তাফসীরে সাঈদী
সূরা আল-ফাতিহা
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

تَـفْـسِـيْـرِ سَـعِـيْـدِى

তাফসীরে সাঈদী

সূরা আল ফাতিহা

কোরআন, হাদীস, দর্শন, ইতিহাস ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের অতুলনীয় সমাবেশ ঘটেছে সূরা ফাতিহার এই তাফসীরে। এই তাফসীর শুনে রাজধানী ঢাকা ও বন্দর নগরী চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত ৪৭ জন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাফসীরে সাঈদী
সূরা আল ফাতিহা
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
সার্বিক সহযোগিতায় ঃ রাফীক বিন সাঈদী
অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল
প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ০১৭১১-২৭৬৪৭৯
ষষ্ঠ প্রকাশ ঃ ২০০৮ নভেম্বর
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ নাবিল কম্পিউটার
৫৩/২ পাঁচতলা-সোনালীবাগ
বড়মগবাজার, ঢাকা–১২১৭, ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১
প্রচ্ছদ ঃ মাসুদ সাঈদী
মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা–১১০০
শুভেচ্ছা বিনিময় ৪৫০/- টাকা

Tafsir-e-Sayedee
Sura Al-Fatiha
Moulana Delawar Hossain Sayedee
Co-operated by **Moulana Raceq bin Sayedee**
Copyist : **Abdus Salam Mitul**
Published by Global publishing Network, Dhaka.

Price : Tk. Four hundred fifty only
Twenty Five Doller (U.S.) Only
Fifteen Pound Only

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সূরা আল-ফাতিহা মহান আল্লাহর নাজিল করা কিতাব পবিত্র কোরআনের সুবিন্যস্ত প্রথম সূরা এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে অবতীর্ণ সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা। এ কারণে এই সূরার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনাতীত। পবিত্র ত্রিশ পারা কোরআনে মানব জাতিকে পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে বিস্তারিতভাবে যা কিছু বিবৃত হয়েছে, এই সূরা ফাতিহায় তারই সার নির্যাস ও সারাংশ (Substance) সন্নিবেশিত হয়েছে। আল্লাহর কোরআন যে জীবন দর্শন ও দার্শনিক মতাদর্শ এবং ইসলামী চেতনার ভিত্তি বা বুনিয়াদ পরিবেশন করেছে, তারই মৌলিক তথ্য ও তত্ত্বসমূহ এ সূরায় নিহিত রয়েছে। এ সূরা তিলাওয়াত ব্যতীত নামাজ গ্রহণীয় নয়—এ জন্য প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে এ সূরার গভীর তাৎপর্য ও নিহিত ভাবধারাসমূহ বিস্তারিতভাবে অনুধাবন করতে হবে।

এই সূরা পাঠকারীর চেতনায় যখন এ কথা জাগ্রত থাকবে যে, সে কি পাঠ করছে এবং আল্লাহর সাথে সে কি অঙ্গীকার করছে, তখন তার পক্ষে আল্লাহর দাস হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা অত্যন্ত সহজ হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের জীবনে দ্বৈত ইবাদাত বা দ্বৈত গোলামীর লক্ষণ তীব্রভাবে পরিস্ফুটিত। অথচ, আল্লাহর দরবারে দ্বৈত ইবাদাত তথা দ্বৈত গোলামী গ্রহণীয় নয়। বান্দার প্রতি এটা আল্লাহর অধিকার যে, তারা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত বা গোলামী (slavery) করবে। কিন্তু আল্লাহর গোলাম বলে যারা নিজেদেরকে দাবী করে, তারা অবচেতনভাবেই আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন সত্তারও গোলামীতে লিপ্ত রয়েছে। মুসলমান দ্বৈত গোলামীতে লিপ্ত, এ কারণেই বর্তমানে গোটা পৃথিবীতে তারা লাঞ্ছিত ও অবহেলিত এবং আল্লাহর সাহায্য বঞ্চিত। পক্ষান্তরে আল্লাহর সাহায্য লাভের পূর্ব শর্তই হলো, গোলামী করতে হবে একমাত্র আল্লাহর।

মুসলমানদের দুরবস্থার একমাত্র কারণ হলো, নামাজের প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহায় কী তিলাওয়াত করছে, তা জানেনা এবং এ সম্পর্কে তারা সচেতন নয়। একজন মুসলমান নামাজে আল্লাহর সামনে একাগ্রচিত্তে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে যে চেতনার কথা বারবার পুনরাবৃত্তি করছে, সেই চেতনা শানিত করার উদ্দেশ্যে আমি ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রামে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তাফসীর মাহফিলে দীর্ঘ পাঁচদিন ব্যাপী বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করেছিলাম। উল্লেখ্য সূরা

ফাতিহার এই তাফসীর রচিত হয়েছে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পাঁচদিন ব্যাপী তাফসীর মাহফিল '১৯৯৭ এ প্রদত্ত আলোচ্য বিষয় কেন্দ্রিক আমার সুদীর্ঘ বক্তব্য অবলম্বনে এবং এই তাফসীর শুনে চট্টগ্রাম-তাফসীর মাহফিল ও রাজধানী ঢাকার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত তাফসীর মাহফিলে এ পর্যন্ত ৪৭ জন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন।

কোরআনের তাফসীর স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মতামত অনুসারে আল্লাহর কোরআনের সর্বোত্তম তাফসীর হলো কোরআন দিয়েই কোরআনের তাফসীর করা। কোরআনের এক আয়াতের তাফসীর অন্য আয়াত দিয়েই করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে বিষয়টি এক আয়াতে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে ভিন্ন আয়াতে সেই বিষয়টিই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং হাদীস শরীফেও তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এসেছে। মহান আল্লাহর রহমতে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পন্থানুসারে কোরআন দিয়েই কোরআনের তাফসীর করি। সূরা আল-ফাতিহার তাফসীরও কোরআন হাদীস দিয়েই করেছি। ভিন্ন বিষয় যা কিছু আলোচিত হয়েছে তা প্রাসঙ্গিক বিষয় স্পষ্টভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যে।

ময়দানের বক্তব্য বহুলাংশে ময়দানেই থেকে যায়। সেক্ষেত্রে চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে পূর্ণাঙ্গ আলোচিত বিষয় স্থায়ীভাবে পৌঁছে দেয়ার মানসে শব্দধারণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে বর্ণমালায় সুন্দর ও সুপাঠ্য করে সাজিয়েছে আমার সন্তানতুল্য আব্দুস সালাম মিতুল। আমার নিদারুণ ব্যস্ততা, দেশে অনুপস্থিতি ও সময়ের স্বল্পতার কারণে এই বিশাল গ্রন্থের প্রতিটি শব্দের প্রতি যতটা যত্নবান হওয়া প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি। এ কারণে মুদ্রণ জনিত ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং, ভুল-ত্রুটি সংশোধনে যে কোন পরামর্শ শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণীয়। কোরআন প্রেমিকদের কাছে এ তাফসীর গ্রন্থটির ব্যাপক চাহিদার কারণে মাত্র দুই মাসে এর দ্বিতীয় মুদ্রণের শেষ কপিটিও নিঃশেষ হয়ে যায়। তৃতীয় মুদ্রণের পূর্বে যতটা সম্ভব ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে ভিন্ন অঙ্গসজ্জায় বর্ধিত কলেবরে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। এ ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও আমার নির্দেশে প্রকাশক মূল্য বৃদ্ধি করেননি।

সূরা ফাতিহার এই তাফসীর পাঠান্তে দ্বৈত গোলামী পরিহার করে একমাত্র আল্লাহর গোলামীর আলোয় আমাদের জীবন আলোকিত হোক, আল্লাহর একত্বের প্রতি ঈমান আরো বদ্ধমূল হোক, সুদৃঢ় হোক এটাই ঐকান্তিক কামনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের ঈমানের বলে বলীয়ান করুন, একমাত্র তাঁরই গোলামী করার ঈমানী চেতনাকে শানিত ও উজ্জীবিত করুন। অনুলিখক এবং প্রকাশকসহ গ্রন্থটির সাথে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যার যতটুকু যোগ থাক আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল সবাইকে দান করুন এর উত্তম ও যথার্থ বিনিময়।

আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী
সাঈদী

সূচীপত্র পৃষ্ঠা

প্রথম আয়াত

দ্বিতীয় আয়াত

তৃতীয় আয়াত

চতুর্থ আয়াত

পঞ্চম আয়াত

ষষ্ঠ আয়াত

সপ্তম আয়াত

اَللّٰهُمَّ انِسْ وَحْشَتِىْ فِىْ قَبْرِىْ ط اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً ط اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَانَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَه اٰنَاءَ الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَّارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

হে আল্লাহ! আমায় কবরে আমার একাকীত্বের ভয়াবহতার সময় তুমি আমাকে কোরআনের আলো দিয়ে প্রশান্তি দান করো। হে আল্লাহ! কোরআন দিয়ে তুমি আমার ওপর দয়া করো, কোরআনকে তুমি আমার জন্যে ইমাম, নূর, পথপ্রদর্শক ও রহমত বানিয়ে দিয়ো। হে আল্লাহ! আমি এর যা কিছু ভুলে গেছি তা তুমি আমায় মনে করিয়ে দিয়ো, যা কিছু আমি–আমার জ্ঞান থেকে হারিয়ে ফেলেছি তার জ্ঞান তুমি আমায় প্রদান করো, তুমি আমাকে দিবানিশি এর তিলাওয়াতের তাওফীক দিয়ো। হে সৃষ্টিকুলের মালিক! তুমি এই কিতাবকে আমার জন্যে চূড়ান্ত দলিল বানিয়ে দিয়ো।

আমীন ! আমীন !!

আল কোরআন পরিচিতি

সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাবের নাম হলো আল কোরআনুল কারীম। এ কিতাব মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়েছে। এ জন্য এর নাম হলো কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব। এই কোরআনকে অবতীর্ণের সময় কাল থেকে পৃথিবী ধ্বংস হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কোরআনের পূর্বেও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনুল কারীমে সেসব আসমানি কিতাবের নাম তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন প্রধান ফেরেশ্‌তা হযরত জিবরাইল আলাইহিস্‌ সালাম মহান আল্লাহর আদেশে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে অবতীর্ণ করেছেন। এ কিতাবকে সহীহ্‌ শুদ্ধভাবে পড়ে শুনানো এবং এর প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের ওপরে দেয়া হয়েছিল। এ কিতাব পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর বাণী এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন এ কিতাবের সঠিক ব্যাখ্যাতা। সারা পৃথিবীর মানব মন্ডলীর পৃথিবীতে শান্তি এবং আলমে আখিরাতে মুক্তি এই কোরআনের শিক্ষা অনুসরণের ওপরে পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এ কারণেই পবিত্র কোরআন যে কোন ধরনের মানুষের পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ-

আমি এ কোরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়েছি। এখন উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ? (সূরা ক্বামার-৪০)

মানুষের জন্য এ কোরআন হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হলেও সবার পক্ষে এ কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করা সম্ভব নয়। হেদায়েত লাভ করতে হলে যেসব শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন, সেসব শর্ত যাঁদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, কেবল তাঁরাই এ কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করতে সক্ষম হবেন। এ কোরআন একদিনে বা একই সময়ে অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে প্রয়োজন অনুসারে, ঘটিতব্য বা সংঘটিত কারণে, সময়ের বিভিন্ন পর্যায়ে অল্প অল্প করে রাসূলের ওপরে অবতীর্ণ করেছেন।

পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলেও তার বর্ণনাশৈলী, বাচনভঙ্গী পৃথিবীতে প্রচলিত আরবী ভাষার অনুরূপ নয়। এই কিতাবের ভাষা প্রচলিত আরবী ভাষা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কোরআনের ভাষা নির্ধারণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহর রাব্বুল আলামীন। এই কোরআনের ভাষা যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তেমনি কোরআন যে ভাব প্রকাশ করে, সে ভাবও এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকেই। এ কোরআন যাঁর ওপরে অবতীর্ণ হয়েছে নিঃসন্দেহে তিনি মানব জাতির বাইরের কেউ ছিলেন না। তিনিও মানুষ ছিলেন, তবে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ

থেকে তিনি ছিলেন ভিন্ন। কোরআনের বাহক মানুষ ছিলেন এ কথা স্বয়ং আল্লাহ তাঁকেই বলতে বলেছেন–

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ-

বলো, আমিও তোমাদের অনুরূপ একজন মানুষ। (সূরা আল কাহ্ফ-১১০)
কোরআনের বাহক মানুষ ছিলেন বলে এর ভাষা ও বাচনভঙ্গী, বর্ণনাশৈলী, শব্দ চয়ন, ভাব মানুষের রচিত কোন কিতাবের মতো নয়–বরং তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও আগত। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ মানব জাতিকে অবগত করেছেন–

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيْهِ-

এটা সেই কিতাব যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। (সূরা আল বাকারা-২)
অর্থাৎ এটা সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর কিতাব, এটা এমন একটি কিতাব, যে কিতাবে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টিকারী একটি বাক্যও সংযোজন করা হয়নি। পৃথিবীর চিন্তাবিদগণ, গবেষকগণ নানা ধরনের গ্রন্থ রচনা করে থাকেন। তাঁদের গবেষণালব্ধ বিষয় বস্তু গ্রন্থাকারে মানব জাতির সামনে প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু তাঁরা গ্রন্থাকারে যেসব তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সে সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে এ কথা বলতে সক্ষম নন যে, 'তাঁদের বিবৃত বিষয় সম্পূর্ণ সংশয় মুক্ত'।

কিন্তু পবিত্র কোরআন তার বিবৃত বিষয়, তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে সকল সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত বলে স্পষ্ট ঘোষণাই শুধু দেয়নি, এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। কারণ এই কোরআন যাঁর বাণী তিনি সব ধরনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও অতিন্দ্রীয় তথ্য, তত্ত্ব ও নির্ভুল জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি যে কোন ধরনের দুর্বলতা, দোষ-ত্রুটি, অক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং তিনি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সে কিতাবে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

মানুষ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। দুর্বলতা, ভ্রান্তি, অজ্ঞতা ও অক্ষমতার বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। মানুষ সন্দেহ আর সংশয়ের আবর্তে আবর্তিত হয় এবং এটা মানুষের স্বভাবজাত। এ কারণে মানুষের চিন্তার জগতে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে যদি কোন সংশয় সৃষ্টি হয়, এ সংশয় মানুষেরই অজ্ঞতা আর অক্ষমতার প্রত্যক্ষ ফসল। এর সাথে আল্লাহর কোরআনের ন্যূনতম কোন সম্পর্ক নেই। গগন চুম্বী বিশাল অট্টালিকার সামনে একজন মানুষ যদি তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করে চোখের সামনে তুলে ধরে, তাহলে সে মানুষের দৃষ্টির সামনে থেকে আকাশ চুম্বী সেই শততলা অট্টালিকা আড়াল হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে অট্টালিকার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। অট্টালিকা বিদ্যমান, এটা অটল বাস্তবতা। দুর্বলতা পরিবেষ্টিত সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী মানুষ নিজের অক্ষমতার কারণে যদি কোরআনের সততা নিরূপণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার যাবতীয় ব্যর্থতা মানুষের ওপরেই আপতিত হয়, আল্লাহর কোরআনকে তা স্পর্শ করতে পারে না।

আল কোরআন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর বাণী

মানব জাতির সর্বকালের এবং সর্বযুগের জন্য যে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা কোন মানুষের রচনা করা কিতাব নয়। পবিত্র কোরআন যে যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল, তদানীন্তন যুগের বিভ্রান্ত লোকজন বলতো, 'এ কিতাব মানুষের রচিত।' এ ধরনের কথা প্রতিটি যুগেই বিভ্রান্ত লোকজন বলে থাকে। যারা এ ধরনের ধারণা পোষণ করে থাকে, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাকারার ২৩ আয়াতে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন-

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّانَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ-

আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তা আমার প্রেরিত কি-না, সে বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কথা পরিষ্কার করে দিলেন। কোরআন অবতীর্ণের যুগে যারা ধারণা করতো যে, এটা মানুষের রচনা করা কিতাব-তাহলে যারা এ ধরনের ধারণা পোষণ করছে, তারাও মানব জাতির বাইরের কেউ নয়। তারাও তো মানুষ। সুতরাং মানুষ হিসেবে তারাও এ ধরনের কোরআন রচনা করতে সক্ষম, অতএব কোরআনের একটি সূরার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে তারা প্রমাণ করে দিক যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোরআন আল্লাহর বাণী বলে দাবি করছেন, তা আল্লাহর বাণী নয়-বরং তা মানুষের রচনা করা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবিশ্বাসীদের লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের মনে যদি এ ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, এ কোরআন 'মানুষের কথা' তাহলে তো জ্ঞানী, বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ, পণ্ডিত বলে দাবিদার সব মানুষেরই এ ধরনের কথা বলার ক্ষমতা থাকা উচিত যে, 'আমি এই কিতাব রচনা করেছি।' অথচ এ ধরনের কোন ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে কারো নেই। তবুও তোমরা আমার কিতাবের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করছো। তোমাদের দাবি তো তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন তোমরা তোমাদের দাবির অনুকূলে আমার কিতাবের ন্যায় একটি কিতাব রচনা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু আমি উপর্যুপরি চ্যালেঞ্জ দিয়েছি, গোটা মানব মন্ডলী মিলিত হয়েও এমন ধরনের একটি কিতাব রচনা করতে অক্ষম। সুতরাং নিজেদের অক্ষমতার প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে প্রকৃত সত্য গ্রহণ করে আমার প্রেরিত কিতাবের প্রতি অনুগত হয়ে যাও-এতেই তোমার জীবনের সার্বিক উন্নতি ও মুক্তি নির্ভরশীল।

কোরআন যাঁর বাণী সেই আল্লাহ বলেন, তোমরা যারা আমার দাসত্ব পরিত্যাগ পূর্বক নানা ধরনের অসার বস্তুকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছো। অথচ প্রভু হওয়ার যাবতীয় যোগ্যতা কেবল মাত্র আমারই রয়েছে। তোমরা যাদেরকে প্রভু মনে করে দাসত্ব করছো, তোমাদের সেসব প্রভুদেরকে বলো, কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুক। কিন্তু তারা তোমাদেরকে কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আর এ থেকেই তো তোমাদের অনুভব করা উচিত যে, তোমাদের কোন দাবীর

অনুকূলে যখন তারা এগিয়ে আসতে সক্ষম নয়, তখন তারা দাসত্ব লাভের যোগ্য হতে পারে না। দাসত্ব লাভের একমাত্র যোগ্য তো তিনিই-যিনি অনুগ্রহ করে তোমাদেরকে সত্য সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য কোরআনের মতো একটি অতুলনীয় কিতাব প্রেরণ করেছেন।

কোন কোন মানুষ এ ধারণা পোষণ করে যে কোরআনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা যে চ্যালে প্রদান করেছেন, সে চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র পবিত্র কোরআনের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য, সাহিত্যিক মান ও সৌন্দর্য এবং উচ্চাঙ্গের ভাষার ব্যাপারে প্রযোজ্য। এ ধরনের ভুল ধারণা যারা পোষণ করে, তারা মূলতঃ কোরআনের গভীরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারায় আবর্তিত হয়। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কোরআনের মর্যাদা এসব ক্ষুদ্র চিন্তা-চেতনা থেকে অনেক উর্ধ্বে। কোরআনের শব্দ, ভাষা এবং সাহিত্যিক মান, বর্ণনাশৈলীর দিক দিয়ে যে অনবদ্য, অতুলনীয় এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে যে কারণে এ কথা বলা হয়েছে যে, 'মানবীয় চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এ ধরনের কিতাব রচনা করা সম্ভব নয়' সে কারণগুলো পবিত্র কোরআনে আলোচিত বিষয়াদি, কোরআন কর্তৃক উপস্থাপিত জীবনাদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য ও তত্ত্বসমূহ। কোরআন যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছে, যে শিক্ষা মানব জাতির সম্মুখে পেশ করেছে, যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার মানব সভ্যতার সামনে উন্মোচন করেছে, যে আদর্শের দিকে মানব জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তা কোন মানবীয় মন-মস্তিষ্ক কল্পনাও করতে পারে না।

শুধু মানব জাতিই নয়-জ্বিন ও মানব জাতি সম্মিলিতভাবে কিয়ামত পর্যন্তও চেষ্টা-সাধনা করতে থাকে, তবুও আল্লাহর কোরআনের অনুরূপ কোন কিতাব রচনা করতে সক্ষম হবে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৮ নং আয়াতে বলেন-

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا-

বলে দাও, মানব ও জ্বিন জাতি সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে কোরআনের মতো একটি জিনিস আনার চেষ্টা করে তবুও তারা আনতে সক্ষম হবে না, তারা পরস্পরের সহযোগী হয়ে গেলেও। (সূরা বনী ইসরাঈল)

পবিত্র কোরআন যাঁর ওপরে অবতীর্ণ হলো, তিনি হঠাৎ করে আকাশ থেকে অবতরণ করে এ দাবী করেননি যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব নিয়ে এসেছি। বরং সেই পূত ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব জীবনের চল্লিশটি বছর সেই লোকগুলোর মাঝেই অতিবাহিত করেছেন, যে লোকগুলো এ অপবাদ দিচ্ছে যে, 'কোরআন তাঁর নিজের রচনা করা।' যারা এ অপবাদ দিচ্ছে, তারাও এ কথা ভালো করে জানতো, এই ব্যক্তির পক্ষে এমন ধরনের কোন কিতাব রচনা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় এবং এই ব্যক্তির পক্ষে সামান্যতম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। তবুও তারা যখন এই অপবাদের কালিমা আল্লাহর রাসূলের ওপরে লেপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো, তখন স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে বলতে বললেন-

قُلْ لَّوْشَاءَ اللّٰهُ مَاتَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَاۤاَدْرٰكُمْ بِهٖ-فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ-اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-

হে রাসূল ! আপনি ওদেরকে জানিয়ে দিন, আমি তোমাদেরকে এ কোরআন শুনাবো এটা যদি আল্লাহ না চাইতেন, তাহলে আমি কোন ক্রমেই তা তোমাদেরকে শুনাতে সক্ষম হতাম না এমনকি এই কোরআন সম্পর্কে কোন সংবাদও তোমাদেরকে জানাতে পারতাম না। আমি তো তোমাদের মধ্যেই আমার জীবনের সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করে আসছি। তোমরা কি এ বিষয়টিও অনুভব করতে সক্ষম হচ্ছো না ? (সূরা ইউনুছ-১৬)

যারা এ অপবাদ আরোপ করছিল যে, নিজের রচনা করা কিতাব তিনি আল্লাহর বাণী বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, তাদেরকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, আমি যদি আমার রাসূলের ওপরে এ কোরআন অবতীর্ণ না করতাম তাহলে তিনি তোমাদেরকে এ কোরআন শুনাতে পারতেন না এমনকি এ কোরআন সম্পর্কে কোন সংবাদও তোমাদেরকে জানাতে পারতেন না। আমি না জানালে তিনি যে কোরআন শুনাতে সক্ষম হতেন না, এ কথা তোমাদের চেয়ে আর বেশী ভালো কে জানে ? কেননা, তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কাল তোমাদের মাঝেই অতিবাহিত হয়েছে। যে ব্যক্তি তার জীবনের সুদীর্ঘকাল তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করলো, সে ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে তোমরা তো পরিপূর্ণভাবে অবগত রয়েছো।

আমি যাঁর ওপরে আমার কোরআন অবতীর্ণ করেছি, সেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অদৃশ্য জগৎ থেকে হঠাৎ করে তোমাদের মাঝে আবির্ভূত হননি বা তিনি তোমাদের কাছে কোন অপরিচিত ব্যক্তিত্ব নন। তিনি যখন তোমাদেরকে শুনালেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে নবী নির্বাচিত করা হয়েছে, তার ক্ষণপূর্বেও কি তোমরা তোমাদের এই সুপরিচিত ব্যক্তিত্বের মুখে কোরআনের কোন আয়াত বা কোরাআনে আলোচিত বিষয়বস্তু, কোরআন পরিবেশিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বক্তব্য শুনেছিলে ? নিশ্চয়ই তোমরা তা ইতিপূর্বে তাঁর মুখ থেকে শোননি।

তাহলে কি তোমাদের মনে এ প্রশ্ন জাগে না, দীর্ঘকালের পরিচিত এই লোকটির মুখ থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত যে কালাম আমরা শুনছি, তা কোন মানুষের রচনা নয় ? ক্ষণিকের মধ্যে এই লোকটির মধ্যে কিভাবে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হলো ? এতকাল এই লোকটি যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে কথা বলে এলো, সে ভাষা ও ভঙ্গীতে কোন অতিন্দ্রীয় শক্তির স্পর্শে পরিবর্তন ঘটলো ? সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোকটির মুখ থেকে কিভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য সমৃদ্ধ কথা নির্গত হলো ? এসব বিষয়ে কি তোমাদের মনে কোন প্রশ্ন সৃষ্টি হয় না ? এসব দিক চিন্তা করলেই তো তোমরা অনুভব করতে সক্ষম হবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কালাম তোমাদেরকে শুনাচ্ছেন, তা তাঁর নিজের রচনা করা নয়-বরং তা আল্লাহর কালাম। আমি যাঁর প্রতি আমার কোরআন অবতীর্ণ করেছি, তিনি এমন নন যে, আমার কালাম তোমাদেরকে শুনিয়ে দিয়ে তিনি অন্য কোথাও চলে যান। বরং আমার কালাম তোমাদের সামনে পেশ করার

পর তিনি তোমাদের মাঝেই পূর্বের ন্যায় বসবাস করতে থাকেন। তোমাদের সাথে আত্মীয়তা ও সামাজিকতা যেভাবে ইতিপূর্বে রক্ষা করতেন, এখনও তাই করছেন। তিনি কোন ভাষায় কথা বলেন, তাঁর বাচন ভঙ্গী কি ধরনের তা তোমরা সুদীর্ঘকাল শুনেছো এবং এখনও শুনছো। আবার তিনি আল্লাহর কালাম হিসেবে যা তোমাদেরকে শুনাচ্ছেন, তার ভাব ও ভাষা, বাচন ভঙ্গী, বর্ণনাশৈলী, প্রকাশ রীতি, শব্দ চয়ন এমন নতুন ধরনের যে, যা ইতিপূর্বে তোমরা কেউ শোননি। এই পার্থক্য নিশ্চয়ই তোমরা অনুভব করে থাকো। সুতরাং তোমরা তোমাদের অনুভূতি শক্তির মাধ্যমেই অনায়াসে বুঝতে পারবে যে, এটা আল্লাহর কালাম।

মহান আল্লাহর এই যুক্তি শুধুমাত্র সেই যুগের জন্যই প্রযোজ্য ছিল না, বরং আল্লাহর এসব যুক্তি অতীতকালে যেমন প্রযোজ্য ছিল, বর্তমান কালেও তেমনিভাবে প্রযোজ্য এবং অনাগত কালেও প্রযোজ্য হবে। আরবী ভাষা সম্পর্কে যারা প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেছে, তাদের সামনে যদি কোরআনের আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয়, তারাও একবার মাত্র পাঠ করেই আল্লাহর বাণী এবং রাসূলের কথার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা অঙ্কন করতে সক্ষম হবেন। সুতরাং পবিত্র কোরআন যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব এবং এটা যে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বাণী, এ কথার সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহর কোরআন। এই কিতাব এমন ধরনের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত যে, এই বৈশিষ্ট্যই মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে।

কোরআন নিজেকে আল্লাহর বাণী বলে কেন দাবী করে

নবীদের সমসাময়িক যুগের অবস্থা সম্পর্কিত ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, সেসব যুগে মানুষ যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও পারদর্শিতা অর্জন করেছিল, মহান আল্লাহ তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলকে সে বিষয়ে যুগের সমস্ত মানুষের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে যখন প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন মানুষ যাদুবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। তারা যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে অস্বাভাবিক একটা কিছু প্রদর্শন করতে সক্ষম হতো। মহান আল্লাহ তাঁর নবী হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে এমন ধরনের ক্ষমতা দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন যে, তদানীন্তন যুগের শ্রেষ্ট যাদুকরদের যাবতীয় ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে প্রদত্ত ক্ষমতা ও শক্তির সামনে পানির বুদ্বুদের মতই মিলিয়ে গেল।

সাধারণ মানুষ অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করলো, যাদুকরবৃন্দ দীর্ঘ সাধনার ফলে যে শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করেছিল, তা মুহূর্তের ভেতরে হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের শক্তি ও ক্ষমতার সামনে ম্লান হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তারা এটাও স্পষ্ট অনুভব করলো যে, যাদুকরদের প্রদর্শনীমূলক ক্রিয়াকর্ম স্পষ্টতই যাদু–যা যে কোন ব্যক্তি সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে সক্ষম হবে। আর হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম যা প্রদর্শন করছেন, তা যাদু নয় এবং এ ক্ষমতা সাধনা করে অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং এ ক্ষমতা তিনিই দান করেছেন, যিনি এ আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং পালনকর্তা।

হযরত ঈসা রুহুল্লাহকে যখন পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন মানুষ চিকিৎসা শাস্ত্রে এতটা উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, তারা দুরারোগ্য ব্যাধি চিকিৎসার মাধ্যমে উপশম করতে সক্ষম হতো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে সে যুগের সমস্ত মানুষের ওপরে যোগ্যতা, ক্ষমতা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। তিনি জন্মান্ধের চোখে হাত স্পর্শ করতেন আর জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করতো। সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের ক্ষমতা অবলোকন করতে বাধ্য হতো। সাধারণ জনগণ চিকিৎসকদের ক্ষমতা আর হযরত ঈসার ক্ষমতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হতো যে, চিকিৎসকগণ যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তা তাদের সাধনা লব্ধ ক্ষমতা। আর হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম যে ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন, তা সাধনালব্ধ কোন ক্ষমতা নয়–এ ক্ষমতা তিনিই দান করেছেন, যিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ সারা পৃথিবীবাসীর জন্য শেষনবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী-রাসূল আসবে না। তাঁকে যে যুগে এবং যেখানে প্রেরণ করা হয়েছিল, ইতিহাস সাক্ষী–সেখানের মানুষ ভাষা ও সাহিত্যে এতটা পারদর্শিতা অর্জন করেছিল যে তারা পরস্পরে সাধারণভাবে যেসব কথা বলতো, সে কথাগুলোও কাব্যাকারে বলতো। তাদের কথা ও রচিত পংক্তিমালার ভেতরে উচ্চমানের সাহিত্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

বর্তমান বিজ্ঞানের হিরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত পৃথিবীর সভ্যতাগর্বী মানুষ সে যুগের মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই তাদের প্রতি 'বর্বর, মূর্খ' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে থাকে। অথচ তাদের রচিত কাব্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বর্তমানের ভাষাবিদগণ স্তব্ধ হয়ে পড়েন। সে যুগে রচিত কবিতাসমূহ বর্তমানেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে পঠিত হচ্ছে। বিশ্বনবীর মহিলা সাহাবী হযরত খান্সা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা মাত্র কিছুদিন পূর্বে বৈরুত থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ হয়ে গোটা পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নবীর সাহাবী হযরত হাছ্ছান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিখ্যাত একজন কবি ছিলেন।

বর্তমানে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ইসলাম বিদ্বেষীগণ যেমন খোদাহীন কবি সাহিত্যিকদেরকে ব্যবহার করে থাকে, সে যুগেও ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠী সে যুগের কবি ও সাহিত্যিকদেরকে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতো। এসব কবি আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রুপাত্মক ও বিদ্বেষমূলক কবিতা রচনা করে সারা আরব সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে দিত যেন সাধারণ মানুষের মনে আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবাদের সম্পর্কে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

সাহাবাগণ এসব কটূক্তিপূর্ণ কবিতা শুনে ব্যথিত হতেন। তাঁরা হযরত আলীকে অনুরোধ জানালেন তিনি যেন কবিতা রচনা করে ইসলাম বিদ্বেষী কবিদের জবাব দেন। হযরত আলী

রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাঁকে অনুমতি দান করেন তাহলে তিনি জবাব দেবেন। রাসূলের কাছে অনুমতি কামনা করা হলে তিনি বললেন, 'আলী এ কাজের উপযুক্ত নয়।' তারপর তিনি মদীনার আনসারদের লক্ষ্য করে বললেন, 'যাঁরা তলোয়ার দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে তাঁরা কি ভাষা দিয়ে এ বিদ্রূপের বাধা দিতে পারেন না?'

আল্লাহর রাসূলের এ কথা শুনে বয়স্ক একজন আনসার সাহাবী উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জিহ্বা বের করে রাসূলকে দেখালেন। তারপর তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অনুমতি কামনা করে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! এ কাজের জন্য আমি উপস্থিত। মহান আল্লাহর শপথ ! আল্লাহর শত্রুদের কথার মোকাবেলা করার মতো বাক্যের থেকে বসরা, সিরিয়া এবং ইয়েমেনে আমার কাছে অন্য কোন বাক্য-ই প্রিয় নয়।' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি যে বংশ থেকে স্বয়ং উদ্ভূত সে বংশের লোকদের বিদ্রূপ তুমি কিভাবে করবে?' হযরত হাছ্ছান বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! তাদের মধ্য থেকে আপনাকে এমনভাবে পৃথক করবো যেভাবে আটার স্তুপ থেকে চুল বের করা হয়।'

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সে প্রিয় সাহাবীর দিকে পরম মমতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং তাঁকে দায়িত্ব দিলেন, তিনি যেন ইসলাম বিদ্বেষী কবিদের জবাব কবিতা দিয়েই দেন। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী কবিতা রচনা করে শত্রুদের মুখ বন্ধ করে দিতেন। তিনিই দরবারে রেসালাতের সবচেয়ে বড় কবি হবার মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। হযরত বিলালের মতো একজন হাবশী গোলামও অতুলনীয় কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পরে প্রাথমিকভাবে মদীনার আবহাওয়া অনুকুল না হবার কারণে অনেকেই প্রচন্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। জ্বরের তীব্রতা এতটা ছিল যে, কারো কারো মাথার চুল পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জ্বরে আক্রান্ত হলেন। প্রচন্ড জ্বরের কারণে কখনও কখনও তিনি অসামঞ্জস্যমূলক কথা বলতেন। এই অবস্থাতেও তাঁর হৃদয়ে সুপ্ত দেশ প্রেম জাগ্রত হয়ে উঠতো এবং যার প্রকাশ ঘটতো কবিতার মাধ্যমে। তিনি তাঁর শৈশব কৈশোর আর যৌবনের চারণভূমি মক্কার বিভিন্ন স্থানের স্মৃতি চারণ করতেন কাব্যাকারে।

প্রিয় জন্মভূমি মক্কার কথা মনে পড়লেই তাঁর চোখ থেকে ঝর্ণার মত পানি ঝরতো। মাতৃভূমি মক্কার কথা স্মরণ করে তিনি বিরহ গাঁথা রচনা করে গাইতেন। তখন তাঁর দু'নয়ন থেকে তপ্ত অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তো। তাঁর হৃদয়ের ক্ষত থেকে কবিতাকারে বের হয়ে আসতো, 'হায় ! সেদিন কি আর আমি ফিরে পাবো না ! যেদিন আমি মক্কার উন্মুক্ত প্রান্তরে নির্জনে একাকী রজনী অতিবাহিত করবো, আমার সঙ্গী হবে সেখানের সুগন্ধি ঘাস ইজখির আর রাতের শিশির। হায় ! সেদিন কি আর আমার জীবনে দেখা দেবে ! যেদিন আমি মাজনার সরোবরে সাঁতার কাটতে সক্ষম হবো ! প্রাণভরে আমি তাফীলের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য অবলোকন করবো !

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন একটি কিতাব দান করলেন, যে কিতাবের সামনে পৃথিবীর সমস্ত কবি-সাহিত্যিকদের কাব্য ও সাহিত্য প্রতিভা চিরদিনের জন্য ম্লান হয়ে গেল। আল্লাহ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করলেন-

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ-بَل لَّا يُؤْمِنُونَ-فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ-

এরা কি এ কথা বলে যে, এই ব্যক্তি কোরআন নিজে রচনা করে নিয়েছে ? প্রকৃত কথা হলো, এরা বিশ্বাস স্থাপন করতে চায় না। এরা যদি তাদের এই কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তারা এমন মর্যাদাপূর্ণ একটি কালাম রচনা করে নিয়ে আসুক না। (সূরা আত্-তুর-৩৩-৩৪)

পবিত্র কোরআন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রচনা নয়-আল্লাহর চ্যালেঞ্জ শুধু এ ব্যাপারেই নয়, আল্লাহ তা'য়ালার চ্যালেঞ্জ হলো, আদৌ এ কিতাব মানব রচিত নয়। মানুষ যে জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও প্রতিভার অধিকারী, তা প্রয়োগ করে এ ধরনের মর্যাদাপূর্ণ একটি কিতাব প্রণয়ন করা আদৌ সম্ভব নয়। এ ধরনের একটি কালাম রচনা করা মানুষের শক্তি ও প্রতিভার সীমার বাইরের বিষয়। মহান আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোন দেশের জনগণের জন্যই শুধু নয়-নয় তা কালের গন্ডিতে আবদ্ধ। আল্লাহর চ্যালেঞ্জ সারা পৃথিবীবাসীর জন্য এবং অনন্ত কাল ব্যাপী।

এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো সাহস সেই অতীতকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্তও কেউ প্রদর্শন করেনি, অনাগত কালেও কেউ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এই চ্যালেঞ্জের প্রকৃত তাৎপর্য অনেক পন্ডিত ব্যক্তি অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে মন্তব্য করে থাকেন, 'বিষয়টি শুধুমাত্র কোরআনের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা ও রচিয়তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন যে ভাব-ভাষা ও ভঙ্গী, শব্দ চয়ন করে গ্রন্থ প্রণয়ন করে থাকেন, তা আরেকজন পারবেন না। কারণ কাব্য ও সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকেন। তাদের একের বৈশিষ্ট্য আরেকজনের অনুরূপ হয় না। যেমন একজন খ্যাতিমান বক্তার অনুরূপ আরেকজন বক্তা বক্তৃতা করতে সক্ষম হন না,হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে।'

আসলে এ ধরনের লোকজন আল্লাহর চ্যালেঞ্জের প্রকৃত তাৎপর্য ও স্বরূপ যথার্থভাবে অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে থাকে। এরা মনে করে, কোরআনে যেভাবে শব্দ চয়ন করা হয়েছে, যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, যে ভঙ্গী অনুসরণ করা হয়েছে, বর্ণনার ক্ষেত্রে যে অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে, আল্লাহর চ্যালেঞ্জ বোধহয় এসব ক্ষেত্রেই করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর চ্যালেঞ্জের স্বরূপ হলো, পবিত্র কোরআন যে ধরনের সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চতর মু'জিযার অধিকারী গ্রন্থ, মান-মর্যাদার সুষমামন্ডিত উচ্চতর বৈশিষ্ট্য ও বিশাল মাহাত্মসম্পন্ন গ্রন্থ, অতুলনীয় শিক্ষাদর্শ প্রদানের ক্ষমতা সম্পন্ন গ্রন্থ, এমন ধরনের কোন গ্রন্থ রচনা করতে যদি সক্ষম হও, তাহলে সে ক্ষমতা প্রদর্শন করো। শুধুমাত্র আরবী ভাষাতেই নয়,

সারা পৃথিবীর যে কোন ভাষায় কোরআনের সমকক্ষ মু'জিযা, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করতে যদি সক্ষম হও তাহলে তা করো। এটাই আল্লাহর চ্যালেঞ্জের প্রকৃত স্বরূপ।

মহান আল্লাহ যখন কোরআন অবতীর্ণ করেন, তখনও এ কোরআন একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা ছিল, বর্তমান কালেও তা রয়েছে এবং অনন্ত কাল ধরেও তা অক্ষুন্ন থাকবে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কোরআন এক অতুলনীয় ও অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক মহাগ্রন্থ। আল্লাহ তা'য়ালা এই কিতাবে যে ব্যাপক ও সর্বাত্মক জ্ঞান সন্নিবেশিত করেছেন, সে জ্ঞানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও অতীত কালে যেমন কোন মনীষীর মধ্যে স্ফুরণ ঘটতে দেখা যায়নি, বর্তমানে এই বিজ্ঞানের যুগেও দেখা যায় না, অনাগত কালেও দেখা যাবে না।

বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সমূহে কোন ব্যক্তি জ্ঞানের কোন একটি শাখায় পারদর্শিতা অর্জনের লক্ষ্যে গোটা জীবনকাল অতিবাহিত করার পরও জ্ঞানের সেই শাখার শেষ স্তর পর্যন্ত তার পক্ষে পৌছা সম্ভব হয় না। সেই ব্যক্তিই যখন তার আকাংখিত জ্ঞানের শাখায় বিচরণের লক্ষ্যে আল্লাহর কোরআনের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন সে দেখতে পায়–গোটা জীবনকাল সে যার অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল, তার স্পষ্ট জবাব ও সমাধান এ কিতাবে রয়েছে।

এই বিষয়টি শুধুমাত্র পরিচিত–অপরিচিত, আবিষ্কৃত–অনাবিষ্কৃত জ্ঞানের বিশেষ কোন একটি শাখার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়-গোটা বিশ্বলোক ও সৃষ্টি জগৎসমূহ, গোটা প্রাণীজগৎ এবং উদ্ভিত জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রথম স্তর থেকে শেষ স্তর পর্যন্ত পবিত্র কোরআনে বিবৃত হয়েছে। অথচ যে যুগকে বলা হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ, যে যুগে জ্ঞানের কোন একটি শাখাও বর্তমান কালের ন্যায় বিকশিত হয়নি, সেই সুর্যোত্তাপস্নাত মরুপ্রান্তরে মুর্খতার তিমিরাবৃত যুগে সম্পূর্ণ নিরক্ষর একজন ব্যক্তি কারো কোন সাহায্য ও গবেষণা ব্যতীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় অকল্পনীয় নির্ভুল ব্যাপক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা অর্জন করলেন এবং প্রতিটি মৌলিক বিষয়ের নির্ভুল স্পষ্ট জবাব রচনা করেছিলেন, এ কথা কি কারো পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব ? সম্ভব নয় বলেই কোরআন নিজেকে আল্লাহর কালাম বলে দাবী করে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরবী ভাষায় পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। ভাষাবিদগণ বলেন, পৃথিবীর সমস্ত ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে আরবী ভাষা থেকে। অর্থাৎ সমস্ত ভাষার মা হলো আরবী, এই ভাষার গর্ভ থেকেই অন্যান্য সমস্ত ভাষা জন্ম গ্রহণ করেছে। এ কারণে পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার ভেতরেই আমরা দেখতে পাই, পরিবর্তিত রূপে বর্তমান সময় পর্যন্তও আরবী শব্দ বিদ্যমান রয়েছে।

এই আরবী ভাষার সর্বোন্নত এবং পূর্ণপরিণত যাবতীয় উচ্চাঙ্গের বৈশিষ্ট্যসহ সাহিত্য মানের চূড়ান্ত বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহর কিতাব। পবিত্র কোরআনের ত্রিশ পারার মধ্যে কোথাও কোন একটি শব্দ অথবা কোন একটি ব্যাখ্যাও অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না, যা নিম্নমানের হতে পারে। যে সূরায় বা যে আয়াতে যে বিষয়েই বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত শোভন, উপযুক্ততম শব্দ চয়ন এবং বাচনভঙ্গীতে পেশ করা হয়েছে।

কোরআনে একই বক্তব্যের পুনরুচ্চারিত করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই তা সম্পূর্ণ নতুন রূপে পরিবেশন করা হয়েছে এবং বলার ভঙ্গীতে অভিনবত্ব রয়েছে, ভিন্ন ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। এ কারণে কোথাও পুনরুচ্চারণের বা পুনরাবৃত্তির অশোভনতা অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না। কোরআনের সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাছ পর্যন্ত শব্দ চয়ন ও সংযোজন এমনভাবে করা হয়েছে, যেন কোন অলঙ্কার শিল্পী তার সাধনালব্ধ কারিগরী কৌশল প্রয়োগ করে হীরক খন্ড একটার পরে আরেকটা সজ্জিত করে এক অনুপম সৌন্দর্যময় আভা ফুটিয়ে তুলেছে। কোরআনের কথার অলঙ্কার ও বর্ণনাশৈলীর প্রভাব এতটা মাধুর্যমন্ডিত যে, ভাষাশিল্পীগণ তা শোনার পরে নিজের অজ্ঞাতেই শ্রদ্ধা নিবেদনে বিরত থাকতে পারে না।

আল্লাহর কোরআনের প্রতি যাদের হৃদয়ে অবিশ্বাস, সন্দেহ-সংশয় রয়েছে, এ ধরনের ব্যক্তির কানে কোরআন তেলাওয়াতের শব্দ প্রবেশ করলে তারা আভিভূত হয়ে পড়েন। প্রায় দেড় হাজার বছর অতিবাহিত হতে চললো, আল্লাহর কোরআনে জীর্ণতার স্পর্শ ঘটেনি–কিয়ামত পর্যন্তও ঘটবে না এবং কোরআন তার নিজ ভাষায় সাহিত্যের এক অতুলনীয় উচ্চতর নিদর্শন হিসেবে পৃথিবীবাসীর সামনে স্বীয় মাহিমা প্রকাশ করে আসছে। এই কোরআনের সমকক্ষ হওয়ার দাবি করা তো অনেক দূরের ব্যাপার, আরবী ভাষায় রচিত কোন একটি গ্রন্থও আল্লাহর কিতাবের উচ্চতর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য এবং তার মূল্যমানের প্রথম সীমা পর্যন্ত এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। বিষয়টি এখানেই শেষ হয়নি, আল্লাহর কোরআন আরবী ভাষাকে এমন দৃঢ় ভিত্তি দান করেছে যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্তও আরবী ভাষার বিশুদ্ধতা ও বিশিষ্টতার মান তাই অক্ষুন্ন রয়ে গিয়েছে, যা আল্লাহর কোরআন প্রথম থেকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল।

অথচ গত প্রায় দেড় হাজার বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর প্রতিটি ভাষাতেই পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোন ভাষাই এতটা সুদীর্ঘকাল ব্যাপী শব্দ গঠন, উপমা প্রয়োগ, সংযোজন, রচনারীতি, বানান পদ্ধতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তার আদি ও অকৃত্রিম রূপ-কাঠামোসহ টিকে থাকতে সক্ষম হয়নি। শুধুমাত্র কোরআনের মু'জিযা–অভ্যন্তরীণ অমিত দুর্জয় শক্তিই আরবী ভাষাকে তার সর্বোচ্চ মান ও বৈশিষ্ট্যের আসন থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত করার প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেয়নি। যেসব কারণে কোরআন নিজেকে আল্লাহর বাণী বলে দাবী করে, উল্লেখিত কারণও তার ভেতরে একটি।

মহান আল্লাহ যে শব্দ, অক্ষর, বর্ণনাশৈলী, রচনারীতি, বাচনভঙ্গী সহযোগে যখন অবতীর্ণ করেছিলেন, বর্তমান কাল পর্যন্তও তার একটি অক্ষরও পরিত্যক্ত হয়নি–কিয়ামত পর্যন্তও হবে না। কোরআনের প্রতিটি বাকরীতি আরবী সাহিত্যে বর্তমান সময় পর্যন্তও অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। আল্লাহর কিতাবের সাহিত্য এখন পর্যন্তও আরবী ভাষায় সর্বোচ্চ মানের সাহিত্য হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি লাভ করে আসছে এবং কোরআনে যে বিশুদ্ধতম ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, বর্ণনায়, রচনায়, লিখনে–ভাষণে এখন পর্যন্তও তাকেই ভাষার বিশুদ্ধ রীতি বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছে। পৃথিবীতে এ যাবৎ কাল পর্যন্ত বহু পন্ডিত ব্যক্তি তাদের স্ব-স্ব ভাষায় কালজয়ী সাহিত্য নির্মাণ করে আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন

করেছেন। কিন্তু কোন একটি সাহিত্যই কি আল্লাহর কোরআনের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের একটিকেও স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে ? হয়নি এবং কখনো হবে না বলেই পবিত্র কোরআন নিজেকে আল্লাহর কিতাব বলে দাবী করে।

আল্লাহর এই কোরআন কোন এক নির্দিষ্ট দিনে একত্রে অবতীর্ণ হয়নি। প্রথমে প্রাথমিক পর্যায়ের হেদায়েত অবতীর্ণ করা হলো। তারপর সেই হেদায়েতের মাধ্যমেই একটি সংস্কারমূলক আন্দোলন ও ভবিষ্যতের গর্ভস্থ দিনগুলোর জন্য সর্বব্যাপী বিপ্লবের সূচনা করে দেয়া হলো। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে যে আন্দোলন পুনঃজাগরিত হলো, সে আন্দোলন দীর্ঘ তেইশ বছরে এসে সফলতা অর্জন করলো। দীর্ঘ তেইশ বছরে আন্দোলন যেসব চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে সম্মুখে সফলতার সোনালী দ্বার প্রান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, তার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে কোরআনের বিভিন্ন অংশসমূহ ইসলামী আন্দোলনের আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত নেতা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ মোবারক থেকে কখনো নাতিদীর্ঘ ভাষণ কখনো বা সংক্ষিপ্ত ভাষণাকারে এ কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছিলো। পরবর্তীতে আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলন সফলতা অর্জনের পর্যায়ে কোরআনের বিভিন্ন অংশসমূহকে পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থাকারে পৃথিবীবাসীর সামনে 'কোরআন' নামকরণ করে পেশ করা হয়েছে।

কোন ব্যক্তি যদি এই কোরআনকে রাসূলের স্বকপোলকল্পিত বলে দাবী করে, তাহলে তার এটা দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, সারা পৃথিবীর ইতিহাস একত্রিত করে তার ভেতর থেকে এমন একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যে, একজন মানুষ বছরের পর বছর ধরে একটি প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির মোকাবেলা করে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কখনো উপদেশ দানকারী হিসেবে, কখনো নৈতিকতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে, কখনো একটি মজলুম জনগোষ্ঠীর মুক্তির অগ্রনায়ক হিসেবে, কখনো একটি বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক হিসেবে, কখনো আইন প্রণেতা ও আইনদাতা হিসেবে, কখনো একটি বিশাল সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর সিপাহ্সালার হিসেবে, কখনো বিজয়ী নেতা হিসেবে, কখনো আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছার পথপ্রদর্শক হিসেবে এবং সে আসনে আসীন হয়ে যে বক্তৃতা ও ভাষণ দান করেছেন, নানা উপলক্ষ্যে যেসব কথাবার্তা বলেছেন, তা একত্রে সংগ্রহ করে একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ সুসংবদ্ধ বিপ্লবাত্মক সর্বব্যাপী চিন্তাদর্শ ও ব্যবহারিক জীবনে কর্ম বিধানে পরিণত করা হয়েছে এবং সে বিধানে কোন ক্রম-বিরোধ, অসামঞ্জস্য বা বৈষম্যের স্পর্শ ঘটেনি, তার সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত একই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও চিন্তা-শৃংখলার ধারা বাস্তবায়িত হয়ে টিকে থাকতে দেখা গিয়েছে, তা মানব গোষ্ঠীর সামনে প্রদর্শন করা। এ ধরনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা কারো পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি, অনাগত দিনেও সম্ভব হবে না বিধায় কোরআন নিজেকে আল্লাহর বাণী বলে দাবি করে।

কোরআন যাঁর ওপরে অবতীর্ণ হলো, সেই মহামানব বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিনই তাঁর মহান বিপ্লবী আন্দোলনের যে ভিত্তি স্থাপন করেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সেই ভিত্তির ওপর অটল অবিচল থেকে চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস ও বাস্তব

জীবনে কর্মের এমন একটি সর্বাত্মক ব্যবস্থা নির্মাণ করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, যার প্রতিটি স্তর অন্যান্য স্তরের সাথে পরিপূর্ণরূপে সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। রাসূলের পবিত্র জবান মোবারক থেকে কোরআন যে ভাষণাকারে প্রকাশিত হয়েছে, তা চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ সত্যানুসন্ধিৎসু মন-মানসিকতা নিয়ে পাঠ করলে এ কথার স্বীকৃতি দানে বাধ্য হবেন যে, রাসূল যে আন্দোলনের সূচনা করলেন, তার শেষ স্তর পর্যন্ত পৌছাতে পথের কোন বাঁকে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে, কোন ধরনের পরিস্থিতিকে স্বাগত জানাতে হবে, তার পরিপূর্ণ একটি চিত্র রাসূলের দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট ছিল। আন্দোলনের যাত্রাপথে পথিমধ্যে রাসূলের মন-মস্তিষ্কে এমন কোন নতুন চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে, যা ইতিপূর্বে অনুপস্থিত ছিল অথবা থাকলেও সে চিন্তার পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, এমন কোন বিষয় অনুসন্ধান করে পাওয়া যায় না। এমন ধরনের বিস্ময়কর সৃজনশীল প্রতিভা প্রদর্শনকারী, অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী কোন ব্যক্তিত্ব সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্তও পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেনি, ভবিষ্যতের গর্ভে অপ্রকাশিত শতাব্দীসমূহেও কখনো পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। যতগুলো কারণে কোরআন নিজেকে আল্লাহর বাণী বলে দাবী করে, এ কারণটিও তার মধ্যে অন্যতম।

আল্লাহর এই কোরআনে মহান আল্লাহ যে বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন, তা যেমন সর্বব্যাপী বিপ্লবাত্মক তেমনি ব্যাপক ও বিশাল। এর আলোচিত বিষয়ের পরিধি অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত গোটা সৃষ্টিলোকে পরিব্যপ্ত এবং বিস্তৃত। সৃষ্টি জগতসমূহের অন্তর্নিহিত রহস্য, মহাসত্য, প্রকৃত তত্ত্ব; এর সূচনা ও সমাপ্তি, বিনাশ এবং সর্বশেষ পরিণতি; এর নিয়ম-শৃঙ্খলা, আইন-বিধান, পরিচালনা ইত্যাদির ব্যাপারে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এই মহা-বিশাল সৃষ্টিলোকের স্রষ্টা, পরিচালনাকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী, লালন-পালনকারীর পরিচয় কি, তিনি কি ধরনের গুণাবলীর অধিকারী, এসব গুণাবলীর ধরন কি, তাঁর ক্ষমতার পরিধি কতটা ব্যাপক, কর্মের সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, কোন মহাসত্যের ভিত্তিতে এই বিশাল বিশ্বলোক তার অস্তিত্ব নিয়ে টিকে রয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে, তা পবিত্র কোরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই বিশ্বলোকে অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষের সম্মান-মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে কোরআন সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা দিয়ে তা নির্ধারণ করে এ কথা জানিয়ে দিয়েছে যে, এটাই হলো মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব ও জন্মগত সম্মান-মর্যাদা। এতে সামান্যতম পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের যে সম্মান ও মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে মানুষের জন্য চিন্তা ও কর্মের অভ্রান্ত পথ ও জীবনাদর্শ কি হতে পারে, যা স্রষ্টার সৃষ্টিপদ্ধতির সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল এবং মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের সাথে সাম স্যপূর্ণ, তা বিস্তারিতভাবে এই কোরআনে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর মানুষের জন্য অন্ধকার ও ধ্বংসের পথ কোনটি, যে পথ মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের সাথে সাংঘর্ষিক, মানুষের স্বভাব ও চিন্তা-চেতনার বিপরীত, সেটাও এই কোরআন সুস্পষ্টরূপে পার্থক্য নির্দেশ করেছে।

অভ্রান্ত পথ ও পদ্ধতি কেন অভ্রান্ত তা যেমন এ কোরআনে অখন্ডনীয় যুক্তির মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়েছে, তেমনি ভ্রান্ত পথ ও পদ্ধতি কেন ভ্রান্ত তা-ও নির্ভুল যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করার জন্য পবিত্র কোরআন গোটা বিশ্বলোকের প্রতিটি জিনিস, সৃষ্টি জগতের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম দিক, বিশ্ব-ব্যবস্থার এক একটি স্তর, মানুষের দেহাভ্যন্তরের নানা দিক, তার সত্তার অস্তিত্ব, মানুষের ইতিহাস থেকে অসংখ্য ও অগণিত বাস্তব প্রমাণ ও নিদর্শনাদি পৃথিবীর সামনে পেশ করেছে। সেই সাথে এ কথাও মানুষকে এ কোরআন অবগত করেছে যে, মানুষ কি কি কারণে, কোন আকর্ষণে, কিভাবে ভ্রান্ত পথের পথিক হয় এবং এর পরিণতি কি, আর যা চিরসত্য, অনন্তকাল উত্তীর্ণ মহাসত্য, তা কিভাবে অনাদীকাল পর্যন্ত অবিকৃত ও অভ্রান্ত থাকবে এবং এ বিষয়টি মানুষ কি করে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, তা মানুষকে এই কোরআন নির্ভুল পদ্ধতির দিকে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দান করেছে।

কোনটি ভ্রান্ত পথ আর কোনটি অভ্রান্ত পথ তা এই কোরআন মানুষকে অবগত করেই ক্ষান্ত হয়নি, সেই অভ্রান্ত পথের একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার অনুপম চিত্রও মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে। এই চিত্রে মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের যে বিভাগে যেখানে যা প্রয়োজন, তা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ বিধি-ব্যবস্থা ও মূলনীতিসমূহ অত্যন্ত বোধগম্য পদ্ধতিতে পেশ করেছে। সেই সাথে এ কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে, অভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে এবং ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করলে তার কি ফল ও পরিণতি এই পৃথিবীতে প্রকাশিত হবে, মানুষের চলমান জীবনে তার কি পরিণতি অনিবার্যভাবে দেখা দেবে, আখিরাতের জীবনেই বা কি ধরনের পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে, তা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

মানুষের জীবন ও এই পৃথিবীর সমাপ্তি কিভাবে ঘটবে এবং দ্বিতীয় আরেকটি জীবন ও জগৎ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করবে তা এই কোরআনে অঙ্কিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই পরিবর্তন কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় ঘটবে, তার প্রতিটি স্তরে কি ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হবে, এসবের প্রতিটি দিকের এক একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র কোরআন তার পাঠকের দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত করে তুলে দিয়ে ঘোষণা করেছে, এই পৃথিবীর পরবর্তী পৃষ্ঠায় মানুষ তার দ্বিতীয় জগতে কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করবে; কোন প্রক্রিয়ায় মানুষ এই পৃথিবীতে করে যাওয়া যাবতীয় কর্মকান্ডের জবাবদিহি করবে; কোন ধরনের অনস্বীকার্য পরিস্থিতির ভেতরে তার কর্মের রেকর্ড তুলে দেয়া হবে; এই রেকর্ডের সত্যতা প্রমাণের জন্য কি ধরনের অখন্ডনীয় বলিষ্ঠ যুক্তি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে; শাস্তি ও পুরস্কার কি ধরনের হবে, কেন শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে তা মানুষের সামনে এই কোরআন স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে আর এসব কারণেই কোরআন নিজেকে আল্লাহর কিতাব বলে দাবী করে। এ দাবীর প্রতি চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা না অতীতে কারো ছিল, বর্তমানেও কারো নেই এবং ভবিষ্যতেও কারো হবে না।

এই পৃথিবীতে আল কোরআনই হলো একমাত্র গ্রন্থ যা মানব জাতির সমুদয় চিন্তা-চেতনা, চরিত্র-নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি এক কথায় মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতির ওপর যে ব্যাপকতর, সুগভীর ও বিপ্লবাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে, এ ধরনের সর্বব্যাপক ও সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আর একটিও নেই। প্রথম

পর্যায়ে এই কোরআন পৃথিবীর একটি জাতির ওপরে প্রভাব বিস্তার করে তাদের জীবন ধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। তারপর কোরআনের রঙে রঙিন সেই জাতি গোটা পৃথিবীর একটি বিরাট অংশের মানুষের জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতির ওপরে কম-বেশী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এই কোরআন পৃথিবীতে যে বিপ্লবাত্মক ভূমিকা পালন করেছে এবং করছে, তা পৃথিবীর কোন একটি আদর্শ বা কোন একটি গ্রন্থের পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়নি। কোরআন শুধুমাত্র সজ্জিত অক্ষরের আকারে কাগজের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ হয়ে থাকে না, বরং মানুষের বাস্তব কর্মের পৃথিবীতে এর এক একটি শব্দ, প্রভাব, শিক্ষা, চিন্তাদর্শ ও মতবাদের অনুপম রূপায়নে সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মাণ করে এক দৃষ্টান্তহীন কর্ম সম্পাদন করেছে এবং এখনো করছে। কোরআন যখন অবতীর্ণ হয়েছিল তখন তার যে প্রভাব ও বিপ্লবাত্মক ভূমিকা ছিল, আজও তা বিদ্যমান রয়েছে। সে যুগে কোরআনের শিক্ষা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যে পাঠক পাঠ করতো, কোরআন তার পাঠককে সে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করতো, কোরআনের এই অতুলনীয় প্রভাব ও ক্ষমতা বর্তমানেও যেমন বিদ্যমান রয়েছে, অনাদিকাল পর্যন্তও বিদ্যমান থাকবে। কোরআন যে মহান আল্লাহর বাণী, এটাও তার একটি বড় প্রমাণ।

আল্লাহর এই কিতাব যাঁর ওপরে অবতীর্ণ হলো তিনি হলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পবিত্র জবান মোবারক থেকেই কোরআন উচ্চারিত হচ্ছিলো। তিনি হঠাৎ করে আকাশ থেকে অবতরণ করেননি। তিনি সেই সমাজেই তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সোনালী দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন। তিনি এমনও ছিলেন না যে, হঠাৎ কোন অদৃশ্যলোক থেকে এসে কোরআন জনসমাজে শুনিয়ে পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যেতেন। তিনি সর্বাত্মক বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করার পূর্বেও যেমন মানব সমাজেই অবস্থান করেছিলেন, আন্দোলনের সূচনা করার পরও সেই সমাজেই উপস্থিত থাকতেন, আন্দোলন সফলতার সিংহদ্বারে উপনীত হবার সেই শুভ মুহূর্তেও মানব সমাজেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর দৈনিন্দন জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম অভ্যাস ও কথা বলার ধরনের সাথে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সঙ্গী-সাথীগণ অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর সারা জীবনে বলা কথার সিংহ ভাগই বর্তমানেও হাদীস গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে।

আল্লাহর বাণী হিসেবে তাঁর পবিত্র জবান থেকে যা মানুষ শুনতো এবং তাঁর নিজের কথাগুলোও মানুষ শুনতো। তাঁর সমভাষাভাষী লোকজন স্পষ্ট অনুভব করতে সক্ষম হতো যে, কোনটা আল্লাহর বাণী আর কোনটা তাঁর নিজের কথা। পরবর্তী কালের আরবী ভাষাবিদগণও কোনটি রাসূলের কথা আর কোনটি আল্লাহর বাণী, তার পার্থক্য রেখা স্পষ্টভাবে অঙ্কন করতে সক্ষম হতেন। রাসূলের দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে কোথাও কোরআনের আয়াত ব্যবহৃত হলে, হাদীস আর কোরআনের বাকরীতিসহ অন্যান্য পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পার্থক্য এতটাই প্রকট যে, আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ যে কোন ব্যক্তি কোরআনের আয়াত আর হাদীস শুনলেই অঙ্গুলি সংকেত করতে সক্ষম হন, কোনটি রাসূলের বাণী আর কোনটি আল্লাহর কালাম। এই বিরাট পার্থক্যের কারণে কোরআন অবিশ্বাসীদের কাছে কতকগুলো বড় প্রশ্ন করা

যায় যে, একই ব্যক্তির পক্ষে কি সম্ভব, বছরের পর বছর ধরে দুটো ভিন্নতর ধারায় ও ভাষায় কথা বলা ? একই ভাষার দুটো স্বতন্ত্র ধারা রপ্ত করে তা অভ্যাসে ও বাকরীতিতে পরিণত করা কি একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব ?

কোরআন ও হাদীসের ভাষা যে একই ব্যক্তির, এ ধরনের দাবী করা কি বর্তমান সময় পর্যন্ত কারো পক্ষে সম্ভব হয়েছে ? পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই কি এ ধরনের অসম্ভব স্বাতন্ত্র রক্ষা করে প্রতিদিনের জীবন পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছে ? একজন মানুষ সাময়িকভাবে এ ধরনের অভ্যাস রপ্ত করে কৃত্রিমতার অভিনয় কিছু দিনের জন্য চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী কারো পক্ষে কথা বলার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সতর্কতার সাথে দুটো ধারা বজায় রাখা সম্ভব ? একজন মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া কালাম পাঠ করে শুনালে তার ভাষা-ভাব ও ভঙ্গী হবে ভিন্ন এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আর তার নিজের কথা ও বক্তৃতার ভাষা-ভাব ও ভঙ্গী পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে এবং এই নীতিদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে অবিকল অক্ষুন্ন থাকবে, এটা কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে ? পারে না বলেই এই কিতাব আল্লাহর বাণী হওয়ার দাবী পেশ করে।

কোরআন আল্লাহর বাণী–এ কথার ওপরে পাহাড়ের মতোই অটল অবিচল থেকে রাসূল দাওয়াতী কাজ ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেছেন এবং এ পথে অবর্ণনীয় সমস্যার মোকাবিলা তাঁকে করতে হয়েছে। কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসীগণ তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে, নির্যাতনের এমন কোন পদ্ধতি অবশিষ্ট ছিল না যা তাঁর ওপরে করা হয়নি। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তাঁর আন্দোলনের কর্মীগণ কষ্টার্জিত সহায়-সম্পদের মমতা বিসর্জন দিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। বছরের পর বছর তাঁকে ও তাঁর আন্দোলনের সাথীদেরকে অনাহারে থাকতে হয়েছে, বৃক্ষের পত্র-পল্লব ও শুকনো চামড়া খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত্ত করতে হয়েছে। দরিদ্রতার কষাঘাতে নির্মমভাবে জর্জরিত হতে হয়েছে। প্রতিপক্ষ তাঁদের ওপরে এমন নির্যাতন করেছে যে, তাঁদের দেহের চর্বি-গোস্ত আগুনের তাপে গলে গলে পড়েছে। তাঁদের বুকের ওপরে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে, বন্য পশুর পায়ের সাথে তাঁদেরকে বেঁধে দিয়ে সে পশুকে দৌড়াতে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁদের গায়ের গোস্ত নির্মম কন্টকের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পথের ধুলোয় মিশেছে।

তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করার পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছে প্রতিপক্ষ। লড়াই-সংগ্রাম হয়েছে তাঁদের প্রতি মুহূর্তের সাথী। সংগ্রামের ময়দানে কখনো তিনি ও তাঁর সাথীগণ বিজয়ী হয়েছেন, আবার কখনো প্রতিপক্ষ বিজয়ী হয়েছে। তাঁর প্রাণের শত্রু যখন পরাজিত হয়েছে, তখন তাঁর মহানুভবতা অবলোকন করে শত্রু তার মাথা সেই পবিত্র কদম মোবারকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। প্রথম থেকেই তিনি আল্লাহ প্রদত্ত মহাক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, আবার অতিরিক্ত ক্ষমতা হিসেবে তিনি বিশাল রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। জনপ্রিয়তার সর্বশীর্ষে.তিনি অবস্থান করছেন। একজন মানুষের জীবনে যখন এতগুলো অবস্থার সমাবেশ ঘটে, তখন সে মানুষের মন-মানসিকতা কখনো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই ধরনের থাকতে পারে না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত কঠিন ব্যক্তিত্বশালী

লোকের মধ্যেও হৃদয়াবেগের স্ফুরণ কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে ঘটে যায়। মানুষ হিসেবে আল্লাহর রাসূল যেসব কথা বলেছেন, সেসব কথা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর ভেতরে কোথাও কোথাও হৃদয়াবেগের প্রতিফলন ঘটেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কালাম হিসেবে যে কথাগুলো তাঁর জবান মোবারক থেকে মানুষ যা শুনেছে, তার মধ্যে মানবীয় হৃদয়াবেগের সামান্যতম চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতেও কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসী গবেষকগণ আল্লাহর কিতাবে মানবীয় হৃদয়াবেগ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

কোরআন শয়তান কর্তৃক অবতীর্ণ হতে পারে না

পবিত্র কোরআন যে যুগে অবতীর্ণ হচ্ছিলো, সে যুগে মানুষের মধ্যে একটি বিরাট গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল, যারা ছিল অশুভ শক্তির সাধক। এদের ভেতরে ছিল যাদুকর, গণৎকার, ভবিষ্যৎবক্তা ইত্যাদি। এরা ছিল শয়তানের পূজারী। মহান আল্লাহ সূরা নাসের শেষ আয়াতে তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে শয়তান শুধু ইবলিসই নয়, মানুষের দেহসত্তার মধ্যে শয়তানি শক্তি নিহিত রয়েছে। আবার মানুষের ভেতরেও শয়তান রয়েছে এবং জ্বিনদের মধ্যেও শয়তান রয়েছে।

এই শয়তান জ্বিনদেরকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে এক শ্রেণীর লোক মানব সমাজে একটা উদ্ভট কিছু প্রদর্শন করে সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। সাধারণ মানুষ যখন কোন ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়তো, তখন তারা এসব গণৎকার আর জ্বিনের পূজারীদের কাছে গিয়ে সমস্যা মুক্ত হবার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে নিজেদের ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহ ব্যক্ত করতো। এসব অশুভ শক্তির সাধক শয়তানের সহযোগিতায় এমন ধরনের আকর্ষণীয় কথা শুনায় যে, হতাশাগ্রস্ত মানুষ তাদেরকেই শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে গণ্য করে। এসব সাধকগণ অজ্ঞ মানুষদের কাছে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল।

সে যুগে এ ধরনের শয়তানি শক্তির পূজারীদের সমাজে প্রভাব ছিল ব্যাপক। কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসী লোকজন তখন ধারণা করেছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোধহয় নিজেকে সমাজে একজন বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রচার করছেন যে, তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কালাম অবতীর্ণ হচ্ছে; আসলে তাঁর সাথে জ্বিনদের যোগাযোগ হয়েছে ও শয়তানের যোগসূত্র স্থাপন হয়েছে; আর তাদের কাছ থেকে তিনি যা শুনছেন–তাই আল্লাহর বাণী বলে দাবী করছেন। তাদের এ ধারণা ও কথার প্রতিবাদ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট ঘোষণা করলেন–

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ–وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ–اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ–

এ (সুস্পষ্ট কিতাবটি) নিয়ে শয়তানরা অবতীর্ণ হয়নি। (কিতাব অবতীর্ণের) এ কাজটি তাদের

শোভাও পায় না এবং তারা এমনটি করতেও সক্ষম নয়। তাদেরকে (শয়তানদেরকে) তো এ (কিতাব) শোনা থেকেও দূরে রাখা হয়েছে। (সূরা আশ্ শু'আরা-২১০-২১২)

কে এই কোরআন বিশ্বনবীর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করেছেন, সে কথাও মানুষকে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আশ্ শু'আরায় জানিয়ে দিয়েছেন–

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ-

এটি রাব্বুল আলামীনের নাযিল করা জিনিস। একে নিয়ে আমানতদার রুহ অবতরণ করেছে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাওয়াতী কার্যক্রম ও আন্দোলন পরিচালিত করছিলেন, তখন মক্কার কুরাইশদের ভেতরে ইসলাম বিরোধী শক্তি এ আন্দোলনের বিস্তৃতি রোধ করার লক্ষ্যে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন জ্বিন প্রভাবিত ব্যক্তি হিসেবে সর্বত্র প্রচার ও প্রসার করে যাচ্ছিলো। এই ভোঁতা অস্ত্র ব্যতীত তাদের কাছে ইসলামকে প্রতিহত করার দ্বিতীয় কোন কার্যকরী অস্ত্র মওজুদও ছিল না। এ জন্য তারা প্রথমে আল্লাহর রাসূলকে সাধারণ মানুষের কাছে অগ্রহণীয় করে তোলার জন্য অপপ্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এই বিভ্রান্তি ছড়ানোর পশ্চাতে যে কারণসমূহ বিদ্যমান ছিল, তার ভেতরে কা'বা ঘরের নেতৃত্বের আসন হারানোর ভয় ছিল অন্যতম। কেননা, সৃষ্টির আদিকাল থেকেই পবিত্র কা'বাঘরের সম্মান ও মর্যাদা ছিল পৃথিবীব্যাপী।

সুতরাং যারা কা'বাঘরের তত্ত্বাবধায়ক ছিল, কা'বাঘরের কারণেই অন্যান্য মানুষের কাছে তাদের সম্মান ও মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। কা'বার খাদেমদেরকে কেউ বলতো আল্লাহর প্রতিবেশী, কেউ বলতো আল্লাহর পরিবার, কেউ বলতো খোদার বংশধর। অর্থাৎ তারা ছিল পুরোহিত শ্রেণী। এ কারণে তারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। অন্যান্য মানুষদেরকে তারা হীনতার দৃষ্টিতে দেখতো। ধর্মকর্মের বিভিন্ন দিক তারা কাটছাট করে নিজেদের জন্য অনেক বিধান পরিবর্তন করে সহজ করে নিয়েছিল।

কা'বার খাদেম হবার কারণে সমস্ত দিক দিয়ে তারা নানা ধরণের সুবিধা ভোগ করতো। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমাজের অন্য মানুষকে যে সব সমস্যার মোকাবেলা করে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হত, কুরাইশরা ছিল এর ব্যতিক্রম। কা'বাঘরকে কেন্দ্র করে তাঁরা নানাবিধ সুযোগ আদায় করতো। কা'বার সেবক ও পুরোহিত হবার কারণে গোটা সমাজে তাদের নেতৃত্ব ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত।

কুরাইশদের লোকজনই কা'বা এবং সমাজের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিল। অর্থ সংক্রান্ত দায়িত্ব ছিল হারেস ইবনে কায়েসের ওপর। পরামর্শ দানের দায়িত্ব ছিল ইয়াজিদ ইবনে রাবিয়া আসাদীর ওপর। কেউ নিহত হলে তাঁর রক্তপণের মীমাংসা করার দায়িত্ব ছিল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ওপর। পতাকা বহন করার দায়িত্ব ছিল আবু সুফিয়ানের ওপর। মানুষের ভাগ্য গুনে দেখার দায়িত্ব ছিল মাকওয়ান ইবনে উমাইয়ার ওপর। মক্কার গরীবদের সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল হারেছ ইবনে আমেরের ওপর। কা'বার চাবির এবং

মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব ছিল উসমান ইবনে তালহার ওপর। হাজীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্ব ছিল হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ওপরে। কারো সাথে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসা করার দায়িত্ব ছিল হযরত ওমরের ওপর। তাঁবু এবং যান-বাহনের দায়িত্ব ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার ওপর।

ওতবা ইবনে রাবিয়া, আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমী, আবু লাহাব, আবু জেহেল, আসওয়াদ ইবনে মুতালিব, ওতবা ইবনে আবু মুয়িত, উবাই ইবনে খালফ, নজর ইবনে হারেস, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস ও আখনাস ইবনে শুরাইক সাকাফী–এ সমস্ত লোকগুলোর প্রভাব ছিল গোটা মক্কায় সর্বাধিক। এদের নেতৃত্বও ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই সমস্ত লোকগুলোর সবাই কোন না কোন দিক দিয়ে আল্লাহ রাসূলের সাথে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা ছিল। কেউ কেউ ছিলেন রাসূলের আপন চাচা। সে সময়ে কুরাইশরাও জানতো একজন নবীর আগমন ঘটবে। তাদের ধারণা ছিল কুরাইশ গোত্রের কোন নেতাকেই নবী হিসাবে নির্বাচিত করা হবে। তদানীন্তন সমাজে যে ব্যক্তির প্রচুর অর্থ সম্পদ এবং সেই সাথে সবচেয়ে বেশী পুত্র সন্তান থাকতো, তাকেই শাসক হিসাবে বরণ করে নেয়া হত।

এটা ছিল সে সমাজের প্রথা এবং অধিক সন্তান থাকা ছিল সমাজে গর্ব ও মর্যাদার বিষয়। নানা ধরণের কুসংস্কারের মধ্যে এটাও প্রচলিত ছিল যে, যার পুত্র সন্তান যত বেশী সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরের জগতে ততবেশী মর্যাদা লাভ করবে। আর যার পুত্র সন্তান থাকবে না বা পুত্র সন্তানের সংখ্যা অল্প থাকবে, পরকালে তার কোন সম্মান নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহর নবীর কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিল না বা তাঁর তেমন ধন ঐশ্বর্য ছিল না। সুতরাং, তাঁর মত মানুষ কী করে নবী হতে পারে বিষয়টি ছিল তাদের কাছে বোধের অগম্য ও অবিশ্বাসের বিষয়। তাদের কল্পনায় যে ধরনের লোক নবী হবার উপযুক্ত, সে ধরনের লোকের অভাব তাদের ভেতরে ছিল না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র ছিল তাদের কল্পনা ও চিন্তা-চেতনার বিপরীত।

সুতরাং, আল্লাহর রাসূলের দাওয়াত গ্রহণ না করে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বিস্তৃতি ঘটানোর এটাও একটা কারন। সে সময় পর্যন্ত মুসলমানগণ নামাজ আদায় করতো বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে। এ কারণে কুরাইশরা ধারণা করতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খৃষ্টানদের মত বাইতুল মুকাদ্দাসকে যখন নিজের আদর্শের কেবলা হিসাবে মনোনীত করেছে, তখন নিশ্চয়ই সে খৃষ্টানদের মতবাদ মক্কায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়–এই ধরনের ভ্রান্তিতেও তারা নিমজ্জিত ছিল।

কুরাইশদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপগোত্র ছিল। তাদের মধ্যে দুটো গোত্র ছিল এমন যে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। একে অপরকে মূহুর্তের জন্য সহ্য করতে রাজী ছিল না। তাঁর মধ্যে একটা গোত্র ছিল বনী হাশেম অপরটি ছিল বনী উমাইয়া। আব্দুল মুত্তালিব তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে বনী হাশেমকে সম্মান ও মর্যাদার অতি উচ্চ স্থানে আসীন করেছিলেন। তাঁর ভেতরে যেমন ছিল নেতৃত্বের গুনাবলী তেমন ছিল তাঁর অর্থ বিত্ত। ফলে সমাজে বনী হাশেমের

প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর সন্তানদের মধ্যে কেউ নেতৃত্বের সে আসন ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। আব্দুল মুত্তালিবের মত নেতৃত্বের গুণাবলীসম্পন্ন তাঁর কোন সন্তানই ছিল না। তাঁর এক সন্তান আবু তালিব যিনি ছিলেন দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। আরেক সন্তান আব্বাস যদিও সম্পদশালী ছিলেন কিন্তু পিতার ন্যায় তিনি দানবীর ছিলেন না, পিতার মত ব্যক্তিত্বও তাঁর ছিল না। আরেক সন্তান আবু লাহাব ছিল সমাজে চরিত্রহীন নামে পরিচিত। সুতরাং, পিতার মত কোন সন্তানই নেতৃত্বের আসন ধরে রাখতে পারেনি।

ফলে বনী উমাইয়া গোষ্ঠী আব্দুল মুত্তালিব জীবিত থাকতেই অন্তরে যে আশা পোষণ করতো, তাঁর অবর্তমানে তাদের সে দীর্ঘকালের আশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা সামনে এগিয়ে এলো। সমস্ত দিক থেকে বনী হাশেমকে কোণঠাসা করে নেতৃত্বের পদ দখল করলো। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বনী হাশেমের সন্তান। সুতরাং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দিলে বনী হাশেমের নেতৃত্ব মেনে চলতে হবে, এ কারণে তারা তাঁর আন্দোলনে বাধার সৃষ্টি করেছে, অপপ্রচার করেছে। আর ইতিহাসে দেখা যায় এই বনী উমাইয়াগণই ইসলামের ইতিহাসে কলঙ্কজনক ঘটনার জন্মদান করেছে সবচেয়ে বেশী। এই উমাইয়া গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ান ইসলামের বিরুদ্ধে একমাত্র বদর যুদ্ধ ব্যতীত সমস্ত যুদ্ধে নেতৃত্বদান করেছে। তাঁর স্ত্রী হিন্দা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কলিজা বের করে চিবিয়ে ছিল। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার জন্মদাতাও এই বনী উমাইয়াগণ। তিনজন খলীফার হত্যাকান্ড এবং ইসলামী শাসন অবসানে বনী উমাইয়াদেরই ষড়যন্ত্র অধিক কার্যকর ছিল।

আবু জেহেলের গোত্র ছিল বনী মাখজুম গোত্র। এই গোত্রের গোত্রপতি ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা। এরাও বনী হাশেম গোত্রের শত্রু ছিল। সুতরাং, হাশেম গোত্র থেকে কেউ নবীর দাবী করলে তারা তা গ্রহণ করবে না, এমন ঘোষনা স্বয়ং আবু জেহেল দিয়েছিল। বনী উমাইয়া গোত্রের ওতবা ইবনে আবু মুয়িত ছিল আল্লাহর নবীর প্রাণের শত্রু। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করছিলেন আর ওতবা নবীর পবিত্র শরীর মোবারকের ওপর উটের পচা নাড়ি ভূড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত কুরাইশদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তি ছিলেন সৎ এবং ভদ্র। তাঁরা কোন ধরনের দাঙ্গা পছন্দ করতেন না। যে কোন সমস্যাকেই তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে আগ্রহী ছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কেন্দ্র করে তারা যে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, এ সমস্যাকে অন্যরা যেমন শক্তি প্রয়োগ করে সমাধান করতে আগ্রহী ছিল, ভদ্র ব্যক্তিগণ তাতে বাধাদান করতেন।

কুরাইশ দাঙ্গাবাজ নেতৃত্বের মধ্যে চরিত্র বলতে কিছু ছিল না। স্বয়ং আবু লাহাব ছিল চোর, কা'বাঘরের স্বর্ণের পাত্র সে চুরি করেছিল। কেউ ছিল মিথ্যাবাদী, কেউ ছিল কুমন্ত্রণাদানকারী। নৈতিক দিক দিয়ে তারা সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর রাসূল একদিকে শিরক্ তথা অংশীদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কঠোর সমালোচনা করতেন অপর দিকে চারিত্রিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে বলতেন। ফলে নেতাদের প্রকৃত চরিত্র সাধারণ মানুষের কাছে উন্মোচিত

হয়ে যেত। নেতাদের নেতৃত্ব সাধারণ মানুষ গ্রহণ করবে না, এ কারণে তারা বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে লেগেছিল। সে সমাজে যারা ছিল নেতা, নেতৃত্বের আসনে বসে যারা প্রভূত অর্থ বিত্তের মালিক হয়েছিল ও সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে যারা গোটা জাতিকে শোষণ করছিল, নেতৃত্বের আসনে বসে যারা নিজেদেরকে সব ধরনের আইন-কানুনের উর্ধ্বে মনে করতো, তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে পবিত্র কোরআন জ্বালাময়ী ভাষণ পেশ করতো ও ক্ষেত্র বিশেষে তাদের নাম ঠিকানা আকারে ইঙ্গিতে সাধারণ মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দিচ্ছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কঠোর বক্তব্য রাখতেন, ফলে স্বার্থান্বেষী নেতাগণ রাসূলের কার্যক্রমের মধ্যে নিজেদের মৃত্যু দেখে ছুটে গেল আবু তালিবের কাছে।

চাচা আবু তালিব সে সব নেতাদেরকে নানা ধরনের কথা বলে কোন রকমে শান্ত করে বিদায় করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল তাঁর আন্দোলনকে আরো গতিদান করলেন। এবারে আস ইবনে ওয়াইল, আবু সুফিয়ান, ওলীদ ইবনে মুগীরা, ওতবা ইবনে রাবিয়া, আবু জেহেল, আস ইবনে হিশাম প্রমুখ কাফের নেতৃবৃন্দ আবু তালিবের কাছে এলো। তারা হুমকির ভাষায় তাঁকে জানালো, 'তোমার আশ্রয় প্রশ্রয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপাস্য দেবতাদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করে, আমাদেরকে বলে আমরা নাকি জ্ঞানহীন মূর্খ। সে আমাদেরকে ভুল পথের পথিক বলে এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিল পথভ্রষ্ট এ কথাও বলে। তুমি তাকে বিরত করতে পারোনি। এখন তুমি তাঁর পেছন থেকে সরে যাও আর না হয় তুমিও তাঁর পক্ষাবলম্বন করে আমাদের সাথে লড়াইতে চলে এসো।'

আবু তালিব পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। তিনি অনুভব করলেন বিশ্বনবীর জন্য ময়দান কতটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। যে কোন মুহূর্তে পরিস্থিতি তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সমস্ত দিক চিন্তা করে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ডেকে বললেন, 'বাবা! এমন কোন ভারী বোঝা আমার কাঁধে আরোপ করো না, যা আমি বহন করতে পারবো না।'

ময়দানের প্রকৃত অবস্থা রাসূলের অজানা ছিল না। চাচার কথার যে কি তাৎপর্য তাও তিনি অনুভব করলেন। তাঁর কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পরিস্থিতি চাচা আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। পরম শ্রদ্ধাভরে তিনি তাঁর চাচাকে জানালেন, 'মহান আল্লাহর কসম করে আপনাকে জানাচ্ছি চাচাজান! যারা আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে অভিযোগ করছে, তারা যদি আমার এক হাতে আকাশের চন্দ্র আর আরেক হাতে আকাশের সূর্য ধরিয়ে দেয় তবুও আমি যে দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি তা থেকে বিরত হবো না। মহান আল্লাহ এ কাজের পূর্ণতা দান করবেন আর না হয় আমি এ পথে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দেব।'

এই কথাগুলো বলার সময় আল্লাহর নবীর পবিত্র চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। তিনি চাচার কাছ থেকে উঠে চলে যেতে লাগলেন। কিছু দূর অগ্রসর হবার পরে আবু তালিব তাঁকে পুনরায় ডাক দিলেন। প্রাণপ্রিয় ভাতিজার কথাগুলো চাচা আবু তালিবের মর্মে স্পর্শ করেছিল। তিনি প্রিয় ভাতিজার দিকে মমতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা! তুমি তোমার দায়িত্ব

পালন করতে থাকো। এমন কোন শক্তি নেই যে তোমার ওপরে আঘাত করবে। তোমাকে আমি কারো হাতেই তুলে দেব না।'

আবু তালিব তাঁর ভাতিজাকে সহযোগিতা করা হতে বিরত হবেন না, এ কথা শুনে তারা এক অদ্ভূত পদ্ধতি আবিষ্কার করে পুনরায় আবু তালিবের কাছে গেল। তাদের সাথে ছিল উমারাহ ইবনে ওয়ালিদ নামক এক সুদর্শন যুবক। তারা আবু তালিবের কাছে ঐ ছেলেটিকে দেখিয়ে প্রস্তাব দিল, 'এই ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি সাহসী। আপনি একে গ্রহণ করে মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে তুলে দিন, তাকে আমরা হত্যা করি। একজনের বিনিময়ে আপনি আরেকজনকে লাভ করছেন।' আবু তালিব ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে তাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'খোদার শপথ ! তোমরা একটা নোংরা প্রস্তাব আমার কাছে পেশ করছো। আমি কখনো তোমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না। তোমরা তোমাদের সন্তানকে আমার কাছে দেবে আমি তাকে ভরণপোষণ করতে থাকবো, আর আমার সন্তানকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দেব তোমরা তাকে হত্যা করবে। খোদার শপথ ! তোমরা মনে রেখো, কোনদিন তা সম্ভব নয়।' তাঁর স্পষ্ট কথা শুনে কাফের নেতা মুতয়িম ইবনে আদী পুনরায় বললো, 'আবু তালিব! আপনার গোষ্ঠীর লোকজন আপনার কাছে যথাযথ প্রস্তাব দান করেছে। যে বিষয়ে আপনি নিজেও চরম অসুবিধার মধ্যে আছেন, এরা আপনাকে সেই অসুবিধা থেকেই মুক্তি দিতে এসেছে অথচ আপনি তা গ্রহণ করছেন না।' আবু তালিব জবাব দিলেন, 'খোদার শপথ! তোমরা আমার সাথে ন্যায় বিচার করোনি। তোমরা এসেছো আমাকে অপমান করতে। এ কারণে সমস্ত মানুষকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়েছো। তোমরা যাও, তোমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারো।'

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথায় অটল থাকলেন। তাঁর শত্রু পক্ষ অনেক চিন্তা ভাবনা করে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকলো। কেননা, গৃহযুদ্ধে তাদের সমস্ত শক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। তারপর মুহাম্মাদকে হত্যা করলে গোত্রে গোত্রে যে পুনরায় যুদ্ধ সৃষ্টি হবে এবং তার পরিণাম যে সমূলে ধ্বংস, এসব দিক তারা ভেবেছিল। সুতরাং, তারা নির্যাতনের পথ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলো। আল্লাহর রাসূলের নামাজ আদায়ের সময় গলিত আবর্জনা তাঁর পবিত্র শরীরে নিক্ষেপ করা, তাকে দেখে হৈ চৈ করা, বিদ্রূপ করা, তাঁর চলার পথে কাঁটা, আবর্জনা বিছিয়ে রাখা, তিনি নামাজে দাঁড়ালে তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ করা, ইত্যাদি অত্যাচার শুরু করলো। যে সব গোত্রের দু'চার জন মুসলমান হয়েছিল তাদের ওপরে নির্যাতন আরম্ভ করলো।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, অবস্থা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন আবু তালিব বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব গোত্রে গমন করে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপরে কোন অত্যাচার হতে দেয়া যাবে না এবং তা প্রতিরোধ করা হবে ও তাঁকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা হবে। বনী হাশিম

এবং বনী মুত্তালিব গোত্র আবু তালিবের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানালো। কিন্তু অভিশপ্ত আবু লাহাব সমর্থন দিলনা। সে এবং তাঁর স্ত্রী আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে বিরোধিতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখলো।

রাসূল এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর এত নির্যাতন সত্বেও তাঁকে এ পথ থেকে বিরত করা গেল না, এ সম্পর্কে কাফের নেতাদের মনে ধারণা হলো নিশ্চয়ই মুহাম্মদ একটা কিছু অর্জন করতে চায়, এ কারণে সে এবং তাঁর অনুসারীরা এত নির্যাতন সহ্য করেও তাদের কার্যক্রমে বিরতি দিচ্ছে না এবং আদর্শ ত্যাগ করছে না। এই অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে কাফের নেতা ওতবা ইবনে রাবিয়া নবীর কাছে এসে প্রশ্ন করলো, 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ! বলো তো, প্রকৃত পক্ষে তোমার মনের ইচ্ছাটা কি ? যদি মক্কার নেতৃত্ব কামনা করো তাহলে তা গ্রহণ করতো পারো। যদি আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মেয়ে কামনা করো তাহলে আমরা ব্যবস্থা করে দেব। গোটা মক্কার ধন রত্ন চাও আমরা তোমার সামনে এনে দিচ্ছি। তবুও তুমি যা বলছো তা থেকে বিরত হও।'

বিশ্বমানবতার মহান মুক্তির দূত নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা না বলে পবিত্র কোরআনের একটা আয়াত কাফের নেতাকে শুনিয়ে দিলেন। বিশ্বনবীর মুখে পবিত্র কোরআন শুনে কাফের নেতা ওতবা থরথর করে সেদিন কেঁপে উঠেছিল। তাঁর মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বের হয়নি। দ্রুত সে বিশ্বনবীর সামনে থেকে সরে পড়েছিল। পবিত্র কোরআন শুনে ওতবা ইবনে রাবিয়ার ভেতরের জগৎ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল। সে কুরাইশদের অন্যান্য নেতাদের বলেছিল, 'আমি নিজের কানে শুনে এসেছি, মুহাম্মাদ যা পড়েছে তা কোন কবির কবিতা নয়। সে যে কি পড়লো তা আমার বুঝে আসছে না। তোমাদের কাছে আমার পরামর্শ হলো, সে যা করছে তাতে তোমরা তাকে বাধা দিওনা। যদি সে তাঁর কাজে সফল হয়ে গোটা আরবের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বিজয়ী হয় তাহলে তোমাদেরই সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আর তা করতে না পারলে সে নিজেই একদিন শেষ হয়ে যাবে।'

কিন্তু ওতবার পরামর্শ কোন নেতা গ্রহণ না করে হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ইতিমধ্যে হজ্জের সময় উপস্থিত হলো। কুরাইশ নেতারা প্রবীণ ব্যক্তি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার কাছে এলো পরামর্শের জন্য। সে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্য করে বললো, 'হজ্জের সময় এসেছে। চারদিক থেকে লোকজন এখানে আসবে। তাদের কানে এর মধ্যেই মুহাম্মাদের কথা পৌঁছেছে। এখন তোমরা মুহাম্মাদ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে একমত হও। তাঁর সম্পর্কে সবাইকে একই কথা বলতে হবে। আমাদের পরস্পরের কথা যেন মানুষের কাছে দু'ধরনের হয়ে না যায়। তাহলে মানুষ আমাদের কথা মিথ্যা মনে করবে। আমরা সবাই তাঁর সম্পর্কে একই কথা বলবো।'

সমবেত লোকজন ওয়ালিদকে জানালো, 'কী কথা মুহাম্মাদ সম্পর্কে বলতে হবে তা আপনিই আমাদেরকে বলে দিন। আপনার শেখানো কথাই আমরা সবার সামনে বলবো।' কিন্তু রাসূলের সম্পর্কে কি কথা যে বলতে হবে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টাতেও ওয়ালিদের মাথা থেকে বের হলো না। অবশেষে সে উপস্থিত নেতাদেরকে জানালো, 'তোমরাই পরামর্শ দাও তাঁর সম্পর্কে

কী কথা বলা যায় ?' কয়েকজন বললো, 'আমরা মানুষদের কাছে মুহাম্মাদ সম্পর্কে জানাবো সে একজন গণক।' ওয়ালিদ এ কথায় একমত না হয়ে বললো, 'মানুষ বহু গণককে দেখেছে, গণকদের কথা থাকে ইশারা ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। মুহাম্মাদের কোন একটি কথাও গণকের মত নয়।'এবার কয়েকজন পরামর্শ দিল,'তাঁকে পাগল হিসাবে পরিচিত করা হোক।' ওয়ালিদ প্রতিবাদ করে বললো, 'অসম্ভব! তাঁকে পাগল বললে কেউ তা বিশ্বাস করবে না, বরং আমাদেরকেই মানুষ পাগল বলবে। মানুষ বহু পাগল দেখেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোন একটি কথাও পাগলের মত নয়। পাগলদের একটা কথার সাথে আরেকটি কথার কোন সামঞ্জস্য থাকে না, কিন্তু তাঁর প্রতিটি কথা একটার সাথে আরেকটার এক অদ্ভূত সামঞ্জস্য রয়েছে।'

এবার কয়েকজন পরামর্শ দিল, 'তাঁকে কবি হিসাবে পরিচিত করা যায়।' ওয়ালিদ পুনরায় অস্বীকার করে বললো, 'না, তাকে কবি বলা যায় না। এদেশের মানুষ কবিদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ। নানা ধরনের কবিতার সাথে তারা পরিচিত। মুহাম্মাদের কোন একটি কথাও কোন কবির মত নয়।' এবার অনেকে পরামর্শ দিল, 'তাঁকে যাদুকর হিসাবে সবার কাছে পরিচিত করা হোক।' ওয়ালিদ বললো, 'মানুষ নানা ধরনের যাদুকরের সাথে পরিচিত, যাদুর সাথে পরিচিত। যাদুকরেরা যেমন সুতার গিরায় ফুঁক দেয়, ঝাড়ফুঁক করে, তাবিজ কবজ দেয় মুহাম্মাদ সে ধরনের কোন কাজ করে না।'এবার সবাই বললো,'তাহলে আপনি যা বলতে চান তাই বলুন।'

ওয়ালিদ বললো,'মুহাম্মাদের কথার ভেতরে যে মাধুর্যতা আছে এ সম্পর্কে কারো মনে কোন দ্বিধা নেই। তাঁর কথার ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় এবং তাঁর মর্মার্থ অতি গভীরে প্রথিত। তোমরা তাঁর সম্পর্কে মানুষকে যা বলবে মানুষ তার কোনটাই বিশ্বাস করবে না। আমার মতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যাদুকর কথাটা বেশী উপযুক্ত। যদিও তিনি যাদুকর নন কিন্তু তাঁর কথার ভেতরে যাদুর থেকেও বেশী প্রভাব রয়েছে। তাঁর কথায় সংসারে বিভেদ সৃষ্টি হয়। স্বামীর কাছে থেকে স্ত্রী পৃথক হয়ে যায়, পিতার কাছে থেকে সন্তান পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং, তাঁর কথা যাদুর থেকে অধিক কার্যকরী। তাঁর কথার কারণেই আজ আমাদের গোটা জাতির ভেতরে বিভেদের রেখা সৃষ্টি হয়েছে।'

মক্কার কাফের নেতৃবৃন্দ এই কথাই সর্বত্র প্রচার করতে থাকে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন যাদুকর। এ ধরণের নানা প্রলাপ উক্তি তারা আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে করেছিল। সে যুগে যদি বর্তমান যুগের মত প্রচার মাধ্যম থাকতো, রেডিও, টেলিভিশন, ডিস এ্যান্টেনা, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি থাকলে এ সমস্ত প্রচার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে মানুষ কত অর্থহীন, ভিত্তিহীন কথাই না শোনার দুর্ভাগ্য লাভ করতো। কার্টুনিষ্টগণ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কত বিকৃত ছবি এঁকে গোটা দেশ ছেয়ে দিত। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যখন ভিত্তিহীন প্রচার প্রপাগান্ডা চালানো হয় তখন ঐ ব্যক্তির নগদ লাভ যেটা হয় তাহলো, তার সম্পর্কে যাদের সামান্যতম কৌতুহল ছিল না তারাও কৌতুহলী হয়ে ওঠে। তার সম্পর্কে যারা কিছুই জানতো না, তারাও তার সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী

হয়ে ওঠে। তার নামটা সর্বস্তরের মানুষের কার্ণকুহরে পৌঁছে যায়, ঘরে ঘরে তার সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে। তাদের এই অপপ্রচারের কারণে ব্যক্তি সম্যক পরিচিতি লাভ করে।

বিশ্বনবীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হলো না। মুহাম্মাদ নামটা এতদিন যারা শোনেনি, এবার তারাও নামটা শুনলো। সর্বত্র তাঁর সম্পর্কে একটা গুঞ্জন সৃষ্টি হলো। অন্ধানুকরণপিয়াসী যারা, তারা হয়তঃ অর্থহীন মন্তব্য করলো। কিন্তু যাদের হৃদয় জীবিত, যুক্তিতে যারা বিশ্বাসী, সত্য উদ্ঘাটনে যারা আগ্রহী তাঁরা নীরবে প্রকৃত সত্য অবগত হবার লক্ষ্যে রাসূলের দরবারে এগিয়ে এলো। প্রকৃত সত্য অবগত হলো এবং যারা সৌভাগ্যবান ছিল তাঁরা মহাসত্য ইসলাম কবুল করে আল্লাহর বান্দায় পরিণত হলো। আর যারা ছিল হতভাগা তাঁরা প্রকৃত সত্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হলো। ইতিহাসে দেখা যায় প্রতিটি যুগেই সমস্ত নবীদের সাথে, ইসলামের বাহকদের সাথে একই আচরণ করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার করা হয়েছে। কোন একজন নবীও বিরোধী শক্তির অপপ্রচারের কবল থেকে মুক্ত ছিলেন না। বর্তমানেও যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছে তাঁরাও অপবাদ মুক্ত নন। তাদেরকেও বিভিন্ন ধরণের অপপ্রচারের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। মহান আল্লাহ তাঁর নবীর ওপরে কাফের নেতৃবৃন্দ যে সমস্ত অপবাদ দিয়েছিল, সে সবের জবাব অখন্ডনীয় যুক্তির মাধ্যমে দিয়েছেন।

রাসূলের দাওয়াতকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল সেখানে তাদের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল, তাহলো রাসূল কোরআনের বাণী হিসেবে যা মানুষকে শোনাচ্ছেন তা মানুষের হৃদয় গভীরে প্রবেশ করছিল, সাধারণ মানুষের কাছে এই বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল, আল্লাহর কোরআনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর পথ বন্ধ করার মতো শক্তি তাদের ছিল না। কোরআনের প্রভাব থেকে মানুষকে কিভাবে দূরে রাখা যায়, এ চিন্তায় তারা গলদঘর্ম হচ্ছিলো। অবশেষে তারা লোক সমাজে রাসূলকে যাদুকর, গণৎকার হিসাবে পরিচিত করার অপপ্রয়াস গ্রহণ করেছিল যেন লোকজন এ ধারণা করে যে, গণৎকারদের মনে যেমন জ্বিন শয়তানরা নানা ধরনের কথার সৃষ্টি করে দেয়, তেমনি মুহাম্মাদের মনেও শয়তান এসব কথার সঞ্চার করে দিচ্ছে আর তিনি তা আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করছেন। ইসলাম বিরোধী শক্তির এই অপবাদের জবাবে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, এ কিতাব শয়তান অবতীর্ণ করতে সক্ষম নয় এবং শয়তানের মুখে কোরআনের বাণী শোভা পায় না।

কেননা কোরআন যে শিক্ষাদর্শ উপস্থাপন করছে, শয়তানের চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষা তো সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সুতরাং, কোরআন উপস্থাপিত শিক্ষা কি করে শয়তান পেশ করতে পারে ? আল্লাহর কালামকে গণৎকারের কথা বলে তোমরা যারা প্রচার করছো, তোমরা যে দেশে, সমাজে বাস করছো, সেখানে যথেষ্ট গণৎকার অবস্থান করছে এবং তোমরা বহু গণৎকারের সঙ্গ লাভ করেছো, তাদের কথা শুনেছো। গণৎকারের বক্তব্য কি ধরনের হতে পারে এ ব্যাপারে তোমরা অভিজ্ঞ। আমার নবীর মুখ থেকে যে কোরআন তোমরা শুনছো, সে কোরআন আর গণৎকারের কথার মধ্যে সামান্যতম কোন সামঞ্জস্য রয়েছে কি ? শয়তান কর্তৃক সঞ্চারিত কথার ভিত্তিতে এতকাল যাবৎ গণৎকারগণ তোমাদের মধ্যে যে শিক্ষাদর্শ

প্রচার করে এসেছে, কোরআন তার ঠিক বিপরীত শিক্ষাদর্শ প্রচার করে, তাহলে এ কোরআন কি করে শয়তান কর্তৃক সঞ্চারিত কথামালা হতে পারে ? তোমরা এবং তোমাদের কোন পূর্ব পুরুষ কি এ কথা কখনো শুনেছে যে, কোন শয়তান গণৎকারের মাধ্যমে মূর্তিপূজা ও সমস্ত ইলাহকে ত্যাগ করে এক আল্লাহর দাসত্ব করার শিক্ষা মানুষের সামনে পেশ করেছে ? পৃথিবীতে মানুষ যা করছে, এসব কাজের জবাবদিহি আদালতে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে করতে হবে–এ কথা কি শয়তান বলেছে ? যাবতীয় অন্যায় ও গর্হিত কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার কথা কি শয়তান কোনদিন বলেছে ? ভ্রান্ত ও অসৎ পথ ত্যাগ করার কথা কি শয়তান বলেছে ? শয়তানরা এসব সৎপ্রবৃত্তি লাভ করবে কিভাবে ? কেননা শয়তানের মূল স্বভাবই হলো, মানুষকে অসৎ পথপ্রদর্শন করা, তাদেরকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করা। সুতরাং শয়তান কি করে কোরআনের শিক্ষার ন্যায় অতুলনীয় আদর্শ প্রচার করতে পারে ? কোরআনের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য করেও কি তোমরা অনুধাবন করো না, এসব কথা শয়তান কর্তৃক অবতীর্ণ হতে পারে না ?

শয়তানের সাধক ও তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী গণৎকারদের কাছে তোমরা তো এসব প্রশ্ন করতে যাও যে, আমার অমুক জিনিসটা হারিয়ে গিয়েছে, তার সন্ধান করে দিন। আমি অমুক একটি মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, তাকে আমার জীবন সাথী করার ব্যবস্থা করে দিন। আমি অমুক দিন অমুক কাজ শুরু করছি, তাতে সফল হবো কিনা বলে দিন। আমি অমুক ব্যাপারে বাজি ধরেছি, তাতে বিজয়ী হবো কিনা বলে দিন। আমার এই ক্ষতি হয়েছে, কে ক্ষতি করেছে তার সন্ধান বলে দিন। গণৎকারগণ তো চিরদিন তোমাদের এসব কাজ সফল করে দিতে পারে বলে তোমাদেরকে ধারণা দিয়ে এসেছে। তারা তো কোনদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দাসত্ব করার বিষয় শিক্ষা দেয়নি বা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে কোন নীতিমালা পেশ করেনি। আর আমার রাসূলের মুখ দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বাণী প্রকাশিত হচ্ছে এবং তোমরা তা শুনছো, সেসব বাণী তো মানুষের জন্য কল্যাণকর নীতিমালায় পরিপূর্ণ। সুতরাং, এ বাণী কি করে শয়তান কর্তৃক সঞ্চারিত হতে পারে ?

আর শয়তান যদি মানব জাতিকে কল্যাণের পথে নিয়ে আসার জন্য কোন শিক্ষামূলক আদর্শ পেশ করতে চায়-ও, তবুও তো সে তা পারবে না। কেননা, আল্লাহর কোরআনের তুলনায় কোন কল্যাণকর আদর্শ শয়তানের পক্ষে পেশ করা সম্ভব নয়। শয়তান যদি ক্ষণিকের জন্য কৃত্রিম শিক্ষকের আসনে আসীন হয়ে মানুষকে শিক্ষা প্রদান করতে চায়, তবুও তো সে শিক্ষা কোরআনের নির্ভেজাল মহাসত্য ও নৈতিকতার উচ্চতর সর্বব্যাপী বিপ্লবাত্মক নীতিমালার সাথে কোন দিক থেকেই তুলনীয় হতে পারে না।

প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করার লক্ষ্যেও শয়তান যদি সৎকাজের আহ্বায়ক হিসাবে অভিনয় করে, তবুও তো তার কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে তার স্বভাবজাত শয়তানী প্রকাশ পাবেই। যে ব্যক্তি শয়তানের অনুপ্রেরণায় নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে বসে, তার নিজের জীবনে ও তার শিক্ষার মধ্যে অনিবার্যরূপে উদ্দেশ্যের অবিশুদ্ধতা, ইচ্ছাশক্তির অপবিত্রতা প্রকাশিত হবেই। নির্ভেজাল সততা ও নির্ভুল সৎকর্মশীলতা কোন শয়তান মানুষের হৃদয় জগতে সঞ্চারিত

করতে সক্ষম নয়। আর শয়তানের সাথে যারা সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তারা কখনো মহাসত্যের ধারক-বাহক হতে পারে না। তদুপরি পবিত্র কোরআনের শিক্ষার উচ্চতর সম্মান ও মর্যাদা, পবিত্রতা, কোরআনের সুনিপুন বাগধারা, সাহিত্যালঙ্কার এবং সুগভীর তত্বজ্ঞান, সৃষ্টিজগৎ ও প্রাণীজগৎ সম্পর্কে স্পষ্ট মৌলিক ধারণা যা গোটা কোরআনে বিস্তৃত রয়েছে যার ভিত্তিতে কোরআন বার বার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে যে, এ কোরআনের অনুরূপ কোন আয়াত শয়তান, জ্বিন ও সমস্ত মানুষ তাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত করেও রচনা করতে সক্ষম নয়। শুধু তাই নয়, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম রাসূলের কাছে কোরআন নিয়ে আগমন করেন, তখন তাঁর আগমন পথের কোন একটি স্থানে শয়তান অবস্থান করা তো দূরের কথা, দূরে-বহুদূরে সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এমনটি কখনো ঘটেনি যে, ওহী নিয়ে আসা হচ্ছে আর শয়তান সেই পথে গোয়েন্দাগিরি করছিল এবং ওহীর বিষয়বস্তু কিছুটা সে জেনে নিয়ে তার পূজারীদের কাছে সে এ কথা জানিয়ে দিয়েছে, আজ মুহাম্মাদের ওপরে অমুক বিষয়বস্তু সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হবে। এটা যদি ঘটতো তাহলে তোমরা তোমাদের গণৎকারদের মাধ্যমে নিশ্চয়ই এতদিন শুনতে সক্ষম হতে।

সেই প্রাচীন কাল থেকেই কিছু সংখ্যক মানুষের ধারণা যে, উর্ধ্বজগতে মহান আল্লাহ যেসব সিদ্ধান্তের কথা তাঁর ফেরেশতাদেরকে অবগত করে থাকেন, ফেরেশ্তারা তা নিয়ে যখন আলোচনা করে, তখন জ্বিন ও শয়তান উর্ধ্বজগতে আড়ি পেতে তা শ্রবণ করে এসে তার পূজারীদেরকে জানিয়ে দেয়। এভাবেই গণৎকারগণ ভবিষ্যৎবাণী করে থাকে। পবিত্র কোরআন বলছে, মানুষের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে, শয়তান উর্ধ্বজগতে গমন করার ক্ষমতা সম্পন্ন। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, শয়তান অবশ্যই উর্ধ্বজগতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা সে জগতের ব্যবস্থাপনা এমনভাবে সুসম্পন্ন করেছেন যে, শয়তানের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। আল্লাহ উর্ধ্বজগতে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নিমার্ণ করেছেন। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে সে জগত থেকে উত্তপ্ত উল্কাপিন্ড নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। শয়তান সে জগতের আশেপাশে ঘুরঘুর করার চেষ্টা করলেই একটি মহাশক্তিশালী অগ্নিপিন্ড তাকে ধাওয়া করে। সুতরাং রাসূলের মুখ থেকে যে কোরআন প্রকাশিত হচ্ছে, তা পরিপূর্ণভাবে শয়তানের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব মুক্ত।

এরপরেও বলা হয়েছে, এই কিতাব এমন এক সত্তার মাধ্যমে নবীর কাছে প্রেরণ করা হয়, যিনি যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত। এ কোরআন নিয়ে কোন বস্তুগত শক্তি আগমন করেনি, যার মধ্যে পরিবর্তন ও অবক্ষয়ের সামান্যতম কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে। সেই সত্তা যাকে বলা হয়েছে 'রুহুল আমিন' তাঁর ভেতরে বস্তুবাদিতার কোন চিহ্ন নেই। মানব জাতির মধ্যে যেমন অবিশ্বস্ততার প্রবণতা বিদ্যমান, রুহুল আমিন বা জিবরাইল আলাইহিস্ সালাম এসব প্রবণতা থেকে মুক্ত। তিনি সম্পূর্ণরূপে আমানতদার। পৃথিবীর অতিবিশ্বস্ত মানুষও প্রলোভনে পড়ে ক্ষেত্র বিশেষে বিশ্বস্ততা হারিয়ে বসে। কারণ মানুষের মধ্যে প্রলোভিত হওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু রুহুল আমিন সে প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত–তাঁকে সৃষ্টিই করা হয়েছে সেভাবে। এ কারণে তিনি যখন কোরআন নিয়ে আসেন, তখন শয়তান এর

ভেতরে কোন মিশ্রণ ঘটাবে, এ সুযোগ শয়তান লাভ করা তো অনেক পরের ব্যাপার, রুহুল আমিনের আগমন পথ থেকে শয়তানকে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থান করতে হয়। সুতরাং কোরআন শয়তান কর্তৃক সঞ্চারিত কোন বাণী নয়–এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে গোটা জগতের প্রতিপালক, স্রষ্টা ও পরিচালক, নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে।

কোরআন বিরোধিদের ওপরে কোরআনের প্রভাব

পবিত্র কোরআন যখন অবতীর্ণ হচ্ছিলো, তখন যারা এর বিরোধিতা করেছে, তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল–এই কিতাবকে তারা না পারছিল আল্লাহর বাণী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে, না পারছিল এটাকে মানুষের রচনা করা কিতাব হিসাবে প্রমাণ করতে। এই কিতাবকে যদি তারা আল্লাহর বাণী হিসাবে স্বীকৃতি দান করে তাহলে তাদের নেতৃত্বের অবসান ঘটে এবং সেই সাথে আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বিষয়টি তাদের কাছে ছিল একেবারেই অসহনীয়। অপরদিকে নবীর বিরুদ্ধে তারা যে অপপ্রচার চালাচ্ছিলো, সে অপপ্রচারের ফল হচ্ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত।

জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ–যাদের অন্তরে ছিল সত্যানুসন্ধিৎসা, তারা ক্রমেই আল্লাহর কোরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলামী আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হচ্ছিলো। প্রতিটি যুগে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই চিরসত্যই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অস্ত্র যতই শানিত করা হয়েছে, সাধারণ মানুষ ততই এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

সে যুগে যারা কোরআন বিরোধিতার নেতৃত্ব দিচ্ছিলো, তারা এটা স্পষ্ট অনুভব করেছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের যে বাণী প্রচার করছেন, তার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। এ কারণে তারা সাধারণ মানুষকে এই কোরআন শোনা থেকে বিরত থাকতে বলতো। মক্কার ইসলাম বিরোধিদের ইসলাম নির্মূলের অগণিত পরিকল্পনার মধ্যে একটি পরিকল্পনা ছিল এই যে, রাসূল যখনই কোন সমাবেশে মানুষকে কোরআনের কথা শোনাবেন, তখনই সেখানে একটা শোরগোল সৃষ্টি করে কোরআন শোনানোর পরিবেশ নষ্ট করে দেয়া। নানাভাবে কোরআনের মাহফিলে বাধা সৃষ্টি করা, যেন মানুষের ওপরে এই কোরআন কোন প্রভাব সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়।

ইসলাম বিরোধী শক্তি এই অস্ত্র শুধু সে যুগেই প্রয়োগ করেনি, বর্তমানেও তারা তাদের সেই পুরনো অস্ত্র প্রয়োগ করে কোরআন শোনা থেকে মানুষকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করে। ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা কোরআনের মাহফিল অনুষ্ঠিত হবার পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করে থাকে। সে যুগে ইসলাম বিরোধিরা সাধারণ মানুষকে কোরআনের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য বলতো–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ–

এসব কাফেররা বলে, এ কোরআন তোমরা কখনো শুনবে না। আর যখন তা শুনানো হবে তখন শোরগোল সৃষ্টি করবে। হয়তো এভাবে তোমরা বিজয়ী হবে। (হা-মীম সেজদা-২৬)

কোরআন কী অসাধারণ প্রভাব ক্ষমতার অধিকারী কিতাব, এই কিতাবের দাওয়াত যিনি দিচ্ছেন তিনি কেমন অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁর এই ব্যক্তিত্বের সাথে উপস্থাপনার ভঙ্গি কেমন বিস্ময়করভাবে কার্যকর হচ্ছে, তা ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট অনুভব করতে পারতো। তারা এ কথা বিশ্বাস করতো, এ ধরনের উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির জবান থেকে এমন চিত্তাকর্ষক-হৃদয়গ্রাহী মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে এই দৃষ্টান্তহীন কালাম যার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত কোরআনের আন্দোলনের প্রতি দুর্বল হবেই হবে। অতএব যে প্রকারেই হোক, কোরআনের মাহফিল অনুষ্ঠিত হতে দেয়া যাবে না। কিন্তু যারা এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতো, স্বয়ং তারাই নিজেদের অজান্তে আল্লাহর কোরআনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়তো।

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, সিজদার আয়াত সম্বলিত সূরা আন্ নাজম-ই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকেই এই হাদীসের যেসব অংশসমূহ হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ, হযরত আবু ইসহাক ও হযরত জুবাইর ইবনে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, সূরা আন্ নাজম-ই কোরআনের প্রথম সূরা যা আল্লাহর রাসূল কুরাইশদের এক সমাবেশে (আর ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনা মতে হারাম শরীফে) সর্বপ্রথম তেলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন। সমাবেশে কাফির ও মুমিন উভয় শ্রেণীর লোকজনই উপস্থিত ছিল।

শেষের দিকে আল্লাহর নবী যখন সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সেজদায় চলে গেল। ইসলাম বিরোধিদের বড় বড় নেতারা পর্যন্ত–যারা অন্যদের অপেক্ষা বেশী বিরোধী ছিল–সেজদা না করে পারলো না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি কাফিরদের মধ্যে মাত্র একজন–উমাইয়া ইবনে খালফ্কে দেখলাম, সে সিজদা করার পরিবর্তে কিছুটা মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বললো, 'আমার জন্য এটাই যথেষ্ট।' আর পরবর্তী সময়ে আমি এ দৃশ্যও দেখতে পেয়েছি যে, লোকটি কুফরি অবস্থায়ই নিহত হলো।

এ ঘটনার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হচ্ছেন হযরত মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদা'আ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেননি। হাদীস গ্রন্থ নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদে তাঁর নিজের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সূরা নাজম তেলাওয়াত করে সিজদা করলেন এবং উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সাথে সেজদায় পড়ে গেল, কিন্তু আমি সেজদা করলাম না। বর্তমানে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ আমি এভাবে করি যে, এ সূরা তেলাওয়াত কালে আমি কক্ষণ-ই সেজদা না করে ছাড়ি না।

নবুয়্যত লাভের পর পাঁচটি বছর পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলমাত্র গোপন বৈঠক-মজলিসে ও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আল্লাহর কালাম শুনিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন সাধারণ জনসমাবেশে কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত করে শোনানোর কেন সুযোগই তাঁর হয়নি। ইসলাম

বিরোধিদের প্রবল প্রতিরোধই ছিল এর প্রধান অন্তরায়। নবীর ব্যক্তিত্বে, তাঁর প্রচারমূলক কার্যাবলী ও তৎপরতার কী তীব্র আকর্ষণ ছিল এবং কোরআনের আয়াতসমূহের কী সাংঘাতিক প্রভাব ছিল, সে বিষয়ে তারা ভালোভাবেই অবহিত ছিল। এ কারণেই তারা নিজেরাও এই কালাম না শুনার এবং অন্যরাও যেন শুনতে না পারে সে জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করতো না। নবীর বিরুদ্ধে নানা ধরনের ভুল ধারণা প্রচার করে তারা ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতকে অবরুদ্ধ ও দমন করতে চেয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে একদিকে তারা নানা স্থানে এ কথা রটিয়ে দিচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে এবং এখন অন্য লোকদেরকে বিভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করছে। অপরদিকে তিনি যেখানেই কোরআন শুনানোর জন্য চেষ্টা করতেন সেখানেই হট্টগোল, কোলাহল ও চিৎকার করা তাদের একটা স্থায়ী নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকে কী কারণে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত বলা হচ্ছে, লোকেরা যাতে তা জানতেই না পারে, এই শোরগোল করার মূলে এটাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই পরিস্থিতিতে একদিন আল্লাহর রাসূল হারাম শরীফের মধ্যে কোরাইশদের একটি বড় সমাবেশে আকস্মিকভাবে ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এ সময় আল্লাহর পক্ষ হতে বিশ্বনবীর মুখে যে ভাষণটি পরিবেশিত হয়েছে, তা-ই পবিত্র কোরআনে সূরা আন্ নাজম রূপে বিদ্যমান। এ কালামের প্রভাব এত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, আল্লাহর নবী যখন এ সূরা তেলাওয়াত করছিলেন, তখন তার বিপরীতে ইসলাম বিরোধিগণ এতটাই মোহিত হয়ে পড়েছিল যে, তারা হৈ-চৈ হট্টগোল করবে–এমন কোন চেতনাই তাদের ছিল না। ভাষণ শেষে নবী যখন সেজদায় পড়ে গেলেন, তখন তাঁর সাথে সাথে উপস্থিত ইসলাম বিরোধিগণও সেজদায় পড়ে গেল।

এটা ছিল কোরআনের প্রতি তাদের একটা বড় দুর্বলতা। তারা এ দুর্বলতা প্রদর্শন করে পরে বিব্রত বোধ করছিল। সাধারণ লোকজন তাদেরকে তিরস্কার করতে লাগলো যে, 'যে কালাম শুনতে তারাই নিষেধ করে আর সে কালাম শুনে স্বয়ং নিষেধকারী নেতাগণই সেজদায় পড়ে যায়। নেতাবৃন্দ মনোযোগ দিয়ে মুহাম্মাদের কোরআনও শুনেছে এবং সেজদাও করেছে।' এই পরিস্থিতিতে ইসলাম বিরোধী নেতাগণ নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

হযরত ওমরের মতো কঠিন হৃদয়ের মানুষও কোরআনের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোরআনের প্রভাব তাঁকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। আল্লাহর রাসূলকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যে একদিন রাতে তিনি রাসূলকে অনুসরণ করছিলেন। গভীর রাতে আল্লাহর নবী কা'বাঘরে নামাজ আদায় করার জন্য গিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল নামাজে দাঁড়িয়ে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন।

হযরত ওমর তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি অন্ধকারে অদূরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নবীর পবিত্র জবান মোবারক থেকে কোরআন শুনছিলেন। কোরআনের বাণীর অপূর্ব সামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করে তাঁর মনে এ কথার উদয় হলো যে, 'এই মুহাম্মাদ সম্ভবত উচ্চমানের কবি হয়ে

গিয়েছেন।' তিনি মনে মনে এ কথাগুলো বলছিলেন, আর সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মুখ থেকে উচ্চারিত করালেন-

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ-قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ-

এটা কোন কবির কথা নয়, তোমরা খুব কমই ঈমান এনে থাকো। (সূরা আল-হাক্কাহ্-৪১)

বিস্ময়ের ধাক্কায় স্তব্ধ অনড় হয়ে গেলেন হযরত ওমর। অবাক দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন আল্লাহর রাসূলের দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই তিনি মনে মনে বললেন, 'এই লোকটি শুধু উচ্চমানের কবিই হননি, সেই সাথে একজন উচ্চ পর্যায়ের গণৎকারও হয়ে গিয়েছেন। তা না হলে তিনি আমার মনের কথা জানলেন কেমন করে ?' তাঁর মনে এ কথা উদিত হবার সাথে সাথে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীবের মুখ থেকে সূরা হাক্কার আয়াত উচ্চারিত করালেন-

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ-قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ-

এটা কোন গণৎকারের কথা নয়, তোমরা খুব কমই চিন্তা-বিবেচনা করে থাকো। (হাক্কাহ্-৪২)

হযরত ওমর বিস্ময়ের দ্বিতীয় ধাক্কা খেলেন। তিনি মনে মনে যা বলছেন, আর তার জবাব রাসূল দিয়ে দিচ্ছেন। বিষয়টি তাঁকে সত্য গ্রহণের পথে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিল। তাঁর মনে পুনরায় প্রশ্ন জাগলো, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা পাঠ করছেন, তা কোন কবির কথা নয়, কোন গণৎকারের কথাও নয়। তাহলে তিনি এ কালাম কোথা থেকে লাভ করলেন ?' তাঁর মনের এ প্রশ্নের উত্তরও রাসূলের মুখ থেকে শোনা গেল-

تَنْزِيْلٌ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

এটা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা আল-হাক্কাহ্-৪৩)

ঐতিহাসিক বালাযুরী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যে সময়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবুয়্যত লাভ করেন সে সময়ে গোটা কুরাইশদের মধ্যে মাত্র সতেরজন লোক লেখা পড়া জানতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন একজন। তদানীন্তন যুগের ইতিহাস থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বীর এবং বিখ্যাত কুস্তিগীর, পাহলোয়ান। উকাযের মেলায় তিনি কুস্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। সমকালীন বিখ্যাত কবিদের সমস্ত কবিতা ছিল তাঁর মুখস্থ, এ থেকে ধারণা করা যায় তিনি কতটা ব্যাপক কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আরবী কাব্য সমালোচনার বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন তিনি। বংশ তালিকা বিদ্যায় তিনি ছিলেন পারদর্শী।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, তাঁর জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির সুনাম চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কোন গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তাঁকেই দূত হিসাবে প্রেরণ করা হত। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী এবং সে কারণে তাকে বিদেশ ভ্রমণ করতে হত। ফলে

বিদেশের নেতৃবৃন্দ এবং শাসক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশার কারণে তাঁর জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি বিশেষ এক স্তরে উন্নীত হয়েছিল।

নেতৃত্বের যাবতীয় গুণাবলী ছিল তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। সেই মূর্খতার যুগেও তিনি ছিলেন নেতা। আবার ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তিনিই ছিলেন নেতা। ইসলামী আন্দোলনের জন্য তাঁর মত ব্যক্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ কারণেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর মত ব্যক্তিত্বের জন্য দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ ! ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হিশামকে ইসলামে দাখিল করে তুমি ইসলামকে শক্তিশালী করো।'

তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা ছিল বড়ই অপূর্ব। তিনি ছিলেন আদী গোত্রের লোক, তাঁর এই গোত্রে তাওহীদের আলো নতুন কিছু ছিল না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বেই তাওহীদবাদী ছিলেন হযরত যায়েদ, আর বিশ্বনবীর হাতে হাত দিয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন ঐ যায়েদেরই সৌভাগ্যবান সন্তান হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব। হযরত সাঈদ একদিকে ছিলেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চাচাত ভাই এবং আরেকদিকে ছিলেন তাঁর আপন বোনের স্বামী।

হযরত ওমরের বংশের আরেকজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল হযরত নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে তেমন কোন সংবাদ রাখতেন না। কেননা, ইসলামী কার্যক্রমের গোপনীয়তার কারণে অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে জানতেন না। তাছাড়া যারা শুনেছিল, তারা হয়তঃ ভেবেছিল মুহাম্মাদের এই নতুন আদর্শ সমাজে তেমন প্রভাব বিস্তার করবে না। দু'চারজন লোকের কাছেই সে আদর্শ সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় কেউ যদি তা শুনেই থাকে ব্যাপারটাকে তাঁরা তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু হযরত ওমর যে সময় ইসলামের কথা শুনলেন তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন যারা ইসলাম কবুল করেছিল, তিনি তাদের প্রাণের শত্রু হয়ে পড়লেন।

তিনি যখন শুনলেন তাঁর এক দাসীও ইসলাম কবুল করেছে, তখন তিনি সেই দাসীর ওপরে চরম নির্যাতন করলেন। দাসীকে যখন তিনি ইসলাম ত্যাগ করাতে সক্ষম হলেন না, তখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, ইসলাম যার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে তাকেই তিনি এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিবেন। তারপর শানিত তরবারী কাঁধে ঝুলিয়ে তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বের হলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, পথে তাঁর সাথে কথা হয়েছিল বনী যুহরার এক নব্য মুসলমানের সাথে, আবার কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল হযরত নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে। ধারণা করা হয় সে পথিক ছিল নও মুসলিম। সে ব্যক্তি হযরত ওমরকে জিজ্ঞাসা করলো, 'হে ওমর! তুমি এমন ক্রোধের সাথে কাঁধে তরবারী ঝুলিয়ে কোথায় যাচ্ছো ?'

লোকটির প্রশ্নের জবাবে হযরত ওমর ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'মুহাম্মাদের সাথে একটা শেষ বোঝাপড়া করতে।' লোকটি তাঁকে সাবধান করে দেয়ার জন্য বললো, 'মুহাম্মাদের কোন

ক্ষতি করলে তাঁর গোত্রের লোকজনের হাত থেকে তুমি নিস্তার পাবে কি করে ?' লোকটির একথায় হযরত ওমর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি বোধহয় মুহাম্মাদের আদর্শ গ্রহণ করেছো ?'

লোকটি হযরত ওমরের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য দ্রুত কণ্ঠে বললো, 'একটা সংবাদ শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে, তোমার বোন এবং তাঁর স্বামী ইসলাম কবুল করে মুহাম্মাদের দলে শামিল হয়েছে।' এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর ক্রোধে ফেটে পড়লেন। হিতাহিত জ্ঞান শুন্যের মত তিনি ছুটলেন তাঁর বোনের বাড়ির দিকে। তাঁর বোন-ভগ্নিপতি ঘরের দরোজা বন্ধ করে সে সময়ে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে কোরআনের সূরা ত্বা-হা শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। হযরত ওমর বোনের বন্ধ দরোজার কাছে যেতেই তাঁর কানে কোরআনের মধুর বাণী প্রবেশ করে তাঁর অন্তরের পূঞ্জিভূত বরফ গলানো শুরু করে দিয়েছিল। তিনি গর্জন করে বোনের দরোজায় আঘাত করলেন। হযরত ওমর এসেছেন এ কথা জানার পরে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আত্মগোপন করলেন। দরোজা খুলে দেয়ার পরে হযরত ওমর ঘরে প্রবেশ করে তাদের কাছে ধমকের স্বরে জানতে চাইলেন, 'তোমরা কি পড়ছিলে ? আমি তাঁর শব্দ শুনেছি।' তাঁরা জবাব দিলেন, 'আমরা পরস্পরের মধ্যে কথা বলছিলাম।'

হযরত ওমর বললেন, 'তোমরা আমাদের আদর্শ ত্যাগ করে মুহাম্মাদের আদর্শ গ্রহণ করেছো।' হযরত ওমরের ভগ্নিপতি বললেন, আমাদের আদর্শের তুলনায় অন্য আদর্শ যদি উত্তম হয় তাহলে তুমি কি করবে ওমর ? তাঁর মুখের কথা শেষ না হতেই হযরত ওমর ভগ্নিপতির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে অমানবিকভাবে প্রহার করতে লাগলেন। স্বামীকে বাঁচাতে এসে তাঁর বোনও ভাইয়ের হাতে রক্তাক্ত হলেন। বোনের শরীরের রক্ত দেখে হযরত ওমর যেন চমকে উঠলেন। ইতিপূর্বেই তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, শত নির্যাতনের মুখেও তাঁর দাসী এই ধর্ম ত্যাগ করেনি। তাঁর বোন এবং ভগ্নিপতির অবস্থাও তেমনি। অহলে কি আছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শের ভেতরে ? প্রশ্নটা তাঁর ভেতরের পৃথিবীটা সম্পূর্ণ ওলট-পালট করে দিল। তিনি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অনুশোচনার কণ্ঠে তিনি তাঁর বোন ভগ্নিপতিকে বললেন, 'তোমরা কি পড়ছিলে আমাকে দেখাও!'

হযরত ওমরের কণ্ঠের পরিবর্তন শুনেই তাঁরা অনুভব করলেন, ওমরের ভেতরে পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছে। তাঁরা জানালেন, 'আমরা যা পড়ছিলাম তা মহান আল্লাহর বাণী, অপবিত্র অবস্থায় তা স্পর্শ করা যায় না।' সুবোধ বালকের মতই হযরত ওমর পবিত্র হয়ে এসে আল্লাহর কোরআন পড়তে লাগলেন। মূহূর্তে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়ে সেখানে তাওহীদের জান্নাতি শিখা দেদীপ্যমান হয়ে উঠলো। কিছুটা পড়েই তিনি করুণ কণ্ঠে আবেদন জানালেন, 'কোথায় আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ! আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।'

হযরত ওমরের এই কথা শুনে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু গোপন স্থান থেকে বের হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আনন্দিত কণ্ঠে বললেন, 'হে ওমর ! আনন্দের সংবাদ

গ্রহণ করো, তোমার জন্য আল্লাহর রাসূল দোয়া করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের দোয়া কবুল করেছেন। তিনি এখন সাফা পাহাড়ের ওপরে আরকামের বাড়িতে অবস্থান করছেন।'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তখন ভিন্ন এক জগতের মানুষ। তিনি আল্লাহর রাসূলকে এই পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার হতে বিরত করতে এসেছিলেন। এসেছিলেন তওহীদের জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে, এখন স্বয়ং তিনিই সে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। দারে আরকামের দিকে তিনি চলেছেন। আগের মতই তাঁর কাঁধে তরবারী ঝুলানো রয়েছে, তবে সে তরবারী এখন ব্যবহার হবে খোদাদ্রোহী বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শের পক্ষে। হযরত হামজা ও হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম সে সময়ে দারে আরকামের দরোজায় কিছু সংখ্যক মুসলমানসহ প্রহরা দিচ্ছিলেন। হযরত ওমরকে কাঁধে তরবারী ঝুলিয়ে আসতে দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'তাকে আসতে দাও, আল্লাহ যদি ওমরের কল্যাণ করেন তাহলে সে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করবে, আর যদি সে অন্য উদ্দেশ্যে আসে তাহলে তাঁর তরবারী দিয়েই তাকে হত্যা করা হবে।'

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে সময়ে আরকামের বাড়ির ভেতরে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে হযরত ওমরের আগমনের কথা জানালে তিনি প্রশান্ত চিত্তে বলেছিলেন, 'তাকে আসতে দাও।' এরপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এসে পৌঁছলে আল্লাহর রাসূল বাইরে এসে তাঁর তরবারীর গোড়ার দিক এবং পরনের কাপড় নিজের হাতে ধরে মমতাভরা কণ্ঠে বললেন, 'হে ওমর ! তুমি কি বিরত হবে না ? হে আল্লাহ ! ওমর আমার সামনে, হে আল্লাহ ওমরের মাধ্যমে তুমি তোমার ইসলামকে শক্তিশালী করো।' হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর নবীর হাতে হাত রেখে ঘোষনা দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনার জন্য আপনার কাছে এসেছি।'

হযরত ওমরের কণ্ঠে এমন ব্যাকুল আবেদন শুনে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলেন, 'বিশ্বনবী সে মুহূর্তে উচ্চ কণ্ঠে আল্লাহ আকবার বলে তাকবির দিয়েছিলেন। বর্তমান কালের গবেষকগণ যাকে বিজয়ের শ্লোগান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। উপস্থিত সাহাবাগণও সেদিন নীরব ছিলেন না, তাঁরাও আল্লাহর নবীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাওহীদের বিজয় ঘোষনা করেছিলেন। নবী ও সাহাবাদের সম্মিলিত শ্লোগানে সেদিন পৃথিবীর সমস্ত বাতিল শক্তির ভিত্তি ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়েছিল, যা শুধু ধ্বসে পড়ার অপেক্ষায় ছিল। ইসলামের বিপ্লবী কাফেলায় শামিল হয়েই আল্লাহর সৈনিক ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘোষনা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আর লুকোচুরি নয়, আল্লাহ বিরোধী মিথ্যে শক্তি প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাবে, আল্লাহর ঘরে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করবে আর আমরা যারা মহান আল্লাহর দাসত্ব করি তারা কা'বায় নামাজ আদায় করতে পারবো না, গোপনে নামাজ আদায় করবো তা হতে পারে না। চলুন আমারা প্রকাশ্যে কা'বায় মহান আল্লাহকে সেজদা করবো।' হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুসহ এমন অসংখ্য মানুষের এ ধরনের পরিবর্তন শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছিল পবিত্র কোরআনের প্রভাবের কারণে।

কোরআন দুর্বোধ্য ভাষায় অবতীর্ণ হয়নি

পৃথিবীতে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে, তাঁকে সেই জাতির মধ্য থেকেই নির্বাচিত করা হয়েছে। নবী ও রাসূলদের ইতিহাসে কখনো এমনটি দেখা যায়নি যে, নবী এক ভাষায় কথা বলেন আর তিনি যে জাতিকে হেদায়াতের জন্য আগমন করেছেন, সে জাতি ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। এমন যদি হতো তাহলে সে জাতি এই অজুহাত সৃষ্টি করতো যে, 'এমন একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের হেদায়াতকারী রূপে প্রেরণ করেছেন, যাঁর ভাষার সাথে আমরা পরিচিত নই।' জাতি যে ভাষায় কথা বলেছে, তাঁদের জন্য প্রেরিত নবী ও রাসূলও সেই একই ভাষায় কথা বলেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ-

আমি আমার বাণী পৌছানোর জন্য যখনই কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌছিয়েছে, যেন তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ভালোভাবে স্পষ্টরূপে বুঝাতে সক্ষম হয়। (সূরা ইবরাহীম-৪)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে এ পৃথিবীতে যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন জাতি ভিত্তিক বা দেশ ভিত্তিক নবী। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন বিশ্বনবী। তিনি সমস্ত যুগের, কালের সমস্ত দেশের তথা গোটা মানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর আদর্শ বিশেষ কোন জাতি গোষ্ঠী বা দেশের জন্য নয়-তাঁর আদর্শ গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। রাসূল ছিলেন আরবী ভাষী এবং তিনি যে জনগোষ্ঠীর ভেতরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তারাও ছিলেন আরবী ভাষী। আরবী ভাষাতেই তাঁর কাছে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা মারিয়ামে তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন-

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا-

হে রাসূল ! এ বাণীকে আমি সহজ করে তোমার ভাষায় এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি মুত্তাকিদেরকে সুসংবাদ দিতে ও সীমালংঘনকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হও।

কোরআনের বক্তব্যে বিন্দুমাত্র দুর্বোধ্যতা নেই। এ কিতাব যা বলে তা অত্যন্ত সহজ সরল ও স্পষ্টভাবে বলে দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ-اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ-

এটা সেই কিতাবের আয়াত, যা নিজের বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। আমি একে কোরআন রূপে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। (সূরা ইউসুফ-১-২)

আরবী ভাষাভাষীদের কাছে অনারব কোন ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ হলে তারা কোরআন বিরোধিতার আরেকটি অস্ত্র লাভ করতো এবং সত্য গ্রহণ না করার অজুহাত হিসাবে দাবী

করতো, আমাদের বোধগম্য ভাষায় কিতাব নিয়ে এলে আমরা তা বুঝতাম এবং গ্রহণ করতে পারতাম। এ জন্য আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করে এ কথা তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মাতৃভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে–যেন তোমরা কোরআনের শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে পৃথিবীর মানুষদেরকেও এ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত পেশ করতে সক্ষম হও। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَكَذَالِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ-

হে রাসূল ! এভাবে আমি একে আরবী কোরআন বানিয়ে অবতীর্ণ করেছি এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কবাণী করেছি। (সূরা ত্বা-হা–১১৩)

এ কিতাব আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলেও এর নিজস্ব কতকগুলো পরিভাষা নির্দিষ্ট রয়েছে। অসংখ্য শব্দকে তার মূল আভিধানিক অর্থ থেকে স্থানান্তরিত করে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং অনেকগুলো শব্দ তাতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা এমন কোন জটিলতা ও বক্রতা দিয়ে এ কোরআন প্রেরণ করেননি যে, তা অনুধাবন করতে মানুষের অসুবিধা হবে। বরং এ কোরআনে পরিষ্কারভাবে সহজ-সরল কথা উচ্চারিত হয়েছে। প্রতিটি মানুষ অবগত হতে পারে, এ কিতার কোন কোন মতাদর্শ, মতবাদ, নিয়ম-পদ্ধতিকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা দেয় এবং কেন দেয়। কোন কোন জিনিসকে সঠিক বলে এবং কিসের ভিত্তিতে বলে। মানুষকে এ কিতাব কিসের প্রতি স্বীকৃতি দিতে বলে এবং কিসের প্রতি অস্বীকৃতি দিতে বলে। এ কিতাব কোন কাজের আদেশ দেয় এবং কোন কাজ থেকে মানুষকে বিরত থাকতে বলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ- قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ-

এ কোরআনের ভেতরে আমি মানুষের জন্য নানা ধরনের উপমা পেশ করেছি যেন তারা সাবধান হয়ে যায়, আরবী ভাষার কোরআন–যাতে কোন বক্রতা নেই। যাতে তারা নিকৃষ্ট পরিণাম থেকে রক্ষা পায়। (সূরা যুমার–২৭-২৮)

এ কিতাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এর ভেতরে না বুঝার মতো কোন জটিল বিষয়ের অবতারণা করা হয়নি। আল্লাহ বলেন–

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ- بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا- فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ

এটা পরম দাতা ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা জিনিস। এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরবী ভাষার কোরআন। সেসব লোকদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী, সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী। (সূরা হা-মীম-সাজদাহ–২-৪)

কোন আদর্শ গ্রহণ করার ইচ্ছা না থাকলে তা অস্বীকার করার জন্য অজুহাতের অভাব হয়না। নানা ধরনের দোষ-ক্রটি, বক্রতা ও অজুহাত প্রদর্শন করতে থাকে এক শ্রেণীর মানুষ। রাসূলের ওপরে তারা ঈমান আনবে না বিধায় তারা বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দাঁড় করাতো। রাসূলকে তো নানা মিথ্যা বিশেষণে বিশেষিত করলো, সেই সাথে তারা এ দাবী করেছিল যে, 'কি অদ্ভুত ব্যাপার ! তিনি নিজে আরবী ভাষী, আর কোরআনও নিয়ে এসেছেন আরবী ভাষায়। তিনি যদি অন্য কোন ভাষায় কোরআন নিয়ে আসতেন, তাহলে বুঝতে পারতাম, তিনি সত্যই আল্লাহর রাসূল। আরবী তাঁর মাতৃভাষা, তিনি সেই ভাষাতেই কোরআন পেশ করছেন, তাহলে এ কথা কি করে বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি এ কোরআন নিজে রচনা করেননি ? কোরআনকে তখনই আল্লাহর বাণী হিসাবে বিশ্বাস করা যেত, যদি তা আরবের বাইরের কোন ভাষায় নিয়ে আসা হতো এবং তিনি তা অনর্গল পাঠ করে আমাদেরকে শুনাতেন।

আসলে এরা কখনো ঈমান আনতো না, এ জন্যই এরা অজুহাত সৃষ্টি করেছে। এদের সামনে যদি অন্য কোন ভাষাতেই কোরআন আসতো, তখন এরা বলতো, এমন কোরআন আমাদের কাছে পেশ করা হলো যে, আমরা তার ভাষাই বুঝি না। আমরা যা বুঝি না, তাই আমাদের সামনে পেশ করে বলা হচ্ছে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আসলে এটা আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি। এদের এসব কথার জবাবে আল্লাহ বলেন-

وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَ اَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ

আমি যদি একে অনারব কোরআন বানিয়ে প্রেরণ করতাম তাহলে এসব লোক বলতো, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি কেন ? কি আশ্চর্য কথা, অনারব বাণীর শ্রোতা আরবী ভাষাভাষী ! (সূরা হা-মীম-সাজদাহ-৪৪)

আরবী ভাষায় এ কোরআন এ জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, কোরআন আরবী ভাষাভাষীদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর ভাষার ব্যাপারেও তখন সেই জনগোষ্ঠী উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিল। এ জন্য তাদের বোধগম্য ভাষায় তা অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যেন তারা এ কিতাব সম্পর্কে গবেষণা করে দেখতে পারে, এ কিতাব কি কোন মানুষের রচনা করা না আল্লাহর বাণী। কোরআনের এসব আয়াত পাঠ করে অনেকেই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, কোরআন যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তা আরববাসীর জন্যই প্রযোজ্য। আমাদের জন্য তা অনুসরণের কোন প্রয়োজন নেই। এসব যুক্তি হলো খোঁড়া যুক্তি। কোন আদর্শ গ্রহণ করা ও বর্জন করার ক্ষেত্রে ভাষা তার মাধ্যম হতে পারে না। এটাই সর্বসম্মত প্রথাসিদ্ধ নিয়ম যে, একটি আদর্শ বিশেষ কোন একটি ভাষায় তা রচিত হবার পরে প্রথমে সে ভাষাভাষীদের মধ্যে তা প্রচারিত হবে। সেসব লোক তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে সে আদর্শ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে অনুবাদকৃত ভাষায় প্রচার শুরু করবে।

পৃথিবীর সমস্ত আদর্শের ক্ষেত্রে এই নিয়মই অনুসরণ করা হয়েছে। পুঁজিবাদ রচিত হয়েছে ইংরেজী ভাষায়, সমাজতন্ত্র রচিত হয়েছে জার্মান ভাষায়, বর্তমান কালের যাবতীয় নীতি পদ্ধতি

ও বৈজ্ঞানিক দর্শন রচিত হচ্ছে ইংরেজী ভাষায়। পরে তা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। আল্লাহর কোরআনও একই নিয়মে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই ধারা চলতে থাকবে। অন্যান্য আদর্শ এই নিয়মে প্রচারিত হওয়ার ও অনুসরণ করার ব্যাপারে যদি কোন আপত্তি উত্থাপন করা না হয়, তাহলে কোরআনের ব্যাপারে কেন আপত্তি উত্থাপন করা হবে? আরবী কোরআন আরব জাতির জন্যই প্রযোজ্য–এ দাবী যারা করে, তারা বিশেষ এক দুরাভিসন্ধি গোপন করেই এ ধরনের অমূলক দাবী করে।

কোরআন আল্লাহর কিতাব-বাস্তবতা কি প্রমাণ পেশ করে

মক্কার কুরাইশদের দাবী ছিল, এই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়-স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রচনা করেছেন, এর রচয়িতা স্বয়ং তিনি। পক্ষান্তরে কোরআন যে স্বয়ং আল্লাহর বাণী, এর বাস্তব প্রমাণ ছিলেন স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সেই অবিশ্বাসীদের সামনেই উপস্থিত ছিলেন। নবুয়্যাত লাভ করার পূর্বে দীর্ঘ চল্লিশটি বছর তিনি তাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। তাদের সম্মুখে তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবনের বিদায় লগ্নে প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছেন।

তাঁর জীবনের সমস্ত কিছুর সম্পর্ক ঐ লোকগুলোর সাথেই বিদ্যমান ছিল, যারা দাবী করছিল, এ কোরআন স্বয়ং তিনি রচনা করেছেন। অথচ তাঁর জীবনের কোন একটি দিকও কোরআন অবিশ্বাসীদের কাছে অস্পষ্ট ছিল না। সুতরাং আল্লাহর রাসূল ছিলেন অবিশ্বাসীদের কাছে পরীক্ষিত সত্যবাদী ব্যক্তিত্ব। কোরআনের প্রতি সন্দেহ পোষণকারী লোকগুলো জানতো, তিনি নবুয়্যত দাবি করার পূর্বে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে এমন কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ পাননি বা এমন কোন গবেষক-চিন্তাবিদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেননি যে, তিনি তাদের কাছ থেকে কোন নতুন ধরনের জ্ঞান-তথ্য আয়ত্ব করে আজ নবুয়্যত দাবী করে তা প্রয়োগ করছেন।

যিনি কখনো অক্ষর জ্ঞান লাভ করার কোন সুযোগ লাভ করেননি, তাঁর মুখ থেকে কিভাবে হঠাৎ করেই জ্ঞানের সরোবর প্রবাহিত হতে থাকলো। কোরআন যেসব বিষয়বস্তুসহ অবতীর্ণ হচ্ছিলো, সেসব বিষয়ে ইতিপূর্বে মক্কার কোন লোক তাঁকে কোনদিন আলোচনা করতে শুনেনি বা এসব বিষয়ে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল বলেও কেউ প্রমাণ দিতে পারেনি। দীর্ঘ চল্লিশ বছরে তাঁর কোন আপনজন, নিকটাত্মীয়, প্রিয় বন্ধু, স্ত্রী তাঁর কোন কাজে কর্মে, কথাবার্তায়, গতি-বিধিতে এমন কোন পূর্বাভাষ পাননি যে, এই লোকটি হঠাৎ করে নিজেকে নবী হিসাবে দাবী করতে পারে বা তাঁর মুখ থেকে এমন জ্ঞান গর্ভ কথা বের হতে থাকে, যে কথা পৃথিবীর নানা ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। পবিত্র কোরআন যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা কিতাব, এটাই তো তার বাস্তব প্রমাণ। কারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ক নিজের জীবন কালের কোন এক অধ্যায়েও এমন কোন জিনিস হঠাৎ করে পেশ করতে সক্ষম নয়, যার উন্মেষ ও বিকাশ লাভের সুস্পষ্ট নিদর্শন জীবনের পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে পরিলক্ষিত হয় না।

কালক্রমে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করে, তার জীবনে শুরু থেকেই সে নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মানুষ অনুমান করতে পারে তার ভবিষ্যৎ জীবনে সে কি ধরনের

খ্যাতি অর্জন করবে। যেমন একটি শিশু পরিণত বয়সে পৌছে কি ধরনের পান্ডিত্য অর্জন করবে, তা তার শৈশব কালে বিদ্যার্জনের প্রতি আকর্ষণ দেখেই অনুমান করা যায়। তেমন কোন নিদর্শন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রে, স্বভাবে, চলাফেরায়, কথাবার্তায় চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বে তাঁর একান্ত আপনজনরাও অনুমান করতে সক্ষম হননি যে, তিনি নবী হচ্ছেন এবং তাঁর মুখ থেকে কোরআন উচ্চারিত হবে। এ কারণেই মক্কার লোকজন ইসলাম বিরোধিতার এক পর্যায়ে অপবাদ উত্থাপন করলো যে, 'কোরআন মুহাম্মদের রচনা করা নয়, কারণ তাঁর ভেতরে আমরা কোরআন রচনা করার মতো কোন যোগ্যতা কখনো দেখিনি। বরং এই কোরআন তাঁকে কেউ শিখিয়ে দেয় আর তিনি তা মুখস্থ করে এসে আমাদের সামনে পেশ করে তা আল্লাহর বাণী বলে দাবী করেন।'

ইসলাম গ্রহণ না করার অজুহাতে হতভাগারা এতটাই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, এই অপবাদ আরোপ করার পূর্বে সামান্য একটি কথা চিন্তা করার অবকাশ তারা পেলো না, শুধু মক্কা ও আরব সাম্রাজ্যই নয়–সারা পৃথিবীতে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন কোন লোকের অস্তিত্ব ছিল না, যিনি কোরআনের মতো সর্ববিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন কিতাব রচনা করতে সক্ষম এবং তা অন্য কোন মানুষকে শিক্ষা দিতে পারেন। আর এই ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন কোন লোকের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকলেও তার পক্ষে তো আত্মগোপন করে থাকা ছিল একেবারে অসম্ভব। সুতরাং কোরআন যে, কোন মানুষের রচনা নয় বরং তা আল্লাহর বাণী–এটাই তো অব্যর্থ প্রমাণ। এ কথা তারা অনুভব করেই পরবর্তীতে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

আরেকটি বিষয় ছিল অলংঘনীয়, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়্যত পূর্ববর্তী জীবনের অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ। তাঁর দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তেও একান্ত আপনজনও প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ও অসততা বা অন্যান্য নৈতিক কদর্যতার কোন চিহ্ন তাঁর চরিত্রে মুহূর্তের জন্যেও প্রকাশ হতে দেখেনি। গোটা আরব সাম্রাজ্যে তাঁর পরিচিত-অপরিচিত এমন একজন লোককেও অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না, যিনি আল্লাহর রাসূলের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে অশোভন কিছু দেখেছে বলে দাবি করতে পারে। বরং যে কোন লোক তাঁর সংস্পর্শে এলেই তাঁকে সত্যবাদী, আমানতদার, সত্যদর্শী, অতিবিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, দয়ালু, মেহেরবান ইত্যাদি অনুপম গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর মতো সমস্ত দিক দিয়ে মহৎ ব্যক্তি আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পায়নি।

খোদ মক্কার লোকজন-পরবর্তীতে যারা প্রাণের দুশমনে পরিণত হয়েছিল, তারাও তাঁকে 'এই ব্যক্তি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য' বলে সর্বমহলে প্রচার করেছিল। নবুয়্যত লাভ করার মাত্র পাঁচ বছর পূর্বে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু হলো। তারপর নির্মাণ কাজ ঐ স্থান পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হলো, যে স্থানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর সন্তান হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের সহযোগিতায় কালো পাথর বা হাজ্রে আস্ওয়াদ স্থাপন করেছিলেন। কথিত আছে, এ পাথর হযরত আদম

আলাইহিস্ সালাম জান্নাত থেকে এনেছিলেন। এই পাথর স্থাপন করা নিয়ে সমস্ত গোত্রের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হলো। প্রতিটি গোত্রেরই আকাংখা, এই জান্নাতী পাথর স্থাপন করার দুর্লভ সম্মান তারাই অর্জন করবে। এ তর্কবিতর্ক শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হলো যে, প্রতিটি গোত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। পাঁচদিন পরে তাঁরা একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য কা'বার প্রঙ্গণে উপস্থিত হলো।

এ সময়ে বনী মখজুম গোত্রের সব থেকে বয়স্ক ব্যক্তি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার ভাই আবু উমাইয়া (এ নামের বিষয়ে মতানৈক্য আছে) উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করলো, 'হে কুরাইশগণ ! তোমরা এই একটা বিষয়ে এ ধরণের ঝগড়া না করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হও যে, কাল সকালে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কা'বার দরোজা দিয়ে প্রবেশ করবে, তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন তোমরা তা সবাই গ্রহণ করবে।' বয়স্ক ব্যক্তির এ কথা সবাই গ্রহণ করলো। সেদিনের মত তাঁরা বিদায় নিল এবং পরদিন তাঁরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো যে, তাদের আল আমীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা'বায় প্রবেশ করছে। সমবেত জনতা আনন্দে চিৎকার করে উঠলো,'হাযাল আমীন রাদিনা, হাযা মুহাম্মাদ ! আতা কুমুল আমীন ! অর্থাৎ এ তো আমীন ! আমাদের অমত নেই, তোমাদের কাছে আমীন এসেছে !'

বিষয়টা তাঁরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রকাশ করলো। তিনি জানতে পারলেন, তাকেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। তখন তিনি বললেন, 'আমাকে তোমরা একটা বড় কাপড় এনে দাও।' একজন একটা বড় কাপড় এনে দিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে কাপড়টা বিছিয়ে কাপড়ের ওপরে নিজের হাতে পাথরটা রাখলেন। তারপর তিনি সমস্ত গোত্র প্রধানদেরকে বললেন, 'আপনারা সবাই এই পাথরসহ কাপড় ধরে ওঠাতে থাকুন।' তারা সবাই কাপড়ের বিভিন্ন অংশ ধরে উঁচু করতে থাকলো। যে স্থানে পাথর স্থাপন করার সিদ্ধান্ত সে পর্যন্ত কাপড় পৌঁছলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাপড় থেকে পাথর উঠিয়ে যথাস্থানে তা স্থাপন করলেন। এভাবে তাঁকে নবী ও রাসূল নির্বাচিত করার পূর্বেই মক্কার কুরাইশদেরকে দিয়ে তাঁকে একজন 'বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি' হিসাবে স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলেন।

সুতরাং, যে মানুষটি নিজের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম কোন ব্যাপারেও কখনো অসততা, প্রতারণা, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেননি, সেই তিনিই হঠাৎ করে এতবড় একটা মিথ্যা ও প্রতারণামূলক দাবীসহকারে দন্ডায়মান হবেন, নিজের রচনা করা অথবা কারো শিখানো কল্পিত জিনিসকে পূর্ণ শক্তিতে ও প্রবলভাবে, দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর নামে প্রচারিত করবেন, এই ধারণা বা অবকাশই কিভাবে থাকতে পারে ? সুতরাং পারিপার্শ্বিকতা ও বস্তুবতাই প্রমাণ করে দেয় যে, কোরআন মহান আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাব।

তিনি স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন। তিনি যদি অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হতেন, কিছু লিখতে ও পড়তে সক্ষম হতেন, তাহলে ধারণা করা যেত যে, তিনি নিজে হয়ত কিছু রচনা করতে পারেন। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ-

(হে রাসূল) ইতিপূর্বে তুমি কোন কিতাব পড়তে না এবং স্বহস্তে লিখতেও না, যদি এমনটি হতো, তাহলে অবিশ্বাসীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারতো। (সূরা আল 'আনকাবূত-৪৮)

আল্লাহর রাসূলের স্বদেশবাসী, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুমহল, পরিচিতজন–যাদের মধ্যে তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর অতিবাহিত করলেন, তারা সবাই এ কথা অত্যন্ত ভালোভাবে অবগত ছিল যে, লোকটি লিখতে জানে না, পড়তে জানে না, জীবনে কোনদিন কোন কিতাব পাঠ করেনি।

অথচ এমন এক ব্যক্তির মুখ থেকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সত্য ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অকল্পনীয় তথ্যাবলী, মানব জীবন বিধানের পরিপূর্ণ দিকসমূহ; ধর্মবিশ্বাসের মূলনীতিসমূহ উচ্চারিত হচ্ছে, তা কোন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে আল্লাহর ওহী ব্যতীত প্রকাশ পেতে পারে না। যদি তিনি অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হতেন, মানুষ যদি তাঁকে কখনো লিখতে-পড়তে এবং অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে দেখতো, তাহলে অবিশ্বাসীদের এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ থাকতো যে, এসব জ্ঞান ওহীর ভিত্তিতে নয় বরং জাগতিক মেধা নিয়োগ করে অর্জন করা হয়েছে–এসব জ্ঞান সাধনালব্ধ জ্ঞান।

পক্ষান্তরে তাঁর নিরক্ষরতা তাঁর সম্পর্কে এসব বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় পোষণ করার কোন অবকাশই রাখেনি। সুতরাং, একজন নিরক্ষর মানুষকে 'কোরআনের রচয়িতা' বলে অপবাদ দিয়ে ঈমান আনা থেকে বিরত থাকা, আর ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

একজন সম্পূর্ণ নিরক্ষর মানুষের পক্ষে পবিত্র কোরআনের মতো একটি অতুলনীয় কিতাব মানুষের সামনে পেশ করা এবং এমনসব অভূতপূর্ব বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রদর্শন করা, যেগুলোর জন্য বহু পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার কোন উদ্যোগ কারো দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি, এসব বিষয় তো অটল বাস্তবতা।

এই বাস্তবতাই প্রমাণ করে দেয় যে, তিনি সত্য নবী এবং কোরআন তাঁর ওপরে আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাব। সারা পৃথিবীতে যারা খ্যাতি অর্জন করেছে, তাদের কারো জীবনী পাঠ করলেই এসব উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় যে, তার ব্যক্তিত্ব গঠনে ও স্ফুরণে এবং তার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশের জন্য তাকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে পরিবেশ সক্রিয় ছিল। তার পরিবেশ ও তার ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদানসমূহের ভেতরে একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়।

পক্ষান্তরে নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব গঠনের উপদানের সাথে কোন ধরনের ন্যূনতম সম্পর্ক থাকতে পারে, এমন সব উপাদান সে যুগে গোটা পৃথিবীতে কোথাও অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না। এই অটল বাস্তবতার ভিত্তিতেই এ

কথার স্বীকৃতি দিতে বিশ্বের চিন্তাবিদগণ বাধ্য হয়েছেন যে, বিশ্বনবীর সত্তা শুধুমাত্র একটি নিদর্শনের নয়–বরং তা অসংখ্য নিদর্শনের সামষ্টিকরূপ।

এ শ্রেণীর লোক এ দাবী করে যে, রাসূল সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন এবং রাসূলের সাক্ষর জ্ঞান থাকা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। এ কথা যারা বলেন, তারা চরম দুঃসাহস প্রদর্শন করেন। কেননা, পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ই ঘোষণা দিয়েছে, তিনি নিরক্ষর ছিলেন এবং এই নিরক্ষরতাই তাঁর নবুয়্যতের এবং কোরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার একটি শক্তিশালী প্রমাণ। রাসূল অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন, এর স্বপক্ষে কিছু সংখ্যক লোক, হাদীস থেকে প্রমাণও পেশ করে থাকে। অথচ যেসব হাদীসের ভিত্তিতে রাসূলের অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া প্রমাণ করা হয়েছে, সেসব হাদীস–হাদীস হিসাবে যোগ্য হওয়ার প্রথম মানদন্ডেই পরিত্যক্ত বলে গণ্য হয়। কারণ কোরআনের বর্ণনার বিপরীত কথাকে হাদীস বলে গ্রহণ করা যাবে না।

একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হোদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পর যখন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা হবে, তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ সংযোজন করতে প্রতিপক্ষ প্রবলভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। অবশেষে আল্লাহর নবী চুক্তির লেখক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন, 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দেন। তিনি 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি নিজের হাতে কেটে দিতে অস্বীকার করলে আল্লাহর রাসুল স্বয়ং নিজের হাতে কলম নিয়ে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দিয়ে সেস্থলে 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ' অর্থাৎ নিজের নামটি লেখেন। এ হাদীসটি বোখারী ও মুসলিম শরীফে ভাষা, বর্ণনা ও শব্দের পার্থক্যসহ বেশ কয়েক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব হাদীস পাঠ করে অনেকে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লিখা পড়া জানতেন না। তিনি ছিলেন উম্মী নবী। অতএব নিজের নাম তিনি কিভাবে লেখলেন এবং কিভাবে এটা সম্ভব হলো ? এ সম্পর্কে আল্লামা শিবলী নোমানী (রাহ) ব্যাখ্যা দান করেছেন যে, 'লেখা পড়ার কাজ কর্ম যখন দৈনন্দিন জীবন ধারার একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায়, তখন লেখা পড়া না জানা একজন মানুষ অন্যের লেখা দেখে নিজের নামের অক্ষর বিন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, নিজের নাম কোন কোন অক্ষরে লেখা যায়, এ সম্পর্কে সেই অক্ষরের সাথে পরিচিত হওয়া অসম্ভবের কিছুই নয়।'

প্রকৃত ব্যাপার ছিল এটাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে প্রতি নিয়ত তাঁকে লেখার সাথে পরিচিত হতে হয়েছে। ইতিপূর্বেও তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনেকের সাথে লিখিত সন্ধি করেছেন, এ সমস্ত লেখার সাথে তাঁকে পরিচিত হতে হয়েছে। প্রতিটি কাজই লিখিতভাবে হয়েছে। সুতরাং লেখালেখির পরিবেশে থেকে বিভিন্ন অক্ষরের সাথে পরিচিত হওয়া একজন নিরক্ষর লোকের পক্ষে অসম্ভব নয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হয়ত এভাবেই অক্ষরের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। অথবা সেটা ছিল তাঁর শত সহস্র মু'জিযার একটি।

কোরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে মানুষ পশুসুলভ জীবন-যাপন করতে পারে না। মানুষের জন্য প্রয়োজন হয় তার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালনার রীতিনীতি। জীবনের এসব দিক পরিচালিত করার জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া হয় বিশেষ কোন চিন্তাদর্শ বা মতবাদকে। যে মতাদর্শকে মানুষ অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সে মতবাদ ত্রুটিপূর্ণ হলে মানুষ নিশ্চত ধ্বংস গহ্বরের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে থাকে। মানুষের গোটা জীবন থেকে শান্তি ও স্বস্তি তিরোহিত হয়। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই মানুষের জন্য নির্দিষ্ট একটি আদর্শের প্রয়োজন হয়। মানুষ যে কোন কাজের মুখোমুখি হলেই তার সামনে প্রথম যে সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তাহলো সে কোন নিয়মে তার সামনে উপস্থিত কর্মটি সম্পাদন করবে। কে তাকে নিয়ম পদ্ধতি শিখিয়ে দেবে। এ থেকে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই নিয়মের মুখাপেক্ষী। এখন এই নিয়ম বা আদর্শ কে রচনা করবে অথবা কে এই আদর্শ দান করবে—এই প্রশ্ন মানুষের সামনে এসে উপস্থিত হয়।

প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে যখন এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হলো, তখন তাঁর মনে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তিনি কোন আদর্শ অনুসরণ করে এই পৃথিবীতে জীবন-যাপন করবেন। বিষয়টি তাঁকে অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। তাঁর এই সমস্যার সমাধান সূরা বাকারার ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়ে দিলেন—

فَامَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ—

আমার পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের কাছে পৌছবে, যারা আমার সেই বিধান অনুসরণ করবে, তাদের জন্য ভয়ভীতি এবং চিন্তার কোন কারণ অবশিষ্ট থাকবে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ কথা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষের জন্য যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতি ও আদর্শ বা জীবন পরিচালনার জন্য যে বিধান প্রয়োজন, তা তিনিই দান করবেন। মানব জীবনের এ জটিল বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালা কোন মানুষের হাতে সোপর্দ করেননি, স্বয়ং তিনিই এ বিষয়টি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। প্রশ্ন আসতে পারে মানুষের জীবন বিধান দেয়ার বিষয়টি কেন তিনি নিজের এখ্তিয়ারে রাখলেন এবং এ দায়িত্ব স্বয়ং মানুষের ওপরে অর্পণ করলেন না কেন ?

এর জবাব হচ্ছে, মানুষ নিজেকে যতই বুদ্ধিমান, যোগ্যতা সম্পন্ন ও যাবতীয় জ্ঞানের অধিকারী বলে ধারণা করুক না কেন—প্রকৃত পক্ষে মানুষ চরম অসহায়, অক্ষম এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। মানুষের অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে পূঁজি করে মানুষের পক্ষে ভারসাম্যমূলক ও ইনসাফপূর্ণ কোন জীবন বিধান রচনা করা সম্ভব নয় বিধায় স্বয়ং আল্লাহ এ দায়িত্ব কোন মানুষের ওপর অর্পণ না করে নিজের এখ্তিয়ারে রেখেছেন। কেননা, এ পৃথিবীতে অসংখ্য

বাঁকা পথের অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক নিয়ম-নীতি ও আদর্শের অস্তিত্ব রয়েছে। যা অনুসরণ করলে মানুষ নিশ্চিত ধ্বংস গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। মানুষ যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংসের অতল তলদেশে তলিয়ে না যায়, এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন। সূরা নাহ্‌লে-এর ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ-

আর আল্লাহরই দায়িত্বে রয়েছে সকল পথপ্রদর্শন, যখন বাঁকা চোরা পথও অনেক রয়েছে।

পথপ্রদর্শনের এই দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা কোন নবী-রাসূলের ওপরেও অর্পণ করেননি। তিনি নবী ও রাসূল প্রেরণ করে তাঁদেরকে যে পথ ও আদর্শের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে নির্দেশ দান করেছেন, তাঁরা তাঁদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব সর্বশক্তি নিয়োগ করে পালন করেছেন। সর্বশেষ এ দায়িত্ব পালন করেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর ওপরে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে এ কোরআনকে মানব জাতির জন্য জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করেছেন। এক কথায় মানব জাতির জীবন বিধান হিসাবে এই কোরআনকে অবতীর্ণ করে বলা হয়েছে-

كِتَابٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَبِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ-اِتَّبِعُوْا مَاۤاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَاۤءَ-

এটা এটা একটি কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। (হে রাসূল !) তোমার হৃদয়ে এর জন্য যেন কোন ধরনের কুণ্ঠা না জাগে। এটা অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্যে এই যে, এর মাধ্যমে তুমি (অমান্যকারীদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করবে এবং বিশ্বাসীদের জন্য এটা হবে স্মরণ ও স্মারক। (হে মানবমন্ডলী) তোমাদের রব্ব-এর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা-ই অনুসরণ করো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোন পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ ও অনুগমন করো না। (সূরা আল-আ'রাফ-২-৩)

অর্থাৎ কোরআন যাঁর ওপরে অবতীর্ণ করা হলো, তাঁকে এটা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হলো, এটা মানব জাতির জীবন বিধান এবং উদ্দেশ্যেই এটা অবতীর্ণ করা হয়েছে। কোন ধরনের ভীতি ও কুণ্ঠা ব্যতীতই এই বিধান প্রচার ও প্রসার করতে থাকো। যারা এটা অস্বীকার করবে, তারা তোমার সাথে কি ধরনের ব্যবহার করবে, এ চিন্তা কারার কোন প্রয়োজন নেই। এটা অবতীর্ণ করার কারণ হলো, ভীতি প্রদর্শন করা। অর্থাৎ রাসূল যেদিকে মানবজাতিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, সে আহ্বানকে উপেক্ষা করার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া এবং অচেতন ও উদাসীন লোকদেরকে সচকিত ও সতর্ক করা। আর অবিশ্বাসীদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন বিশ্বাসীগণ স্বাভাবিকভাবেই অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করেন।

অমানিশার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল মানব জাতি। এই অন্ধকার থেকে মানব মন্ডলীকে আলোর দিকে আনার লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে রাসুল প্রেরণ করে তাঁকে কিতাব দান করেছেন এবং কিতাব কেন অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়েছে–

كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ–

(হে রাসূল !) এটা একটি কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি মানুষদেরকে অমানিশার নিচ্ছিদ্র অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসো।

অর্থাৎ মানুষকে বাঁকাচোরা, ক্ষতিকর, শয়তানি পথ থেকে কল্যাণের পথের দিকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। মানুষ জানে না তাঁর প্রকৃত মালিক কে। কে তার প্রতিপালক। কোন শক্তির দাসত্ব তাকে করতে হবে এবং কেন করতে হবে। কার আইন-কানুন সে পৃথিবীতে অনুসরণ করবে এবং কেন করবে। এসব বিষয় পরিপূর্ণরূপে অবগত করানোর লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ–

প্রকৃত পক্ষে এটা (কোরআন) একটি পয়গাম সমস্ত মানুষের জন্য আর এটা প্রেরণ করা হয়েছে এ জন্য যে, এই কিতাবের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হবে এবং তারা এ কথা অবগত হবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ শুধু একজন আর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে সচেতন হবে। (সূরা ইবরাহীম-৫২)

মানুষ কার দাসত্ব করবে এবং কে মানুষের জন্য জীবন বিধান রচনা করে দেবে, এ বিষয় নিয়ে মানুষের ভেতরে চরম মতপার্থক্য অতীতে যেমন চলেছে, বর্তমান কালেও চলছে। এক শ্রেণীর মানুষ নিজের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত আইন-কানুন মানব গোষ্ঠীকে অনুসরণ করার কথা বলছে। রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে কিছু সংখ্যক মানুষ আল্লাহর দেয়া বিধানের বিপরীত আইন-কানুন দিয়ে দেশ ও জাতিকে পরিচালিত করছে। আইন প্রণয়নের অধিকার কে সংরক্ষণ করেন এবং কেন করেন, এ বিতর্কের সমাধানের লক্ষ্যেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ কথা সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছে যে, আইন রচনা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা সংরক্ষণ করেন। আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ–وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ–

আমি তোমার প্রতি এ কিতাব এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি এ মতভেদের তাৎপর্য এদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরো। যার মধ্যে এরা ডুবে রয়েছে। এ কিতাব পথনির্দেশ ও রহমত হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের জন্য যারা একে মেনে নেবে। (সূরা আন্ নাহ্ল-৬৪)

কল্পনা, ভাব-বিলাস, অন্ধানুকরণ ও কুসংস্কারের এবং জড়বাদ আর বস্তুবাদের ভিত্তিতে যে অসংখ্য মতবাদ, ধর্মমত রচনা করা হয়েছে এবং মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়েছে, এসবের অবসান কল্পে একটি মহাসত্যের স্থায়ী বুনিয়াদের ওপরে যেন মানব গোষ্ঠী দাঁড়াতে সক্ষম হয়, এ জন্য এই কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। যারা এ কোরআনকে স্বীকৃতি দিয়ে অনুসরণ করবে এবং আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে, এ কিতাব জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও ক্ষেত্রে তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে। একে অনুসরণ করে চলার কারণে তাদের ওপরে মহান আল্লাহ রহমত অবতীর্ণ করবেন। এই কোরআন তাদেরকে এ সুসংবাদ প্রদান করে যে, আদালতে আখিরাতে তারা সফলতা অর্জন করবে। আর যারা এ কিতাব অনুসরণ করবে না, তারা সমস্ত দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এ কিতাব আল্লাহর অনুগত বান্দাদেরকে সুসংবাদ ও রহমতের সংবাদ এবং সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত স্পষ্ট জ্ঞান দেয়ার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ–

আমি এ কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যা সব জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে এবং যা সঠিক পথনির্দেশনা, রহমত ও সুসংবাদ বহন করে তাদের জন্য যারা আনুগত্যের মস্তক নত করে দিয়েছে। (সূরা আন্ নাহ্ল-৮৯)

অজ্ঞ, নির্বোধ, অসচেতন, উদাসীন, অমনোযোগী, অসতর্ক, বিদ্রোহী মানুষদেরকে সজাগ সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে এ কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا–

আমি এ কোরআনে নানাভাবে মানুষদেরকে বুঝিয়েছি যেন তারা সজাগ হয়। (বনী ইসরাঈল)

এই কোরআনে এমন কোন কথা নেই যা বুঝতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আবার সত্য ও ন্যায়ের সরল রেখা থেকে বিচ্যুত হতে পারে এমন কোন কথাও এ কোরআনে নেই। এ কোরআন স্পষ্ট এবং সোজা কথা বলার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا–

প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এর মধ্যে কোন বক্রতা রাখেননি। একেবারে সোজা কথা বলার কিতাব। (সূরা আল কাহ্ফ-১)

যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করে তাদের জন্য সুসংবাদ এবং যারা মানুষের বানানো বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করে, তাদের ঘৃণ্য পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করার লক্ষ্যে এ কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا-

(হে রাসূল !) এই বাণীকে আমি সহজ করে তোমার ভাষায় এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পারো এবং হঠকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারো।

রাসুল এবং তাঁর অনুসরণকারীদের ওপরে এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি যে, যারা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়–তাদের ওপরে শক্তি প্রয়োগ করে তা অনুসরণ করাতে হবে। যারা ঈমান আনবে না, শক্তির মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করাতে হবে। এ দায়িত্ব রাসুলের বা তাঁর অনুসারীদের নয়। কোন অসাধ্য সাধন করার জন্য রাসুলকে প্রেরণ করা হয়নি অথবা এমন কোন দায়িত্ব তাঁর ওপরে অর্পণ করে তাঁকে বিপদগ্রস্ত করা হয়নি। যারা ঈমান আনতে আগ্রহী নয়, ইসলামী আন্দোলন যারা জেনে বুঝে পছন্দ করে না, তাদেরকে সত্য পথে নিয়ে আসার জন্য অযথা সময় নষ্ট করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা কারো ওপরে অর্পণ করেননি। আবার এ কোরআন এ জন্যও প্রেরণ করেননি যে, এই কিতাব যাঁর ওপরে অবতীর্ণ করা হলো তিনি এবং এ কিতাবের অনুসারীগণ পৃথিবীতে অবহেলিত ও লাঞ্ছনাময় জীবন-যাপন করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

طٰهٰ-مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى-

আমি এ কোরআন তোমার প্রতি এ জন্য অবতীর্ণ করিনি যে, তুমি লাঞ্ছিত থাকবে। (ত্ব-হা-১)

ভুল করা মানুষের স্বভাব–মানুষ ভুল করবেই। সে ভুল করে ভ্রান্ত পথ ও মত অনুসরণ করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আবার অসচেতনতার কারণে মানুষ ধ্বংস গহ্বরের দিকে এগিয়ে যায়। মানুষের এ অবস্থা থেকে তাকে সচেতন করার লক্ষ্যে এ কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْيُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا-

(আর হে রাসূল !) এভাবে আমি একে আরবী কোরআন বানিয়ে অবতীর্ণ করেছি এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কবাণী করেছি হয়তো এরা বক্রতা থেকে নিরাপদ থাকবে এবং তাদের মধ্যে সচেতনতার নিদর্শন দেখা দেবে। (আল কোরআন, সূরা ত্বা-হা-১১৩)

মানুষকে সতর্ক করা এবং সৎপথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ সম্পর্কে সূরা সাজদাহ্-এর ২-৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ-اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ-بَلْ هُوَالْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ-

এ কিতাবটি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। এরা কি বলে, এ ব্যক্তি নিজেই এটি রচনা করে নিয়েছে ? না, বরং এটি সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন একটি জাতিকে যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি, হয়তো তারা নিজেদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবে।

যারা আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে; পরকালীন জীবনকে যারা খেল-তামাসার বিষয় বলে মনে করে; আল্লাহর ফেরেশ্তা, জান্নাত-জাহান্নম ও আদালতে আখিরাতে হিসাব গ্রহণের বিষয়কে যারা রূপকথার গল্প এবং কবিদের কল্পনা বলে হেসে উড়িয়ে দেয়, তাদের এসব ধারণা খন্ডন করে মহাসত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোরআনকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهٗ ط اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ - لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ -

আমি (নবী)-কে কাব্য কথা শিক্ষা দেইনি এবং কাব্য চর্চা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। এ তো একটি উপদেশ এবং পরিষ্কার পঠনযোগ্য কিতাব, যাতে সে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে পারে এবং অস্বীকারকারীদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (সূরা ইয়াছিন)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করে তাঁর সামনে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু একত্রিত করে সেসব বস্তু নিচয়ের নামসমূহ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর সেসব বস্তুর নাম ফেরেশ্তাদেরকে বলতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করে আল্লাহকে বলেছিলেন-

قَالُوْا سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَا-

সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত একমাত্র আপনিই, আমরা তো শুধু ততটুকুই অবগত আছি যতটুকু আপনি আমাদের অবগত করেছেন। (সূরা বাকারা-৩২)

কিন্তু আল্লাহর প্রথম নবী হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ঠিকই সমস্ত বস্তুর নাম ও তার গুণাগুণসহ বর্ণনা করেছিলেন। বিষয়টি কেমন ছিল তা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যাক। ধরা যাক, সে সময় ফেরেশতার সংখ্যা ছিল পাঁচ শত কোটি। তাদের শরীরের আয়তন যদি বর্তমান মানুষের শরীরের আয়তনের মত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের সহজভাবে বসার জন্য যদি একবর্গ গজ করে স্থানেরও প্রয়োজন হতো, তবে তাদের বসার জন্য পাঁচশত কোটি বর্গ গজ স্থানের প্রয়োজন হতো। অর্থাৎ ফেরেশতাদের বসার জন্য প্রায় দশলক্ষ একরেরও বেশী জমির প্রয়োজন হতো। তার মানে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির মত বিরাট একটি মাঠের প্রয়োজন হতো। আমরা পৃথিবীতে যদি এই ধরনের কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করি, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে ? প্রথমে সাহারা মরুভূমিতে বিরাট একটি মঞ্চ প্রস্তুত করতে হবে। তারপর তার ভেতরে বিশাল আকৃতির একটি গ্যালারী প্রস্তুত করতে হবে। এরপর সেই

গ্যালারীতে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর অংশ সাজিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সেখানে উপস্থিত করে যদি প্রশ্ন করা হয়, কে পারবে এই সমস্ত বস্তুর নাম গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বলতে। তাহলে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে কল্পনা করা যায়?

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে সমস্ত বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁরা তা বলতে পারেনি এবং আদম আলায়হিস্ সালাম সেসব বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বলেছিলেন। এ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি, এই ধরনের একটি বিশাল কিছুর আয়োজন মহান আল্লাহ তাঁর কুদরতি ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করেছিলেন। এবার ধারণা করা যাক, পৃথিবীতে যদি এই ধরনের কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তাহলে তার নাম কি দেয়া হবে? ধরে নেয়া যাক, পদার্থ বিজ্ঞান মেলা বা মহাপদার্থ বিজ্ঞান মেলা একটা কিছু নাম দেয়া হলো।

এখন কোন মানুষকে যদি সেখানের সমস্ত বস্তুর নাম, ব্যবহার পদ্ধতি ও গুণাগুণ বলতে বলা হয়, কোন মানুষ তা বলতে পারবে? মানুষের ব্যবস্থায় এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতের কাছে এটা কোন বিষয়ই নয়। তিনি তা মুহূর্তের ভেতরেই সম্পন্ন করেছিলেন। আবার মনে করা যাক, মানুষের পক্ষে এমন একটি বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হলো। তারপর সেখানে কোন মানুষকে যদি প্রশ্ন করা হয়, এ সমস্ত জিনিষের নাম, ব্যবহার পদ্ধতি ও গুণাগুণ বর্ণনা করতে হবে। কোন মানুষের পক্ষে কি তা বর্ণনা করা সম্ভব? পদার্থ বিজ্ঞানে যারা একাধিক নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন, তারাও কি বলতে পারবেন? কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম তা পেরেছিলেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে যদি আমরা বলি, বস্তু বিজ্ঞানী, প্রাণী বিজ্ঞানী, রসায়ন বিজ্ঞানী পদার্থ বিজ্ঞানী এক কথায় সমস্ত বিষয়ে তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন, তাহলে কি তা ভুল হবে? সে বিজ্ঞানীর শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রথম ছাত্র ছিলেন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এবং আল্লাহ্ তায়ালা হলেন তাঁর শিক্ষক। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁকে বিজ্ঞান শিক্ষা দান করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। সৃষ্টির শুরুতেই বিজ্ঞান, সৃষ্টির প্রথম মানুষ একজন বিজ্ঞানী। কি ধরনের বিজ্ঞানী তা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম নবী ছিলেন, রাসূল ছিলেন, পৃথিবীতে আসার পূর্বে তাঁকে নবুয়্যত দান করা হয়েছিল না পরে দান করা হয়েছিল, সাপ ময়ূরের অস্তিত্ব সেখানে ছিল কিনা, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ গবেষণা করেন, বিতর্ক করেন। কিন্তু আফসোস, তিনি যে বিজ্ঞানী ছিলেন, তা নিয়ে গবেষণা করেন না। এ সম্পর্কে গবেষণা তো করেনই না, যারা বিজ্ঞান গবেষণা ও চর্চা করেন তাদেরকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করেন এবং তাদের প্রতি নির্দয় মন্তব্য করেন।

এই পৃথিবীতে আল্লাহ যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন তা সবই মানুষের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য। পৃথিবীর বস্তু নিয়ে মানুষ গবেষণা করে তা মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করবে :

এসব বিষয়ে মানুষ যেন চিন্তা-গবেষণা করে সে লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কোরআনে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ–

এটি একটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ কিতাব, যা (হে রাসূল !) আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন এরা তার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। (সূরা সা-দ–২৯)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনকে মানব জাতির জন্য বরকতপূর্ণ কিতাব বলেছেন। বরকতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, কল্যাণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি। এই কিতাবকে বরকতপূর্ণ কিতাব বলার কারণ হলো, এ কিতাব অসংখ্য বাঁকা পথের ভেতর থেকে সত্য-সহজ-সরল পথ কোনটি তা মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে। এ কিতাব যারা সঠিকভাবে অনুসরণ করে, তাদেরকে সারা পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন করে দেয়। মানুষের জীবন থেকে অশান্তির শেষ চিহ্নটুকুও দূরীভূত করে দেয়। মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বোত্তম বিধান দান করে। এ কিতাবে আলোচিত বিষয়সমূহ নিয়ে গবেষণা করে মানুষ চরম উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হয়। এ জন্য এ কিতাবকে বরকতপূর্ণ বলা হয়েছে এবং চিন্তা ও গবেষণায় উৎসাহিত করার জন্য এ কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে।

এই কোরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন একমাত্র আল্লাহর গোলাম হয়ে যায়, তারা যেন তাঁরই গোলামী করে এবং গোলামী যেন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। মানুষ নামাজ, রোজা ও হজ্জ পালনের সময়টুকু আল্লাহর গোলামী করবে, আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে অন্য মানুষের রচিত বিধান অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করবে, এ ধরনের দ্বৈত গোলামী করার অবকাশ ইসলামে নেই। মানুষকে এ উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত করার জন্য পৃথিবীতে কোরআন এসেছে। আল্লাহ বলেন–

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ–

(হে রাসূল !) আমি তোমার কাছে হকসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। তাই তুমি একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো। (সূরা আয যুমার-২)

মূলতঃ মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মহান আল্লাহর দাসত্ব করার লক্ষ্যে। এ পৃথিবীতে যা কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সবই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা হয়েছে আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা কেবলমাত্র রাব্বুল আলামীনের গোলামী করবে। মানুষকে এ অবকাশ দেয়া হয়নি যে, সে আল্লাহর সৃষ্টি যাবতীয় নিয়ামত ভোগ করবে আর জীবন পরিচালিত করবে নিজের অথবা অন্যের খেয়াল-খুশী মতো।

কোরআন পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হবার কারণ

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে যখন কোরআন অবতীর্ণ করা হয় তখন অবিশ্বাসীরা কোরআনের সত্যতার ব্যাপারে যতগুলো যুক্তি প্রদর্শন করতো, তার ভেতরে এই যুক্তিটি ছিল অত্যন্ত প্রবল যে, তুমি বলছো মানুষকে হেদায়াত করার জন্য আল্লাহ তোমার কাছে কোরআন অবতীর্ণ করে থাকেন। মানুষকে হেদায়াত করার আল্লাহর যদি এতই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কেন কোরআনকে পরিপূর্ণ আকারে একটি গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থবদ্ধ করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন না ? এভাবে বিরতি দিয়ে অল্প অল্প করে কেন অবতীর্ণ করছেন ? তাহলে আল্লাহকে কি মানুষের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সময় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয় ? অথবা বিরোধিদেরকে যা শুনানো হবে এ সম্পর্কে চিন্তা করে কথা বলতে হয় ?

আসলে তুমি যা বলছো, এসব আল্লাহর বাণী মোটেও নয়। যদি এটা আল্লাহর বাণীই হতো, তাহলে তিনি পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ প্রেরণ করতেন। তুমি যেভাবেই সক্ষম হয়ে থাকো না কেন, সময় নিয়ে সাধনা করে স্বয়ং তুমি অথবা তোমার কোন অদৃশ্য সহযোগী এ কোরআন রচনা করে আমাদেরকে শুনাচ্ছো। অবিশ্বাসীদের এসব অবান্তর কথার জবাব এবং সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটানোর জন্য সূরা বনী ইসরাঈলের ১০৬ আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلاً–

আর কোরআনকে আমি সামান্য সামান্য করে অবতীর্ণ করেছি। যেন তুমি বিরতি দিয়ে তা মানুষদেরকে শুনিয়ে দাও এবং তাকে আমি (বিভিন্ন সময়) পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেছি।

ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী আল্লাহর রাসূলকে অভিযুক্ত করতো যে, স্বয়ং তিনি এ কোরআন রচনা করেছেন। তাদের এ ভিত্তিহীন কথার জবাবও আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আদ দাহারের ২৩ আয়াতে এভাবে দিয়েছেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلاً–

হে নবী ! আমিই তোমার প্রতি এ কোরআন অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি।

কোরআনের সত্যতার ব্যাপারে তারা প্রশ্ন তুলে বলতো, যদি এটা আল্লাহর কিতাবই হয়ে থাকে, তাহলে সমগ্র কিতাবটি একই সময়ে কেন অবতীর্ণ হচ্ছে না ? নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি চিন্তা-গবেষণা করে অথবা অন্য কারো কাছ থেকে জেনে নিয়ে এবং নানা ধরনের গ্রন্থ থেকে নকল করে এনে আমাদেরকে তা শুনাচ্ছে। আল্লাহ মানুষকে বর্তমান ও ভবিষ্যতে কি বলবেন, তা তো তিনি অবগত আছেন। এটা যদি আল্লাহর বাণী হতো, তাহলে তিনি তা একত্রে অবতীর্ণ করতেন। এই যে চিন্তা-ভাবনা করে বিরতি দিয়ে নতুন নতুন বিষয় আমাদের সামনে পরিবেশন করা হচ্ছে–এটাই হলো বড় প্রমাণ যে এটা আল্লাহর বাণী নয়; তাঁর ওপরে কোন ওহী আসছে না। তিনি স্বয়ং রচনা করছেন অথবা কেউ তাকে সরবরাহ করছে। মূর্খতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত এসব কথার জবাবে আল্লাহ বলেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً-كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا-

অস্বীকারকারীরা বলে, 'এ ব্যক্তির কাছে সমগ্র কোরআন একত্রে কেন অবতীর্ণ করা হলো না ?' হ্যাঁ, এমন করা হয়েছে এ জন্য যে, যেন আমি একে ভালোভাবে তোমার মনে গেঁথে দিতে থাকি এবং (এ লক্ষ্যে) একে একটি বিশেষ ক্রমধারানুযায়ী পৃথক পৃথক অংশে সজ্জিত করেছি। (সূরা আল ফুরকান—৩২)

এ কথা মনে রাখতে হবে, নবী ছিলেন স্বয়ং নিরক্ষর। যাদের ভেতরে কোরআন অবতীর্ণ হলো তারাও ছিলেন অক্ষর জ্ঞানহীন জনগোষ্ঠী। নিরক্ষর এই জনগোষ্ঠীকে দিয়েই আল্লাহ পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয় বিরাট একটি আদর্শিক বিপ্লব ঘটিয়ে ছিলেন যে বিপ্লবের প্রভাব কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এই নিরক্ষর মানুষগুলোই পৃথিবীর পরিবেশ পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং নেতৃত্ব ছিল তাঁদেরই হাতে। আর কোরআন দিয়ে তাঁরা তা সম্ভব করেছিলেন। সুতরাং নিরক্ষর সেই মানুষগুলোর মাধ্যমে নিকট ভবিষ্যতে যে কিতাব দিয়ে বিপ্লব ঘটানো হবে, সেই কিতাব একত্রে তাঁদের কাছে প্রেরণ করা হলে, তাঁরা তা স্মৃতির কোষাগারে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হতেন না। স্মৃতির ভান্ডারে আল্লাহর কোরআন যেন হুবহু সংরক্ষিত হয়, এ জন্য তা বিরতি দিয়ে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

বর্তমান যুগের ন্যায় সে যুগে প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের কোন আধুনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বর্তমানের কোন আন্দোলনের দিক নির্দেশনা আন্দোলনের কর্মীদের কাছে লিখিত আকারে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সে যুগে কোন নির্দেশ পৌঁছানো হতো মৌখিক আকারে। যে লোকগুলোকে বাছাই করে সর্বাত্মক বিপ্লব ঘটানোর উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছিলো, তাদের সামনে একত্রে আদর্শ পেশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত ছিল না। এ জন্য পূর্বে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তা অন্তরে ধারণ ও পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করিয়ে এবং আন্দোলনের কর্মীদের তা পালনের অভ্যাসে পরিণত করিয়ে পরবর্তী নির্দেশনামা অবতীর্ণ করা হচ্ছিলো। এ পদ্ধতিকেই বর্তমানে বলা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং তখন তাই অবলম্বন করা হয়েছিল।

যে কোন আদর্শের ওপরে কোন ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করলে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে সময়ের প্রয়োজন হয়। রাতারাতি কোন ব্যক্তির চরিত্রে আমূল পরিবর্তন যেমন ঘটানো যায় না এবং তা কোনক্রমে সম্ভবও নয়। যাঁদেরকে সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে কোরআন দিয়ে গড়া হচ্ছিলো এবং সমগ্র মানব জাতির সর্বকালের শিক্ষক হিসাবে যাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছিল, সেই সাহাবায়ে কেরামও মানুষ ছিলেন। তাঁরা কোন সমাজের ছিলেন এবং সে সমাজ কোন স্তরে অবস্থান করছিল, ইতিহাসের পাঠক মাত্রই তা অবগত রয়েছেন। সেই মানুষগুলোকে পরিপূর্ণভাবে গড়া একদিনে সম্ভব ছিল না একং তাঁরা যেন কোরআনের শিক্ষাসমূহ ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন, এ জন্য অল্প অল্প করে কোরআন অবতীর্ণ করে তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিলো।

আল্লাহর কোরআন মানুষের রচনা করা শোষণমূলক কোন আদর্শের মতো মানব জাতির ওপরে সমগ্র শক্তিতে একই সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এ কোরআন সর্বপ্রথমে মানুষের চিন্তার জগতে সর্বাত্মক বিপ্লব সংঘটিত করে। আর এ বিপ্লবও একদিনে সংঘটিত হয় না। তা পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে হতে থাকে। কেননা মানুষের চিন্তা-চেতনা নামক জগতের গঠন প্রণালী অত্যন্ত জটিল এবং বিচিত্র ধরনের। শক্তি প্রয়োগ করে মানুষের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসবোধের পরিবর্তন সাধন করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ জন্য কোরআন যে জীবন পদ্ধতি পেশ করে, তার ওপরে মানুষের মন স্থির করার প্রয়োজন ছিল। এ জন্য নির্দেশ ও বিধানসমূহ পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করাটাই ছিল বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি। কোরআন সে পদ্ধতিতেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ পদ্ধতি অবলম্বন না করে যদি সমস্ত আইন-কানুন এবং গোটা জীবন ব্যবস্থা একত্রে মানুষের সামনে পেশ করে তা প্রতিষ্ঠিত করার ও অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হতো, তাহলে মানুষের ভেতরে যেমন বিদ্রোহের প্রবণতা দেখা দিত তেমনি তার চেতনার জগতে বিরাজ করতো এক মহাবিশৃংখলা।

আইন অনুসরণকারীদের জন্য সমস্ত বিধান তার ধারা-উপধারাসহ একত্রে পেশ করলে তা অনুসরণের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখা দেবেই। এ জন্য প্রতিটি আইন উপযুক্ত পরিবেশে ও যথাসময়ে জারি করা প্রয়োজন। এভাবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয় এবং আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা অত্যন্ত সহজ হয় এবং এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্যই পবিত্র কোরআন দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নানা পর্যায়ে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

ইসলামী আন্দোলন কোন ফুল শয্যার নাম নয়, এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়—কন্টকাকীর্ণ। এ আন্দোলন সফল হওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় সীমাও নেই। এই আন্দোলনে যাঁরা জড়িত থাকেন, তাঁদেরকে অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, অকল্পনীয় কোরবানী দিতে হয়। বিরোধী শক্তির সাথে তাঁদেরকে প্রতি পদক্ষেপে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হয়। ক্ষেত্র বিশেষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রাণ দান করতে হয়। আন্দোলন সফল হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত এসব পরিস্থিতি শুধুমাত্র একবারই যদি সৃষ্টি হতো, তাহলে নেতা-কর্মীদের মনে সাহস সঞ্চার করার মতো উপদেশ, দৃষ্টান্ত, উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক একটি কিতাব তাদের কাছে পেশ করলেই চলতো। পক্ষান্তরে, এই আন্দোলন করতে গিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যে ধরনের পরিস্থিতি পরিবেশের মোকাবেলা করতে হবে, তা সবই রাসূলের সেই তেইশ বছরে প্রকাশিত হয়েছিল—যে তেইশ বছর তিনি আন্দোলন করেছিলেন। এ জন্য দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী এ কোরআন আল্লাহর নবীর ওপরে অবতীর্ণ হয়েছে।

আন্দোলনের কর্মীগণ যখন বিরোধী পক্ষের সাথে সংঘাতে জড়িত থাকে, তখন তাদের মনে সাহস সঞ্চার করা হয় আন্দোলনের পরিচালকদের পক্ষ থেকে। প্রথম অবস্থায় কর্মীগণ মনে করে সে প্রবল এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মোকাবেলা করছে। এ অবস্থায় যদি তাদের কাছে মাঝে মাঝে পথনির্দেশ আসতে থাকে তখন তাদের মনে এ ধারণা জাগ্রত থাকে যে, যাঁর নির্দেশে এবং সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সে জীবন বাজি রেখে আন্দোলন করছে, তিনি নীরবে বসে না থেকে

তাদের ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তারা যে প্রক্রিয়ায় আন্দোলনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করছেন এবং তাদের সমস্যা ও সংকটে পথ প্রদর্শন করছেন। এ কাজে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে বলে বার বার ঘোষণা দান করছেন এবং তাদের সাথে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক স্থাপন করবেন বলে জানিয়ে দিচ্ছেন। এ প্রক্রিয়ায় আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মনে বিপুল সাহস ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং সংখ্যায় অতি অল্প হলেও তাঁদের শক্তি হয় অপ্রতিরোধ্য। তাঁরা তখন তাঁদের অভিধান থেকে 'পরাজয়' শব্দটি মুছে ফেলে।

রাসূলের সময়ও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল। সাহাবাগণ ময়দানে প্রতিটি মুহূর্তে জিহাদে লিপ্ত থেকেছেন, অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং অবশেষে নিজের প্রাণ পর্যন্ত দান করেছেন। এ সময়ে তাঁদের মন-মানসিকতা যেসব কথা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ওহীর মাধ্যমে তাই শুনিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ফোরকানে বলেছেন, 'কোরআনকে একটি বিশেষ ক্রমধারানুযায়ী পৃথক পৃথক অংশে সজ্জিত করেছি।' কেন এমন করেছেন, সে জবাবও আল্লাহ দিয়েছেন-

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَٰكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا-

আর (এর মধ্যে এ কল্যাণকর উদ্দেশ্যেও রয়েছে যে) যখনই তারা তোমার সামনে কোন অভিনব কথা (অথবা অদ্ভূত ধরনের প্রশ্ন) নিয়ে এসেছে তার সঠিক জবাব যথাসময়ে আমি তোমাকে দিয়েছি এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছি। (সূরা ফোরকান-৩৩)

কোরআন কেন পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে, তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত আরেকটি কারণ স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। এ কিতাব অবতীর্ণ করার কারণ এটা নয় যে, মানব জাতির জন্য জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ রচনা করবেন এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে গ্রন্থ প্রচারের লক্ষ্যে পৃথিবীতে নির্বাচিত করেছেন। প্রকৃত পক্ষে বিষয় যদি সেটাই হতো, তাহলে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রণয়ন শেষ করেই তা নবীর হাতে উঠিয়ে দেয়ার দাবী যুক্তিযুক্ত হতো। আসলে বিষয়টি সেটা নয়। প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ তা'য়ালা শির্ক, কুফর, মূর্খতা, অজ্ঞতা, অন্যায়, অসত্য ইত্যাদির মোকাবেলায় ঈমান, ইসলাম, আনুগত্য ও আল্লাহভীতির একটি আন্দোলন পরিচালনা করতে চান এবং এ লক্ষ্যেই তিনি মানুষের ভেতর থেকে একজন সর্বোৎকৃষ্ট মানুষকে নির্বাচিত করে তাঁকে নবুয়্যত দিয়ে আন্দোলনের আহ্বায়ক ও নেতা হিসাবে মানুষের সামনে প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামী আন্দোলনের নেতা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন এবং আন্দোলন বিরোধিরা যখনই কোন আপত্তি বা সন্দেহ অথবা জটিলতা সৃষ্টি করবে তখনই তিনি তা দূরীভূত করে দেবেন এবং শত্রুপক্ষ কোন কথার ভুল অর্থ করবে তখনই আল্লাহ তার সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে দেবেন। নবীর দীর্ঘ তেইশ বছরের আন্দোলনের জীবনে এ ধরনের অসংখ্য বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে আর এসব অবস্থার মোকাবেলার জন্য যেসব ভাষণ

আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর সমষ্টির নামই হলো আল কোরআন। কোরআন একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের কিতাবের নাম। আর কোরআন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিও কোরআনের স্বভাব ও প্রকৃতিতে বিদ্যমান। আর সে স্বভাব হলো, কোরআনের আন্দোলনের সূচনা লগ্ন থেকে তার সূচনা করতে হবে। এ আন্দোলন সমাপ্তি পর্যন্ত যেভাবে অগ্রসর হতে থাকবে কোরআনও সাথে সাথে প্রয়োজন অনুসারে দিক নির্দেশনা দিতে থাকবে।

ওহীর সূচনা ও অবতীর্ণ হবার পদ্ধতি

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে ওহীর সূচনা পূর্বে প্রায়ই তিনি নির্জনতা অবলম্বন করতেন। যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে তিনি চিন্তায় অস্থির থাকতেন, এসব সমস্যার সমাধান আল্লাহ তাকে ওহীর মাধ্যমে দান করবেন। সুতরাং ওহী নাজিলের সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্জনতা অবলম্বন ততই বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তিনি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে একটা পাহাড়ে চলে যেতেন। সে পর্বতের হেরা নামক গুহায় বিশেষ ইবাদাতে নিমগ্ন হয়ে পড়তেন। এ সময়ে তিনি সত্য এবং সুন্দর স্বপ্ন দেখতেন। তিনি এমন স্বপ্ন দেখতেন তা যেন মনে হত তিনি তা বাস্তবে দেখছেন। পর্বতের গুহায় তিনি ইবাদাতের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। বোখারী শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, হেরা গুহায় তিনি যে ইবাদাত করতেন তা ছিল চিন্তা গবেষণা ও উপদেশ গ্রহণ করা।

তিনি বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যেতেন অথবা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা স্বয়ং গিয়ে দিয়ে আসতেন বা লোক মারফত প্রেরণ করতেন। কোন সময় কয়েকদিনের খাবার তিনি একত্রে নিয়ে যেতেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেছেন, মহান আল্লাহ যে সময়ে তাকে অনুগ্রহ করে মানব জাতির জন্য নবী নির্বাচিত করলেন তখন তিনি নবুয়্যতের একটা অংশ হিসাবে নির্ভুল স্বপ্ন দেখতেন। এ সময়ে মহান আল্লাহ তাঁকে নির্জন বাসের প্রতি গভীর আগ্রহী করে তোলেন। তখন তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা দিনের আলোর মতই বাস্তবে পরিণত হত। একাকী কোন নির্জন স্থান সে সময়ে তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আরেকটি বর্ণনায় দেখা যায়, নবুয়্যতের সূচনা লগ্নে তিনি বাইরে বের হলেই কোন নির্জন উপত্যকায় বা কোন নির্জন সমভূমিতে চলে যেতেন। সে সময়ে তিনি কোন জড়পদার্থের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেতেন, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ !

এ কথা শোনার সাথে সাথে তিনি চমকে উঠে তাঁর চারদিকে তাকিয়ে সালাম দাতার সন্ধান করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর আশেপাশে গাছ পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না। এভাবেই সময় তখন অতিবাহিত হচ্ছিল। গবেষকদের ধারণা, তিনি যেন ওহী এবং হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে ধারণ করতে সক্ষম হন, এ কারণেই নবুয়্যতের পূর্বে কিছুদিন মহান আল্লাহ এ অবস্থা সৃষ্টি করে তাঁর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন। হাদীস শরীফে দেখা যায়, যে সময়ে তিনি নির্জনতা অবলম্বন করতেন তখন তিনি প্রচুর দান করতেন। অভাবীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করতেন। বাড়িতে ফিরে আসার পথে কা'বাঘরে এসে তিনি সাতবার বা

ততোধিক বার তাওয়াফ করতেন তারপর বাড়িতে যেতেন। এ সময়ে বিশ্বনবী যে সমস্ত স্বপ্ন দেখতেন তা শুধুমাত্র সে সময়ের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ ধরণের স্বপ্ন নবুয়্যত লাভের পরেও তিনি তাঁর জীবনে বহুবার দেখেছেন। হাদীসে কুদসী নামে যে হাদীসগুলো রয়েছে, তা অনেকই এ পর্যায়ভুক্ত। নবী ও রাসূলগণ যে স্বপ্ন দেখেন তা যে সম্পূর্ণরূপে সত্যের সাথে সামস্যপূর্ণ এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ-

বস্তুত আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে প্রকৃতই সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণরূপে সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। (সূরা আল ফাত্হ-২৭)

এ ছাড়াও বিশ্বনবীর মনে বিভিন্ন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নানা কথার সৃষ্টি করে দেয়া হত। রমজান মাসে তিনি হেরা গুহায় চলে গেলেন। এরপর সেই মহান রাত বিশ্বমানবতার সামনে এসে উপস্থিত হলো, যে রাতে নির্ভুল জীবন বিধান বিশ্বনবীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হতে থাকলো। সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এ সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে আমার সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছে ছিল একখন্ড রেশমী কাপড়। সে কাপড়ে কিছু লেখা ছিল। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আমাকে বললেন, 'পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম আমি পড়তে পারি না। তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর সে আলিঙ্গন এমন ছিল যে, আমার মনে হলো আমার প্রাণ বায়ু নির্গত হবে। তিনি আমাকে পুনরায় বললেন, 'পড়ুন'। আমি পূর্ববৎ বললাম, আমি পড়তে পারিনা। তিনি সেই আগের মতই আমাকে এমন জোরে জড়িয়ে ধরলেন যে, এবারেও আমার ধারণা হলো আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। আবারও তিনি আমাকে আদেশ করে বললেন, 'পড়ুন'। এবার আমি বললাম, আমি কি পড়বো ? তিনি বললেন–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ-خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ-اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ-الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ-

পড়ুন আপনার রবের নাম সহকারে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের এক পিন্ড হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন, আর আপনার রব্ব খুবই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা সে অবগত ছিল না।' (আ'লাক)

আল্লাহর রাসূল বলেন, 'তিনি যা পড়লেন আমিও তাঁকে তা পড়ে পড়ে শোনালাম। তখন তিনি বিদায় নিলেন। তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি জাগ্রত হলাম। তখন আমার উপলব্ধি হলো সমস্ত ঘটনাটি এবং যা আমাকে পড়ানো হয়েছিল তা আমার স্মরণে জাগরুক হয়ে আছে।' ঐতিহাসিক এবং গবেষকগণ বলেন, বিশ্বনবীর সাথে বাস্তবে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম যে আচরণ করবেন সে আচরণ তাঁর ঘুমের ভেতরে করার অর্থ হলো তা

ছিল ঘটিতব্য ঘটনার ভুমিকা। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, এরপর আল্লাহর নবী সে পাহাড়ের গুহা থেকে বের হয়ে এলেন। পাহাড়ের মাঝামাঝি অবস্থানে আসার পরে তিনি তাঁর মাথার ওপর থেকে এক অশ্রুত কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তাকে ডেকে বলা হচ্ছে, 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরাঈল!'

এ কণ্ঠ শ্রবণ করে তিনি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম একজন অপূর্ব সুন্দর মানুষের আকৃতি ধারণ করে আছেন, কিন্তু তাঁর দুটো পাখা রয়েছে এবং সে পাখা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি পুনরায় বললেন, 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরাঈল !' তিনি হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। এরপর তিনি আকাশের যেদিকেই দৃষ্টি দিলেন সেদিকেই তাকে দেখতে পেলেন। সমস্ত আকাশ জুড়েই জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহর নবী বিরাজ করতে দেখলেন। তিনি অবিচল থেকে সেই দৃশ্য দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখতে থাকলেন এবং অবস্থায় তিনি তাঁর কদম মোবারক কোন দিকেই নড়াতে পারছিলেন না।

তিনি দেখছিলেন তাঁর সন্ধানে তাঁর সহধর্মিনী লোক প্রেরণ করেছে, সে লোক তাঁর সন্ধান করছে কিন্তু তিনি সে লোককে বলতে পারলেন না তাঁর নিজের অবস্থানের কথা। লোকটি ফিরে চলে গেল। এরপর আকাশে আর কোন দৃশ্য দেখলেন না। তিনি ভীত কম্পিত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে গেলেন এবং হযরত খাদিজাকে বললেন, 'আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও! আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও!' হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ভীত কম্পিত অবস্থার অবসান হলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'হে খাদিজা! আমার এ কি হলো!' তারপর তিনি সমস্ত ঘটনা তাঁর স্ত্রীকে শুনিয়ে বললেন, 'আমার নিজের জীবনের ভয় হচ্ছে।'

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'অসম্ভব! বরং আপনি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহর শপথ! আপনাকে আল্লাহ কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি সব সময় সত্য কথা বলেন এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করেন, তাদের হক আদায় করেন। মানুষের আমানত প্রত্যার্পণ করেন। অসহায় মানুষের বোঝা নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেন। গরীবদেরকে নিজে উপার্জন করে সাহায্য করেন। মেহমানের হক আদায় করেন এবং উত্তম কাজে সহযোগিতা করেন।' এভাবেই রাসূলের ওপরে প্রত্যক্ষ ওহীর সূচনা হয়েছিল।

এরপরে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আল্লাহর রাসূলকে সাথে করে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন। এ লোক ছিলেন বয়সে বৃদ্ধ ও অন্ধ। তিনি ছিলেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার চাচাত ভাই। তিনি পৌত্তলিকতা সহ্য করতে না পেরে পরবর্তীতে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী এবং হিব্রু ভাষায় ইন্জিল লিখতেন। হযরত খাদিজা তাকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। তিনিও আল্লাহর রাসুলকে প্রশ্ন করে সমস্ত ঘটনা জেনে নিলেন। সবকিছু শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'এ তো সেই ফেরেশতা যাকে মহান আল্লাহ্

হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আফসোস! আপনার নবুয়্যত যুগে আমি যদি যুবক থাকতাম ! আফসোস! আপনার জাতি যখন আপনাকে বহিষ্কৃত করবে ! সে সময়ে যদি আমি জীবিত থাকতাম !' তাঁর এ সমস্ত কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন, 'আমার জাতি আমাকে বের করে দেবে?' ওয়ারাকা ইবনে নওফেল জানালেন, 'অবশ্যই বের করে দেবে ! আপনার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, এ দায়িত্ব যার ওপরেই অর্পিত হবে অথচ তাঁর সাথে শত্রুতা করা হবে না, এমন কখনো হয়নি। সে সময় পর্যন্ত আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবো।' গবেষকগণ বলেছেন, সাধারণতঃ বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, তাঁকে নবুয়্যত দান করা হয়েছিল চল্লিশ বছর বয়সে। কিন্তু গবেষণায় প্রমাণ হয়, তাঁর আগমন ঘটেছিল হস্তী বছর রবিউল আউয়াল মাসে। আর তাঁকে নবুয়্যত দান করা হয়েছিল হস্তী বছর হিসাবে রমজান মাসে। এ হিসাবে প্রথম ওহী অবতীর্ণের সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর ছয় মাস।

পবিত্র কোরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে ওহীর মাধ্যমে। মানবীয় মন-মস্তিষ্ক; হৃদয়ের ক্ষেত্র আল্লাহর ওহী ধারণ করার জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। নবী ও রাসূলদের ওপরে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, সেই সাথে আল্লাহ তা'য়ালা ওহী ধারণ করার যোগ্যতা তাঁদের ভেতরে সৃষ্টি করেছেন। তাঁদেরকে সেই শক্তিদান করা হয়েছে, যে শক্তি ওহী ধারণ করার জন্য প্রয়োজন। 'ওহী' আরবী শব্দ, এর অর্থ হলো গোপন ইঙ্গিত। শরিয়তের পরিভাষায় ওহী বলতে বুঝানো হয়, যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের অন্তরে প্রবেশ করানো হয় বা ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়। এ কারণে নবীদের অন্তরে বিশ্বাস এমন দৃঢ় হয় যে, সাধারণ মানুষের থেকে সে বিশ্বাসের মর্যাদা পৃথক। তাঁকে মহান আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে যে বাণী প্রেরণ করা হলো এ সম্পর্কে নবীর অন্তরে সামান্যতম দ্বিধা থাকে না। আরেক কথায় বলা যায়, জ্ঞান বৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমের নাম হলো ওহী যা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং তা শুধু মাত্র নবী রাসূলদের জন্য নির্দিষ্ট। এর সম্পর্ক সরাসরি আলমে কুদস্ এবং আলমে গায়েবের সাথে।

ওহী কিভাবে অবতীর্ণ হয় তা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। আল্লাহর নবী এ সম্পর্কে বলেছেন, 'কখনো তা আমার কাছে মনে হয় যে, ঘন্টার শব্দ অবিরাম গুঞ্জন সৃষ্টি করছে, আবার কখনো মৌমাছীর গুঞ্জনের ন্যায়, আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে এসে আমাকে শোনায় আমি শুনি আল্লাহ আমার অন্তরে তা সুরক্ষিত করে দেন।' বিশ্বনবীর কথায় ওহী অবতীর্ণের অবস্থাকে যেভাবে উপমার মাধ্যমে বা ফেরেশতার আগমনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে, তা মানুষের বোধশক্তির কাছাকাছি হলেও এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, প্রকৃত অবস্থা মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কোন মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে না।

যতদূর উপলব্ধি করা যায় ওহী অবতীর্ণের সময় প্রকৃত অবস্থা যে কি হয় তা বুঝিয়ে বলা নবীর আয়ত্বের বাইরে। তাই বলে এটা নবীর অক্ষমতাও নয়। যেমন, যে ব্যক্তি সাগরের অতল তলদেশে বিশেষ পোশাক পরিধান করে অবতরণ করে, সেখানে তাঁর প্রকৃত অবস্থা কেমন হয়

তা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সে প্রকাশ করে তাদের কাছে, যারা কোনদিন সাগরের তলদেশে অবতরণ করেনি। কিন্তু পানির নিচে সে যে অবস্থা উপলব্ধি করে, তাঁর সে উপলব্ধি বোধটাকে সে আরেকজনের ভেতরে সংক্রমিত করতে পারে না। তেমনি নবীগণ ওহী অবতীর্ণের সময় কেমন অবস্থার সৃষ্টি হয় তা বর্ণনা করতে পারেন কিন্তু তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি বোধটাকে তো আর শ্রোতার মনে প্রবেশ করাতে পারেন না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেছেন যে, 'এবং ওহীর এ অবস্থাটা আমার ওপর ভীষণ কঠিন বোধ হতে থাকে। পুনরায় যখন এই কষ্টকর অবস্থার অবসান ঘটে তখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যা বলা হয়ে থাকে তা আমার মনের মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে যায়।' ফেরেশতা যখন মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসেন বা পর্দার আড়াল থেকে মহান আল্লাহর সাথে কথা হয় সে সময়ের অবস্থা হয় খুব সহজ। কিন্তু ওহী অবতীর্ণ করার প্রথম অবস্থা অর্থাৎ ওহী যখন মৌমাছির গু নের মত বা ঘন্টার অবিরাম শব্দের মত আসতে থাকে তখন ভীষণ কষ্ট অনুভব হয়। প্রশ্ন হলো এমন কেন হয়?

এ সম্পর্কে গবেষকগণ ধারণা করেন, 'মহান আল্লাহ মানুষকে মানুষের আবশ্যকীয় শর্ত ও স্বভাব চরিত্রের সাথে এমনভাবে জড়িত করে দিয়েছেন যে, নবী ও রাসূলদের মত পবিত্র এবং নিষ্পাপ সত্তাও নিজেদের সমস্ত পবিত্রতা থাকার পরেও মানবীয় প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে উপায় থাকে না। এ কারণে তাদের ওপরে যখন ওহী অবতীর্ণ হয় সে সময়ে তাদেরকে সেই উর্ধ্বজগতের প্রভাব আচ্ছন্ন করে রাখে এবং আল্লাহর নূরের ছায়ায় তাঁরা মহান আল্লাহর কথা গ্রহণ করেন।'একদিকে তাঁরা মানবীয় দেহধারী অপরদিকে তাঁরা আল্লাহর নূরের ছায়ায়–এ কারণে তাদের ওপরে উভয় জগতের প্রভাব নিপতিত হয়। সে সময়ে তাদের মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে দমন করে তাঁকে এমন এক জগতের উপযোগী করা হয় যে, তাঁরা যেন ওহী শ্রবণ এবং ধারণ করতে সক্ষম হন।

মানুষ নবীর মানবীয় বৈশিষ্ট্য অবদমিত করে তাকে যখন আল্লাহর নূরের জগতের উপযোগী করা হয় তখন তাঁর ভেতরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেটাই হলো মানুষের চর্ম চোখে অস্থিরতা, নবীর কাছে তখন সেটাই কষ্টানুভব হয়। সেই কষ্টের অবসান যখন হয় তখন নবীকে সেই জগতের যাবতীয় পবিত্রতা আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তিনি তখন অপূর্ব শান্তি অনুভব করেন। যে সময়ের ভেতরে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় সে সময়টুকু হয় ক্ষণস্থায়ী।

ওহী অবতীর্ণের বিশেষ অবস্থায় যখন মানবসুলভ অনুভূতি ও বোধ শক্তির ওপর উর্ধ্বজগতের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, তখন মানবদেহে এক ধরণের অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। সে সময় নবীর শ্রবণ শক্তির সম্পর্ক স্থাপন হয় ওহী শ্রবণের সাথে, তখন তাঁর কাছে এ জড়জগতের কোন শব্দ স্থান পায় না। প্রথম প্রকারের ওহী অবতীর্ণের সময় নবীর যে অবস্থা হত এই অবস্থাকে ইউরোপিয় গবেষকগণ রোগ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেই শিশুকাল হতেই মৃগীরোগী। এ রোগ তাঁর মাঝে মধ্যেই দেখা দিত।' তাদের কথা যে কত বড় মিথ্যা তা তারা জেনে বুঝেই শুধুমাত্র ইসলাম

এবং মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য লিখেছেন। হযরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার বাড়িতে অবস্থানকালে শিশু নবীর যে বক্ষবিদারণ করা হয় তখন থেকে নাকি তাঁর এ রোগের সৃষ্টি। আমাদের বক্তব্য হলো, সে সময়ে আল্লাহ নবীর বয়স ছিল পাঁচ বছর। ঐ পাঁচ বছর বয়সেই শুধুমাত্র একবার সে রোগ দেখা দিল আর মাঝের ৩৫ বছর দেখা দিল না, ঠিক যখন তিনি নবুয়্যত লাভ করলেন ৪০ বছর বয়সে, তখন পুনরায় সে রোগ দেখা দিল, এ সমস্ত প্রশ্ন ইসলাম বিদ্বেষী গবেষকদের মনে জাগেনি কেন ? প্রকৃতপক্ষে জেনে বুঝেই, বিশ্বনবীর নবুয়্যতকে অস্বীকার এবং ইসলামকে কোন ঐশী বিধান হিসাবে স্বীকৃতি না দেবার লক্ষ্যেই তাঁরা বিশ্বনবীর ওপরে মৃগী রোগের অপবাদ চাপানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী ও রাসূলদের ওপরে ওহী নাযিল করেছেন ফেরেশ্তার মাধ্যমে। স্বয়ং আল্লাহ কোন নবী বা রাসূলের সাথে দেখা করে ওহী দান করেন না, এটা আল্লাহর নিয়ম নয় এবং কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় তাঁকে দেখা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْمِنْ وَّرَائِ حِجَابٍ اَوْيُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ–

কোন মানুষই এ মর্যাদার অধিকারী নয় যে, আল্লাহ তার সাথে প্রত্যক্ষভাবে কথা বলবেন। তিনি কথা বলেন হয় ওহীর মাধ্যমে, পর্দার আড়াল থেকে অথবা তিনি কোন বার্তাবহক প্রেরণ করেন এবং সে তাঁর আদেশে তিনি যা চান ওহী হিসেবে দেয়। (সূরা আশ্ শুরা–৫১)

পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার অর্থ হলো, বান্দা শব্দ শুনতে সক্ষম কিন্তু শব্দদাতাকে দেখতে সক্ষম নয়। হযরত মুছার সাথেও এ প্রক্রিয়াতেই আল্লাহ কথা বলেছিলেন। তূর পাহাড়ের পাদদেশ অবস্থিত একটি বৃক্ষ থেকে হঠাৎ তিনি আহ্বান শুনতে পেলেন। কিন্তু যিনি কথা বললেন, তিনি তাঁর দৃষ্টির আড়ালেই রয়ে গেলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ তেইশ বছর ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত করে সফলতা অর্জন করেছিলেন। এ সময়ে আল্লাহর বিধান সম্পর্কিত কোন কথা নিজের প্রবৃত্তি থেকে তিনি বলেননি। যা বলেছেন তা ওহীর ভিত্তিতেই বলেছেন। সূরা নাজমে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى–اِنْ هُوَاِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى–

তিনি নিজের প্রবৃত্তি থেকে কথা বলেন না, এ তো একটা ওহী–যা তাঁর ওপরে অবতীর্ণ করা হয়।

ময়দানে ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত করার ক্ষেত্রে যখন যে নিদের্শের প্রয়োজন তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই ওহীর মাধ্যমে রাসূলের কাছে অবতীর্ণ করা হতো। রাসূলের কাছে যে কোরআন অবতীর্ণ হতো, তার ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসূলই করতেন। এ ক্ষেত্রেও রাসূল তাঁর চিন্তাধারা অনুসারে কোরআনের ব্যাখ্যা করেননি। বরং কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও তিনি ওহীর

মাধ্যমেই অবগত হতেন। যদিও রাসূলের ব্যাখ্যার প্রতিটি শব্দ কোরআনের মতো ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণককৃত শব্দ নয়। কিন্তু তিনি যে জ্ঞান দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা দিতেন, সে জ্ঞানও ওহীর উৎস থেকে লাভ করা জ্ঞান ছিল এবং তা ছিল ওহীর উৎসের ওপরই ভিত্তিশীল। রাসূলের এসব ব্যাখ্যা ও আল্লাহর কোরআনের মধ্যে শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, কোরআনের শব্দ, ভাষা, অর্থ ও বক্তব্য সমস্ত কিছুই হলো আল্লাহর বাণী এবং তিনিই তা প্রেরণ করেছেন। আর রাসূলের কথার মূল ভাবধারা, বক্তব্য ও বিষয় ছিল মহান আল্লাহরই শিখানো। আল্লাহর শিখানো বক্তব্য তিনি নিজের ভাষায় মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন। তাঁর এসব কথা ও বক্তব্য হাদীস নামে পরিচিত। তিনি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কোন কথা যদি বলতেন, তাহলে তাঁর সাথে স্বয়ং আল্লাহ কি ধরনের ব্যবহার করতেন এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেন–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ-لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ-ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ-

আমার নবী যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমার নামে চালিয়ে দিত, তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠ শিরা ছিন্ন করে ফেলতাম। (সূরা-হাক্কাহ্-৪৪-৪৬)

প্রথম ওহীর তাৎপর্য

বিশ্বনবীর প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, তা ছিল–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ-خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ-اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ-الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ-

পড়ো তোমার রব-এর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাটবাঁধা এক রক্তপিন্ড হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়ো, এবং তোমার রব অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের দ্বারা জ্ঞান শিক্ষাদান করেছেন। মানুষকে এমন জ্ঞানদান করেছেন যা সে অবগত ছিল না।'

এ সূরার নাম হলো 'আল্ আলাক', পবিত্র কোরআনের ত্রিশ পারার ৯৬ নং সূরা। এই সূরার ১ থেকে ৫ নং আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। এই আয়াতগুলোয় স্পষ্ট করে ঘোষনা করা হয়েছে, মহান আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির ভেতরে মানুষ হলো সর্বোত্তম সৃষ্টি এবং পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত সৃষ্টি এবং এ কারণে মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা। মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতা এটাই যে, তাঁর আগমনের সূচনা হলো অপবিত্র পানি এবং জমাটবাঁধা রক্ত থেকে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্ যখন তাকে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং সর্ব 'নিম্ন পর্যায়ের' সৃষ্টিকে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তাকে এমন গুণ দান করলেন যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা শ্রেষ্ঠগুণ। তাকে জ্ঞান নামক গুণের প্রকাশ ক্ষেত্র হিসাবে প্রস্তুত করলেন। তাকে কলমের মাধ্যমে লেখা শিক্ষা দান করলেন। সব ধরনের জ্ঞান ও আবিষ্কারের ক্ষমতা দান করলেন।

আবার মানুষকে এটাও উপলব্ধি করালেন যে, উপায় ও উপকরণগত ধারায় জ্ঞান অর্জনের তিনটি মাত্র নিয়ম বিদ্যমান।

জ্ঞানার্জনের প্রথম প্রকারের মাধ্যম হলো, অন্তর জগৎ ও মেধার জগতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জন্মগতভাবে যে জ্ঞান প্রদান করা হয়, তা শব্দ, অক্ষর এবং চিত্র বা লেখনীর মুখাপেক্ষী নয়। ইলহামের মাধ্যমেই এভাবে মানুষ জ্ঞানার্জন করে। জ্ঞানার্জনের দ্বিতীয় মাধ্যম হলো কোন কিছু শুনে মুখে আবৃত্তি করে তা স্মরণে রাখা। জ্ঞানার্জনের এ পথ হলো জিহ্বার মুখাপেক্ষী, অক্ষর ও লেখনীর মুখাপেক্ষী নয়। জ্ঞানার্জনের তৃতীয় মাধ্যম হলো, অক্ষর ও লেখনীর দ্বারা। কিন্তু এটা এমন একটি মাধ্যম যে, এই মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের উল্লেখিত দুটো মাধ্যম ছাড়া এই তৃতীয় মাধ্যমকে জ্ঞানার্জনের একমাত্র মাধ্যম হিসাবে অবলম্বন করা যায় না। এ কারণে বলা হয়েছে, তিনি তোমাদেরকে কলমের মাধ্যমে জ্ঞান শিক্ষা দান করেছেন। কলমের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে হলে যেমন অন্তর জগৎ ও মেধার জগৎ প্রসারিত হতে হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় জিহ্বা দ্বারা আবৃত্তি করে তা স্মরণে রাখা।

ফেরেশতা বিশ্বনবীর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন, 'আপনি পড়ুন। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আমি পড়তে জানিনা।' ফেরেশতার কথা এটা ছিল না যে, আমি যা আবৃত্তি করছি, আমার সাথে অনুরূপ আপনিও করুন। এই বচন ভঙ্গী বা কথোপকথন থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় হযরত জিবরাঈল প্রথম ওহীর শব্দগুলো লিখিত আকারে তাঁর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। প্রথম ওহী যে তাঁর সামনে লিখিত আকারে ছিল তা বিশ্বনবীর কথার ভঙ্গীতেও প্রকাশ পায়। তিনি বলেছিলেন, আমি পড়তে জানি না। ওহী লিখিত না হলে তিনি এ কথা বলতেন না। ব্যাপারটা যদি শুধুমাত্র মুখের সাথে সম্পর্কিত হতো তাহলে তিনি হযরত জিবরাঈলের সাথে সাথে প্রথমেই আবৃত্তি করে যেতেন, কোন আপত্তি উত্থাপন করতেন না। মহান আল্লাহর প্রথম বাণী থেকে এ সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁকে নবুয়্যত দান করার পূর্বেই বিশেষ কোন প্রক্রিয়ায় তাঁর জ্ঞানের জগতে এ সত্য প্রবেশ করানো হয়েছিল, একমাত্র আল্লাহই হলেন রব বা প্রতিপালক। আল্লাহর এই রবুবিয়াত ছিল বিশ্বনবীর কাছে প্রকাশিত।

এ কারণেই দেখা যায় তিনি কোনদিন কোন মূর্তির কাছে সামান্য কোন প্রার্থনা করেননি। তিনি জানতেন যে, এই মূর্তিগুলো মানুষের রব্ব নয়, রব্ব হলেন একমাত্র আল্লাহ। এ সত্য তাকে অবগত করানো হয়েছিল বলেই তিনি মূর্তিকে প্রচন্ড ঘৃণা করতেন। তিনি ওহী আসার পূর্বেই একমাত্র আল্লাহকে রব্ব বলে জানতেন এবং তাঁকেই একমাত্র রব্ব হিসাবে মেনে চলতেন। এই রব্ব কি, এটা তাঁর কাছে পরিচিত ছিল ফলে প্রথম ওহীর ভেতরে নবীকে রব্ব-এর পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হয়নি। সরাসরি তাকে বলা হয়েছিল, আপনি আপনার রব্ব-এর নামে পড়ুন বা বিসমিল্লাহ বলে শুরু করুন। ঐ রব্ব-এর নামেই পড়ুন, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি কাকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন এ কথা তাঁর নবীকে বলা প্রয়োজন হয়নি এ কারণে যে, নবীর জ্ঞানের জগতে এ কথাগুলো পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছিল, দৃষ্টির আড়ালে এবং দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান আলোকিত সমস্ত পৃথিবীটা এবং এর ভেতরে

যা কিছু আছে, এ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। জমাটবাঁধা রক্ত যা ইতিপূর্বে ছিল তোমাদের দেহ নির্গত এক ফোটা অপবিত্র পানি। যাকে বিশেষ এক সময়ে জমাটবাঁধা রক্তে পরিণত করা হয়েছে, মাংস পিন্ডে পরিণত করে তার ভেতর অস্থি সংযোজন করে মানুষের আকৃতিদান করা হয়েছে। মানুষের প্রথম অবস্থা ছিল এক ফোটা অপবিত্র পানি, সেখান হতে সুন্দর মানুষ সৃষ্টি করে তাকে জ্ঞানের সঞ্জিবনী সূধা ঢেলে জ্ঞানের অলংকারে সজ্জিতকরণ সেই মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের প্রকাশ।

তাকে শুধু জ্ঞানই দান করা হয়নি, কলমের মাধ্যমে তাকে এমন এক জ্ঞান দান করা হয়েছে যে, অর্জিত জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তা সংরক্ষণের কৌশল ঐ মহান আল্লাহই তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেছেন। তিনি যদি তোমাদেরকে অলক্ষ্যে থেকে কলমের ব্যবহার শিক্ষাদান না করতেন, তাহলে তোমাদের জ্ঞানের জগতে বন্ধ্যাত্ব নেমে আসতো। তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারতে না। তোমরা ছিলে জ্ঞানহীন অচেতন, কিছুই তোমরা অবগত ছিলে না। তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে যখন তোমাদের নিয়ে আসা হয় সে সময়ে তোমাদের কোন চেতনাই ছিল না। তারপর তোমাদেরকে তিনটি জিনিষ দান করা হয়েছে। চোখ কান এবং মস্তিষ্ক। একটা দিয়ে দেখবে আরেকটা দিয়ে শুনবে এবং মাথা দিয়ে চিন্তা করবে। তোমার চিন্তার জগতে আমিই আবিষ্কারের সূত্রদান করি। যা তোমার কাছে আবৃত, অজানা-অজ্ঞাত ছিল, তা তোমাকে জানানোর ব্যবস্থা আমি করেছি। তোমরা একটা নতুন কিছু উদ্ভাবন করে এ ধারণা করো যে, এটা তোমারই কৃতিত্ব। প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, আমিই তোমার চিন্তার জগতে আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা এবং সূত্রদান করি। তুমি তোমার জ্ঞান দ্বারা কোন কিছুই করতে পারোনা। যতক্ষণ আমি তোমাকে সহযোগিতা না করি। তোমার এ জ্ঞান নেই, তুমি অনুভব করতে পারো না কিভাবে আমি তোমাকে জ্ঞানদান করি।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রথম বাণীতেই তাঁর রাসূলের ওপর কোন বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দেননি। তাঁর সামনে কাজের বিশাল তালিকাও পেশ করেননি। ওহী সম্পর্কে বিশ্বনবী ছিলেন অনভিজ্ঞ, প্রথম বার এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে ওহী সম্পর্কে অভিজ্ঞ করলেন যেন আগামী বার তিনি ওহী ধারণ করতে পারেন। মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতির জন্যও কিছুদিন তাঁকে সময় প্রদান করা হয়েছিল। প্রথমবার তাঁর পবিত্র স্বভাব প্রকৃতির ওপর যে প্রভাব নিপতিত হয়েছিল, তা যেন সহজ হয়ে যায়, এ কারণেও ওহীর বিরতি দেয়া হয়েছিল। প্রথম অবতীর্ণকৃত বাণীর তাৎপর্য হলো, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুয়্যত সম্পর্কে অর্থাৎ তিনি যে নবী হবেন এ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগত করা হলো, আপনাকে নবী হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে, সুতরাং আপনি সাধারণের থেকে ভিন্ন। আপনার জীবন এবং সাধারণ মানুষের জীবনে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান। একজন রাসূলের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আপনাকে তা পালন করতে হবে। অর্থাৎ নবুয়্যত সম্পর্কে বিশ্বনবীকে সজাগ করে তোলা হয়েছিল প্রথম ওহী অবতীর্ণ করে।

বিশ্বনবীর ওপরে মহান আল্লাহ তাঁর প্রথম ওহীতেই তাঁকে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ময়দানে এগিয়ে দেননি। যে দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, সে দায়িত্ব সম্পর্কে প্রথম ওহীতে কোন নির্দেশ দান করা হয়নি। দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন তাঁর ওপরে ওহী অবতীর্ণ করা হলো, তখন তাঁর প্রতি নবুয়্যতের দায়িত্বের সাথে রেসালাতের দায়িত্বও অর্পণ করা হলো। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর ওপর অবতীর্ণ করা হলো পবিত্র কোরআনের ৭৪ নং সূরার প্রাথমিক সাতটি আয়াত। এই সূরার নাম হলো সূরায়ে আল্ মুদ্দাস্সির।

বিশ্বনবীর আরেকটি নামও হলো মুদ্দাস্সির। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মুদ্দাস্সির নামটি হলো গুণবাচক বা উপাধি বিশেষ। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে দ্বিতীয় বার দেখে তিনি অস্থির হয়ে বাড়িতে এসে শয্যায় শুয়ে তাঁকে কম্বল দিয়ে আবৃত করে দিতে বলেছিলেন। এই সময় তাঁর ওপরে সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রথম সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। রাসূলকে আহ্বান করা হলো–

يٰاَيُّهَاالْمُدَّثِّرْ-قُمْ فَاَنْذِرْ-وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ-وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ-وَالرُّجْزَفَاهْجُرْ-وَلاَتَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ-وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ-

হে কম্বল আবৃত শয্যা গ্রহণকারী! ওঠো এবং সাবধান করো। এবং তোমার রব্ব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশালত্বের ঘোষনা দাও। এবং নিজের পরিধেয় পোষাক পবিত্র রাখো। আর মলিনতা অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে অবস্থান করো। আর অনুগ্রহ করো না অধিক লাভের আকাংখায়। এবং নিজের রব্ব-এর জন্য ধৈর্য অবলম্বন করো।' (সূরা আল্ মুদ্দাস্সির-১-৭)

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, রাসূলকে এভাবে সম্বোধন করা হলো না, হে মুহাম্মাদ ওঠো! মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বনবীকে আহ্বান করা এখান থেকেই শুরু হয়েছে। গোটা কোরআন পাঠ করলে দেখা যায়, এভাবে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুকে নানা ধরনের মধুর নামেই আহ্বান করেছেন। কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের যে ব্যক্তিবাচক দুটো নাম রয়েছে, মুহাম্মাদ এবং আহ্মাদ, এ দুটো নামে আল্লাহ তাঁকে কখনো আহ্বান করেননি।

মুহাম্মদ শব্দটা পবিত্র কোরআনে চারটি সূরায় মোট চারস্থানে উল্লেখ করা হলেও সেটা প্রাসঙ্গিকভাবে, তাঁকে আহ্বান করে নয়। আর আহ্মাদ শব্দটা একটি সূরায় মাত্র একস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের কথা থেকে, তাঁকে আহ্বান করে নয়। অথচ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর প্রথম মানুষ, প্রথম নবী ও রাসূল, প্রথম বিজ্ঞানী হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করেই তাঁর নাম ধরে আহ্বান করে বলেছিলেন–

يٰادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ-

হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী এই বেহেশ্তের মধ্যে বসবাস করো।' (সূরা বাকারা)

মহান আল্লাহ কর্তৃক নবীদেরকে আহবানের এই ধারা অব্যাহত থাকলো হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত। এই পৃথিবীতে যত নবী এবং রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের সবাইকে মহান আল্লাহ সরাসরি নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে আহ্বান করা হয়েছে, হে আদম, হে নূহ্, হে মুসা, হে ইবরাহীম, হে লূত অর্থাৎ নাম ধরে আহ্বান করা হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন বিশ্বনবী এবং তাঁকে কখনো তাঁর ব্যক্তিবাচক নামে আহ্বান করা হয়নি। তাঁর গুণবাচক নাম বা উপাধি দিয়েছেন আল্লাহ এবং সেই উপাধি ধরে বা গুণবাচক নামেই আল্লাহ তাঁকে আহবান করেছেন।

এর কারণ হলো বিশ্বনবীর বিশাল মর্যাদা এবং সম্মান। আল্লাহ তাঁকে যে কত সম্মান এবং মর্যাদা প্রদান করেছেন, তাঁকে যে ভাষায় এবং ভঙ্গীতে আহ্বান করা হত, সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে অবাক হতে হয়। কম্বল দিয়ে নিজের শরীর আবৃত করে তিনি শয্যায় শায়িত, তাঁকে কি সুন্দর বিশেষণে-কি মধুর ভঙ্গিতে আহ্বান করা হলো, হে কম্বল গায়ে দেয়া শয্যায় শায়িত ব্যক্তি, ওঠো!

দ্বিতীয় পর্যায়ের ওহী অবতীর্ণ করে তাঁকে বলা হচ্ছে, হে আমার প্রিয় বন্ধু! আপনি এমন করে কম্বলে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন কেন! এভাবে শুয়ে থাকা তো আপনার কাজ নয়। মানুষ পশুস্তরে নেমে গেছে, অসহায় মানুষ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আর্তনাদ করছে, মিথ্যে রব্ব-এর কাছে মানুষ নিজের কামনা বাসনা পেশ করছে, এসব দেখে আপনার মনে যে যন্ত্রণার ঝড় শুরু হতো, সে যন্ত্রণার অবসানের জন্যই আপনি কাজ শুরু করে দিন। আপনার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সে দায়িত্ব পালন করুন। এ জন্য আপনি সংকল্পের দৃঢ়তা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হোন। আপনি মানব এবং জ্বিন জাতিকে আদেশ করুন, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি করা পৃথিবীতে বাস করছো, তাঁর নেয়ামত ভোগ করছো, তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত এক মুহূর্ত জীবিত থাকতে সক্ষম হবেনা। অতএব তাঁরই বিধান অনুসরণ করে তাঁর দাস হয়ে যাও। একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করো, আর কারো দাসত্ব করো না। কেননা, তারা দাসত্ব লাভের উপযোগী নয়। তারা যদি তাদের রবের বিধান অনুসরণ না করে, তাহলে তাদেরকে সতর্ক করে দিন, তাদেরকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদের পরিণাম শুভ হবেনা।

এ কথা মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলার পরেই আদেশ করলেন, আপনি যাকে রব্ব বলে জানেন, তিনিই প্রকৃত রব্ব। আয়াতটিতে 'ওয়া রাব্বাকা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। রব্ব আরবি শব্দ। এই শব্দের অর্থ বড় ব্যাপক। রব শব্দের ব্যাখ্যা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে ইনশাল্লাহ। এখানে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন, যত আইন-কানুনের প্রয়োজন এ সমস্ত যিনি পূরণ করেন তিনিই হলেন রব্ব।

পৃথিবীতে যত নবী রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের সাথে যাদের সংঘর্ষ বেধেছে, তাঁরা আল্লাহকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু আল্লাহকে রব্ব হিসাবে গ্রহণ করতে আপত্তি করেছে। ফেরআউন ঘোষনা করেছিল, আমিই তোমাদের বড় রব। সে নিজেকে আল্লাহ

হিসাবে ঘোষনা দেয়নি, দিয়েছিল রব হিসাবে। আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে এই রব্ব নিয়েই সত্যপন্থীদের সাথে বাতিল শক্তির সংঘর্ষ চলছে। সত্যপন্থীগণ দাবী করছে, এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ; তিনিই আমাদের রব্ব-তিনিই আমাদের জীবন বিধানদাতা। আর বাতিল শক্তি দাবী করছে, আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করলে করতেও পারেন। কিন্তু আইন-কানুন তৈরী এবং জীবন বিধান তৈরী করবো আমরা, এ ব্যাপারে আমরা স্বাধীন। আমাদের যে আদর্শ, আমাদের যে মতবাদ, সে অনুসারেই দেশ চলবে এবং দেশের মানুষকে তা অনুসরণ করে চলতে হবে।

আল্লাহর নবীগণ তাদের এ কথা যখন গ্রহণ করেননি, তখনই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাদের কারো নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছে, কাউকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়েছে, কাউকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, শুধুমাত্র এই রব্ব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষনা করার কারণে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ আদেশ করলেন, 'আপনি শুয়ে থাকবেন না, উঠুন এবং আপনার রব্ব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষনা করুন। পৃথিবীতে নিজেদেরকে যারা রব্ব বানিয়ে বসেছে, তাদেরকে সতর্ক করে দিন, তোমরা রব্ব নও। রব্ব হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ। কোন আইন-কানুন বিধান রচনা করার এখতিয়ার তোমাদের নেই। রব্ব সেজে যে গদিতে তোমরা বসে আছো, সে গদি ছেড়ে দাও। আল্লাহর বিধান ঐ গদিতে বসে দেশের বুকে, আল্লাহর বান্দাদের ওপরে আইন জারি করবে। পৃথিবীব্যাপী উচ্চকণ্ঠে ঘোষনা করে দাও, আল্লাহ আমাদের রব্ব এবং আল্লাহর সৃষ্টি এই পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বই চলবে, আল্লাহর রবুবিয়াত প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন। এই পৃথিবীতে নবী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে একজন নবীর হলো এটাই সর্বপ্রথম কাজ এবং দায়িত্ব। এই পৃথিবীতে যারা নিজেদেরকে রব্ব বলে ধারণা করছে, মূর্খ মানুষ যে সমস্ত দুর্বল অথর্ব বস্তুকে নিজেদের রব্ব বানিয়েছে, তাদেরকে বলে দাও, রব্ব হলেন একমাত্র আল্লাহ।

রব্ব কি, রব্ব কাকে বলে এবং রব্ব-এর প্রয়োজনীয়তা কি, একমাত্র আল্লাহকে কেন রব্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মক্কী সূরাসমূহ এই রব্ব-এর আলোচনা এবং রিসালাত ও আখেরাতের আলোচনায় পরিপূর্ণ। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত এ তিন বিষয়ে মক্কী সূরায় বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। বলা হয়েছে, তোমরা যাকে রব্ব হিসাবে পূজা করছো, সেও ঐ আল্লাহর দাস এবং ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ঐ আল্লাহরই মুখাপেক্ষী। সুতরাং, তাদেরকে রব্ব হিসাবে গ্রহণ করার কোনই প্রয়োজন নেই, রব্ব হিসাবে গ্রহণ করো তাঁকেই যিনি তোমাদেরকে জমাটবাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন; জ্ঞান দান করেছেন এবং তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন যিনি পূরণ করছেন। তোমাদের সমস্ত কাজে তাকেই রব্ব হিসাবে ঘোষনা করবে, একমাত্র দাসত্ব লাভের যোগ্য বলে বিবেচনা করবে এবং একমাত্র আইনদাতা হিসাবে গ্রহণ করবে।

মহান আল্লাহ প্রথম অবতীর্ণকৃত বাণীতে তাঁর নবীকে আদেশ দিলেন, আমিই যে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র রব্ব-এ কথার ঘোষনা করে দাও। তুমি কোন দ্বিধা করোনা। তোমার রব্ব-এর

শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষনা করো এবং কোন শক্তিকে দেখে ভয় করো না। কেননা, সমস্ত শক্তির শ্রেষ্ঠ শক্তি তোমার সাথে রয়েছে। তোমার রব্ব-এর শক্তির সামনে কোন শক্তিই শ্রেষ্ঠ নয়। তুমি তাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট করে বলে দাও, তুমি যে কাজ শুরু করছো, এ কাজের গতি কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে কোথায় কি কাজ করতে আদেশ করলেন, তা বিশ্লেষণ করলে আমাদের সামনে একটা দিক পরিষ্কার হয়ে যায় যে, গোটা পৃথিবীও যদি সত্যের বাহকের বিরুদ্ধে চলে যায় তবুও সত্যের ঘোষনা দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা যাবে না। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে ঘোষনা দিতে আদেশ করলেন, সেই ঘোষনার বিপরীত অবস্থা বিরাজ করছিল তদানীন্তন পৃথিবীতে। রাসূল যে সমাজে উপস্থিত ছিলেন সে সমাজ এই ঘোষনা শুনতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

এই ঘোষনা দেয়ার সাথে সাথে রাসূলকে তাঁর আপনজনেরাই যে বন্য হায়েনার মত ঘীরে ধরবে এতেও কোন সন্দেহ ছিল না। যারা রব্ব-এর দাবী নিয়ে সে সমাজে দীর্ঘকাল ব্যাপী নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল, নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করছিল, কা'বাঘরসহ নিজেদের ঘরে ঘরে মূর্তিকে রব্ব বানিয়ে তাদের পূজা অর্চনা করছিল, তারা রাসূলের এ ঘোষনা শুনেই রাসূল একজন সৎ এবং সুন্দর চরিত্রের লোক হবার কারণে তাঁর ঘোষনাকে তারা স্বাগত জানাবে অবস্থা এমন ছিল না। বরং এ ঘোষনা দেয়ার সাথে সাথেই বিপদ মসিবতের পাহাড় নিজের ওপরে আপতিত হবে, আপন আত্মীয়-স্বজন প্রাণের শত্রুতে পরিণত হবে, তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে, তাঁকে হত্যা করার জন্য সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠবে–এটাই ছিল প্রকৃত পরিস্থিতি।

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কোন কথা ঘোষনা করতে আদেশ করলেন, সে কথার যে কি তাৎপর্য এ কথা উপলব্ধি করার মত জ্ঞান রাসূলকে দেয়া হয়েছিল, রাসূল মহান আল্লাহর আদেশের তাৎপর্য অনুধাবন করবেন, তিনি ভীতিগ্রস্থ হতে পারেন, চিন্তিত হতে পারেন, এ কারণে ঐ আয়াতের মধ্যে রাসূলকে এ কথাও বুঝিয়ে দেয়া হলো, ভয় বা চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা তোমার রব্ব-ই শ্রেষ্ঠ, তোমার রব্ব-এর শ্রেষ্ঠত্বের সামনে অন্য সমস্ত শক্তি ধুলিকণার মতই উড়ে যাবে। তোমার রব্ব রয়েছেন তোমার সাথে, তোমাকে ইসলামী আন্দোলনের উত্তপ্ত ময়দানে এগিয়ে দিয়ে তোমার রব্ব নীরব থাকবেন না। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন শুরু করে দাও, তোমাকে সহযোগিতা করার দায়িত্ব আমার।

এই সুক্ষ্ম কথাগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উপলব্ধি করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দান করেছিলেন ঐ আয়াতে তা রাসূল অনুভব করেছিলেন বলেই তিনি তাঁর আন্দোলনের গতি পথে কোন শক্তিকে সামান্যতম দেননি। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব রাসূল উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একাকী গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাসূলের আদর্শ নিয়ে আজো যারা ময়দানে কাজ করতে অগ্রসর হবেন প্রথমে তাদেরকে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা অর্জন করতে হবে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের চিত্র নিজের মনে অঙ্কন করতে

হবে। তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তিকেই আর শক্তি বলে মনে হবে না। এরপরে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বললেন, 'আপনি নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখুন।' বিজ্ঞ তাফসীর কারগণ পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের ব্যাপক তাফসীর করেছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত আয়াতের মর্মও বড় ব্যাপক। ছোট একটি কথা দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে একটা অর্থ হলো, পরিধেয় পোষাক পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা।

পোষাক মানুষের মনের ওপরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে এতে কোন সন্দেহ নেই। এ কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামরিক বাহিনীর বিশেষ পোষাক নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষকগণ বলেছেন, পোষাক-পরিচ্ছেদের পবিত্রতা এবং আত্মার পবিত্রতা অবিচ্ছিন্ন। একটার সাথে আরেকটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পবিত্র রুচি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় সে পুঁতিগন্ধময় কোন খাদ্য তাঁর মুখ গহ্বর দিয়ে দেহে প্রবেশ করাবে। সুতরাং, কোন পবিত্র আত্মার পক্ষেও সম্ভব নয় সে কোন অপবিত্র দেহের ভেতরে বাস করবে। কোন পবিত্র দেহের পক্ষেও সম্ভব নয় সে নিজেকে অপবিত্র অপরিচ্ছন্ন পোষাকে আবৃত রাখবে। মহান আল্লাহ পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন। তিনি অপবিত্রতা প্রশ্রয় দেননা। এ কারণে তিনি তাঁর রাসূলকে আদেশ করলেন, তোমার পোষাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখবে। মহান আল্লাহর এ কথা থেকে এটা ধারণা করার কোন অবকাশ নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বোধহয় ইতিপূর্বে অপবিত্র অপরিচ্ছন্ন পোষাকে থাকতেন। পবিত্রতা সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না।

প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন জন্মগতভাবেই পবিত্র। মহান আল্লাহ তাঁকে পবিত্র রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাঁর জ্ঞানের জগতে পবিত্রতা সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছিলেন। আরবী 'তাহ্‌হের বা তাহারাত' শব্দের অর্থ শুধু বাহ্যিক পবিত্রতা নয়। অন্তরের কলুষতা দূর করাকেও বোঝায়। পবিত্রতা বা তাহারাতকে কোরআন যে অর্থে উপস্থাপন করেছে, পৃথিবীর এমন কোন ভাষা নেই যে, সে ভাষার একটি শব্দ তাহারাতের সমার্থক হতে পারে বা পবিত্রতার ব্যাপক ধারণা পেশ করতে পারে।

পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করাও পবিত্রতা এবং পাপের ভেতরে নিজেকে জড়িত করাকে অপবিত্রতা বলা হয়েছে। কোন অন্যায় কাজ বা মিথ্যা কথা থেকে নিজেকে বিরত রাখার অর্থও হলো পবিত্রতা। মিথ্যা কথা বলা অপবিত্রতা। এভাবে যাবতীয় অন্যায় অনাচার, পাপাচার, অত্যাচার, অপরিচ্ছন্নতা, মিথ্যা, চিন্তার জগতে অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকাকেই পবিত্রতা বলা হয়েছে। দেহ এবং দেহের পোষাক পবিত্র–এটা কোন পবিত্রতাই নয়। চিন্তার জগৎ হতে যাবতীয় অপরিচ্ছন্নতা এবং অপবিত্রতা দূর করতে হবে। অজ্ঞানতা তথা মূর্খতাও এক ধরণের অপবিত্রতা। এ সমস্ত অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকার নামই হলো পবিত্র কোরআনের ভাষায় তাহারাত।

ইসলাম আত্মা এবং দেহের পবিত্রতার দাবী করে। সে সময়ে মানুষ জ্ঞানের দিক থেকে, চিন্তার দিক থেকে, চরিত্রের দিক থেকে; স্বভাবের দিক থেকে, নেতৃত্বের দিক থেকে, কথার দিক থেকে তথা সর্বস্তরে অপবিত্রতায় নিমজ্জিত ছিল। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আদেশ

করলেন, মানব সমাজ থেকে এ সমস্ত অপবিত্রতা দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করো। তুমি এই মহান কাজ করছো, এ জন্য যেন তুমি ধারণা করোনা, তুমি তাদের ওপরে দয়া করছো। বরং এটাই তোমার দায়িত্ব, এই দায়িত্ব দিয়েই তোমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। আবার এ ধারণাও করো না যে, এ কাজ করে তুমি তোমার রব্ব-এর কল্যাণ করছো। বরং তুমি তোমার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করছো। যে দায়িত্ব তুমি পালন করছো এ কাজ সহজ নয়। তুমি তোমার প্রতিটি পদক্ষেপে বাধাগ্রস্থ হবে। তোমার সাথে অহেতুক শত্রুতা করা হবে। তোমাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়া হবে; হত্যা করার প্রচেষ্টা করা হবে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তোমার বিরুদ্ধে চলে যাবে। তুমি নানা ধরণের মিথ্যা অপবাদের, ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হবে।

তোমার বাড়ি-ঘর, সহায় সম্পদ বিনষ্ট হবে; আহার নিদ্রায় কষ্ট পাবে। তোমার উপার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তোমার নামে কুৎসা ছড়িয়ে দেয়া হবে। বিরোধী শক্তি তোমাকে অবরোধ করবে; দেহের রক্ত ঝরবে। তোমার সামনে নানা ধরণের লোভ-লালসা দেখানো হবে। বিভিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করা থেকে তোমাকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু তোমার কাজে তুমি থাকবে অটল অবিচল। তোমাকে এমন ধৈর্য ধারণ করতে হবে, যে ধৈর্যের শেষ সীমা–শেষ পর্যায় বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ওহীর সূচনাতেই মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে এ কথা স্পষ্ট করে দিলেন যে, কি কাজের জন্য তোমাকে বিশ্বনবী হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে এবং কেন করা হয়েছে। এই কাজের সূচনা কিভাবে করা হবে। এই কাজের কারণে কোন মানুষের কাছে এ কথা বলা যাবে না যে, আমি তোমাদের হেদায়াতের জন্য এসেছি; তোমাদের কল্যাণ করছি, তোমরা আমার হাতে হাত দিয়ে ঈমান যখন আনলে তাহলে এবার আমাকে আমার বিনিময় প্রদান করো।

এ ধরনের কোন আশা মনে পোষন করা যাবেনা, এ কথা সত্যের প্রচারকদেরকে বলে দেয়া হলো। এ কাজ করতে গেলে কি ধরনের বাধা আসবে তাও স্পষ্ট করে বলে দিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে বলা হলো। এভাবে আল্লাহ তাঁর নবীকে দায়িত্ব দিলেন এবং কিভাবে তিনি কাজ করবেন, কার্য ক্ষেত্রে যে সব অসুবিধা দেখা দিত তা দূর করার পথের সন্ধান দিতে থাকলেন। অর্থাৎ ক্রমাগতভাবে ওহী অবতীর্ণ হতে থাকলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওহী ধারণ করার ক্ষমতা ক্রমশঃ অর্জন করলেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম যে সময়ে ওহী তাঁর কাছে আবৃত্তি করতেন তিনিও তাঁর সাথে দ্রুত আবৃত্তি করতে থাকেন। প্রিয় বন্ধুর এই অস্থিরতা–ব্যস্ততা মহান আল্লাহর কাছে সহ্য হলো না। তিনি তাঁর রাসূলকে বললেন–

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ–وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا–

কোরআন পড়ার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করো না যতক্ষণ না তোমার প্রতি তার ওহী পূর্ণ হয়ে যায় এবং দোয়া করো, হে আমার রব্ব ! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা ত্বা-হা)

আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবকে জানিয়ে দিলেন, আমার ওহী তোমার স্মৃতিতে অম্লান রাখা আমার দায়িত্ব। তুমি শুধু তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকো। আল্লাহ বলেন–

لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ-اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْنَهُ-فَاِذَا قَرَاْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ-ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ-

এই ওহী অত্যন্ত দ্রুত মুখস্থ করে নেয়ার জন্য তোমার জিহ্বা দ্রুত সঞ্চালন করো না। তা মুখস্থ করিয়ে দেয়া ও পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। সুতরাং, আমি যখন (আমার পক্ষ থেকে আমার ফেরেশ্তা) পড়তে থাকি, তখন তুমি তার পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকে। তারপর এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমারই দায়িত্ব। (সূরা কিয়ামাহ্-১৬-১৯)

কোরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ পৃথিবী সৃষ্টি করে মানুষসহ অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এসব প্রাণী পৃথিবীতে কিভাবে জীবন পরিচালিত করবে, সে প্রবণতা সৃষ্টিগতভাবেই তাদের ভেতরে দান করা হয়েছে। প্রতিটি প্রাণীর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যে খাদ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারা সে খাদ্যই আহার করে জীবন ধারণ করে। মাংসাশী প্রাণীসমূহ বৃক্ষ-তরু-লতা আহার করে না। আবার উদ্ভিদ আহার করে যেসব প্রাণী, তারা রক্ত-মাংস আহার করে না। প্রাণীসমূহকে যেসব নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে দেখা যায়, তা তাদের সৃষ্টিগত প্রবণতা। এ প্রবণতা দিয়েই আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের জন্য পৃথক কোন বিধি-বিধানের প্রয়োজন হয় না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে যে নিয়ম-কানুনের অধীন করে সৃষ্টি করেছেন, তারা সে নিয়মের অধীনেই জীবনকাল অতিবাহিত করে। এ জন্য কখনো এটা দেখা যায়নি যে, মাছ হঠাৎ করে পানি ত্যাগ করে স্থলে এসে বসবাস করছে। আবার বাঘকে এমন দেখা যায়নি যে, তারা বন-জঙ্গল ত্যাগ করে সমুদ্রে গিয়ে বসবাস করছে। তারা সবাই আল্লাহর নিয়মের অধীন। আর আল্লাহর নিয়মের কোন পরিবর্তন কখনো হয় না। আল্লাহ বলেন–

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً-

তুমি আল্লাহর নিয়মে কোন ধরনের পরিবর্তন হতে, কোন প্রকারের ব্যতিক্রম হতে দেখতে পাবে না। (সূরা ফাতির)

সুতরাং, আইন-কানুন, বিধি-বিধানের প্রয়োজন হয় মানুষের। মানুষের জন্যই জীবন বিধানের প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যেই পৃথিবীতে নবী ও রাসূলদের আগমন ঘটেছে এবং তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'য়ালা ওহী যোগে জীবন বিধান প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন প্রেরণ করা হয়েছে। এ কোরআন দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান জ্ঞানের কোন বিশেষ শাখা নিয়ে শুধু আলোচনা করে না, বরং মানব জাতির জন্য যেখানে যা প্রয়োজন তাই নিয়ে এ কোরআনে আলোচনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ এ কোরআনের সবটুকুই মানুষের জন্যই আলোচনা করা হয়েছে। মানুষই হলো এ কিতাবের মূল আলোচ্য বিষয়। মানুষকে বোঝাতে গিয়ে অন্যান্য বিষয় যতটুকু প্রয়োজন-ঠিক ততটুকুই আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের যখন কোনই অস্তিত্ব ছিল না, তখন থেকে শুরু করে, তার শেষ পরিণতি পর্যন্ত এ কিতাব আলোচনা করেছে। আত্মার জগতে মানুষকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁর প্রতিপালক সম্পর্কে এবং সে কি জবাব দিয়েছিল, সে কথা এ কোরআন আলোচনা করেছে। আবার সেখান থেকে মাতৃগর্ভে যখন তাকে প্রেরণ করা হলো, তখন সে কি অবস্থায় ছিল, সে বিষয়টিও আলোচনা করা হয়েছে। সূরা যুমার-এর ৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ-ذٰالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ-لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ-

তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে তিন তিনটি অন্ধকার পর্দার অভ্যন্তরে একের পর এক আকৃতি দান করে থাকেন। (যিনি এ কাজগুলো সম্পাদন করেন) সেই আল্লাহই তোমাদের রব্ব। তিনিই প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিকারী-তিনি ব্যতিত কোন ইলাহ নেই।

তিনটি পর্দা বলতে এখানে মায়ের পেট, বাচ্চা যে থলির ভেতরে অবস্থান করে সে থলি এবং যে ঝিল্লি দিয়ে বাচ্চা আবৃত থাকে সে ঝিল্লিকে বুঝানো হয়েছে। পৃথিবীতে আগমন পূর্ব মুহূর্তে মানুষের কি অবস্থা ছিল, তা আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আস্ সাজ্দায় বলেন-

الَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَاَخَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ-ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ-ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ-قَلِيْلاً مَّاتَشْكُرُوْنَ-

যে জিনিস তিনি সৃষ্টি করেছেন তা উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে, তারপর তার বংশ উৎপাদন করেছেন এমন সূত্র থেকে যা তুচ্ছ পানির মতো। তারপর তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করেছেন এবং তার মধ্যে নিজের রুহ ফুঁকে দিয়েছেন, আর তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

মানুষ সৃষ্টির উপাদান ও প্রক্রিয়া, তারপর একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষ কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করবে, তার শারীরিক কাঠামো, তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য এবং তার দায়িত্ব-কর্তব্য কি, ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছি আমি এবং এর ভেতরে যা কিছুই রয়েছে, কোন কিছুই আমি বৃথা সৃষ্টি করিনি।

একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এসব সৃষ্টি করেছি। পৃথিবীর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি তোমাদের কল্যাণের জন্য। এসব কিছুই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছি। আর তোমাদের ওপরে আদেশ দিয়েছি, তোমরা কেবল আমারই আদেশ পালন করবে। আমার বিধান অনুসরণ করবে। আমার দাসত্ব ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবে না আর আমার দাসত্বের মধ্যেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

অর্থাৎ এ কিতাব মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ নিয়ে আলোচনা করেছে। কোন কাজ করলে, কোন পথে অগ্রসর হলে, কিভাবে জীবন পরিচালিত করলে মানুষ একটি সুখী সমৃদ্ধশালী শান্তিপূর্ণ, ভীতিহীন, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, নিরাপত্তপূর্ণ পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি গঠন করতে সক্ষম হবে এবং পরকালীন জীবনে কিভাবে কল্যাণ লাভ করতে পারবে, সে বিষয়ে এ কোরআনে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ কোন পথে নিজেকে অগ্রসর করালে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিজেকে পৌঁছে দেবে, পৃথিবীর জীবন হবে অস্থিরতা আর শঙ্কা জড়িত, পরকালীন জীবনে তাকে নিক্ষিপ্ত হতে হবে যন্ত্রণাময় জীবনে, তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষকে নির্ভুল কর্মনীতি ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার দিকে মানুষকে অগ্রসর করানোর লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং মানুষকে নিয়ে এ জন্যই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের আলোচনার বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আরেকটি বড় সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আর সে সত্যটি হলো, কোরআন যে কোন মানুষের রচনা করা কিতাব নয়, তা যে কোন চিন্তাশীল পাঠকই স্পষ্ট অনুভব করতে সক্ষম হয়। কারণ এ কিতাব যাঁর ওপরে এবং যে পরিবেশে অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং সে পরিবেশ ছিল মূর্খতায় আচ্ছন্ন। একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে অজ্ঞানতার পরিবেশে অবস্থান করে এমন বৈজ্ঞানিক আলোচনা সমৃদ্ধ কিতাব রচনা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, এ সত্য কোরআনের আলোচিত বিষয়ই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা

বিশ্বের সর্বকালের সর্বযুগের একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কোরআনে কারীমের মাধ্যমে একটি জাতির পরিবর্তন সাধিত করেছিলেন। গোটা বিশ্বে রেডিক্যাল চেঞ্জ এনেছিলেন। এ কথা অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি, পৃথিবীতে মানব রচিত কোন বিধান দিয়ে কোনদিন কল্যাণ বয়ে আসবে না। জাতি সুখ এবং সমৃদ্ধি কখনো দেখতে পাবে না। অপরের রক্তচক্ষু দেখে গোলাম হয়ে চিরকাল কাটাতে হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। ভয়ে আতঙ্কে কাতর হয়ে পড়তে হবে। এই বিশ্বের মাঝে যদি আমরা বলিষ্ঠতা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে আগ্রহী হই, একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ ও জাতি কামনা করি, তাহলে কোরআনে কারীম প্রবর্তিত একটি সমাজ ব্যতীত অন্য কোন পথে তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আল্লাহর কোরআন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আল্লাহ তা'য়ালা আর অন্য কিছু দেননি। গোটা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ রাব্বুল

আলামীনের পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো কোরআন। আল্লাহর এই কিতাব হচ্ছে এই মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়। মানুষের হেদায়াতের জন্য এই কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত কিছুই বলে দিয়েছেন, নতুন করে কোন কিছু আর বলার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে আর একটি শব্দ এবং অক্ষরও মানুষের কাছে হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করা হবে না। এই কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা যে কতবেশী, তা মানুষের পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। এ জন্য আল্লাহর এ কিতাবের সম্মান ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশী।

সর্বময় ক্ষমতার উৎস হলেন মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এবং যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদা তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁর পক্ষ থেকেই এ কোরআন মানব জাতির জীবন বিধান হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যত নিয়ামত দান করেছেন, তার ভেতরে এই কোরআনই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এই নেয়ামতের গুরুত্ব, সম্মান ও মর্যাদা অনুধাবন করার জন্যই একে অবতীর্ণ করা হয়েছে রমজানের কদরের রাতে। এ সম্পর্কে সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ-

রমজানের মাস, এতে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন-যাপনের বিধান আর এটা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক ও সত্য পথপ্রদর্শন করে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য পরিষ্কাররূপে নির্ধারণ করে। (সূরা বাকারা)

কোরআনের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তা রমজান মাসে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর যাদের জন্য এই কোরআনের মতো মহান নিয়ামত দান করা হয়েছে, তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা এই অমূল্য নিয়ামত লাভ করলে এ জন্য তোমরা শোকর আদায় করো। কিভাবে শোকর আদায় করতে হবে, সেটাও আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে, রোজা পালন করে শোকর আদায় করো।

ব্যক্তিগতভাবেও কোন মানুষ যদি তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে সফলতা অর্জন করে, তখন সে আনন্দ প্রকাশ করে। একটি জাতি যখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে সফলতা অর্জন করে, তখন সে জাতি বিজয় উৎসবের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করে। মুসলিম একটি মিল্লাতের নাম। এই মিল্লাত বা জাতির পিতা হলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম। এই জাতি গোটা পৃথিবীতে নেতৃত্ব দান করবে এ জন্য যে, এরা গোটা পৃথিবীতে কোরআনের আদর্শ বাস্তবায়ন করবে। কারণ কোরআনের আদর্শ যদি এরা বাস্তবায়ন না করে, তাহলে গোটা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপক ভাঙন ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে অশান্তির দাবানল যেভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, এর মূল কারণ হলো, কোরআনের আদর্শের অনুপস্থিতি। এই কোরআন স্বয়ং সম্মানিত ও মর্যাদাবান এবং তা আগমন করেছে তাঁর অনুসারীদেরকে পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করার লক্ষ্যে। অর্থাৎ কোরআন

তার অনুসারীদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে দেয়। এটা কোন কল্পনার বিষয় নয়-মুসলমানদের অতীত ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। যতদিন মুসলমানরা কোরআন অনুসরণ করেছে, গোটা পৃথিবীর নেতৃত্ব ছিল তাদেরই পদতলে।

সুতরাং, এই অমূল্য নিয়ামত দান করে তার শোকর আদায় করার জন্য রোজা পালন করতে বলা হয়েছে। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অনুধাবন করা যাক, যেমন জাতিয় কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জনগণ যেন তাতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় সে জন্য নির্দিষ্ট একটি সময় সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। বিষয়টির ওপরে সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখে যেন সকল স্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করতে পারে। যে অনুষ্ঠানে জনগণ অংশগ্রহণ করবে, সে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুযায়ী সরকার ক্ষেত্র বিশেষে সময় বর্ধিত করে যেন সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা থেকে কেউ বঞ্চিত না থাকে। ঠিক তেমনি, কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা এত বেশী যে, এটা লাভ করে মানুষ শোকর আদায় করবে। এই শোকর আদায় থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না থাকে, সে ব্যাপারেও আল্লাহ তা'য়ালা ব্যাবস্থা করে রেখেছেন।

আল্লাহর গৃহীত সে ব্যবস্থাটি হলো, কোন কারণবশতঃ শোকর আদায়ের মাস রমজান মাসে কেউ যদি রোজা পালন করার সুযোগ না পায়, তাহলে বছরের যে কোন সময়ে সে রোজার কাযা আদায় করে শোকর পালনে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই সুযোগ দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র কোরআনের সম্মান ও মর্যাদার কারণে। রমজান মাসের রোজাকে শুধুমাত্র আল্লাহভীতি অর্জনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমই করা হয়নি, বরং মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে যে বিরাট ও মহান নিয়ামত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে দান করেছেন, রোজাকে তার শোকর আদায়ের মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জন্য কোন নিয়ামতের শোকর আদায় এবং অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম পদ্ধতি এটাই তো হতে পারে যে, যে বিরাট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ নিয়ামত দান করা হয়েছে, নিয়ামত যারা লাভ করলো, তাদের দায়িত্ব হলো সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযোগী করে নিজেকে গঠন করার জন্য সর্বাত্মক সাধনায় লিপ্ত হওয়া।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনের মতো নিয়ামত এ জন্য আমাদেরকে দান করেছেন যে, আমরা তাঁকে সন্তুষ্ট করার পথ ও পদ্ধতি অবগত হয়ে সে অনুসারে নিজেদেরকে প্রস্তুত করবো এবং গোটা পৃথিবীকেও সেই পথেই পরিচালিত করার জন্য সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করবো। আর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো রোজা এবং রমজান মাসে এ জন্যই কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোরআন দিয়ে আমাদেরকে ধন্য এবং বিজয়ী করা হয়েছে। আমরা শোকর আদায় শেষে বিজয় উৎসব যেন উদযাপন করতে পারি এর জন্য দান করা হয়েছে ঈদ উৎসব। আল্লাহ বলেন-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ-

হে নবী ! বলো, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে, তিনি এটা (কোরআন) প্রেরণ করেছেন। এ জন্য তো লোকদের আনন্দ ফূর্তি করা উচিত। (সূরা ইউনুস-৫৮)

কোরআনের মতো অতুলনীয় নিয়ামত লাভ করে আমরা বিজয়ী হয়েছি, সেই বিজয় উৎসবই হলো ঈদ। কোরআনের মতো নিয়ামতকে যে রাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِیْنَ–

আমি এটি এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা দুখান-৩)

এভাবে সূরা কদরেও বলা হয়েছে, এ কোরআন আমি কদরের রাতে অর্থাৎ অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। সে রাত যে কতটা মহিমান্বিত রাত, যার মর্যাদা সম্পর্কে কোন মানুষ কল্পনাও করতে সক্ষম নয়। অগণিত রাত-ব্যাপী নামাজেরত থেকে যে সওয়াব অর্জন করতে পারে, সে রাতে এক রাকাআত নামাজ আদায় করে সেই একই সওয়াব অর্জন করতে পারে। এ রাতের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

وَاِنَّهٗ فِیْۤ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَكِیْمٌ–

প্রকৃতপক্ষে এটা মূল কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যা আমার কাছে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ। (সূরা যুখরুফ–৪)

কোরআনের পরিচয় আল্লাহ জানিয়ে দিয়ে এ কথাও স্পষ্ট করে দিলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি তার অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে আল্লাহর কোরআনের মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে সক্ষম না হয়, কোরআন পরিবেশিত অনুপম জ্ঞান ভান্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করে তা অনুসরণ করতে না পারে, তাহলে এটা সে ব্যক্তির লজ্জাজনক ব্যর্থতা আর দুর্ভাগ্য ছাড়া কি বলা যেতে পারে। কেউ যদি এ কিতাবকে ছোট করার প্রয়াস পায় এবং কিতাবের বক্তব্যের মধ্যে ভুল ধরার চেষ্টা করে তাহলে সেটা তার চরম হীনমন্যতা বৈ আর কিছু নয়।

কোরআনকে কেউ সম্মান-মর্যাদা না দিলেই এর মূল্যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। কেউ কোরআনের প্রভাব ও জ্ঞানকে গোপন করতে চাইলেই তা গোপন করতে পারে না। এটা যথাস্থানে একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব যাকে এর অতুলনীয় শিক্ষা, মু'জিযাপূর্ণ বাগ্মিতা, নিষ্কলুষ জ্ঞান এবং যাঁর বাণী তাঁর গগনচুম্বী ব্যক্তিত্ব অতি উচ্চে তুলে ধরেছে। সুতরাং একে কেউ অবমূল্যায়ন করলেই তা মূল্যহীন হয়ে যায় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ –

এটা একটি কিতাব, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ। (আন'আম–৯২)

এই কোরআনের যেমন সম্মান ও মর্যাদা, একে যারা অনুসরণ করবে, তাদেরও সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যারা আমার কোরআন অনুসরণ করবে, তাদেরকে আমি পৃথিবীতে নেতৃত্ব দান করে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবো।

কেননা, আমার এ কিতাব কল্যাণময় ও বরকতর্পূণ। এ বরকতপূর্ণ কিতাব আমি ইতিপূর্বে নবী ও রাসূলদেরকে দান করেছিলাম। এ থেকে কল্যাণ লাভ তারাই করতে পারে, যারা না দেখে তাদের রব্বকে ভয় করে এবং আখিরাতের দিনে হিসাব গ্রহণের বিষয়ে ঈমান রাখে।

কোরআন অধ্যয়নে সতর্কতা অবলম্বন

এ কিতাব যিনি পাঠ করছেন, তিনি তা থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারেন। সেই সাথে এর শ্রোতাদেরকেও বলা হচ্ছে, তোমরা তা শ্রদ্ধাভরে নীরবে শুনে তা থেকে হেদায়াত লাভ করার চেষ্টা করো। হেদায়াত লাভ করা আল্লাহর রহমত ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং নীরবে কোরআন শুনে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভ করার জন্য দোয়া করতে থাকো। এ কিতাব যিনি পাঠ করবেন তার ওপরে আদেশ দেয়া হচ্ছে–

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً–

আর কোরআন থেমে থেমে পাঠ করো। (সূরা মুয্যাম্মিল-৪)

আল্লাহর কিতাবের অতি উচ্চ মর্যাদার কারণে তা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। ধীর গতিতে প্রতিটি শব্দ মুখে উচ্চারণ করতে হবে এবং বিরতি দেয়ার স্থানে বিরতি দিতে হবে। যেন এ কোরআনের অর্থ ও তাৎপর্য পরিপূর্ণভাবে তেলাওয়াতকারী অনুভব করতে পারে। তার বিষয়বস্তু হৃদয়পটে অঙ্কিত হয় এবং তা অনুসরণে উৎসাহ সৃষ্টি হয়। কোরআন তেলাওয়াতের সময় যেন শয়তান কোনভাবেই প্রতারণা করতে না পারে, সেদিকেও তেলাওয়াতকারী বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

তারপর যখন তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে। (সূরা আন্ নাহল–৯৮)

কোরআন তেলাওয়াতের শুরুতেই আয়ুযুবিল্লাহিমিনাশ্ শাইত্বানির রাজিম মুখে উচ্চারণ করলেই হবে না, মনের মধ্যে কোরআন বুঝার ইচ্ছা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, শয়তান যেন প্রতারণা করতে সক্ষম না হয়, কোরআনের ভুল অর্থ গ্রহণ করা না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এ কিতাবের প্রতিটি কথাকে কিতাবেরই আলোকে দেখতে হবে এবং নিজের মনগড়া মতবাদ বা অন্য কারো কাছ থেকে ধার করা চিন্তার মিশ্রণে কোরআনের শব্দাবলীর এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবেনা, যা আল্লাহর বক্তব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিপন্থী। সেই সাথে তেলাওয়াতকারীর মনে এ চেতনা এবং উপলব্ধিও জাগ্রত রাখতে হবে যে, সে যেন কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারে এবং কোরআনের ভুল অর্থ গ্রহণ না করে, কেননা এ ব্যাপারে শয়তান তার পেছনে সক্রিয় তৎপরতা চালাচ্ছে।

কোরআন যেন আল্লাহ প্রদত্ত অর্থে তেলাওয়াতকারী বুঝতে না পারে, এ জন্য শয়তান সবচেয়ে বেশী তৎপর। এ কারণে মানুষ যখনই এ কিতাবের দিকে ফিরে আসে তখনই

শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার এবং কোরআন থেকে পথনির্দেশনা লাভ থেকে বাধা দেয়ার এবং তাকে ভুল চিন্তার পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এ কারণে আল্লাহর কোরআন অধ্যয়নের সময় অধ্যয়নকারীকে অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে, যেন শয়তানের প্ররোচনা ও সুক্ষ্ম অনুপ্রবেশের কারণে সে হেদায়াতের উৎস কোরআনের কল্যাণকারিতা থেকে বঞ্চিত না হয়ে পড়ে। কারণ যে মানুষ আল্লাহর কিতাব থেকে সঠিক সত্য পথের সন্ধান লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে, সে পৃথিবীর কোন উৎস থেকেই আর সত্য পথের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হবে না। শয়তানের প্রতারণার কারণে কোন ব্যক্তি যদি কোরআন অধ্যয়নের সময় বিভ্রান্ত হয়ে ভ্রষ্টতা ও প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে পড়ে, তাহলে পৃথিবীতে এমন কোন জ্ঞান নেই, যে জ্ঞান তাকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে।

আল্লাহর এই কোরআন যে রূপে অবতীর্ণ হয়েছে, যে অর্থ প্রকাশ করেছে, যেদিকে মানুষকে নিতে চেয়েছে, এসব দিকে কেউ যদি যেতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই শয়তানের প্রতারণা থেকে সতর্ক ও সচেতন হতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কোরআন অবতীণ করেছেন এবং এর সংরক্ষণের দায়িত্বও তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেছেন–এ কথা শয়তান জানার পরে সে এটা অনুভব করেছে, এই কোরআনকে কোনক্রমেই ধ্বংস করা যাবে না। অতএব কোরআন যখন ধ্বংস করা যাবে না তখন যারা কোরআন বুঝার চেষ্টা করবে তাদেরকে প্রতারিত করতে হবে। কোরআনের স্পষ্ট বক্তব্য যেন মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম না হয়, বিভ্রান্তির গোলক ধাঁ-ধাঁয় যেন নিমজ্জিত হয়, এ ব্যাপারে শয়তান কোরআন অধ্যয়নকারীর প্রতি তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এ জন্য কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্তে শয়তানের প্রতারণা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং সে পদ্ধতিও আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। সূরা নাহ্লের ৯৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, শয়তানের প্রতারণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে এবং যে কথা বলে বান্দা আশ্রয় প্রার্থনা করবে সে কথাটি হলো–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

অভিশপ্ত শয়তানের প্রতারণা থেকে আমি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি।

কোরআন শ্রবণে সতর্কতা অবলম্বন

এ কোরআন যখন পাঠ করা হবে, তখন শ্রোতারা কিভাবে কোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, এ সম্পর্কে আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে–

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ–

যখন কোরআন তোমাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তা খুবই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো, সম্ভবত তোমাদের প্রতিও রহমত অবতীর্ণ হবে। (আ'রাফ-২০৪)

মানব জাতির জন্য কোরআনের মোকাবেলায় শ্রেষ্ঠ নিয়ামত আর দ্বিতীয়টি নেই। এই

কোরআন যারা অধ্যয়ন করে বুঝে অনুসরণ করবে, তারা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। মুসলমানগণ নামাজে প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সত্য সহজ সরল পথ কামনা করে। আর মানুষের এ কামনার জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা পরিপূর্ণ কোরআন তার সামনে পেশ করেন। সূরা ইয়াছিনে বলা হয়েছে-

وَأَنِ اعْبُدُوْنِىْ ـ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

আল্লাহর দাসত্ব করবে, এটাই সহজ সরল পথ। (সূরা ইয়াছিন)

মুক্তির সোপানে পৌঁছে দেয় এই কোরআন। আল্লাহর কোরআন যেন মানুষ উপলব্ধি করতে সক্ষম না হয়, এ জন্য শয়তান তার মুরীদদের সাথে নিয়ে কোরআন শোনার পরিবেশ বিঘ্নিত করে। আল্লাহর কিতাব যাতে মানুষের কানে পৌঁছতে না পারে, শয়তান সে ব্যবস্থা করতে থাকে। এ গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শয়তান শুধু ইবলিসই নয়-মানুষের নফছ্ এক শয়তান, জ্বিন শয়তান ও মানুষের ভেতরেও শয়তান রয়েছে। এই চার ধরনের শয়তান একযোগে প্রচেষ্টা চালায় যেন কোরআন কোন মানুষ শুনতে না পারে। আল্লাহর এ কিতাব শোনা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে এসব শয়তান এক শ্রেণীর মানুষকে এভাবে ধোকা দিয়ে থাকে যে, 'কোরআন হলো আল্লাহর বাণী। আর আল্লাহর বাণী বড়ই জটিল, এটা বুঝতে হলে যে জ্ঞান ও যোগ্যতা প্রয়োজন-তা আমাদের নেই। অতএব সামান্য জ্ঞানের অধিকারী হয়ে কোরআন বুঝা যাবে না। অতএব কোরআনের কোন তাফসীর পড়াও যাবে না-করাও যাবেনা।'

এভাবে শয়তান এক শ্রেণীর নামাজী লোকদেরকে কোরআন বুঝা থেকে দূরে রাখে। আরেক শ্রেণীর মানুষকে শয়তান এভাবে ধোকা দিয়ে থাকে, 'কোরআন হলো আরবী ভাষায় অবতীর্ণ একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থ অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ করলেও এর সঠিক মর্মার্থ অপ্রকাশিতই থেকে যায়। সুতরাং পরিবর্তিত ভাষায় কোরআন অধ্যয়ন করে কোন লাভ নেই। আরবীতে তেলাওয়াত করলেই প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমলনামায় দশ দশটি করে সওয়াব লেখা হতে থাকবে। অতএব আরবী ভাষার কোরআন আরবীতেই তেলাওয়াত করে সওয়াব অর্জন করতে হবে, অন্য ভাষায় তা পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।' এভাবে শয়তান সওয়াবের লোভ দেখিয়ে মানুষকে দূরে রাখার চেষ্টা করে।

শয়তান আবার এভাবে ধোকা দেয় যে, 'কোরআন হলো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এ গ্রন্থ সুমধুর সুরে পাঠ করলে সওয়াব অর্জন করা যায়। শুনলেও সওয়াব হয়। নামাজে তা পাঠ করতে হবে। প্রতিদিন সকালে ফজরের নামাজ আদায় করে তেলাওয়াত করলে সওয়াবে আমলনামা পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু এ গ্রন্থ যে শিক্ষাদর্শ মানুষের সামনে পেশ করেছে, তা ঐ যুগে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য ছিল, যখন তা অবতীর্ণ হয়েছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগে পৃথিবীর সার্বিক অবস্থা বড়ই জটিল। এখানে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা অবস্থান করছে। কোরআনের বিধান এ অবস্থায় প্রয়োগ করতে গেলেই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে। ফলে

পৃথিবীতে হানহানি সৃষ্টি হবে। সুতরাং, বর্তমানের এই জটিল অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অনুসারে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত করতে হবে। কোনক্রমেই রাজনীতির অপবিত্রতার অঙ্গনে কোরআনের ন্যায় পবিত্র গ্রন্থকে টেনে এনে অপবিত্র করতে দেয়া হবে না।'

এভাবে শয়তান কোরআনে থেকে হেদায়াত লাভ করা থেকে মানুষকে বিরত রাখে। কোরআনের মাহফিল অনুষ্ঠিত হলে অসংখ্য মানুষ তা শুনতে যায়। এ মাহফিল যেন অনুষ্ঠিত হতে না পারে, এ জন্য শয়তান তার অনুগতদের দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আবার শয়তান কোরআনের মাহফিলে মানুষ যেন যেতে না পারে, সে পথেও নানা ধরনের বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে। যারা বাধাতিক্রম করে মাহফিলে যায়, তারাও যেন মনোযোগের সাথে কোরআন শুনতে না পারে, এমন অবস্থা তাদের ভেতরে সৃষ্টি করে দেয়।

এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আ'রাফে বলেছেন, আমার কোরআন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। যিনি তোমাদেরকে কোরআন শোনাচ্ছেন, তোমার পূর্ণ চেতনা একমাত্র তাঁর দিকেই নিবিষ্ট করে কোরআন শোনো। যখন আমার কিতাব থেকে তোমাদেরকে শোনানো হয়, তখন এমন পরিবেশের সৃষ্টি করো না, যাতে আমার বাণী অনুধাবন করতে কোন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়। কোরআন অনুধাবন করে যারা সত্য পথ লাভ করেছে, আমার রহমত তাদের ওপরে বর্ষিত হচ্ছে। তুমিও কোরআন শুনে সত্য পথ লাভ করে আমার রহমতের অংশ নিতে পারো।

কোরআন কোন অবস্থায় স্পর্শ করা যেতে পারে

আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র এবং তাঁর বাণীও পবিত্র। তাঁর বাণী সম্বলিত পবিত্র কোরআন কোন অবস্থাতেই অপবিত্র শরীরে স্পর্শ করা যাবে না। এ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব স্পর্শ করতে হলে স্পর্শকারীকে অবশ্যই শরীর ও পোষাকের দিক দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। এ কোরআনের মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

انَّه لَقُرانٌ كَرِيْمٌ - فِيْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ - لاَيَمَسُّه الاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ - تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعلَمِيْنَ-

প্রকৃতপক্ষে এটা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কোরআন। একটি সুরক্ষিত গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে লিপিবদ্ধ, যা পবিত্রতম সত্তা (ফেরেশ্তাগণ) ব্যতীত আর কেউ স্পর্শ করতে সক্ষম নয়। এটা রাব্বুল আলামীনের অবতীর্ণ করা। (সূরা ওয়াকী'আ–৭৭-৮০)

আল্লাহর এই কোরআন এক নিখুঁত মাত্রায় পরস্পর সংযুক্ত ও সুসংবদ্ধ জীবন বিধান হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে চরিত্র, ইবাদাত, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা, আইন ও আদালত, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ ও সন্ধিনীতি তথা মানব জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র ও বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ; বিস্তীর্ণ ব্যবস্থা-বিধান দান করা হয়েছে। এ কোরআনে কোন একটি জিনিসও অপর কোন একটি জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন ও

অসামঞ্জস্যমূলক নয়। এ কিতাবে যা বর্ণিত হয়েছে তা অবিচল; অপরিবর্তনীয় এবং এর সম্মান ও মর্যাদার দিকে দৃষ্টি রেখে তা অপবিত্রাবস্থায় পাঠ করা দূরে থাক, স্পর্শ করার অনুমতিও দেয়া হয়নি।

মানুষকে অপবিত্রতা মুক্ত করে সৃষ্টি করা হয়নি। পক্ষান্তরে আল্লাহর ফেরেশ্তাগণ যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। এ কোরআনে ফেরেশতাদের সত্তা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে 'পবিত্রতম সত্তা'। তাঁরা এ কোরআন যখন তখন স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু এই মানুষের দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে অপবিত্রতা। তা দেহের বাইরে নির্গত হলে কোন সময় মানুষের ওপরে গোসল ফরজ হয়ে দাঁড়ায়। আবার কোন অপিবত্রতা দেহ থেকে বাইরে এলে অজু করা আবশ্যক হয়। এ জন্য এসব অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে, পবিত্র স্থানে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করতে হবে। এ বিষয়ে একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, শয়তান স্বয়ং অপবিত্র এবং সে অপবিত্রতা পছন্দ করে। কোরআনের পাঠককে সে যদি অপবিত্র অবস্থায় পায়, তাহলে অতি সহজে সে তাকে প্রতারণা করতে সক্ষম হয়। এ জন্য আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন কালে পবিত্রতা অর্জনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

রাসূল কিভাবে কোরআন পাঠ করতেন

পবিত্র কোরআন যে মহামানবের ওপরে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাঁকে এ কিতাবের পঠনরীতিও শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ এ কিতাব যাঁর বাণী তিনিই তাঁকে তা পাঠ করার উপযুক্ত রীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতিতে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, তা ছিল মহান আল্লাহর শিখানো এবং সহীহ শুদ্ধ রীতি। ঐ একই রীতিতে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে পবিত্র কোরআনের অনুসারীদেরকে। আল্লাহর রাসূল কখনো দ্রুত গতিতে কোরআন তেলাওয়াত করতেন না। তিনি এমন রীতিতে তেলাওয়াত করতেন যে, প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট বুঝা যেত। তাঁর তেলাওয়াত শুনে পাঠক অনুভব করতে পারতো, আল্লাহ তা'য়ালা কি বলছেন। আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত শুনে শ্রবণকারী প্রভাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তেলাওয়াতের রীতি যদি এমন হয় যে, শ্রোতা রীতিমতো বিরক্তি বোধ করে অথবা তা অস্পষ্ট, এভাবে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে না। এ কিতাব তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূল প্রদর্শিত রীতিই অনুসরণ করতে হবে।

বুঝে স্পষ্ট উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহ কি বলছেন, তা তেলাওয়াতকারী যেমন বুঝতে পারে এবং তার ওপরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, এমন কোন আয়াত পাঠ করা হচ্ছে, যে আয়াতে আল্লাহর মূল সত্তা ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সে আয়াত তেলাওয়াত করার ফলে মহান আল্লাহর বিরাটত্ব ও মহানত্ব তেলাওয়াতকারীর হৃদয়-মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। আবার যে আয়াতে আল্লাহর রহমত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, সে আয়াত পাঠ করার সময় আল্লাহর শোকরের আবেগে মন-মানসিকতা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এভাবে যে আয়াতে আযাবের কথা বলা হয়েছে, তা পাঠ করার ফলে হৃদয়ে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। এক কথায় কোরআন পাঠ করার বিষয়টি যেন শুধুমাত্র শব্দের

উচ্চারণ ও ধ্বনি তোলার মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রেখে তেলাওয়াত গভীর চিন্তা-ভাবনা, অনুধাবন ও হৃদয়ংগম করা পর্যন্ত প্রসারিত করতে হবে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, এ ব্যাপারে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি জানিয়ে ছিলেন যে, আল্লাহর রাসূল প্রতিটি শব্দ টেনে দীর্ঘ করে পাঠ করতেন। তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এমনভাবে পাঠ করতেন যে, আল্লাহ রাহমান ও রাহীম এই শব্দগুলো খুব বেশী টেনে টেনে পাঠ করতেন। (বোখারী)

হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আল্লাহর রাসূল কিভাবে কোরআন পাঠ করতেন। তিনি জানিয়ে ছিলেন, আল্লাহর রাসূল এক একটি আয়াত পৃথক পৃথকভাবে পাঠ করতেন এবং প্রতি আয়াত পাঠ করে থামতেন। যেমন আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন পাঠ করে থামতেন। তারপর আর রাহমানির রাহীম পাঠ করে থামতেন। এর পরে পাঠ করতেন মালিকি ইয়াও মিদ্দিন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক একটি শব্দ সুস্পষ্ট উচ্চারণ সহকারে পাঠ করতেন। (তিরমিযী, নাসায়ী)

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একদিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমি রাতে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন দেখলাম তিনি কোরআন এমনভাবে পাঠ করছেন যে, যেখানে আল্লাহর প্রশংসা করার কথা বলা হয়েছে, সেখানে তিনি প্রশংসা করছেন। যেখানে দোয়া চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে তিনি দোয়া করছেন। যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় লাভের কথা বলা হয়েছে, সেখানে তিনি আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতেন। (মুসলিম, নাসায়ী)

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একদিন রাতে আল্লাহর রাসূল নামাজে কোরআন পাঠ করছিলেন। তিনি যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন–

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

'হে আল্লাহ ! তুমি যদি তাদেরকে আযাব দাও, তাহলে তুমি তা দিতে সক্ষম। কারণ তারা তো তোমারই বান্দাহ্ মাত্র। আর তুমি যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তা করার ক্ষমতা তোমারই ইখতিয়ারে। কেননা তুমি তো সর্বজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী।' তিনি এই আয়াতটি বার বার পড়তে লাগলেন। আর এভাবে প্রভাত এসে গেল। (বোখারী, মুসনাদে আহমাদ)

অনেকে যেমন এক নিঃশ্বাসে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে থাকেন। রাসূল কখনো এমন করতেন না। তিনি প্রতিটি আয়াতের শেষে বিরতি দিয়ে তারপর পরবর্তী আয়াত পাঠ করতেন। এর ফলে শ্রোতারা বুঝতে পারতো, কি পাঠ করা হচ্ছে এবং সে আয়াতে আল্লাহ কি বলছেন তার মনে কোরআনের প্রভাব সৃষ্টি হতো।

রাতের নির্জন পরিবেশে কোরআন তেলাওয়াত

অধ্যয়ন, সাধনা ও অনুধাবনের উপযুক্ত পরিবেশ হলো নির্জনতা। একাজগুলো নির্জন পরিবেশ ব্যতীত সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন হতে পারে না। জনকোলাহলপূর্ণ পরিবেশে একাগ্রতা সৃষ্টি হয় না। এ জন্য উল্লেখিত কাজগুলো সম্পাদন করার উপযুক্ত পরিবেশ হলো রাতের নির্জনতা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ জন্য রাতকে অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দান করেছেন। রাতে নামাজ আদায় ও কোরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন-

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلاً-

প্রকৃতপক্ষে রাতে শয্যা ত্যাগ করে ওঠা আত্মসংযমের জন্য অত্যন্ত বেশী কার্যকর এবং কোরআন যথাযথভাবে পাঠ করার জন্য যথার্থ। (সূরা মুয্যাম্মিল-৬)

যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সম্পাদন করা হবে, সে কাজ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতে হবে। কাজের ভেতরে যদি প্রদর্শনেচ্ছা বিদ্যমান থাকে, তাহলে সে কাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুল করার প্রশ্নই ওঠে না। কিয়ামতের ময়দানে এমন অনেক শহীদকে দেখা যাবে, সে জিহাদের ময়দানে জীবন দান ঠিকই করেছে, কিন্তু তার শাহাদাত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছিল না। তার মনে এ উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল যে, মানুষ তার বীরত্ব দেখবে, তার মৃত্যুর পরে তাকে জাতিয় হিরো হিসাবে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হবে, এ উদ্দেশ্যেই সে জিহাদের ময়দানে জীবন দান করেছিল। আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি তো আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জীবন দান করোনি, তুমি জীবন দিয়েছিলে তোমার সুনাম বৃদ্ধি করার আশায়। তোমার মৃত্যুর পরে পৃথিবীতে মানুষ তোমার সুনাম করেছে। সুতরাং, তুমি তোমার প্রাপ্য লাভ করেছো। আজ তোমার প্রাপ্য হলো জাহান্নাম।

এভাবে অনেক নামাজীকে, রোজা পালনকারীকে, হজ্জ আদায়কারীকে, দানকারীকে বলা হবে, লোকে তোমাকে নামাজী বলবে, পরহেজগার বলবে, হাজী সাহেব বলবে, এসব লক্ষ্যে তুমি নামাজ-রোজা-হজ্জ আদায় করেছো। দানবীর উপাধি লাভের আশায় দান করেছো। তোমার কোন কাজ আমাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ছিল না। সুতরাং আজ আমার কাছ থেকে তোমাদের প্রাপ্য কিছুই নেই।

মহান আল্লাহ রাতকে এ জন্য বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন যে, রাতের নির্জনতায় আরামের শয্যা ত্যাগ করে মানুষ যখন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে সেজদা দেয়, সে সেজদার মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছা থাকে না। নির্জন নিস্তব্ধ নিঝুম পরিবেশে আল্লাহর কিতাব বান্দাহ যখন পাঠ করে আল্লাহকেই শোনায়, তখন সে পাঠের ভেতর দিয়ে এক অনাবিল জান্নাতী আবেশের সৃষ্টি হয়।

তাছাড়া কোরআন অধ্যয়নের জন্য রাতই উপযুক্ত সময়। এ সময়ে কানে কোন কোলাহল আসে না, পৃথিবীতে জীবন ধারণ করার কোন উপকরণের চিন্তায় মনভারাক্রান্ত থাকে না। মন-মস্তিষ্ক থাকে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত-উন্মুক্ত। আল্লাহর কোরআন এ সময়ে অধ্যয়ন করে অনুধাবন করার তখনই উপযুক্ত সময়। রাতের ইবাদাতের মর্যাদাও আল্লাহর কাছে অনেক বেশী। রাতে

নামাজের জন্য শয্যা ত্যাগ করে ওঠা এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। গোটা দিনের কর্মক্লান্ত দেহ-মন এ সময় বিশ্রাম কামনা করে। এ সময়ে দেহ-মনকে বিশ্রাম লাভের সুযোগ না দিয়ে নামাজ আদায়-কোরআন তেলাওয়াত অবশ্যই সাধনার বিষয়। এ সাধনা মানুষের কুপ্রবৃত্তি দমন করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি প্রবল কার্যকর পন্থা সন্দেহ নেই। এভাবে যে ব্যক্তি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং নিজের দেহ-মনের ওপর প্রবল প্রতিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে, নিজের যাবতীয় শক্তিমত্তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়, সে ব্যক্তি সর্বাধিক দৃঢ়তার সাথে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রসর হতে এবং পৃথিবীর বুকে এ আন্দোলনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে ভূমিকা রাখতে পারে।

রাতের নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াত মানুষের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টির একটি কার্যকর পদ্ধতি। কারণ গভীর রাতে বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যে প্রতিবন্ধক ও অন্তরাল সৃষ্টিকারী কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। এ সময়ে বান্দাহ আল্লাহর কাছে যা বলে, তা তার হৃদয়ের অতল তলদেশ থেকে উত্থিত কথাগুলোই বলে থাকে। এসবে কোন ধরনের প্রদর্শনেচ্ছার স্পর্শ থাকে না। রাতের ইবাদাত হলো মানুষের বাইরের চরিত্র আর ভেতরের প্রকৃত চরিত্রে সাম স্যতা সৃষ্টির উৎকৃষ্ট মাধ্যম। ব্যক্তি দিনের আলোয় মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজে, কোরআন তেলাওয়াতে সময় ব্যয় করতে পারে। কিন্তু গভীর রাতে যখন সবাই গভীর সুসুপ্তিতে নিমগ্ন থাকে, তখন ব্যক্তি সবার অগোচরে কোরআন তেলাওয়াত করে, নামাজ আদায় করে, এগুলো সে করে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই।

দিনের নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াত রাতের নামাজ-কোরআন তেলাওয়াতের তুলনায় অনেক সহজ। ঘুমে দু'চোখ যখন বন্ধ হয়ে আসতে চায়, দেহ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চায়, এসব কিছুকে উপেক্ষা করে মানুষ যখন নামাজে-তেলাওয়াতে নিমগ্ন হয় এবং এটা যদি অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মানুষের ভেতরে অবিচলতা ও স্থিতিশীলতার গুণাবলী সৃষ্টি হয়। ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে সে অধিক দৃঢ়তা সহকারে এগিয়ে যেতে থাকে। বাতিল সৃষ্ট যাবতীয় কঠিন পরিস্থিতি, সে অবিচলতা ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

কোরআন তেলাওয়াতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপকারিতা

মানুষ যে কোন কর্মই সম্পাদন করুক না কেন, সে কর্মের একটি ফল অবশ্যই সে লাভ করে থাকে। যে কাজে কোল ফল লাভ করা যাবে না, জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন কোন মানুষের পক্ষে সে কাজে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। মানুষ তার শ্রমের বিনিময় লাভ করবে, মনে আশা নিয়েই সে শ্রমদান করে থাকে। অনুরূপ আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াতকারী ও নামাজ আদায়কারী যদি তেলাওয়াত ও নামাজের মাধ্যমে কোন ফল লাভ না করে, তাহলে এটা বুঝতে হবে, তার কোরআন তেলাওয়াত ও নামাজ আদায় যেমনভাবে হওয়া উচিত, তেমনভাবে হচ্ছে না। ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর লোমহর্ষক নির্যাতনের মুখে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষের শক্তি অবিচলতা ও দৃঢ়তা মাত্র দুটো জিনিসের মাধ্যমে অর্জন করতে সক্ষম হয়। তার একটি যথাযথভাবে নামাজ আদায় এবং অপরটি কোরআন অধ্যয়ন।

কারণ নামাজ ও কোরআন আন্দোলনের কর্মীদেরকে এমন সুগঠিত চরিত্র ও উন্নত অনুপম ...তার অধিকারী করে গড়ে তোলে এমন শক্তি তার ভেতরে সঞ্চারিত করে, যে শক্তির সাহায্যে সে বাতিলের প্রবল কঠোরতা ও নির্যাতনের মোকাবেলায় শুধু টিকেই থাকে না, বাতিলের গতিকে স্তব্ধ করে দিতেও সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মানুষ এ শক্তি তখনই অর্জন করতে পারে, যখন সে কোরআনের শব্দগুলো পাঠ করেই ইতি-কর্তব্য পালন করে না, বরং কোরআন প্রদর্শিত শিক্ষাসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন করে তা বাস্তবায়িত করার জন্য চেষ্টা সাধনায় নিয়োজিত হয়। কোরআনের শিক্ষা তার দেহের শিরা উপশিরায় প্রবাহিত করে। নামাজের বিষয়টিও ঠিক তেমনি। একটার পর আরেকটা সেজদা আর শারীরিক কসরতের মধ্যে নামাজকে সীমাবদ্ধ না রেখে যারা নামাজের শিক্ষাকে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করে, তখনই নামাজ তার ভেতরে শক্তি সৃষ্টি করে। এই শক্তির বলেই সে আল্লাহর পছন্দের বিপরীত পথ থেকে নিজেকে হেফাজত করতে সক্ষম হয়।

কোরআন তেলাওয়াতকারীর তেলাওয়াত কণ্ঠনালী অতিক্রম করে তার মনের গহীনে যদি পৌঁছতে না পারে, তার হৃদয়তন্ত্রীতে যে তেলাওয়াত আঘাত করতে সক্ষম হয় না তাকে জিহাদের ময়দানে বাতিল শক্তির মোকাবিলায় ঐ তেলাওয়াত শক্তি সরবরাহ করা তো দূরের কথা, তার ঈমান ঠিক রাখার শক্তিই সরবরাহ করতে সক্ষম হয় না। এ ধরনের কোরআন তেলাওয়াতকারীগণ মানুষের কাছে পরহেজগার হিসাবে সুনাম অর্জন করলেও সে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি মোটেও অর্জন করতে সক্ষম হয় না। এই শ্রেণীর কোরআন তেলাওয়াতকারী সম্পর্কেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

يقرآون القران ولايجاوز حناجرهم - يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية-

তারা কোরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে অবতরণ করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমনভাবে ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়। (বোখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা)

প্রকৃতপক্ষে যে তেলাওয়াত ও অধ্যয়নের পরে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, বাস্তব জীবনে চরিত্র ও কর্মনীতিতে কোরআনের কোন প্রভাব দেখা যায় না; কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না, কোরআনের বিপরীত কোন কর্মকান্ড ত্যাগ করে না, আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না, কোরআন যা হালাল করেছে, তা হালাল বলে গ্রহণ করে না, কোরআন যা হারাম করেছে, তা থেকে বিরত থাকে না, কোরআনের বিপরীত রাজনীতি ত্যাগ করে না, কোরআন যাদেরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে, তাদেরকে পরিত্যাগ করে না, একজন মুসলমানের কোরআন তেলাওয়াত-অধ্যয়ন এমন হতে পারে না। হযরত সুহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল বলেন–

ما امن بالقران من استحل محارمه-

কোরআন কর্তৃক হারাম জিনিসকে যে হালাল করে নিয়েছে, সে কোরআনের প্রতি ঈমান আনেনি।

যারা কোরআন তেলাওয়াত-অধ্যয়ন ও কোরআনের তাফসীর শোনার পরেও নিজেদের চরিত্র সংশোধন করতে সক্ষম হয়নি, আত্মিক উন্নতি হয়নি, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোন চেষ্টা-সাধনা করেনি, তাদের তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন কোরআনের প্রতি বিদ্রূপ করার শামিল। এ ধরনের লোকগুলো আল্লাহর মোকাবেলায় যেমন নিজেদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে তেমনি নিজেদের বিবেকের কাছেও চরম নির্লজ্জ হিসাবে নিজেকে প্রকাশিত করে। এ লোকগুলোর চরিত্র বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কারণ যে ব্যক্তি এ কিতাবকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকৃতি দেয় এবং তা পাঠ করে কোরআনের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়, তারপরও সে আল্লাহর পছন্দের বিপরীত কর্মকান্ডে জড়িত হয়, সে তো সরাসরি আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করে বসে। এরা আল্লাহর কোরআনে সূরায়ে ইমরাণে পাঠ করেছে-

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ-

মানুষ কি আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে অন্য বিধান অনুসন্ধান করে? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা সবই স্বেচ্ছায় হোক এবং অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে (ইসলাম গ্রহণ করেছে)। আর তাঁরই দিকে সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

কোরআন তেলাওয়াত করছে, অধ্যয়ন করছে-জানতে পারছে এটা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, তারপরও এ লোকগুলো কোরআনের বিপরীত মতবাদ মতাদর্শের অনুসরণ করছে, সেসব মতবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোকে সহযোগিতা করছে; এরা তো আল্লাহর মোকাবিলায় বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করে। না জানার কারণে এমন করছে না বরং জেনে বুঝেই এরা এই ভূমিকা পালন করছে। এদের সম্পর্কে সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ-

নিশ্চিত জেনো, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং তার মোকাবেলায় বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরোজা কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততটাই অসম্ভব, যতটা অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উটের গমন।

কিয়ামতের ময়দানে আদালতে আখিরাতে স্বয়ং কোরআন এদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। এ বিষয়টিকে আল্লাহর রাসূল তাঁর বক্তব্যে এভাবে উপস্থাপন করেছেন-

الـقـران حـجـة لـك اوْ عـلـيـك-

কোরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ। (মুসলিম)

আল্লাহর এ কিতাবকে যদি যথাযথভাবে তেলাওয়াত করা হয়; অধ্যয়ন করে তা অনুসরণ করা হয় তাহলে এ কোরআন তার জন্য সাক্ষী ও প্রমাণ হয়ে দেখা দেবে। পৃথিবী থেকে আখিরাত পর্যন্ত চলার পথে যেখানে তাকে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, সেখানেই কোরআন তার জন্য সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। কোরআনের তেলাওয়াতকারী ও অধ্যয়নকারী বলতে সক্ষম হবে, পৃথিবীতে আমি যে কাজই করেছি তা এই কিতাবের নির্দেশেই করেছি। যদি মানুষের কাজ প্রকৃতপক্ষেই কোরআনের আদর্শ অনুযায়ী হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীতেও কোন ইসলামী বিচারক তাকে গ্রেফতার করতে পারবে না এবং আখিরাতের ময়দানেও তাকে গ্রেফতার করা হবে না।

আর যে ব্যক্তি এই কোরআন থেকে জেনেছে, তাকে কোরআনের বিধি-নিষেধ অনুসরণ করে চলতে হবে, কোরআনের রাজনীতি করতে হবে; কোরআন পরিবেশিত অর্থনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে, কোরআনের শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কোরআনের বিচার নীতি অনুসারে বিচার কার্য পরিচালনা করতে হবে। এসব জেনেও যে ব্যক্তি কোরআন বিরোধী কর্মনীতি অবলম্বন করবে, তখন এ কোরআন সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহর বিচারালয়ে এ কোরআন তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাকে আরো শক্তিশালী করবে। পরিশেষে তাকে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে।

রাসূল কর্তৃক কোরআনে পরিবর্তন ঘটেনি

এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে যেসব মহামানবদেরকে নবী-রাসূল হিসাবে নির্বাচিত করেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগত করার মুহূর্তকাল পূর্বেও তাঁদের কল্পনাতেও আসেনি, তাঁরা নবী-রাসূল হিসাবে মনোনীত হতে যাচ্ছেন। সুতরাং, তাঁদের নিজস্ব কোন শক্তি বা ক্ষমতা থাকার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। তাঁরা ইচ্ছা করলেই মানুষকে কোন ধরনের নিদর্শন দেখাতে পারেন না। আল্লাহ বলেন-

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ-

আর আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত নিজেই কোন নিদর্শন এনে প্রদর্শন করবে, কোন রাসূলেরই এ শক্তি ছিল না। (সূরা আর-রা'দ-৩৮)

পবিত্র কোরআন যখন অবতীর্ণ হলো তখন এর বিধি-বিধানের মধ্যে কায়েমী স্বার্থবাদীর দল নিজেদের মৃত্যু দেখতে পেলো। তখন তারা বিশ্বনবীর কাছে দাবীনামা পেশ করলো যে, এই কোরআনের পরিবর্তে অন্য কোন কোরআন নিয়ে এসো অথবা এসব বিধান পরিবর্তন করো। বিষয়টি মহান আল্লাহ এভাবে বলেছেন-

قَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَرجُوْنَ لِقَاءَ نَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْبَدِّلْهُ - قُلْ

مَايَكُوْنُ لِىْ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاىِٔ نَفْسِىْ - اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَايُوْحٰى اِلَىَّ-

এরা বলে, এর পরিবর্তে অপর কোন কোরআন নিয়ে এসো অথবা এর মধ্যেই কোন পরিবর্তন সূচিত করো। (হে রাসূল !) তাদেরকে বলো, আমার এ কাজ নয় যে, আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নেবো। আমি তো শুধু সেই ওহীরই অনুসারী, যা আমার কাছে প্রেরণ করা হয়। (সূরা ইউনুস-১৫)

পৃথিবীর কোন শক্তির সাধ্য নেই যে, এই কোরআনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে সক্ষম হয়। এ ক্ষমতা তাঁকেও দেয়া হয়নি, যাঁর ওপরে তা অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহ তা'য়ালা যা অবতীর্ণ করেন, তা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারেই অবতীর্ণ করেছেন। এসব বিধান পৃথিবীর কোন সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা হয় না যে, জনরোষের ভয়ে তা পুনরায় পরিবর্তন করা যেতে পারে। আল্লাহর ওহী অপরিবর্তনীয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে আইন-কানুন বা জীবন বিধান হিসারে কোন ওহী আর কিয়ামত পর্যন্ত অবতীর্ণ হবে না। সুতরাং, এতে কোন পরিবর্তনও সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন-

وَمَاكَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ-

আর এই কোরআন এমন কোন জিনিস নয় যে, আল্লাহর ওহী ও শিক্ষা ব্যতীত রচনা করে নেয়া যেতে পারে। (সূরা ইউনুস-৩৭)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর রাসূল নিজ থেকে বানিয়ে কোন কথা বলেন না; তিনি যা ওহী করেন-রাসূলের মুখ থেকে আল্লাহর বাণী হিসাবে তাই উচ্চারিত হয়। শুধু তাই নয়, এ কথা ধমকের সুরে বলেছেন, আমার রাসূল যদি কোন কথা নিজ থেকে বানিয়ে বলতেন, তাহলে আমি তার কণ্ঠনালী টেনে ছিঁড়ে দিতাম। সুতরাং, কোরআনে যে বিধি-বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে কোন ধরনের পরিবর্তন রাসূল কর্তৃক সূচিত হবার কোন অবকাশ ছিল না। আর মহান আল্লাহ এমন অক্ষম নন যে, কোন বিধান রচনার জন্য কোন মানুষের সহযোগিতা তাঁর প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং সম্পূর্ণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন-পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী।

কোরআনের বিকৃত ঘটানো অসম্ভব

মানব জাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী-রাসূল প্রেরণ করে তাদের ওপরে কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, যেন তাঁরা আল্লাহর অভিপ্রায় অনুসারে মানব গোষ্ঠীকে পরিচালিত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত ঈসা রুহুল্লাহ আগমন করেন। এই ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। তাঁর ওপরে পবিত্র কোরআন মানব জাতির জীবন ব্যবস্থা হিসাবে অবতীর্ণ করা হয়। কোরআনের পূর্বে যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তা যথাযথ বৈজ্ঞানিক পন্থায় সংরক্ষণ করার কোন ব্যবস্থা না থাকায় মূল কিতাব বিকৃত হয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে কোরআন অবতীর্ণ হবার সাথে

সাথে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সমকালীন লোকজন থেকে শুরু করে, বর্তমানকাল পর্যন্ত এই কোরআন মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই, যে গ্রন্থ দাড়ি, কমা এবং সেমিকোলনসহ মুখস্থ করে রাখা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ এ কোরআনকে মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। অতীতে যেমন অসংখ্য মানুষ এ কোরআন মুখস্থ করে স্মৃতির পাতায় থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন, বর্তমানেও রাখছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যহত থাকবে। মানুষ একটু চেষ্টা করলেই তা মুখস্থ করতে পারে।

এ জন্য কোরআনের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোন অবকাশ নেই। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে প্রচার মাধ্যমে কোন একজন কোরআন তেলাওয়াত করছে, যদি সে কোথাও সামান্য একটু ভুল করে, তাহলে পৃথিবীর অপর প্রান্তে বসে শ্রবণরত হাফেজে কোরআন তা শোনার সাথে সাথে বুঝতে পারবে, তেলাওয়াতকারী অমুক স্থানে ভুল উচ্চারণ করেছে। পরক্ষণেই গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাফেজে কোরআনগণ সেই তেলাওয়াতকারীকে জানিয়ে দেবে, অমুক আয়াতে সে ভুল উচ্চারণ করেছে বা তেলাওয়াতের সময় অমুক শব্দ বাদ পড়েছে। এভাবে পবিত্র কোরআন অবিকৃত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাঁর কিতাব পাঠ করার একটি নিয়ম চিরপ্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে। সে নিয়মটি হলো, কোরআন যে ভাষায় যে ভঙ্গীতে অবতীর্ণ হয়েছে, ঐ ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় এই কিতাব তেলাওয়াত করা যাবে না। এ কিতাব যে কোন ভাষায় অনুবাদ করা যেতে পারে, যে কোন ভাষার মাধ্যমে তা অনুধাবন করা যেতে পারে এবং তা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোরআনের অবিকৃত আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় তা তেলাওয়াত করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

এই সুযোগ যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে করে দেয়া হতো, তাহলে এ কিতাবে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার সুযোগ থাকতো। যে কোন ধরনের বিকৃতি থেকে হেফাজত করার লক্ষ্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সূরা হিজর-এ আল্লাহ বলেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ–

আর বাণী, একে তো আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাঁর ওপরে অবতীর্ণ করেছি, তিনি তা স্বয়ং রচনা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তোমরা যারা আমার কিতাবের বিরোধিতা করছো, জেনে রেখো, এতে করে আমার এ কিতাবের কোন ক্ষতি তোমরা করতে পারবে না। এ কিতাব প্রত্যক্ষভাবে আমার হেফাজতে রয়েছে। গোটা পৃথিবীতে যারা তোমরা কোরআন বিরোধী রয়েছো, তারা সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালালেও আমার কিতাবকে বিলুপ্ত করতে পারবে না। তোমরা একে কোণঠাসা করে রাখতে চাইলেও তা পারবে না। তোমাদের আপত্তি,

নিন্দাবাদ, মিথ্যা প্রচার-প্রচারণার কারণেও আমার কিতাবের সম্মান-মর্যাদা বিন্দুমাত্র কমবে না। তোমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মুখেও এ কোরআনের আন্দোলন থেমে থাকবে না। এ কোরআনকে কোনক্রমেই তোমরা বিকৃত বা এর ভেতরে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে সক্ষম হবে না।

কোরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার ইতিহাস

প্রথম দিকে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদেরকে বলা হয় সাবিকুনাল আওয়ালিন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাদেরকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, সহায়-সম্পদ হারাতে হয়েছে, আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে। এভাবে একের পর এক কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁদের ঈমানী শক্তি বিকশিত হয়েছিল এবং দৃঢ়তা লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে মক্কা বিজয়ের পরে ইসলামের সোনালী দিনে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে কোন ধরনের পরীক্ষা দিতে হয়নি বা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। ফলে যে পরিবেশে ঈমানী শক্তি বিকশিত হয় এবং দৃঢ়তা লাভ করে, সে পরিবেশ তাঁরা পাননি।

এ জন্য যুক্তি সংগত কারণেই সাহাবাদের মধ্যে এ দুটো দলের সম্মান ও মর্যাদা সমপর্যায়ের হয়নি। এরপর আরেকটি দল ছিল ইতিহাসে যাদেরকে তোলাকা বলা হয়েছে। তোলাকা মানে হচ্ছে, মক্কার এমন এক বংশ, যারা শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী ছিল। মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূল তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত মুআবিয়া, ওয়ালীদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং মারওয়ান ইবনুল হাকামও সেই ক্ষমাপ্রাপ্ত বংশের লোক ছিলেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেন, তারপর থেকেই এই তোলাকাদের মধ্য থেকে এবং আরবের অন্যান্য এলাকার কিছু লোকজন ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিলো। এদের এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য রাসূলের সাহাবাগণকে যুদ্ধের মুখোমুখী হতে হয়েছিল। এসব যুদ্ধে পবিত্র কোরআনের অসংখ্য হাফিজ শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

বিষয়টি সম্পর্কে বোখারী শরীফে এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, যে সময়ে ইয়ামামার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে অসংখ্য সাহাবা শাহাদাত বরণ করলেন। তারপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হয়ে দেখলাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও সেখানে উপস্থিত আছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আমাকে বললেন, ওমর আমার কাছে এসেছে এবং পরামর্শ দিচ্ছে, ইয়ামামার যুদ্ধে কোরআনের অসংখ্য কারী (যাদের কোরআন মুখস্থ ছিল এবং মানুষকে তা পড়ে শোনাতেন এবং শিক্ষা দিতেন) শহীদ হয়েছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, অন্যান্য যুদ্ধেও যদি কোরআনের কারীগণ শাহাদাত বরণ করেন, তাহলে কোরআনের বিরাট অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এ জন্য আমার রায় হচ্ছে এই যে, আপনি কোরআনকে একত্রিত (গ্রন্থাকারে) করার নির্দেশ দেন।

আল্লাহর কোরআনের অধিক সংখ্যক হাফিজগণ শহীদ হয়ে যাবার পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু চিন্তা করেছিলেন, এভাবে যদি তাঁরা পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে থাকেন, তাহলে তো একদিন গোটা কোরআনই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট যা টিকে থাকবে, তাতেও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটতে পারে। এ জন্য তিনি শুধু স্মৃতির পাতায় কোরআন সংরক্ষণের একমাত্র ব্যবস্থার সাথে সাথে কাগজের পাতায় তা লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সে লক্ষ্যেই তিনি খলীফাতুর রাসূলের কাছে নিজের মতামত দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরেছিলেন।

বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ওমরের কথা শুনে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'আল্লাহর রাসূল যে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি, সে কাজ আপনি কিভাবে করতে পারেন ?'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, 'আল্লাহর শপথ ! এটা খুবই উত্তম কাজ।' এভাবে তিনি যুক্তি উত্থাপন করতে থাকেন। হযরত আবু বকরের মধ্যে প্রথম দিকে কিছুটা দ্বিধা সংকোচ থাকলেও পরে তিনি এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'পরবর্তীতে আল্লাহ তা'য়ালা এ কাজের জন্য আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিলেন। ওমরের মতামতের সাথে আমার অভিমত মিলে গেল।'

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ব্যক্তিগত সচিব। তিনি বলেন, 'খলীফাতুর রাসূল আমাকে বললেন, বয়সে তুমি নবীন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দান করেছেন। তুমি রাসূলের ওহী লেখার কাজেও নিয়োজিত ছিলে। তোমার দায়িত্ব হলো, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কোরআনের অংশসমূহ একত্র করা।'

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহর শপথ ! তিনি যদি আমাকে পাহাড় তুলে আনার নির্দেশ দিতেন তাহলে এটা আমার কাছে এতটা কঠিন মনে হতো না–যতটা কঠিন মনে হচ্ছে তার এই কাজের নির্দেশ। আমি আবেদন করলাম, আপনি এ কাজ কেমন করে করবেন যা রাসূল করেননি ?'

তিনি জবাব দিলেন, 'আল্লাহর শপথ ! এটা বড়ই উত্তম কাজ।' হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে এই মহান কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। আল্লাহর রাসূলের ওপর যখন যে ওহী অবতীর্ণ হতো, তা স্বয়ং রাসূলের নির্দেশে লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেসব অংশ জমা করা হলো। সাহাবাদের ভেতরে যার কাছে কোরআনের যে অংশ বা সম্পূর্ণ কোরআন পাওয়া গেল, তাও জমা করা হলো। সে সময় পর্যন্ত কোরআনের হাফিজ যাঁরা ছিলেন, তাদের কাছ থেকে যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করা হলো। এভাবে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা, সন্দেহ সংশয়ের সম্ভাবনা মুক্ত হয়ে আল্লাহর কোরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজে হাত দেয়া হলো। আল্লাহর কিতাব গ্রন্থাবদ্ধ করার পূর্বে এর প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে তাঁদেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলো, যাঁদের সামনে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যাঁরা তা কণ্ঠস্থ করে রেখেছিলেন ও ওহী লিখতেন।

সময়ের ব্যবধানে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নির্ভুল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখন কোরআনকে লিখিত একটি গ্রন্থের রূপ দেয়া সম্ভব হলো, তখন সেটা খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছেই রাখা হলো। তাঁর ইন্তেকালের পরে তা রাখার দায়িত্ব পালন করেছিলেন দ্বিতীয় খলীফা স্বয়ং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁর শাহাদাতের পরে তাঁরই কন্যা উম্মুল মুমিনীন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার কাছে আমনত রাখা হলো। লোকজনকে এ অনুমতি দেয়া হয়েছিল যে, তাঁরা সে কোরআন দেখে নিজের কাছে রক্ষিত কোরআনের সাথে তা মিলিয়ে নিতে পারে, সেটা নির্ভূল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

আল্লাহর এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল মক্কার কুরাইশদের ব্যবহৃত আরবী ভাষায়। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষার উচ্চারণ গোটা দেশে এক ধরনের নয়। এক একটি এলাকায় তা উচ্চারণগত দিক দিয়ে পৃথক ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়ে থাকে। গোটা আরবের ভাষা আরবী হলেও তা বিভিন্ন ধরনের ভঙ্গীতে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আরবের আরবী ভাষায় বিভিন্ন অঞ্চলে তখন যেমন পার্থক্য ছিল বর্তমানেও তেমনি পার্থক্য বিদ্যমান। একই বিষয়বস্তু আরবের এক এলাকায় এক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়, আবার অন্য এলাকায় তা ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই উচ্চারণগত পার্থক্যের কারণে বর্ণিত অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না। সাত হরফ বলতে হাদীসে এ বিষয়টিকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, কোরআন যদিও কোরাইশদের মধ্যে প্রচলিত বাকরীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু আরববাসীদের স্থানীয় উচ্চারণ ভঙ্গী ও বাকরীতিতে তা পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

একজন আরবী ভাষী লোক যখন আল্লাহর এই কিতাব পাঠ করে তখন ভাষার স্থানীয় পার্থক্য বর্তমান থাকার পরও অর্থ ও বিষয়বস্তুর মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না। কোরআনে নিষিদ্ধ বিষয় বৈধ হয়ে যায় আবার বৈধ বিষয় নিষিদ্ধ হয়ে যায় না, আল্লাহর একত্ব তথা তাওহীদের বর্ণনা পরিবর্তিত হয়ে শিরক মিশ্রিত হয় না।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে–হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একদিন আমি হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযামকে সূরা ফোরকান পাঠ করতে শুনলাম। কিন্তু আমি যেভাবে সূরাটি পাঠ করে থাকি, তার সাথে হিশামের পাঠে গরমিল লক্ষ্য করলাম। তখন আমি তার চাদর ধরে টানতে টানতে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে গিয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। রাসূল আমাকে আদেশ করলেন আমি যেন তাকে ছেড়ে দিই, তখন আমি রাসূলের নির্দেশ পালন করলাম। রাসূল তাকে সূরা ফোরকান পাঠ করতে বললেন, আমি যেভাবে তার মুখে পাঠ শুনেছিলাম, রাসূলের সামনেও তিনি সেভাবে পাঠ করলেন। রাসূল শুনে কোন আপত্তি না করে বললেন, কোরআন সাত হরফে অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং যেভাবে পাঠ করা সহজ সেভাবেই পাঠ করো।

এরপর সাহাবাদের সম্মিলিতি প্রচেষ্টায় আল্লাহর ইসলাম আরব সাম্রাজ্যের বাইরে ছড়িয়ে পড়লো। অসংখ্য অনারব ইসলাম কবুল করে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত হতে থাকলো।

এসব অনারবদের শিক্ষক ছিলেন আরবরাই। এসব শিক্ষকদের আরবী উচ্চারণ ভঙ্গী পৃথক ছিল। তাঁরা যাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তাঁদের পৃথক উচ্চারণ ভঙ্গীতেই তা শিক্ষা দিচ্ছিলেন। বিষয়টি বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। অনারব মুসলমান ও আরব মুসলমানদের মেলামেশার ফলে আরবী ভাষা অনারবদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছিলো।

ফলে যে যার মতো আঞ্চলিক উচ্চারণে কোরআন পাঠ করতে থাকলে অনারব নও মুসলিমদের মনে কোরআন সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হওয়া অসম্ভবের কিছু ছিল না। তারপর এ ধরনের সমস্যাও প্রকট হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছিল যে, এক এলাকার সাহাবী নামাজে কোরআন তেলাওয়াত করছেন তাঁর আঞ্চলিক উচ্চারণে, অন্য এলাকার সাহাবী তা শুনে সন্দেহে পড়ে যেতেন। যেমনটি হযরত ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমসহ অনেকের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। আল্লাহর কালাম অপরিচিত উচ্চারণ ও ভঙ্গীতে পাঠ করা নিয়ে সাহাবাদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভবের কিছু ছিল না। তারপর এ পার্থক্য অদূর ভবিষ্যতে মৌলিক বিকৃতি সৃষ্টি করতো না, এ নিশ্চয়তা ছিল না।

এ ধরনের নানা আশঙ্কা দেখা দেয়ার ফলে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রবীন সাহাবা–যাদেরকে সাবিকুনাল আওয়ালীন বলা হয়, তাঁদেরকে নিয়ে বৈঠক করে সবার মতৈক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, খলীফা তুর রাসূল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর প্রচেষ্টায় যে কোরআন লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেটাই এখন থেকে পঠিত হতে থাকবে। আর অন্য যেসব কোরআন রয়েছে, যা বিভিন্ন উচ্চারণ ভঙ্গীতে পাঠ করা হয়ে থাকে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। অবিলম্বে এই আইন কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হলো এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সংকলিত কোরআন মুসলিম জাহানে প্রচার করা হলো। কোরআন অবতীর্ণ হবার সময় যেভাবে তা সুসংবদ্ধ ও উন্নতমানের ছিল, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক সংকলিত কোরআন অনুরূপ তাই ছিল।

এ সম্পর্কে বোখারী শরীফে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আনাস ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান হযরত উসমানের কাছে এলেন। এটা সেই সময়ের কথা, যখন তিনি সিরিয় বাহিনীসহ আরমেনিয়া বিজয়ে ইরাকী বাহিনীর সাথে আযারবাইজান বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। লোকদের বিভিন্ন রীতিতে কোরআন পাঠ হযরত হুযাইফাকে উদ্বিগ্ন করে তুললো। তাই তিনি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! ইহুদী-খৃষ্টানদের মতো আল্লাহর কিতাবে বিভেদ সৃষ্টির পূর্বে আপনি এই জাতিকে রক্ষা করার চিন্তা-ভাবনা করুন।

এরপর হযরত উসমান হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে বলে পাঠালেন, আপনার কাছে যে কোরআন রয়েছে তা আমার কাছে প্রেরণ করুন। আমরা সেটা দেখে কপি করে তা আপনাকে ফেরৎ দেবো। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পাঠিয়ে

দিলেন। তারপর তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, হযরত সাঈদ ইবনে আ'স এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে হিশাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম-এ চারজনকে এ কাজে নিযুক্ত করলেন। তাঁরা হযরত আবু বকর কর্তৃক সংকলিত কোরআন থেকে আরো কয়েকটি কপি প্রস্তুত করবেন।

এই চারজনের মধ্যে কোরাইশ বংশের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, হযরত সাঈদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমদেরকে নির্দেশ দিলেন, যদি কখনো কোরাআনের কোন জিনিস নিয়ে তোমাদের সাথে যায়েদের মতানৈক্য হয়, তাহলে তোমরা কোরআনকে কোরাইশদের বাকরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করবে। কারণ সেই রীতিতেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরাই তাঁর নির্দেশ অনুসারে দায়িত্ব পালন করলেন। যখন তাঁরা গ্রন্থাকারে কোরআনের সংকলন প্রস্তুত করলেন, তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক সংকলিত কপিটি হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার কাছে ফেরৎ পাঠালেন।

এরপর হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কোরআনের এক একটি সংকলন ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করলেন। তিনি সেই সাথে নির্দেশ দিলেন, এই সংকলন ব্যতীত অন্য যতো সংকলন রয়েছে, তা যেন আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং, বর্তমান সময়ে আমরা যে কোরআন দেখছি ও পাঠ করছি, তা হযরত আবু বকর কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থের অনুলিপি। হযরত উসমান সেই সংকলনেরই অনুলিপি সরকারীভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন।

ইতিহাস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শুধু যে আল্লাহর কিতাবের বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের সংকলন প্রস্তুত করে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় স্থানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন তাই নয়, একই সাথে তিনি সে কোরআনের যথার্থ পঠনরীতি মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য স্বনামধন্য ক্বারীও প্রতিটি স্থানে নিয়োগ করিয়েছিলেন। মদীনায় এ কাজের দায়িত্ব ছিল হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ওপর। মক্কায় এ কাজের আঞ্জাম দিতেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। সিরিয়ায় নিয়োজিত ছিলেন হযরত মুগীরা ইবনে শিহাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

কুফায় নিয়োগ লাভ করেছিলেন হযরত আবু আব্দুর রহমান সুলামী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। বসরায় এই মহান দায়িত্ব পালন করতেন হযরত আমের ইবনে আব্দুল কায়েস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়াও যেখানেই আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁর বিদায়ের পরে কোরআন পাঠে অভিজ্ঞ ক্বারী সাহাবীদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কোন সাহাবীর সন্ধান পাওয়া যেত, অগণিত মানুষ তাঁর কাছে গিয়ে আল্লাহর এ কিতাবের প্রতিটি শব্দ সহীহ শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা শিখে নিতো।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই মুসলমান ও অমুসলমানদের কাছে কোরআনের সেই অনুলিপিই বিদ্যমান। পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে কোরআনের একটি কপি সংগ্রহ করে, তা আরেক দেশের কপির সাথে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, দুটো কপির সাথে কোন গড়মিল নেই। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির কাছে পেশ করেছিলেন; এটাই যে সেই কোরআন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই কোরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য একশ্রেণীর অমুসলিম চিন্তাবিদ্গণ চেষ্টার কোন ক্রটি করেনি। তারা যদি কোরআনের ভেতরে একটি অক্ষরেরও গড়মিল খুঁজে পেতো, তাহলে এতদিনে গোটা পৃথিবী জুড়ে তা প্রচার করতো। কোরআনের ওপরে গবেষণা করতে গিয়ে তারা কোন গড়মিল খুঁজে পায়-ই নি, উপরন্তু তারা প্রমাণ পেয়েছে, এ ধরনের কোন গ্রন্থ মানুষের পক্ষে শতকোটি বছর ধরে চেষ্টা-সাধনা করেও রচনা করা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের আধুনিক যুগে কম্পিউটারের সাহায্যে তারা কোরআনের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে কোরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মাহাত্মের সন্ধান লাভ করে। তারা সন্ধান পেয়েছে, আল্লাহর এই কিতাবে এক বিস্ময়কর সংখ্যাতাত্ত্বিক জটিল জাল বিছানো রয়েছে, যা অতি অদ্ভূত, অভিনব এবং বিস্ময়কর। সেই সংখ্যাটি হলো ১৯ সংখ্যার সুদৃঢ় সাম স্য। চূড়ান্ত বিশুদ্ধতায় এ কিতাব আল্লাহর বাণী এবং নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। সারা পৃথিবীর মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর গোটা বয়সব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা-সাধনা করে যেত কোরআনের মতো একটি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে, তবুও তা অনন্তকাল ধরে থেকে যেতো সাম্ভাব্যতার সীমানা থেকে শতকোটি যোজন যোজন দূরে।

এ কিতাবে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করা হয়েছে, সংখ্যাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে যে ১৯ সংখ্যার চরম এক জটিল জালকে যেভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে, তেমনি সমান সংখ্যক শব্দে, সমান সংখ্যক বাক্যসংখ্যায়, সমান সংখ্যক অক্ষরে এ কোরআনের মতো একটি গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন হতো ৬২৬, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ বছর। অর্থাৎ ৬২৬ সংখ্যার সাথে ২৪ টি শূণ্য জুড়ে দিলে যে সংখ্যা হতে পারে। এরপরও বলা হয়েছে, কোন মানুষের পক্ষে এ ধরনের কিতাব রচনা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কেননা, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একত্রিত হয়ে একযোগে চেষ্টা করতে হবে, সেই সাথে প্রতিটি মানুষকে হায়াত লাভ করতে হবে শতকোটি বছরের ওপরে। সুতরাং আমাদের সামনে যে কোরআন বর্তমান রয়েছে, তা যে আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যেভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছিল, আল্লাহর নির্দেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে কোরআনের বিন্যাস করেছিলেন এবং গ্রন্থাবদ্ধ করার সময় তাতে যে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেনি, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

পৃথিবীতে মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য যে হেদায়াত ও পথনির্দেশনার একান্ত প্রয়োজন, এ পৃথিবীতে মানুষের আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গোটা বিশ্বলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব ও অস্তিত্বের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুধাবন করার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, মানুষের ব্যক্তি চরিত্র গঠন ও দায়িত্ব-কর্তব্য, পারিবারিক চরিত্র গঠন ও পরিচালনা, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা, সমাজ, দেশ ও জাতিকে সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব মূলনীতি ও আদর্শ একান্ত প্রয়োজন, সেসব লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হলো মহান আল্লাহকে নিজেদের জন্য একমাত্র পথনির্দেশক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া।

তারপর তিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন, শুধুমাত্র তাই অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে তা অনুসরণ করা। আল্লাহকে শুধুমাত্র সেজদা লাভের অধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তারপর জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে পৃথিবীর চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের আবিষ্কৃত মতবাদ মতাদর্শ অনুসরণ করা এবং নিজেকে পরিপূর্ণরূপে নেতা নেত্রীদের নেতৃত্বাধীন করা মানুষের জন্য এক মারাত্মক ভ্রান্ত কর্মনীতি। এ ধরনের কর্মকান্ড মানুষকে ক্রমশঃ ধ্বংস গহ্বরের দিকে অগ্রসর করিয়ে থাকে। এ জন্য মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

اِتَّبِعُ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَاتَتَّبِعُوا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ–

হে মানুষ ! তোমাদের রব্ব-এর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাই অনুসরণ করো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ ও অনুগমন করো না। (সূরা আ'রাফ–৩)

এই কোরআন মানুষকে আহ্বান জানায় মহান আল্লাহর দাসত্ব করার দিকে। মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তিনিই তোমাদের স্রষ্টা ও লালন-পালন কর্তা। সুতরাং তাঁরই আইন-কানুন অনুসরণ করে চলো। কোরআন মানুষকে এভাবে দাওয়াত দেয়–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ–

হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের সেই রব্ব-এর দাসত্ব স্বীকার করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত মানুষের সৃষ্টি কর্তা। (সূরা বাকারা–২১)

মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই তাঁর স্রষ্টার মুখাপেক্ষী। মানুষের সৃষ্টিগত প্রকৃতিই হলো, সে আল্লাহর দাসত্ব করবে। এই প্রকৃতি থেকে মানুষ যখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তখন সে সমস্ত সৃষ্টির দাসত্ব করতে বাধ্য হয়। সম্মান ও মর্যাদার আসন থেকে সে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল তলদেশে তলিয়ে যায়। এ জন্য কোরআন মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য আহ্বান জানায় তথা মানব প্রকৃতির দিকে ফিরে আসতে উদাত্ত আহ্বান জানায়। কোরআন মানুষকে দাওয়াত দেয়–

حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ-وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ-

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বান্দাহ্ হয়ে যাও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেলো। এখন হয় তাকে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে এমন স্থানে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দেবে যেখানে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। (সূরা আল হাজ্জ-৩১)

উল্লেখিত আয়াতে আকাশ বলতে মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর প্রকৃতি দাবি করে আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার জন্য এবং তাওহীদ ব্যতীত সে আর অন্য কোন আদর্শ অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়না। মানুষ জন্মগ্রহণ করে তার স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপরে আল্লাহর গোলাম হিসাবেই। পরবর্তীকালে তার প্রকৃতি নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করতে থাকে। মানুষ যখন তার জন্মগত স্বাভাবিক প্রকৃতিতে থাকে, তখন তাকে রাসূল প্রদর্শিত আদর্শানুসারে শিক্ষা প্রদান করা হলে তার জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি ও অন্তরদৃষ্টি স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরবর্তী জীবনে এসব মানুষ আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে আরোহন করতে সমর্থ হয়।

আল্লাহর রাসূল বলেন, মানুষ জন্মগ্রহণ করে মুসলিম হিসাবেই, তাকে লালন-পালনকারী যারা, তারাই তাকে ভিন্ন আদর্শে গড়ে তোলে। অর্থাৎ মানুষ এক আল্লাহর গোলামী করার প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করে থাকে। মানুষের জন্য এই প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হবার অর্থই হলো, সম্মান-মর্যাদার উচ্চাসন থেকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হওয়া। এ অর্থেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর গোলামী ত্যাগ করে যে ব্যক্তি অন্যের অনুসরণ করলো সে যেন তাকে দাসত্ব লাভের অধিকারী বানিয়ে দিল।

আর এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করার অর্থই হলো স্পষ্ট শিরক করা। শিরকে লিপ্ত হওয়ার মানেই হলো সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসন থেকে ছিটকে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়া। এভাবে কোন মানুষ যখন নীচে পড়ে যায়, তখন অসংখ্য শক্তির দাসত্ব করতে সে বাধ্য হয়। পরিবারে নিজের স্ত্রী থেকে শুরু করে, সমাজের নেতাদের দাসত্ব করতে থাকে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের এবং মানুষের রচনা করা রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের দাসত্ব করতে সে বাধ্য হয়।

একটা পাখির শাবক যখন বাসা থেকে ছিটকে পড়ে, তখন যেমন শাবকটি বাতাসের ঝাপটায় বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হতে পারে, অথবা অন্য কোন জন্তু-জানোয়ারের খোরাকে পরিণত হয়। তেমনি মানুষ যখন তার নিজের আসল স্থান থেকে ছিটকে পড়ে, তখন সে শয়তানের খেলনার বস্তুতে পরিণত হয়। মানুষের মধ্যে যারা শয়তান রয়েছে, তারা শিকারী পাখির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাকে বিভিন্ন দল ও আদর্শের দিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। অপরদিকে তার মধ্যে যে কুপ্রবৃত্তি রয়েছে, এই কুপ্রবৃত্তি তাকে বাতাসের গতিতে ভ্রান্ত পথে দ্রুত গতিতে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। এ জন্যই কোরআন মানুষের প্রতি এই

দাওয়াত দেয়, দাসত্ব করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং এ পথেই মানুষের জীবনে স্থিতি আসতে পারে। নিজের গর্দান থেকে দাসত্বের সমস্ত শৃংখল ছিন্ন করে নিজেকে এক আল্লাহর গোলামে পরিণত করার মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনে সার্বিক সফলতা। কোরআন সেদিকেই মানুষকে আহ্বান জানায়। আল্লাহর কোরআন বলছে–

وَيَرَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْ أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ-يَهْدِىْ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ-

হে নবী। জ্ঞানবানরা অতি উত্তমভাবে অবগত রয়েছে যে, যা কিছু তোমার রব্ব-এর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য এবং তা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথপ্রদর্শন করে। (সূরা সাবা-৬)

কোরআন অনুধাবনের প্রকৃত ক্ষেত্র

হেরা পর্বতের গুহায় রাসূল ধ্যানমগ্ন ছিলেন আর আল্লাহর ফেরেশ্তা এসে তাঁকে এই কোরআন নামক গ্রন্থটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন; রাসূল তা এনে বাড়িতে আরাম শয্যায় শুয়ে কোরআনের মর্ম অনুধাবন করেছেন–বিষয়টি মোটেও এরকম নয়। পবিত্র কোরআন যে শিক্ষাদর্শ সহকারে অবতীর্ণ হলো, যে পরিবেশে অবতীর্ণ হলো, তা ছিল আল্লাহর এ কিতাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিপরীত স্রোতধারাকে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যেই এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থের মতো এ কোরআন কোন ধর্মগ্রন্থ নয়। এটা একটি পরিপূর্ণ ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা–সমাজ পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। একটি বিপ্লবাত্মক দাওয়াত ও আন্দোলনের গ্রন্থ। চার দেয়ালের মধ্যে বসে এ গ্রন্থ পাঠ করলে এর সঠিক ভাবধারা উপলব্ধি করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। বসে বসে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র পাঠ করলে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায় না। রোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ওষুধ সেবন করতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের যে সমস্যার সমাধানের জন্য কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, সে সমস্যার সাথে মোকাবেলা না করলে কি করে কোরআনের মূলভাবধারা অনুধাবন করা যেতে পারে? অন্যায় অত্যাচারে ভেসে যাওয়া সমাজ, অশান্তির অগ্নি গহ্বরে নিমজ্জিত দেশ ও জাতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে যারা ঘরের নিভৃত কোণে আবদ্ধ রেখে নিজেকে সবচেয়ে 'নির্বিরোধী সত্যাশ্রয়ী শান্তি প্রিয়' হিসাবে প্রমাণ করতে চায়, তাদের পক্ষে কখনোই আল্লাহর কোরআনের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। একটা বিষয় কোরআন অধ্যয়নকারীর স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহর রাসূলের চেয়ে বড় পরহেজগার, নির্বিরোধী, সত্যাশ্রয়ী ও শান্তি প্রিয় মানুষ এ পৃথিবীতে অতীতে যেমন ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও আর আসবে না। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বকে আল্লাহর কোরআন কি আরামের শয্যায় অবস্থান করার অনুপ্রেরণা যুগিয়ে ছিল–না রক্তক্ষয়ী উত্তপ্ত ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত করেছিল?

সুতরাং, এ কোরআন বুঝতে হলে এবং এ থেকে পথনির্দেশনা লাভ করতে হলে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির ভেতরে আসন গেড়ে বসা আল্লাহ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। সমাজ দেহে অনুপ্রবিষ্ট আল্লাহ বিরোধী শক্তি যে ক্যান্সার সৃষ্টি করেছে, তা নিরাময়ের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহর কোরআন অধ্যয়ন করলে তখন আল্লাহর কোরআনের প্রকৃত ভাবধারা অনুধাবন করা সহজ হবে। কোরআন অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহর রাসূলকে যে আন্দোলনের পথে অগ্রসর করালো, সেই আন্দোলনের দাওয়াত মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। যারা সর্বপ্রকার দাসত্বের বন্ধন দূরে ছুড়ে ফেলে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করতে আগ্রহী ছিল, তাঁরা সর্বপ্রথম কোরআনের আন্দোলনে শামিল হলো।

দেশ ও জাতির ওপরে যারা নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রেখে শোষণ যন্ত্রটি সক্রিয় রাখতে আগ্রহী ছিল, তারা চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। কোরআনের আন্দোলনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে তারা সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। শুরু হয়ে গেলো কোরআনের সৈনিকদের সাথে শয়তানের সৈনিকদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। আল্লাহর কিতাব যাদেরকে প্রস্তুত করছিল, তাঁদের ওপরে লোমহর্ষক নির্যাতন শুরু হলো, তাঁরা সহায়-সম্পদ হারালেন; অপমানিত লাঞ্ছিত হলেন। তাঁদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হলো। কষ্টার্জিত সমস্ত সম্পদ বাতিল করা হলো। কারাবরণ করতে হলো। শাহাদাতের পেয়ালাও হাসি মুখে পান করতে হলো। এভাবে সূচনা থেকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে দীর্ঘ তেইশটি বছর লেগে গেলো। আল্লাহর এই কোরআন দীর্ঘ তেইশটি বছর ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে তা সফলতার সিংহদ্বারে পৌঁছে দিল।

অতএব এই কোরআনকে বুঝতে হলে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাগণ যে পথে তাঁদের পবিত্র পদচিহ্ন এঁকেছেন, তাঁরা যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন, সে পথে এগিয়ে যেতে হবে, সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য নিজের সমস্ত কিছু উৎসর্গ করার মন-মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তাহলে কোরআনের অধ্যয়নকারীর কাছে মনে হবে, বর্তমানে তিনি যে সমস্যার মোকাবিলা করছেন, এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ বোধহয় এই মাত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। এ সময়ে কোরআনকে সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বে অবতীর্ণ করা কোন কিতাব মনে হবে না, কোরআন যে চির নতুন–এ কথা নতুন করে পাঠকের সামনে প্রতিভাত হবে।

কোথাও যদি আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয় আর সে আগুনের উত্তাপে চারদিকের আবর্জনা নিঃশেষে পুড়ে না যায়, তাহলে বাহ্যিক দিক থেকে তা আগুন মনে হলেও তা আগুন নয়। এ ধরনের দহন ক্ষমতাহীন আগুনের কোন মূল্য নেই। শত সহস্র কণ্ঠে যদি কোরআন তেলাওয়াত করা হয়, আর সে তেলাওয়াতের আঘাতে মানব রচিত মতবাদ মতাদর্শের ধারক-বাহকদের ক্ষমতার মসনদ টল-টলায়মান হয়ে না ওঠে, তাদের ভেতরে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়, তখন তো তেলাওয়াতকারীকে এ কথা অনুধাবন করতে হবে, তার কোরআন তেলাওয়াত আর সাহাবীদের কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য অনুধাবন করতে হলে যে আন্দোলন ও সংগ্রামের ময়দানে কোরআন

অবতীর্ণ হয়েছে, সে ময়দানে নামতে হবে। কোরআন অনুধাবন করে কোরআনের আদর্শে নিজেকে প্রস্তুত করে এগিয়ে যেতে থাকলে তার সামনে অবশ্য অবশ্যই মক্কার উত্তপ্ত পরিবেশ এসে উপস্থিত হবে। বদরের ময়দান তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। ওহুদের রক্ত রঞ্জিত ময়দান দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হবে। তায়েফের প্রস্তর বর্ষন কিভাবে হচ্ছে তা অবলোকন করা যাবে। হোনাইনের ময়দানে আকাশ আবৃত করে কিভাবে তীর ছুটে আসছে তা দেখা যাবে। মুতার প্রান্তরে কিভাবে রক্তের বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে, তা দেখে শরীর শিহরিত হবে।

মানুষের মধ্যে একটি শ্রেণী কোরআন পাঠ করে, কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ বিরোধী শক্তির অপতৎপরতার কাহিনী পড়ে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সম্মানিত সাহাবাদের সাথে কি নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, সে কাহিনী বিভিন্ন গ্রন্থে পড়ে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু বাস্তব ময়দানে তারা আল্লাহ বিরোধী শক্তির অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। আবু জেহেল আর আবু লাহাবের ভূমিকা তাদের চোখে পড়ে না। না পড়ার কারণ হলো, এরা কোরআনকে একটি আন্দোলনের কিতাব হিসাবে পড়ে না। এরা কোরআনের ভেতরে জ্বিন তাড়ানোর আয়াত অনুসন্ধান করে। যুবক-যুবতীদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করার, হারানো দ্রব্য ফিরে পাবার, মামলায় জয়ী হবার, শত্রুর উৎপাত থেকে নিরাপদ থাকার, পুত্র সন্তান জন্ম দেবার, ব্যবসায়ে বরকত হবার, পরীক্ষায় পাশ করার, বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার, বন্ধ্যা নারীর সন্তান হবার আয়াত অনুসন্ধান করে। আল্লাহর কোরআনকে এরা ঝাড়-ফুঁকের কিতাব হিসাবে পাঠ করে।

কোন ব্যক্তি যদি দেশের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি এলাকা থেকে দেশের রাজধানীর দিকে যাওয়ার লক্ষ্যে যন্ত্রযানে আরোহন করে যাত্রা আরম্ভ করে, তাহলে তার সামনে যে মঞ্জিলগুলো আসার কথা, সে মঞ্জিল না এসে তার বিপরীত মঞ্জিল আসতে থাকে, তাহলে যাত্রীকে এ কথা বুঝতে হয়, সে যে যন্ত্রযানে আরোহন করেছে, তা তার কাংখিত স্থানের দিকে, তার গন্তব্য স্থলের দিকে যাচ্ছে না–যাচ্ছে বিপরীত দিকে। এ পথ তাকে দেশের রাজধানীর দিকে নিয়ে যাবে না, নিয়ে যাবে সেখানেই যেখানে সে যেতে ইচ্ছুক নয়। একইভাবে কোরআন নিয়ে কেউ যদি ময়দানে সক্রিয় হতে চায়, তার সামনে একে একে ঐসব মঞ্জিল এসে উপস্থিত হবে, যেসব মঞ্জিল রাসূল ও তাঁর সাহাবাদের সামনে এসেছিল। সে তখন চোখ মেলেই দেখতে পাবে, তাঁর চোখের সামনে শ্বাপদ সঙ্কুল পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে আবু জেহেল আর আবু লাহাবের দল। সামনে-পেছনে, ডানে-বামে যেদিকেই সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, সেদিকেই সে দেখতে পাবে, আবু জেহেল আর আবু লাহাবের দল কিভাবে হুংকার ছাড়ছে। সুতরাং, কোরআনকে তার সঠিক অর্থে অনুধাবন করতে হলে, কোরআন যে আন্দোলন আর সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই ময়দানে নিজের অবস্থান নির্ণয় করে তারপর কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে।

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য

বর্তমানে পবিত্র কোরআন যেভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে, এভাবে এ কোরআনকে বিন্যাস করেছেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবুয়্যত ও রিসালাত সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তিনি যেসব কথা বলেছেন, সেসব কথা তিনি আল্লাহর আদেশেই বলেছেন। এই কোরআনে যখন শ্রেণী বিন্যাস করা হয়, তখন তা স্বয়ং আল্লাহরই নির্দেশে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে তা করা হয়। কোন সূরার পরে কোন সূরা সাজানো হবে, কোন আয়াত কোন সূরার অংশ হবে, এ সংক্রান্ত নির্দেশ আল্লাহর রাসূল দিয়েছিলেন। আল্লাহর নবী তাঁর নবুয়তি জিন্দেগীর মোট তেইশ বছরের মধ্যে তের বছর অবস্থান করেছিলেন মক্কায় আর অবশিষ্ট দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেন এবং সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

মক্কায় অবস্থানকালে তাঁর ওপরে যেসব ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, সেগুলো মক্কী সূরা নামে অভিহিত হয়েছে। আর মদীনায় অবস্থানকালে যেসব ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, তা মাদানী সূরা নামে অভিহিত। অবশ্য কতকগুলো সূরা সম্পর্কে কোরআন গবেষকগণ বলেন, এসব সূরায় মক্কী ও মাদানী এ উভয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। আল্লাহর এ কিতাবের যেসব সূরা মক্কী হিসাবে অভিহিত হয়েছে, সেগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং মাদানী নামে পরিচিত সূরাগুলোর বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য রয়েছে। পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন দায়িত্ব হলো নবী-রাসূলদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব। এই দায়িত্ব অর্পণ করার ক্ষণপূর্বেও নবী হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ এ দায়িত্ব ও দায়িত্বের পরিধি–ব্যাপকতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা রাখতেন না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর ওপরে অর্পিত দায়িত্ব অর্পণের পূর্বে কিছুই জানতেন না। সুতরাং, এ দায়িত্ব অর্পণ করার পর তাঁর মধ্যে যে অস্থিরতা প্রকাশিত হয়েছিল, মক্কী সূরায় তাঁর অস্থিরতা দূর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ আলোচনা করা হয়েছে।

নবী ও রাসূল হিসাবে তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব কি এবং কিভাবে তিনি তা পালন করবেন, সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দান করা হয়েছে। কোরআন যে দাওয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হচ্ছিলো, সে দাওয়াতের দিকে আল্লাহর রাসূল কোন পদ্ধতিতে মানুষকে আহ্বান জানাবেন, দাওয়াত দানকারীকে কি ধরনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে ও গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে, মক্কী সূরায় এ সম্পর্কিত আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিকভাবে এ দাওয়াতের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার মোকাবেলায় রাসূলের অবস্থান কি হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দান করা হয়েছে। যখন বিরোধিতা শুরু করা হলো, সে বিরোধিতার ধরন অনুসারে করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা শামিল হচ্ছিলেন, তাঁদের মাধ্যমে এক বিরাট উদ্দেশ্য সাধন করা হবে, এ লক্ষ্যে ব্যক্তি গঠনমূলক পথনির্দেশ মক্কী সূরায় স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

মানুষের সামনে আল্লাহর একত্ববাদ, এক আল্লাহর দাসত্ব করার প্রয়োজনীয়তা, নবুয়্যত ও রিসালাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, আখিরাত ও আখিরাতের আবশ্যকতা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান

দেয়া হয়েছে মক্কী সূরায়। এসব প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করতে গিয়ে গোটা বিশ্বলোক, প্রাণীজগৎ, মহাশূণ্য, উদ্ভিদজগৎ, মানব সৃষ্টির রহস্য, রাত-দিনের আবর্তন ও বিবর্তন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের সূচনায় মক্কায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে যেসব সূরা অবতীর্ণ করা হতো, সেগুলো আকারে ছোট হলেও অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সমৃদ্ধ ছিল এবং তা ছিল গভীরভাবে প্রভাব বিস্তারকারী। ইসলামী আদর্শের মৌলিক দিক হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। এ তিনটি বিষয় মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছিল এসব সূরায় এবং সেই সাথে শিরক, আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস ইত্যাদির পরিণতি সম্পর্কে বারবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যারা রাসূলের দাওয়াতে সাড়া দেবে না, বিরোধিতা করবে আখিরাতে তাদের জন্য কি ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা প্রস্তুত রয়েছে, তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

অতীতে যারা নবী-রাসূলদের সাথে বিরোধিতা করেছে, ইতিহাসে তাদের কি পরিণতি ঘটেছে, সেসব ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। যারা বিরোধিতা করতো, তারা যেসব ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান রাখতো, সেগুলোও তুলে ধরা হয়েছে। যারা রাসূলের ইসলামী আন্দোলনে শামিল হবে এবং রাসূল কর্তৃক আনিত আদর্শ অনুসরণ করবে, আখিরাতে তাদের সম্মান ও মর্যাদা এবং প্রতিদান সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে।

মাতা-পিতা তাদের অবাধ্য সন্তানকে যেমন স্নেহমাখা কণ্ঠে সোজা সরল পথে চলার জন্য নানা ধরনের যুক্তি দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করেন এবং সন্তানকে সত্য পথে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন না, মক্কী সূরার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সে বিষয়টি প্রতিভাত হয়ে ওঠে। সত্য সহজ সরল পথ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাহ্দেরকে বারবার বুঝিয়েছেন। বারবার বুঝানোর পরেও বান্দাহ্ বিদ্রোহীর ভূমিকা অবলম্বন করছে, তবুও আল্লাহ তাদেরকে বুঝানোর ব্যাপারে বিরতি দেননি বা বিরক্ত হয়ে তাদেরকে পরিত্যাগ করেননি। তারা যেন সত্য পথ গ্রহণ করে, এ ব্যাপারে আহ্বান জানিয়েছেন।

রাসূল এবং রাসূলের সাথীদের ওপরে যখন চরম নিষ্ঠুর নির্যাতন অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রবল বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে, এ অবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের সৈনিকদেরকে কি ভূমিকা পালন করতে হবে তা বলে দেয়া হয়েছে এবং বারবার সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

ইসলামী আন্দোলনে শামিল হবার কারণে অতীতে যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁরা কিভাবে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, এখন তাঁদেরকে কিভাবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, নির্যাতনের মধ্য দিয়েই কিভাবে আন্দোলনকে বিজয়ের পথে অগ্রসর করাতে হবে, এর বিনিময়ে তাঁদেরকে কিভাবে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হবে এবং সামনে তাঁরা বিজয়ের সোনালী সূর্যের আভায় অচিরেই সিক্ত হবেন, এ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে ইসলাম বিরোধিদেরকে মারাত্মক পরিণতি ভোগ করতে হবে, এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদেরকে আখিরাতের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

এ পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কিভাবে ধ্বংস হবে, মাটির সাথে মিশে যাওয়া মৃত মানুষগুলো আবার জীবিত হবে, পৃথিবীতে মানুষ যা করেছে তার প্রতিটি কর্মকান্ডের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, এসব দিক আলোচনা করে বিরোধিদেরকে বিরোধিতা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া হয়েছে। আখিরাত সম্পর্কে গোটা কোরআনে এত কথা আলোচনা করা হয়েছে যে, তা একত্রিত করলে গোটা কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগের সমান হবে। এত কথা একটি বিষয়ের ওপরে এ জন্য বলা হয়েছে যে, যে কোন ধরনের কঠিন আইন প্রণয়ন করে তা জারি করেও মানুষকে অন্যায় করা থেকে বিরত রাখা যায় না এবং মানুষের ভেতর থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর করা যায় না। এক কথায় মানুষের চরিত্র কিছুতেই ভালো করা যায় না। মানুষের চরিত্র ভালো করতে হলে মানুষের চিন্তার জগৎ থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর করতে হলে, অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে দূরে রাখতে হলে মানুষের ভেতরে আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করতে হয়। মক্কী সূরাসমূহে এ প্রচেষ্টার আধিক্য লক্ষ্যণীয়।

মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, দীর্ঘ তের বছরে সে আন্দোলন একটি বিশেষ পর্যায়ে উন্নিত হলেও মক্কায় এ আন্দোলন সফল হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ যে কোন আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলন সফল করতে হলে দুটো জিনিসের একান্তই প্রয়োজন হয়। একটি হলো যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে, সে আদর্শের ভিত্তিতে একদল লোক প্রস্তুত করা। যেন সাধারণ মানুষ সে লোকগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে আদর্শ সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারে এবং আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

এ ছাড়া আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যতটা কঠিন, তার চেয়ে অধিক কঠিন হলো আদর্শ টিকিয়ে রাখা। আদর্শ ভিত্তিক লোক প্রস্তুত করা না হলে আদর্শ টিকিয়ে রাখা যায় না। দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রয়োজন হয় তাহলো আদর্শ ভিত্তিক সে আন্দোলনের প্রতি জনসমর্থন। দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনতার সে আন্দোলন ও আদর্শের প্রতি যদি সমর্থন না থাকে, তাহলে তা দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়না।

আল্লাহর রাসূল মক্কার জীবনে প্রথমটিতে সফলতা অর্জন করেছিলেন। দ্বিতীয়টি মক্কায় ছিল না। মক্কায় আদর্শ ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তি প্রস্তুত হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ রাসূলের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেনি এবং ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এ জন্য হযরত মুসয়াব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে আল্লাহর রাসূল মদীনায় প্রেরণ করে মদীনার জনগণকে ইসলামের পক্ষে সংগঠিত করার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ–ইসলামের প্রথম দুত।

এছাড়া মদীনা থেকে হজ্জ উপলক্ষ্যে যেসব লোকজন মক্কায় আগমন করতো, আল্লাহর নবী তাদের কাছে ইসলামী আদর্শ তুলে ধরতেন। এভাবে মদীনার কিছু সংখ্যক লোকজনের ইসলামের সাথে পরিচিতি ঘটে এবং পরপর দু'বছর মদীনা থেকে আগত লোকজন রাসূলের

কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা রাসূলকে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে মদীনায় বরণ করে নেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই মদীনায় ইসলামের পক্ষে একটা সাধারণ জনমত গড়ে উঠেছিল।

মক্কায় ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী মুসলমানদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এ কারণে কিছু সংখ্যক মুসলমান রাসূলের অনুমোদনক্রমে হাবশা-বর্তমানে যে দেশটির নাম আবিসিনিয়া সেখানে হিজরাত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীতে মক্কার মুসলমানগণও একে একে মদীনায় হিজরাত করেন। তারপর মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী স্বয়ং আল্লাহর রাসূলকেই পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়ার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছিল। ঠিক সে সময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরাত করার অনুমতি দিলেন।

রাসূল মদীনায় গমন করলেন, সেখানের সাধারণ জনগণ তাঁকে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য রাসূলের এই আন্দোলন, তা বাস্তবে পরিণত করার সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করলেন। এবার রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে ইসলাম চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো। এ পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী-সমর্থক যেখানে যে অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছিলেন, তাঁরা সবাই একই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ লাভ করলেন।

মদীনায় হিজরাত করার পরে আল্লাহর রাসূলের ওপরে কোরআনের যেসব আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয়, সেগুলো মাদানী সূরা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এসব সূরার বৈশিষ্ট্য মক্কী সূরা থেকে ভিন্ন। একটি রাষ্ট্রশক্তি মুসলমানদের হস্তগত হবার পর থেকে ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে মুসলমানদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করলো। মদীনায় ইহুদীদের একটি বিরাট শক্তি বর্তমান ছিল। এই ইহুদী জাতি-গোষ্ঠীগতভাবে অত্যন্ত কুটিল স্বভাবের। ইসলাম এবং মুসলমান এদের কাছে অসহনীয়।

এছাড়া রাসূল মদীনায় হিজরাত করার পূর্বে উবাই নামক এক প্রভাবশালী ব্যক্তির নেতৃত্বের আসনে আসীন হবার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসূল মদীনায় পদার্পণ করার সাথে সাথে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরে গেল; জনতা নেতৃত্বের আসনে আসীন করলো স্বয়ং আল্লাহর রাসূলকে।

নেতৃত্ব হারিয়ে লোকটি উন্মাদের ন্যায় হয়ে পড়েছিল। সে তার সমর্থক গোষ্ঠী নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। সংখ্যা গরিষ্ঠ জনশক্তি ইসলামের দিকে থাকার কারণে সে প্রকাশ্যে বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করতে না পেরে মদীনার ইহুদী এবং মদীনার বাইরের ইসলামের শত্রুদের সাথে আঁতাত করে ইসলামী রাষ্ট্র উৎখাত করার প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিলো। এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হচ্ছিলো। মুসলমানদের জনবল নেই, অর্থবল নেই, অস্ত্রশক্তিও নেই-তবুও তাঁদেরকে একটার পরে আরেকটা যুদ্ধের মোকাবেলা করতে হলো। এভাবে এক চরম সংঘাত-মুখর পরিস্থিতি অতিক্রম করে দীর্ঘ দশ বছর পরে বিজয়ের সোনালী

সূর্য উদিত হলো। এই দীর্ঘ দশটি বছর অতিবাহিত করতে গিয়ে যেসব পরিস্থিতি ও পরিবেশের মোকাবেলা করতে হয়েছে, তার আলোকে কোরআনের যে সূরা বা আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একটি নতুন পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও জাতি গঠন এবং তা বিশ্বের মানচিত্রে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যেসব উপাদান-উপকরণের প্রয়োজন, তা মাদানী সূরাসমূহে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

মক্কায় অবস্থান কালে মুসলমানদেরকে নির্যাতিত হয়েছে। মদীনায় এসে তাদেরকে আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের (Self preservation and resist) ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। তাঁদের এই ভূমিকার ধরন কেমন হবে, তা এসব সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। জাতি গঠন ও জাতি গঠনের মূল উপাদান-উপকরণ কি কি, তা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধনীতি, সন্ধিনীতি ও যুদ্ধবন্দীদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তা পেশ করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং এ সম্পর্কের ভিত্তি কি হবে-তা সবিস্তারে পেশ করা হয়েছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির রূপরেখা এবং তা কিভাবে বিকশিত হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের প্রতিদিনের জীবনধারা এবং জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে কোন নীতি অবলম্বন করতে হবে, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

মুনাফিক ও অমুসলিমদের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে, তা অবগত করানো হয়েছে। আহলি কিতাবদের সাথে মুসলমানরা কি ধরনের সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে, সে ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এভাবে সামাজিক আইন-কানুন, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আইন-কানুন, বিচার বিভাগীয় আইন-কানুন, উত্তারাধীকার সংক্রান্ত বিধি-বিধান ইত্যাদি বিষয় সবিস্তারে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

গোটা পৃথিবীর সামনে তাঁরা যেন আদর্শের জীবন্ত সাক্ষী হিসাবে (Model) নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়, এ জন্য তাঁদের দক্ষতা (Dexterity) বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সাথে ইহুদী-খৃষ্টানদের ভ্রান্তিসমূহ স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, এই ভ্রান্ত পথ-মত ও নীতি-পদ্ধতি পরিহার না করলে তাদের পরিণতি কতটা ভয়াবহ হবে।

যুদ্ধে বিজয়ী হবার পরে যেসব সম্পদ মুসলমানদের হাতে এসেছে, সেসব সম্পদ সম্পর্কিত বিধান জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ও জীবন বিধানের ওপর হামলা আসার ফলে মুসলমানদেরকে সংগত কারণেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। সক্ষম থাকার পরেও এসব যুদ্ধে যোগদান না করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে জিহাদকারীর সম্মান ও মর্যাদা।

জিহাদের ময়দানে আল্লাহর রাস্তায় যাঁরা জীবন দান করবে, তাঁদেরকে কি ধরনের বিনিময় দেয়া হবে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। জিহাদের প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় তথা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে উৎসাহ প্রদান ও ব্যয় না করার পরিণতি সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

সাংবাদিকতার নীতিমালা পেশ করা হয়েছে এবং সেই সাথে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ ভীতিহীন লোক কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদ যাচাই-বাছাই না করে গ্রহণ করা যাবে না। মাদানী সূরাসমূহে এ ধরনের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

কোরআনের সূরা সংখ্যা ও নামসমূহ

পবিত্র কোরআনে মোট সূরার সংখ্যা হলো ১১৪ টি। আল্লাহর রাসূলের হিজরাতের পূর্ব জীবনে যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যেগুলোকে মক্কী সূরা নামে অভিহিত এবং হিজরাতের পরবর্তী সময়ে যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মাদানী সূরা নামে অভিহিত হয়েছে। এমন কি হিজরাতের পর মক্কার কাছে অবস্থিত হুদায়বিয়ার সন্ধী (Hudaibiya treaty) সম্পাদিত হবার পর এবং বিদায় হজ্জ উপলক্ষ্যে মূল মক্কা নগরীতে যা কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, সেগুলোও মাদানী সূরার অন্তর্গত হয়েছে। এ দিক দিয়ে মক্কী সূরার মোট সংখ্যা হলো ৮৬ টি। আর মাদানী সূরার মোট সংখ্যা হলো ২৮ টি। এভাবে কোরআনের মোট সূরার সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ১১৪ টি। কতকগুলো সূরা এমন যে, তার প্রথম অংশ মক্কী এবং পরবর্তী অংশ মাদানী। কিন্তু গোটা সূরাটিই মক্কী হিসাবেই গণনা করা হয়েছে। সূরা মুযাম্মিল এ ধরনের একটি সূরা।

কোরআনের মোট সূরার মধ্যে ১৭ টি সূরা মক্কী না মাদানী এ বিষয়ে মতপার্থক্য বিরাজমান। এই ১৭ টি সূরার মধ্যে আবার সূরা বাইয়েনাহ্, সূরা আল আদিয়াহ্, সূরা আল মাউন, সূরা আল ফালাক ও সূরা আননাস–অর্থাৎ মোট ৫ টি সূরা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য বিদ্যমান। এই ১৭ টি সূরার মধ্যে সূরা আর রাদ, সূরা আর রাহ্মান, সূরা আদ দাহার ও সূরা আল যিলযাল অর্থাৎ ৪ টি সূরা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো মাদানী সূরা। আবার সূরা আত তীন, সূরা আল কদর, সূরা আত তাকাসুর, সূরা আল আসর, সূরা আল কোরাইশ, সূরা আল কাউসার, সূরা আল কাফিরুন ও সূরা ইখলাস–এই ৮ টি সূরা সম্পর্কে অধিকাংশ গবেষকগণ বলেছেন, এগুলো মক্কী সূরা।

আল্লাহ্র কোরআনের কোন বিষয় ভিত্তিক নাম নেই। এ কিতাবের যতগুলো নাম পাওয়া যায়, তা সবই গুণবাচক নাম। যেমন কোরআন একটি নাম এবং এর অর্থ হলো যা পাঠ করা হয় বা যা পাঠ করা একান্তই জরুরী। অর্থাৎ এটা এমনই একটি কিতাব, যা প্রতিটি মানুষের জন্য পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ এ কিতাব ব্যতীত মানুষ কোনক্রমেই নির্ভুল পথ এবং জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম নয়। আর নির্ভুল পথ ও জ্ঞান মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যেই এ কিতাব অবশ্যই পাঠ করা কর্তব্য। এ জন্য আল্লাহ্র এ কিতাবকে বলা হয়েছে কোরআন।

মহান আল্লাহর অবতীর্ণ করা এ কিতাবের আরেকটি নাম হলো ফোরকান। এই ফোরকান শব্দের অর্থ হলো যা সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য নির্ভুলভাবে দেখিয়ে দেয়। পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ নেই, যে গ্রন্থ দাবী করতে পারে যে, আমি সত্য আর মিথ্যার ব্যবধান নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম। কিন্তু আল্লাহর এই কিতাব চ্যালেঞ্জ করে দাবী করে, আমি সত্য আর

মিথ্যা নির্ণয়ের একমাত্র নির্ভুল মানদন্ড–আমি সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ–

স্মরণ করো, আমি মুসাকে কিতাব এবং ফোরকান দান করেছি–সম্ভবত এর সাহায্যে তোমরা সহজ ও সত্য পথ লাভ করতে পারবে। (সূরা বাকারা-৫৩)

হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের ওপরেও যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, সে কিতাবও সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য করার গুণাবলী সম্বলিত ছিল। আর কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ–

রমজান মাস, এতেই কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন যাপনের বিধান আর এটা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক ও সত্য পথপ্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলে ধরে। (সূরা বাকারা-১৮৫)

সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন ধরনের জড়তা বা সন্দেহ সংশয় থাকে না, সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে তা তুলে ধরে। মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, মানুষের রচনা করা বিধান অনুসরণ কেন করা যাবে না এবং কেন আল্লাহর প্রেরিত বিধান অনুসরণ করতে হবে। এ পার্থক্য দিনের আলোর মতো স্পষ্ট তুলে ধরে এ কিতাব। আল্লাহ বলেন–

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ–اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ–

আর তিনি মানদন্ড অবতীর্ণ করেছেন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশকারী। এখন যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। (সূরা আলে-ইমরান-৪)

আল্লাহ তা'য়ালা যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তা অত্যন্ত কল্যাণময়। কেননা এ কিতাব মানুষের যে কোন সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। এই পৃথিবীর ইতিহাস হলো সত্য আর মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্বের ইতিহাস। সত্য আর মিথ্যার যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব এ পৃথিবীতে চলে আসছে, এ দ্বন্দ্ব দূরীভূত করার লক্ষ্যেই এ কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا–

বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি–যিনি এ ফোরকান তাঁর বান্দার ওপর অবতীর্ণ করেছেন, যেন সে গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য সতর্ককারী হয়। (সূরা আল ফোরকান-১)

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবকে 'যিকর' নামে অভিহিত করেছেন। প্রচলিত অর্থে যিকর বলতে একশ্রেণীর মানুষ যা বুঝে থাকে, যিকর শব্দের অর্থ বা যিকর বলতে শুধু সেটাই বুঝায় না। আল্লাহ তা'য়ালা এই যিকর শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ কিতাবকেও যিকর বলা হয়েছে। কোরআনকে যিকর বলা হয়েছে এ অর্থে যে, এ কিতাব ভুলে যাওয়া শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা নির্ভুল উপদেশ-জ্ঞান দান করে। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের ওপর যে তাওরাত অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তাকেও যিকর বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ-

পূর্বে (এই কোরআনের পূর্বে) আমি মুসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফোরকান, জ্যোতি ও যিকর মুত্তাকিদের জন্য। (সূরা আল আম্বিয়া-৪৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর এই কিতাবকে যিকর হিসাবে উল্লেখ করে বলেন-

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ-اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ-

আর এখন এই বরকত সম্পন্ন যিকর আমি অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা একে মেনে নিতে অস্বীকার করবে? (সূরা আল আম্বিয়া-৫০)

আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আ'রাফের ৬৩ ও ৬৯ আয়াতে, সূরা ইউসুফের ১৪০ আয়াতে, সূরা হিজরের ৬ ও ৯ আয়াতে, সূরা নাহলের ৪৪ আয়াতে, সূরা কলমের ৫১ আয়াতে ও সূরা আবাসার ১১ আয়াতে যিকর শব্দের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনকে বুঝিয়েছেন। সূরা কামারের ২৫ আয়াতে যিকর শব্দ দিয়ে ওহীকে বুঝানো হয়েছে। এই কিতাব সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করে সূরা আল হিজরের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاالذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ-

আর বাণী, একে তো আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কোরআনকে 'আমার যিকর' নামে অবিহিত করেছেন-যে যিকর মানুষকে সত্য সহজ পথপ্রদর্শন করে। মানুষ যে শিক্ষা ভুলে গিয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন-

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ-

এ বাণী তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যেতে থাকো। যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে লোকেরা চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা আন নাহল-৪৪)

এভাবে এ কিতাবকে 'নূর' বলা হয়েছে। কারণ এ কিতাব মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অর্থাৎ মিথ্যার অন্ধকার থেকে মহাসত্যের আলোর দিকে নিয়ে আসে। এ ধরনের অনেক

নাম রয়েছে এ কিতাবের। যা গুণবাচক নাম এবং সেসব নাম এ কিতাবের সম্মান-মর্যাদা ও অন্যান্য গুণাবলী প্রকাশ করে। আল্লাহর এই কিতাবে যে ১১৪ টি সূরা রয়েছে, তার ভেতরে ৯ টি সূরা ব্যতিত ১০৫ টি সূরার বিষয় ভিত্তিক নাম নেই। শুধুমাত্র পরিচিতির জন্য বিভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে। যেমন সূরা বাকারাহ্, এর অর্থ গাভী। এ নাম এ জন্য দেয়া হয়নি যে, এ সূরায় শুধু গাভী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আন নাহ্‌ল–এর অর্থ মৌমাছি। সূরা নামল–এর অর্থ পিপিলীকা। সূরা আনকাবুত–এর অর্থ মাকড়শা। এসব সূরার মধ্যে এই শব্দগুলো উল্লেখ রয়েছে, ফলে পরিচিতির জন্য নামকরণ করা হয়েছে।

কোরআনের আংশিক অনুসরণ করা যাবে না

আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান হিসাবে কোরআনের ওপরে ঈমান আনার অর্থ হলো, কোরআন পরিবেশিত বিধি-বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা। কারণ কোরআনই হলো একমাত্র নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা। কোরআনের বিধান কিছুটা অনুসরণ করা হবে আর কিছুটা অনুসরণ করা হবে না, অর্থাৎ কোরআনের বিধান খণ্ডিতভাবে অনুসরণ করা হবে, তাহলে মুমিন হওয়া যাবে না।

নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ-তাহলীল, জানাযা, দাফন-কাফন ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোরআনের বিধান অনুসরণ করা হবে আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন–রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি, শ্রমনীতি, পরিবার পরিচালনায়, সমাজ পরিচালনায়, বিচার কার্য পরিচালনায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় কোরআনের বিধান ত্যাগ করে পৃথিবীর দার্শনিক-চিন্তাবিদ কর্তৃক রচিত মতবাদ-মতাদর্শ বা বিধি-বিধান অনুসরণ করলে কোনক্রমেই নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়া যাবে না।

কোরআনের বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত করতে হবে। জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে কোরআনের বিধান অনুসরণ করতে হবে। কোরআন এ জন্য অবতীর্ণ হয়নি যে, তার কিছু নীতিমালা মানুষ অনুসরণ করবে আর অবশিষ্ট বিধি-বিধান শুধু সুমধুর স্বরে তেলাওয়াত করা হবে তা ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনে অনুসরণ করা হবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ -وَمَااللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّاتَعْمَلُوْنَ- اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ-فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ

তবে তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং অপর অংশকে অবিশ্বাস করো? জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যে যারাই এধরনের আচরণ করবে তাদের এ ছাড়া আর কি শাস্তি

হতে পারে যে, তারা পৃথিবীর জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ সে সম্পর্কে মোটেও বেখবর নন। প্রকৃতপক্ষে এসব লোকেরা নিজেদের পরকাল বিক্রি করে পৃথিবীর জীবন ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না এবং এরা নিজেরাও কোন সাহায্য পাবে না। (সূরা বাকারা-৮৫-৮৬)

মুসলমানদের জীবন দুই ভাগে ভাগ করার কোন অবকাশ নেই। এক ভাগে থাকবে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি আর আরেক ভাগে থাকবে ধর্ম, এ বিভক্ত জীবন মুসলমানের হতে পারে না। আল্লাহর কোরআনের পূর্ণাঙ্গ বিধান অনুসরণ করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুসারে জীবন-যাপন করা যাবে না। যারা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুসরণ করবে, এ পৃথিবীতে তারা গোলামীর জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। আর গোলামীর জীবন হয় অপমান ও লাঞ্ছনামূলক জীবন।

বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানরা ঘৃণা ও লাঞ্ছনার জীবন অতিবাহিত করছে, এর একমাত্র কারণ হলো, এরা কোরআনের বিধি-বিধান আংশিক অনুসরণ করে। পৃথিবীতেও এরা লাঞ্ছিত হচ্ছে, কিয়ামতের ময়দানেও এরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। মুসলিম বিশ্বে যারা এই ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করছে, তারা যে অমুসলিম শক্তির পক্ষে কাজ করছে এবং এ কাজের বিনিময়ে বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার করে থাকে এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর কোরআনের পূর্ণাঙ্গ বিধান মেনে নিলে পৃথিবীতে ভোগবাদী জীবন ধারা অনুসরণ করা যাবে না, এ জন্যই তারা দুনিয়ার জীবনের মোকাবেলায় আখিরাতের জীবন বিক্রি করে দিয়েছে।

এই ধর্মনিরপেক্ষ নীতির অনুসারীদের জন্য আদালতে আখিরাতে কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। সুতরাং, একমাত্র কোরআনের বিধানই অনুসরণ করতে হবে, এ ব্যাপারে কোন আপোস করা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আ'রাফের ৩ নম্বর আয়াতে বলেন–

اِتَّبِعُ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَاتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ–

হে মানুষ ! তোমাদের রব্ব-এর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাই অনুসরণ করো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ ও অনুগমন করো না। (সূরা আ'রাফ–৩)

পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً–

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো। (সূরা বাকারা-২০৬)

উল্লেখিত আয়াতে 'ইসলামে প্রবেশ করো' বলতে বুঝানো হয়েছে, পরিপূর্ণভাবে কোরআনের বিধান অুনসরণ করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ-

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। (সূরা নেছা)

এ আনুগত্য শুধু নামায-রোযার নয়, বরং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে নবী ও রাসূলদের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রাজনীতি করেছেন। তাছাড়া সকল নবী-রাসূলগণ ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাজনীতি করেছেন। তাঁরা কেউ-ই ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। সুতরাং ইসলাম মানুষের জীবনের কোন খন্ডিত অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খন্ডিতভাবে রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করা এবং কোরআনের বিধান অনুসরণ করার কোন অবকাশ কোরআন দেয়নি। কোরআন তথা রাসূলের আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে যদি কারো মধ্যে কোন ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে মুসলমান হওয়া যাবে না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে একজন লোক এসে একটি মামলার নিষ্পত্তি করে দেয়ার আবেদন পেশ করেছিল। সেই ব্যক্তি ঐ একই মামলা রাসূলের আদালতে পেশ করেছিল–কিন্তু রাসূলের দেয়া রায় তার মর্জ্জি মাফিক ছিল না।

এ কারণে সে পুনরায় মামলাটি হযরত ওমরের কাছে পেশ করেছিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লোকটির কাছে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এই মামলাটি প্রথম কার কাছে পেশ করেছিলে ?'

লোকটি জানালো, 'আমি মুসলমান, আমি নামায আদায় করি; রোযা পালন করি, ইসলামের পক্ষে জিহাদেও যোগদান করি। একজন ইহুদী রাসূলের আদালতে আমার বিরুদ্ধে মামলা করলো আর রাসূল সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ইহুদীর পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। এ রায় সঠিক হয়নি। আপনি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শুনে সঠিক ফায়সালা করে দিন।'

লোকটির কথাগুলো হযরত ওমরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর ধমনীর রক্ত দ্রুত বেগে প্রবাহিত হতে থাকলো। ক্রোধে তাঁরা চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি অপেক্ষা করো, আমি তোমার মামলার ফায়সালা করে দিচ্ছি।'

এ কথা বলে তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করে কোষমুক্ত তরবারী এনে বললেন, 'আল্লাহর বান্দা শোন, আল্লাহর রাসূল যে ফায়সালা করে দেন, তাঁর ফায়সালার সাথে যারা দ্বিমত পোষণ করে, তাদের ফায়সালা এভাবেই করতে হয়।'

এ কথা বলে তিনি তরবারীর আঘাতে লোকটিকে দ্বিখন্ডিত করে দিলেন। রাসূলের দরবারে সংবাদ পৌঁছে গেল, হযরত ওমর একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। চারদিকে এ সংবাদ জানাজানি হয়ে গেল। লোকজন বিরূপ মন্তব্য করতে থাকলো। আল্লাহর রাসূল স্বয়ং বিব্রতবোধ করতে থাকলেন, ওমর কেন এমন কাজ করলো। রাসূলের যাবতীয় দ্বিধা সংকোচ দূর করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ সূরা নিছার ৬৫ নং আয়াতে জানিয়ে দিলেন–

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

তোমার রবের শপথ ! লোকেরা কোনক্রমেই ঈমানদার হতে পারবে না, যদি না তারা-হে নবী-আপনাকে তাদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়ে বিচারক ও সিদ্ধান্তকারী হিসেবে মেনে নেয়, আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মনে কুণ্ঠাবোধ করে এবং তা সর্বান্তকরণে মেনে নেয়।

অর্থাৎ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যাকে হত্যা করেছেন সে ব্যক্তি মুমিন নয়, সে ব্যক্তি হলো মুনাফিক। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করার পরে নিজেকে মুসলমান দাবী করে কোরআনের আংশিক অনুসরণ ও খন্ডিতভাবে নবীর নেতৃত্ব মানার কোন অবকাশ নেই, পরিপূর্ণভাবে নবীর নেতৃত্ব অনুসরণ করতে হবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের যে বিধান পেশ করেছেন, সে বিধানের কোন একটি দিকও ত্যাগ করা যাবে না। কোরআনের বিধান পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এই বিধান যেমন বাস্তবায়িত করতে হবে ব্যক্তি জীবনে, তেমনি বাস্তবায়িত করতে হবে দেশ-জাতি ও রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে।

কোন মুসলমান যদি রাজনীতি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাঁকে অবশ্যই কোরআনের রাজনীতি করতে হবে। ইসলাম কোন মুসলমানকে এ সুযোগ দেয়নি যে, সে কোরআনের বিধানের বিপরীত কোন মতবাদ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতি করবে। এ ধরনের কোন রাজনীতির সাথে যে ব্যক্তি নিজেকে জড়িত করবে, নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করার তার কোন অধিকার নেই। শাসন ক্ষমতায় যিনি অধিষ্ঠিত, তাকেও কোরআনের বিধান অনুসরণ করতে হবে।

শাসক হিসাবে আল্লাহর রাসূল কিভাবে দেশ পরিচালিত করেছেন, সেভাবেই দেশ পরিচালনা করবেন। সেনাপ্রধান অনুসরণ করবেন আল্লাহর রাসূলকে। তিনি তাঁর বাহিনী পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখবেন, আল্লাহর রাসূল সেনাপ্রধান হিসাবে কিভাবে তাঁর অধীনস্থ বাহিনী পরিচালিত করেছেন। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বপ্রথমে অনুসন্ধান করতে হবে আল্লাহর কোরআনে। কোরআন কি ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করে গোটা মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে দরিদ্রতা দূর করেছিল। কোরআনের সেই অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতে হবে।

আল্লাহর কিতাবের দেয়া যে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট স্তরের মানুষগুলোকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রবান মানুষে পরিণত করেছিলেন, সেই শিক্ষানীতি অনুসরণ করতে হবে। শিল্পপতিগণ তাদের অধিনস্থ শ্রমিকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোরআনের দেয়া শ্রমনীতি অনুসরণ করবেন। এসব ব্যাপারে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকা যাবে না। পৃথিবীর কোন মানুষ নির্ভুল বিধান দিতে পারে না।

কারণ কোরআনের জ্ঞানহীন মানুষ নির্ভুল জ্ঞানের পরিবর্তে অমূলক ধারণা ও অনুমানকেই অনুসরণ করে থাকে। তাদের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-কল্পনা, নীতি-দর্শন, জীবন বিধান ও কর্ম পদ্ধতি সমস্ত কিছুই অনুমান নির্ভর-ধারণা আর অনুমানের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

পক্ষান্তরে কোরআন প্রদর্শিত পথ–নির্ভুল পথ। এ সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান ও সন্ধান সেই আল্লাহই দান করেছেন। মানুষ নিজেদের ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে যে পথ নির্ধারণ করে নিয়েছে, তা কোনক্রমেই নির্ভুল নয়। সুতরাং, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও দেশসমূহ কোন পথে চলছে এবং কোন বিধান অনুসরণ করছে, তা কোন মুসলমানের কাছে বিবেচনার বিষয় নয়। মুসলমান একমাত্র কোরআন প্রদর্শিত পথে চলবে। এ পথের পথিক যদি সে একাও হয় তবুও সে একাকীই এ পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হবে। এ বিষয়টিই কোরআন স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে–

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً-لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ-وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَمَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ-

তোমার রব্ব-এর কালামসমূহ সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণত। তার বিধান পরিবর্তনকারী কেউ নেই। এবং তিনি সমস্ত কিছু শোনেন এবং জানেন। আর হে রাসূল ! তুমি যদি এ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কথা মতো চলো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। তারা তো নিছক ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে চলে এবং কেবল ধারণা অনুমানই তারা করতে থাকে। (সূরা আল আন'আম-১১৫-১১৬)

কোরআনের প্রথম সূরা ফাতিহা

আল্লাহর এই কিতাব পবিত্র কোরআনে মোট সূরার সংখ্যা হলো ১১৪ টি। এ সমস্ত সূরার মধ্যে সূরা ফাতিহাকে কোরআনের শুরুতেই স্থান দেয়া হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, কোরআনের অন্যান্য সূরার বোধহয় তেমন কোন মর্যাদা সেই। বিষয়টি তেমন নয়। প্রকৃত বিষয় হলো, গোটা কোরআনের প্রতিটি সূরা; প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি শব্দ ও অক্ষরই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা এবং এর সম্মান ও মর্যাদা অতুলনীয়। কিন্তু সূরা ফাতিহার বিষয়টি একটু ভিন্ন ধরনের। কারণ, গোটা কোরআনে সূরা ফাতিহা ব্যতীত আর এমন একটি সূরাও 'নেই, যে সূরার ভেতরে গোটা কোরাআনের বিষয়বস্তু পাওয়া যাবে। কিন্তু সূরা ফাতিহার ভেতরে গোটা কোরআনের বিষয়বস্তু বিদ্যমান রয়েছে।

অর্থাৎ গোটা কোরআন যেসব বিষয়বস্তুসহ অবতীর্ণ হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ রয়েছে সূরা ফাতিহার মধ্যে। এই সূরা ফাতিহা-ই সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। ইতিপূর্বে যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তা খন্ডিতাকারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং উক্ত আয়াতসমূহ সূরা আ'লাক, সূরা মুয্যাম্মিল ও সূরার মুদ্দাসিরে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ সূরা ঠিক ঐ সময় একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান জানানোর দায়িত্ব অর্পণ করা

হয়েছিল। যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, আল্লাহর সৈনিক হিসাবে তাঁদের মন-মানসিকতা প্রস্তুত করার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কেননা, এই লোকগুলোকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মহান শিক্ষকের পদে আসীন করবেন এবং তাদের মাধ্যমেই ইসলামকে সম্প্রসারিত করাবেন। এই মহান দায়িত্ব যখন তাঁরা রাসূলের সাথে পালন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, তখন পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল তাঁদের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। বিপদ-মসিবত, নির্যাতন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল।

এ সময়ে সেই লোকগুলোর মন-মস্তিষ্কে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে এ চেতনা জাগ্রত রাখার প্রয়োজন ছিল যে, তাঁদের ইলাহ কে, কার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁরা যে কোন ধরনের কোরবানী দিতে নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখবেন, সেই অসীম শক্তিশালী ইলাহ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহশীল কিনা, তাঁর কাছে জীবনের সমস্ত কর্মকান্ডের জবাব দিতে হবে কিনা এবং তিনিই তাঁদেরকে সত্য সহজ সরল পথপ্রদর্শন করতে সক্ষম। একমাত্র তিনিই তাঁদেরকে যে কোন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করতে সক্ষম এবং তাঁর কাছেই নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করতে হবে।

উল্লেখিত চেতনা আল্লাহর সৈনিকদের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্তে সক্রিয় রাখা একান্তই প্রয়োজন। সূরা ফাতিহা সে চেতনা শানিত রাখার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। প্রতিদিন নামাজে এ সূরা বারবার পাঠ করার মাধ্যমে উক্ত চেতনাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাগণের ওপরে বাতিল শক্তি নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়েছে, তখন তাঁরা নামাজে এ সূরার মাধ্যমে নিজেদের মনের সমস্ত ব্যথা-বেদনা আল্লাহর কাছে নিবেদন করে হৃদয়-মনে এক অনাবিল শান্তি অনুভব করেছেন। তাঁদের দেহ-মনে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। সম্পূর্ণ নব-উদ্যোমে তাঁরা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

মানুষ আল্লাহর দাস এবং যাবতীয় ব্যাপারে তাকে সেই আল্লাহরই মুখাপেক্ষী হতে হবে, এ চেতনা পৃথিবীর এই প্রতিকূল পরিবেশে সদাজাগ্রত রাখার জন্যই এ সূরাকে কোরআনের প্রথমে স্থান দিয়ে বারবার পঠনীয় করা হয়েছে। কোরআন পাঠ শুরুর সাথে সাথেই এ সূরা পাঠ করার মাধ্যমে পাঠকের চেতনায় এ কথা জাগ্রত হয়ে ওঠে, সে কার বাণী পাঠ করতে যাচ্ছে এবং তাঁর পরিচয় কি। পাঠকের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কোন ধরনের। এসব কথা কোরআনের পাঠকের কাছে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়।

বর্তমানে আল্লাহর কিতাবের সূরাসমূহ যে ক্রমিকধারা অনুসারে সাজানো হয়েছে, এই ধারা অনুসারে কোরআন অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহর কোরআনের বর্তমান ক্রমিক সজ্জা সূরাসমূহের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সামঞ্জস্যের কারণে আল্লাহর আদেশে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন এবং তিনিই সূরা ফাতিহাকে কোরআনের প্রথমে স্থান দিয়েছেন। এ সূরার মূল বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি রেখেই একে সর্বপ্রথমে স্থান দেয়া হয়েছে।

কারণ, মানুষের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহর প্রশংসা করে শেষ করতে পারে। কিভাবে কোন কোন বাক্যে আল্লাহর প্রশংসা করা যেতে পারে, এ বিষয়টি এই সূরার মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অক্ষম দুর্বল মানুষ কিভাবে নিজেকে আল্লাহর কাছে

নিবেদন করবে, কিভাবে সে তার আবেগ-উচ্ছ্বাস মহান মালিকের দরবারে প্রকাশ করবে, কোন কথার মাধ্যমে সে আল্লাহর অফুরন্ত দান ও অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেবে, মানব প্রকৃতির কামনা-বাসনা কি-ইত্যাদি বিষয়সমূহ এ সূরার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

এ সূরার ফযিলত সম্পর্কে হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর নবী বলেন, যে ব্যক্তি এমন নামাজ আদায় করলো, যার মধ্যে উম্মুল কোরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি, তার নামাজ ব্যর্থ ও মূল্যহীন থেকে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রাসূল এ কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেন। তার নামাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা যখন ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করবো, তখন কি করবো ? আল্লাহর রাসূল জবাবে বললেন, তখন সূরা ফাতিহা মনে মনে পাঠ করবে। কেননা, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন-আমি নামাজকে আমার এবং বান্দার মাঝে সমান দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। বান্দাহ যা কামনা করবে আমি তাকে তা দান করবো।

বান্দাহ যখন বলে, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন-অর্থাৎ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে। যখন বান্দাহ বলে, আর রাহমানির রাহীম। অর্থাৎ তিনি দয়াময়, তিনি অনুগ্রহকারী। তখন মহান আল্লাহ বলেন, বান্দাহ আমার মর্যাদা স্বীকার করেছে এবং আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বান্দাহ যখন বলে, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাছ্তাঈ'ন। অর্থাৎ আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার এবং বান্দার মাঝে (অর্থাৎ বান্দাহ আমার দাসত্ব করবে আর আমি তাকে সাহায্য করবো), আমার বান্দাহ যা চায় তা আমি দান করবো। যখন বান্দাহ বলে, ইহ্দিনাস্ সিরাত্বাল মুস্তাকিম, সিরাত্বাল্লাযিনা আনআ'মতা আলাইহিম গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দোয়াল্লীন। অর্থাৎ আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন, সেইসব বান্দাদের পথে যাদের আপনি নি'য়ামত দান করেছেন, যারা অভিশপ্তও নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়। তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দাহ যা প্রার্থনা করেছে তা সে পাবে। (মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

নামাজে এ সূরা অবশ্যই পাঠ করতে হবে। এ সূরা পাঠ করা ব্যতীত কোন নামাজ আদায় হবে না। জামাআতে নামাজে মুক্তাদীগণকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে কিনা, এ সম্পর্কে ইসলাম বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতানৈক্য বিরাজমান। হাদীস শরীফে দেখা যায়, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা নীরবে পাঠ করবে। ইমাম শাফেঈ (রাহ) বলেন, মুক্তাদীগণকে যে কোন অবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (রাহ) বলেন, কোন অবস্থায়ই মুক্তাদীগণকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে না।

ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রাহ) বলেন, ইমাম সাহেব যে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন, তা যদি মুক্তাদীগণ শুনতে পায়, তাহলে তাদের জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করার কোন প্রয়োজন

নেই। তাঁরা ইমামের পাঠ মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কিন্তু ইমামের পাঠ যদি মুক্তাদীগণ শুনতে না পায়, তাহলে তাঁদেরকে তা পাঠ করতে হবে।

এ সম্পর্কে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহ) ভারসাম্যমূলক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে আমি যতটুকু অনুসন্ধান করেছি, তার আলোকে সর্বোত্তম পন্থা হলো, ইমাম যখন উচ্চকণ্ঠে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে তখন মুক্তাদীগণ নীরব থাকবেন। আর যখন ইমাম নীরবে পাঠ করবেন, তখন মুক্তাদীগণও নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে কোরআন ও হাদীসের কোন নির্দেশের বিরোধিতা করার কোন সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে না। জামাআতে নামাজে মুক্তাদীগণ কর্তৃক ফাতিহা পাঠ সম্পর্কিত যাবতীয় দলীল-প্রমাণের দিকে দৃষ্টি রেখে এ ধরনের একটি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করায় দোষের কিছু দেখি না। কিন্তু যে ব্যক্তি জামাআতে নামাজ আদায়কালে যে কোন অবস্থাতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করে, তার সম্পর্কে এ কথা বলা যাবে না যে তার নামাজ হবে না। কারণ উভয় মতের পক্ষে দলীল-প্রমাণ রয়েছে এবং জামাআতে সূরা ফাতিহা পাঠকারী ব্যক্তি জেনে বুঝে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরোধী আচরণ করছে না। বরং তার কাছে দলীলের ভিত্তিতে যে মতটি প্রমাণিত, সে ব্যক্তি উক্ত মতের ওপর আমল করছে এবং তা অনুসরণ করছে।

সূরা ফাতিহার নামকরণ

এই সূরাটিকে কোরআনের প্রারম্ভিকা হিসাবে রাখা হয়েছে বলে এই স্যুরাটির নামকরণ করা হয়েছে সূরা ফাতিহা-আল ফাতিহা বা ফাতিহাতুল কিতাব। এ সূরার বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতেই সূরাটির এই নামকরণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কোন বিষয়ের সূচনা করা হয়; কোন বিষয় আরম্ভ করা হয়, কোন কাজের উদ্বোধন করা হয়, কোন গ্রন্থের শুরু করা হয় আরবী ভাষায় তাকেই 'ফাতিহা' বলা হয়।

এ সূরাকে ফাতিহাতুল কিতাবও বলা হয়। কেননা এ সূরার মাধ্যমেই আল্লাহর এই কিতাবের সূচনা করা হয়েছে। কোরআনের প্রথমেই একে স্থান দেয়া হয়েছে। এ সূরা দিয়েই আল্লাহর কোরআন উদ্বোধন করা হয়েছে। কোরআন পাঠকারী প্রথমে কোরআন উন্মোচন করেই এই সূরাটিই দেখতে পায়। এই সূরার সাহায্যেই কোরআনের উদ্বোধন করা হয়, এ জন্য এ সূরাকে ফাতিহাতুল কিতাব বা ফাতিহাতুল কোরআন বলা হয়। অর্থাৎ কোরআনের কুঞ্জিকা বা কোরআনের চাবি, যা দিয়ে কোরআন খোলা হয়।

সূরা ফাতিহার অন্যান্য নামসমূহ

সাত আয়াত সম্বলিত সূরা ফাতিহার শুধুমাত্র একটি নাম নয়–এর অনেকগুলো নাম রয়েছে। এ সূরার কম বেশী ২২ টি নাম দেখা যায়। আবার তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে এ সূরার ৪০ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর কিতাবের এ সূরাটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ এবং এর অসংখ্য ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআনের এ সূরাটিকে বলা হয়েছে 'উম্মুল কিতাব' বা কিতাবের মা। আরবী ভাষায় 'উম্ম' শব্দের অর্থ হলো কেন্দ্র। পবিত্র কোরআনে দেখা যায়,

পবিত্র মক্কাকে বলা হয়েছে, 'উম্মুল কোরা' অর্থাৎ গ্রামসমূহের মা। গোটা পৃথিবীর শহর-বন্দর; গ্রাম থেকে অসংখ্য মানুষ এসে এখানে সমবেত হয়; মক্কাকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীর মানুষের মহাসম্মিলন ঘটে, এ জন্য একে বলা হয়েছে উম্মুল কোরা। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেরই নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী রয়েছে। প্রতিটি সেনাবাহিনীর রয়েছে নিজস্ব পতাকা। এই পতাকাকে বলা হয় 'উম্ম্'। কারণ সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য এই পতাকাকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়। এই পতাকাই হলো সেনা সদস্যদের একত্রিত হবার মূলকেন্দ্র। এ জন্য একে আরবী ভাষায় 'উম্ম্' বলা হয়েছে।

অনুরূপভাবে গোটা কোরআনের মধ্যে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, সে আলোচনার বিষয়বস্তু এই সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াতের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে, এ কারণে এ সূরাকে বলা হয়েছে 'উম্মুল কিতাব'। সমস্ত কিতাবের মা। গোটা কোরআনে যা পাওয়া যাবে, এই সূরা ফাতিহাকে বিশ্লেষণ করলে তাই পাওয়া যাবে। এই সূরার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছে সত্য সহজ সরল পথ কামনা করে। তার এই প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা তার সামনে গোটা কোরআন পরিবেশন করেছেন। সত্য পথ চাও ! তাহলে এ কোরআনকে অনুসরণ করো। যাবতীয় সত্য এই কিতাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

এ সূরাটির আরেকটি নাম হলো 'সূরাতুর রা'স'। আরবী রা'স শব্দের অর্থ হলো মগজ বা মগজের কেন্দ্রস্থল। মগজ হলো মাথার কেন্দ্রস্থল। আর গোটা কোরআনের কেন্দ্রস্থল হলো সূরা ফাতিহা, এ জন্য একে বলা হয়েছে সূরাতুর রা'স। কারণ এ সূরাটির মধ্যে ত্রিশপারা কোরআনের সারাংশ; মূল বিষয়বস্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, ফলে এর নাম দেয়া হয়েছে রা'স।

নিত্য এবং বারবার পঠিত এ সূরাটির আরেকটি নামকরণ করা হয়েছে, 'সূরাতুল কান্‌য'। আরবী ভাষায় 'কান্‌য' শব্দের অর্থ হলো খনি। কিন্তু সূরা ফাতিহাকে কেন খনি বলা হলো ? খনি এ কারণে বলা হয়েছে যে, এই সূরাটির ভেতরে মহান আল্লাহ জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। মানুষ যে কোন ধরনের জ্ঞান অর্জন করতে যদি আগ্রহী হয়, তাহলে এ সূরাটি সে সূত্র দান করতে সক্ষম। বর্তমান পৃথিবী নামক যে গ্রহে আমরা বসবাস করছি, এ ধরনের অসংখ্য গ্রহ আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন। এই বহুমাত্রিক জগতের ধারণা এই সূরার প্রথম আয়াত থেকেই লাভ করা যায়। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য আলামীন শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন)

এ সূরাটির আরেকটি নাম হলো, 'সূরাতুল ওয়াফিয়া'। পূর্ণত্বপ্রাপ্ত কোন জিনিসকে আরবী ভাষায় বলা হয়, 'ওয়াফিয়া'। এটা একটি পূর্ণ সূরা। একে খণ্ডিত করে পাঠ করার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহর কিতাবের অন্য যে কোন সূরা খণ্ডিত করে নামাজে পাঠ করা যেতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র ব্যতিক্রম হলো, সূরা ফাতিহা। একে খণ্ডিত করে পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। কেউ যদি তা করে, তাহলে তার নামাজ হবে না। এই সূরা যখন পাঠ করবে, তখন তা পরিপূর্ণভাবে পাঠ করতে হবে। এ জন্য এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে, 'সূরাতুল ওয়াফিয়া' বা পূর্ণত্বপ্রাপ্ত সূরা।

এ সূরার আরেকটি নাম হলো 'আসাসুল কোরআন' অর্থাৎ কোরআনের ভিত্তি। ত্রিশপারা কোরআনে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা পেশ করা হয়েছে, তার ভিত্তি হলো এই সূরা ফাতিহা। এ জন্য এ সূরাকে বলা হয়েছে 'আসাসুল কোরআন'।

এই সূরাকে 'সূরাতুল হাম্‌দ'ও বলা হয়েছে। কারণ এ সূরার প্রতিটি ছত্রে ঐ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা-ই বর্ণিত হয়েছে। মানুষ জানে না সে কিভাবে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করবে, এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে তা মানবমন্ডলীকে শিক্ষা দিয়েছেন। এ সূরা পাঠকালে পাঠকের মুখ থেকে বারবার আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা উচ্চারিত হতে থাকে, এ কারণে সূরাটিকে বলা হয়েছে, 'সূরাতুল হাম্‌দ' বা প্রশংসার সূরা।

শোকর আদায়ের বিষয়টিও অনুরূপ। এ পৃথিবীর সমস্ত মানুষই নয়, সমস্ত সৃষ্টি যদি কিয়ামত পর্যন্ত আয়ূ লাভ করে আর তারা একযোগে অসংখ্য মুখে আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করতে থাকে, তবুও আল্লাহ তা'য়ালার যেমন প্রশংসা করা প্রয়োজন, তেমনভাবে তার শত সহস্র কোটি ভাগের এক ভাগও করা হবে না। এ জন্য তাঁর প্রশংসা কিভাবে করতে হবে, তা স্বয়ং আল্লাহ-ই করুণা করে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য এ সূরার আরেকটি নাম হলো 'সূরাতুশ্‌ শুক্‌র' অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সূরা। এ সূরার মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করতে শিখেছে এবং আল্লাহভীরু বান্দাগণ তা পাঠ করে শোকর আদায় করে, এ জন্য একে সূরাতুশ্‌ শুক্‌র বলা হয়ে থাকে।

এ পৃথিবীতে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো একটি সত্য সহজ সরল; সহজে পালনযোগ্য, যা অনুসরণ করতে, মেনে নিতে, স্বীকৃতি দিতে কোন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে না, এমন একটি ভারসাম্যমূলক নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা। মানুষের এ বিরাট প্রয়োজন তাঁরই অনুরূপ কোন সৃষ্টি পূরণ করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। এই প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে সক্ষম হলেন কেবলমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা। এ জন্য সূরা ফাতিহার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাহকে তাঁরই কাছে প্রয়োজনীয় জীবন ব্যবস্থা দান করার জন্য দোয়া করতে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ এ সূরা বারবার পাঠ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করতে থাকে, এ কারণে এ সূরার আরেকটি নাম হলো. 'সূরাতুদ্‌ দোআ'। দোআ' করার বা প্রার্থনা করার সূরা।

সমস্ত কিছু দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার এবং তিনিই পারেন মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে। মানুষ বিপদগ্রস্ত হলে তিনিই পারেন মানুষকে বিপদ থেকে মুক্ত করতে এবং রোগগ্রস্ত হলে শুধুমাত্র তিনিই পারেন মানুষকে রোগমুক্ত করতে। অনাহারীর খাদ্যের ব্যবস্থা তিনিই করেন; সন্তানহীনকে তিনিই সন্তান দান করতে পারেন। প্রচন্ড খরায়–সূর্যের উত্তপ্ত কিরণে যখন পথ-প্রান্তর ফেটে চৌচির হয়ে যায়, প্রাণীজগৎ বৃষ্টি ধারার আশায় আর্তচিৎকার করতে থাকে, মানুষ আল্লাহর কাছেই পানি চাইতে থাকে। মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা আল্লাহর কাছেই মানুষ চাইবে। কিভাবে চাইতে হবে, সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ তা শিক্ষা দিয়েছেন। এ জন্য এ সূরার আরেক নাম হলো 'সূরাতুস্‌ সাওয়াল'।

অর্থাৎ কামনা করার সূরা বা চাওয়ার সূরা। মানুষ এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহকে বলে থাকে, আমরা তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি এবং তোমার কাছে নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা কামনা করি। এ অর্থে এ সূরাকে সূরাতুস্ সাওয়াল বলা হয়েছে।

রোগী যেমন আরোগ্য লাভের আশায় রোগ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকে। তেমনি পৃথিবীতে পথহারা মানুষ অন্ধকারে পথ হারিয়ে; শোষকের শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে, ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে মুক্তির আশায় আর্তনাদ করতে থাকে। এ অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে রাসূল প্রেরণ করলেন এবং তাঁর মাধ্যমে যাবতীয় যন্ত্রণার উপশমকারী কোরআন অবতীর্ণ করে মানুষকে মুক্তি বা শিফা দান করলেন। এই শিফা বা মুক্তি চাওয়া হয় সূরা ফাতিহার মাধ্যমে। এ কারণে এ সূরাকে 'সূরাতুশ্ শিফা' বলা হয়েছে। শিফা বা প্রতিষেধক বলা হয়েছে এ সূরাকে। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় সমস্যাকে যদি রোগের সাথে তুলনা করা যায়, আর সে রোগসমূহের প্রতিষেধক বলা যেতে পারে আল্লাহর এ কিতাবকে। এই প্রতিষেধক কামনা করা হয়ে থাকে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে।

সাধারণ মানুষ যাদেরকে আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় বান্দাহ বলে মনে করে, কোন রোগ-ব্যধিতে আক্রান্ত হলে তাদের কাছে যায় পানি, তেল বা কালোজিরা নিয়ে। তাঁরা আল্লাহর কোরআন থেকে পাঠ করে সেগুলোর ওপরে ফুঁ দেন। মানুষ তা ব্যবহার করে রোগ মুক্তির আশায়। তাঁরা আল্লাহর কোরআনের এই সূরা ফাতিহা পাঠ করেই ফুঁ দেন। কোন কোন কিতাবে এ সূরার ফযিলত সম্পর্কে মুফাচ্ছিরীন এবং মুহাদ্দিছীনগণ লিখেছেন, এমন দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েছে ,যা কোন ওষুধে আরোগ্য লাভ করছে না। তখন প্রতিদিন ফজরের পরে সূরা ফাতিহা ৪০ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিয়ে তা ৪১ দিন রোগীকে পান করতে দিলে আল্লাহর রহমতে রোগী আরোগ্য লাভ করবে। এ জন্যও এ সূরাকে 'সূরাতুশ্ শিফা' বলা হয়েছে।

সূরা ফাতিহা পাঠ করা ব্যতীত নামাজ হবে না। এ জন্য এই সূরাকে বলা হয়েছে, 'সূরাতুস সালাত'। হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে–

لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَاْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (بخارى-مسلم)

সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামাজই হবে না। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত শুধু ফরজ নামাজে এ সূরাটি সতের বার পাঠ করতে হয়। বিতরের নামাজসহ বিশ বার পড়তে হয়। আর সুন্নাতসহ প্রতিদিন বিয়াল্লিশ বার পাঠ করতে হয়। এ ছাড়া যে কোন ধরনের নামাজে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেই হবে। এ সূরা পাঠ করা ব্যতীত কোন নামাজ হবে না। এ সূরার গুরুত্ব অসীম। হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে–

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ
فَدَعَانِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فَلَمْ اُجِبْهُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ
فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ-قَالَ اَلَمْ يَقُوْلِ اللّٰهُ

اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ-اَلاَ اُعَلِّمُكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ-فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَلَمَّا اَرَدْنَا اَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ-يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّكَ قُلْتَ لَ اُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ-اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهُ (بخارى)

হযরত আবু সাঈদ ইবনে মুআল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন আমি মসজিদে নববীতে নামাজ (নফল) আদায় করছিলাম। এ সময় আল্লাহর রাসূল আমাকে আহ্বান জানালেন। আমি (নামাজে ছিলাম বলে) তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে পারলাম না। (নামাজ শেষ করে) আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি নামাজ আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ কি বলেননি, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যখন তোমাদেরকে আহ্বান জানাবেন তখন তাঁদের আহ্বানে সাড়া দাও ! এ কথা বলে তিনি বললেন, তুমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবার পূর্বে আমি কি তোমাকে কোরআনের সবচেয়ে মহান এবং সবচেয়ে বড় সূরাটি শিখিয়ে দেবো না ? এ কথা বলে তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর আমরা যখন মসজিদ থেকে বের হতে উদ্যোগ নিলাম, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি বলেছিলেন, আমি তোমাকে কোরআনের সবচেয়ে বড় সূরা শিখিয়ে দেবো। তিনি বললেন, সে সূরা হলো আলহাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। এটাই সাবউল মাসানী (বারবার পঠিত আয়াত) এবং তার সাথে রয়েছে মহান কোরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে। (বোখারী)

আকারের দিক থেকে এ সূরাকে বড় বলা হয়নি, বড় বলা হয়েছে, এর ফযিলতের কারণে। এ সূরার আরেকটি নাম হলো, 'আস্‌সাব উল মাছানি' নিত্য পঠনীয় সপ্তবাক্য। বারবার এ সূরাকে পাঠ করতে হয়। নামাজের প্রতিটি রাকাআতে পাঠ করতে হয়। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সূরাটি সম্পর্কে বলেছেন–

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ-

আমি তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়েছি, যা বারবার আবৃত্তি করার মতো এবং তোমাকে দান করেছি মহান কোরআন। (সূরা আল হিজ্‌র-৮৭)

এ সূরাটির মাধ্যমে মানুষ নিজের যাবতীয় সত্তাকে একমাত্র আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয়। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছেই নিবেদন করে। এ জন্য এ সূরাকে বলা হয় 'সূরাতুত্ তাফ্‌বিয' অর্থাৎ আত্মনিবেদন করার সূরা। এ পৃথিবীর যে কোন ধরনের মানুষ, হতে পারে সে পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী, হতে পারে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী, শারীরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী, প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে শক্তিশালী। যখন সে সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের সাথে নামাজে দাঁড়ায়, তখন তার মধ্যে আর সমাজের খেটে খাওয়া দিন মজুরের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে

না। আল্লাহর দরবারে মনিব আর ভৃত্যের দল এক কাতারে মাথানত করে দাঁড়িয়ে যায়। ডঃ আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন–

এক হি সফ্ মে খাড়ে হো গ্যয়ি মাহ্মুদ ও আয়াজ

না কো-ই বান্দাহ রাহা না কো-ই বান্দা নেয়াজ

একই সারিতে সম্রাট মাহ্মুদ আর তাঁর ভৃত্য আয়াজ দাঁড়িয়ে গিয়েছে, এদের মধ্যে কে সম্রাট আর কে যে ভৃত্য, সে পার্থক্য নেই।

যে কোন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর দরবারে নামাজে দাঁড়িয়ে নিজের অসহায়ত্ব পেশ করে বলে, রাব্বুল আলামীন ! আমরা তোমার গোলাম। একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি। তোমার কাছেই সাহায্য কামনা করি। তোমার কাছেই আমরা নিজেদেরকে নিবেদন করি। এভাবে সূরা ফাতিহার মধ্য দিয়ে আল্লাহর কাছে মানুষ নিজের যাবতীয় সত্তাকে নিবেদন করে বলে এ সূরাটির নাম হয়েছে 'সূরাতুত তাফবিয' বা আত্মনিবেদন করার সূরা।

এ সূরাকে বলা হয়েছে, 'সূরাতু আল কাফিয়া' অর্থাৎ যথেষ্ট। নামাজে কোরআন পাঠ করা ফরজ–এ সূরা পাঠ করলেই সে ফরজ আদায় হয়ে যায়। মানুষের হেদায়াতের জন্যও এ সূরা যথেষ্ট, কারণ এ সূরার ভেতরেই গোটা ত্রিশপারা কোরআনের সারসংক্ষেপ বিদ্যমান। এ জন্য একে বলা হয়েছে, 'আল কাফিয়া'।

এ সূরাকে বলা হয়েছে, 'সূরাতুল হিক্মা' অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূরা। অসংখ্য জ্ঞানের সূত্র এ সূরায় বিদ্যমান। এ সূরাকে বিশ্লেশণ করে মানুষ জ্ঞানের যে কোন শাখায় পৌঁছতে সক্ষম, এ কারণে একে বলা হয়েছে, 'সূরাতুল হিক্মা'।

এ সূরাকে বলা হয়েছে, 'সূরাতুল আখ্লাক্' অর্থাৎ নীতি নৈতিকতার সূরা। এ সূরা মানুষকে একটি দৃঢ় নীতি অর্থাৎ আল্লাহর দাসত্ব করার দৃঢ় নীতির ওপর দন্ডায়মান করে দেয়। মানুষকে উন্নত নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেয়। এ জন্য একে চিহ্নিত করা হয়েছে, সূরাতুল আখলাক হিসাবে।

এ সূরাকে বলা হয়েছে, সূরাতুল কাসাস' অর্থাৎ ইতিহাসের সূরা। এ সূরা অতীত ইতিহাসের বদ্ধ দুয়ার মানব জাতির সামনে খুলে দেয়। আল্লাহর দাসত্ব করার কারণে কোন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর নিয়ামত লাভে ধন্য হয়েছে। আর আল্লাহর দাসত্ব না করার কারণে কোন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর ক্রোধে নিমজ্জিত হয়েছে এবং তাদের পরিণতি কতটা করুণ হয়েছে, সে ইতিহাস মানুষের সামনে এ সূরা পেশ করে, এ জন্য একে বলা হয়েছে সূরাতুল কাসাস। এই সূরা ফাতিহার যে কত মর্যাদা এবং ফযিলত, তা এ নামগুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয় মোট তিনটি এবং তা হলো, তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত। আল্লাহর কিতাবের সূরা ফাতিহার মধ্যে এ তিনটি বিষয়ের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। গোটা কোরআনে আলোচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিমূর্ত প্রতিফলন হলো এই সূরা ফাতিহা। এ সূরাটি

একটি দর্পণ বিশেষ, যার ভেতর দিয়ে মানুষ তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের চিত্র দেখতে পাবে। মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরার মোট আয়াত সংখ্যা হলো সাত। রুকু একটি এবং এ সূরার মোট শব্দ সংখ্যা হলো ২৫ টি। এ সূরায় মোট অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে ১১৩ টি।

বিস্‌মিল্লাহ কি সূরা ফাতিহার অংশ ?

কোরআন সম্পর্কে যাঁরাই চিন্তা-গবেষণা করেন, কোরআন বুঝে পাঠ করতে আগ্রহী, তাদের মনে একটি প্রশ্ন বার বার উঁকি দেয়, পবিত্র কোরআনে সূরা ফাতিহার ওপরে আরেকটি আয়াত রয়েছে, সে আয়াতটি হলো–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ–

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। (সূরা আন্ নাম্‌ল–৩০)

সূরা আন্ নাম্‌লে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম–আয়াতটি উল্লেখ রয়েছে এভাবে যে, হযরত সুলাইমান আলাহিস্ সালাম সাবার রাণীর কাছে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিয়ে যে পত্র হুদহুদ পাখির মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলেন, সে পত্র তিনি শুরু করেছিলেন বিস্‌মিল্লাহ দিয়ে। সুতরাং এটা কোরআনের আয়াত এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সূরা ফাতিহার ওপরে এটা স্থান লাভ করেছে, এ জন্য এটা সূরা ফাতিহার অন্তর্ভুক্ত একটি আয়াত কিনা, এটাই প্রশ্ন। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে দেখা যায়, কোন কোন সাহাবী বিস্‌মিল্লাহকে সূরা ফাতিহার একটি অংশ বলে ধারণা করতেন।

সাহাবাদের পরবর্তী যুগের ইমামগণের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ)ও বিস্‌মিল্লাহকে সূরা ফাতিহার অংশ বলে ধারণা করতেন। ইমাম আলুসী (রাহঃ) তাঁর তাফসীরের মধ্যে এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের দশটি মতামত উল্লেখ করেছেন। ইমাম রাযী (রাহঃ) তাঁর রচিত তাফসীরের মধ্যে বিস্‌মিল্লাহকে সূরা ফাতিহার অংশ হিসাবে প্রমাণ করতে গিয়ে মোট ষোলটি যুক্তির অবতারণা করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আলুসী (রাহঃ) বিস্‌মিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ–এর পক্ষের সমস্ত যুক্তি খন্ডন করে বহু দলীলের ওপর ভিত্তি করে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, এটা সূরা ফাতিহার অংশ নয়। তিনি মতামত পেশ করেছেন যে, বিস্‌মিল্লাহ একটি স্বতন্ত্র আয়াত এবং তা কোরআনেরই আয়াত। এটা সূরা ফাতিহার কোন অংশ নয়। মহান আল্লাহর কিতাব পবিত্র কোরআনের সূরা আন্ নাম্‌লের ৩০ নম্বর আয়াত হলো বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতামত হলো, এটা সূরা ফাতিহার অন্তর্গত কোন আয়াত নয়। মহান আল্লাহর আদেশে কোরআনের প্রতিটি সূরার ওপরে বিস্‌মিল্লাহ সংযোজন করা হয়েছে কিন্তু ব্যতিক্রম হলো সূরা আত্ তাওবা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোরআনের ১১৪ টি সূরার মধ্যে ১১৩ টি সূরার ওপরে বিস্‌মিল্লাহ রয়েছে, একটি সূরার ওপরে নেই। কিন্তু কোন মানুষ যদি গোটা ত্রিশপারা কোরআন পাঠ করতে চায়, তাহলে তাঁকে বিস্‌মিল্লাহ ১১৪ বারই পাঠ করতে হবে। কারণ সূরা তাওবার

ফর্মা–১৭

ওপর বিস্‌মিল্লাহ্ সংযোজন করা না হলেও সূরা আন্ নাম্‌লের ৩০ নম্বর আয়াত পাঠ করার কারণে পাঠকের ১১৪ বারই বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করা হয়ে যায়।

এই বিস্‌মিল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'য়ালা যে ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসূল তা যেভাবে পাঠ করেছেন, এর বিপরীত পাঠ করা যাবে না। বোঝার জন্য যে কোন ভাষায় অনুবাদ করা যেতে পারে। কিন্তু তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে আরবী ভাষাতেই তেলাওয়াত করতে হবে। 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' না বলে 'পরম করুণাময়ের নামে শুরু করছি' এভাবে যারা এটাকে পাঠ করতে আগ্রহী, তারা অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। ইসলামী শরিয়ত আল্লাহর কালাম অনুবাদের মাধ্যমে তেলাওয়াত করার অনুমতি দেয়নি।

আল্লাহর রাসূল বলেছেন, কোরআনের একটি অক্ষর উচ্চারণ করলে মানুষের আমল নামায় দশটি করে সওয়াব লেখা হবে। আরবী ভাষায় তেলাওয়াত না করে অন্য ভাষায় পাঠ করলে সওয়াব পাওয়া যাবে না এবং তা ক্রমশঃ বিকৃতির পথ খুলে দেবে। গবেষকগণ বলেন, ত্রিশপারা কোরআনের ভেতরে যা রয়েছে, সূরা ফাতিহার মধ্যে তাই আছে। আবার সূরা ফাতিহার মধ্যে যা আছে, শুধুমাত্র বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর মধ্যে তাই রয়েছে। সুতরাং, এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতকে যারা জেনে বুঝে বিকৃত করবে, তারা অবশ্যই আল্লাহদ্রোহীদের দলে শামিল হয়ে যাবে।

হেরা পর্বতের গুহায় যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে প্রথম ওহী অবতীর্ণ করা হয়, তার ধরন ছিল এমন–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ-

পড়ুন আপনার রব্ব-এর নাম সহকারে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আলাক)

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রব্ব-এর নাম উচ্চারণ করে তাঁর রাসূলকে পড়তে আদেশ দেয়া হলো। রব্ব-এর নাম বলতে পরবর্তীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে গেল বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রাথমিক আদেশানুসারে তাঁর কোরআনের প্রতিটি সূরার শিরোভাগে একে স্থান দিয়ে একে কোরআনের সাথে মিলিয়ে বারবার পাঠ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিস্‌মিল্লাহ্ একটি অত্যন্ত বরকত ও ফযিলতপূর্ণ আয়াত। মুসলমান যখনই কোন কাজ শুরু করবে, তাকে বিস্‌মিল্লাহ্ বলতে আদেশ করা হয়েছে। বিস্‌মিল্লাহর বলে যে কাজ শুরু করা হবে, মহান আল্লাহ্ তাতে বরকত দান করে থাকেন। বিস্‌মিল্লাহ্ বলার কারণে শয়তান বঞ্চিত হয়।

মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন কোন মানুষ তার ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম স্মরণ করে এবং আহার গ্রহণের পূর্বে আল্লাহর নাম নেয়, তখন শয়তান তার সাথীদের বলে, তোমাদের জন্য এই ঘরে রাত অতিবাহিত করার কোন অবকাশ নেই এবং কোন খাদ্য নেই। আর যখন কোন মানুষ আল্লাহর নাম না নিয়েই ঘরে প্রবেশ করে, তখন শয়তান তার সাথীদের বলে, এখন এ ঘরে তোমাদের

রাত অতিবাহিত করার ব্যবস্থা হয়ে গেল। তারপর সে ব্যক্তি যখন আহার গ্রহণের পূর্বে আল্লাহর নাম স্মরণ করলো না, তখন শয়তান বলে, তোমাদের রাত কাটানোর ও আহার গ্রহণের ব্যবস্থা এ ঘরে হয়ে গেল।

যে কাজের শুরুতে বিস্মিল্লাহ বলা হয় না, আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সে কাজে শয়তান অংশগ্রহণ করে এবং তার ভেতরে কোন বরকত থাকে না। মুসলিম শরীফে আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা কখনো একত্রে আহার করতে বসলে তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত আহার শুরু না করতেন, ততক্ষণ আমরা খাদ্যে হাত দিতাম না। একদিন আমরা তাঁর সাথে আহার করতে উপস্থিত হলাম। এমন সময় একটি ছোট্ট মেয়ে এসে এমনভাবে খাদ্যের ওপর ঝুঁকে পড়লো যেন সে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর। সে খাদ্যের দিকে হাত অগ্রসর করতেই আল্লাহর রাসূল তার হাত ধরে ফেললেন।

তারপর একজন বেদুঈন এসে খাদ্যের ওপর ঝুঁকে পড়তেই আল্লাহর রাসূল তার হাতও ধরে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন, যে খাদ্যে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না, শয়তান এসে তা নিজের জন্য হালাল করে নেয়। শয়তান এ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল এর মাধ্যমে তার নিজের জন্য খাদ্য হালাল করার জন্য। আমি তার হাত ধরে ফেললাম। তারপর শয়তান এই বেদুঈনকে নিয়ে এলো তার মাধ্যমে নিজের জন্য খাদ্য হালাল করার জন্য। আমি তারও হাত ধরে ফেললাম। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ ! এ দু'জনের হাতের সাথে শয়তানের হাতও আমার হাতের মধ্যে মুষ্ঠিবদ্ধ রয়েছে। তারপর তিনি আল্লাহর নাম নিলেন অর্থাৎ বিস্মিল্লাহ বললেন এবং আহার শুরু করলেন।

আল্লাহর নাম অর্থাৎ বিস্মিল্লাহ উচ্চারণ করার সাথে সাথে শয়তান বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত উমাইয়্যা ইবনে মাখশী সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–আল্লাহর রাসূল বসেছিলেন। একজন লোক আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করেই খাদ্য গ্রহণ করছিল। খাদ্যের শেষ লোকমা মুখে উঠানোর সময় সে বললো, বিস্মিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু অর্থাৎ আল্লাহর নাম স্মরণ করছি আমি আহার করার শুরু ও শেষভাগে। তার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, শয়তান তার সাথে আহার করছিল। লোকটি আল্লাহর নাম স্মরণ করা মাত্রই যা কিছু শয়তানের পেটে ছিল, তা সব সে উদগিরণ করে দিল। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

বিস্মিল্লাহর বরকত অত্যন্ত বেশী। এটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত অবতীর্ণ হতে থাকে। আল্লাহর রাসূল তাঁর ছয়জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আহার করছিলেন। এ সময় একজন বেদুঈন এসে দুই লোকমাতেই সমস্ত খাদ্য শেষ করে দিল। রাসূল বললেন, লোকটি যদি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে আহার গ্রহণ শুরু করতো, তাহলে এ খাদ্য সবার জন্য যথেষ্ট হতো। (তিরমিযী)

আল্লাহর নামের যে কত বরকত, এর ভেতরে যে কতটা কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা কল্পনাও করা যাবে না। যে ছাগল কোনদিন বাচ্চা দেয়নি অথবা তার বাচ্চা দেয়ার বয়স হয়নি। আল্লাহর রাসূল বিস্মিল্লাহ বলে সে ছাগলের ওলানে হাত দেয়া মাত্র তা দুধে পরিপূর্ণ হয়ে

গিয়েছে। খন্দকের যুদ্ধে পরীখা খনন করার সময় হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহু তাঁর সাধ্যানুযায়ী শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূলের জন্য আহারের ব্যবস্থা করে তাঁকে অনুচ্চ কণ্ঠে দাওয়াত দিয়েছিলেন। রাসূল উপস্থিত সমস্ত সাহাবাদের সাথে নিয়ে হযরত জাবিরের বাড়িতে গেলেন। হযরত জাবির অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন। রাসূল তাঁকে বললেন, তুমি খাদ্যপাত্র আমার সামনে নিয়ে এসো। তা নিয়ে আসা হলো এবং তিনি বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তা বিতরণ করতে থাকলেন। মাত্র এক দু'জনের খাদ্য কয়েক শত সাহাবী তৃপ্তির সাথে আহার করার পরও অবশিষ্ট রয়ে গেল।

ইসলামের মর্মকথাই হলো মহান আল্লাহকে তাঁর নির্দেশিত পন্থায় স্মরণ করা। আর বিস্‌মিল্লাহর মধ্যে ইসলামের বিপ্লবী কেন্দ্রীয় ভাবধারা বিদ্যমান। তাছাড়া মানুষের হৃদয়-মনকে যে কোন প্রকার মানসিক অশান্তি, দুশ্চিন্তা, অস্বস্তি, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, অস্থিরতা, উদ্যোমহীনতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত রেখে হৃদয়-মন প্রফুল্ল রাখার একমাত্র শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো আল্লাহর স্মরণ। একজন মানুষ তার নিজের ওপরে প্রবল আস্থাশীল। কাজ সম্পাদন করার মতো তার শারীরিক যোগ্যতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা রয়েছে। এরপরও সে যখন কাজ শুরু করার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ বললো, তখন সে প্রকারান্তরে এ কথারই স্বীকৃতি দিল, আমি আল্লাহর গোলাম। আমার অভ্যন্তরে যাবতীয় যোগ্যতা আমাকে তিনিই দান করেছেন। তাঁর করুণা ব্যতীত কোন কাজ সম্পাদন করার ক্ষমতা আমার নেই।

সুতরাং, বিস্‌মিল্লাহ্ মানুষকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে একজনের গোলাম। তাঁর একজন মনিব রয়েছেন এবং তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান। আল্লাহর রাসূল বলেছেন-

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِاسْمِ اللّٰهِ فَهُوَاَبْتَرُ-

যে কোন বৈধ কাজ আল্লাহর নাম না নিয়ে শুরু করা হলে সে কাজ অবশ্যই অসম্পূর্ণ এবং অকল্যাণে পরিপূর্ণ হবে।

এ জন্য এই বরকত ও কল্যাণকর আয়াতটি মহান আল্লাহ্ দান করেছেন, তাঁর বান্দারা যেন তা কাজের শুরুতে উচ্চারণ করে বরকত ও কল্যাণ লাভ করতে পারে। আল্লাহর এ কিতাবের যে কোন স্থান থেকে পাঠ করার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলতেই হবে। আল্লাহর এই কোরআন যেন মানুষ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়, এ জন্য শয়তান মরিয়া হয়ে তৎপরতা চালায়। কোরআনের পাঠক যেন কোরআন থেকে হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী লাভ করে, এ ব্যাপারে শয়তান চতুরমুখী আক্রমণ পরিচালিত করে।

শয়তানের এসব হামলা থেকে নিরাপদ থাকার লক্ষ্যে বর্ম হিসাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা বিস্‌মিল্লাহ্ দান করেছেন, কোরআনে সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ স্থাপন করা হয়েছে। কোরআনের মূল পাঠ শুরু করার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করে মানুষ যেন প্রকারান্তরে আল্লাহর কাছে এ আবেদনই করে, হে আল্লাহ্ ! আমরা অন্ধকারে ছিলাম। তুমি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে কোরআন দান করে অন্ধকারের জাল ছিন্ন করে আলোর দিকে আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছো। তোমার কালামের মর্ম অনুধাবন করে আমরা সে অনুসারে যেন নিজেদেরকে পরিচালিত করতে সক্ষম হই, এ জন্য তুমি আমাদের ওপরে করুণা করো।

সূরা আল ফাতিহা
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম দাতা ও দয়ালু
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি নিখিল জাহানের রব্ব্!
اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
যিনি পরম দয়াময় ও অসীম করুণাময়;
مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ
যিনি বিচার দিবসের মালিক;
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
আমরা শুধুমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি।
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
আমাদেরকে সঠিক সুদৃঢ় পথপ্রদর্শন করো;
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
তাদের পথ–যাদের প্রতি তুমি নিয়ামত দান করেছো।
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ
যারা অভিশপ্ত নয়–পথ ভ্রষ্ট নয়।
اٰمِيْنَ
হে আল্লাহ ! আপনি কবুল করুন।

সূরা ফাতিহা একটি প্রার্থনা

সূরা ফাতিহাকে একটি অভিনন্দন-পত্র (Congratulatory address) বলা যেতে পারে। বান্দাহ মহান আল্লাহকে-যিনি গোটা জাহানের রব্ব, তাঁকেই অভিনন্দন-পত্র দিচ্ছে। এ অভিনন্দন-পত্র বান্দাহ স্বয়ং রচনা করে আল্লাহর দরবারে পেশ করছে না, কারণ বান্দার সে ক্ষমতা ও যোগ্যতা (Qualification) কোনটিই নেই। আল্লাহর কতৃজ্ঞতা, তাঁর প্রশংসা, তাঁর অগণিত নিয়ামতের শোকর আদায় ও তাঁকে অভিনন্দন জানানো কোনটিই মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। আল্লাহর প্রশংসা কিভাবে জানাতে হবে, কোন ভাষায় প্রশংসা করতে হবে এবং কি পদ্ধতিতে করতে হবে, এর কোনটিই বান্দা জানে না বা সে যোগ্যতা বান্দার মধ্যে নেই। এ জন্য স্বয়ং আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাকে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে শিখিয়েছেন, কিভাবে ও কোন ভাষায় এবং কোন পদ্ধতিতে মনিবের প্রশংসা করতে হবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। এ সূরাটি মুলতঃ একটি প্রার্থনার সূরা। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে কিতাব যে ব্যক্তিই অধ্যয়ন করতে আগ্রহী হবে, মহান আল্লাহ তাঁকেই এই সূরা ফাতিহার মাধ্যমে এই দোয়া করতে শিক্ষা দিয়েছেন, সে যেন এই কিতাব থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারে।

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, একটি নির্ভুল ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা তথা এমন একটি সত্য সঠিক পথ-যে পথে এগিয়ে গেলে মানুষ তার সমগ্র জীবনে চরম সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এটাই মানুষের কামনা এবং এই কামনা সে এমন এক শক্তির কাছে পেশ করে, যে শক্তি সম্পর্কে তার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, সে যা কামনা করছে, তা একমাত্র ঐ শক্তির হাতেই নিবদ্ধ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের এই কামনার প্রতি লক্ষ্য রেখে সূরা ফাতিহাকে তাঁর কিতাবের শিরোভাগে স্থান দিয়েছেন, যেন মানুষ সত্যানুসন্ধিৎসু মনোভাব এবং সত্য সঠিক পথের সন্ধান লাভের উদ্দেশ্যেই তাঁর অবতীর্ণ করা এই কিতাব অধ্যয়ন করতে শুরু করে। সত্য সহজ সরল পথের সন্ধান করছে মানুষ ঐ আল্লাহর কাছে, যিনি সমস্ত জ্ঞানের উৎস এবং তিনিই নির্ভুল জ্ঞান ও পথের সন্ধান দিতে সক্ষম।

সূরা ফাতিহাকে অনুধাবন করতে হলে একটি কথা স্মরণে রেখে অধ্যয়ন করতে হবে, গোটা কোরআনের ভেতরে মহান আল্লাহ যা আলোচনা করেছেন, তার সারমর্ম (Substance)) হচ্ছে সূরা ফাতিহা। সুতরাং, অনুসন্ধানী দৃষ্টি; সত্যানুসন্ধিৎসু মন-মানসিকতা, একনিষ্ঠ অধ্যয়ন ব্যতীত সূরা ফাতিহার গুরুত্ব অনুধাবন ও এ সূরা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হবে না।

সূরা ফাতিহা একটি অভিনন্দন-পত্রের মতো। তিনটি বিষয়কে সম্বলিত করে একটি অভিনন্দন-পত্র রচিত হয়। এ পত্রের প্রথমে থাকে যাকে উদ্দেশ্য করে তা রচিত হচ্ছে, তার ভূয়সী প্রশংসা। দ্বিতীয় ভাগে থাকে যাকে কেন্দ্র করে অভিনন্দন পত্র রচিত হচ্ছে, তাঁর পরিচিতি। তৃতীয় ভাগে সংযোজন করা হয়ে থাকে অভিনন্দন-পত্র রচয়িতা কর্তৃক দাবী।

যাকে উদ্দেশ্য করে অভিনন্দন-পত্র রচিত হয়, শব্দের ভান্ডার থেকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রশংসামূলক শব্দ চয়ন করে তা সংযোজন করে আকর্ষণীয় বর্ণনাশৈলীতে তা প্রথম অংশে বর্ণনা করা হয়। যার উদ্দেশ্যে অভিনন্দন পেশ করা হচ্ছে, তিনি যেন প্রথম অংশ শ্রবণ করেই বর্ণনাকারীদের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় অংশে তাঁর পরিচিতি থাকে। পরিচিতির ভেতরে তাঁর অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহের কথা, তাঁর উদারতা ও বদান্যতার কথা; তিনি কতটা ক্ষমতাধর এবং তাঁর ক্ষমতার পরিধি কতটা ব্যাপক, যে কোন সাহায্য দানে তিনি সক্ষম ইত্যাদির কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তৃতীয় অংশে থাকে যারা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে, তারা কতটা অসহায়, অভাবী, অপারগ, মুখাপেক্ষী এবং তাদের কি প্রয়োজন তা বিনয়ের সাথে তুলে ধরা হয়।

প্রবল ক্ষমতা ও শক্তিধরের কাছে কোন সাহায্য কামনা করার এটাই প্রথাসিদ্ধ রীতি। মূলতঃ এই শালীনতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে আল্লাহর কিতাব। এই কোরআনই মানুষকে ভদ্র, মার্জিত ও রুচিবান হবার শিক্ষা দিয়েছে। এই কোরআনের শিক্ষা যাদের কাছে নেই, সেই পশ্চিমা জগৎ–আজো জানেনা কিভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্না অর্জন করতে হয়। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, দাঁত পরিষ্কার করা, পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র করা, মলমূত্র ত্যাগের পর পবিত্রতা অর্জন করা এবং গোসলের সাথে তাদের পরিচয় ঘটে না। অন্য জাতির সাথে ইনসাফ করতে তারা জানে না। আল্লাহর কোরআনই এসব কিছু মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা ফাতিহার মাধ্যমে তাঁর বান্দাহদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে প্রশংসা করতে হবে, কোন পদ্ধতিতে পরিচয় পেশ করতে হবে এবং কিভাবে দাবি করতে হবে। এই তিনটি জিনিস মানুষ জানতে পেরেছে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে। সূরা ফাতিহা একটি অভিনন্দন-পত্রের মতো এবং তা কিভাবে আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে, সেটাও আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন এবং কেন–কোন উদ্দেশ্যে পেশ করতে হবে, সেটাও আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন। মানব জীবনের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আল্লাহর কাছে কামনা করতে হবে, সেই জিনিসটি কি–তা সামনের দিকে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হলেন সবচেয়ে বড় এবং মহান; তাঁর দরবারে কামনাও করতে হবে সবচেয়ে বড় জিনিস। সেটা কামনা করার নিয়ম-পদ্ধতিই শিক্ষা দেয়া হয়েছে বান্দাকে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সর্বাবস্থায় প্রশংসা হয় সুন্দরের, অসুন্দরের কোন প্রশংসা হয় না। কদর্য, কুৎসিত এবং বিভৎসতার কোন প্রশংসা হয় না। যা দৃষ্টিনন্দন, মনোমুগ্ধকর, হৃদয়গ্রাহী, চিত্তাকর্ষক প্রশংসা তারই হয়। সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে, সমস্ত প্রশংসা কেবল মাত্র আল্লাহর। অন্য কোন শক্তির প্রশংসা হতে পারে না। কারণ, পৃথিবীতে মানুষ যেসব বস্তু দেখে এবং যাদেরকে শক্তির উৎস বলে মনে করে, এসব বস্তু ও শক্তির কোন প্রশংসা হতে পারে না। কেননা, বস্তু স্বয়ং দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্যের পসরা ও মনোমুগ্ধকর, কল্যাণকর গুণাবলীসহ সৃষ্টি হয়নি। এর পেছনে একজন স্রষ্টা রয়েছেন। তিনিই বস্তুর ভেতরে সৌন্দর্য দান করেছেন, তার ভেতরে কল্যাণকর গুণাবলী দান করেছেন। আবার মানুষ যাদেরকে বিরাট ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর বলে মনে করে তার প্রশংসা করে, আল্লাহর শক্তির মোকাবেলায় এসব নশ্বর শক্তির কোন তুলনা হয় না। মানুষের কল্পিত এসব শক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা মুহূর্তে অস্তিত্বহীন করে দিতে পারেন। সুতরাং, মানুষের সামনে পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর কোন শক্তিই প্রশংসা লাভের অধিকারী হতে পারে না এবং তাদের সে যোগ্যতাও নেই। আল্লাহ বলেন-

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ-وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا-

আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, উপরন্তু যাবতীয় প্রশংসার তিনিই একমাত্র যোগ্য অধিকারী। (সূরা আন নিসা-১৩১)

প্রশংসা যারই করা হোক না কেন, দুটো কারণ সামনে রেখে তা করা হয়। প্রথমতঃ যার প্রশংসা করা হবে, তার ভেতরে নিজস্ব অনুপম গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বিদ্যমান থাকতে হবে। তাকে স্বয়ং সৌন্দর্যের স্রষ্টা হতে হবে। তার অনুপম গুণাবলী ও সৌন্দর্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করবে এবং তা চূড়ান্তভাবে পরিবেশের ওপরে প্রতিফলিত হবে। দ্বিতীয় যে কারণে প্রশংসা করা হয় তাহলো, যার প্রশংসা করা হবে, তার অসীম অনুগ্রহ দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান থাকবে। যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হবে, সেদিকেই প্রশংসা লাভের অধিকারী যিনি-তার অপার অনুগ্রহ দেখা যাবে। এ দুটো গুণাবলীর অধিকারী যিনি, তিনিই সমস্ত প্রশংসা লাভের অধিকারী। এ দুটো গুণ কোন সৃষ্টির মধ্যে যে বিদ্যমান নেই, তা অনুধাবন করার জন্য গভীর তত্ত্ব জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। স্থুল দৃষ্টিতেই উপলব্ধি করা যায়, এ দুটো গুণের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সুতরাং, প্রশংসা লাভের একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ তা'য়ালা।

সূরা ফাতিহায় এ কথা বলা হয়নি যে, 'প্রশংসা আল্লাহর জন্য' বরং বলা হয়েছে, 'সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য'। তাওহীদের মূল ধ্বনিই সূরা ফাতিহার এই আয়াতে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হয়েছে। দাসত্ব করতে হবে একমাত্র আল্লাহর-এ কথারই স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে 'সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর' এ কথাটি বলে। কারণ তাওহীদের

ধারণার বিপরীত জ্ঞান মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব করায়। যিনি একটি শক্তি সৃষ্টি করলেন, সেই শক্তির প্রকাশ দেখেই কেউ যদি শক্তির স্রষ্টার প্রশংসা না করে তার সৃজিত শক্তির পূজা অর্চনা করতে থাকে, তাহলে তো মূল স্রষ্টার দাসত্ব করা হলো না। পৃথিবীতে যেখানে যে অবস্থায় যে বস্তু বিদ্যমান, এসব বস্তু কোন না কোন দিক দিয়ে অবশ্যই গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। চাঁদকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য দিয়ে। সূর্যকে সৃষ্টি করা হয়েছে চাঁদের বিপরীত ভিন্ন গুণ-বৈশিষ্ট্য দিয়ে। এভাবে বাতাসের মধ্যে নানা গুণ-বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, পানির ভেতরে অসংখ্য গুণাবলী দান করা হয়েছে। পাহাড়-পর্বত, উদ্ভিদরাজির ভেতরে অসংখ্য গুণাবলী বিদ্যমান। আগুনের মধ্যে গুণ-বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে। সমস্ত প্রাণী জগতের মধ্যে নানা ধরনের গুণাবলী দান করা হয়েছে।

কিন্তু মানুষকে এটা অনুভব করতে হবে যে, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য কে দান করেছেন ? বস্তুর ভেতরে একটি আশ্চর্য ধরনের গুণাবলী দেখে অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে তাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ভেবে তার সামনে দাসত্বের মস্তক অবনত করে দেয়া হয়, তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, তাহলে এর চেয়ে বড় ধরনের আহম্মকি আর কিছুই হতে পারে না। কারণ বিস্ময়কর গুণাবলীর দর্শককে তো সর্বপ্রথমে এটা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, এই গুণ-বৈশিষ্ট্য কে দান করলেন ? যিনি দান করলেন তাঁকে চিনতে হবে এবং তাঁর সামনেই তো দাসত্বের মাথানত করে দিতে হবে। সমস্ত প্রশংসা করতে হবে একমাত্র তাঁরই।

বিষয়টি অনুভব করার পরে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর প্রশংসা না করে কোন সৃষ্টির প্রশংসা করে, তাহলে তা হবে শির্ক। এই শির্ক থেকে মানুষকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং প্রশংসাও করতে হবে একমাত্র তাঁরই। কারণ সৃষ্টির সমস্ত কিছুই একমাত্র তাঁরই প্রশংসা করছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা শোনার মতো শ্রবণশক্তি অর্জন করতে পারে না। কেউ যদি তা পারে তাহলে শুনতে সক্ষম হবে কিভাবে পৃথিবীর প্রতিটি অনু-পরমাণু আল্লাহর মহিমা কীর্তন করছে। মহান আল্লাহ বলেন–

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ-وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ-

এমন কোন জিনিস নেই যা তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে না, কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা কীর্তন বুঝতে পারো না। (সূরা বনী ইসরাঈল-৪৪)

প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার অর্থ হচ্ছে, প্রতিটি জিনিস শুধুমাত্র নিজের রব্ব-এর দোষ-ক্রটি ও দুর্বলতা মুক্ত থাকার স্বীকৃতিই দিচ্ছে না, সেই সাথে তাঁর যাবতীয় গুণে গুণান্বিত ও যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী হবার কথাও বলিষ্ঠভাবে বর্ণনা করছে। প্রতিটি জিনিস তার পরিপূর্ণ অস্তিত্বের মাধ্যমে এ কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে যে, তার স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক

এমন এক সত্তা, যিনি সমস্ত মহৎ গুণাবলীর সর্বোচ্চ ও পূর্ণতম অবস্থার অধিকারী এবং প্রশংসা যদি কারো করতেই হয়, তাহলে যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী হলেন আল্লাহ তা'য়ালা। সূরা বনী ইসরাঈলের ১১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, একমাত্র তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো। কেন তাঁর প্রশংসা করতে হবে, এ প্রশ্নের উত্তরও মহান আল্লাহই দিয়েছেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا–

প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এর মধ্যে কোন বক্রতা রাখেননি। (সূরা আর কাহ্ফ-১)

মানুষ ছিল পথহারা, এ কিতাব অবতীর্ণ করে তিনি পথহারা মানুষকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। এমন কিতাব তিনি অবতীর্ণ করেছেন, যে কিতাবের মধ্যে কোন ধরনের অস্পষ্টতা নেই। এই নিয়ামত লাভের কারণে তাঁরই প্রশংসা করতে হবে। আল্লাহ অনুগ্রহ করে মানুষের মধ্যে থেকে নবী নির্বাচিত করে মানুষকে নির্ভুল নেতৃত্ব দান করেছেন। এ জন্যও প্রশংসা একমাত্র ঐ আল্লাহর-ই প্রাপ্য। আল্লাহ বলেন–

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى–

(হে রাসূল !) বলে দিন, প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সালাম তাঁর এমন বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি নির্বাচিত করেছেন। (সূরা আন নাম্‌ল-৫৯)

পৃথিবীর বস্তু নিচয় অবলোকন করে, তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যারা এই সৌন্দর্যের স্রষ্টা সেই নিপুণ শিল্পী আল্লাহর কথা ভুলে যায় এবং বস্তুর সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে থাকে। আল্লাহর সৃষ্টির গুণাবলী দেখে সৃষ্টির সামনে মাথানত করে দেয় এবং তার গুণ-কীর্তন করতে থাকে। তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে–

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا–وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ–

তাদেরকে বলো, প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, অত্যন্ত দ্রুত তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দেবেন এবং তোমরা তা চিনে নেবে। আর তোমরা যেসব কাজ করো সে সম্পর্কে তোমাদের রব্ব অমনোযোগী নন। (সূরা আন্ নাম্‌ল-৯৩)

পৃথিবীর কোন বৈজ্ঞানিকের কোন ক্ষমতা নেই তারা নিজের শক্তি প্রয়োগে আল্লাহ সৃষ্ট বস্তুর সহযোগিতা ব্যতীত ভিন্ন কিছু সৃষ্টি করে প্রশংসা লাভের অধিকারী হতে পারে। তারা যা কিছুই করতে অগ্রসর হবেন, প্রতি মুহূর্তে–প্রতি পদক্ষেপে তাকে মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী হতে হবেই। এ জন্য আল্লাহ ব্যতীত যেমন দাসত্ব লাভের অধিকারী আর কেউ নেই, তেমনি তাঁর প্রশংসা ব্যতীত আর কারো প্রশংসা করা যেতে পারে না। সূরা কাসাসে মহান আল্লাহ বলেন–

وَهُوَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ-لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ-وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

তিনিই এক আল্লাহ যিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের অধিকারী আর কেউ নন। তাঁরই জন্য প্রশংসা পৃথিবীতেও এবং আখিরাতেও। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।

একশ্রেণীর লোক রয়েছে যারা নিজেদেরকে প্রকৃতি প্রেমিক বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এরা বিশ্বপ্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যরাশি অবলোকন করে মুগ্ধ হয়ে তার গুণ বর্ণনা করে থাকে। রাতের নির্জনতায় কৌমুদী স্নাত পুষ্প উদ্যানে সুধাকরের স্নিগ্ধ সৌরভে মন-প্রাণ আমোদিত হয়ে ওঠে, সৌন্দর্য পিয়াসী মানুষ আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সৌন্দর্যের স্রষ্টা আল্লাহর প্রশংসার পরিবর্তে চাঁদকেই সমস্ত সৌন্দর্যের আধার মনে করে তার গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে থাকে। প্রখর সূর্য কিরণে পথ-প্রান্তর যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, উদ্ভিদরাজি শ্যামলিমা হারিয়ে হরিদ্রাভা ধারণ করে, নির্জীব ভূমি ফসল উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যায়, প্রচন্ড দাবদাহে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে, তখন হঠাৎ করেই আকাশ থেকে এক পশলা বৃষ্টি যদি নেমে আসে তখন অজ্ঞ মানুষ আল্লাহর প্রশংসা না করে বৃষ্টির প্রশংসা করতে থাকে। মায়াবী চাঁদের আলো নিয়ে প্রশংসামূলক অসংখ্য পংক্তি মালা রচনা করে। মেঘমালা আর প্রশান্তিদায়ক বৃষ্টির প্রশংসায় কবিতা রচনা করে থাকে। কিন্তু এদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, এই চাঁদের আলোর স্রষ্টা কে ? এই বৃষ্টি কে বর্ষালেন ? এরা তখন বলতে বাধ্য হয়, এসবের পেছনে একজন মহাশক্তিধর স্রষ্টা আছেন। এ সমস্ত তথাকথিত প্রকৃতি প্রেমিকদের লক্ষ্য করেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ-قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ-بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ-

আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত পতিত ভূমিকে সঞ্জীবিত করেছেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য কিন্তু অধিকাংশ লোক বোঝে না। (সূরা আল 'আনকাবুত–৬৩)

আল্লাহর সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য রাশি ও সৃষ্টির নিপুণতা দেখে, তাঁর অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করে শুধু মুখে মুখে আল্লাহর প্রশংসামূলক বাণী উচ্চারিত করলেই হবে না, তাঁর সামনে দাসত্বের মস্তক অবনত করতে হবে। আল্লাহর প্রশংসা করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামাজ আদায় করা। সূরা রূমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ-وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ-

সুতরাং, আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় এবং যখন তোমাদের প্রভাত হয়। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তাঁর জন্যই প্রশংসা এবং (তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো) তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমাদের কাছে এসে যায় যোহরের সময়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই বিশ্ব-জাহান ও এর সমস্ত জিনিসের মালিক, এ বিশ্ব প্রকৃতিতে সৌন্দর্য, পূর্ণতা, জ্ঞান, শক্তি, শিল্পকারিতা ও কারিগরির যে নিপুণতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এসবের জন্য একমাত্র মহান আল্লাহ-ই প্রশংসার অধিকারী। এ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীজগৎ যে কোন বস্তু থেকে উপকারিতা লাভ করছে, লাভবান হচ্ছে, আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করছে সে জন্য অন্যান্য প্রাণীসমূহ যেমন আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, মানুষকেও আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর দাসত্ব করতে হবে। যাবতীয় সৌন্দর্যের পেছনে এক আল্লাহ ব্যতীত যখন অন্য কারো কোন ভূমিকা নেই, তখন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ–

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসের মালিক এবং আখেরাতেও প্রশংসা তাঁরই জন্য। (সূরা সাবা-১)

মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে কারো কোন অংশ নেই, সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে এ কথাটিই অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সমস্ত কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে একক কৃতিত্ব একমাত্র তাঁর। তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। এ জন্য সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ–

প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। (সূরা ফাতির-১)

একশ্রেণীর মানুষ বোঝে না, না বুঝে আল্লাহর সৃষ্টি কাজে অন্যের অংশ আছে বলে বিশ্বাস করে। তারা ধারণা করে, সৃষ্টি কাজে আল্লাহকে সহযোগিতা করার জন্য স্বয়ং আল্লাহই অনেককে নিয়োগ করেছেন। তারাও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অসীম ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। এ জন্য তাদেরও পূজা-অর্চনা করতে হবে। এভাবে অজ্ঞ মূর্খ মানুষ কল্পিত শক্তির মূর্তি নির্মাণ করে তার সামনে মাথানত করে দেয়। মাটির নিষ্প্রাণ মূর্তির প্রশংসায় মুখরিত হয়ে ওঠে। এদেরকে ভ্রান্তিমুক্ত করার জন্য সূরা সাফ্ফাতের ১৮০-১৮২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ–وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ–وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ–

তারা যেসব কথা তৈরী করছে তা থেকে পাক-পবিত্র তোমার রব্ব, তিনি মর্যাদার অধিকারী। আর সালাম প্রেরিতদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের জন্য।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, তোমরা নিজের হাতে যেসব মূর্তি নির্মাণ করো, তাদের যে কোন ক্ষমতা নেই, তা তোমরা নিজেরাই অনুধাবন করতে পারো। তাদের দেহে মাছি বসলে তারা সে মাছিকেও তাড়াতে অক্ষম তা তোমরা দেখছো। তোমরা যেসব জিনিসকে শক্তির উৎস বলে তার পূজা-অর্চনা করছো, তা ধ্বংসশীল, তারা কিভাবে ধ্বংস হয় সে দৃশ্য তোমরা নিজেদের চোখে দেখে থাকো। এসব দেখেও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো না ? সুতরাং, দাসত্ব ও প্রশংসা করো ঐ আল্লাহর–যিনি অমর অক্ষয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

هُوَالْحَىُّ لَاۤاِلٰهَ اِلَّا هُوَفَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ-اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তোমাদের দ্বীন তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো। গোটা সৃষ্টি জগতের রব্ব আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। (মু'মিন–৬৫)

প্রশংসা করো একমাত্র আমার এবং দাসত্ব করো শুধু আমারই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিয়ম-পদ্ধতি আমার বিধানের অনুগত করে দাও। আমার একনিষ্ঠ গোলাম হয়ে যাও। আমার গোলামীর সাথে অন্য কারো গোলামীর মিশ্রণ ঘটিয়ো না। এ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছুই তোমরা দেখছো, এসবের মালিক আমি–আমিই এসবের রব্ব। যাবতীয় ব্যবস্থাপনা আমারই হাতে নিবদ্ধ। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে–

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি যমীন ও আসমানের মালিক এবং গোটা বিশ্বজাহানের সবার রব্ব। (সূরা আল জাসিয়া-৩৬)

এ পৃথিবীতে অসংখ্য বস্তু এমন রয়েছে, যাদেরকে জড়পদার্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এসব বস্তুর ভেতরে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। এসব প্রাণহীন বস্তুও মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। আকাশের মেঘমালাও আল্লাহর প্রশংসা করে। ঈশান কোণে কালবৈশাখীর নিকষকালো মেঘ রুদ্র ভয়াল রূপ ধারণ করে ক্রমশঃ গোটা আকাশ ছেয়ে ফেলে। ভয়ঙ্কর গর্জন করতে থাকে। আল্লাহ বলেন–

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ-

মেঘের গর্জন তাঁরই প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করে। (সূরা আর-রা'দ-১৩)

হাম্‌দ ও তাসবীহ্ শুধু আল্লাহর জন্য

সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে 'হাম্‌দ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় হাম্‌দ শব্দের অর্থ হলো, নির্মল নিষ্কলুষ প্রশংসা, যে প্রশংসা উচ্চারিত হয় সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে। এই হাম্‌দ শব্দটি সর্বোত্তম গুণ প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। মহান আল্লাহ এক অদ্বিতীয় ও তুলনাহীন। তাঁর

সৃষ্টির নিপুণতা ও সৌন্দর্যও অতুলনীয়। তাঁর শৈল্পিক গুণাবলী দর্শন করে মানুষের মন স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁরই প্রশংসা করে ওঠে। আরবী হাম্‌দ শব্দের পূর্বে আরবী বর্ণলিপির 'আলিফ' অক্ষর ও 'লাম' অক্ষর যুক্ত হয়ে তা উচ্চারিত হয়, 'আল হাম্‌দ'। এই আল শব্দ হাম্‌দ-শব্দের পূর্বে ব্যবহার করে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার সাথে উচ্চারণ করা হয়েছে, 'সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য'। এই হাম্‌দ শব্দের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁরই দাসত্ব করার ভাবধারা প্রকাশ পেয়েছে। মহান আল্লাহ্ চিরঞ্জীব এবং কখনো তাঁর ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটবে না। এ জন্য সেই সত্তারই প্রশংসা ও দাসত্ব করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لاَيَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ-

(হে রাসূল !) নির্ভর করো এমন আল্লাহর প্রতি যিনি জীবিত এবং কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো। (সূরা ফোরকান-৫৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কত যে সুন্দর, তা তাঁর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই অনুভব করা যায়। যাঁর সৃষ্টি এত সুন্দর, তিনি কত সুন্দর হতে পারেন তা কল্পনাও করা যায় না। মনের গহীনে কল্পনার কুঞ্জবনেও মানুষ আল্লাহর রুচি ও শৈল্পিক জ্ঞান সম্পর্কে ছায়াপাত ঘটাতে সক্ষম নয়। সমুদ্রের অতল তলদেশে অসংখ্য প্রাণী বাস করে। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ আকারের মাছের সমাহার রয়েছে সমুদ্রে। এসব মাছের দেহের সৌন্দর্য দেখলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়। আল্লাহভীরু লোকদের মুখ থেকে নিজের অজান্তেই উচ্চারিত হয় 'আল হাম্‌দুল্লিাহ'। সৌন্দর্যের পূজারীরা এসব মাছ ক্রয় করে এ্যাকুইরিয়ামে রেখে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। অপূর্ব সৌন্দর্যমন্ডিত এসব মাছ শুধুই তাকিয়ে দেখে এক শ্রেণীর লোক। তাদের মুখ থেকে আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারিত হয় না। কিন্তু সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে যে মাছগুলো মানুষের চোখের সামনে বিচিত্র ভঙ্গীতে পানির ভেতরে সাঁতার কেটে ফিরছে, তারা এক মুহূর্ত নীরব নেই। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তারা ঐ মহান আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করছে।

ঐ দূর নীলিমায় পাখিরা ডানা মেলে দিয়ে মনোমুগ্ধকর ভঙ্গীতে উড়ছে। মানুষ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে কিভাবে পাখিগুলো মহাশূন্যে উড়ছে। পাখিদের ওড়ার এই দৃশ্য দেখে অকৃতজ্ঞ মানুষ হতবাক হয়ে থাকলেও উড়ন্ত পাখিগুলো কিন্তু নীরব নেই। আল্লাহ্ বলেন-

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ-

তুমি কি দেখো না, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে যারা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তারা সবাই এবং যে পাখিরা ডানা বিস্তার করে আকাশে ওড়ে। (সূরা আন্ নূর-৪১)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাবিজ্ঞানী, তাঁর জ্ঞানের সাথে কোন কিছুর তুলনা হয় না। তিনি আপন কুদরতে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এসব সৃষ্টি তাঁরই প্রশংসায় নিয়োজিত রয়েছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে-

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ-وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

আল্লাহর তাস্‌বীহ্ করছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশমন্ডলে ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিরাজ করছে। তিনিই সর্বজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী। (সূরা আস-সফ্-১)

আকাশমন্ডলে মহাশূন্যে অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র, অগণিত তারকারাজি এবং গ্যালাক্সি (Galaxy) রয়েছে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এসবের রহস্য সন্ধানে ব্যপৃত রয়েছেন। তারা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের (Telescope) সাহায্যে তা অবলোকন করছেন। মহান আল্লাহ্ এসব সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর এসব সৃষ্টি তাঁরই প্রশংসা করছে। পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর এবং এসবের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সমস্ত কিছু তাদের নিজস্ব ভাষায় মহান আল্লাহর তাসবীহ্ করে যাচ্ছে। মানুষকেও তাঁরই প্রশংসা করার জন্য এসব বিষয় কোরআনে তুলে ধরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ-

আল্লাহর তাস্‌বীহ্ করছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশমন্ডলে রয়েছে এবং এমন প্রতিটি জিনিস যা পৃথিবীতে রয়েছে। তিনি রাজাধিরাজ; অতি পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী এবং সুবিজ্ঞানী। (সূরা জুম'আ-১)

তিনি নিরঙ্কুশ শক্তির অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। কোন শক্তি তাঁর এই সীমাহীন কুদরতকে সীমাবদ্ধ বা সংকুচিত করতে পারে না। এই সমগ্র বিশ্বলোক তাঁরই এক রাজত্ব ও সাম্রাজ্য। তিনি এ পৃথিবীকে একবারই পরিচালিত করে দিয়ে এর থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে যাননি। তিনিই এর ওপর নিরন্তর শাসনকার্য পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এই শাসন -প্রশাসন চালানোর ব্যাপারে অন্য কারো এক বিন্দু অংশীদারীত্ব নেই। অন্য কারো অস্থায়ীভাবেও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই বিশ্বলোকের কোন স্থানে সামান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা, মালিকানা ভোগ করা অথবা শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা যদিও কিছুটা থেকে থাকে, তা সে স্বয়ং অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, আল্লাহর পক্ষ থেকেই তা দান করা হয়েছে। আল্লাহ্ যতদিন ইচ্ছা করবেন, ততদিন এই ক্ষমতা দিয়ে রাখবেন। আর যখনই তিনি ইচ্ছা করবেন, তখনই ক্ষমতার মসনদ থেকে বিদায় করে দেবেন।

সুতরাং, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই এবং তিনিই তা লাভের যোগ্য। শুধু তিনিই প্রশংসা লাভের অধিকারী। অন্য কোন সত্তায় যদি প্রশংসার যোগ্য কোন গুণ বা সৌন্দর্য দেখা যায়, তাহলে তা তাঁরই অবদান। তিনি দান করেছেন বলেই তাতে সৌন্দর্য বিদ্যমান। অতএব কৃতজ্ঞতা লাভের প্রকৃত ও একমাত্র অধিকারী তিনিই। কারণ সর্বপ্রকার নিয়ামত তাঁরই সৃষ্ট, তাঁরই অবদান। সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রকৃত কল্যাণকারী তিনি ব্যতীত আর কেউ নয়। অন্য কারো কোন উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেও তা এই হিসাবে করা যেতে পারে যে,

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিয়ামত আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে তার মাধ্যমে। কেননা, সে নিয়ামতের প্রকৃত স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। তাঁর অনুমতি ব্যতীত এবং তিনি সুযোগ না দিলে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কোনক্রমেই উপকার করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং কোন মানুষের কাছ থেকে উপকৃত হলেও আল্লাহরই প্রশংসা করতে হবে। কেননা তিনিই সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক। আল্লাহ বলেন-

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ -لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ-وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

আল্লাহর তাসবীহ করছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশমন্ডলে রয়েছে এবং এমন প্রতিটি জিনিস যা পৃথিবীর বুকে রয়েছে। বাদশাহী তাঁরই এবং তারীফ-প্রশংসাও তাঁরই জন্য। আর তিনিই প্রতিটি জিনিসের ওপরে কর্তৃত্বের অধিকারী। (সূরা আত-তাগাবুন-১)

আল্লাহ্-আল ইলাহ্

মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক মানুষই আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। ফেরাউন, নমরুদ এবং এদের মতো আরো যারা ছিল, তারা কেউ আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিল না। তারা কখনো এ কথা বলেনি যে, 'এই গোটা বিশ্ব আমি সৃষ্টি করেছি'। বরং তারা বলেছে, আল্লাহর কোরআনের ভাষায়-

اَشَدُّ مِنَّ قُوَّةً ــــ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى-

আমার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ নেই। আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব্ব।

অর্থাৎ তারা দাবী করেছে, 'এই বিশাল ভূখন্ডের শাসক হিসাবে দেশের জনগণের ওপরে আইন ও বিধান চলবে আমার। এখানে অন্য কারো আইন-কানুন চলবে না। জনগণ অন্য কারো আইন অনুসরণ করতে পারে না। আইন চলবে একমাত্র আমার এবং আমাকেই ইলাহ হিসাবে পূর্জা-অর্চনা করতে হবে। মাথানত করতে হবে একমাত্র আমার কাছে।' এভাবে দেশের জনগোষ্ঠী আল্লাহকেও বিশ্বাস করেছে, সেই সাথে তারা আল্লাহর অংশীদার বানিয়েছে। পবিত্র কোরআনে দেখা যায় আরবের যারা মূর্তিপূজক ছিল তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। মুখে তারা আল্লাহর নাম বেশ শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করতো। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম হলো এসব মূর্তি।

পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষকে শিখালো, আল্লাহ এমন এক অদ্বিতীয় সত্তার নাম, যিনি গোটা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুই তাঁরই সৃষ্টি। সমস্ত সৃষ্টির সব ধরনের প্রয়োজন যিনি পূরণ করেন তিনিই হলেন মহান আল্লাহ। আল্লাহ শব্দের বিকল্প কোন শব্দ নেই। তিনিই মানব জাতির সব ধরনের বিধান দাতা। প্রাচীন সিমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি শাখাতেই সামান্য রূপান্তর ভেদে 'আল্লাহ' কথাটি এক, অদ্বিতীয়, অনাদী, অনন্ত উপাস্য সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভাষাবিদগণ অনুমান

করেন যে, মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই তওহীদবাদী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্ব প্রতিপালকের একক সত্তা বোঝানোর জন্য 'আল্লাহ' শব্দটির প্রচলন রয়েছে। যেমন প্রাচীন কালদানীয় ও সুরইয়ানী ভাষায় আল্লাহ শব্দটি 'আলাহিয়া,' প্রাচীন হিব্রুভাষায় 'উলুহ' এবং আরবী ভাষায় 'ইলাহ' রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিবর্তিত আরবী ভাষায় 'ইলাহ' শব্দের সাথে আরবী আল অব্যয় যুক্ত হয়ে 'আল-ইলাহ' বা আল্লাহ শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।.

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বেও আরবদের মধ্যে 'আল্লাহ' শব্দটিই মহান পরওয়ারদেগারের একক শব্দরূপে ব্যবহৃত হতো। আল্লাহ শব্দটির কোন লিঙ্গান্তর হয় না। এর কোন দ্বিবচন বা বহুবচনও হয় না। এ প্রাচীন শব্দটিই পরম উপাস্যের সত্তা বোঝানোর জন্য পবিত্র কোরআনে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী শরীআতে আল্লাহ নামের কোন বিকল্প নেই। মহান আল্লাহকে তাঁর যে কোন গুণবাচক নামেও ডাকা যায়। তবে আল্লাহ ও আল্লাহর গুণবাচক নামের বিকল্প যেমন গড, ঈশ্বর, পরমেশ্বর, ভগবান ইত্যাদি কোন নামে ডাকা স্পষ্ট হারাম। কারণ এসব শব্দের মধ্য দিয়ে তওহীদ বিশ্বাসের অনুরূপভাব প্রকাশ পায় না। কারণ ঐ সমস্ত শব্দের লিঙ্গান্তর করা যায় এবং স্ব স্ব ভাষার ব্যকরণ শুদ্ধভাবে করা যায়। ইংরেজী গড শব্দের ইংরেজী বানান God. এখানে ইংরেজী বর্ণমালার তিনটি অক্ষর রয়েছে। এই শব্দটি যদি উল্টিয়ে উচ্চারণ করা হয় তাহলে তা একটি চতুষ্পদ জন্তুর নাম প্রকাশ করবে। আল্লাহ কে এবং তাঁর পরিচয় স্বয়ং তিনিই এভাবে দিয়েছেন–

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ-اَللّٰهُ الصَّمَدُ-لَمْ يَلِدْ-وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

হে নবী ! আপনি বলে দিন, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি অভাব শুন্য। তাকে কেউ জন্ম দেয়নি তিনিও কাউকে জন্ম দেননি। (সূরায়ে ইখলাস)

আর ভগবানের সংজ্ঞা শ্রী মদ্ভাগবদ গীতা দিয়েছে এভাবে, অর্জুনের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন–

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভুত্থনমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥
(গীতা, চতুর্থোহধ্যায় ঃ জ্ঞানযোগ–৭–৮)

অনুবাদ ঃ হে অর্জ্জুন! যে যে সময়ে ধর্ম্মের পতন আর পাপের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি জন্ম লইয়া থাকি। এইভাবে পাপীদের বিনাশ করিতে (শাস্তি দিতে) আর সৎ লোকদের বাঁচাইতে, এবং ধর্ম্মকে আবার প্রতিষ্ঠিত করিতে যুগে যুগে আমি জন্মগ্রহণ করি।

হিন্দুগণ শ্রী কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান নামে অভিহিত করেন। সুতরাং ভগবান প্রয়োজনে বা বাধ্য হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই ভগবান পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভগবান একবার চার অংশে রাজা দসরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন-এই চার নাম ধারণ করেছিল। ভগবান তার ভক্ত প্রহল্লাদের সামনে পশুরাজ সিংহের আকৃতি ধারণ করে নিজেকে প্রকাশ করেছিল। তাহলে দেখা গেল ভগবান এই পৃথিবীতে মাতৃগর্ভে পিতার ঔরসে প্রয়োজনে জন্মগ্রহণ করে। যে কোন পশুর রূপও ধারণ করতে পারে। সুতরাং, স্রষ্টাকে নামের পরিচয়ে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মানুষ এমন সব শব্দ আবিষ্কার করেছে যে, এসব শব্দের যে কি অর্থ এবং শব্দকে খন্ডিত করলে যে কি অর্থ প্রকাশ করে, সেদিকে লক্ষ্য না রেখেই মানুষ তার সীমিত জ্ঞান প্রয়োগ করে কল্পিত স্রষ্টার একটি নাম রেখেছে। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম হলো ইসলাম। ইসলাম আল্লাহ্ নামের যে পরিচয় দিয়েছে, তার কোন বিকল্প নেই।

আরবের ছাফা পর্বতের অনেক শিলালিপিতে আরবী আল্লাহ্ শব্দটি সেই যুগ থেকেই লিখা ছিল এবং এখনো আছে। উত্তর আরবের জনগোষ্ঠী এবং নাবাতী জনগোষ্ঠী নামের একটি অংশ আল্লাহ নাম ব্যবহার করতো। নাবাতীদের কাছে আল্লাহ নামটা পৃথক কোন উপাস্য হিসাবে বিবেচিত না হলেও তাদের শিলালিপিতে দেবতাদের নামের সাথে আল্লাহ নাম সংযুক্ত দেখা যায়। পক্ষান্তরে সেল, মাবগলিউথসহ অনেক ইসলামবৈরী পাশ্চাত্য গবেষক 'আল্লাহ' শব্দটি জাহিলিয়াত যুগের 'আল লাত' নামক দেবমূর্তির নামের রূপান্তর বলে যে কষ্ট কল্পনা করেছে, আরবী শব্দ গঠন পদ্ধতির বিচারে এটা নিতান্তই হাস্যস্পদ অপচেষ্টা মাত্র। 'আল্লাহ' শব্দটি এমনই এক শব্দ যে, এই শব্দের কোন অনুবাদ হয় না। 'আল্লাহ' শব্দের অনুবাদ কেউ যদি 'স্রষ্টা' লেখে তাহলে তা হবে এক মারাত্মক ভুল। কারণ, স্রষ্টা হিসাবে তো মহান আল্লাহর 'খালিক' নামক একটি গুণবাচক নাম রয়েছে। শুধু একটি নয়, আল্লাহর অনেকগুলো সর্বোত্তম গুণবাচক নাম রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন-

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا-وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ-سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ-

আল্লাহ্ সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী, তাঁকে সুন্দর সুন্দর নামেই ডাকো। সেই লোকদের কথার কোন মূল্য দিও না, যারা তাঁর নামকরণে বিপথগামী হয়। তারা যা কিছুই করতে থাকে; তার বিনিময় তারা অবশ্যই লাভ করবে। (সূরা আল-আ'রাফ-১৮০)

আল্লাহর গুণবাচক নাম রহমান, এ নামেও তাঁকে ডাকে যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন-

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِادْعُوا الرَّحْمَنَ-أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى-

হে নবী ! এদেরকে বলে দাও, আল্লাহ্ অথবা রহমান যে নামেই ডাকো না কেন তাঁর জন্য সব ভালো নামই নির্দিষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল-১১০)

মহান আল্লাহ অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী এবং গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর গুণবাচক নাম প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গুণবাচক নাম সম্পর্কে স্বয়ং তিনিই সূরা ত্বা-হায় বলেছেন–

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ-لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى-

তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ।

আল্লাহর এসব গুণবাচক নামও অতীব সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এসব নামেরও তসবীহ করতে হবে। আল্লাহ বলেন–

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى-

(হে নবী !) তোমার মহান শ্রেষ্ঠ রব্ব-এর নামের তাসবীহ্ করো। (সূরা আ'লা–১)

আল্লাহ্ শব্দের অর্থ কোনক্রমেই 'স্রষ্টা' হিসাবে অনুবাদ করা যেতে পারে না এবং এ নামের কোন অনুবাদও হতে পারে না। আল্লাহ্ নামের কোন বিকল্প হতে নেই। স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহ তা'য়ালার একটি নাম রয়েছে। কোরআন বলছে–

هُوَ اللّٰهُ الْخٰلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى-

তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি-পরিকল্পনা রচনাকারী ও তার বাস্তবায়নকারী এবং তা অনুসারে আকার-আকৃতি প্রদানকারী, তাঁরই জন্য অতীব উত্তম নামসমূহ। (সূরা হাশর–২৪)

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল্লাহ নাম দিয়েই তিনি তাঁর পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন–

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ-لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ-

আল্লাহ্ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমগ্র বিশ্বচরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি সদাজাগ্রত এবং তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করতে সক্ষম নয়। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুর সার্বভৌমত্ব তাঁর। (সূরা বাকারা-২৫৫)

আল্লাহ হলেন তিনি, যিনি একমাত্র দাসত্ব লাভের অধিকারী এবং অসীম দয়ালু; তাঁর কাছে গোপন ও প্রকাশ্য বলে কোন কিছু নেই। কোরআন ঘোষণা করছে–

هُوَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -

তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুরই জ্ঞাতা, তিনিই রহমান ও রাহীম। (সূরা হাশর–২২)

আল্লাহ্ মহাপবিত্র এবং তিনি সমস্ত কিছুর মালিক–সমস্ত কিছুরই বাদশাহ–রাজাধিরাজ। কোরআন তাঁর পরিচয় এভাবে পেশ করছে–

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ-

তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি মালিক-বাদশাহ। অতীব মহান ও পবিত্র। সর্ম্পূণ শান্তি, নিরাপত্তা দানকারী, সংরক্ষণকারী, সর্বজয়ী নিজের নির্দেশাবলী শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। (সূরা হাশর-২৩)

সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র অধিপতি হলেন আল্লাহ। তাঁর নাম বিকৃত করার সামান্যতম অবকাশ নেই। আল্লাহ নামের প্রতিটি অক্ষর দিয়েই তাঁর পরিচয় কোরআন উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ নাম লিখতে প্রথমে আরবি অক্ষর আলিফ-এর প্রয়োজন হয়। এই আলিফ অক্ষর বাদ দিলেও আল্লাহর নাম বিকৃত করা যাবে না। কোরআন বলছে-

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ-وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ-

আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছুই রয়েছে, তা সবই আল্লাহর। তোমাদের মনের কথা প্রকাশ করো অথবা না-ই করো আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে সে সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করবেন। (সূরা বাকারা-২৮৪)

পবিত্র কোরআন আল্লাহ শব্দের 'আলিফ' ব্যতিতই এ ধরনের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় প্রকাশ করেছে, তাঁর অসীম ক্ষমতার কথা তুলে ধরেছে। উল্লেখিত আয়াতের আল্লাহ শব্দ থেকে আলিফ উহ্য রাখার কারণে আল্লাহ শব্দের সামান্যতম বিকৃতি ঘটেনি। আল্লাহ শব্দ থেকে আলিফ উহ্য রাখলে শব্দ হলো 'লিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর জন্য বা আল্লাহর। এই লিল্লাহ শব্দ থেকেও যদি একটি 'লাম' অক্ষর বাদ দেয়া হয় তাহলে অবশিষ্ট থাকে 'লাহু'। এই লাহু শব্দ দিয়েও পবিত্র কোরআন মহান আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছে এভাবে-

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ-اِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ-

আকাশ ও যমীনের ভান্ডারসমূহের চাবি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ, যাকে ইচ্ছা অঢেল রিযিক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা মেপে দেন। তিনি সব কিছু জানেন। (সূরা আশ শূরা-১২)

এভাবে আল্লাহ শব্দ থেকে আলিফ অক্ষরটি বাদ দেয়া হলো, তারপর দুটো লাম অক্ষরের প্রথমটি বাদ দেয়া হলো। এবারে দ্বিতীয় লাম অক্ষরটি বাদ দেয়ার পরে থাকে শুধুমাত্র 'হা' অক্ষরটি। এই 'হা' অক্ষরের সাথে পেশ যুক্ত করে 'হু' আকারে উচ্চারিত হয়ে মহান আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছে। পবিত্র কোরআন এই 'হু' শব্দ দিয়ে আল্লাহর পরিচয় পেশ করছে-

اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ-وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ-ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيدُ-

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশ-অধিপতি, মহান শ্রেষ্ঠতর। নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সব কাজ সম্পন্নকারী। (সূরা বুরুজ)

সুতরাং, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের 'আল্লাহ' নামের কোনভাবেই বিকৃতি ঘটানো সম্ভব নয়। এর যে কোন অক্ষর ছেড়ে দিলেও তা অবিকৃত থাকে এবং সঠিক অর্থ প্রকাশ করে। এ নামের সাথে কোন কিছুর তুলনা করা যায় না এবং এ নামের কোন ভাষান্তর করাও যায় না।

আল্লাহর প্রশংসা করা-উন্নত রুচির প্রকাশ

আল্লাহ ব্যতীত কোন মানুষ বা বস্তুর প্রশংসা করা উচিত নয়। যদি করতেই হয়, তাহলে ঐ আল্লাহরই করা উচিত, যিনি ঐ মানুষ বা বস্তুর ভেতরে প্রশংসা করার মতো গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। সাধারণতঃ কোন মানুষের প্রশংসা তার সামনে করা কোনক্রমেই উচিত নয়। কোন মানুষের উদারতায়; বদান্যতায় ও দানশীলতায় মুগ্ধ হয়ে তার সামনে যদি প্রশংসা করা হয়, তাহলে তার ভেতরে আত্মাহংকার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া আল্লাহ বিরোধী কোন মানুষের অথবা কোন ফাসিক ব্যক্তির প্রশংসা করা যাবে না। কোন ফাসিক ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে আল্লাহর আরশে আযীম প্রচন্ড ক্রোধে কাঁপতে থাকে। সুতরাং, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো প্রশংসা করার ভেতরে শির্কমূলক ভাবধারা বিদ্যমান। শির্কের আবর্জনায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের শিখিয়েছেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই-যিনি গোটা জাহানের রব্ব। তাঁর শৈল্পিক জ্ঞান, তাঁর দৃষ্টি-নন্দন সৃষ্টি তাঁরই অনুগত চিন্তাশীল বান্দাদেরকে সেজ্দায় অবনত হতে বাধ্য করে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে অসুন্দর দেখতে চান না। তিনি যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুর ভেতরেই সৌন্দর্য বিদ্যমান। আল্লাহর সৃষ্টি এই বিশ্বলোকে কোথাও একঘেয়েমি ও বৈচিত্রহীনতা নেই। সর্বত্রই বৈচিত্র দেখা যায়। একই মাটি ও একই পানি থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছের দুটো ফলের বর্ণ, বাহ্যিক কাঠামো ও স্বাদ এক নয়। পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে তার ভেতরে নানা রংয়ের সমাহার। পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বস্তুগত গঠনপ্রণালীতে অদ্ভূত ধরনের পার্থক্য বিরাজমান। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে একই জনক-জননীর দুটো সন্তানও একই ধরনের হয় না। পৃথিবীতে শতকোটি মানুষ, একজনের সাথে আরেকজনের চেহারার কোন মিল নেই। স্বভাবগত ও গুণগত বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। সৃষ্টির এই বৈচিত্র ও বিরোধই স্পষ্ট করে আঙ্গুলি সংকেত করছে, এ সৃষ্টিজগতকে কোন মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানী বহুবিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং এর নির্মাতা একজন দৃষ্টান্তহীন স্রষ্টা ও তুলনাবিহীন নির্মাণ কৌশলী।

সে অতুলনীয় নির্মাণ কৌশলী একই জিনিসের শুধুমাত্র একটি নমুনা জ্ঞানের জগতে ধারণ করে সৃষ্টি কাজ সম্পাদনে আদেশ দেননি। বরং তাঁর জ্ঞানের দর্পণে প্রতিটি জিনিসের জন্য একের পর এক এবং অসংখ্য ও সীমাহীন নমুনা, প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত রয়েছে। বিশেষ করে মানবিক

স্বভাব, প্রকৃতি ও বুদ্ধি-বৈচিত্র সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে যে কোন ব্যক্তি এ কথা অনুভব করতে সক্ষম যে, সৃষ্টির এই নিপুণতা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং প্রকৃতপক্ষে অতুলনীয় সৃষ্টি জ্ঞান-কুশলতার প্রকাশ্য নিদর্শন। যদি জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষকে তাদের নিজেদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক প্রবৃত্তি ও কামনা, আবেগ-অনুভূতি, ঝোঁক-প্রবণতা এবং চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে এক করে দেয়া হতো, কোন প্রকার বৈষম্য-বিভিন্নতার কোন পার্থক্য রাখা না হতো, তাহলে পৃথিবীতে মানুষের মতো একটি নতুন ধরনের সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত করা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন এ পৃথিবীতে একটি কর্তব্য পরায়ণ-দায়িত্বশীল ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করার সিদ্ধান্ত করেছেন, তখন মানুষের সৃষ্টিগত কাঠামোর ভেতরে সব ধরনের বিচিত্রতা ও বিভিন্নতার অবকাশ রাখা ছিল সে সিদ্ধান্তের অনিবার্য দাবী। মানুষ যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ও পরিকল্পনাহীনতার ফসল নয় বরং একটা মহান বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ফলশ্রুতি, তা মানুষের স্বভাবগত বিচিত্রতা ও বিভিন্নতাই প্রমাণ বহন করে। এখানে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যেখানেই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা দৃষ্টিগোচর হবে, সেখানেই অনিবার্যভাবে সে পরিকল্পনার পশ্চাতে এক বিজ্ঞানময় প্রতিষ্ঠিত সত্তার সক্রিয় সংযোগ লক্ষ্য করা যাবে। বিজ্ঞানী ব্যতীত যেমন বিজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি পরিকল্পনা ভিত্তিক সৃষ্টির পেছনে পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্বও অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্র ও নিপুণতার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন–

اَلَمْ تَرَاَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً-فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًااَلْوَانُهَا-وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ-وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذَالِكَ-

তুমি কি দেখো না আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তারপর তার মাধ্যমে আমি নানা ধরনের বিচিত্র বর্ণের ফল বের করে আনি ? পাহাড়ের মধ্যেও রয়েছে বিচিত্র বর্ণের–সাদা, লাল ও নিকষকালো রেখা। আর এভাবে মানুষ, জীব–জানোয়ার ও গৃহপালিত জন্তুও বিভিন্ন বর্ণের রয়েছে। (সূরা ফাতির–২৭-২৮)

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বে মানুষকে যেখানে প্রেরণ করবেন, সে পৃথিবীকে নানাভাবে সজ্জিত করেছেন। পৃথিবীর ছাদ হিসাবে আকাশ সৃষ্টি করেছেন। যমীনকে গালিচার মতো বিছিয়ে দিয়েছেন। তারপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ বলেন-

اَلَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًاوَّ لسَّمَاءَ بِنَاءً-وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًالَّكُمْ-

সেই আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে গালিচা হিসাবে বিছিয়ে দিয়েছেন, আকাশকে ছাদ হিসাবে নির্মাণ করেছেন, তারপর সে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তার সাহায্যে নানা ধরনের ফল উৎপন্ন করে তোমাদের জন্য রিয্কের ব্যবস্থা করেছেন। (সূরা বাকারা-২২)

পৃথিবীর স্থলভাগকে শুধু শুষ্ক মাটি আর বালির মরুভূমি বানিয়ে তিনি শ্রীহীন করেননি। সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলাভূমিতে পরিণত করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً-فَاَخْرَجْنَابِهٖ نَبَتَا كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَكِبًا-وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ-اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ-

তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তার সাহায্যে সব ধরনের উদ্ভিত উৎপাদন করেছেন এবং তার দ্বারা শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার ও বৃক্ষ-তরু-লতার সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে বিভিন্ন কোষসম্পন্ন দানা বের করেছেন, খেজুরের মোচা থেকে ফলের থোকা বানিয়েছেন, যা বোঝার ভারে নূয়ে পড়ে। আর সজ্জিত করেছেন আঙ্গুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান সাজিয়ে দিয়েছেন, সেখানে ফলসমূহ পরস্পর স্বদৃশ, অথচ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন। এই গাছগুলো যখন ফল ধারণ করে, তখন এদের ফল বের হওয়া ও তা পেকে যাওয়ার অবস্থাটা একটু সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখো। (সূরা আল আন'আম-৯৯)

কোনটি আল্লাহ অপূর্ণ রাখেননি। গোটা পৃথিবীকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছেন। সমুদ্র সৃষ্টি করে তার ভেতরে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করেছেন। সমুদ্র নিশ্চল থাকলে তা দেখতে অসুন্দর মনে হতো। এ জন্য আল্লাহ সমুদ্রের বুকে ঢেউ সৃষ্টি করে পানিতে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তা দৃষ্টি-নন্দন করেছেন। পানির ভেতরে মাছ সৃষ্টি করেছেন। আকাশে কোন আলোর ব্যবস্থা না থাকলে তা দেখতে কুৎসিত দেখাতো। আল্লাহ তা'য়ালা সে আকাশ সুন্দর করে সাজিয়েছেন। পবিত্র কোরআন বলছে–

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ-

তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে বিরাটায়তন প্রদীপরাশি দ্বারা সুসজ্জিত ও সমুদ্ভাসিত করে দিয়েছি। (সূরা মুল্‌ক-৫)

আল্লাহ বলেন, এই বিশ্বলোককে আমি অন্ধকারময় ও নিঃশব্দ নিষ্প্রভ করে সৃষ্টি করিনি। আকাশে তারকামালা ও নক্ষত্রপুঞ্জ দিয়ে অত্যন্ত মনোহর; উজ্জ্বল উদ্ভাসিত ও সুসজ্জিত করে দিয়েছি। তোমরা রাতের অন্ধকারে তার উজ্জ্বল আলো ঝকমকে রূপ দেখে গভীরভাবে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে পড়ো। শুধু তাই নয়, আমি চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছি। তোমরা লক্ষ্য করে দেখো–

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا-وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا-

তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ কিভাবে সাত আকাশ স্তরে স্তরে নির্মাণ করেছেন ? আর সে আকাশে চন্দ্রকে আলো ও সূর্যকে প্রদীপ বানিয়ে দিয়েছি। (সূরা নূহ-১৫-১৬)

মহান আল্লাহর রুচিবোধ, তাঁর সৌন্দর্যবোধ; সৃষ্টির ভেতরে তাঁর শৈল্পিক জ্ঞানের প্রকাশ দেখলেই অনুমান করা যায় তিনি কত সুন্দর। প্রতিটি সৃষ্টির ভেতরেই তাঁর অকল্পনীয় উন্নত রুচির প্রকাশ ঘটেছে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে তিনি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআনে সূরা ইয়াছিনে বলা হয়েছে-

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ-

মহান পবিত্র সেই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিলোকের যাবতীয় জোড়া সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভিদ ও মানবজাতির মধ্য থেকে এবং এমন সব সৃষ্টি থেকে, যার সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না।

পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও মিলন বিশ্বপ্রকৃতির এক স্বভাবসম্মত বিধান এবং তা এক চিরন্তন-শ্বাশত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা কার্যকর হয়ে রয়েছে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি পরতে পরতে। প্রতিটি প্রাণী, উদ্ভিদ ও বস্তুর মধ্যে। সৃষ্ট জীব, জন্তু ও বস্তুনিচয় জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার তাৎপর্য হলো, সৃষ্টির মূল রহস্য দুটো জিনিসের পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে মিলে মিশে একই মোহনায় অবস্থান করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যখনই এভাবে দুটো জিনিসের মিলন সংঘটিত হবে, তখনই সে মিলনের মধ্য থেকে তৃতীয় আরেকটি জিনিসের উদ্ভব হতে পারে। সৃষ্টিজগতের কোন একটি জিনিসও চিরন্তন এই নিয়ম ও পদ্ধতির বাইরে নয়। এর ব্যতিক্রম কোথাও দৃষ্টি গোচর হতে পারে না।

এই যে একই মোহনায় মিলন অবস্থান এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে তৃতীয় ফসল উৎপাদন করার ব্যবস্থা শুধুমাত্র মানবজাতি, প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদরাজির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটা হচ্ছে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত এক সুক্ষ্ম ও ব্যাপক ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক জগতের কোন একটি জিনিসও এ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত নয়। গোটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই এমন কৌশলে রচিত ও সজ্জিত যে, এখানে সর্বত্রই পুরুষ জাতি এবং স্ত্রী জাতি। এ দুটো প্রজাতি সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে বিদ্যমান। এ দুটো প্রজাতির ভেতরে রয়েছে এক দুর্লংঘ্য ও অনমনীয় আকর্ষণ, যা পরস্পরকে নিজের দিকে প্রতিনিয়ত তীব্রভাবে আকর্ষিত করছে। এ আকর্ষণের কারণেই মানুষের ভেতরে নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং বিয়ের মাধ্যমে মিলিত জীবন-যাপন করে। সমস্ত প্রাণীজগতেও এ আকর্ষণ কার্যকর রয়েছে।

মানুষ এবং প্রাণীসমূহ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের কারণে একের কাছে আরেকজন যেতে পারে এবং মিলিত হতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদজগৎ তথা জড়জগতের অবস্থা ভিন্নরূপ। এসব সৃষ্টির

সূচনাতে যে স্থানে অবস্থান করে, পরিসমাপ্তিতেও সেই একই স্থানে অবস্থান করে। এরা অবস্থানচ্যুত হতে পারে না। উদ্ভিদ জগতে ফুলের থেকে ফল সৃষ্টি হয়। আর এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা পরাগায়নের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি ফুলের প্রতিটি উর্বর পুংকেশরের মাথায় একটি করে পরাগধানী সৃষ্টি করেছেন। এই পরাগধানীর ভেতরেই পরাগরেণু উৎপাদিত করেন। নির্দিষ্ট একটি সময়ে পরাগধানী যেন ফেটে যায় এবং পরাগরেণু কীট-পতঙ্গ ও বাতাসের মাধ্যমে একই গাছের অন্য একটি ফুলের অথবা একই প্রজাতির অন্য একটি গাছের কোন একটি ফুলের গর্ভমুন্ডের সাথে যেন লেগে যায়, এ ব্যবস্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করেছেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকেই বলা হয়েছে পরাগায়ন (Pollination)।

এ বিষয়টি কিভাবে সংঘটিত হয়, তা অবলোকন করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়। অন্যান্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না দিয়েও এই একটি মাত্র বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলেই আল্লাহর রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, শৈল্পিক নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ কত যে বিস্ময়কর; কত যে প্রশংসামূলক, তা দেখে যেমন হতবাক হতে হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা করেও শেষ করা যাবে না। ফুলসমূহের চলৎশক্তি নেই; তারা চলাফেরার মাধ্যমে একটি আরেকটির সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারে না। এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাতাসের মাধ্যমে, পানির মাধ্যমে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রমর, মৌমাছি ও সুদর্শন দৃষ্টি-নন্দন প্রজাপতির মাধ্যমে ফুলের পুরুষ কেশরকে স্ত্রী কেশরের সাথে মিলিত হবার ব্যবস্থা করেছেন। এই কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব মহান আল্লাহ সর্বভূক প্রাণী আরশোলা-তেলাপোকাকে দেননি। কারণ তাঁর বান্দারা এই ফুলের সৌরভ গ্রহণ করে, ফুল দেখতে সুন্দর আর এ জন্য ফুলের ওপর বিচরণ করে সে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন দৃষ্টি নান্দনিক প্রজাপতির ওপরে এবং মৌমাছি আর ভ্রমরের ওপরে।

কি অপূর্বদর্শন এই ভ্রমর আর প্রজাপতি। এদেরকে দেখলে মনে হয় যেন কোন এক নিপুণ শিল্পী দীর্ঘদিন সাধনা করে তার দেহে অপূর্ব সৌন্দর্যের পশরা অঙ্কন করেছে। শত সহস্র প্রজাপতি; একটি প্রজাতির সাথে আরেকটি প্রজাতির রংয়ের কোন মিল নেই। আল্লাহ সুন্দর এবং ফুলও সুন্দর, এই সুন্দর ফুলগুলোর ওপরে কুৎসিত দর্শন এবং নোংরা কোন প্রাণী বিচরণ করে পরাগায়ন ঘটালে সৌন্দর্য ও রুচিবোধ ক্ষুন্ন হতো। ফুলের সৌন্দর্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মহান আল্লাহ অপূর্ব সুন্দর প্রজাপতিকেই নির্বাচিত করেছেন, তারা গোটা বিশ্বব্যাপী পরাগায়ন ঘটাবে। মহান আল্লাহর রুচিবোধ যে কত সুন্দর, কত মার্জিত ও উন্নত রুচি, তা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই প্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহকে কেউ যদি চিনতে চায়, কেউ যদি তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হতে চায়, তাহলে তাকে আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। তাঁর সৃষ্টির অপূর্ব সৌন্দর্য আর সামঞ্জস্যতা দেখে মুখ থেকে নিজের অজান্তেই উচ্চারিত হতে থাকবে-আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন-সমস্ত প্রশংশা একমাত্র আল্লাহর জন্য-যিনি গোটা জাহানের রব্ব।

পৃথিবীর সমস্ত ফলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, এমন কোন একটি ফলও পাওয়া যাবে না, যে ফলের ওপরে আবরণ নেই। সমস্ত ফলের ওপরে আবরণ রয়েছে। মনে হয় যেন মানুষ আল্লাহর সম্মানিত মেহমান, আর মেহমানের সামনে তিনি খাদ্যগুলো পরিবেশন করছেন

অত্যন্ত যত্নের সাথে। আবরণহীন ফলের ওপরে নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ বসবে; তারা মলমূত্র ত্যাগ করবে, ফলগুলো রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবে এবং তা খেতে রুচি হবে না। এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি ফলের ওপরেই আবরণ সৃষ্টি করেছেন। যেন ফলের গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে এবং খেতেও রুচিতে না বাধে। একটি বেদানার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, বেদানার দানাগুলোর ওপরে বেশ কয়েকটি আবরণ রয়েছে। ওপরের আবরণটি সবচেয়ে ঘন আর মোটা। তারপরের আবরণগুলো পাতলা। এগুলো ছিন্ন করার পরেই রসে ভরা দানাগুলো বের হবে। নারিকেলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, তার প্রথম আবরণটি খোসার আকারে বিদ্যমান এবং সেটা খুবই মোটা। এরপর রয়েছে একটি খোলা জাতিয় শক্ত আবরণ। এসব ছিন্ন করার পরই পাওয়া যাবে সুস্বাদু নারিকেল আর শরবত। ছোট্ট একটি ফল আঙ্গুর, তার ওপরেও আবরণ রয়েছে। চালের ওপরেও রয়েছে অনেকগুলো আবরণ। এসব সৃষ্টির সাথে কতটা উন্নত রুচি জড়িত, তা সৃষ্টির ধরণ দেখলেই অনুমান করা যেতে পারে।

সত্যের অনুসারী সত্যানুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সম্পন্ন একজন মানুষ নিখিল বিশ্বের অনু-পরমাণু থেকে শুরু করে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে ঐ বিশাল আকাশ পর্যন্ত এবং বৃক্ষ-তরু-লতা, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ও বৈচিত্রপূর্ণ প্রাণীজগতের অপূর্ব গঠন প্রণালী তার দৃষ্টির সামনে দেখতে পায়, তখন তার মুখ থেকে নিজের অগোচরেই বেরিয়ে আসে–আল হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন–সমস্ত প্রশংসা একমাত্র ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি নিখিল জাহানের রব্ব। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কেই সূরা আল ইমরাণের ১৯০-১৯১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِاُولِى الْاَلْبَابِ-الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا-سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে সেসব বিচক্ষণ-জ্ঞানী লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যারা উঠতে, বসতে ও শুতে–যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সংগঠন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে–আমাদের রব্ব ! এসব কিছু তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। তুমি উদ্দেশ্যহীন কাজের বাতুলতা থেকে পবিত্র।

মানুষ নিজেকেও সুন্দর করে সাজাতে জানতো না। কোরআন শরীফ বলছে, মহান আল্লাহ এই মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য পোষাক অবতীর্ণ করেছেন, পাখির দেহে একটির পর আরেকটি পালক সজ্জিত করে পাখির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। পাখির পালকগুলো যেন সুন্দর ঝকঝকে থাকে, পালকে কোন ময়লা-আবর্জনা যেন স্থির থাকতে না পারে, এ জন্য আল্লাহ ঐ পালকের গোড়া থেকে ক্রীম জাতিয় এক প্রকার পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত করার ব্যবস্থা করেছেন।

পালকধারী প্রাণীগুলো তা নিজের মুখ দিয়ে পালকের গোড়া থেকে টেনে টেনে ঐ পিচ্ছিল পদার্থ সমস্ত পালকে ছড়িয়ে দেয়। এ ব্যবস্থা যদি আল্লাহ না করতেন, তাহলে হাঁস, মুরগী, কবুতর এবং অন্যান্য যেসব পাখি মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, সেসব প্রাণী দেখতে শুষ্ক মৃতের মতো হতো। মানুষের খেতে তা রুচিতে বাধতো। এই সৌন্দর্য আর রুচিবোধের যিনি পরিচয় দিলেন তিনিই হলেন আল্লাহ এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।

বস্ত্রহীন থাকলে মানুষকে ভীষণ কদাকার ও কুৎসিত দেখাবে। এ জন্য আল্লাহ পোষাক অবতীর্ণ করেছেন। এই পোষাকের মাধ্যমে মানুষ নিজের লজ্জাস্থান আবৃত রাখবে এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে। মহান আল্লাহ বলেন-

يَابَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا-

হে আদম সন্তান ! আমি তোমাদের জন্য পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে আবৃত করতে পারো। এটা তোমাদের জন্য দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। (সূরা আল আ'রাফ-২৬)

এই পোষাক অবিন্যস্তভাবে ব্যবহার করলে অরুচিকর দেখাবে। এ জন্য তা পাক-পবিত্র, পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, মহান আল্লাহ সূরা মুদ্দাচ্ছিরের মাধ্যমে তাও শিক্ষা দিয়েছেন। অজ্ঞতার কারণে তাদানীন্তন যুগে একশ্রেণীর লোকজন বস্ত্রহীন হয়ে কা'বাঘরকে তাওয়াফ করতো। বিষয়টি ছিল চরম অরুচিকর এবং অসামাজিক। এ কুপ্রথা বন্ধ করে পোষাকে সজ্জিত হয়ে ইবাদাতের হক আদায় করতে সূরা আল আরাফের ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন-

يَابَنِىْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ-

হে আদম সন্তান ! প্রতিটি ইবাদাতের ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের ভূষণে সজ্জিত হয়ে থাকো।

এভাবে মানুষের রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, ভদ্রতা, শালিনতা, কোন কিছু চাওয়ার পদ্ধতি, আহার করার শালীন পদ্ধতি, হাঁটা-উঠা-বসা এক কথায় মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক যেন সৌন্দর্যময় ও উন্নত রুচি গড়ে ওঠে, তা মহান আল্লাহ শিখিয়েছেন। তিনি স্বয়ং সুন্দর এবং সবচেয়ে প্রশংসামূলক রুচির অধিকারী, মানুষকেও তিনি তাঁর কোরআনের মাধ্যমে রুচি ও সৌন্দর্যবোধ শিখিয়েছেন। মানুষকে তিনি সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ-

মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি। (সূরা আত-তীন-৪)

মানুষকে এমন সুন্দর করে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, যার সাথে অন্য কোন সৃষ্টির কোন তুলনা হয় না। আল্লাহ বলেন-

خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ-

তিনি পৃথিবী ও আকাশমন্ডলকে সত্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের আকার -আকৃতি অত্যন্ত সুন্দর করে নির্মাণ করেছেন। (সূরা আত তাগাবুন–৩)

শারীরিক কাঠামোয় যেখানে যা প্রয়োজন, সেখানে তাই সংযোজন করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অদ্ভূত সুন্দর আকৃতিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন–

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ-وَلِسَانًا وَّ شَفَتَيْنِ-

আমি তাকে দুটো চোখ, একটি জিহ্বা এবং দুটো ওষ্ঠ দেইনি ? (সূরা বালাদ-৮-৯)

মানুষের শারীরিক কাঠামো ও গঠন প্রণালী দেখে কারো এ কথা বলার মতো ধৃষ্টতা নেই যে, কান দুটো মাথার দু'পাশে না দিয়ে তা বগলের নিচে দিলে ভালো হতো। চোখ দুটো কপালের নিচে টানা টানা করে না দিয়ে কপালের ওপরে গোল বৃত্তের মতো করে দিলে ভালো হতো। নাকটা ঠোঁটের ওপরে না দিয়ে নাভীর ওপরে দিলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতো। ফুলের পাঁপড়ীগুলো ভিন্ন ধরনের হলে আরো সুন্দর দেখাতো। চতুষ্পদ প্রাণীর লেজ পেছনের দিকে না দিয়ে তা পিঠের ওপরে থাকলে ভালো হতো। এ ধরনের অমূলক কথা বলার ধৃষ্টতা এবং দুঃসাহস কেউ দেখাতে পারবে না। আল্লাহর সৃষ্টিতে অসামঞ্জস্য রয়েছে, এমন চিন্তাও করা যায় না। যেখানে যা প্রয়োজন, আল্লাহ তাই করেছেন।

কথিত আছে, আল্লাহর একজন ওলী পথ দিয়ে যেতে যেতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বিশ্রামের জন্য একটি বট গাছের নিচে শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ করে বট গাছের ফল তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি চিন্তা করলেন, এত বড় একটি বিশাল গাছ, আর তার ফলগুলো কতই না ছোট্ট। মনে মনে তিনি আল্লাহকে বললেন, 'তোমার সৃষ্টিতে তো কোন অসামঞ্জ্য নেই–এ কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু বেল গাছ এই বট গাছের তুলনায় কত ছোট অথচ তার ফলগুলো বেশ বড়। আর বট গাছ কত বিশাল কিন্তু তার ফল খুবই ছোট। বিষয়টা আমার কাছে কেমন যেন..................।'

আল্লাহর সেই ওলী মনে মনে আল্লাহকে যে কথাগুলো বলছিলেন, তা শেষ না হতেই বাতাসের এক ঝাপটা এসে বট গাছের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। বাতাসের ঝাপটায় বট গাছের একটি ছোট্ট ফল গাছের নিচে শায়িত সেই ব্যক্তির নাকের ওপরে এসে পতিত হলো। সাথে সাথে আল্লাহর ওলী উঠে সিজদায় গিয়ে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ ! আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমার কল্পনা অনুযায়ী এই বট গাছের ফল যদি গাছ অনুসারে বড় হতো, তাহলে আজ আমার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো এবং তোমার বান্দারা সূর্যের প্রখর তাপে নিঃশেষে জ্বলে পুড়ে গেলেও কেউ এই গাছের নিচে ছায়ায় বিশ্রামের জন্য আসতো না।'

সুতরাং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। তিনিই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। তাঁর সৃষ্টিতে কোথাও কোন অসামঞ্জ্যতা নেই। সূরা আল মুল্‌ক-এর ৩-৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا-مَاتَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ

تَفٰوُتٍ-فَارْجِعِ الْبَصَرَ-هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ-ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ-

তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছেন। তোমরা মহাদয়াবানের সৃষ্টিকর্মে কোন ধরনের অসঙ্গতি পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখো, কোথাও কোন দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি? বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে।

মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো, তারা সৃষ্টির এই অপরূপ দর্শনে আত্মহারা হয়ে ওঠে। নারীর সৌন্দর্য অবলোকনে অস্থির চিত্তে তারা কবিতা রচনা করে। প্রজাপতির রঙ দেখে মুগ্ধ হয়ে তারা প্রশংসামূলক গীত রচনা করে। আকাশের নীল রঙ, সাগরের তরঙ্গমালা, বনানীতে বাতাসের হিন্দোল, দূরনিহারিকা কুঞ্জের পলায়নপর আলো, শশধরের মায়াবী কিরণ, দক্ষিণা মলয় সমিরণ, ফুলের মন-মাতানো সৌরভ আর পাখির কলকাকলীতে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে। কিন্তু এসবের যিনি মূল স্রষ্টা, যিনি পাখির কণ্ঠে গান দিয়েছেন, অরণ্যের মাঝে যিনি সবুজাভা দান করেছেন, সাগর তরঙ্গে যিনি রজত শুভ্র কিরীট দান করেছেন, নক্ষত্রপুঞ্জে যিনি আলোর দ্যুতি সৃষ্টি করেছেন, চাঁদের মাঝে যিনি স্নিগ্ধ কিরণ দিয়েছেন, সমিরণ মাঝে যিনি প্রশান্তির স্পর্শ-আবেশ সৃষ্টি করেছেন, ফুলের পাঁপড়ীকে যিনি মাধুরী আর সুষমামন্ডিত করেছেন তাঁর প্রশংসা করতে ভুলে যায়। সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশংসায় কোন কার্পণ্য নেই, কিন্তু স্রষ্টার প্রশংসায় জিহ্বায় জড়তা নেমে আসে। সুতরাং, আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য দর্শন করে যারা তাঁর প্রশংসা করতে কার্পণ্য করে, তারা নিকৃষ্ট রুচি আর হীন মানসিকতারই পরিচয় দিয়ে থাকে।

সমস্ত প্রশংসা ঐ রব্ব-এর

সূরা ফাতিহার মাধ্যমে বান্দাগণ মহান আল্লাহকে অভিনন্দন-পত্র দিয়ে থাকে। আল্লাহকে দেয়া অভিনন্দন-পত্রের ধরন কেমন হবে, কি হবে তার ভাষা এবং কোন পদ্ধতিতে তা পেশ করতে হবে, তা মানুষ জানে না। এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এই অভিনন্দন-পত্র অনুগ্রহ করে তাঁর নবীর মাধ্যমে বান্দাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, তিনিই শিখিয়েছেন অভিনন্দন-পত্রের ভাষা। প্রথমেই বলা হয়েছে−সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য-যিনি সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব।

সমস্ত প্রশংসা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর−কেন তাঁর প্রশংসা করতে হবে এবং অন্য কারো প্রশংসা করা যাবে না? এ প্রশ্ন কারো মনে উদয় যেন না হয়, এ জন্য সাথে সাথে বলা হয়েছে, 'একমাত্র প্রশংসা আল্লাহর করতে হবে এ কারণে যে, তিনি জগতসমূহের রব্ব'। মানুষের মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে এ ধারণার প্রচলন ঘটানো হয়েছে যে, আরবী 'রব্ব' শব্দের অর্থ হলো প্রতিপালক। প্রকৃতপক্ষে রব্ব শব্দের অর্থ ব্যাপক। এই ব্যাপক অর্থেই আল্লাহর কোরআনে রব্ব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর কোরআনে রব্ব শাসক অর্থে, উপাস্য অর্থে, মালিক অর্থে, প্রতিপালক অর্থে, আইনদাতা অর্থে, আইন রচিয়তা অর্থে, আইন প্রয়োগকারী অর্থে, ব্যবস্থাপক অর্থে অর্থাৎ এ ধরনের নানা অর্থে রব্ব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

এক কথায় রব্ব-এর অর্থ হলো, 'যার যখন যে জিনিসের যতটুকু প্রয়োজন, তাকে তখন সেই জিনিস ফরিয়াদ করার পূর্বে যিনি পৌঁছে দেন, তাঁর নামই হলো রব্ব।'

এই রব্ব যিনি হবেন, তাঁর ভেতরে রবুবিয়াতের গুণাবলী বিদ্যমান থাকতে হবে। এই গুণাবলী একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কারো মধ্যে নেই। তিনিই রব্ব যিনি সৃষ্টি করেই তাঁর দায়িত্বের ইতি-কর্তব্য ঘটান না, বরং সৃষ্টিকে তিনি পূর্ণতায় পৌঁছে দেন। মানুষের সৃষ্টি প্রসঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, এই মানুষের কোন অস্তিত্বই ছিল না। মহান আল্লাহ বলেন-

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى-

মানুষ কি সেই সামান্যতম শূক্র ছিল না, যা সজোরে নির্গত হয়েছিল? (সূরা কিয়ামাহ্-৩৭)

পক্ষান্তরে মানব দেহে এই শূক্র এলো কোথেকে? পৃথিবীতে আমরা যা কিছুই দেখি, এসবের মূল উপাদান হলো মাটি। মাটি থেকেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। বিশাল আকাশের শূন্যগর্ভে যে উড়োজাহাজ চলাচল করে, তা যে উপকরণ দিয়ে নির্মিত হয়েছে, নির্মাণকালে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব বস্তুর মূল উপাদান মাটি থেকে উৎপাদিত হয়েছে। যেমন লৌহ, তামা, দস্তা, পিতল, স্বর্ণ, কয়লা ইত্যাদির খনি মৃত্তিকা অভ্যন্তরেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রমশ অস্তিত্ব লাভ করে। কাঠ সংগৃহিত হয় গাছ থেকে। গাছ উৎপন্ন হচ্ছে মাটি থেকে। পৃথিবীতে আমরা যা কিছুই দেখছি, তা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন জাতবস্তু আল্লাহর দেয়া জ্ঞান প্রয়োগে পরিবর্তন করে মানুষ নবতর আবিষ্কার করেছে। সুতরাং, মানুষ মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্য আহার করে। দেহ এবং দেহের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে, তা গঠিত হয় গ্রহণকৃত খাদ্যের সার নির্যাস থেকে। মানুষের দেহ থেকেই শূক্র নির্গত হয়, অতএব শূক্রের মূল উপাদান হলো মাটি। এ জন্যেই বলা হয় মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে।

মানুষের দেহ গঠনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিস্ময়ের ধাক্কায় হতবাক হয়ে যেতে হয়। অসংখ্য কোষ (Cell) দিয়ে মানব দেহ গঠিত করেছেন আল্লাহ-যিনি হলেন রব্ব। লক্ষ লক্ষ কোষের মাধ্যমে গঠিত মানুষের দেহসৃষ্টি নৈপুন্যতায় এক অদ্ভূত জটিল সৃষ্টি। বিশাল একটি ইমারত যেমন একটির পর একটি ইট পাথর সাজিয়ে নির্মাণ করা হয়, তদ্রুপ মানুষের দেহে কোষের পর কোষ বিন্যাসের মাধ্যমে মানুষের দেহ কাঠামোটি গড়ে তুলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এই অসংখ্য কোষ সর্বপ্রথমে বিস্তৃতি লাভ করেছে একটি মাত্র কোষ থেকে। সূচনায় যা ছিল একটি পুরুষ প্রজনন কোষ যাকে বলা হয়েছে শুক্রাণু (Spermatozoon) এবং আরেকটি স্ত্রী প্রজনন কোষ যাকে বলা হয়েছে ডিম্বাণু (Ovum)। এই দুটো কোষের মিলিত হওয়াকে বলা হয়েছে নিষেক (Fertilization)। এ দুটো কোষ মিলিত হয়ে যে কোষটি উৎপন্ন হয়েছে তাকে বলা হয়েছে জাইগোট (Zygote)। বিভাজনের মাধ্যমে এই জাইগোট মহান আল্লাহর নির্দেশে ক্রমশঃ মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। মাতৃগর্ভের যে স্থানটির নাম জরায়ূ (Uterus) সেখানে তা স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং এটাকেই বলা হয়ে থাকে ভ্রূণ (Embryo)। এই কাজটি যিনি করেন তিনিই হলেন রব্ব। আল্লাহ বলেন-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً

হে জনগণ ! তোমাদের রব্বকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকেই তোমাদের জুটি নির্বাচিত করেছেন এবং এই উভয় থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারীকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা আন নিছা-১)

মাতৃগর্ভে আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় ভ্রূণ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। এভাবে প্রায় চল্লিশ সপ্তাহ অর্থাৎ দুই শত আশি দিন বা আরো কিছু কম সময়ের ব্যবধানে অপূর্ব সুন্দর মানব শিশু এই পৃথিবীতে আগমন করে। রব্বুল আলামীন বলেন–

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ-

তিনি মানুষকে এক ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন নাহ্‌ল-৪)

এই আয়াতে 'নুৎফা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটির অনেক ধরনের অর্থ হতে পারে যা যথাস্থানে প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণতঃ নুৎফা শব্দ দ্বারা শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুকে বোঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহর নির্দেশে যে সমস্ত কোষ একটির পর আরেকটি সজ্জিত হয়ে মানব দেহ গঠিত হয়, তার ভেতরে নানা ধরনের জৈব পদার্থ বিদ্যমান থাকে। এসব পদার্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে এবং তার একটিকে বলা হয়েছে সাইটোপ্লাজম ও অপরটিকে নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থান করছে DNA (Deoxyribonucleic Acid)। মূলতঃ এ জিনিসটিই হচ্ছে প্রাণীজগতের বংশগতির ধারক-বাহক। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতিটি প্রাণীর ডিএনএ-কে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন ফলে একটি প্রাণীর গর্ভ থেকে ভিন্ন প্রজাতির আরেকটি প্রাণী জন্মগ্রহণ করে না। নারী দেহের একটি ডিম্বাণুর মধ্যে পুরুষ দেহের একটি শুক্রাণু প্রবেশ করে নিষেক ঘটাতে সক্ষম হলেই ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। এরপর এই ভ্রূণ নানা স্তর অতিক্রম করতে থাকে। আর এগুলো যিনি সুনিপুন দক্ষতার সাথে সম্পাদিত করেন, তিনিই হলেন আমাদের রব্ব। আল্লাহ বলেন–

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا-

তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নূহ-১৪)

মানুষ মাতৃগর্ভে কিভাবে অবস্থান করে এবং কয়টি পর্যায় অতিক্রম করে এই পৃথিবীতে আসে, বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন–

يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمَاتٍ ثَلٰثٍ-ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ-

তিনিই মাতৃগর্ভে তিন তিনটি অন্ধকারময় আবরণের মধ্যে তোমাদেরকে একের পর এক

সজ্জিত করেছেন। তিনিই আল্লাহ–যিনি তোমাদের রব্ব। প্রভুত্ব-সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, তিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের অধিকারী কেউ নেই। (সূরা যুমার-৬)

তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন স্তর অতিক্রম করে এই মানুষকে মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়েছে। আধুনিক ভ্রূণ তত্ত্ববিদগণ মাতৃগর্ভে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভ্রূণ বিকাশের স্তরগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, যে তিনটি স্তরের কথা কোরআন বলেছে, তার প্রতিটি স্তর তিনটি পর্দা দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে। এসব পর্দা মানব শিশুকে দেহ সম্পর্কিত নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছে। এই বিস্ময়কর ব্যবস্থা যিনি সুচারুরূপে সম্পাদন করছেন, তিনিই হলেন রব্ব। বর্তমান মেডিকেল সাইন্স এই তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণকে বলেছে, জাইগোট, ব্লাষ্টোসিষ্ট ও ফিটাস (Zygote. Blastocyst. Foetus)। বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুসারে প্রতিটি মানুষের দেহে যে কোষ রয়েছে, তার ভেতরে তেইশ জোড়া বা ছয়চল্লিশটি ক্রোমোজোম (Chromosome) বিদ্যমান। মানব শিশুর সূচনায় দেহ কোষে তেইশটি ক্রোমোজোম সরবরাহ হয় পিতার শুক্রাণু থেকে এবং আরো তেইশটি ক্রোমোজোম সরবরাহ করে মায়ের ডিম্বাণু। এই ছয়চল্লিশটি ক্রোমোজোমের মধ্যে তেইশটিকে বলা হয় দেহ ক্রোমোজোম (Autosome)। দেহ ক্রোমোজোমের মধ্যে বাইশ জোড়া ক্রোমোজোমের আকার ও কর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা এক ও অভিন্ন। এই এক ও অভিন্ন ক্রোমোজোম মানব শিশুর দেহ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

তারপর আরো যে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম (Sex chromosome), এগুলো মানব শিশুর যৌন বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ পুরুষ হবে না নারী হবে–তা নিয়ন্ত্রণ করে। এই তেইশটি ক্রোমোজোমকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এর একটি হলো মেইল ক্রোমোজোম (Male chromosome) ও অপরটি হলো ফিমেইল ক্রোমোজোম (Female chromosome)। বিজ্ঞানীগণ মেইল ক্রোমোজোমের পরিচিতি তুলে ধরেছেন ইংরেজী অক্ষরের ওয়াই (Y) অক্ষর দিয়ে এবং ফিমেইল ক্রোমোজোমের পরিচয় দিয়েছেন ইংরেজী অক্ষরের এক্স (X) অক্ষর দিয়ে। অর্থাৎ নারীর যৌন ক্রোমোজোমের সাংকেতিক চিহ্ন হলো দুটো এক্স (XX)। পক্ষান্তরে পুরুষের যৌন ক্রোমোজোমের জোড়ায় একটি এক্স ও অন্যটি ওয়াই বিদ্যমান রয়েছে (XY)। এভাবে পুরুষের যৌন ক্রোমোজোমের পরিচিতি দেয়া হয়েছে একটি এক্স ও একটি ওয়াই দিয়ে। এই যৌন ক্রোমোজোমের কারণেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে দেহগত বাহ্যিক আকৃতি–বৈশিষ্ট্য এবং শরীরের অভ্যন্তরীস্থ পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। এই অকল্পনীয় জটিল বিষয়টি যিনি সুনিগুনভাবে সম্পাদন করেছেন, তিনিই হলেন রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ বলেন–

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا–وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ–

আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্রকীট থেকে। এরপর

তোমাদেরকে জোড়ায় পরিণত করা হয়েছে। কোন নারী গর্ভবতী হয়না, না সন্তান প্রসব করে–এসব কিছু রয়েছে আল্লাহর জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে। (সূরা ফাতির–১১)

এভাবে জোড়া সৃষ্টি বা ক্রোমোজম সংক্রান্ত বিষয় অত্যন্ত রহস্যময়। কিভাবে এটা সংঘটিত হয়, তা বিজ্ঞানীদের কাছে এক চরম বিস্ময়কর বিষয়। সমস্ত সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِيْنٍ-ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ-ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا-ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ-فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ-

আমি মানুষকে মাটির সার নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে একটি সুসংরক্ষিত স্থানে টপ্‌কে পড়া ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি। এরপর সেই ফোঁটাকে জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত করেছি। তারপর সেই রক্তপিন্ডকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি। এরপর মাংসপিন্ডে অস্থি-পঞ্জর স্থাপন করেছি। তারপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোস্ত দিয়ে। তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি হিসাবে। সুতরাং আল্লাহ বড়ই বরকত সম্পন্ন, সমস্ত শিল্পীর চেয়ে সর্বোত্তম শিল্পী তিনি। (সূরা আল মু'মিনূন–১২-১৪)

উল্লেখিত আয়াতে 'সুলালাতিম মিন ত্বিন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো মাটির সার-নির্যাস। মাটি যেসব উপাদানে গঠিত তাহলো, ৬৪ দশমিক ৬ শতাংশ অক্সিজেন, ২৭ শতাংশ সিলিকন, ৮ দশমিক ১ শতাংশ এ্যালুমিনিয়াম, ৫ শতাংশ লোহা, ৩ দশমিক ৬ শতাংশ ক্যালশিয়াম, ২ দশমিক ৮ শতাংশ সোডিয়াম, ২ দশমিক ৬ শতাংশ পটাশিয়াম, ২ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম। তারপর হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য উপাদান ১ দশমিক ৬ শতাংশ রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের উদ্ভিদরাজি তার মূলের সাহায্যে মাটির এসব উপাদান শোষণ করে। তারপর উদ্ভিদ থেকে যেসব খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছে তা মানুষ খাদ্য হিসাবে আহার করে। পাকস্থলিতে এগুলো ডাইজেষ্ট হয়। গ্রহণকৃত খাদ্যের সার-নির্যাস থেকে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পুরুষের শুক্রাশয়ে স্পার্ম্যাটাজোন (Spermatozoon) এবং নারীর ডিম্বাশয়ে (Ovary) ওভাম (Ovum) উৎপন্ন হয়। ওভাম–এর নিষেক থেকে সৃষ্টি হয় জাইগোট। এই জাইগোট নারীর জরায়ুতে স্থানান্তরিত হয়ে ভ্রূণ গঠন করে। জগতসমূহের রব্ব মহান আল্লাহ এই ভ্রূণ থেকেই পর্যায়ক্রমে মানুষ সৃষ্টি করেন।

জাইগোট গঠনের মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সেটা নারীর বাচ্চা থলির দেয়ালে একটি ঘেরা প্রকোষ্ঠে স্থান লাভ করে। এরপর তা জ্যামিতিক হারে বিভাজন হতে থাকে এবং সময়ের ব্যবধানে তা জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত হয় এবং বিজ্ঞানীগণ এটাকেই ব্লাষ্টোসিষ্ট নামে অভিহিত করেছেন। এই ব্লাষ্টোসিষ্ট অনেকটা পানির জোঁকের মতো দেখায়। তিন থেকে চার সপ্তাহের

মধ্যে জোঁক রক্তপান করলে যেমন আকৃতি ধারণ করে, এটিও তেমন আকার ধারণ করে। এই ব্লাষ্টেসিষ্ট মায়ের রক্ত দ্বারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং মাতৃগর্ভের বাচ্চাথলির দেয়ালে ঝুলতে থাকে। ব্লাষ্টোসিষ্টের বাইরের যে স্তরটি তাকে বলা হয় ট্রফোব্লাষ্ট–এই ট্রফোব্লাষ্ট থেকে এক ধরনের এনজাইম নির্গত হতে থাকে। এনজাইমের প্রভাবে বাচ্চাথলির টিসুগুলো গলে যায় এবং গলিত টিসুর ভেতরে ব্লাষ্টেসিষ্ট ডুবে যায়। এ সময় ব্লাষ্টোসিষ্ট পরিণত মাংসপিন্ডে যাকে সুমিটেস বলা হয়। এ প্রক্রিয়া প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। এই সুমিটেসের শিরদাঁড়ায় তেরটি উঁচু নিচু দাগের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এটাই পরবর্তীতে মেরুদন্ডে পরিণত হয়। ছয় সপ্তাহের শেষ সময়ে এটা একটি মানব কঙ্কালের আকার ধারণ করে। বার সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণের একটি ক্ষুদ্র অথচ পরিপূর্ণ কঙ্কাল গঠিত হয় এবং এ কঙ্কালে সর্বমোট তিন শত ষাটটি জোড়া থাকে। মানুষের কঙ্কাল সর্বমোট দুই শত ছয়টি হাড় দিয়ে গঠিত। আট সপ্তাহের শেষের দিকে তা একটি পরিপূর্ণ মানব শিশুর আকার ধারণ করে এবং ভ্রূণ তখন নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়া যিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পাদন করেন, তাঁরই নাম হলো রব্ব এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বোত্তম রব্ব। ভ্রূণকে রেখেছিলেন এমন একস্থানে যেখানে কোন ধরনের রোগ শিশুকে আক্রান্ত করতে পারে না। এই স্থানটিকেই কোরআনে বলা হয়েছে, 'কারারিম মাকিন'–সুসংরক্ষিত স্থান। সেখান থেকে শিশুকে যখন পৃথিবীতে নিয়ে আসা হলো, তখন তার অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ –

মানুষকে আমি এমন এক অবস্থায় তার মায়ের গর্ভ থেকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছি, যে সময় তার কোন চেতনাই ছিল না। পেটের ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও তার বলার ক্ষমতা ছিল না যে, তার ক্ষুধা পেয়েছে। সেই সাথে তাকে আমি তিনটি জিনিষ দিয়েছি। তাকে শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তা করার মত মগজ দিয়েছি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরায়ে আস্‌সাজদার মধ্যে বলেছেন, মানুষের সৃষ্টির সূচনা তিনি করেছেন কাদা-মাটি থেকে। তারপর তার বংশধারা এমন এক বস্তু থেকে চালু করেছেন যা নিকৃষ্ট পানির মতই। এরপর তিনি দেহের যেখানে যে অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের প্রয়োজন তা সজ্জিত করে রুহ্ দান করেছেন। তারপর তিনি মানুষকে জ্ঞান, চোখ এবং হৃদয় দান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তার শরীরের ত্বকের ভেতরে স্পর্শ অনুভূতি এবং নাক দিয়েছি ঘ্রাণ গ্রহণ করার জন্য। এভাবে তাকে আমি সুন্দর করে সাজিয়েছি। তার যা যেখানে প্রয়োজন আমি তাই দিয়েছি। তার মাতা-পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ভেতরে তার জন্য অসীম মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছি। সে পৃথিবীতে চোখ খুলেই দেখতে পায়, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তাকে প্রতিপালন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সমস্ত কিছুই তার সেবায় নিয়োজিত করেছি।

মানুষের জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন আমি তাই দিয়েছি। মানুষের ভেতরে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোন যোগ্যতা কারো ভেতরে বেশী দিয়েছি। আবার তা কারো ভেতরে কম দিয়েছি। এমন না করলে কেউ কারো মুখাপেক্ষী হত না। একজন মানুষ আরেকজনের পরোয়া করতো না এবং মানুষের যোগ্যতার কোন মূল্যায়ন হত না।

যে জিনিষের প্রয়োজন যতবেশী মহান আল্লাহ তা অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবীর জন্য কর্মীর প্রয়োজন অধিক এবং মহান আল্লাহ তা অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। বড় বড় বিজ্ঞানী, সেনাপতি, তাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন কম, আল্লাহ তা কম পরিমাণেই সৃষ্টি করেছেন। এ জাতিয় মানুষের সংখ্যা আল্লাহ ঘরে ঘরে সৃষ্টি করেননি। কারণ, এসব মানুষের অবদান এই পৃথিবীতে শতাব্দীর পরে শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। এ জন্য এসব দুর্লভ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ পৃথিবীর জন্য যে কয়জন প্রয়োজন মহান আল্লাহ তাই সৃষ্টি করেছেন। তাদের একজনের যে অবদান, শতকোটি মানুষ ঐ একজন মানুষের চিন্তাধারা দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে। এভাবে নানা ধরনের বিদ্যায় পারদর্শী মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্য প্রকৌশলী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, স্থপতি, শাসক, শিল্পী, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সেনাপতি, শিক্ষাবিদ, সমরবিদ, নানা ধরনের বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক তথা যে ধরনের গুণাবলীসম্পন্ন ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন, আল্লাহ তা মানব জাতিকে দান করেছেন। যে আল্লাহ এসব করলেন, তিনিই হলেন রব্ব এবং এই রব্ব-এর সমস্ত প্রশংসা।

সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে এ পৃথিবীতে আগমন করবে, সন্তানের যারা অভিভাবক তাদেরকে পূর্ব থেকেই সন্তানের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়নি। যিনি ঐ সন্তানকে প্রেরণ করছেন, তিনিই সন্তানের মায়ের বুকের ওপরে এমন এক খাদ্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার বিকল্প গোটা পৃথিবীতে নেই। মায়ের বুকের দুধের মধ্যে পানির ভাগ বেশী এবং সামান্য মিষ্টি থাকে যেন শিশু আগ্রহ সহকারে পান করে। আল্লাহ তা'য়ালা এই দুধে পানির ভাগ বেশী না দিলে সদ্যজাত শিশু তা হজম করতে সক্ষম হতো না। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুকে পানি পান করালে তার নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে। এ জন্য মহান রব্ব আল্লাহ তা'য়ালা ঐ দুধের মধ্যেই পানি দিয়েছেন যেন শিশুকে পৃথকভাবে পানি পান করাতে না হয়।

মাতৃদুগ্ধ শুধুই দুধ নয়, এই দুধ শিশুর জন্য সর্বোত্তম ওষুধ। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে মাতৃদুগ্ধ যেসব সন্তান নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পান করার সুযোগ পেয়েছে, তারা রোগে খুব কমই আক্রান্ত হয় এবং এরা মেধাবী হয়। শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে, মায়ের দুধও ক্রমশঃ ঘন হতে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে প্রথমে মায়ের বুকে যে দুধ থাকে, অজ্ঞতার কারণে তা অনেকে ফেলে দেয়। অথচ ঐ দুধই হলো সন্তানের সমস্ত রোগের প্রতিষেধক। শিশু বড় হচ্ছে মায়ের দুধও ঘন হচ্ছে, এর কারণ হলো–প্রথমে দুধ ঘন হলে শিশু তা চুষে বের করতে পারবে না এবং সে ঘন দুধ তার অপরিপক্ক পাকস্থলীতে হজম হবে না। পাকস্থলী ক্রমশঃ শক্তিশালী হতে থাকে, সেই সাথে মায়ের দুধও ঘন হতে থাকে। এভাবে শিশু যখন বাইরের খাদ্য আহার করতে সক্ষম হয়, তখন মায়ের দুধ ক্রমশঃ ঘন হতে হতে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। মায়ের স্তনে

একটি ছিদ্র নেই, একটি ছিদ্র থাকলে তা দিয়ে বেগে দুধ নির্গত হয়ে সন্তানের কণ্ঠনালীতে অসুবিধার সৃষ্টি করতো। এ জন্য মায়ের স্তনে আল্লাহ তা'য়ালা বত্রিশটি ছিদ্র দিয়েছেন যেন সমতা রক্ষা করে দুধ নির্গত হয় এবং শিশু তা পরম প্রশান্তিতে পান করতে সক্ষম হয়।

শিশু যখন বাইরের খাদ্য গ্রহণ করার উপযুক্ত হলো, তখন শক্ত খাদ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার জন্য মাড়িতে দাঁতের প্রয়োজন। এই দাঁতের জন্য আল্লাহর কাছে কারো আবেদন করতে হয়নি। তিনি এমন রব্ব যে, তা না চাইতেই তিনি দিয়েছেন। মানুষের মাথার মগজ–যাকে ব্রেন বলা হয়ে থাকে। এই মগজ এমনভাবে মাথার খুলির ভেতরে রাখা হয়েছে, যেন তা কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মগজের চারদিকে বেশ কয়েকটি আবরণ বা পর্দা নির্মাণ করা হয়েছে, এগুলো কোন কঠিন পদার্থ দিয়ে বানানো হয়নি। এগুলো করা হয়েছে নরম এবং সিক্ত। ক্রীম যেভাবে পানির ভেতরে ভাসতে থাকে, মাথার মগজকে সেভাবে সিক্তাবস্থায় রাখা হয়েছে. যেন তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে। মানুষের মাথায় অসংখ্য সেল নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো কম্পিউটার। এই কম্পিউটারের কার্যক্ষমতা দেখলে হতবাক হতে হয়। তারপরেও কম্পিউটারের মেমোরির একটি নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু মানুষের এই মাথা অনেকগুণ বেশী বিস্ময়কর। মানুষের মাথায় আল্লাহ যে মেমোরি দিয়েছেন, গোটা পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য এই মেমোরিতে রাখার পরও আরো বিশাল জায়গা অবশিষ্ট রয়ে যাবে।

মানুষের চোখে কর্ম ক্ষমতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন। মানুষ রাস্তায় চলতে গিয়ে যদি সাপ দেখে, তাহলে এই চোখ অত্যন্ত দ্রুত বিপদ সংকেত প্রেরণ করে ব্রেনকে। এই ব্রেন তাৎক্ষণিকভাবে সক্রিয় করেছে পা ও হাতকে। সংকেত দিয়েছে হাতে যদি কোন অস্ত্র থাকে তাহলে তা দিয়ে সাপকে আঘাত করতে হবে আর না থাকলে পায়ের শক্তিতে দৌড় দিতে হবে। বিষয়টি যতটা সহজ মনে করা হয় প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বিষয়টি এত অল্প সময়ের ভেতরে বাস্তবায়িত হয় যে. এতে কতটুকু সময় ব্যয় হলো তা মানুষের পক্ষে হিসাব করে বের করা অসম্ভব। চোখ সাপ দেখলো এবং সে মাথায় সংবাদ প্রেরণ করলো, মাথা পা ও হাতকে সক্রিয় করলো। এই পুরো বিষয়টি সংঘটিত হতে, এক সেকেন্ডেরও সময়ের প্রয়োজন হয়নি, এক সেকেন্ডের কয়েক লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র সময় প্রয়োজন হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি সম্ভব করা কেবল মাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষেই সম্ভব আর এ জন্যেই তাঁর যাবতীয় প্রশংসা।

আবার মানুষ তার চোখে যা দেখে তা নেগেটিভ ভঙ্গীতে দেখে থাকে। নেতিবাচক দৃশ্য ধরে চোখ তা ব্রেনে পৌছে দেয় এবং সেখান থেকে তা পজিটিভ হয়ে বের হয়ে আসে এবং মানুষ তখন স্পষ্ট দেখতে পায়। আল্লাহ হলেন রব্ব এবং এসব ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। মানুষ তার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে অসংখ্য শব্দ শুনে থাকে। কিন্তু অনেকগুলো শব্দ একই সাথে কানে প্রবেশ করে অস্বাভাবিক কোন শব্দের সৃষ্টি করে না, কোন একটি শব্দও জড়িয়ে যায় না। মানুষের জিহ্বার গঠন প্রণালী এমন যে, জিহ্বা অসংখ্য স্বাদ গ্রহণ করতে ও পার্থক্য নির্দেশ করতে সক্ষম। এ জন্য সেই রব্ব-এরই প্রশংসা করতে হবে, যিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে মানুষকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন।

রবুবিয়াত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট

সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতেই বলা হলো, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। কেন সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর ? এ প্রশ্ন উদয় হবার পূর্বেই জবাব এসে গেল, তিনি জগতসমূহের রব্ব। তিনি শুধু সৃষ্টি জগতসমূহের রব্‌ই নন, এই পৃথিবীতে যে আইন-বিধান দিয়ে মানুষ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত করবে, সে আইন-বিধানও তিনিই দান করবেন, মানব জীবনের এসব বিভাগের রব্‌ও মহান আল্লাহ। হযত মুসা ও হযরত হারুন আলাইহিস্ সালামকে তদানীন্তন পৃথিবীর সুপার পাওয়ার (Super power) ফেরাউনের দরবারে যাবার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ দিলেন তখন তাঁরা আল্লাহর কাছে আবেদন করে বলেছিলেন–

قَالاَ رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى-

হে আমাদের রব্ব ! আমারা আশঙ্কা করছি, সে আমাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করবে অথবা আমাদের ওপরে চড়াও হবে। (সূরা ত্বা-হা-৪৫)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের ভেতরের শঙ্কা দূর করার জন্য বললেন–

قَالَ لاَ تَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَ اَسْمَعُ وَاَرٰى-فَاْتِيٰهُ فَقُوْلاَ رَبِّكَ-

কোন ভয় করো না, আমি আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছি এবং আমি সব কিছু শুনছি ও দেখছি। যাও তার কাছে এবং বলো, আমরা তোমার রব্ব-এর প্রেরিত। (সূরা ত্বাহা)

বিষয়টি লক্ষ্যনীয়, হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামকে একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তির কাছে–যে রাষ্ট্র ছিল সে যুগের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র। এমন একটি শক্তির কাছে পাঠাচ্ছেন আর আল্লাহ বলছেন, কোন ভয় নেই. সমস্ত শক্তির উৎস আমি আল্লাহ তোমার সাথে রয়েছি। তোমার সাথে ওরা কি আচরণ করবে তাও আমি দেখবো। তুমি একা নও, যাও তার কাছে এবং বলো–তুমি রব্ব নও। তোমার যিনি রব্ব আমাকে তিনিই তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর বিধানের সামনে নিজের অহঙ্কারের মাথানত করে দাও।

সূরা ত্বা-হা'র উল্লেখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, ময়দানে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাথে আল্লাহ অবশ্যই থাকেন এবং তিনি দেখতে থাকেন, ইসলামের সৈনিকদের সাথে বাতিল শক্তি কি আচরণ করে। যথা সময়ে তাঁর সাহায্যও চলে আসে। হযরত মুছাকে ফেরাউনের কাছে গিয়ে এ কথা বলতে বলেননি যে, 'আমাকে তোমার আল্লাহ প্রেরণ করেছে' বরং তাঁকে বলতে বলা হলো, 'আমরা তোমার রব্ব-এর পক্ষ থেকে এসেছি'।

অর্থাৎ তুমি নিজেকে রব্ব বলে দাবী করছো। এ দাবীর মধ্যে সত্যতার কোন লেশ নেই বরং সম্পূর্ণ বাতুলতামাত্র। কারণ রব্ব হওয়ার জন্য যে ধরনের গুণাবলীর প্রয়োজন, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ভেতরে থাকতে পারে না–তোমার ভেতরেও নেই। অতএব আল্লাহই তোমার রব্ব। অতুলনীয় সমর শক্তির অধিকারী রব্ব-এর দাবীদার ফেরাউন কোনদিন স্বপ্নেও

কল্পনা করতে পারেনি তার দরবারে দাঁড়িয়ে তারই মুখের ওপরে এমন ধরনের দুঃসাহসী কথা কেউ উচ্চারণ করতে পারে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ফেরাউন বিস্ময়ে অস্ফুটে প্রশ্ন করলো–

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يمُوسٰى–

ফেরাউন বললো, আচ্ছা, তাহলে তোমাদের দু'জনের রব্ব কে হে মুছা ? (সূরা ত্বা-হা-৪৯)

ফেরাউন যেদিন থেকে নিজেকে রব্ব হিসাবে ঘোষণা করেছিল, তার দাপটের মুখে নিষ্পেষিত জাতি শুধু অসহায় ক্ষোভে গুমরে ফিরেছে। কোন প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। এ জন্য মূর্খ ফেরাউন ধারণা করেছিল, গোটা জাতির প্রতিটি সদস্যই তাকে একমাত্র রব্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই দু'জন লোকই আমাকে রব্ব হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। এ জন্য সে প্রশ্ন করেছিল, 'তোমাদের দু'জনের রব্ব কে ?' তার এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম বলতে পারতেন, 'আমার রব্ব হলেন আল্লাহ।' তিনি এ ধরনের জবাব না দিয়ে কে তাঁর রব্ব এবং সেই রব্ব কোন ধরনের অদ্বিতীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তাও জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর রব্ব-এর পরিচয় তিনি এভাবে দিলেন–

قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى–

আমাদের রব্ব তিনি যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা ত্বা-হা-৫০)

তদানীন্তন মিশরের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মিশরের অধিকাংশ জনগণ ধর্মীয় দিক দিয়ে নানা ধরনের মূর্তি ও প্রকৃতির পূজা করতো। আর ফেরাউন নিজেকে সূর্যদেবতার অবতার বলে দাবী করতো। ফেরাউন এ দাবী করতো না যে, কোন দেব-দেবীর পূজা করা চলবে না এবং দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা ত্যাগ করে আমার পূজা করতে হবে। বরং তার দাবী ছিল, আদর্শগতভাবে মিশরের সমস্ত জনগণের ওপরে রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব চলবে আমার। আমার আইন-কানুন, আমার ইচ্ছাশক্তির সামনে সবাইকে নত হতে হবে। আমার কথাই দেশের আইন। ফেরাউন যখন দেখলো যে, মুছার কথা মেনে নিলে দেশের বুকে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তার ইচ্ছার কোন মূল্য থাকবে না। সার্বভৌমত্ব থাকবে আল্লাহর। এ জন্য সে মুছা আলাইহিস্ সালামকে হুমকি দিয়ে বলেছিল–

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ–

যদি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ইলাহ্ বলে গ্রহণ করো, তাহলে মনে রেখো–আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করবো। (সূরা শু'আরা-২৯)

এই ধরনের হুমকি শুধু ফেরাউনই দেয়নি, প্রতিটি যুগেই সত্যের বাহকদের সাথে সমকালীন রাষ্ট্রশক্তি একই ব্যবহার করেছে, বর্তমানেও করছে। পার্থক্য শুধু এটাই যে, সে যুগের স্বৈরাচারী ফেরাউন প্রকাশ্যে আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করেছিল, আর এ যুগের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ফেরাউনরা অঘোষিতভাবে নিজেদেরকে রব্ব বলে দাবী করে এবং সত্যের বাহকদের ওপরে বর্বর নির্যাতন চালায় এবং তাদেরকে মিথ্যা অভিযোগে কারারুদ্ধ করে।

হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম নিজের রব্ব-এর পরিচয় এভাবে দিলেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস তাঁরই নির্মাণ কৌশলে নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি জিনিসকে তিনিই আকার-আকৃতি, গঠনশৈলী, শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা, গুণ-বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে কর্ম সম্পাদন করার জন্য হাতের যে গঠনাকৃতির প্রয়োজন ছিল, পায়ের জন্য যে সর্বাধিক উপযুক্ত গঠনাকৃতির দরকার ছিল, চোখ, কান, মুখ, দাঁত, পেট ও পিঠের জন্য যে গঠনশৈলী ও আকৃতি প্রয়োজন ছিল তাই তিনি দিয়েছেন। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ, বাতাস, পানি আলো, চন্দ্র-সূর্য, তারকা, পাহাড়-পর্বত তথা প্রতিটি জিনিসকেই এমন বিশেষ আকৃতি দান করেছেন যা এ বিশ্বজগতে তার নিজের অংশের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল।

হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম বলিষ্ঠ ও নির্ভীক কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, আমার রব্ব প্রতিটি জিনিসকে তার প্রয়োজনীয় বিশেষ আকৃতি দিয়েই কর্ম শেষ করেননি বরং তিনিই সবাইকে পথ দেখিয়েছেন। পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যাকে তিনি নিজের গঠনাকৃতিকে কাজে ব্যবহার করার এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দেননি। চন্দ্র-সূর্যকে তিনিই কক্ষ পথে বিচরণ করতে শিখিয়েছেন। মানব দেহের যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, এগুলো যে কর্ম সম্পাদন করে তা তিনিই শিখিয়েছেন। পানিতে মাছ কিভাবে সাঁতার কাটবে, পাখি মহাশূন্যে কিভাবে উড়বে, প্রজাপতি ফুলে ফুলে ঘুরে কিভাবে পরাগায়ন ঘটাবে, গাছ কিভাবে ফুল দেবে, মাটি কিভাবে ফসল উৎপন্ন করবে, তা আমার রব্ব–আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শিখিয়েছেন। অতএব সেই রব্ব-এর অনুগত হয়ে যাও।

রব্ব কে, কেন তিনি রব্ব এবং কেন তাঁকে ব্যতীত আর কাউকে রব্ব বলে স্বীকৃতি দেয়া যাবে না, হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম ফেরাউনের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তাঁর সেই ছোট্ট উত্তরের মধ্যে সমস্ত কথা নিহিত রয়েছে। সুতরাং, এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, 'রাষ্ট্রের শাসক থেকে শুরু করে, দেশ ও জাতির কর্তৃত্বশীল পদে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অধিষ্ঠিত হবে, সে বা তারা যদি আল্লাহর বিধান অনুসারে তার বা তাদের অধিনস্থদের পরিচালিত না করে নিজের অথবা অন্য কারো আইন-বিধান অনুসারে পরিচালিত করার চেষ্টা করে, তাহলে সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ প্রকারান্তরে নিজেদের ভেতরে রবুবিয়াতের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে বলে দাবি করলো।'

দেশ ও জাতি পরিচালিত হবে আল্লাহর বিধান দ্বারা। কারণ তিনিই রব্ব এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। পৃথিবীর ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর, অনু থেকে পরমাণু পর্যন্ত সমস্ত কিছুর রব্ব এবং একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী হলেন আল্লাহ। এ জন্যই সমস্ত প্রশংসা তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রব্ব শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। প্রতিপালনকারীকে রব্ব বলা হয়। প্রয়োজনীয় জিনিস যিনি যথাসময়ে দান করেন তাকেও রব্ব বলা হয়। যিনি ক্রমবিকাশ দাতা, দেখাশোনা করেন, পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে সক্ষম, শিখাতে পারেন, জিম্মাদার হতে পারেন, পৃষ্ঠপোষকতা করতে সক্ষম, সাহায্য করতে সক্ষম, কেন্দ্রীয়

ভূমিকা পালন করতে সক্ষম, যে সত্তাকে কেন্দ্র করে মানুষ সমবেত হয়, যিনি ভাগ্যের পরিবর্তন করতে সক্ষম, যার আইন অনুসরণ করা হয়, বিধান অনুসারে কোন কর্ম সম্পাদন করা হয়, যার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা হয়, যাকে দেখে ভয় করা হয়, যিনি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখেন, দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব ও পরামর্শ দিতে পারেন, নির্ভূলভাবে পরিদর্শন করতে পারেন, যার কর্তৃত্ব স্বীকার করা যেতে পারে, শক্তি প্রয়োগ করে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম, যার আদেশে কোন কিছু পরিচালিত হতে পারে, যার নির্দেশ পালন করা যায়, যিনি আইন জারি করতে পারেন আবার তা রদও করতে পারেন, পুরস্কার ও শাস্তি দিতে সক্ষম, আকৃতি দান করতে সক্ষম, যিনি মালিক ও মনিব এবং দৃষ্টির আড়ালে থেকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন; সৃষ্টি ও ধ্বংস করতে সক্ষম, যিনি বিচারক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অর্থাৎ এ ধরনের অসংখ্য গুণাবলীর যিনি অধিকারী–তাকে রব্ব বলা হয়।

এই রবুবিয়াতের গুণাবলী এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ভেতরে নেই। কোন মানুষের ভেতরে উল্লেখিত কতক গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেলেও এটা বুঝতে হবে যে, সে গুণ ও বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির নিজস্ব সৃষ্টি নয়–বরং তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ঐ বান্দার মধ্যে অনুগ্রহ করে দান করেছেন। আল্লাহ-রব্ব–তিনি দানকারী, তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর ঐ বান্দার মধ্যে গুণ-বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এ জন্য ঐ ব্যক্তি প্রশংসা লাভের যোগ্য নয়–প্রশংসা তো তিনিই লাভ করতে পারেন–যিনি তাঁর বান্দার মধ্যে তা দিয়েছেন।

রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির এ ক্ষমতা নেই যে, তিনি দেশ ও জাতির ওপরে কোন আইন জারি করতে পারেন। তাঁকে মহান রব্ব-এর পক্ষ থেকে এতটুকু অধিকার দেয়া হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহর দেয়া আইন দেশ ও জাতির ওপরে প্রয়োগ করবেন। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি স্বাধীন নন। আল্লাহ রব্ব হিসাবে আইন প্রয়োগের যে মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ততটুকু এবং যে পদ্ধতি প্রদর্শন করেছেন, সেই পদ্ধতিতে করতে পারেন। এর বেশী কিছু করার অর্থ হলো–তিনি স্বয়ং রব্ব হিসাবে নিজেকে দাবী করলেন।

আল্লাহর রাসূল মক্কার ইয়াহুদী ও অন্যান্য লোকদেরকে একদিন সকালে পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত করে প্রশ্ন করলেন–আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের পশ্চাৎ দিক থেকে সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত একদল শত্রু তোমাদের ওপরে হামলা পরিচালিত করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাহলে কি তোমরা আমার এ কথা বিশ্বাস করবে? সমবেত জনতা সমস্বরে জবাব দিয়েছিল, 'তুমি জীবনে কোনদিন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করোনি। অতএব তোমার এ কথা বিশ্বাস না করার কোন কারণ নেই।' তখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَنُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ–

বলো, হে আহলি কিতাব, এসো একটি কথার ওপরে আমরা মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত করি, যে কথা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমানভাবে গ্রহণীয়। সে কথা হলো, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবো না, তাঁর সাথে কারো শরীক করবো না এবং আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে রব্ব হিসাবে গ্রহণ ও স্বীকৃতি দেবো না। (ইমরাণ-৬৪)

আল্লাহর রাসূলের পবিত্র জবান মোবারক থেকে এ কথা শোনার সাথে সাথে অভিশপ্ত আবু লাহাব একটি পাথর খন্ড রাসূলের দিকে নিক্ষেপ করে বলেছিল, 'তাব্বাল্লাকা ইয়া মুহাম্মাদ আলে হাযা দাওয়াতানা ?' ধ্বংস হয়ে যাও হে মুহাম্মদ ! (নাউযুবিল্লাহ্) তুমি কি এই জন্য আমাদেরকে ডেকেছো ?

আল্লাহর রাসূল আল্লাহর শিখানো যে আয়াতের মাধ্যম্যে লোকগুলোকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন সেখানেও বলা হয়েছে, 'আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবো না এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকে রব্ব হিসাবে গ্রহণ করবো না।'

কোরআনের এ আয়াত পরিষ্কার অর্থ ব্যক্ত করছে যে, আল্লাহ্ অবশ্যই সেজদা লাভকারী এবং শুধু মাত্র তাঁরই ইবাদাত বন্দেগী করতে হবে। সেই সাথে আল্লাহকে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণকারী হিসাবে অর্থাৎ রব্ব হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। বিপদের মুহূর্তে সাহায্যের আশায় কোন মূর্তি, জ্বিন প্রভাবিত ব্যক্তি, পীর, ফকীর, মাজারের কাছে গিয়ে সাহায্য চাওয়া যাবে না। কারো আইন মানাও যাবে না এবং কাউকে আইনদাতা হিসাবে মনেও করা যাবে না। অতএব নামাজ, রোজা এবং হজ্জ যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আদায় করা হয়, সেই আল্লাহকেই আইনদাতা, বিধানদাতা, সাহায্যকারী, প্রয়োজন পূরণকারী, সন্তানদানকারী, কামনা-বাসনা পূরণকারী, প্রার্থনা কবুলকারী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামও তাঁর জাতিকে একই কথা বলেছিলেন−

إِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ-هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

আল্লাহ্ আমারও রব্ব, তোমাদেরও রব্ব। অতএব তোমরা তাঁরই দাসত্ব করো আসলে এটাই সঠিক ও সোজা পথ। (সূরা আলে ইমরাণ−৫১)

সেই সুদূর অতীতকাল থেকেই মানুষ আল্লাহকে গোটা বিশ্বের স্রষ্টা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে আসছে, এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত ছিল না। আর শুধু এটুকু কথার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য অর্থাৎ 'আল্লাহ আছেন এবং তিনি গোটা বিশ্বের স্রষ্টা' নবী ও রাসূলদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়নি এবং কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। 'আল্লাহ্ আছেন এবং তিনি গোটা বিশ্বের স্রষ্টা' মানব গোষ্ঠীর কাছ থেকে এ কথার স্বীকৃতি আদায় করার জন্য কোন একজন নবী ও রাসূলের সাথে প্রতিষ্ঠিত কায়েমী শক্তির যুদ্ধ তো অনেক পরের ব্যাপার−কোন বিতর্কই হয়নি। আল্লাহর কোরআন বলছে−

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِىْ حَاجَّ إِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ أَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ-

তুমি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করোনি, যে ব্যক্তি ইবরাহীমের সাথে বিতর্ক করছিল ? বিতর্ক হয়েছিল এ কথা নিয়ে যে, ইবরাহীমের রব্ব কে ? এবং সে বিতর্ক এ জন্য হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। (সূরা আল বাকারা-২৫৮)

তদানীন্তন সমাজের কোন সাধারণ লোক মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের সাথে আল্লাহর রবুবিয়াত নিয়ে তর্ক করেনি। অর্থাৎ যারা দেশের আইন অনুসরণ করে, জারিকৃত আইন-বিধান মেনে চলতে বাধ্য-এমন ধরনের কোন লোক তাঁর সাথে রব্ব নিয়ে বিতর্ক করেনি। সেই লোকটিই বিতর্ক করেছে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন ছিল। যে ছিল দোর্দন্ড প্রতাপশালী, প্রচন্ড ক্ষমতাধর ও রাষ্ট্রশক্তি ছিল যার হাতের মুঠোয়, যে ব্যক্তি আইন রচনা করার ও প্রয়োগ করার সুযোগ লাভ করেছিল। এখানেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নমরুদের সাথে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের সাধারণ ধর্মীয় কোন বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়নি। এ কারণেও বিতর্ক হয়নি যে, তিনি নমরুদের দরবারে গিয়ে দাবী করছেন, 'তুমি আল্লাহকে স্রষ্টা হিসাবে স্বীকৃতি দাও।' আর নমরুদ তাঁর দাবীর প্রতি কর্ণপাত করছে না। বিষয়টি এমন ছিল না। বিতর্ক হয়েছিল, দেশ ও জাতি পরিচালিত হবে কার নির্দেশে, জাতি কাকে আইনদাতা ও বিধানদাতা হিসাবে স্বীকৃতি দেবে, দেশের জনগণ কাকে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণকারী হিসাবে গ্রহণ করবে, জনগণ বিপদের মুহূর্তে কার কাছে সাহায্য ও আশ্রয় লাভের জন্য প্রার্থনা জানাবে-ইত্যাদি বিষয় অর্থাৎ কোন শক্তিকে রব্ব হিসাবে গ্রহণ করবে, তাই নিয়ে বিতর্ক চলছিল।

কোরআনের উল্লেখিত আয়াত থেকে এ কথাও প্রমাণ হয়ে গেল যে, রব্ব-এর দাবী দেশের সাধারণ কোন জনগণ করে না। এই দাবী করে তারাই, যারা রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন ক্ষমতা সম্পন্ন পদ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য থেকে সর্বোচ্চ পদ রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রের যে কোন কর্তৃত্ব যাদের হাতে থাকে; সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী পূঁজিপতি গোষ্ঠী এবং ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। ধর্ম ব্যবসায়ী এই গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদের অনুসারীদেরকে ধর্মের নামে নানা ধরনের বিধি-বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য করে। এদের সম্পর্কেই আল্লাহর কোরআন বলেছে, এরা নিজেদেরকে রব্ব-এর আসনে অধিষ্ঠিত করেছে-

اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ-

এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে নিজেদের রব্ব বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা আত তাওবা-৩১)

কিভাবে লোকজন ধর্মীয় নেতাদেরকে রব্ব বানিয়ে নিয়েছিল, বিষয়টি সম্পর্কে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আদী ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যিনি পূর্বে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি মদীনায় দরবারে রেসালাতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় তিনি জানার জন্য আল্লাহর রাসূলকে নানা ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নের ভেতরে একটি প্রশ্ন এমন ছিল যে, তিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'কোরআন বলছে-আমরা আমাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে রব্ব বানিয়ে নিয়েছিলাম। বিষয়টির তাৎপর্য আমাকে বুঝিয়ে দিন।' রাসূল

তাঁকে বলেছিলেন, 'এটা কি সত্য নয় যে, তোমাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যে জিনিসকে বৈধ বলে ঘোষণা দিত, তোমরা তাকেই বৈধ বলে মেনে নিতে। আর যে জিনিসকে অবৈধ বলে ঘোষণা দিত, তাকেই তোমরা অবৈধ বলে মনে করতে ?' হযরত আদী ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিনয়ের সাথে বললেন, 'অবশ্যই এ কথা ঠিক, আমরা অনুরূপ করতাম।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এমন করলেই তো তাদেরকে রব্ব বানিয়ে নেয় হলো।'

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ধর্মীয় নেতা বা পীর সাহেব যা বললেন, তা কোরআন-হাদীস সম্মত কিনা অথবা তারা কোরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দিলেন কিনা, তা অনুসন্ধান না করেই অন্ধের মতো অনুসরণ করার অর্থই হলো তাদেরকে রব্ব বানিয়ে নেয়া। কোরআনের আয়াত থেকে এ কথা প্রমাণ হয়ে গেল যে, আল্লাহর কোরআনের সাক্ষ্য বা সনদ ব্যতীত যেসব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মানব জীবনের জন্য বৈধ ও অবৈধের সীমা নির্ধারণ করে, তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ধারণা অনুসারে নিজেরাই রব্ব-এর আসন ও মর্যাদা দখল করে বসে। আর যারা সরব বা নীরবে সমর্থন দিয়ে তাদেরকে আইন-বিধান রচনা বা প্রয়োগ করার সুযোগ ও অধিকার দেয়, তারাই ঐসব লোকদেরকে নিজেদের রব্ব বানিয়ে নেয়।

মানুষের একমাত্র রব্ব আল্লাহ

সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। তিনি কে ? সে পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, তিনি সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব। মানুষের রব্ব সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সূরা কুরাইশে ঘোষণা করছে–

الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ–وَّاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ–

যিনি ক্ষুধার সময় আহার দান করেন এবং ভয়-ভীতির সময় নিরাপত্তা দান করেন।

স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা নিজেকে মানুষের রব্ব হিসাবে এভাবে তাঁর পরিচয় পেশ করেছেন–

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ–

প্রকৃতপক্ষে তোমাদের রব্ব সেই আল্লাহ–যিনি আকাশ ও যমীনকে ছয়টি কালে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আ'রাফ–৫৪)

অতএব প্রশংসা করতে হবে তাঁর, যিনি মানুষের জন্য এ পৃথিবী সৃষ্টি করে তা বসবাসের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই রাতের পর দিন নিয়ে আসেন, দিনের পর রাত নিয়ে আসেন। সূরা আ'রাফের ৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ–

তিনি রাতকে দিনের ওপর বিস্তার করে দেন। তারপর দিন রাতের পেছনে আবর্তিত হতে থাকে। তিনি সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন। এসব কিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

তিনিই রব্ব, মানুষের কল্যাণের জন্য তিনিই এসব কিছু করেছেন। সুতরাং, এই মানুষের ওপরে অন্য কারো ক্ষমতা নেই যে, তারা আইন-বিধান দান করে। এমন কারো ক্ষমতা নেই যে, সে নিজেকে সার্বভৌম ক্ষমতার দাবী করতে পারে। আল্লাহ্ বলেন–

اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ-تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ-

সাবধান, সৃষ্টি তাঁরই এবং সার্বভৌমত্বও তাঁরই। অপরিসীম বরকতময় আল্লাহ, সমগ্র সৃষ্টি জগতসমূহের মালিক ও প্রতিপালক। (সূরা আ'রাফ–৫৪)

আল্লাহ বলেন, আমাকে ত্যাগ করে তোমরা অন্য যাদেরকে নিজেদের বিধানদাতা, আইনদাতা, সাহায্যকারী, প্রার্থনাকবুলকারী বলে মনে করেছো অর্থাৎ রব্ব বানিয়ে নিয়েছো, তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আমি আল্লাহ যদি তোমাদের ওপরে রাতকে প্রলম্বিত করে দেই, তখন তোমরা যাদেরকে রব্ব বলে গ্রহণ করেছো, সেই শয়তানের অনুসারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, স্বার্থবাদী, দুনিয়া পুজারী পীর ও মাওলানা, যে মাজারে গিয়ে ধর্ণা দাও সে, এরা কি সক্ষম হবে রাতকে যথা নিয়মে পরিচালিত করতে ? রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীর মাধ্যমে এ ধরনের লোকদেরকে প্রশ্ন করছেন–

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ-

হে নবী ! তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছো, আল্লাহ্ যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপরে রাতকে অব্যাহত রাখেন, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন্ মাবুদ আছে তোমাদের আলো এনে দেবে ? (সূরা আল কাসাস–৭১)

মহান আল্লাহ যদি কখনো এই অবস্থার সৃষ্টি সত্যই করেন, তাহলে এ পৃথিবীতে কারো কি এমন ক্ষমতা রয়েছে, ক্ষণিকের জন্য হলেও দিন এনে দেবে ? অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর পছন্দ অপছন্দের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করে না। আল্লাহকে আইন ও বিধানদাতা বলে স্বীকৃতি দেয় না। তারা পৃথিবীর ঐ শ্রেণীর মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যারা শয়তানের গোলাম। এদের অনুসারীদেরকে বলা হচ্ছে–

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ-

তাদেরকে প্রশ্ন করো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আল্লাহ্ যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপরে দিনকে অব্যাহত রাখেন তাহলে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন্ মাবুদ আছে

তোমাদেরকে রাত এনে দেবে, যেন তোমরা তার মধ্যে বিশ্রাম করতে পারো ? তোমরা কি ভেবে দেখো না ? এটা তাঁরই অসীম অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন রাত ও দিন, যেন তোমরা রাতে শান্তি এবং দিনে নিজের রব্ব-এর অনুগ্রহ (রিয্‌ক) সন্ধান করতে পারো। (সূরা আল কাসাস–৭২-৭৩)

আল্লাহ্ বলেন, পানি ব্যতীত তোমাদের জীবন মুহূর্ত কাল চলতে পারে না। এ পানির ব্যবস্থা কি তারা করে যাদেরকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে তোমরা তাদেরকে নিজেদের রব্ব বানিয়ে নিয়েছো ? তোমরা কি বোঝ না এদের কোন ক্ষমতা নেই ? পৃথিবীর সমস্ত পানি যদি আমি শোষণ করে নেয়ার ব্যবস্থা করি, তোমরা অন্ধের মতো যাদের পেছনে ছুটছো, তারা কি তোমাদেরকে পানির ব্যবস্থা করে দিতে পারবে ? পবিত্র কোরআন বলছে–

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ–

এই লোকদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো এ কথা ভেবে দেখেছো যে, তোমাদের কূপের পানি যদি যমীনে তলিয়ে যায়, তাহলে এই পানির প্রবাহমান ধারাসমূহ তোমাদেরকে কে বের করে এনে দেবে ? (সূরা মুল্‌ক–৩০)

আল্লাহ্ হলেন এমন রব্ব যে, তাঁর কাছে কোন আবেদন-নিবেদন চিৎকার করে উচ্চকণ্ঠে বলার প্রয়োজন হয় না। উচ্চকণ্ঠে বললেও তিনি যেমন শোনেন এবং নীরবে চুপিসারে অস্ফুট কণ্ঠে বললেও তিনি শোনেন। শুধু তাই নয়, মনে মনে বললেও তিনি শোনেন। আল্লাহ্ বলেন–

لَهُ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى–وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى–اَللّٰهُ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ–

যা কিছু পৃথিবীতে ও আকাশে রয়েছে, যা কিছু পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে রয়েছে এবং যা কিছু মাটির অতল তলদেশে রয়েছে সমস্ত কিছুর মালিক তিনিই। তুমি যদি নিজের কথা উচ্চকণ্ঠে বলো, তবে তিনি তো চুপিসারে বলা কথা বরং তার থেকেও গোপনে বলা কথাও জানেন। তিনি আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। (সূরা ত্বা-হা–৬-৭-৮)

আল্লাহ্ হলেন এমন রব্ব যে তিনি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর কোন কিছু কামনা করার পূর্বে এবং কোন প্রয়োজন অনুভূত হবার পূর্বেই তার ব্যবস্থা করে থাকেন। পৃথিবীর প্রতিটি এলাকার আবহাওয়া এক নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি বিভিন্ন ধরনের। মহান আল্লাহ্ এগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশে যেসব প্রাণী রয়েছে, তা এখানের আবহাওয়া ও পরিবেশের অনুকূলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদেশের কোন প্রাণীকে যদি এমন দেশে নিয়ে যাওয়া হয়, যে দেশে বছরের প্রতিটি ঋতুতে বরফ ঝরতে থাকে। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে অবস্থান করে। তাহলে সে প্রাণী প্রচন্ড ঠান্ডায়

মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু সেদেশেও আল্লাহ ঐ একই ধরনের প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং তারা স্বচ্ছন্দে বরফের মধ্যে বসবাস করছে; বংশ বৃদ্ধি করছে। ঐ সব প্রাণী এদেশে নিয়ে এলে তারা গরমে মৃত্যুবরণ করবে। বরফাচ্ছাদিত এলাকার কুকুর আর গ্রীষ্ম প্রধান এলাকার কুকুর-এ উভয়ের দেহের তাপমাত্রা সমান নয়। শীত প্রধান দেশের যে কোন প্রাণীর দেহের তাপমাত্রা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের অনুরূপ প্রাণীর দেহের তাপমাত্রার চেয়ে অনেক বেশী। এদের দেহে পশমও অনেক বেশী। এসব প্রাণীকে ঠান্ডা থেকে হেফাজতের ব্যবস্থা কোন মানুষ করেনি, স্বয়ং আল্লাহ্ এদের দেহে বিশালাকৃতির ঘন পালক আর পশম দিয়ে ওদের জন্য স্থায়ী কম্বলের ব্যবস্থা করেছেন। যিনি এটা করেছেন তিনিই হলেন রব্ব।

আল্লাহ এমন রব্ব যে, এ বিশ্বে তিনি অসংখ্য ও অগণিত প্রাণী ও বস্তু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এসব সৃষ্টির ভেতরে কোন একটি সৃষ্টিও অসুন্দর, সৌষ্ঠবহীন ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। রব্ব-এর সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসের নিজস্ব একটি পৃথক সৌন্দর্য রয়েছে। প্রতিটি জিনিস তার নিজের স্থানে সুসামঞ্জস্য ও উপযুক্ত-উপযোগী। যে কাজের জন্য যে জিনিস তিনি প্রস্তুত করেছেন সর্বাধিক উপযোগী আকৃতিতে-সর্বাধিক কার্যকর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সহকারে প্রস্তুত করেছেন। দেখার জন্য চোখ ও শোনার জন্য কানের যে আকৃতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রস্তুত করেছেন, এর থেকে উত্তম ও উপযোগী কোন আকৃতির কল্পনাও মানুষ করতে সক্ষম নয়। বাতাস ও পানি যেসব উদ্দেশ্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন তার জন্য বাতাস ও পানি ঠিক তেমনি গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যেমন তার হওয়া উচিত। রাব্বুল আলামীন বলেন-

الَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ-ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ-ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ-

যে জিনিস তিনি সৃষ্টি করেছেন উত্তমরূপেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে, তারপর তার বংশ উৎপাদন করেছেন এমন সূত্র থেকে যা তুচ্ছ পানির মতো। তারপর তাকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করেছেন এবং তার মধ্যে নিজের রুহ্ ফুঁকে দিয়েছেন, আর তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন। (সূরা আস্ সাজদাহ্-৭-৯)

রব্ব হওয়ার যাবতীয় ক্ষমতা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ এবং সর্বাত্মকভাবে একমাত্র আল্লাহরই আয়ত্তাধীন। অতএব মানুষ কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত বা বন্দেগী করবে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী বা দাসত্ব করবে না। মহান আল্লাহ্ লালন-পালনকারী, মানুষ শুধুমাত্র তাঁরই শোকর করবে, তাঁরই কাছে দোয়া-প্রার্থনা করবে এবং ভক্তি ও ভালোবাসায় শুধু তাঁরই সামনে আনুগত্যের মাথানত করবে। আল্লাহ্ হলেন মালিক ও মুনিব। মানুষ একমাত্র তাঁরই দাস ও গোলাম হয়ে জীবন পরিচালিত করবে। তাঁর মোকাবেলায় এক মুহূর্তের জন্যেও স্বাধীন আচরণ অবলম্বন করবে না। তিনি ব্যতীত আর কারো চিন্তা, বিশ্বাস ও কর্মের দিক দিয়ে দাসত্ব স্বীকার করবে না। এরই নাম হলো ইবাদাত-প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শুধু

নামাজ-রোজা করাই ইবাদাত নয়। জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহকে রব্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় সম্পাদন করার নাম হলো ইবাদাত। আল্লাহ হলেন সার্বভৌম-নিরঙ্কুশ শাসক। একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী তিনি। মানুষ একমাত্র তাঁরই অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করবে। তাঁরই দেয়া আইন-কানুন অনুসরণ করবে। মানুষ স্বয়ং নিজেকে সার্বভৌম বলে দাবি করবে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সার্বভৌমত্ব স্বীকারও করবে না।

মহান আল্লাহ এ পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম স্বীয় আদেশে সম্পাদন করছেন। এ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ব্যাপারে অন্য কারো হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা, কেউ প্রভাব বিস্তার করে বা সুপারিশ করে আল্লাহর কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন সাধন করাবে, কারো ভাগ্যের অবনতি বা উন্নতি ঘটাবে এমন সাধ্য কারো নেই। কেউ খুব বেশী যা করতে পারে তাহলো আল্লাহর কাছে কারো জন্য দোয়া করতে পারে। সে দোয়া কবুল করা বা প্রত্যাখ্যান করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অনুগ্রহের ওপরে নির্ভরশীল। মহান আল্লাহর এই বিশাল সাম্রাজ্যে কেউ এমন শক্তিশালী নয় যে, তার কোন আবেদন আল্লাহর কাছে পেশ করে অবশ্যই বাস্তবে পরিণত করাবে। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ইউনুছের ৩ নং আয়াতে বলেন–

مَامِنْ شَفِيْعٍ اِلاَّ مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ-ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ-

সুপারিশ ও শাফায়াতকারী কেউ নেই, তবে যদি আল্লাহর অনুমতির পর শাফায়াত করে (তাহলে তা ভিন্ন কথা)। এই আল্লাহই তোমাদের রব্ব, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো।

তিনিই মানুষের রব্ব, যিনি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে মানুষের দর্শন করার ক্ষমতা, শ্রবণ করার ক্ষমতা হরণ করতে সক্ষম। তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে শুষ্ক অনুর্বর যমীন থেকে ফসল উৎপন্ন করে মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। এসব দেখেও যারা জ্বিন-মূর্তি, গণৎকার, জ্বিন প্রভাবিত লোক, ধর্মীয় নেতা ও দলীয় নেতাদেরকে রব্ব-এর গুণাবলী সম্পন্ন বলে মনে তাদের কাছে প্রশ্ন করা হচ্ছে–

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ-فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ-فَقُلْ اَفَلاَ تَتَّقُوْنَ-فَذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ-

তাদের কাছে প্রশ্ন করো, আকাশ ও যমীন থেকে তোমাদেরকে কে রিয্ক দান করে ? এই শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কার নিয়ন্ত্রাধীন ? নিষ্প্রাণ ও নির্জীব থেকে কে সজীব ও জীবন্তকে বের করে ? এই বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনা কে পরিচালনা করছে ? তারা উত্তরে অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। তাহলে (আল্লাহ বিরোধী আচরণ থেকে) তোমরা কেন বিরত থাকো না ? সেই আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত রব্ব। (সূরা ইউনুছ-৩১-৩২)

মানুষের রব্ব হলেন আল্লাহ, তাঁর সিদ্ধান্ত ব্যতীত কারো কোন ক্ষতি বা কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। লাভ-ক্ষতি, জীবন-মৃত্যুর বাগডোর একমাত্র তাঁরই হাতে। হযরত হুদ আলাইহিস্ সালামকে যখন ইসলাম বিরোধী শক্তি একের পর এক হুমকি দিচ্ছিলো, তখন তিনি তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন, তোমরা যা খুশী তাই করতে পারো। আমাকে কোন ধরনের কোন সুযোগ না দিয়ে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে থাকো। আমি সেই আল্লাহরই ওপর নির্ভর করছি, যিনি শুধু আমারই রব্ব নন-তোমাদেরও রব্ব। এ ঘটনা পবিত্র কোরআন এভাবে পেশ করছে-

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَ تُنْظِرُوْنِ-اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ-مَامِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ هُوَاٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا-اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

তোমরা সবাই একতাবদ্ধ হয়ে আমার বিরুদ্ধে যা করতে চাও তা করতে পারো, আমাকে কোন সুযোগ দিও না। আমি নির্ভর করি আল্লাহর ওপর, যিনি আমারও রব্ব আর তোমাদেরও রব্ব। কোন জীব এমন নেই, যার মাথা তাঁর মুষ্ঠিতে নিবদ্ধ নয়। নিঃসন্দেহে আমার রব্ব সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (সূরা হুদ- ৫৫-৫৬)

যিনি বিপদের মুহূর্তে মানুষের সহায় হন এবং মানুষকে আশ্রয় দেন, বিপদমুক্ত করেন-তিনিই হলেন রব্ব। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীগণ যখন মক্কায় চরমভাবে নির্যাতিত হচ্ছিলেন, এমন প্রচন্ড হুমকি দেয়া হচ্ছিলো যে, ইসলামী আন্দোলন ত্যাগ না করলে কাউকে জীবিত রাখা হবে না। ঠিক এ অবস্থায় মহান আল্লাহ তাঁর নবী ও নবীর সাহাবাদেরকে আদেশ দিলেন, ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীকে স্পষ্ট জানিয়ে দিন-

قُلْ هُوَ رَبِّىْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ-عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ-

তাদেরকে বলো, তিনিই আমার রব্ব, তিনি ছাড়া আমার আর কোন মাবুদ নেই, তাঁরই ওপর আমি নির্ভর করেছি এবং তিনিই আমার সহায় ও আশ্রয়। (সূরা আর-রা'দ-৩০)

অতএব নামাজের মধ্যে সূরা ফাতিহা বার বার পাঠ করলেই ইবাদাতের হক আদায় হবে না, সূরা ফাতিহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। তাহলে সূরা ফাতিহা পাঠ করলে সফলতা অর্জন করা যাবে। একদিকে সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত পাঠ করে বলা হলো, 'তুমিই আমার আল্লাহ, তুমিই আমার রব্ব, আমরা একমাত্র তোমারই প্রশংসা করি' আবার নামাজ শেষ করেই এমন দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করা হলো, এমন দলের পক্ষে ভূমিকা পালন করে সে দলকে ভোট দেয়া হলো, যারা 'আল্লাহ' নামটি উচ্চারণ করার মতো শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে 'স্রষ্টা' শব্দ উচ্চারণ করে। 'বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম' উচ্চারণ না করে 'করুণাময় স্রষ্টার নামে শুরু করছি' উচ্চারণ করে। কোন বিপদ এলে বা মনের কোন

আশা পূরণের জন্য ছুটে গেল মাজারে ও পীরের দরবারে। নানা ধরনের মানত মানা হলো, টাকা দেয়া হলো বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য। এসব কাজ করার অর্থই হলো প্রকারান্তরে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের উদ্দেশ্যে এসব করা হলো, তাদেরকেই রব্ব হিসাবে গ্রহণ করা। মুখে আল্লাহকে রব্ব বলে স্বীকৃতি দিয়ে কাজে কর্মে অন্য কাউকে রব্ব হিসাবে মেনে চলার পরিষ্কার অর্থ হলো মুনাফেকী। অতএব, মুসলমানদেরকে মুনাফেকী ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকেই রব্ব হিসাবে অনুরসণ করতে হবে। তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সেই বান্দার প্রশংসা গ্রহণ করবেন নতুবা নয়।

মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুর রব্ব আল্লাহ

সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর-যিনি সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব। পৃথিবীর মানুষ যেন আল্লাহ তা'য়ালাকে রব্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে একমাত্র তাঁরই বিধান অনুসরণ করে, এ জন্য নবী-রাসূলদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল আগমন করে তাঁদের জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন–

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ–

হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। (সূরা আল আ'রাফ–৫৯)

এ কথার শোনার সাথে সাথে ঐ শ্রেণীর লোকগুলো প্রথমে প্রতিবাদ করেছে, যারা মুখে দাবী না করলেও নিজেদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতো যে, 'আমরাই সমাজ, দেশ ও জাতির সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী অর্থাৎ রব্ব।' এই লোকগুলোই নবী-রাসূল এবং পরবর্তী যুগে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দেশের অজ্ঞ-নিরক্ষর জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। নবী-রাসূলদের ও ইসলামের পক্ষের লোকদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানো হতো, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হতো, প্রলোভন দেখানো হতো, অর্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে সত্য গ্রহণ ও অনুসরণে বাধা সৃষ্টি করা হতো। জনগণকে বিভ্রান্ত করার কাজে, অতীতে যে পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো বর্তমানে আরো অধিক শক্তিশালী পন্থায় রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং দেশের 'সুশিল সমাজ' বলে দাবীদার লোকদের পক্ষ থেকে সেই ঘৃণিত কাজের আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে।

হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে তৎকালীন জাতির জাতীয় নেতারা বলতো, 'এই লোকটি আমাদের জাতিকে বিভ্রান্ত করতে চায়। সে জাতীয় উন্নতি ও প্রগতির চাকাকে পেছনে ঘুরিয়ে দিতে চায়। সে যে আদর্শের কথা বলছে, তা গ্রহণ করলে জাতির চরম অবনতি ঘটবে। লোকটি নিজে স্বয়ং বিভ্রান্ত এবং গোটা জাতিকেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম সেসব নেতাদের কথার উত্তরে বলেছিলেন–

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ

الْعَالَمِيْنَ-أُبَلِّغُكُمْ رِسلْتِ رَبِّيْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ-

নূহ বললো, হে আমার জাতি ! আমি কোন ধরনের ভ্রষ্টতায় লিপ্ত নই, আমি তো তাঁরই রাসূল-যিনি সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব। আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর পয়গামসমূহ পৌঁছে দিয়ে থাকি, আমি তোমাদের কল্যাণকামী। আমি আল্লাহর কাছ থেকে সেসব বিষয় জানি, যা তোমাদের জানা নেই। (সূরা আ'রাফ-৬১-৬২)

আল্লাহর নবী হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম তাঁর জাতির কাছে আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে এ কথা বলেননি যে, তিনি তোমাদের ও আমার রব্ব-বরং তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ হলেন গোটা সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব। তোমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান যা কিছু দেখছো শুধু এগুলোই নয়-যা তোমরা দেখতে পাওনা এমন অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে, তারা সব সেই আল্লাহকেই একমাত্র রব্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরই বিধান অনুসরণ করছে।'

তাঁকে সে জাতির নেতৃবৃন্দ যে ধরনের ধৃষ্টতামূলক কথা বলেছিল এবং যেভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিল, বর্তমানেও ইসলামের পক্ষের শক্তি সম্পর্কে দেশের জনগণকে একশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ সেই একই কৌশলে বিভ্রান্ত করছে। ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে দেশের তথাকথিত সুশিল সমাজ সেই পুরনো ধারণাই দিচ্ছে যে, এরা দেশের ক্ষমতায় গেলে উন্নতির চাকা পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দেবে। এই লোকগুলো নিজেদেরকে জাতির রব্ব বলে অন্তরে ধারণা পোষণ করে, কিন্তু প্রকাশ্যে সে দাবী করার মতো সাহস তাদের নেই, এ কারণে এরা ভাষাগত কৌশলের আশ্রয় নিয়ে জনগণের সাথে প্রতারণা করে থাকে। কারণ এরা জানে যে, ইসলাম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তাদের রবুবিয়াত উৎখাত হয়ে যাবে। এ জন্য এসব লোক নিজেদের প্রভুত্ব বা রবুবিয়াত প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে ইসলামকে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক, সেকেল ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করছে এবং ইসলামপন্থীদেরকে সন্ত্রাসী এবং সমাজের নিকৃষ্ট মানুষ হিসাবে পরিচিত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

ইতিহাসে দেখা যায়, 'আদ জাতির ভেতরে হযরত হুদ আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহর বিধানসহ প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি সে জাতিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন-

يقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ-

হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। (সূরা আল আ'রাফ-৬৫)

তিনি যখন তাঁর জাতিকে এ কথা বলে আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন. তখন সে জাতির জাতিয় নেতা বলে দাবীদারগণ কি বলেছিল, মহান আল্লাহ তা শোনাচ্ছে-

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنَرَاكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ-

তাঁর জাতির নেতৃবৃন্দ–যারা তাঁর আহ্বান গ্রহণ করতে অস্বীকার করছিলো–তারা জওয়াবে বললো, আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত বলে মনে করি। আর আমাদের ধারণা এই যে, তুমি মিথ্যাবাদী। (সূরা আল আ'রাফ–৬৬)

হযরত হুদ আলাইহিস্ সালামও তাদের কাছে মহান আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরে বলেছিলেন, তিনিই আল্লাহ–যিনি তোমাদের ও আমারই শুধু রব্ব নন, তিনি সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব। তিনিই সমস্ত কিছুর প্রয়োজন পূরণ করছেন এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সবাই তাঁরই বিধান অনুসরণ করছে। তিনি তাঁর জাতিকে জানিয়ে দিলেন–

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ-اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ-

হে আমার জাতি ! আমি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত নই, বরং আমি তাঁরই রাসূল যিনি সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব। আমি তোমাদের কাছে আমার আল্লাহর পয়গাম পৌছে দিই। আমি তোমাদের এমন কল্যাণকামী যে, আমার ওপরে নির্ভর করতে পারো। (সূরা আল আ'রাফ–৬৭-৬৮)

আল্লাহর নবী হযরত হুদ আলাইহিস্ সালাম তাঁর জাতিকে এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা এমন সব নেতাদের অনুসরণ করো, যাদের কাছে চরিত্রের বালাই নেই। নিজের স্বার্থ ছাড়া তারা আর কিছুই বোঝে না। এরা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যে কোন ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করতে পারে। এদের বিবেক বলে কিছুই নেই। এরা এ কথাও বিশ্বাস করে না যে, এদের যাবতীয় কাজ কর্মের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে। এরা যা কিছুই করে তা একমাত্র নিজেদের স্বার্থের কারণে করে। অতএব এদেরকে কখনো বিশ্বাস করা যায় না এবং এদের ওপরে নির্ভরও করা যায় না। আমার ওপরে নির্ভর করতে পারো তোমরা। কারণ সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তোমাদের কল্যাণের জন্যেই প্রেরণ করেছেন। তোমাদেরকে সত্য পথপ্রদর্শনের জন্যেই আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আমি আল্লাহর নবী, একমাত্র নির্ভরযোগ্য নেতৃত্ব। কোন বৈষয়িক স্বার্থ আমার নেই এবং আমার নেতৃত্বের ওপরে ঈমান এনে প্রতারিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামও তদানীন্তন যুগের জালিম রাষ্ট্রপতি ফেরাউনের সামনে আল্লাহর রবুবিয়াত সম্পর্কে বলেছিলেন–

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ-حَقِيْقٌ

عَلَى اَنْ لاَّ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ-قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ-

হে ফেরাউন, আমি সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি, যিনি সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব। আমার পদ-মর্যাদাই হলো, আল্লাহর নামে আমি প্রকৃত সত্য ব্যতিত অন্য কোন কথা বলি না। আমি তোমাদের রব্ব-এর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিয়োগ-প্রমাণ নিয়ে এসেছি (সূরা আ'রাফ)

ফেরাউন নিজেকে রব্ব বলে ঘোষণা করেছিল। আর হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম সেই জালিম স্বঘোষিত রব্ব-এর সামনে প্রকৃত রব্ব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রবুবিয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। ফেরাউন কর্তৃক নিয়োজিত যাদুকরবৃন্দ হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে প্রকৃত রব্ব-এর পরিচয় যখন লাভ করেছিলেন, তখন তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার সময় ঘোষণা করেছিলেন–

قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ-رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ-

আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের রবের প্রতি–যিনি মুছা ও হারুনেরও রব। (সূরা আ'রাফ)

আল্লাহর কিতাব–এই কোরআনের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ নিজের রবুবিয়াত সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন–

وَتَفْصِيْلَ الْكِتَابِ لاَرَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ-

এই কিতাব যে সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব-এর পক্ষ থেকে এসেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। (সূরা ইউনুছ–৩৭)

মহান আল্লাহর রবুবিয়াতের বর্ণনায় আল্লাহর এই কোরআন পরিপূর্ণ। তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। মানুষ এমন সব শক্তিকে নিজের রব্ব বানিয়ে নেয়, যাদের কোনই ক্ষমতা নেই। এই লোকদেরকে প্রশ্ন করার জন্য আল্লাহ বলেন–

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ-قُلِ اللّٰهُ-قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ لاَ يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلاَ ضَرًّا-

এই লোকদেরকে প্রশ্ন করো, আকাশ ও যমীনের রব্ব কে ? বলো, আল্লাহ। এরপর তাদেরকে বলো, এটাই যখন প্রকৃত ব্যাপার, তখন তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব মাবুদকে নিজেদের কর্মকর্তা মেনে নিয়েছো, যারা স্বয়ং নিজেদেরও কোন ধরনের উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। (সূরা আর রা'দ–১৬)

আল্লাহ ব্যতীত কোন পীর-দরবেশকে ও মাজারে সিজ্দা করা যেমন শির্ক, তেমনি তাদের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করা এবং মনের একান্ত কামনা-বাসনা পেশ করাও শির্ক। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার কাছে দোয়া চাওয়া বা তাকে সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানানোও

শির্ক। দোয়া ও সাহায্য চাওয়াও মূলতঃ তাত্ত্বিক বিচারে ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত। অতএব আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রার্থনাকারী একজন মূর্তিপূজকের অনুরূপ সমান অপরাধী। তাছাড়া আল্লাহ ব্যতীত কারো কোন কল্যাণ সাধন করা বা ক্ষতি করার সামান্য ক্ষমতা নেই। অন্য কেউ কোন আপদ-বিপদ থেকে নিরাপত্তা দিতে পারে না এবং কোন খারাপ অবস্থাকে ভালো অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতেও পারে না। আল্লাহ ব্যতীত কোন পীর-দরবেশ বা মাজার সম্পর্কে এ ধরনের বিশ্বাস অন্তরে লালন করা একটি মুশরিকী বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ বলেন-

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلاَ يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّعَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيْلاً-اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ-اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا-

এদেরকে বলো, আহ্বান করে দেখো তোমাদের সেই মাবুদদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কার্যোদ্ধারকারী মনে করো, তারা তোমাদের কোন কষ্ট দূর করতে পারবে না এবং তা পরিবর্তন করতেও পারবে না। এরা যাদেরকে ডাকে তারা তো নিজেরাই নিজেদের রব্ব-এর নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান করে ফিরছে যে, কে তাঁর নিকটতর হয়ে যাবে এবং এরা তাঁর রহমতের প্রত্যাশী এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত। আসলে তোমার রব্ব-এর শাস্তি ভয় করার মতো। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫৬-৫৭)

হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম ফেরাউনকে বার বার সতর্ক করলেন যে, আল্লাহকে রব্ব বলে মেনে না নিলে তিনি ভয়ঙ্কর গযব পাঠাবেন। তবুও ফেরাউন তার নিজের দাবীতে অটল রইলো। সে নিজের চোখে দেখলো, লক্ষ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকায় পঙ্গপাল এক মহাধ্বংসের বিভীষিকা নিয়ে এলো, ক্ষেত-খামারের মারাত্মক ক্ষতি হলো। ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আর এটা যে হবে, সে ব্যাপারে হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম পূর্বেই সতর্ক করেছিলেন। এরপর দেশ জুড়ে ব্যাঙ বের হয়ে জন-জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলা, খাদ্য গুদামে পোকা লেগে খাদ্য বিনষ্ট হওয়া বা এ ধরনের অন্যান্য জাতীয় দুর্যোগ দেখা দেয়া কোন ঐন্দ্রজালিকের কৃত্রিম শক্তি নয়, এটা কোন মানুষের ক্ষমতা নয়-এ কথা ফেরাউন ঠিকই অনুভব করেছিল। আল্লাহই যে একমাত্র রব্ব-এ কথা অনুধাবন করার পরেও ফেরাউন শক্তির দাপট দেখিয়ে যাচ্ছিলো এবং দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামকে একজন যাদুকর বলে প্রচার করছিল।

বর্তমান যুগেও যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করে, তারাও অবশ্যই অনুধাবন করে যে, কেবলমাত্র ইসলামই সক্ষম সমস্ত সমস্যার ইনসাফপূর্ণ সমাধান দিতে। জেনে বুঝেই তারা বৈষয়িক স্বার্থে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের

সাথে বিরোধিতা করে-মৌলবাদী বলে গালি দেয়। ফেরাউনও জানতো হযরত মুছা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হিসাবেই আগমন করেছেন এবং তিনি যেসব নিদর্শন প্রদর্শন করছেন, তা আল্লাহর নির্দেশেই করছেন। তবুও বৈষয়িক স্বার্থের কারণে সে হযরত মুছা কর্তৃক প্রদর্শিত নিদর্শনগুলোকে যাদু বলে প্রচার করছিল। তখন হযরত মুছা ফেরাউনকে বলেছিলেন-

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ-وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثْبُورًا-

ফেরাউনের অপবাদের উত্তরে মুছা বললো, তুমি খুব ভালো করেই জানো যে, এ প্রজ্ঞাময় নিদর্শনগুলো আকাশ ও পৃথিবীর রব্ব ব্যতীত আর কেউ অবতীর্ণ করেনি আর আমার মনে হয় হে ফেরাউন ! তুমি নিশ্চয়ই একজন হতভাগ্য ব্যক্তি। (সূরা বনী ইসরাঈল-১০২)

হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিজগতের নির্দিষ্ট কোন কিছুর রব্ব নন-বরং তিনি এ মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বের যেখানে যা রয়েছে সমস্ত কিছুর রব্ব। তাঁর অসীম ক্ষমতা দেখেও তুমি যখন সোজা পথে এলে না, তাঁকে রব্ব বলে স্বীকৃতি দিলে না, তাহলে তুমি অবশ্যই একজন কপাল পোড়া-তোমার থেকে দুর্ভাগা আর হতভাগা আর কেউ হতে পারে না।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আস্হাফে কাহ্ফের সেই সাতজন যুবকের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সে যুবকগুলো একমাত্র আল্লাহকে ব্যতীত আর কাউকে রব্ব হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। সে সময়ের জালিম সম্রাট কাইজার ডিসিয়াস তাদেরকে দরবারে তলব করে প্রশ্ন করেছিল, 'বলো, তোমাদের রব্ব কে ?' তাঁরা নির্ভীক চিত্তে জবাব দিয়েছিল-

رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَّدْعُوْ مِنْ دُوْنِهِ إِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا-

আমাদের রব্ব তো কেবল তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব্ব। আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন মাবুদকে ডাকবো না। যদি আমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে মাবুদ ডাকি, তাহলে তা হবে নিরর্থক। (সূরা আল কাহ্ফ-১৪)

আস্হাবে কাহ্ফের সেই যুবকগুলো জানতো, এ কথা বললে তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। কিন্তু তাঁরা প্রাণের মায়া করেনি। তাঁরা এ কথা অনুভব করেছিল, 'পৃথিবীর জীবন একবারই পাওয়া যায়, দু'বার এই সুযোগ জুটবে না। অতএব যে জীবনে আল্লাহকে রব্ব বলে স্বীকৃতি দেয়া হলো না সে জীবনের কোন মূল্য নেই। আল্লাহকে আইনদাতা, বিধানদাতা তথা যে কোন প্রয়োজন পূরণকারী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকেই অনুসরণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা।'

এ জন্য তাঁরা যে কোন পরিস্থিতিকে স্বাগত জানিয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিল একমাত্র আল্লাহকেই রব্ব হিসাবে গ্রহণ করে তাঁরই দাসত্ব করবো। আর এ পথে যদি নির্যাতন আসে, মৃত্যু হয়-মৃত্যুকেই হাসি মুখে বরণ করবো। তবুও একমাত্র আল্লাহকে ব্যতীত আর কাউকে রব্ব বলে স্বীকৃতি দেবো না। হযরত ইবরাহীম যখন তাঁর জাতির নেতৃবৃন্দকে বলেছিলেন, তোমরা যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মাটির পুতুল এবং অন্যান্য জিনিসকে নিজেদের রব্ব হিসাবে গ্রহণ করে তাদের পূজা-অর্চনা করছো, তাদের প্রতি সীমাহীন ভক্তি প্রদর্শন করছো। তাদেরকেই ইলাহ বলে মনে করছো আসলে এগুলো কিছুই নয়।

তাঁর জাতির লোকজন তাঁকে জবাব দিয়েছিল, আমরা আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদেরকে এদেরই ইবাদাত করতে দেখেছি। আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম নির্ভীক চিত্তে বলিষ্ঠ কণ্ঠে জবাব দিলেন, তোমরাও যেমন পথভ্রষ্ট তেমনি তোমাদের বাপ-দাদা এবং পূর্ব পুরুষগণও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল। তদানীন্তন যুগের জাতিয় নেতৃবৃন্দ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের কথায় বিস্মিত হয়ে ভেবেছিল, তিনি বোধহয় কৌতুক করে এসব কথা বলছেন। এ জন্য তারা প্রশ্ন করেছিল-

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ-

ইবরাহীম ! তুমি কি আমাদের সামনে তোমার মনের প্রকৃত কথা বলছো, না নিছক কৌতুক করছো ? (সূরা আল আম্বিয়া-৫৫)

হযরত ইবরাহীমের কথা শুনে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিল। তারা এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি যে, রাজপুরোহিতের সন্তান হয়ে কেউ এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারে। আসলে এটা ইবরাহীমের মনের কথা নয়, কৌতুক করে সে এসব কথা বলছে। কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম স্পষ্ট কণ্ঠে রব্ব হিসাবে আল্লাহর পরিচয় জানিয়ে দিলেন-

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ-وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ-

না, আমি মোটেও কৌতুক করছি না। বরং আসলে তোমাদের রব্ব তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব্ব এবং এদের স্রষ্টা এবং এ কথার স্বপক্ষে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। (আম্বিয়া-৫৬)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর জাতিকে জানিয়ে দিলেন, তোমরা যাদেরকে রব্ব বলে মনে করছো এবং তাদের ইবাদাত করছো, আসলে এগুলো রব্ব নয়, রব্ব কারো সৃষ্টি হতে পারে না-তিনি স্বয়ং স্রষ্টা। তিনিই তোমাদের রব্ব, যিনি তোমাদের মাথার ওপরে আকাশ সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবী সৃষ্টি করে তোমাদের জন্য এ পৃথিবীকে কল্যাণময় করে দিয়েছেন। তোমরা যাদেরকে রব্ব বলে মনে করছো, আমার আল্লাহ্ এগুলোরও রব্ব।

তিনিই রব্ব, সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী। গোটা সৃষ্টি জগতের একটি অনু-পরমাণুর ক্ষমতা নেই যে, তাঁর অনুমতি ব্যতিত নড়াচড়া করতে পারে। তিনিই মানুষকে কথা বলতে এবং

লিখতে পড়তে শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন এবং সমস্ত সৃষ্টিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। সূরা আম্বিয়ার ৯২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ–

আর আমিই তোমাদের রব্ব। অতএব তোমরা আমারই দাসত্ব করো।

এমন এক শক্তিকেই তো অবলম্বন করা উচিত–যা অবিনশ্বর, যাঁর ক্ষমতা অপরিসীম। যিনি কখনো ধ্বংস হবেন না, তাঁকেই অবলম্বন করে জীবন পরিচালিত করা উচিত। এমন কোন ঠুনকো শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, যা ধ্বংসশীল–একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহকে যারা রব্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরই অনুসরণ করে তারা এমন এক রবের প্রতি নির্ভর করেছে যিনি কখনো নিঃশেষ হয়ে যাবেন না। আল্লাহ বলেন–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ –وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ–

এই পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই ধ্বংসশীল এবং শুধুমাত্র তোমার মহীয়ান গরীয়ান রব্ব-এর মহান সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে। (সূরা আর রাহমান–২৬-২৭)

কোন শক্তিই পৃথিবীতে টিকে নেই। বিরাট পরাক্রমশালী শক্তি আদ জাতি, ছামুদ জাতি, নমরুদ, ফেরাউন এবং সাদ্দাদ কত বিরাট শক্তির অধিকারী ছিল। ইতিহাসের পৃষ্ঠা এমন অসংখ্য জালিম নায়ক কলঙ্কিত করেছে যাদের শক্তির দাপটে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মানুষ ঐসব শক্তির সামনে আঙ্গুল উঁচু করতে সাহস পায়নি। তারা সব ইতিহাসের আস্তাকুড়োয় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত পৃথিবীর মাটি থেকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। কেউ এ কথা বলার মতো সাহস করে না যে, 'নমরুদ বা ফেরাউন আমার পূর্বপুরুষ ছিল।' অর্থবল ও জনবল, বাহুবল ও অস্ত্রবল এবং জনপ্রিয়তা দেখে মানুষ যাদেরকে বিরাট ক্ষমতাধর-শক্তিশালী মনে করে, এরা সবই মাকড়সার জালের মতই ভঙ্গুর। আল্লাহর শক্তির সামনে এরা একটি মাছির পাখার শতকোটি ভাগের এক ভাগ শক্তির অধিকারীও নয়।

কোন পীর, বুযর্গ–সাধারণ মানুষ যাদেরকে আল্লাহর ওলী বলে মনে করে এবং ধারণা পোষণ করে যে, তাকে সন্তুষ্ট করলেই তিনি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে তিনি আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারেন। আমার মনের কামনা-বাসনা তিনি পূরণ করার ব্যবস্থা করতে পারেন। এসব ধারণা মানুষের নিছক কল্পনা বৈ আর কিছু নয়। পৃথিবীর মানুষ তো অদৃশ্য জগতের কোন দৃশ্যই দেখতে পায় না। কিন্তু আল্লাহর ফেরেশতাগণ–যাঁরা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর আদেশ পালনে রত আছেন। তাঁরাও আল্লাহর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকেন। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তাঁরাও কোন কথা বলতে পারবেন না। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করেছে এবং তা দেশ ও জাতিয় জীবনে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন করেছে, আখিরাতের ময়দানে তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করে বলা হবে–

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لاَ يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا-يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا-لاَّ يَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا-

তোমাদের রব্ব-এর পক্ষ থেকে, সেই অতীব দয়াবান আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি যমীন ও আকাশসমূহের এবং দুটোর মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি জিনিসের একচ্ছত্র মালিক, যাঁর সাথে কথা বলার সাহস কারো হবে না। যেদিন রুহ ও ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, কেউ-ই কোন কথা বলবে না-সে ব্যতীত, যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দেবেন। (সূরা নাবা)

তিনিই রব্ব-যিনি অসীম অনুগ্রহশীল

তিনি শুধু মুসলমান বা মানুষেরই রব্ব নন, এই সৃষ্টি জগতসমূহ এবং এর ভেতরে যা যেখানে অবস্থান করছে, তার সমস্ত কিছুরই মালিক, প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রণকর্তা। একমাত্র তাঁরই প্রশংসা ও তস্‌বীহ্ করতে হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ-

অতএব হে নবী ! তোমার মহামহিম রব্ব-এর নামের তস্‌বীহ করো। (সূরা আল হাক্কাহ্-৫২)

মহান আল্লাহ হলেন রাব্বুল আযীম। তিনি মহাসম্মানিত এবং অসীম মর্যাদার অধিকারী। তাঁকে কিভাবে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতে হবে তা মানুষ জানতো না। তিনিই এতই অনুগ্রহশীল যে, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক হীন ও নগণ্য অবস্থা থেকে। অপবিত্র এক কাত্‌রা পানি থেকে তিনি এই সুন্দর মানুষের অস্তিত্ব দান করেছেন। তাকে কথা বলতে শিক্ষা দিয়েছেন। কিভাবে তাঁর প্রশংসা করতে হবে কোরআন অবতীর্ণ করে তা শিখিয়েছেন। অপরিসীম নির্ভুল জ্ঞানের ভান্ডার কিতাব দান করেছেন। তিনি মানুষকে এক নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে মায়ের পেটে বর্ধিত করেছেন, তাকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিবেকসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ সত্তায় পরিণত করেছেন। জ্ঞান আর বিবেকই হলো সৃষ্টিলোকের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ গুণ ও বৈশিষ্ট্য। এসব তিনি মানুষকেই দান করেছেন। এটা আল্লাহ্ তা'য়ালার এক বিশেষ অবদান, অতিবড় অনুগ্রহ এবং মহান অনুগ্রহের ফলশ্রুতি।

মহামহিম রব্ব-এর প্রশংসা করে শেষ করা তো দূরের কথা, আল্লাহর প্রশংসা যেখানে শুরু-সেখানেই মানুষ পৌছতে সক্ষম নয়। তিনি রাব্বুল আকরাম। কোরআন বলছে-

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ-الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ-

পড়ো, আর তোমার রব্ব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন।

রাব্বুল আলামীন যে কত বড় অনুগ্রহশীল, তা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তিনি মানুষকে জ্ঞান-বিবেক দান করেছেন। সেই সাথে কলমের ব্যবহার তথা লেখার কৌশল শিক্ষা

দিয়েছেন। কারণ জ্ঞান আর কলম–এ দুয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। একটি ছাড়া আরেকটি চলতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার-প্রসার, বিস্তার, উন্নয়ন এবং বংশানুক্রমে জ্ঞানের উত্তরাধিকার সৃষ্টি, জ্ঞানের বিকাশ সাধন, জ্ঞানের সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব–এসবের মাধ্যম বানিয়েছেন কলমকে। কিভাবে কলম আবিষ্কার করতে হবে এবং তার ব্যবহার পদ্ধতি কি হবে, এ চেতনা যদি তিনি মানুষের মনের মধ্যে জাগ্রত করে না দিতেন তাহলে মানুষের জ্ঞানার্জন এবং বিস্তারের যাবতীয় সৃষ্টিগত যোগ্যতা-প্রতিভা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যেতো। জ্ঞানের বিকাশ ও উন্নয়ন এবং তা এক জাতি থেকে আরেক জাতি, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছানো যেতো না। শত সহস্র শতাব্দী ধরে জ্ঞান সংরক্ষণ করে তা দিয়ে মানবতা উপকৃত হতে পারতো না। তিনি রাব্বুল আকরাম–তিনিই অনুগ্রহ করে কলমের ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন।

তিনি মহান–তিনিই রাব্বুল কারীম। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত মানুষ তাঁর অসীম করুণায় সিক্ত হচ্ছে। তাঁর করুণা ব্যতীত মানুষের পক্ষে একটি মুহূর্তও জীবিত থাকা সম্ভব নয়। তিনি মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ–

হে মানুষ ! কোন্ জিনিস তোমাকে তোমার সেই মহান রব্ব-এর ব্যাপারে ধোঁকায় নিমজ্জিত করেছে ? (সূরা ইনফিতার-৬)

নিজের জীবনে এবং সৃষ্টিজগৎ ব্যাপী প্রতি মুহূর্তে তোমরা দেখছো, আমার করুণা কিভাবে বৃষ্টি ধারার মতই বর্ষিত হচ্ছে, এসব দেখেও কেন তোমরা আমার দাসত্ব করার ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করছো, কেন তোমরা ধোঁকায় নিমজ্জিত হচ্ছো ? সমস্ত সৃষ্টির ভেতরে আমিই ভারসাম্য দান করেছি। অতএব আমার দাসত্ব করো এবং আমার নামের তস্‌বীহ করো। আল্লাহ বলেন–

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى–الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى–

তোমার মহান শ্রেষ্ঠ রব্ব-এর নামের তস্‌বীহ্ করো। যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্যতা স্থাপন করেছেন। (সূরা আ'লা–১-২)

এই মানুষের মালিক স্বয়ং মানুষ নয়, তাঁর মালিকও হলেন সেই আল্লাহ যিনি গোটা সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব। মানুষকে একমাত্র তাঁরই আশ্রয় কামনা করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ–مَلِكِ النَّاسِ–اِلٰهِ النَّاسِ –

বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব্ব, মানুষের মালিক-বাদশাহ, মানুষের মা'বুদের কাছে।

মানুষের মালিক মানুষ স্বয়ং নয়, তার মালিক হলেন আল্লাহ। এ জন্য তার অধিকার নেই যে, সে তার মালিককে অস্বীকার করে নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে পৃথিবীতে জীবন অতিবাহিত

করে। তাঁর যে মালিক ও স্রষ্টা, তাঁরই দাসত্ব এবং যাবতীয় ব্যাপারে তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কিতাব ঘোষণা করছে–

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ-

বলো, আমি আশ্রয় চাই রাব্বুল ফালাকের কাছে। (সূরা ফালাক-১)

সূরা ফালাক আল্লাহর কিতাবের ত্রিশ পারার ছোট্ট একটি সূরা। এ সূরাটি অধিকাংশ মুসলমানের মুখস্থ রয়েছে। নামাজে এটি বার বার পাঠ করা হয়। এ সূরার প্রথম আয়াতে ফালাক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সাথে রব্ব শব্দ সহযোগে উচ্চারিত হয়েছে, 'রাব্বুল ফালাক'। রাব্বুল ফালাক কাকে বলা হয়–বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝতে হবে। আরবী ফালাক শব্দের ক্রিয়ামূল হলো 'ফুল্‌কু'। এর অর্থ হলো 'যে চিরে ফেলে।' আর ফালাক শব্দের অর্থ হলো, কোন কিছু দীর্ণ করা বা চিরে ফেলা। সূরা আল আন্‌আ'মের ৯৬ আয়াতে 'ফলিকুল ইস্‌বাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং আল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনিই রাতের আবরণ দীর্ণ করে রঙিন প্রভাতের উন্মেষ ঘটান।' আর সূরা ফালাকের প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত 'রাব্বুল ফালাক' শব্দের সরল অর্থ হলো, 'প্রভাত কালের রব্ব'।

পৃথিবীতে এক একটি দেশে প্রভাত কিভাবে হয়? রাতের নিকষ কালো অন্ধকার ভেদ করে পূর্ব গগনে তরুণ তপন উদিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রভাত হওয়া বলে। অর্থাৎ অন্ধকারের বুকচিরে নবারুণের আগমন ঘটে। আর এই প্রক্রিয়াকে আরবী ভাষায় বলা যেতে পারে, ফালাকুস্ সুবাহ্ অর্থাৎ প্রভাত সূর্যের উদয়। এই ফালাক শব্দের আরেকটি অর্থ করা হয়েছে 'সৃষ্টিকার্য সমাধা করা।' এই অর্থ এ জন্য করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে যত কিছুই সৃষ্টি হয়, তা কোন না কোন জিনিস বা আবরণ ভেদ করে, দীর্ণ করেই সৃষ্টি হয়। তিমিরাবৃত রজনীর বুকচিরেই দূর নিহারিকা কুঞ্জের মিটিমিটি আলো পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছায়। উত্তাল সাগরের বুক চিরেই জলযানসমূহ গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়। খেজুর গাছে সুমিষ্ট রসের ভান্ডার মওজুদ থাকলেও তা নির্গত হয় না। খেজুর গাছকে যখন দীর্ণ করা হয়, তখনই রস বেরিয়ে আসে। রাবার গাছসমূহ দীর্ণ করা না হলে রাবার পাওয়া যায় না। ডাবের পানি পান করতে হলেও তা দীর্ণ করতে হবে। পৃথিবীর উদ্ভিদ বীজসমূহ মাটির বুকচিরেই তার অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। উদ্ভিদ মাটি দীর্ণ করেই পৃথিবীর আলো বাতাসে বেরিয়ে আসে।

ডিমের মাধ্যমে বংশধারা টিকিয়ে রাখার জন্য পৃথিবীতে যেসব প্রাণী ডিম দেয়, সেই ডিম দীর্ণ করেই শাবক পৃথিবীতে বেরিয়ে আসে। কুমিরের মতো বিশাল প্রাণীর বাচ্চাও ডিম চিরেই ভূমিষ্ঠ হয়। নদী-সাগর-মহাসাগরে যেসব প্রকান্ড মাছ বাস করে, সেসব মাছের বাচ্চাও ডিম থেকেই বেরিয়ে এসেছে। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী মাতৃগর্ভ থেকে কোন বাধা বা আবরণ দীর্ণ করেই এই পৃথিবীতে আগমন করছে। বৃক্ষের বহিরাবরণ দীর্ণ করেই শাখায় শাখায় জাগে কিশলয়। ফুলের কুড়ি দীর্ণ করেই ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে পাঁপড়ী মেলে দেয়। অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই কোন না কোন বাধা অপসারিত করে, কোন কিছুর বুক চিরে বা কোন আবরণ

দীর্ণ করেই সৃষ্টি হয়, আর এই প্রক্রিয়ায় যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই হলেন রাব্বুল ফালাক। তিনিই মানুষের মালিক, খালিক, সম্রাট, শাসক, আইনদাতা ও জীবন বিধানদাতা। একমাত্র তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনিই দাসত্ব লাভের অধিকারী। কোরআনের গবেষকগণ এই ফালাক শব্দের বিস্তারিত তাফসীর করেছেন।

তিনিই পৃথিবীর পরিবেশ মানুষের অনুকূল করেছেন

পৃথিবীর গোটা পরিবেশের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মহান আল্লাহর প্রতি সেজ্‌দায় মাথানত হয়ে আসে। লক্ষ্য করে দেখুন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গোটা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু গোটা সৃষ্টিজগতকে মানুষ বা কোন জীবের জন্য বসবাসের উপযোগী করেননি। সৃষ্টি জগতের সকল স্থানেই জীবের বসবাসের জন্য তিনি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেননি। এর পেছনেও মহান আল্লাহ মানুষের জন্য অবশ্যই কল্যাণ রেখেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সৃষ্টি জগতের কোন গ্রহে প্রাণের উৎপত্তি ও তার বিকাশ এবং বসবাসের জন্য বিশেষ ধরনের অনুকূল পরিবেশ একান্তই অপরিহার্য। যে গ্রহ প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হবে সে গ্রহটিতে কতকগুলো মৌলিক পদার্থ যথা কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি থাকবে। এসব পদার্থের পরমাণুগুলো বিশেষ নিয়মে মিলে মিশে নানা ধরনের অণু গঠন করে। এসব অণু প্রাণী দেহের কোষ (Tissue), হাড় (Bone), ইত্যাদি গঠনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে।

যে গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে, তাতে পরিমিত পরিমাণে পানি থাকতে হবে। কারণ পানি জীবের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দেয়ার উপরই জীবদেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় বস্তু নিগর্ত হতে সহায়তা করবে। জীবের বসবাসের উপযোগী গ্রহে বায়ু মন্ডল থাকবে। গোটা গ্রহটিকে বায়ুমন্ডল আবৃত করে রাখবে। যেখানে থাকবে পরিমিত পরিমাণে অক্সিজেন এবং জীবন ধারনের উপযোগী অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্যাসীয় স্তর। কারণ অক্সিজেন জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য। বায়ুমন্ডল প্রাণী জগতের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণের যথা বৃষ্টির ব্যবস্থা করবে।

জীব বসবাসের উপযোগী গ্রহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হতে হবে। তাপমাত্রা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে বা কম হলে সে গ্রহটি প্রাণী জগতের বসবাসের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। জীব বসবাসের গ্রহটির বায়ুমন্ডল স্বাভাবিকভাবে উপযুক্ত হতে হবে। যেন সেই বায়ু স্তর ভেদ করে সূর্যের কোন ক্ষতিকর রশ্মি (Harmful ray) বা ভিন্ন কোন গ্রহ থেকে কোন ক্ষতিকর রশ্মি আগমন করতে সক্ষম না হয়।

বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবী ব্যতিত সৌরমন্ডলের যতগুলো গ্রহ-উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেসব গ্রহে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান নেই। কোন কোন গ্রহে গ্যাসীয় আবরণ বা বায়ুমন্ডলের অস্তিত্ব নেই। আবার যেগুলোতে রয়েছে তা কোন প্রাণীর জন্য উপযুক্ত নয়। সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ সম্পর্কে গবেষকগণ গবেষণা করে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সৌরমন্ডল ছাড়াও অন্য সৌরমন্ডলেও প্রয়োজনীয় পরিবেশে জীব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁরা নিয়মিত গবেষণা করে যাচ্ছেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের জন্য এই পৃথিবীকে উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবী হলো প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য একটি অনুপম গ্রহ। প্রাণের উৎপত্তির জন্য আল্লাহ তা'য়ালা প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থ, উপযুক্ত বায়ুমন্ডল এবং বায়ুমন্ডলে প্রয়োজনীয় গ্যাস ও অক্সিজেন, ভূ-পৃষ্ঠে অফুরন্ত পানি এবং সে পানির উষ্ণতা জীবের জন্য স্বাভাবিক করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীর শূণ্যমার্গে বায়ুমন্ডলের ওপর দিয়ে এমন একটি স্তর সৃষ্টি করেছেন, যাকে ওজোন (Ozone) বলা হয়। এই স্তর সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা ক্ষতিকর রশ্মি (Harmful ray) থেকে প্রাণী জগতকে রক্ষা করে।

পৃথিবী সূর্য থেকে যথাযথ দুরত্বের কক্ষপথে অবস্থান করাব কারণে পৃথিবীর উষ্ণতা প্রাণীকুলের জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সঠিক পরিমাণের পদার্থ অর্থাৎ ভর (Mass) সৃষ্টি করেছেন। ফলে সঠিক মাধ্যাকর্ষণ বলবিশিষ্ট হয়েছে এবং এ কারণে বায়ুমন্ডল যথাযথভাবে আকর্ষিত করে ভূপৃষ্ঠের সাথে চেপে রেখেছে যেন প্রাণীকুলের জন্য বায়ুমন্ডল ক্রিয়া করতে পারে। যদি ভর নির্দিষ্ট পরিমাণের কম থাকতো তাহলে বায়ুমন্ডলের প্রয়োজনীয় গ্যাস ও পানির বাষ্প ক্রমশঃ মহাকাশে হারিয়ে যেত এবং পৃথিবীতে কোন বায়ুমন্ডল থাকতো না। ফলে পৃথিবীতে অক্সিজেন থাকতো না, পানির কোন অস্তিত্ব থাকতো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ–

বলো দেখি সবে, শুকাইয়া যদি যায় এই যমীনের পানি

তাহলে হেথায় তটনীর ধারা কে দিবে সবারে আনি। (সূরা মুল্ক-৩০)

যারা নভোমন্ডল ভ্রমণ করেছেন, তারা পৃথিবীর ছাবি ক্যামেরায় ধারণ করেছেন। ছবিতে দেখা গিয়েছে সবুজ রং বেশী এসেছে। পৃথিবীর পানিপূর্ণ এলাকাগুলোই ছবিতে সবুজ আকারে উদ্ভাসিত হয়েছে। পানির বেশী প্রয়োজন, এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে পানি বেশী দিয়েছেন। আল্লাহ ছুবহানাহু তা'য়ালা এই পৃথিবীকে সমস্ত জীবের জন্য বসবাসের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন–

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا–

তিনি যমিনকে স্থিতি ও বসবাসের উপযোগী স্থান হিসেবে নির্মাণ করেছেন। এ পৃথিবীর ওপরে নদ-নদী প্রবহমান করেছেন এবং যমীনের ওপরে পাহাড়-পর্বতকে স্তম্ভ হিসেবে গেড়ে দিয়েছেন এবং প্রবহমান নদী-সাগরের দুটো ধারার মধ্যখানে আড়াল সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (নম্‌ল–৬১)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শুধুমাত্র এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগিই করেননি, এই পৃথিবী থেকে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী যেন তাদের চাহিদানুযায়ী সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে, সে ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًاوَّ سَلَكَ لَكُمْ فِیْهَا سُبُلاً وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً-فَاَخْرَجْنَابِهٖ اَزْوَجًامِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰی-كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ-

যিনি তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ করেছেন এবং এতে তোমাদের জন্য চলার পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। তোমরা আহার করো এবং তোমাদের জন্তু-জানোয়ারকেও বিচরণ করাও। (সূরা ত্ব-হা–৫৩)

তিনিই যমীনকে গালিচা হিসাবে বিছিয়েছেন

আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীকে মানুষের জন্য বিছানা হিসেবে বিছিয়ে দিয়েছেন, দূর-দূরান্তে মানুষ যেন গমন করতে পারে, সে জন্য নানা ধরনের পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এই পৃথিবীর ভূ-ভাগকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নানা ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠন করেছেন। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের ৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ হলো অক্সিজেন, ২৭ শতাংশ সিলিকন, ৮ দশমিক ১ শতাংশ এ্যালুমিনিয়াম, ৫ শতাংশ লোহা, ৩ দশমিক ৬ শতাংশ ক্যালসিয়াম, ২ দশমিক ৮ শতাংশ সোডিয়াম, ২ দশমিক ৬ শতাংশ পটাসিয়াম, ২ শতাংশ ম্যাগনেসিয়াম এবং অন্যান্য উপাদান ১ দশমিক ৬ শতাংশ। এখানে মানুষ যেন তার প্রয়োজনীয় জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হয় সে ব্যবস্থাও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করেছেন। আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তিনি অনুর্বর যমীনকে উর্বর করেছেন, যেন মানুষ ফসল উৎপাদনে সক্ষম হয়। যমীনে নানা ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করেছেন যেন নিরামিষাশী প্রাণীকুল এসব আহার করে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে। মানুষকে বলা হয়েছে এসব আহার করো আর আমারই দাসত্ব করো। আমিই তোমাদের রব্ব এবং শুধু আমারই প্রশংসা করো। আমার আইন ব্যতিত অন্য কারো আইন-বিধান অনুসরণ করো না। তোমরা লক্ষ্য করে দেখো, কিভাবে আমি এই পৃথিবীর যমীনকে তোমাদের জন্য কল্যাণকর করে দিয়েছি। আল্লাহ বলেন–

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ-وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرَازِقِيْنَ-

যমীনকে আমি বিস্তৃত করে দিয়েছি এবং যমীনের ওপর পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছি, প্রত্যেক বস্তু আমি সুপরিমিতভাবে (Balanced) সৃষ্টি করেছি এবং এসবের মধ্যে তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তোমাদের জন্য আর সেই অসংখ্য সৃষ্টির জন্য যাদের রিয্কদাতা তোমরা নও। (সূরা হিজর–১৯-২০)

বিজ্ঞানীগণ বলেন, এ পৃথিবী প্রধানত চারটি পর্বে বিভক্ত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অভ্যন্তরের পর্বকে ইনার কোর (Inner Core) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই ইনার কোর (Inner Core) কঠিন লোহা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। ইনার কোরের ব্যাসার্ধ প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার। (Outer Core) আউটার কোর (Inner Core) ইনার কোরকে আবৃত করে রেখেছে। এই আউটার কোর তরল লোহা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এর সাথে ২০ ভাগ মত নিকেল রয়েছে। এই আউটার কোরের পুরুত্ব (Thickness) প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার। এই আউটার কোরের ওপরের পর্বকে ম্যান্টেল (Mantle) নামে অভিহিত করা হয়েছে। ম্যান্টেল (Mantle) প্রধানত অক্সিজেন, সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও লোহার তৈরী যৌগিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। এই ম্যান্টেলের পুরুত্ব প্রায় ২৯২০ কিলোমিটার।

বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই ম্যান্টেল কোরের ওপরের স্তরকে ক্রাষ্ট (Crust) বলা হয়। গোটা পৃথিবীর মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ এই ক্রাষ্টের ওপরেই অবস্থান করছে। এই ক্রাষ্টের পুরুত্ব প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার এবং সমুদ্র তলদেশে প্রায় ১০ কিলোমিটার। ম্যান্টেলের ওপর অংশের ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত একটু ভিন্ন গুণাবলী সম্পন্ন। ক্রাষ্ট এবং ম্যান্টেলের ওপরের অংশের এই এলাকা সম্মিলিতভাবে লিথোস্ফিয়ার (Lithosphere) প্রস্তুত করে। লিথোস্ফিয়ার (Lithosphere) অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে গঠিত এবং সাতটি বিরাটাকারের খন্ডে বিভক্ত। এগুলোকে কন্টিনেন্টাল প্লেটস (Continental Plates) নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার লিথোস্ফিয়ারের নিচের অংশকে এ্যাসথেনোস্ফিয়ার (Asthenosphere) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের তাপমাত্রা ৪০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং যতই ওপরের দিকে আসা যাবে ততই এর তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। পৃথিবীর ভূ-ভাগের ওপরের অংশের এই তাপমাত্রা .০৬ ওয়াট প্রতি বর্গমিটারে। এই পৃথিবীর ভেতর থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসার সময় এ্যাসথেনোস্ফিয়ারে কনভেকশন কারেন্ট (Convection Current) প্রস্তুত করে।

এই কারেন্ট বা স্রোত যমীনের ওপরের অংশে ধাক্কা দেয় এবং তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ্যাসথেনোস্ফিয়ারের এই কনভেকশন কারেন্টের কারণে কন্টিনেন্টাল প্লেটগুলো অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকে। পৃথিবীর সাতটি মহাদেশ এই সাতটি প্লেটের ওপরে অবস্থিত, এ কারণে মহাদেশগুলো অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকে। এই প্লেটগুলো যখন চলতে থাকে তখন এর কিনারাগুলো একটির সাথে আরেকটি ক্রিয়া করে থাকে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই ক্রিয়া চার ধরণের হতে পারে। যখন একটি প্লেট আরেকটি প্লেটকে ধাক্কা দেয় এবং একটি অন্যটির নীচে চলে যেতে পারে না, যে এলাকায় এটা ঘটে সে এলাকাকে কলিসন জোন (Collision Zone) বলে। এলাকায় প্লেটের কিনারা বাঁকা হয়ে পর্বতমালার সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, হিমালয় পর্বত এই প্রক্রিয়াতেই সৃষ্টি হয়েছে। আর যখন একটি প্লেট অন্য প্লেটের নীচে চলে যায় তখন ভূমিকম্প হতে পারে, আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নি উদগিরণ হতে পারে। আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভা দিয়ে পর্বতমালার সৃষ্টি হতে পারে যেমন হয়েছে আন্দিজ পর্বতমালা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই প্রক্রিয়াতেই পৃথিবীকে প্রসারিত

করেছেন মানব জাতির কল্যাণের জন্য। এই কাজটি যিনি সম্পাদন করেছেন, তিনিই হলেন রব্ব। শুধু তাঁরই প্রশংসা করতে হবে।

আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের এমন রব্ব যে, এই যমীন সৃষ্টি করেছি আমি, এই যমীনকে তোমাদের বসবাসের জন্য উপযোগী করেছি, এখানের পরিবেশ তোমাদের জন্য অনুকূল করেছি। যা আহার করলে তোমাদের দেহ সুষ্ঠু সবল হবে, দেহ পরিপুষ্ট হবে, দেহ সুস্থ থাকবে–এসবের ব্যবস্থা আমি আল্লাহ করেছি। এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী রয়েছে–যা তোমাদের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু এসব প্রাণী কি আহার করে জীবিত থেকে তোমাদের কল্যাণ সাধন করবে–এ চিন্তা তোমাদের করতে হয় না। স্বয়ং আমি আল্লাহ তাদের আহারের ব্যবস্থা করেছি। যাবতীয় জীবের উৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ আমি এই পৃথিবীতে পরিমিত পরিমাণে দান করেছি, জীবন ধারনের যাবতীয় উপকরণ আমি দান করেছি। সুতরাং আমারই প্রশংসা করো আর আমারই গোলামী করো। আমার নবীর মোকাবিলায় অন্য কাউকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে তার অনুসরণ করো না। আল্লাহ বলেন–

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ–اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ–

তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এসবের মধ্যে রয়েছে নিদর্শন। (সূরা জাসিয়া)

সূরা লোকমানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً –

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন। (সূরা লোকমান-২০)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তোমরা আমার দেয়া আইন-কানুন অনুসরণ করো। কারণ আমি আল্লাহ তোমাদের রব্ব, আমিই আকাশমন্ডলী তোমাদের অধীন করে দিয়েছি। এ কারণেই তোমরা উড়ন্ত যান নির্মাণ করে আকাশে ভ্রমণ করতে সক্ষম হচ্ছো। আমি মহাশূন্যে যেসব গ্রহ-উপগ্রহ তৈরী করেছি সেগুলোয় তোমরা ভ্রমণ করতে সক্ষম হচ্ছো। এই পৃথিবীতে যা কিছু তোমরা তোমাদের দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান দেখছো, তা সবই তোমাদের অধীন করে দিয়েছি বলে তোমারা এসব নিজেদের কল্যাণে ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছো। আমি এমন বায়ূমন্ডল তৈরী করেছি, নানা ধরনের গ্যাসীয় স্তর নির্মাণ করেছি–যা তোমরা দেখতে পাওনা। এসব হলো তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ। তোমরা তোমাদের কল্যাণে এসব ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছো এ কারণে যে, আমি এসব তোমাদের অধীন করে দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি

আদেশ করেছি যে, তোমরা কেবল মাত্র আমার দেয়া বিধি-বিধান অনুসারে পৃথিবীর জীবন পরিচালিত করবে। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে আমার প্রশংসা করবে আর আমাকেই রব্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিবে।

তিনিই জীবের উৎপত্তি করেছেন পানি থেকে

এই পৃথিবীতে মানুষ এমন অনেক কিছু ভোগ করে এবং চোখে তা দেখে, জ্ঞানে ধরা পড়ে এসব হলো আল্লাহ তা'য়ালার প্রকাশ্য নেয়ামত। আর যেসব নেয়ামত সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না এবং অনুভবও করতে পারে না সেগুলো হলো আল্লাহ তা'য়ালার গোপন নেয়ামত। স্বয়ং মানুষের নিজের দেহে এমন অনেক কিছু কাজ করে যাচ্ছে এবং দেহের বাইরে পৃথিবীর পরিবেশে মানুষের স্বার্থে কল্যাণময় ভূমিকা পালন করছে এমন অগণিত জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু মানুষ এসব সম্পর্কে জানেও না যে, মহান আল্লাহ তাকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য, তার প্রতিদিনের আহারের জন্য, তার দেহের জীব কোষ বৃদ্ধি ও মেধা বিকাশের জন্য এবং তার অন্যান্য কল্যাণের জন্য নানা ধরনের উপকরণ থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানের নানা শাখায় মানুষ যতই গবেষণা করছে ততই মানুষের সামনে আল্লাহ তা'য়ালার এমন অগণিত নেয়ামত স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হচ্ছে যে, এসব নেয়ামত সম্পর্কে মানুষের কোন পূর্ব ধারণাও ছিল না। পক্ষান্তরে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই মানুষ আল্লাহর যেসব নেয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে, সেগুলো ঐসব নেয়ামতের তুলনায় অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ, যেসব নেয়ামত বর্তমান সময় পর্যন্তও মানুষের জ্ঞানের অগোচরে রয়েছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পানি থেকেই প্রথমে জীবন্ত বস্তুর উদ্ভব হয়েছে। অথচ চৌদ্দ শত বছর পূর্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন এক ব্যক্তির মুখ দিয়ে পৃথিবীবাসীকে শুনিয়ে দিয়েছেন যে, 'পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে পানি থেকে।' অথচ তিনি কোন দিন কোন বিজ্ঞান গবেষণাগারে গবেষণা করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা সেই মহামানবের মুখ দিয়েই উচ্চারিত করালেন-

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ-

আমি পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুকে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আম্বিয়া-৩০)

জীবন্ত বস্তু বলতে শুধু মানুষকেই বুঝানো হয় না। সৃষ্ট জগতের অসংখ্য জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ এবং উদ্ভিদসমূহও জীবন্ত বস্তুর মধ্যে শামিল রয়েছে। প্রজননের মাধ্যমেও জীবের জন্ম ও বিকাশের ক্ষেত্রেও পানি অপরিহার্য। জীব কোষের পদার্থসমূহের অধিকাংশই পানি এবং অতি সামান্য অংশ রয়েছে অন্যান্য পদার্থ। পানি ব্যতিত জীব কোষ জীবিত থাকতে পারে না এবং কোন ধরনের জীবের উৎপত্তি ও বিকাশ কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটবর্তী গ্রহ। আর আয়তনের দিক থেকে পৃথিবী হলো পঞ্চম বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে পৃথিবীর দুরত্ব ১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কিলোমিটার। এই দুরত্বকে জ্যোতির্বিদ্যার একক বা এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট (Astronomical unit)

বলে। এই হিসেবে সূর্য থেকে পৃথিবীর দুরত্ব ১ জ্যোতির্বিদ্যা একক। পৃথিবীর ব্যস ১২ হাজার ৭ শত ৫৬ দশমিক ৩ কিলোমিটার। আর ভর ৬. ৬ সেক্সটিলিয়ন। পৃথিবীর গতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেন, ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে পৃথিবী এক পাক সম্পন্ন করে। যাকে আমরা একদিন বলে থাকি। আর সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে আমাদের এই পৃথিবী সময় নেয় ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ৯ মিনিট, ৯ দশমিক ৫৪ সেকেন্ড।

এই পৃথিবীর আকার সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর এক মেরু থেকে আরেক মেরুর দুরত্ব ৭ হাজার ৮ শত ৯৯ দশমিক ৮৩ মাইল বা ১২ হাজার ৭ শত ১৩ দশমিক ৫৪ কিলোমিটার। আর বিষুবীয় অঞ্চলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দুরত্ব ৭ হাজার ৮ শত ৯৯ দশমিক ৮৩ মাইল বা ১২ হাজার ৭ শত ১৩ দশমিক ৫৪ কিলোমিটার। পৃথিবী পৃষ্ঠের আয়তন সম্পর্কে বলা হয়েছে, ১৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫১ হাজার বর্গমাইল বা ৫১ কোটি ১ লক্ষ কিলোমিটার। এই বিশাল আয়তনের পৃথিবীর মধ্যে ভূ-ভাগ হলো মাত্র ৫ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৯ হাজার মাইল বা ১৪ কোটি ৮৩ লক্ষ কিলোমিটার। অর্থাৎ পৃথিবীর আয়তনের মোট ৩০ শতাংশই হলো পানি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি করেছেন পানি থেকে। পৃথিবীতে জীব টিকে থাকা ও বিকাশের জন্যও পানি একান্তই প্রয়োজন। পৃথিবীতে পানির অংশের আয়তন হলো ১৩ কোটি ৯৬ লক্ষ ৯২ হাজার মাইল বা ৩৬ কোটি ১৫ লক্ষ কিলোমিটার। কত পানি যে আল্লাহ এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তা কল্পনাও করা যায় না। জীবন ধারনের জন্য পানির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য নদী-নালা,ডোবা-পুকুর, হ্রদ-সাগর-মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন। এরপরেও আল্লাহ মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এসব কিছুই করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।

আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীতে যত সাগর-মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গভীর এলাকার নাম হলো ম্যারিনা ট্রেঞ্চ। গুয়ামের দক্ষিণ পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে এই এলাকাটির গভীরতা ৩৬ হাজার ১৯৮ ফুট বা ১১ হাজার ৩৩ মিটার। পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলোর গড় গভীরতা ১২ হাজার ৪ শত ৫০ ফুট বা ৩ হাজার ৭ শত ৯৫ মিটার। এই পরিমাপের কম বা বেশী হলেই পৃথিবীর পরিবেশ বিপন্ন হবে এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পানির পরিমাপ এই পৃথিবীতে ঠিক রেখেছেন। এই ব্যবস্থা যথাযথভাবে যিনি সম্পাদন করেন তিনিই হলেন রব্ব। যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।

এ পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে লিবিয়ার আল আজিজিয়ায় ১৩৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এ্যান্টার্টিকার ভোকষ্ট-এ মানইনাস ১২৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট অর্থাৎ মাইনাস ৮৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আল্লাহ তা'য়ালা এই তাপমাত্রার ব্যতিক্রম করে দিলেই পৃথিবীর প্রাণীকুল বিপন্ন হয়ে পড়বে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, আল্লাহর মোকাবিলায় পৃথিবীর পরিবেশ প্রাণী বসবাসের উপযোগী করতে পারে। আল্লাহ বলেন, এসব কিছুর নিয়ন্ত্রণ করি

আমি আল্লাহ। সুতরাং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আমার বিধান অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করো আর আমার বিধান গ্রহণ করার মধ্যেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তোমরা কি দেখতে পাওনা, তোমাদেরকে আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। শুধু তোমাদেরকেই নয়–পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকেই আমি পানি থেকেই সৃষ্টি করেছি। এই পানি ব্যতিত মুহূর্তকালের জন্যও তোমাদের জীবন চলতে পারে না। এ জন্য আমি পৃথিবীতে অসংখ্য বিশালাকের জলাধার নির্মাণ করেছি। এসব দেখেও কি তোমরা নিজেদেরকে ভুল পথেই পরিচালিত করবে?

পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য বিচিত্র প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত প্রাণীর চলার ধরণ ও গতি এক রকম নয়। আল্লাহ বলেন–

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ-فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ-وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى اَرْبَعٍ-يَخْلُقُ اللّٰهُ مَايَشَآءُ-اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

আল্লাহ সমস্ত জীবকেই পানি থেকেই সৃষ্টি করেছেন। তাদের কোনটি বুকের ওপরে ভর করে চলে। কোনটি দু'পায়ে ভর করে চলে। আবার কোনটি চলে চার পায়ে ভর করে। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন, তিনি তো সমস্ত কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (সূরা আন্ নূর-৪৫)

তিনিই বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও সৃষ্টির নৈপূর্ণতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, পৃথিবীর প্রাণী জগতের দিকেই তোমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো আমার সৃষ্টির বিচিত্র রূপ। আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি, শৈশবে এই মানুষ অপরের সাহায্য ব্যতিত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করতে পারে না। আমি আল্লাহ তাকে হাঁটার কৌশল শিখিয়েছি। মানুষ দু'পায়ের ওপর ভর করে হাঁটে। আবার পশু জগতের মধ্যে এমন কিছু পশু সৃষ্টি করেছি, যারা কিছু সময়ের জন্য দু'পায়ের ওপর ভর করে চলতে পারে। আবার এমন পশুও আমি সৃষ্টি করেছি যারা চার পায়ের ওপর ভর করে এই পৃথিবীতে চলে। এমন প্রাণী আমি সৃষ্টি করেছি, যার কোন পা নেই, পা বিহীন প্রাণী আমি সৃষ্টি করেছি। আমি সর্পকে পা দিইনি, তারা পা ছাড়াই বুকের ওপর ভর করে এই পৃথিবীতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলতে পারে। সাগরের এমন অনেক প্রাণী রয়েছে যারা পা ছাড়াই জলে ও স্থলে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলাফেরা করে। আমি বিচ্ছু জাতীয় প্রাণী সৃষ্টি করেছি, যাদেরকে আমি অসংখ্য পা দান করেছি। তারা অসংখ্য পা দিয়ে পৃথিবীতে চলা ফেরা করে।

এমন অসংখ্য পাখি আমি সৃষ্টি করেছি, যারা দু'পা দিয়ে হাঁটতেও পারে আবার ঐ দূর আকাশেও ডানা মেলে উড়তে পারে। এসব পাখি উড়তে উড়তে কখনও ডানা দুটো গুটিয়ে নিয়েও মহাশূন্যে অবস্থান করে–নিচে পতিত হয় না। আল্লাহ বলেন–

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّتٍ وَّيَقْبِضْنَ-مَايُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ الرَّحْمٰنُ-اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْئٍ بَصِيْرٌ-

এসব লোকজন কি নিজেদের ওপরে উড়ন্ত পাখিগুলোকে ডানা বিস্তার করতে ও গুটিয়ে নিতে দেখে না ? একমাত্র রহমান ব্যতিত তাদেরকে অন্য কেউ ধরে রাখে না। তিনি সমস্ত জিনিসের সংরক্ষক। (সূরা মূল্‌ক-১৯)

আল্লাহ বলেন, তোমাদের জীবন ধারনের জন্য যা প্রয়োজন তা সবই আমি করেছি। যাবতীয় ব্যবস্থাপনা আমার হাতে, আমিই সব কিছু সম্পাদন করছি। তোমরা ক্ষেত্রে বীজ বপন করে নিশ্চিন্ত থাকো, সেই বীজ থেকে ফসল ফলানোর ক্ষমতা তোমাদের নেই। আমিই সেই বীজ থেকে ফসল উৎপাদন করে থাকি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَاى-يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ-ذَالِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ-

দানা ও বীজ দীর্ণকারী হচ্ছেন আল্লাহ। তিনিই জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে বের করেন জীবিত থেকে। এসব কাজের প্রকৃত কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ; তাহলে তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছো ? (সূরা আনআ'ম-৯৫)

তোমরা তোমাদের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছো যে, আল্লাহই সমস্ত কিছু করছেন, তাহলে আমার আইন-বিধান ত্যাগ করে মানুষের রচনা করা বিধান তোমরা কেন অনুসরণ করছো ? তোমরা কি দেখনা ? একটি কুকুর আরেকটি কুকুরের আইন মানে না, একটি শুকুর আরেকটি শুকুরের আইন মানে না। তোমরা কি এসব প্রাণী থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে গেলে যে, একজন মানুষ একটি মতাদর্শের জন্ম দিল আর ওমনি তোমরা তা অনুসরণ করতে শুরু করলে ? তোমরা লক্ষ্য করে দেখো তো ? আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য কি করছি-

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً-فَاَخْرَجْنَابِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا-وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَمُتَشَابِهٍ-اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَوَيَنْعِهٖ-

তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তার সাহায্যে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপাদন করেন এবং তা থেকে শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার ও বৃক্ষ তরু-লতার সৃষ্টি করেছেন। তারপর তা থেকে বিভিন্ন কোষসম্পন্ন দানা বের করেছেন, খেজুরের মোচা থেকে ফলের থোকা থোকা

বানিয়েছেন, যা বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে। আর সজ্জিত করেছেন আঙ্গুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান সাজিয়ে দিয়েছেন, সেখানে ফলসমূহ পরস্পর স্বদৃশ, অথচ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন। এই গাছগুলো যখন ফল ধারণ করে, তখন তাদের ফল বের হওয়া ও তার পেকে যাওয়ার অবস্থাটা একটু সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখো। (সূরা আনআ'ম-৯৯)

জীবের জন্য পানি অপরিহার্য-এ কথা নতুন কিছু নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান মোবারকের মাধ্যমে চৌদ্দ শত বছর পূর্বেই বিশ্ববাসীকে পানির অপরিহার্যতার কথা শুনিয়েছেন। তিনি মানুষের জন্য নানা ধরনের ফল-মূল ও দানা সৃষ্টি করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কোন একটি ফল এবং দানাও খোসা বিহীন নয়। মানুষ এসব আহার করবে এ কারণে আল্লাহ সমস্ত ফল ও দানার ওপরে আবরণ সৃষ্টি করেছেন। বায়ু প্রাণী জগতের জন্য অপরিহার্য।

বিজ্ঞানীদের ধারনা অনুসারে পৃথিবীর মূল আবহাওয়ামন্ডলের বিস্তৃতি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৫০ মাইল বা ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঁচু। পৃথিবীর আবহাওয়ামন্ডলের ৯৯ শতাংশই এর মধ্যে পড়েছে। তবে ১ হাজার মাইল বা ১ হাজার ৬ শত কিলোমিটার উঁচু পর্যন্ত পৃথিবীর আবহাওয়ামন্ডলের গ্যাসের হাল্কা অস্তিত্ব বিরাজমান। পৃথিবীর এই বায়ুমন্ডলের ৭৮ ভাগই নাইট্রোজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন, ১ ভাগ আর্গন। এছাড়া রয়েছে কার্বনডাই-অক্সাইড, অন্যান্য গ্যাস ও জলীয় বাষ্প। বায়ুমন্ডলের এসব উপাদানসমূহ উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের টিকে থাকার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

মানুষের জীবন ধারনের জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানব শরীরে অক্সিজেন গ্রহণ করা হয় এবং তা মানবদেহের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। মানুষের জীবন ধারনের জন্য একান্ত প্রয়োজন হলো আগুন। অক্সিজেন ব্যতিত আগুন প্রজ্জ্বলিত হয় না। কয়লা, তেল বা অন্য কোন দহনের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। বায়ূমন্ডলে থাকা নাইট্রোজেন গ্যাস যে কোন ধরনের দহন কার্য নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। উদ্ভিদ-বৃক্ষ-তরু-লতার জন্য নাইট্রোজেন অপরিহার্য। বায়ুমন্ডলে অবস্থিত কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস উদ্ভিতের জন্য প্রাণস্বরূপ। পানি এবং কার্বনডাই অক্সাইড থেকে সূর্যের আলোতে বৃক্ষ-তরু-লতার সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শ্বেতসার খাদ্য ও অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত হয় এবং অনাবশ্যকীয় অক্সিজেন বায়ুমন্ডলে ছেড়ে দেয়।

এভাবে মানুষ এবং অন্যান্য জীব-জন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বায়ুমন্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বনডাই অক্সাইড ছেড়ে দেয়। পক্ষান্তরে বৃক্ষ, তরু-লতা বায়ুমন্ডল থেকে কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে এদের সমতা রক্ষা করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বায়ুমন্ডলকে আদেশ দান করেছেন, যেন বায়ুমন্ডল গোটা পৃথিবীকে আবৃত করে রাখে। ফলে দিন ও রাত, গ্রীষ্ম এবং শীতকালের উষ্ণতার পার্থক্য বেশী হতে না দিয়ে জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ জগৎ টিকে থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ বায়ুমন্ডলে নানা ধরনের স্তর সৃষ্টি করেছেন। এসব স্তরের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এর একটি স্তরের নাম হলো ওজোন স্তর। এই

ওজোন স্তর সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকর রশ্মি (Harmful ray) শোষণ করে জীব জগৎ ও উদ্ভিদ জগতকে হেফাজত করে। বায়ুমন্ডলের আরেকটি স্তরের নাম হলো অমভ্রযদণরণ। এই স্তর থাকার কারণে মানুষ যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। ভূ-পৃষ্ঠের সাগর, মহাসাগর, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড় ইত্যাদি থেকে সূর্যের তাপে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে আল্লাহর আদেশে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে। এই জলীয় বাষ্প ওপরে ওঠার পর ক্রমে তা শীতল হতে থাকে এবং পানির বিন্দু সৃষ্টি হয়। এরপর তা ঘনীভূত হয়ে আল্লাহর আদেশে মেঘমালায় পরিণত হয়। মহান আল্লাহ বায়ুমন্ডলে উষ্ণতা ও চাপের পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। ফলে মেঘ দূর-দূরান্তে চলে যায়। তারপর আল্লাহর আদেশে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠ সিক্ত করে। এভাবে আল্লাহ মৃত যমীনকে জীবিত করেন। মহান আল্লাহ সূরা ফাতিরের ৯ নং আয়াতে বলেন–

وَاللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَابِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا–

তিনিই আল্লাহ যিনি বায়ু প্রেরণ করে এবং বায়ু দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। তারপর তিনি তা নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে পরিচালিত করেন এবং মৃত যমীনকে জীবন্ত করে তোলেন।

পৃথিবীর যেখানে বৃষ্টি প্রয়োজন আল্লাহ তা'য়ালা বায়ুকে আদেশ করেন সেখানে মেঘমালা সঞ্চালিত করার জন্য। মুহূর্তের মধ্যে বায়ু সে আদেশ পালন করে। কি পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং বৃষ্টির ফোটার আকার কি হবে সেটাও আল্লাহ তা'য়ালা নির্ধারণ করে দেন। এভাবে বৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীকে সিক্ত করেন। আল্লাহ বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ–حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ–

তিনি নিজের অনুগ্রহের (বৃষ্টি বর্ষণের) প্রথমে বাতাসকে সুসংবাদবাহী হিসেবে প্রেরণ করেন। তারপর যখন সে বাতাস পানি ভারাক্রান্ত মেঘমালা উত্থিত করে, তখন সে বাতাসকে কোন মৃত (শুষ্ক) যমীনের দিকে প্রেরণ করেন, পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারপর যমীন থেকে নানা ধরনের ফলমূল উৎপদন করেন। (সূরা আ'রাফ–৫৭)

তিনিই শূন্যমার্গে বায়ুমন্ডল দিয়ে আবৃত করেছেন

আল্লাহর আদেশে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। কোন একটি ধূলি কণাও যেন শুষ্ক না থাকে মহান আল্লাহ সে ব্যবস্থা করেন। গাছ ফলে-ফুলে সুশোভিত হবে-এ জন্য প্রয়োজন হয় কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ইত্যাদি। আল্লাহ হলেন রাব্বুল আলামীন-তিনি এসবের ব্যবস্থা করেন। বৃক্ষ-তরুলতা বায়ুমন্ডলে থাকা কার্বনডাই-অক্সাইড থেকে কার্বন সংগ্রহ করে, বায়ুমন্ডল মাটি ও পানি থেকে হাইড্রোজেন সংগ্রহ করে এবং বায়ুমন্ডল ও পানি থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে। এছাড়াও নানা পদার্থসমূহ মাটি থেকে সংগ্রহ করে। এসব ব্যবস্থা যিনি করেছেন তিনিই হলেন রাব্বুল আলামীন।

এই পৃথিবীকে তিনি প্রাণীকুলের জন্য বাসোপযোগী করেছেন। বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, এই পৃথিবী আকৃতিতে গোলাকার। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ অঞ্চল উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে। কেন্দ্রস্থ এলাকার উষ্ণতা সবচেয়ে বেশি এবং ওপরের দিকের উষ্ণতা ক্রমশঃ কমে এসেছে। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ শিলা, বালি ও মাটি দিয়ে গঠিত। এই ভূ-পৃষ্ঠের নিচে মহান আল্লাহ নানা ধরনের খনিজ সম্পদ দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছেন। আবার ওপরের দিকে রয়েছে নদী, সাগর, মহাসাগর এবং বনজসম্পদ। নদী-সাগর-মহাসাগরের গর্ভে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের কল্যাণের জন্য অগণিত সম্পদ দান করেছেন। বনজ সম্পদ শুধু মানুষেরই কল্যাণে আসে না, সমস্ত প্রাণীকুল বনজ সম্পদ থেকে যেন উপকৃত হতে পারে, মহান আল্লাহ সে ব্যবস্থাও করেছেন।

পৃথিবীর ওপরে শূন্যমার্গে বায়ুমন্ডল দিয়ে আবৃত করা রয়েছে। মাটি, পানি ও বায়ুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন বলে এই পৃথিবী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য বসবাসোপযোগী হয়েছে। এই পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ-ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ-فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ -

আল্লাহই তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করেছেন এবং ওপরে আকাশের গম্বুজ নির্মাণ করেছেন, যিনি তোমাদের প্রতিকৃতি রচনা করেছেন, অত্যন্ত সুন্দর করে বানিয়েছেন, যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিস সমূহের রিযক দান করেছেন। তিনিই আল্লাহ এসব কাজ যিনি নিপুণভাবে সম্পাদন করেছেন তিনি তোমাদের রব, অসীম অপরিমেয় বরকতওয়ালা বিশ্বলোকের সেই রব। (সূরা মুমিন-৬৪)

আল্লাহ তা'য়ালা শুধু এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগিই করেননি, এই পৃথিবীকে মানুষের জন্য শয্যা বানিয়েছেন, পৃথিবীতে মানুষের জন্য অসংখ্য কল্যাণের পথ সৃষ্টি করেছেন। সূরা যুখরুফের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং সেখানে তোমাদের কল্যাণের জন্য পথ করে দিয়েছেন যেন তোমরা নিজেদের গন্তব্যস্থলের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হও।

তিনিই মাটিকে পরিচালনসাধ্য করেছেন

মানুষের প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনীয় সব ধরনের উপকরণ দিয়েই এই ভূ-পৃষ্ঠ আল্লাহ তা'য়ালা গঠন করেছেন যেন মানুষ তার জ্ঞান বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ ভূ-পৃষ্ঠ থেকেই সংগ্রহ করতে পারে। আল্লাহ বলেন-

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ-

তিনি তোমাদের জন্য মাটিকে পরিচালনসাধ্য বা নিয়ন্ত্রণসাধ্য (Manageable) করে দিয়েছেন। তোমরা মাটির বুকে বিচরণ করো এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ করো। (সূরা মুল্ক-১৫)

আল্লাহ তা'য়ালা এই মাটিকে পাথরের মতো কঠিন করেননি, আবার পানির মতো তরলও করেননি। যেরূপে যে অবস্থায় মাটি থাকলে সমস্ত সৃষ্টির কল্যাণ হয়, আল্লাহ তাই করেছেন। আর যিনি এটা করেছেন তাকেই বলা হয় রব্। আল্লাহ বলেন-

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهرًا-وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ-اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ-

আর তিনিই ভূ-তলকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন এবং পৃথিবীর বুকে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করেছেন দুই প্রকারের। তিনি দিনকে রাত দিয়ে আবৃত করে দিয়েছেন। এসব কিছুর মধ্যে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রা'দ-৩)

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'পৃথিবীর ভূ-তলকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন'। এ আয়াতে যে 'মাদ্দা' শব্দ ব্যহার করা হয়েছে, এর অর্থ হলো, 'কোন কিছুকে টানা বা বিস্তৃত করা।' বিজ্ঞানীদের পৃথিবী সম্পর্কে গবেষণালব্ধ তথ্যানুযায়ী আমরা জানতে পারি যে, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ এলাকা অতিরিক্ত উত্তপ্ত থাকার পরও অতিরিক্ত চাপের (Pressure) কারণে কঠিন অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের অল্প গভীরে চাপের পরিমাণ কম থাকার কারণে মাটির নিচের পদার্থসমূহ গলিত অথবা কঠিন বা মিশ্রণ অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ভূ-পৃষ্ঠ ঠান্ডা

হওয়ার জন্য কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ঢাকনা (Crust) বা আবরণের সৃষ্টি হয়েছে। মাটির এই আবরণ পৃথিবীর কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ হয়নি। আবরণটি সম্পূর্ণ গোলাকার পৃথিবীকে ঘিরে বা আবৃত করে রেখেছে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই আবরণ গঠিত না হলে এই পৃথিবীতে কোন প্রাণী বসবাস করতে পারতো না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত প্রাণী জগতের কল্যাণের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের আবরণ সৃষ্টি করে টেনে দিয়েছেন বা বিস্তৃত করে দিয়েছেন। কিন্তু এই আবরণের বিষয়টি এতটা সহজ নয়। চিন্তা গবেষণা করলে মাটির এই আবরণটির গঠনের কলা-কৌশল দেখলে সেজদায় মাথানত হয়ে আসে। যমীনকে আল্লাহ কিভাবে বিস্তৃত করেছেন, এ সম্পর্কে মানুষকে বলা হয়েছে, তোমরা চিন্তা করো–গবেষণা করো তাহলেই তোমরা অনুভব করতে সক্ষম হবে, আমি আল্লাহ তোমাদের কেমন রব্। সূরা যারিয়াতের ৪৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ–

এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, দেখতো আমি কত চমৎকার করে বিছিয়েছি।

আমি আল্লাহ তোমার এমন রব্–তুমি না চাইতেই আমি তোমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তোমার কল্যাণের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করে রেখেছি। দেখতো, আমি তোমার জন্য কত সুন্দর করে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি। পৃথিবীর এই যমীনকে তোমার জন্য কি করেছি শোন–

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ–

আমি যমীনকে বিস্তৃত করেছি, তারপর এর ওপরে পাহার গেড়ে দিয়েছি, তারপর যমীনের ওপরে নব ধরনের উদ্ভিদ দান করেছি এবং এসব উদ্ভিদ যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, সেখানে ততটুকুই দান করেছি। (সূরা হিজর–১৯)

গোলাকার উত্তপ্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠ মাটির স্তর দিয়ে ঢেকে দিয়ে বা বিস্তৃত করে দিয়ে যথাযথ উষ্ণতা, পানি, বায়ু ইত্যাদি সৃষ্টি করে আল্লাহ পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করেছেন। ভূ-পৃষ্ঠের মাটির ভেতরে আল্লাহ স্তর সৃষ্টি করেছেন বা বিছানার মতো করে বিছিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً–

তোমাদের জন্য মাটিকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন। (সূরা বাকারাহ্-২২)

সূরা ত্বাহায় আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا–

তোমাদের জন্য মাটিকে বিছানা করেছেন। (সূরা ত্বাহা-৫৩)

সূরা নূহের ১৯ আয়াতেও বলেছেন, মাটিকে তোমাদের জন্য আমি বিছানা হিসেবে বিছিয়ে দিয়েছি। তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি এই ব্যবস্থা করেছি, সুতরাং আমার দেয়া বিধান ত্যাগ করে কেন তোমরা অন্যের রচিত বিধান অনুসরণ করছো ? আল্লাহ বলেন–

মাটিকে তোমাদের জন্য বিছানা হিসেবে বিছিয়ে দিয়েছি, তা কি তোমরা দেখতে পাও না ?

তিনিই পর্বতসমূহ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন

এ কথা আমরা সবাই জানি যে, এই পৃথিবীর পৃষ্ঠ অসমান। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ইত্যাদি থাকার কারণে এই ভূ-পৃষ্ঠ সমান নয়–অসমান। কিন্তু বিছানা তো অসমান হয় না–তাহলে আল্লাহ এই ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানা বলে কোরআনে কেন উল্লেখ করেছেন ? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, বিছানা বা কার্পেট এ দুটো জিনিস ব্যবহার করা হয় কোন কিছুকে ঢেকে বা আবৃত করার জন্য। বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই পৃথিবীর ভেতরের অংশ উত্তপ্ত কঠিন এবং গলিত অবস্থায় রয়েছে। এই উত্তপ্ত গলিত অংশ উপযুক্ত পরিবেশের ভূ-পৃষ্ঠ দিয়ে আল্লাহ ঢেকে দিয়েছেন বা আবৃত করে দিয়েছেন বলেই এই যমীনের ওপরে বসবাস করা সম্ভব হয়েছে। ভোগবহুল জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় উপকরণ বা জিনিস যমীন নামক এই ঢাকনার ওপরে বিদ্যমান। এ কারণেই এই ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানার সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানুষ আকারে খুবই ছোট, এ কারণে তার চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সে পৃথিবীকে অসমতল দেখতে পায়। আসলে বিশাল এই পৃথিবীর আকারের তুলনায় এই পৃষ্ঠদেশের অসমতলতা অত্যন্ত নগণ্য। ছোট্ট প্রাণী পিঁপড়ার কাছে তার ঘরের মেঝে অসমতল হলেও আমরা আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে পাই যে, পিঁপড়ার ঘর সমতল। তেমনি এই বিশাল পৃথিবীও আমাদের কাছে অসমতল বলে মনে হয়।

পৃথিবীর ভূ-বিজ্ঞানীগণ (Geologists) পাহাড়-পর্বতসমূহের উৎপত্তি ও গঠন সম্পর্কে গবেষণা করে দেখেছেন যে, স্মরণাতীত কাল থেকে একটি বিরাট সময় পর্যন্ত পৃথিবী পৃষ্ঠে বিবর্তন হওয়ার কারণেই এসব পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর অধিক সংখ্যক পাহাড়-পর্বত বিচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি না করে শ্রেণীবদ্ধভাবে (In ranges) সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন পাহাড়কে ভূ-পৃষ্ঠে নিঃসঙ্গভাবে দৃষ্টি গোচর হলেও মাটির তলদেশ দিয়ে দূরে-অনেক দূরে অন্য পাহাড়ের সাথে যোগসূত্র থাকতে দেখা যায়। বিজ্ঞানিগণ পাহাড়-পর্বতগুলোর আকার-আকৃতি পর্যবেক্ষণ করে শিলা, বালু ও মাটি প্রভৃতি পরীক্ষা করে এবং অন্যান্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলেছেন, পৃথিবী প্রাথমিক পর্যায়ে ভয়ংকর ধরনের উত্তপ্ত ছিল। পর্যায়ক্রমে বির্বতনের ফলে কালক্রমে তাপ বিকিরণের কারণে পৃথিবী ঠান্ডা হয়ে সংকুচিত হতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের ভিতরের অংশের অতিরিক্ত চাপের কারণে তার কিছু অংশ ওপরের দিকে ভাঁজ হয়ে ফুলে উঠতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়। একটি কমলা লেবু শুকিয়ে গেলে যেমন তার ওপরের বাকলের ওপরে যে ধরনের ভাঁজ সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে পৃথিবীর বুকে ভাঁজের সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞানীগণ বলেন, পৃথিবীর ভিতরের অংশে অতিরিক্ত উত্তপ্ত থাকার ফলে সেখানে অস্থিরতা (Unstability) বিরাজ করছে। ভূ-পৃষ্ঠের ভেতরে প্রতি মুহূর্তে প্রচন্ড আলোড়ন হচ্ছে। এই আলোড়নের কারণে কখনো কখনো পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ বা ওপরের স্তরটি ফেটে যায় এবং সেই ফাটল দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের ভেতরের গলিত পদার্থ প্রচন্ড বেগে বেরিয়ে আসতে থাকে। এভাবে গলিত পদার্থগুলো ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে জমা হয়ে কালক্রমে পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞানীগণ আরো বলেন, কোটি কোটি বছরের সময়ের বিবর্তনেও ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়ে কিছু সংখ্যক পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ এই তিন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। মহান আল্লাহ পাহাড়-পর্বতসমূহ এ পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের অনেক গভীরে প্রোথিত করেছেন এবং অধিক সংখ্যক পাহাড়-পর্বত শ্রেণীবদ্ধভাবে মাটির তলদেশ দিয়ে একটির সাথে আরেকটির সংযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর এ জন্যই ভূ-পৃষ্ঠ স্থিরতা (Stability) লাভ করেছে। ভূ-পৃষ্ঠের সুস্থিরতার ব্যাপারে পাহাড়-পর্বতের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এটা একটি সাধারণ সূত্র যে, বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে বস্তুটির অণু-পরমাণুগুলোর গতি শক্তি বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং উত্তপ্ত জিনিসের আলোড়নও বৃদ্ধি লাভ করে।

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে, কোন তরল পদার্থ যেমন পানি, উত্তপ্ত করলে পানির ভেতরে অস্থিরতা বা আলোড়ন বৃদ্ধি পায় এবং এ কারণে পানির ওপরের পৃষ্ঠে নানা ধরনের স্রোত বা ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। অবশেষে উত্তাপে পানি ফুটতে থাকে। তেমনিভাবে পৃথিবীর ভেতরের অংশও উত্তপ্ত হওয়ার কারণে গলিত পদার্থগুলোর উত্তপ্ততার জন্য এক প্রচন্ড অস্থির অবস্থায় বিরাজ করছে সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত। এই উত্তপ্ত গলিত আলোড়িত পদার্থের ওপরে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের ওপরি ভাগ বা মাটির স্তর বিদ্যমান।

এই মাটির সুস্থিরতা আনয়নে পাহাড়-পর্বত ভূমিকা পালন করছে। পাহাড়-পর্বত ভূ-পৃষ্ঠের অনেক গভীর পর্যন্ত প্রোথিত থাকায় এবং বিস্তীর্ণ আয়তন জুড়ে মাটির নিচে পরস্পর সংযুক্ত থাকায় এই পৃথিবী পৃষ্ঠ স্থিরতা লাভ করেছে। পাহাড়-পর্বতগুলো মাটির নিচ দিয়ে একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত রয়েছে অর্থাৎ টানাটানি অবস্থায় আল্লাহ রেখেছেন। এটা এ জন্য রেখেছেন যেন পৃথিবী পৃষ্ঠের কোথাও সহজে ফাটল ধরে প্রাণী জগৎ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। পাহাড়গুলো একটির সাথে আরেকটি বিচ্ছিন্নও হতে পারে না। পাহাড়গুলোকে আল্লাহ যদি এভাবে না রাখতেন, তাহলে পৃথিবীর এই ভূ-পৃষ্ঠ কখনও সুস্থির হতো না এবং এখানে মানুষ বসবাস করতে সক্ষম হতো না। এটা যিনি করেছেন তিনিই হলেন রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَأَلْقَى فِى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ–

এবং তিনি ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতসমূহ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেন তোমাদের নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ কাঁপতে না পারে। (সূরা নাহ্‌ল-১৫)

মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে ডেকে বলেন, আমার সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখতো, আমি কী ভাবে সৃষ্টি করেছি। কোরআন বলছে–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ–وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ–

তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো, তিনি আকাশ মন্ডল সৃষ্টি করেছেন কোন ধরনের স্তম্ভ ব্যতিতই, তিনি যমীনের বুকে পর্বতমালা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে দিয়েছেন, যেন যমীন তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না যায়। তিনি সব ধরনের জীব-জন্তু যমীনের বুকে বিস্তার করে দিয়েছেন, আকাশ থেকে পানি বর্ষিয়েছেন এবং যমীনের বুকে রকমারী উত্তম জিনিসসমূহ উৎপাদন করেছেন। (সূরা লোকমান-১০)

এসব আয়াতে 'কাঁপা' বা 'হেলে' যাওয়া শব্দ দিয়ে আমরা যে মাটির ওপরে অবস্থান করছি সেই মাটিকে বা পৃথিবী পৃষ্ঠকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এসব আয়াত থেকে গোটা ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন বা আন্দোলিত হবার কথা বুঝানো হয়নি। বরং গোটা পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ আন্দোলিত না হয়েও ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন স্থান যে কোন মুহূর্তে আন্দোলিত হতে পারে। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর একটি দেশে ভূমিকম্প হলে অন্য দেশ তা অনুভব করতে পারে না। আবার একটি দেশের ভেতরেও একটি বিশেষ এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয় কিন্তু পার্শ্ববর্তী এলাকায় তা অনুভূত হয় না। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন হওয়ার জন্য পৃথিবীর গোটা ভূ-পৃষ্ঠ কাঁপার প্রয়োজন হয় না। ভূমিকম্পের কারণে স্থানীয়ভাবে ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন হয় এবং সেই কম্পন দূরবর্তী কোন স্থানকে প্রভাবিত নাও করতে পারে–সাধারণত্ব এটা করে না তাই আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ তা'য়ালা যদি পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি না করতেন তাহলে ভূ-পৃষ্ঠের এই স্থানীয় কম্পন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতো এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধিলাভ করতো। সূরা আম্বিয়ার ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ–

আমি ভূ-পৃষ্ঠে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে দিয়েছি যেন ভূ-পৃষ্ঠ তাদের নিয়ে কাঁপতে না পারে।

তিনিই পাহাড়গুলো প্রাচীর ন্যায় গেড়ে দিয়েছেন

রেল লাইনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইস্পাত নির্মিত পাতগুলোর নিচে রয়েছে অনেকগুলো ইস্পাতের পাত বা মোটা কাঠ। এগুলোর সাথে লোহার মোটা গজাল দিয়ে রেল লাইনগুলো অত্যন্ত মজবুতভাবে এঁটে দেয়া হয়েছে যেন ট্রেন চলাচলের সময় তা

নড়াচড়া করতে না পারে। তেমনি আল্লাহ তা'য়ালা পাহাড়-পর্বতগুলো গজালের ন্যায় ভূ-পৃষ্ঠের গভীরে গেঁথে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا-

আর পাহাড়গুলো গ্রাফীর ন্যায় গেড়ে দিয়েছি। (সূরা নাবা-৭)

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পাহাড়-পর্বতের উচ্চতা ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে যত পরিমাণ দৃষ্টিগোচর হয় তারচেয়েও অনেক বেশী মাটির অতলদেশে প্রোথিত রয়েছে। কোন পর্বতমূল ভূ-গর্ভের কতটা গভীরে প্রোথিত রয়েছে তা নির্ভর করে সেই পর্বতটির সৃষ্টির সূচনা কিভাবে হয়েছিল। অর্থাৎ আগ্নেয়গিরির লাভার মাধ্যমে তা সৃষ্টি হয়েছে না অন্য কোনভাবে। গড় হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০ থেকে ১৫ মাইল পর্যন্ত পুরু বা মোটা হতে পারে। এ কারণে পর্বতের মাটির নিচের মূল অংশ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০ থেকে ১৫ মাইল গভীরে প্রোথিত থাকতে পারে। এরচেয়ে অধিক গভীরে অতিরিক্ত উত্তাপের কারণে পদার্থগুলো গলিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, পাহাড়-পর্বতসমূহ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে উত্থিত হয়েছে এবং নিচের দিকেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। সুতরাং পাহাড়-পর্বতগুলো ভূ-পৃষ্ঠে গজালের ন্যায় বিদ্ধ হয়ে রয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা এ ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ বলেন-

وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا-مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ-

আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠে পর্বত প্রোথিত করে দিয়েছেন, জীবিকার সামগ্রী হিসেবে তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পশুর জন্য। (সূরা নাযিয়াত-৩২-৩৩)

আল্লাহ তা'য়ালা পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সঠিক অবস্থান দান করেছেন। পর্বতের এই সঠিক অবস্থিতির কারণে বাতাস তথা মেঘের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বৃষ্টি বর্ষণে সহায়ক হয়। পাহাড়-পর্বত থেকে প্রবাহিত নদ-নদীর পানি প্লাবিত হয়ে কৃষি কাজের জন্য মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিলাভ করে। নদ-নদীর পানি নিয়ন্ত্রিত করে দূর-দূরান্তে পানির সরবরাহ করা সম্ভব হয় এবং পানিবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। এভাবে নানা ধরনের খাদ্য সামাগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে এবং তা মানুষ ও প্রাণীকুলের আহার যোগাচ্ছে। এগুলো যিনি সম্পাদন করেছেন তাঁর নামই হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোরআন ঘোষণা করছে-

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهٰرًا-

এবং তিনি ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতমালা ও নদী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রা'দ-৩)

সুতরাং নাস্তিকদের ধারণানুযায়ী এ পৃথিবী কোন দুর্ঘটনার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। এ পৃথিবী সৃষ্টির পেছনে রয়েছেন একজন মহাবিজ্ঞানী-যাঁর নাম হলো আল্লাহ। তিনি এ পৃথিবীকে পরিকল্পনা ভিত্তিক সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ-

আমি যমীন ও আকাশমন্ডলকে এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী ঐ মহাশূন্যে যা কিছু রয়েছে, তা মহাসত্য ব্যতিত অন্য কোন ভিত্তির ওপর সৃষ্টি করিনি। (সূরা হিজর-৮৫)

খেল্-তামাসার বিষয়বস্তু করে এ পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়নি। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোন কিছুই এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ বলেন-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ-

আমি এই আকাশ ও যমীন এবং এর ভেতরে যা কিছুই রয়েছে, তার কোন কিছুকেই খেল-তামাসার ছলে সৃষ্টি করিনি। (সূরা আম্বিয়া-১৬)

পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ-مَاخَلَقْنٰهُمَآ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ-

এই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এর ভেতরে অবস্থিত জিনিসগুলো খেল-তামাসার ছলে সৃষ্টি করিনি। এগুলোকে আমি সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়। (সূরা দুখান-৩৮-৩৯)

আল্লাহ বলেন, আমি কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করিনি এবং অসুন্দর করেও সৃষ্টি করিনি। গোটা পৃথিবীর চারদিকে এবং নিজের দেহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, আমার সৃষ্টির নৈপূন্যতা লক্ষ্য করো-কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি তোমার চোখে পড়বে না। কোরআন চ্যালেঞ্জ করছে-

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا-مَاتَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ
تَفٰوُتٍ-فَارْجِعِ الْبَصَرَ-هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ-ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ
كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ-

তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছেন। তোমার মহাদয়াবানের সৃষ্টিকর্মে কোন ধরনের অসংগতি দেখতে পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখো, কোথাও কোন দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি ? বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমাদের দৃষ্টি ক্লান্ত-শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। (সূরা মুল্কঃ-৩-৪)

তিনিই সৃষ্টিতে ভারসাম্যতা রক্ষা করেছেন

তিনি রব্ব, কোন কিছুই ভারসাম্যহীন করে সৃষ্টি করেননি। যা সৃষ্টি করেছেন, তার ভেতরে ভারসাম্য রক্ষা করেই সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে মানব সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মানব

সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে মহান রব্ব এমন নিয়ম করে দিয়েছেন যে, তিনি বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আধিপত্য ও শক্তি সামর্থ লাভের সুযোগ দান করেন। কিন্তু কোন দল যখন সেই সীমা লংঘন করতে শুরু করে, তখন অপর এক মানব গোষ্ঠীকে দিয়ে তার শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। পৃথিবীতে যদি একটি দল ও একটি জাতির স্থায়ী প্রভুত্ব বিস্তারের ব্যবস্থা করা হতো এবং তার স্বৈরাচারী নীতি আর জুলুমমূলক ব্যবস্থা অমর অক্ষয় হয়ে থাকতো, তাহলে গোটা পৃথিবীতে এক চরম দুর্যোগ, ধ্বংস আর বিপর্যয় দেখা দিত। সূরা বাকারার ২৫১ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ-لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ-

আল্লাহ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের মাধ্যমে দমন না করতেন, তবে পৃথিবীর নিয়ম শৃঙ্খলা সব বিনষ্ট হয়ে যেতো। কিন্তু পৃথিবীবাসীদের প্রতি বড়ই করুণাময়।

এভাবে মহান আল্লাহ সমস্ত কিছুতেই ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। পৃথিবীর বুকে কোন জালিমই স্থায়ীভাবে তার জুলুমের রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। দম্ভ, অহঙ্কার স্থায়ী হয়নি। প্রাণীজগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও দেখা যায়, রাব্বুল আলামীন তাদের ভেতরে কি সুন্দর করে ভারসাম্য রক্ষা করছেন।

সামুদ্রিক কাছিমগুলোর যখন ডিম দেয়ার সময় ঘনিয়ে আসে তখন তারা রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের বেলাভূমিতে উঠে আসে, দিনের আলোয় আসে না। দিনের আলোয় এসে ডিম দিয়ে গেলে তা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর চোখে পড়বে। তার ডিম ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, তারপর পা দিয়ে তারা বালির ভেতরে গর্ত করে। গর্ত করা শেষ হলেই একের পর এক ডিম দিতে থাকে। মুরগী, হাঁস বা অন্যান্য পাখি যে সংখ্যক ডিম দিবে, তা প্রতিদিন একটি করে দিয়ে থাকে। আর কাছিম যে ডিমগুলো দিবে তা একই সময়ে একটির পর একটি করে দিতে থাকে। যতগুলো ডিম দেয়া প্রয়োজন, তা পনের বা বিশ মিনিটের মধ্যে দিয়ে দেয়। তারপর ডিমে পরিপূর্ণ গর্ত পায়ের সাহায্যে বালি দিয়ে ভরে দেয়।

ডিমের ওপরে বসে তা দিতে হয় না। মাটি বা বালির অভ্যন্তরীণ তাপেই ডিমগুলো নির্দিষ্ট দিন পরে ফোটে। যেখানে মাটি বা বালির ঘনত্ব বেশী সেখানেও তারা ডিম দেয় না। কারণ বাচ্চাগুলো তা দীর্ণ করে পৃথিবীতে আসতে পারবে না। সমুদ্রের পানি থেকে মাত্র দশ অথবা বিশ ফুট দূরে কাছিম এভাবে ডিম দেয়। অনেক দূর থেকে আসতে আসতে বাচ্চারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

স্থলে কাছিম দ্রুত গতিতে চলতে পারে না। এ জন্য তারা পানির খুব কাছেই ডিম দেয় যেন বাচ্চা বের হয়েই দ্রুত পানির ভেতরে যেতে পারে। সদ্যজাত বাচ্চাগুলো ডিম থেকে বেরিয়েই পানির দিকে ছুটতে থাকে। ওদের গতি পানির বিপরীত দিকে কখনোই হয়না। এই সাবধানতা অবলম্বন করে ডিমগুলো রক্ষা করতে হবে, পানির কাছাকাছি ডিম দিতে হবে,

বাচ্চাগুলোকে পানির দিকে ছুটতে হবে, কাছিমের ভেতরে যিনি এই চেতনা দান করেছেন, তিনিই হলেন রব্ব।

কাছিম ডিম দিয়ে চলে যায়, ওদের ডিমের অনুসন্ধানে চলে আসে শিয়াল, বেজি এবং অন্যান্য প্রাণী। এরা সন্ধান পেলেই ডিমগুলো খেয়ে নেয়। যেগুলোর সন্ধান পায় না সেগুলোর বাচ্চা ফোটে। এই বাচ্চাগুলো ডিম থেকে বেরিয়ে পানির দিকে যাবার পথে নানা ধরনের প্রাণী এদেরকে খেয়ে ফেলে। পানির ভেতরে বড় বড় মাছ এই বাচ্চাগুলো খেয়ে ফেলে। আল্লাহ তা'য়ালা যদি সমস্ত কাছিমের ডিম হেফাজত করে বাচ্চা ফুটিয়ে বাচ্চাগুলোকে বাঁচতে দিতেন, তাহলে গোটা পৃথিবীই কাছিমে পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। মহান রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ عِنْدَ نَا خَزَائِنُهُ–وَمَا نُنَزِّ لُهُ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ–

আমারই কাছে রয়েছে প্রতিটি বস্তুর অফুরন্ত ভান্ডার এবং আমিই তাদের সরবরাহ করি এক পরিজ্ঞাত পরিমাপে। (সূরা আল হিজর-২১)

কুমিরের ডিমেরও এই একই অবস্থা। কুমির স্থলে ডিম দিয়ে কোন কিছু দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর পাহারা দিতে থাকে। শিয়াল, বেজি এবং অন্যান্য প্রাণী কুমিরকে প্রহরা দিতে দেখেই বুঝে নেয়, ওখানে ওর ডিম আছে। ওরা কুমিরের গতি-বিধির ওপরে নজর রাখে। ডিমের কাছ থেকে একটু দূরে গেলেই ওরা এসে ডিম খেয়ে নেয়। তারপরেও যে বাচ্চাগুলো জন্ম নেয়, সেগুলোকে ধরে মাছসহ অন্যান্য প্রাণী খেয়ে নেয়। সমস্ত কুমির, সাপ, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি যত বাচ্চা দেয়, তা যদি বাঁচতে পারতো, তাহলে এই পৃথিবী আর মানুষ বসবাসের উপযোগী থাকতো না। এদের সৃষ্টির ভেতরে রাব্বুল আলামীন ভারসাম্যতা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন–

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى–الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى–

তোমার মহান শ্রেষ্ঠ রব্ব-এর নামের তস্‌বীহ্ করো। যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্যতা স্থাপন করেছেন। (সূরা আ'লা–১-২)

পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদেরও এই অবস্থা। আল্লাহ তা'য়ালা কোন একটি উদ্ভিদকেও মাত্রার অতিরিক্ত বিস্তৃতি ঘটতে দেন না। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ–

আল্লাহর বিধানে প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্ধারিত রয়েছে একটি পরিমাপ। (সূরা আর রা'দ–৮)

বিশেষ বিশেষ ঋতুতে অসংখ্য উদ্ভিদ জন্ম নেয়। আবার এমন ঋতু পৃথিবীতে আগমন করে, কতকগুলো উদ্ভিদ ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে। এভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীকে তাঁর বান্দাদের বসবাসের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সমস্ত সৃষ্টির ভেতরে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। বান্দাকে তিনিই প্রতিপালন করেন, বান্দার কল্যাণে এসব ব্যবস্থা তিনিই করেন। অতএব একমাত্র তাঁরই প্রশংসা ও দাসত্ব করতে হবে।

মানুষের প্রতি রব্ব-এর অনুগ্রহরাজি

মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং তিনি এই মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত রয়েছেন। মানুষ কি চায়, কিসে তার কল্যাণ এবং অকল্যাণ, বিষয়টি মানুষের চেয়ে যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন–তিনিই বেশী জানেন। মহান রব্ব মানুষের এই প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছেন। মানুষের জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তা তিনি যথাযথভাবে পৌছিয়েছেন। মানব সভ্যতা স্থিতি ও বিকাশ লাভের জন্য যেসব উপাদান অপরিহার্য তার সমস্ত কিছুই রাব্বুল আলামীন লাভ করার ব্যবস্থা করেছেন। আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছুই রয়েছে, তা এমন সব আইন ও বিধানের অনুগত করা হয়েছে যে, এসব থেকে যেন মানুষ কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়। তিনি যদি নৌ-যানকে কতকগুলো নিয়ম ও বিধানের অধীন না করতেন, তাহলে মানুষ কখনোই জলপথে ভ্রমণ করার কথা কল্পনাও করতে পারতো না। নদী, সাগর-মহাসাগরকে যদি বিশেষ নিয়মের অধীন না করতেন, তাহলে এসব থেকে মানুষ পানি বের করে এনে তা ব্যবহার করতে পারতো না। আকাশের ঐ বিশাল সূর্য এবং মায়াবী চাঁদকে যদি বিশেষ নিয়মে পরিচালিত না করতেন, তাহলে পৃথিবীতে মানব জীবনের উদ্গাম হতো না, কোনক্রমেই একটি বিকাশমান সভ্যতা বিকশিত হতো না। মহান আল্লাহই হলেন সমস্ত কিছুর একমাত্র রব্ব-তাঁর নিয়ামত গুণে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ-وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ-وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ-وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ-وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ-وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَاسَاَلْتُمُوْهُ-وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا-

আল্লাহ তো তিনিই, যিনি যমীন ও আকাশকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। আর তার সাহায্যে তোমাদেরকে রিযিক পৌছানোর জন্য নানা ধরনের ফল সৃষ্টি করেছেন, যিনি নৌ-যানকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও আয়ত্বাধীন করেছেন, যেন তার আদেশে তা নদী-সমুদ্রে চলাচল করে। আর নদ-নদীগুলোও তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন, তারা প্রতিনিয়ত চলছে। আর রাত ও দিনকেও তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সেসব কিছুই দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছো (তোমাদের স্বভাব ও প্রকৃতির দাবিই এসব)। তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও, তাহলে তা গুণতে পারবে না। (ইবরাহীম-৩২-৩৪)

এমন অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে এই পৃথিবীতে যা মানুষ চোখে দেখতে পায় না। এসব সৃষ্টি মানুষের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। আকাশ ও পৃথিবীতে বিপুল পরিমাণ জিনিস এমন রয়েছে যা

মানুষের কল্যাণ সাধন করে যাচ্ছে, অথচ কোথায় কত সেবক তার সেবা করে যাচ্ছে এবং কি ধরনের সেবা প্রদান করছে সে সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا-لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ-وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ-وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلاَّ بِشِقِّ الْاَنْفُسِ-اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً-وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ-

তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য পোষাক, খাদ্য এবং অন্যান্য নানাবিধ উপকারিতাও। তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য যখন সকালে তোমরা তাদেরকে চারণভূমিতে পাঠাও এবং সন্ধ্যায় তাদেরকে ফিরিয়ে আনো। তারা তোমাদের জন্য বোঝা বহন করে এমন সব স্থানে নিয়ে যায় যেখানে তোমরা কঠোর প্রাণান্ত পরিশ্রম না করে পৌছতে পারো না। আসলে তোমার রব্ব বড়ই স্নেহশীল ও করুণাময়। তোমাদের আরোহণ করার এবং তোমাদের জীবনের শোভা-সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। তিনি (তোমাদের কল্যাণার্থে) আরো অনেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো তোমরা জানো না। (সূরা আন্ নাহ্ল–৫-৮)

মানুষের প্রয়োজনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পশুদল সৃষ্টি করেছেন। তাদের চামড়া থেকে মানুষ নানা উপকার গ্রহণ করে। পশম দিয়ে কম্বল, পোষাক এবং অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত করে। গোস্ত খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। হাড় দিয়ে ব্যবহার্য সামগ্রী নির্মাণ করে। পশুর নাড়িভূড়িও মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। পাহাড়ী এলাকায় বন্ধুর পথে যেখানে কোন যান-বাহন চলে না, সেখানে পশুকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গভীর অরণ্যে কাঠের প্রয়োজনে বিশালাকারের গাছ কেটে তা বাইরে বের করে আনার জন্য এখানো হাতীকে ব্যবহার করা হয়। সেখানে কোন যান-বাহন প্রবেশ করতে পারে না। কাটা গাছের সাথে লোহার শিকল বেঁধে তার আরেক প্রান্ত হাতীর দেহে বেঁধে দেয়া হয়। হাতী তা টেনে ঘন জঙ্গলের বাইরে বের করে নিয়ে আসে।

আল্লাহ তা'য়ালা লোহা সৃষ্টি করেছেন, এই লোহা দিয়ে যমীন কর্ষণ করে ফসল উৎপাদন করা হয়। লোহা ব্যতিত মানব সভ্যতা সম্পূর্ণ অচল। নানা ধরনের যান-বাহন নির্মাণে, অস্ত্র প্রস্তুতকরণে, দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরীতে লোহা ব্যবহার করা হচ্ছে। আল্লাহ স্বর্ণ দিয়েছেন অল্প পরিমাণে আর লোহা দিয়েছেন বিপুল পরিমাণে। কারণ সোনার ব্যবহার কম আর লোহার ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। জলযান নির্মাণ লোহা ব্যতিত সম্ভব নয়। সূরা বনী ইসরাঈলের ৬৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ-اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا-

তোমার প্রকৃত রব্ব তো তিনিই যিনি সমুদ্রে তোমাদের নৌযান পরিচালনা করেন যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো। আসলে তিনি তোমাদের অবস্থার প্রতি বড়ই করুণাশীল।

আল্লাহ তা'য়ালা এমন রব্ব-যিনি পশুর ভেতরে তাঁর বান্দাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য মওজুদ রেখেছেন। সূরা নাহলের ৬৬ ও ৬৭ নং আয়াতে রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً-نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّرِبِيْنَ-وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا-

নিশ্চয়ই গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তাদের পেট থেকে গোবর ও রক্তের মাঝখানে বিদ্যমান একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই, নির্ভেজাল দুধ, যা পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর। এভাবে খেজুর গাছ ও আঙ্গুর লতা থেকেও আমি একটি জিনিস তোমাদের পান করাই, যাকে তোমরা মাদকে পরিণত করো এবং পবিত্র খাদ্যেও।

পশু যে খাদ্য আহার করে তা থেকে একদিকে রক্ত প্রস্তুত হয় এবং অন্যদিকে প্রস্তুত হয় মলমূত্র। কিন্তু এ পশুদের স্ত্রী জাতির ভেতরে আবার এই একই খাদ্য থেকে তৃতীয় আরেকটি জিনিসও প্রস্তুত হয়। বর্ণ, গন্ধ, গুণ-বৈশিষ্ট্য, উপকারিতা ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে গোবর আর রক্তের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। তারপর বিশেষ করে গবাদি পশুর মধ্যে এই দুধের উৎপাদন আল্লাহ এতটা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যে, পশু শাবকের প্রয়োজন পূরণ করার পরও মানুষের জন্যও উৎকৃষ্টতম খাদ্য বিপুল পরিমাণে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এরপর ফলের রস সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ রসের মধ্যে এমন উপাদানও রয়েছে যা মানুষের জন্য জীবনদায়ী খাদ্যে পরিণত হতে পারে, সেই সাথে এমন উপাদানও বিদ্যমান রয়েছে যে, যা পচে যাবার পরে তার মূল গুণ-বৈশিষ্ট্য হারিয়ে মাদকদ্রব্যে পরিণত হয়।

এখন মানুষ জীবনদায়ী এই রস থেকে পাক-পবিত্র রিযিক গ্রহণ করবে, না বিবেক, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি বিনষ্টকারী মাদক গ্রহণ করবে, তা মানুষের নিজের নির্বাচন ক্ষমতার ওপরে নির্ভর করে। মাদকদ্রব্য যে অপবিত্র, এ কথাও উল্লেখিত আয়াতে পরোক্ষ্যে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি রব্ব-শুকনো খেজুর গাছের ভেতরে তিনি মানুষের জন্য রিযিক রেখেছেন, গবাদি পশু আহার করে ঘাস, শুকনো খড় আর গুল্ম-লতা-পাতা। যিনি রব্ব তিনি এসব থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করেছেন। এমনভাবে ব্যবস্থা করেছেন যে, গরুর বাচ্চার

প্রয়োজনও পূরণ হবে সেই সাথে মানুষেরও প্রয়োজন পূরণ হবে। সূরা মু'মিনূনের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الاَنْعَامِ لَعِبْرَةً-نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ-

আর প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য গবাদি পশুদের মধ্যেও শিক্ষার বিষয় রয়েছে। তাদের পেটের মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে আরো অনেক উপকারিতাও রয়েছে, তাদেরকে তোমরা খেয়ে থাকো।

স্ত্রী জাতিয় গবাদি পশুর দেহের অভ্যন্তরে অন্ত্রের বস্তুনিচয় এবং রক্তের সংযোগের ফলে দুগ্ধ উৎপাদন হয় এবং তা মানুষ পান করে। শরীরে সাধারণ পুষ্টির জন্য যে বস্তুটির প্রয়োজন, তা মানুষ বা প্রাণী লাভ করে খাদ্যবস্তু থেকে। ভক্ষিত খাদ্যবস্তু প্রথমে পরিপাকযন্ত্রে পৌছায় এবং সেখানে তার রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে। সেই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে সারবস্তু নির্গত হয়, তা অন্ত্রে প্রবিষ্ট হবার পরে আবার রূপান্তরিত হয়।

এই রূপান্তরিত বস্তুটি একটি উপযুক্ত সময়ে অন্ত্রের আবরণের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসে দেহের সরবরাহ যন্ত্রের দিকে ধাবিত হতে থাকে। রূপান্তরিত সেই রাসায়নিক বস্তুটি প্রত্যক্ষভাবে রসবাহী নালী দিয়ে আর পরোক্ষভাবে মুখবাহী নালী দিয়ে প্রবাহিত হয়। তারপর সেই রূপান্তরিত রাসায়নিক বস্তুটি প্রথমে লিভারে উপনীত হয় এবং সেখান থেকে আবার পরিবর্তিত হয়। এরপর সেই রূপান্তরিত রাসায়নিক বস্তুটি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে যুক্ত হয় দেহের সরবরাহ যন্ত্রের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে। আর এ প্রক্রিয়াতেই সর্বশেষ রূপান্তরিত রাসায়নিক বস্তুটি রক্তধারার সাথে মিশ্রিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দেহের সর্বত্র। এই অদ্ভুত ও অপূর্ব জটিল ব্যবস্থা যিনি সম্পাদন করেন তিনিই হলেন রব্ব। এটা তাঁরই অনুগ্রহরাজি।

আধুনিক দেহতত্ত্ববিদগণ বলেছেন, দুধ যেসব উপাদানে প্রস্তুত হয়, সেসব উপাদান নিঃসৃত হয় দেহের মামারী গ্লান্ড নামক দেহস্থিত একটি রসস্রাবী গ্রন্থি থেকে। এই মামারী গ্লান্ড পরিপুষ্টি লাভ করে খাদ্যের সেই সারবস্তু থেকে, যে সারবস্তু বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও রূপান্তরের মাধ্যমে রক্তধারার সহায়তায় মামারী গ্লান্ডে পৌছায়। সুতরাং খাদ্যবস্তু থেকে যা কিছুই লাভ করা যায় তা রক্ত এবং একমাত্র রক্তই সেসব কিছুর সংগ্রাহক ও নিয়ামক হিসাবে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

এভাবে এই রক্তই দেহের অন্যান্য যন্ত্রের মতো মামারী গ্লান্ডেরও প্রয়োজনীয় পুষ্টিসাধন করে। এই প্রক্রিয়ায় রক্ত ও অন্ত্রের রাসায়নিক বস্তু সম্মিলিতভাবে মামারী গ্লান্ডে প্রস্তুত করে থাকে দুধ উৎপাদনের উপাদান। যে আল্লাহ অনুগ্রহ করে এসব কিছুর নিপুণ ব্যবস্থা করেছেন, তিনিই হলেন রব্ব অতএব একমাত্র প্রশংসা তাঁরই।

নদী, সাগর, সমুদ্রে জলযান নিয়ে মানুষ বেরিয়ে পড়ে। সেখানে মানুষের জন্য রিয্কের ব্যবস্থা আল্লাহ করে রেখেছেন। একশ্রেণীর মানুষ ধারণা করে, এসব জলযান বোধহয় আর্কিমিডিসের

সূত্র অনুসারে চলে। পানির ভেতরে যে বস্তু যতটুকু নিমজ্জিত হয়, নিমজ্জিত বস্তু পানির ততটুকু ভর অপসারিত করে এবং এ কারণে তা ভেসে থাকে। পানির মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা যদি নৌযানকে ভাসিয়ে রাখার গুণাগুণ দান না করতেন, কোন সূত্রই তা ভাসিয়ে রাখতে সক্ষম হতো না। সুতরাং বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের কৃপায় সমুদ্রে জাহাজ চলে না, সমস্ত জ্ঞানের ভান্ডার যাঁর হাতে নিবদ্ধ, সেই আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি করুণা করেই জলযানসমূহ চলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি সমগ্র আকাশ জগতে সীমা-সংখ্যাহীন বিশাল গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জকে যার যার গতি পথে অদৃশ্য স্তম্ভের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা করেছেন। কোন তারের সাহায্যে তাদের পরস্পরকে সংযুক্ত করে রাখা হয়নি। কোন বিশাল আকারের গজাল বা পেরেকের সাহায্যে তাদের একটির অন্যটির ওপর উল্টে পড়ে যাওয়াকে ঠেকিয়ে রাখা হয়নি। একমাত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই এ ব্যবস্থাকে সচল রেখেছে। গোটা সৃষ্টি জগতের রব্ব আল্লাহ বলেন–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ-وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ-

তিনি আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ছাড়াই, যা তোমরা দেখতে পাও। তিনি পৃথিবীতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন, যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে। তিনি সবধরনের জীব-জন্তু পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং জমিতে নানা ধরনের উত্তম জিনিস উৎপন্ন করি। (সূরা লোকমান–১০)

রাব্বুল আলামীন বলেন, নদী-সাগর ও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখো, পানির দুটো ধারা কিভাবে বয়ে চলেছে। একটি ধারা সুমিষ্ট আরেকটি ধারা লবণাক্ত। এই পানির ভেতরে নানা ধরনের মাছ আমি তোমাদের খাদ্য হিসাবে মওজুদ রেখেছি। তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ নানা ধরনের অলঙ্কার প্রস্তুত করার উপাদান রেখেছি। পবিত্র কোরআন বলছে–

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ-هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُه وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ-وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا-وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ-وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ-كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى-ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ-

পানির দুটো উৎস সমান নয়। একটি সুমিষ্ট ও পিপসা নিবারণকারী সুস্বাদু পানীয় এবং অন্যটি

ভীষণ লবণাক্ত যা কণ্ঠনালীতে ক্ষত সৃষ্টি করে, কিন্তু উভয়টি থেকে তোমরা সজীব গোস্ত লাভ করে থাকো, পরিধান করার জন্য সৌন্দর্যের সরঞ্জাম বের করো এবং এ পানির মধ্যে তোমরা দেখতে থাকো নৌযান তার বুক চিরে ভেসে চলছে, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন। চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি অনুগত করেছেন। এসব কিছু একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এ আল্লাহই তোমাদের রব, সার্বভৌমত্বও তাঁরই। (সূরা ফাতির)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এমন রব, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। লবণাক্ত পানি পান করার অযোগ্য কিন্তু লোনা পানির ভেতর দিয়ে মানুষ যখন জলযানে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তখন যদি তার পানির প্রয়োজন হয়, এ জন্য আল্লাহ্ সাগর-মহাসাগরের ভেতরে অসংখ্য মিষ্টি পানির স্রোতধারা প্রস্তুত করে রেখেছেন। তিনি বলেন-

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ-وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا-

আর তিনিই দুই সাগরকে মিলিত করেছেন। একটি সুস্বাদু ও মিষ্টি এবং অন্যটি লোনা ও খারযুক্ত। আর দু'য়ের মাঝে একটি অন্তরাল রয়েছে, একটি বাধা তাদের এককার হবার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে রেখেছে। (সূরা আল ফুরকান-৫৩)

পৃথিবীর কোন বড় নদী এসে যেখানে সাগরে মিলিত হয়, সেখানেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সমুদ্রের মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি পানির স্রোত পাওয়া যায়। সমুদ্রের ভীষণ লবণাক্ত পানির মধ্যেও মিষ্টি পানির স্রোত তার নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম। পারস্য উপসাগরেও মিষ্টি পানির স্রোত রয়েছে। চারদিকে লবণাক্ত পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে, আর মাঝখানে গোল বৃত্তের মতো মিষ্টি পানির স্রোত ঘুরছে। একটি লবণাক্ত পানির স্রোত এসে মিষ্টি পানির স্রোতের সাথে মিলিত হয়েছে, কিন্তু সে পানি পরস্পর মিলিত হয়ে আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে না। রাব্বুল আলামীন এমন এক অদৃশ্য প্রহরার ব্যবস্থা সেখানে করেছেন, যেন তারা পরস্পর মিলিত হতে না পারে। সূরা রাহ্মানের ২০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَنِ-بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّيَبْغِيَنِ -

দুটো সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন, যেন পরস্পরে মিলিত হয়। এরপরেও উভয়ের মাঝে একটি আবরণ আড়াল হয়ে রয়েছে, যা তারা অতিক্রম বা লংঘন করে না।

তিনিই প্রাণীসমূহকে শিক্ষা দিয়েছেন

পৃথিবীর এই মানুষগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলো কোন সাধারণ মানুষ সৃষ্টির সেই শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মহান আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস পোষণ করেনি। আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস পোষণ করেছে এবং বর্তমানেও করছে, শিক্ষিত শ্রেণীর ভেতরে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি। জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর তথাকথিত দার্শনিক-বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিগণই

আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। বিশ্বের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নাস্তিক্যবাদে আস্থাশীল ব্যক্তিবর্গ নানা ধরনের ডিগ্রী অর্জন করেও গ্রামের ঐসব নিরক্ষর কৃষকের সমপর্যায়ের যোগ্যতাও অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, যে কৃষক তার নিজের দেহ আর পালিত পশুর মল ত্যাগের দৃশ্য অবলোকন করে মহান আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস দৃঢ় করেছে। কৃষক যখন দেখেছে, তার পালিত পশুটি বৃক্ষ-তরুলতার পাতা আর ঘাস ভক্ষণ করে এবং মল হিসেবে ত্যাগ করে ভক্ষিত দ্রব্যের বিপরীত বস্তু, তখন তার চিন্তার জগতে এ কথার উদ্রেক হয়েছে, বিষয়টি কোন পরিকল্পনাবিদের পরিকল্পনা ব্যতিত কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারেনা। পদার্থের রূপান্তর এভাবে যিনি ঘটাচ্ছেন তার পেছনে একজন মহান স্রষ্টা নিশ্চয় রয়েছেন, যার নাম আল্লাহ এবং তিনিই আমাদের রব্ব, তিনিই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন।

নিরক্ষর কৃষক যখন তার নিজের হাতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, তার এই হাতটি কিভাবে খাদ্য উঠিয়ে নিয়ে মুখের কাছে আসে। হাতের এই অবস্থা দেখে তার চিন্তার সাগরে ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে। সহজ-সরলভাবে সে বুঝেছে, তার এই গোটা হাতের মধ্যে রয়েছে ছয়টি গ্রন্থি। এই গ্রন্থিগুলো না থাকলে তার এই হাত নামক অঙ্গটি একটি লাঠি ব্যতিত আর কিছুই হতো না এবং তা বক্র হয়ে মুখের কাছেও আসতো না। এক মহান সত্তার পরিকল্পনার অধীনে হাতে এই গ্রন্থিগুলো সৃষ্টি হয়েছে, সেই পরিকল্পনাবিদের নাম হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অক্ষর জ্ঞানহীন মজুর ব্যক্তিটি তার বাড়িতে পালিত কবুতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। সে দেখেছে, ক্ষুদ্রাকৃতির দুটো ডিম থেকে ১৭/১৮ দিনের ব্যবধানে বিস্ময়কর ছোট্ট দুটো বাচ্চা বেরিয়ে এলো।

একটি শস্যদানাও আহার করার এবং পরিপাক করার ক্ষমতা সদ্যফোটা কবুতরের বাচ্চার নেই। তাহলে কি খেয়ে বাচ্চা জীবিত থাকবে? এ চিন্তা বাচ্চা কবুতরের মা-বাবাকে করতে হয়নি। মহান আল্লাহ তা'য়ালার কি সুন্দর ব্যবস্থা দেখুন, কবুতর ডিমে তা দেবার জন্য বসার ৭ দিন পর থেকেই মা ও বাবা কবুতরের খাদ্য থলিতে পিজিয়ন মিল্ক তৈরীর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। আর বাচ্চা ফোটার সাথে সাথে অর্থাৎ ১৮ দিন থেকেই মাতাপিতা উভয় কবুতরের খাদ্য থলিতে এই দুধ যথেষ্ট পরিমাণে মওজুদ হয়।

বাচ্চা দুটোর জনক-জননী বাচ্চার মুখ নিজের মুখের মধ্যে নিয়ে উদগিরণ করে এই দুধ বাচ্চার খাদ্যনালীতে পৌঁছে দেয়। মা ও বাবা কবুতরের খাদ্যনালীতেই এই দুধ একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, বাচ্চা কবুতরের খাদ্যের উপযোগী এই দুধে রয়েছে ৭০ ভাগ পানি, ১৭. ৫ ভাগ আমিষ, ১০ ভাগ চর্বি এবং বাকী ২. ৫ ভাগ বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ। এ কারণে ৭ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত সদ্যফোটা বাচ্চা কবুতরের বাড়তি খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।

নিরক্ষর ব্যক্তিটি এ দৃশ্য দেখে চিন্তা করেছে, কবুতর আহার করে শক্ত শস্যদানা। কিন্তু যে কবুতরের ছোট্ট বাচ্চা রয়েছে সে কবুতরের সদ্যফোটা বাচ্চাকে মা-বাবা কবুতর খাওয়াচ্ছে, কিন্তু বাচ্চার থলিতে শস্যদানা নেই, রয়েছে এক ধরনের সাদা তরল পদার্থ। এর কারণ কি? এর কারণ হিসেবে তার সহজ-সরল বুদ্ধিতে ধরা পড়েছে, শক্ত শস্যদানা আহার করালে তার বাচ্চা এখন তা হজম করতে পারবে না। এ কারণে কবুতর তার ছোট্ট বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখার

জন্য নরম এমন কিছু বাচ্চার মুখে উদগিরণ করে দিচ্ছে–যেন বাচ্চা তা সহজে পরিপাক করতে পারে। বাকশক্তিহীন সামান্য একটি কবুতরকে এই প্রক্রিয়া অবলম্বনের জ্ঞান যিনি দান করেছেন, তার পরিচয় হলো রাব্বুল আলামীন।

গৃহপালিত গাভী বা ছাগল বাচ্চা প্রসব করেছে। সে বাচ্চা কিছুক্ষণ পরেই টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে গর্ভধারিণীর পেছনের দু'পায়ের মাঝে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে খাদ্যের সন্ধান করছে। দুধ মুখের ভেতরে নিয়ে চুষতে আরম্ভ করেছে আর মাথা দিয়ে বার বার দুধের স্থানের গোস্ত পিন্ডে আঘাত করেছে। বাচ্চা প্রসবের পূর্বে সে স্থানে দুধ ছিল বরফের মতই জমাট বাঁধা। শাবকের মাথার আঘাতে সে দুধ গলে গলে দুধবাহী নালীতে এসেছে আর শাবক তা চুষে পান করে উদর পূর্ণ করেছে। এই দৃশ্য যখন রাখাল অবলোকন করেছে, তখন তার মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে, এই প্রক্রিয়া সদ্যজাত ঐ শাবককে কে শিখিয়ে দিল ? তার মনের গহীন থেকে প্রশ্নের উত্তর এসেছে, শিক্ষাদাতা হলেন স্বয়ং আল্লাহ এবং তিনিই সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব।

মুরগীর বাচ্চার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, চিল বা বাজ পাখী দেখলে মা মুরগী একটা বিশেষ ধরনের শব্দ করে। সদ্যজাত মুরগী ছানা সে শব্দ শোনার সাথে সাথে আত্মগোপন করে। মা মুরগী একটা বিশেষ শব্দ করলো আর সদ্যজাত ছানাগুলো বুঝে নিল এটা একটি বিপদ সংকেত (Alarm or Signal of danger)। এখন ঐ বাচ্চাকে এই সিগ্‌ন্যাল সম্পর্কে কে অভিহিত করলো যে এটা বিপদ সংকেত ? এই বিপদ সংকেত বোঝার ক্ষমতা যিনি দান করলেন তিনিই হলেন রাব্বুল আলামীন। একশ্রেণীর নাস্তিকগণ বলে থাকেন যে, মুরগী ছানার জনক-জননীর ভেতরে ভীতির প্রবণতা বিদ্যমান ছিল, চিল বা বাজপাখী যে তাদের জন্য বিপজ্জনক এই প্রবণতা তাদের রক্তের ভেতরে বিদ্যমান। যে ধরনের অনুভূতি জনক-জননীর ভেতরে বিদ্যমান ছিল, প্রজননের মাধ্যমে যে বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করলো, ঐ প্রবণতা বাচ্চার ভেতরেও সংক্রামিত হলো।

এ কারণে মুরগীর বাচ্চা চিল দেখেই আত্মগোপন করেছে। তাদের এই যুক্তি যে কতটা অর্থহীন তা এই নাস্তিকগণ অনুভব করতে চায় না। এরা হলো হতভাগ্য, এ কারণে সামান্য বিষয় তাদের মাথায় প্রবেশ করে না। যেমন মানুষ সাপ দেখলে ভয় পায়। নারী-পুরুষ উভয়েই সাপ দেখলে ভয় পায়। এই নারী ও পুরুষ থেকে আরেকটি শিশু জন্মগ্রহণ করলো, এই শিশুটি যখন এক বা দেড় বছরের হলো তখন সে হাতের কাছে যা পায় তাই ধরতে শিখলো। তার সামনে যদি একটি বিষাক্ত সাপ এসে ফণা তুলে দাঁড়ায়, শিশু সাপ দেখে ভয় পেয়ে পালায় না বা চিৎকার দেয় না। সে খেলার ছলে সাপটিকে ধরতে যায়।

মাতা-পিতা সাপ দেখলে ভয় পায় অর্থাৎ তাদের ভেতরে ভীতির অনুভূতি বিদ্যমান ছিল। এই অনুভূতি কেন তার শিশু সন্তানের ভেতরে সংক্রামিত হলো না ? প্রকৃত অর্থে বিষয়টি হলো, মুরগীর বাচ্চার কাছে বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ নেই, তাকে হেফাজত করার কেউ নেই, এ কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে বোঝার তওফিক দান করেছেন কোনটা বিপদ সংকেত। আর মানুষের শিশুকে লালন-পালন করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন তার মাতা-পিতার ওপরে। এ কারণে শিশুর ভেতরে বিপদ সংকেত বোঝার মত অনুভূতি দেয়া হয়নি। এই ব্যবস্থা যিনি করেছেন, তাঁর নাম হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

বিড়ালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, তার যখন প্রসব কাল অত্যাসন্ন হয়ে ওঠে তখন সে নিরব নির্জন গোপন স্থান অনুসন্ধান করতে থাকে। প্রসবের কয়েক দিন পূর্ব থেকেই গর্ভবতী বিড়াল প্রসবের স্থান খুঁজতে থাকে। তারপর সে গোপন স্থানে বাচ্চা প্রসব করে। এই বাচ্চা সে একস্থানে রাখে না, কয়েক দিন পরপর সে স্থান পরিবর্তন করে। মা তার শাবকের ঘাড়ে আলতোভাবে কামড়ে ধরে স্থান পরিবর্তন করে। শত্রু যেন কোনক্রমেই তার শাবকদের সন্ধান না পায় এ জন্য মা বিড়াল এটা করে থাকে। শাবককে রক্ষা করার জন্য বিড়ালকে সতর্কতা অবলম্বনের অনুভূতি যিনি দান করেছেন, তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এসব দেখে সাধারণ মানুষের মনে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রচলিত যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার পরও এক শ্রেণীর পন্ডিত ব্যক্তি মহান আল্লাহ সম্পর্কে অবিশ্বাস পোষণ করেছে। যৌগিক পদার্থ আর মৌলিক পদার্থের পেছনে ছোটাছুটি করতে করতে এদের অনেকেই বয়সের শেষ প্রান্তে পৌছে গিয়েছে, কিন্তু নিরক্ষর কৃষকের মতো স্রষ্টার নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের সময় এদের ভাগ্যে জোটেনি। পৃথিবীতে এই শ্রেণীর লোকগুলো হলো সবচেয়ে হতভাগা। এরা আকার আকৃতি মানুষের মত দেখতে হলেও মহান আল্লাহ এদেরকে পশুর থেকেও নিকৃষ্ট বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ-لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّيَفْقَهُوْنَ بِهَا-وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَّيُبْصِرُوْنَ بِهَا-وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا-أُولٰئِكَ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ-أُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ-

এ কথা একান্তই সত্য যে বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তকরণ রয়েছে, কিন্তু তার সাহায্যে তারা চিন্তা-গবেষণা করে না। তাদের চোখ রয়েছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের শ্রবণ শক্তি রয়েছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শুনতে পায় না। তারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মত, বরং তা থেকেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমগ্ন। (সূরা আ'রাফ-১৭৯)

যারা মহান আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারা এই সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। কারণ তাদের বুঝার মত জ্ঞান রয়েছে, এই জ্ঞান দিয়ে তারা সমস্ত কিছুই অনুভব করলো, অনুভব করতে পারলো না শুধু মহান আল্লাহকে। এদের দর্শনশক্তি এবং শ্রবণশক্তি রয়েছে, আল্লাহর দেয়া এসব শক্তির সাহায্যে তারা পৃথিবীর সমস্ত কিছুই দেখেছে এবং শুনেছে কিন্তু মহাসত্য তারা দেখতে পায়নি; মহাসত্যের বাণী তারা শুনেও শোনেনি। এ জন্যই এদেরকে পশু পদবাচ্যে বিশেষিত করা হয়েছে। আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তিদেরকে পশু পদবাচ্যে চিহ্নিত করার কারণ হলো, এক শ্রেণীর পশু তার মনিবের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত এবং অবগত। বর্তমান পৃথিবীতে অনেক দেশেই বাড়িতে কুকুর লালন-পালন করা হয়।

বিভিন্ন দেশের সরকারের কুকুর বাহিনী রয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরগুলো লুকায়িত মাদক দ্রব্যের, অস্ত্রের সন্ধান জানিয়ে দেয় এবং অপরাধীকে সনাক্ত করতে পারে। গৃহপালিত কুকুর চৌকিদারের ভূমিকা পালন করে। তার শ্রবণ ইন্দ্রিয় সজাগ করে সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে

আক্রমণ করার জন্য ছুটে যায়। সুতরাং কুকুরের মতো একটি প্রাণীও তার মনিবকে চিনে। কিন্তু মানুষের মতো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ একটি জীব যখন তার আপন প্রভু আল্লাহকে চিনতে ব্যর্থ হয়; আল্লাহকে অস্বীকার করে তখন তো সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। কারণ পশুর যে যোগ্যতা বিদ্যমান, সে যোগ্যতা আল্লাহকে অস্বীকারকারী ঐ মানুষ অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

আল্লাহ যে রব্ব-এ কথার ওপরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যেমন পানি, পানির অপর নাম হলো জীবন। কিন্তু এই পানি আবার জীবনহানির কারণও ঘটাতে পারে এ কথা মানুষ বিশ্বাস করে। প্লাবন যখন তীব্র গতিতে আসে, তখন বিশাল বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায়, অসংখ্য ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদের ক্ষতি হয়, প্রাণহানী ঘটে। পানির মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা এমন গুণাবলী দান করেছেন, যা দ্বারা কল্যাণও লাভ করা যায়, আবার অকল্যাণও হতে পারে-পানির এই গুণাবলীর প্রতি মানুষ বিশ্বাসী। গোটা সৃষ্টিকে প্রতিপালন করার জন্য পানি একান্ত প্রয়োজনীয়। এই পানির ব্যবস্থা করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

এই পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ হলো পানি আর এক ভাগ হলো স্থল। পানির ভাগ বেশী করার কারণ হলো, পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখা। পানি ব্যতিত পৃথিবী টিকে থাকতে পারে না। এ কারণে আল্লাহ পাক বিশাল আকারের জলাধার নির্মাণ করেছেন। সাগর মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন। এসবের পানি প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বত্র পৌঁছতে সক্ষম হবে না বলে আল্লাহ ছুব্হানাহু তা'য়ালা খাল-বিল, নদী-নালা, হাওড় নির্মাণ করেছেন। মাটির প্রতিটি স্তরে তিনি পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

এত পানির ব্যবস্থা করার পরও চাহিদা পূরণ হবে না বলে মহান আল্লাহ বৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি তাপ সৃষ্টি করেছেন। এই তাপের কারণে পৃথিবীর জলভাগের পানি বাষ্প আকারে উর্ধ্বে চলে যায়। তারপর তা মেঘমালায় পরিণত হয়। তারপর তা আল্লাহর আদেশে শীতল থেকে শীতলতর হতে থাকে। এক সময় তা প্রচন্ড ভারী হয়ে যায়। আল্লাহ আদেশ দান করেন, বৃষ্টির আকারে পানি পৃথিবীর বুকে ঝরতে থাকে। এ পৃথিবীর কোথায় কোন কোণে একটি শুষ্ক বালু কণা অবস্থান করছে, আল্লাহ পাক সেটাকেও সিক্ত করার সুব্যবস্থা করেন।

এমনিভাবে মানুষ বিষের গুণাবলী, বিভিন্ন খাদ্যের গুণাবলী, মৃত্তিকার গুণাবলী তথা দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান যাবতীয় বস্তুর প্রতি মানুষ শুধু বিশ্বাস-ই করে না, এসব বস্তুর গুণাবলীর প্রতিও মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। আগুনের অস্তিত্বেই মানুষ শুধু বিশ্বাস করে না, আগুন যে একটি দাহ্য বস্তু, আগুনের দহন ক্ষমতা রয়েছে, এ কথা প্রতিটি মানুষই বিশ্বাস করে। সাপের অস্তিত্বে মানুষ যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি সাপের এ গুণাবলীর প্রতিও মানুষ বিশ্বাস করে, সাপ দংশন করলে তার বিষের ক্রিয়ায় প্রাণ হারাতে হবে। মানুষ বনের হিংস্র বাঘের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সেই সাথে এ কথাও মানুষ বিশ্বাস করে যে, বাঘের ভেতরে হিংস্রতা বিদ্যমান। বাঘের এই গুণাবলীসহ মানুষ বাঘের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে থাকে।

এই পৃথিবীতে মানুষ শুধুমাত্র বস্তুর প্রতিই বিশ্বাস করে না, বস্তুর গুণাবলীসহ বস্তুকে বিশ্বাস করে। ঠিক তেমনি, শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করলেই যথাযথ অর্থে আল্লাহর

খলীফা বা প্রতিনিধি হওয়া যাবে না, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে না, জাহান্নাম থেকে মুক্তিও লাভ করা যাবে না। আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পূর্ণ ধারণা না থাকলে ইসলামী আন্দোলনের কোন কর্মীর পক্ষে ময়দানের প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকাও যাবে না। এ জন্য মুমীন হতে হলে আল্লাহ পাকের অস্তিত্বে যেমন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হতে হবে, সেই সাথে মহান আল্লাহর গুণাবলীর প্রতিও গভীর আস্থাশীল হতে হবে। মহান আল্লাহ হলেন সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান এবং যা কিছু মানুষের দৃষ্টি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে বিদ্যমান, তারও স্রষ্টা হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। আল্লাহ ব্যতিত এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, যে শক্তি মাছির সামান্য একটা পাখা তৈরী করতে সক্ষম। তবে মানুষকে এ জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা বস্তুর রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম-কিন্তু স্বয়ং সে কোন বস্তুর স্রষ্টা নয়। বস্তুর স্রষ্টা হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

তিনি প্রতিপালক। অর্থাৎ তিনি শুধু স্রষ্টাই নন, সমস্ত কিছু সৃষ্টি তিনি তার সৃষ্টির প্রতিপালক হিসেবে অন্য কোন শক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করেননি। তিনি তার যাবতীয় সৃষ্টির লালন ও পালন কর্তা। কোথায় কোন সৃষ্টি অবস্থান করছে, কোন সৃষ্টির কখন কি প্রয়োজন, এ সম্পর্কে তিনি উদাসীন নন। সাগর-মহাসাগরের অতল তলদেশে শৈবালদামে আবৃত প্রস্তর খন্ডে বসবাসরত এমন ক্ষুদ্র একটি পোকা, যা ম্যাগ্নিফাইং (Magnifying) গ্লাসের সাহায্য ব্যতিত দৃষ্টি গোচর হবে না, সে পোকাটিরও আহারের ব্যবস্থাসহ যাবতীয় প্রয়োজন তিনিই পূরণ করে থাকেন। মানুষের দৃষ্টি যেখানে পৌঁছে না এবং যেখানে অনুভূতিও ক্রিয়াশীল থাকে না, এমন কোন স্থানে কোন সৃষ্টি যদি বিপদগ্রস্থ হয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, সে আর্তনাদ তিনি শোনেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনিই যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী।

তিনি স্রষ্টা, তিনিই প্রতিপালক এবং সমস্ত সৃষ্টির অনুপম সৌন্দর্য তিনিই দান করেছেন, পৃথিবীকে যেমনভাবে সৃষ্টি করলে অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে উঠবে, তিনি সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি জীবসমূহের যে অঙ্গ দেহের যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তিনি স্থাপন করেছেন। যে-বস্তুর মধ্যে যে ধরনের গুণাবলী উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, সে বস্তুর ভেতরে তিনি সেই গুণাবলীই দান করেছেন। প্রতিটি খাদ্যবস্তুকে তিনি তার বান্দার আহারের জন্য আবৃত করে দিয়েছেন। যাবতীয় প্রশংসামূলক কর্ম এবং প্রশংসাযোগ্য কার্যাবলী তিনিই সম্পাদন করে থাকেন। এ জন্য যাবতীয় প্রশংসার একমাত্র যোগ্য সত্তা হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

তিনিই সর্বশক্তিমান; সমস্ত কিছুর ওপরে তিনিই একমাত্র শক্তিশালী এবং তাঁর শক্তি সমস্ত কিছুর ওপরে পরিব্যপ্ত। তাঁর শক্তির মোকাবেলায় তাঁরই সৃষ্টি অন্যান্য শক্তিসমূহ সম্পূর্ণভাবে অসহায়। তাঁর শক্তির সামনে দৃশ্যমান যাবতীয় শক্তি একেবারেই ভঙ্গুর। তিনি মুহূর্তেই সমস্ত কিছু ধ্বংস স্তুপে পরিণত করতে সক্ষম এবং প্রজ্জ্বলিত অনলকুন্ড পুষ্পকাননে পরিণত করতেও সক্ষম। মানুষ যাকে মহাশক্তিশালী হিসেবে জ্ঞান করে, আল্লাহর শক্তির তুলনায় এসব শক্তির সামান্যতম কোন মূল্য নেই। মানুষের কাছে অসম্ভব বলে যা বিবেচিত হয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তা অত্যন্ত সহজ।

মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবি কাঠি একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহ ব্যতিত এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, যে শক্তি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তিনিই মানুষকে ধন-দৌলত দান করতে পারেন, আবার তিনিই মানুষকে অসহায় দরিদ্রে পরিণত করতে পারেন। তিনিই মানুষকে বিপদগ্রস্থ করতে পারেন, আবার তিনিই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। এ সমস্ত গুণ আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো ভেতরে উপস্থিত নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذاً مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ-

আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কোন সত্তাকে ডেকো না যারা তোমার কোন কল্যাণ করার বা কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। যদি তোমরা এমন কাউকে ডাকো তাহলে তোমরা জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা ইউনুছ-১০৬)

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন, তাহলে তা আল্লাহ ব্যতিত আর কেউ-ই দূর করতে পারে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ দান করতে ইচ্ছে পোষণ করেন, তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়। মানুষসহ যে কোন প্রাণীর আহার দাতা একমাত্র তিনিই। তিনি ব্যতিত খাদ্যের ব্যবস্থা আর কেউ করতে পারে না। কোথা থেকে কিভাবে তিনি মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীর আহারের ব্যবস্থা করবেন, এ দায়িত্ব একমাত্র তাঁরই। সমস্ত প্রাণীর খাদ্যের ব্যবস্থা তিনিই সম্পাদন করে থাকেন। তিনি যদি ইচ্ছে করেন, কাউকে তিনি অনাহারে রাখবেন, সেটাও তিনি পারেন আবার তিনি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কাউকে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত রিয্ক প্রদান করবেন, তাও তিনি পারেন।

তাঁর সিদ্ধান্তে কেউ পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয়, তাঁর কার্যাবলীতে কেউ হস্তক্ষেপ করতেও সক্ষম নয়। যা ইচ্ছা তিনি তাই করতে সক্ষম। সমস্ত সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কোন প্রয়োজনের জন্য তাঁকে কারো দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয় না। বরং সমস্ত সৃষ্টিই নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার দিকে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি মেলে থাকে। মাতৃগর্ভে যে সন্তান অবস্থান করছে, সে সন্তান কি আহার করে বৃদ্ধি লাভ করবে, এ চিন্তা সন্তানের জনক-জননীকে করতে হয় না। পৃথিবীর কোন কর্তৃত্ব পরায়ণ শক্তিও গর্ভস্থ সন্তানের আহারের চিন্তা করে না। আহার দাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, মাতৃগর্ভে ঐ সন্তানকে জীবিত রাখার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় তার আহারের ব্যবস্থা করেন।

মুরগীর ডিম দেয়া যখন শেষ হয়ে যায়, আল্লাহ তা'য়ালা ঐ মুরগীর শরীরের স্বল্প মেয়াদী এক ধরণের জ্বর সৃষ্টি করে দেন। ফলে মুরগীর শরীরে ঐ পরিমাণ উত্তাপের সৃষ্টি হয়, যে পরিমাণ

উত্তাপ থাকলে ডিম ফুটে বাচ্চা নির্গত হবে। ডিম দেয়া শেষে মুরগীর শরীরের যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, এর ফলে মুরগীর ভেতরে জড়তা সৃষ্টি হয়। মুরগী এক স্থানে বসে থাকতে চায়। বাচ্চা ফোটানোর জন্য মুরগি ডিমগুলো পেটের নিচে নিয়ে শুধু নিরবে বসেই থাকে না। নিজের মুখের সাহায্যে ডিমগুলো সে দিনের মধ্যে কয়েক বার ওলট-পালট করে দেয়-যেন সবগুলো ডিম সমপরিমাণ তাপ লাভ করতে পারে।

এরপর ডিমের মধ্যে যখন বাচ্চার অস্তিত্ব দেখা দিল, তখন তার আহারের প্রয়োজন হয়। ডিমের মধ্যে সাধারণত দুটো অংশ দেখা যায়। একটি হলো সাদা অংশ আরেকটি হলো কুসুম বা হলুদ অংশ। ঐ হলুদ অংশ থেকে বাচ্চা সৃষ্টি হলো। আর এই বাচ্চা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে তার চারপাশে অবস্থিত সাদা অংশগুলো, ফলে ডিমের খোসা ঘনত্ব হারিয়ে ফেলে। যেদিন খাবার শেষ হয়ে যায়, সেদিন বাচ্চা নিজের ঠোঁটের সাহায্যে ঠোকর দিয়ে ডিমের পাতলা খোসা ভেঙ্গে পৃথিবীর আলো-বাতাসে বেরিয়ে আসে। এই ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক পন্থায় যিনি সম্পাদন করেন, তাঁর নাম হলো রব্ব।

পিঁপড়াকে ও মাছিকে দেয়া হয়েছে তীব্র ঘ্রাণশক্তি। দশতলায়, বারোতলায় কোন খাদ্য রাখা হলে এরা সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তিন থেকে সাড়ে তিন মাইল উর্ধ্বে চিল এবং শকুন উড়তে থাকে। সেখানে কোন খাদ্য ছড়ানো নেই। তাদের খাদ্য লাভের উৎস কি? আল্লাহ হলেন এমন রব্ব-তিনি এসব প্রাণীকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। ভূ-পৃষ্ঠে কোথায় কোন প্রাণীর মৃতদেহ পড়ে আছে, তারা সেখান থেকে তা দেখতে পায়। তারপর তীব্র বেগে নেমে এসে তা ভক্ষণ করে। এরই নাম হচ্ছে রবুবিয়াতে ইলাহি। যার যা প্রয়োজন তিনি তাকে তাই দান করেছেন।

শামুকের ওপরের আবরণ অত্যন্ত শক্ত। চিল এবং বাজ পাখির আরেকটি খাদ্য হলো এই শামুক। কিন্তু শক্ত আবরণ ঠোকর দিয়ে ভেঙে ওরা শামুকের গোস্ত খেতে পারে না। জন্তু-জানোয়ারের বড় হাড় ভেঙে ওরা মজ্জা খেতে পারে না। এ জন্য চিল-বাজ হাড় এবং শামুক মুখে নিয়ে অনেক ওপরে চলে যায়। তারপর সেখান থেকে তা কোন শক্ত পাথুরে স্থানে ফেলে দিয়ে ভেঙে খায়। উট পাখির ডিমও ওরা এভাবে খেয়ে থাকে। হায়েনা, সিংহ বা বাঘ, এরা বিশাল আকারের বন্য গরু এবং মোষকে একা ধরে খেতে পারে না। কারণ এদের শক্তি বেশী। এ জন্য এসব হিংস্র প্রাণী দলবদ্ধভাবে এসে তারপরে ধরে খায়।

চিতা বাঘ যখন শিকার ধরতে যায় তখন একা যায় না। চার পাঁচটি চিতা একত্রিত হয়ে প্রথমে শিকারকে টার্গেট করে। শিকারকে তাড়া করলে সে কোন কোন পথ দিয়ে দৌড়ে পালাতে পারে সেদিকগুলো এরা নির্দিষ্ট করে নেয়। শিকার সাম্ভাব্য যে পথ দিয়ে পালাতে পারে, সেসব পথের ঝোপ-ঝাড়ে কতকগুলো চিতা লুকিয়ে থাকে এবং একটি চিতা শিকারকে তাড়া করে। শিকার দৌড়ে পালানোর সময় ঝোপে লুকিয়ে থাকা চিতা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলে। প্রাণীজগতকে এ ধরনের কৌশল যিনি শিক্ষা দিয়েছেন তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

রব্ব-এর ব্যবস্থাপনায় কোন অংশীদার নেই

সেই প্রাচীনকাল থেকেই একশ্রেণীর মানুষ ধারণা করে নিয়েছে যে, আল্লাহ্ একা তাঁর সৃষ্টিকার্য ও সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেননা। এসব কাজ সম্পাদন করার ব্যাপারে তাঁর সাহায্যকারী রয়েছে। তাঁর সন্তান রয়েছে এবং তারা তাকে সাহায্য করে অথবা তিনি ফেরেশ্তা, জ্বিন, দেবদেবী এবং মানুষের মধ্যে যারা ওলী তাদেরকে আল্লাহ্ নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিভিন্ন বিভাগ এবং নিজের রাজত্বের বিভিন্ন এলাকা তাদের ব্যবস্থাপনায় দিয়ে দিয়েছেন। অমুক ওলীর হাতে আল্লাহ ধন-ভান্ডারের চাবিকাঠি উঠিয়ে দিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। অমুক দেবতার পূজা-অর্চনা করলে ধন-ঐশ্বর্য লাভ করা যাবে। অমুকের মাজারে মানত করলে রোগ থেকে মুক্তি ও মনের আশা পূরণ হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের বোঝা বহনে অক্ষম হয়ে এদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছেন। মূর্খ ও অজ্ঞলোকদের এসব ধারণার প্রতিবাদ করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَّلَمْ يَكُنْ لَّه شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْراً–

বলো সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি কোন পুত্রও গ্রহণ করেননি। তাঁর বাদশাহীতে কেউ শরীকও হয়নি এবং তিনি এমন অক্ষমও নন যে কেউ তাঁর সাহায্যকারী ও নির্ভর হবে। আর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো–চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্ব। (সূরা বনী ইসরাঈল–১১১)

সৃষ্টির কোন কিছুতেই কারো কেন অংশীদার নেই, রাব্বুল আলামীন এসব ব্যাপারে কারো সাহায্য গ্রহণ করেন না এবং কারো পরামর্শ গ্রহণ করারও কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধানকারী একমাত্র তিনিই। কোরআন বলছে–

مَالَهُمْ مِّنْ دُوْنِه مِنْ وَّلِىٍّ–وَّلاَ يُشْرِكُ فِىْ حُكْمِه اَحَداً–

পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্বাবধানকারী তিনি ব্যতীত আর কেউ নেই এবং নিজের শাসন কর্তৃত্বে তিনি কাউকে শরীক করেন না। (সূরা আল কাহ্ফ–২৬)

মহান আল্লাহই এ বিশ্ব-জাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক এবং তাঁর শাসন ক্ষমতায় কারো কোন সামান্যতমও অংশ নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কোন রব্ব বা মাবুদ নেই। মানুষ যাকে মাবুদ বা রব্ব-এ পরিণত করে, সে এ কথা মনে করেই করে যে তার কাছে কোন শক্তি আছে যে কারণে সে আমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ করতে সক্ষম এবং আমাদের ভাগ্যের ওপর লাভ-ক্ষতির প্রভাব বিস্তার করতে পারে। শক্তিহীন ও প্রভাবহীন সত্তাদেরকে আশ্রয়স্থল করতে কোন একান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও সম্মত হতে পারে না।

এ জন্য আল্লাহ্ বলেন, সমস্ত শক্তির অধিকারী আমি আল্লাহ–আমিই রব্ব। লাভ-ক্ষতি যা হয়ে থাকে তা আমারই নির্দেশে হয়ে থাকে। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, যারা আমাকেই একমাত্র রব্ব হিসাবে গ্রহণ করেছে, তারা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করার জন্য অন্য কোন কিছুর সামনে

মাথানত করে না। একমাত্র আমার সামনেই মাথানত করে। তাদের হাত যখন নজরানা পেশ করে তখন তা আমার জন্যই পেশ করে। কোনকিছু কোরবানী দিতে হলে আমার উদ্দেশ্যেই দিয়ে থাকে। তাদের কণ্ঠ থেকে কোন প্রশংসা বের হলে তা আমার উদ্দেশ্যেই বের হয়। তাদের প্রার্থনার প্রয়োজন হলে আমার কাছেই প্রার্থনা করে। কারণ একমাত্র আমাকেই তাঁরা রব্ব হিসাবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং, আমার রাজত্বে কাউকে শরীক করো না।

মহান রব্ব হলেন শক্তির পূর্ণতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ, তিনি বিশ্বজাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টিকারী ও তার ক্ষমতা নির্ধারণকারী। তিনি বড়ই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ; সমগ্র রাজত্ব তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তাঁর ক্ষমতায় অংশীদার হবার যোগ্যতা ও মর্যাদা কারো নেই এবং থাকতে পারে না। কারণ তাঁর সত্তা সব ধরনের শির্কের গন্ধমুক্ত। তাঁর সমজাতীয় কোন শক্তির অস্তিত্ব কোথাও নেই। তাঁর সত্তার সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন দৃষ্টান্ত ও সমকক্ষ বা তুলনীয় কেউ নেই। তাঁর কোন ধ্বংস নেই-পরিবর্তন নেই। তাঁর স্থলাভিষিক্তের জন্য কোন পুত্রেরও প্রয়োজন নেই এবং তাঁর ক্ষমতার ভাগ দেয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ বলেন-

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ -

যিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক, যিনি কাউকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেননি, যাঁর সাথে রাজত্বে কেউ শরীক নেই। (সূরা আল ফুরকান-২)

অতএব আল্লাহর রবুবিয়াতের সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। একমাত্র তাঁকেই রব্ব হিসাবে গ্রহণ করে যাবতীয় ব্যাপারে তাঁর ওপরেই ভরসা করতে হবে। মানুষ অন্য মানুষের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে ভরসা করে প্রতারিত হয়। কিন্তু আল্লাহর ওপরে ভরসা করে ঠকার কোন সম্ভাবনাই নেই। তাঁর ওপরেই বান্দাকে ভরসা করতে হবে। আল্লাহ বলেন-

وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا-

এবং ভরসা করার জন্য তোমার রব্বই যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল-৬৫)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খ মানুষ যে অংশীদারিত্বের ধারণা পোষণ করে, আল্লাহ তা'য়ালা সেসব থেকে মুক্ত। যে কোন ধরনের দুর্বলতা ও শির্কের পঙ্কিলতা থেকে রাব্বুল আলামীনের সত্তা পাক ও পবিত্র। পবিত্র কোরআনের সূরা সা-ফ্ফাতে বলা হয়েছে-

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ-وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ-وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

তারা যেসব কথা তৈরী করছে তা থেকে পাক-পবিত্র তোমার রব্ব, তিনি মর্যাদার অধিকারী। আর সালাম প্রেরিতদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই জন্য।

তাঁরই প্রশংসা–জগতসমূহের রব্ব যিনি

সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। এই আল্লাহ কে–এ প্রশ্নের উদয় হবার পূর্বেই জবাব এসেছে যিনি রব্ব। কোন সে রব্ব–এ প্রশ্ন উদয় হবার পূর্বেই জবাব দেয়া হয়েছে, আলামীন–রাব্বুল আলামীন, সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব। অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর যিনি সৃষ্টি জগতসমূহের প্রতিপালক, মালিক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, মনিব, স্রষ্টা, পরিবর্তনকারী, পরিবর্ধনকারী, প্রয়োজন পুরণকারী, দাসত্ব লাভের অধিকারী ইত্যাদি। পবিত্র কোরআনের প্রথম সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতেই বহুমাত্রিক জগতের ধারণা দেয়া হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। তাহলো বর্তমান যুগকে অত্যাধুনিক যুগ বলে দাবি করা হয়। বিজ্ঞান দিয়েই সমস্ত কিছুর সত্যতা নির্ধারণ করা হয়। যে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মানদন্ডে উত্তীর্ণ হবে তাকেই একমাত্র ও চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করার এক অযৌক্তিক মানসিকতা জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জন্মলাভ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাব এই কোরআনই হলো বিজ্ঞানের মূল উৎস। বিজ্ঞানের নবতর আবিষ্কারের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বিজ্ঞান কোরআনের কাছে ভিক্ষার হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকবে। কোরআন যে কথা প্রায় পনের শত বছর পূর্বে পৃথিবীর মানুষের সামনে পেশ করেছে বিজ্ঞান সে কথাই নতুন করে পৃথিবীবাসীকে শোনাচ্ছে। বিজ্ঞান বলছে, জগৎ একটি নয় অসংখ্য জগৎ বিদ্যমান। অথচ বহুমাত্রিক জগতের ধারণা আল্লাহর কোরআন বহুপূর্বেই পৃথিবীবাসীকে দিয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি এবং ব্লাকহোল ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞান মাত্র কিছুদিন পূর্বে ধারণা দিয়েছে, পৃথিবী ব্যতীতও অন্য কোথাও প্রাণের উৎস থাকতে পারে এ ধারণা আল্লাহর কোরআন বহুপূর্বেই দিয়েছে।

সুতরাং, আল্লাহর কোরআনের সত্যতা বিজ্ঞান প্রমাণ করবে না, বিজ্ঞানের সত্যতাই আল্লাহর কোরআন প্রমাণ করবে। একটি মাত্র কোষ থেকে মানুষ সৃষ্টি লাভ করেছে। আলো, তাপ, বাতাস ব্যতীত উদ্ভিদ বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে না, ফুলের পরাগায়ন পদ্ধতি, মৌমাছীর কলা-কৌশল, মরুজাহাজ উটের পানি ধারণ ক্ষমতা, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিকাশ সাধন, সৃষ্টির সমতা, প্রতিটি গ্রহের আবর্তন-বিবর্তন, যার যার কক্ষপথে পরিভ্রমণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞান স্বল্প কিছুদিন পূর্বে ধারণা পেশ করেছে। আর এসব তথ্য আল্লাহর কোরআন সপ্তম শতাব্দীতেই মানুষকে অবহিত করেছে এবং এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। অতএব বিজ্ঞানের আবিষ্কার যত বৃদ্ধি লাভ করবে ততই বিজ্ঞান কোরআনের কাছে ঋণের জালে বন্দী হবে।

সাধারণতঃ মানুষ এই পৃথিবীকেই প্রথম ও শেষস্থল বলে জানতো। এরপর মানুষ ধারণা লাভ করলো মানুষের জীবনাবসানের পরে পরলোক বলে আরেকটি জগৎ রয়েছে। কোরআনে বর্ণিত বহুমাত্রিক জগতের ধারণা পেয়ে চিন্তাশীল মানুষ যখন গবেষণা করেছে, তখন তারা 'আলামীন' শব্দের রহস্য উদ্ঘাটন করতে কিছুটা সমর্থ হয়েছে। সূরা ফাতিহা আল্লাহর পরিচয়

দিতে গিয়ে ঘোষণা করেছে, তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, আমরা চোখের সামনে জগৎ দেখছি মাত্র একটি এবং পৃথিবী নামক এই জগতে আমরা বসবাস করছি। অন্য জগতগুলো কোথায়? সাধারণভাবে চিন্তা করলেই সূরা ফাতিহায় বর্ণিত বহুমাত্রিক জগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

মহাশূন্যে কতটি জগৎ রয়েছে, সে আলোচনা মুলতবী রেখে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের নীচে আরেকটি জগৎ বিদ্যমান। মাটির নানা স্তর সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা। অসংখ্য খনিজজগৎ মাটির নীচে সৃষ্টি করেছেন। খনিজ পদার্থসমূহ মাটির নীচের জগতেই অবস্থান করছে। পানির জগৎ রয়েছে মাটির নীচে। মাটির নীচে এমন ধরনের জগৎ বিদ্যমান রয়েছে যে, প্রতিটি মুহূর্তে সেখানে গলিত উত্তপ্ত লাভা আলোড়িত হচ্ছে। মাঝে মাঝে তা জ্বালামুখ দীর্ণ করে পৃথিবীতে এসে আঘাত হানছে। কোথাও রয়েছে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি। ফুটন্ত প্রসবণ, ঝর্ণার আকারে তা নির্গত হয়ে থাকে।

সমুদ্র গর্ভে রয়েছে আরেকটি জগৎ। অগণিত প্রাণী সেখানে বসবাস করছে। সমুদ্রের অতল তলদেশে রয়েছে উদ্ভিদজগৎ। এরও নীচে রয়েছে উত্তপ্ত লাভার জগৎ। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠে রয়েছে মরুজগৎ, অরণ্যজগৎ, পশুজগৎ। দৃশ্যমান জগতেরই কোন শেষ সীমা নেই, এরপরেও রয়েছে অদৃশ্যজগৎ। পরমাণু জগতও সম্পূর্ণ একটি অদৃশ্যজগৎ। পরমাণু বা এ্যাটম-একে আমরা কোন কিছুর সাহায্য ব্যতীত দেখতে সক্ষম নই। এটা কেন দেখা যায় না এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রথমে দেখতে হবে আমাদের দেখার বা চোখের ক্ষমতা কতটুকু।

যখন আমরা কোন বস্তুকে দর্শন করি, তখন ঐ বস্তু থেকে আলোক তরঙ্গ ছড়িয়ে পরে এবং তা আমাদের চোখের ভেতরে প্রবেশ করে। আলোক তরঙ্গের বিচ্ছুরণ ব্যতীত কোন কিছুই আমরা দেখতে পাই না। যখন কোন আলোক তরঙ্গ কোন জিনিসের ওপরে পতিত হয়ে বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে ফেলে তখন আলোক তরঙ্গ আর ঐ বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত হতে পারে না। সুতরাং, কোন বস্তু থেকে আলোক তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হবার শর্ত হলো, বস্তুতে পতিত আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড় হতে হবে।

এবার আসা যাক পরমাণু সম্পর্কিত ব্যাপারে। পরমাণু দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক ছোট। এ কারণে আলোক তরঙ্গ যখন তার ওপর পতিত হয় তখন তা সম্পূর্ণ পরমাণুকে পরিপূর্ণভাবে আবৃত করে ফেলে। যে কারণে আর তা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে পারে না। এই কারণেই আমরা পরমাণু খালি চোখে দেখতে পাই না।

এভাবে যদি কয়েক লক্ষ পরমাণু মানুষের চোখের সামনে রাখা হয়, তবুও তা মানুষের দৃষ্টি দেখতে সক্ষম হবে না। মানুষের দৃষ্টি যা দেখতে সম্পূর্ণ অক্ষম অথচ এই পরমাণুরে ভেতরে আল্লাহ তা'য়ালা আরেকটি শক্তিশালী জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই জগতকেই বলা হয় পরমাণু জগৎ। মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু ভাঙলে পাওয়া যায় ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, নিউক্লী, কোয়ার্ক এবং আরো কত কিছু। এ ধরনের বহু অণুকণা ও প্রতিকণা অদৃশ্য জগতে বিরাজ করছে। স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে এসব কণা দর্শন করা সম্পূর্ণ

অসম্ভব। ভারী মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরাম নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হচ্ছে। এসব রশ্মি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং উচ্চ ভেদন শক্তি সম্পন্ন; এসব নিউক্লিয়াসকে ভেঙে প্রতি মুহূর্তে নির্গত হয়। এ ধরনের আরো অদৃশ্য রশ্মি সৃষ্টি জগতে বিদ্যমান এবং যা খালি চোখে দেখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অদৃশ্যজগতে এমন অনেক ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী রয়েছে যেগুলো মানুষের পরিবেশকে বেষ্টন করে আছে। এসব এককোষী প্রাণীর মধ্যে কোন একটির অভাব ঘটলে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হবে, ফলশ্রুতিতে মানুষের জীবন বিপন্ন হবে।

বর্তমান বিজ্ঞান বলছে, মানুষ যে সৌরজগতে বসবাস করছে এবং তার দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান যে জগত বিদ্যমান এটাই শেষ নয়। এ ধরনের অসংখ্য সৌরজগৎ মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর প্রতি চার বিলিয়ন মানুষ যদি একটি করে সৌরজগতে অবস্থান করে, এরপরেও সহস্র বিলিয়িন তথা অসংখ্য সৌরজগৎ ফাঁকা থেকে যাবে। এত সৌরজগৎ মহান আল্লাহ মহাশূন্যে সৃষ্টি করেছেন। মহাশূন্য যে কত বিশাল তা কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে আবিষ্কার করা তো দূরের কথা, এর বিশালতা সম্পর্কে কল্পনাও করতে পারেনি। মহাশূন্যে রয়েছে অসংখ্য চন্দ্র, সূর্য, তারকাপুঞ্জ, গ্রহ-উপগ্রহ, মিল্কীওয়ে, গ্যালাক্সী এবং ব্লাকহোল। এসবের পরিধি এবং বিশালতা দেখে বিজ্ঞানীগণ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা যে বিশলতা দিয়ে মহাশূন্য নির্মাণ করেছেন সে তুলনায় এই পৃথিবী একটি ছোট্ট মার্বেলের সমানও নয়। মহাজগতের বিবেচনায় বর্তমানে মানুষ যেখানে অবস্থান করছে, এই সৌরজগতটি নিতান্তই ক্ষুদ এবং অতি তুচ্ছ একটি অঞ্চল। বিশাল মহাসমুদ্রে একবিন্দু পানি যেমন, মহাবিশ্বে এই সৌরজগতের অবস্থান ঠিক তেমনি। স্বয়ং পৃথিবীর অবস্থা যদি ছোট্ট একটি মার্বেলের মতো হয় তাহলে ক্ষমতাদর্পী এই মানুষের অবস্থান কোথায়? মহাশূন্যের তুলনায় মানুষ ক্ষুদ্র একটি পিপীলিকার মতও নয়। অতএব অস্তিত্বহীন শক্তি আর ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ জীবনের অধিকারী হয়ে মানুষের পক্ষে স্বয়ং আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা চরম বোকামী বৈ আর কিছুই নয়। এ জন্য পৃথিবীর বর্তমানে যারা বিখ্যাত বিজ্ঞানী তারা নাস্তিক্যবাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন। মহাশূন্যের সৃষ্টিসমূহ আর বিশালতা দর্শন করে তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

বহুমাত্রিক জগতের ধারণা ও পৃথিবীর সুরক্ষিত ছাদ

পবিত্র কোরআনে আকাশ সম্পর্কে বহু তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। কিভাবে আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কেমন করে তার সাংগাঠনিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং কোন পদ্ধতিতে আকাশকে কোন ধরনের স্তম্ভ ব্যতিত যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআন মানুষকে ধারণা দান করেছে। আকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ এখন পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হননি। তারা প্রকৃত অর্থে আকাশের কোন সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিষয়টি এখনো গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে। মানুষ সসীম জ্ঞানের অধিকারী। কোন কিছু সম্পর্কে এরা সঠিক জ্ঞানার্জন করতে ব্যর্থ হলেই তার অস্তিত্ব অস্বীকার

করা এদের স্বভাব। আকাশের ঠিকানা আবিষ্কারে ব্যর্থ কেউ কেউ আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলেছে, আকাশ বলতে কিছুই নেই। পৃথিবীর ধূলিকণা মহাশূন্যে বায়বিয় স্তরে পুঞ্জিভূত হয় এবং তার ওপরে সূর্যের আলো পতিত হবার ফলে তা নীল দেখায়। প্রকৃত অর্থে আকাশের কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ এই আকাশের যিনি স্রষ্টা তিনি বলছেন–

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ-

এই দুনিয়ার আকাশখানিকে তারকা প্রদীপ দিয়া

সাজায়ে রেখেছি মনের মতন দেখো তুমি তাকাইয়া। (সূরা আস্ সা-ফ্‌ফা-ত-৬)

উল্লেখিত আয়াতে পৃথিবীর আকাশ বলতে সেই আকাশকেই বুঝানো হয়েছে, যা আমাদের এই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী। যে আকাশকে আমরা কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিতই খালি চোখে দেখে থাকি। এই আকাশ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীগণ যে বিশ্বকে দেখে থাকেন এবং তাদের পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে যেসব বিশ্ব এখন পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়নি সেগুলো সবই দূরবর্তী আকাশ। কোরআনে আকাশ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে 'সাব'আ' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যার সরল অনুবাদ করা হয়েছে 'সাত আকাশ'। আল্লাহর কোরআনের বক্তব্য মানুষের বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। যে শব্দ ব্যবহার করলে মানুষ সহজে বুঝতে সক্ষম হবে, সেই শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। কোরআনে কোন জটিলতা রাখা হয়নি। আরবী পরিভাষায় 'আলিফ' বলতে অগণিত কিছু বোঝায়। এখন কেউ যদি এই আলিফ বলতে শুধুমাত্র একহাজার বুঝে, তাহলে সে তার জ্ঞান অনুযায়ী তা বুঝতে পারে। কিন্তু এই আলিফ দিয়ে আল্লাহর কোরআন অসংখ্য অগণিত বুঝিয়েছে।

যেমন সূরা কদরে লাইলাতুল কাদরি মিন আলফি শাহ্‌রে বলতে বুঝানো হয়েছে অসংখ্য অগণিত মাসের থেকেও উত্তম হলো কদরের রাত। আবার কিয়ামত সংঘটিত হবার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করতে গিয়ে কোরআন 'সুর' শব্দ ব্যবহার করেছে। এই 'সুর' শব্দের অর্থ হলো শিঙ্গা। হযরত ইসরাফিল আলাইহিস্ সালাম শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন, কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। সেই প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্তও কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রচারের জন্য ঢেড়া পিটিয়ে বা শিঙ্গা বাজিয়ে মানুষকে একত্রিত করা হয়। এখানো সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করার জন্য বিউগল বাজানো হয়। অর্থাৎ মানুষ এই শিঙ্গা শব্দটির সাথে পরিচিত, এ কারণে কোরআন শিঙ্গা শব্দই ব্যবহার করেছে। এদেশেও কথার মাঝে মানুষ সীমাহীন দূরত্ব বুঝাতে 'সাত সমুদ্দুর তের নদী–সাত তবক আসমান' ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করে থাকে। অমূল্য কোনকিছু বুঝাতে 'সাত রাজার ধন' বাক্যটি ব্যবহার করে। এ জন্য আল্লাহর কোরআন অসংখ্য আকাশকে বুঝাতে 'সাব'আ' বা সাত আকাশ শব্দ ব্যবহার করেছে, যেন মানুষ সহজে বুঝতে পারে। আল্লাহ্ বলেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ-وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ

غَافِلِيْنَ-وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ-وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ-

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ওপরে অসংখ্য স্তর সৃষ্টি করেছি। আমি আমার সৃষ্টি সম্পর্কে মোটেও অমনোযোগী নই। আর আকাশ থেকে আমি ঠিক হিসাব মতো একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে ভূমিতে সংরক্ষণ করেছি। আমি তাকে যেভাবে ইচ্ছা অদৃশ্য করে দিতে সক্ষম। (সূরা আল মু'মিনূন-১৭-১৮)

মহান আল্লাহ হলেন রাব্বুল আলামীন। তিনি অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এসব সৃষ্টি করেই তিনি অবসর গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন রয়েছেন। কোনটি কিভাবে পরিচালিত হবে, কোন সৃষ্টির কি প্রয়োজন, এ সম্পর্কে তিনি মোটেও অমনোযোগী নন। তাঁর সৃষ্টি অসংখ্য জগৎ যেন যথা নিয়মে পরিচালিত হয়, এ ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ তা'য়ালা একই সঙ্গে এমন পরিমিত পরিমাণ পানি পৃথিবীতে বর্ষণ করেছিলেন যা পৃথিবী নামক এই গ্রহটির ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। এই পানি পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এভাবে পানিকে সংরক্ষণ করার কারণেই নদী, সাগর-মহাসাগর ও জলাধারের সৃষ্টি হয়েছে, ভূগর্ভেও বিপুল পরিমাণ পানি রিজার্ভ রয়েছে। এই পানিই চক্রাকারে উষ্ণতা, শৈত্য ও বাতাসের মাধ্যমে বর্ষিত হতে থাকে। মেঘমালা, বরফাচ্ছাদিত-পাহাড়, সাগর, নদী-নালা ঝরণা ও কুয়া, ডিপ টিউবওয়েল এই পানিই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিয়ে থাকে।

অসংখ্য জিনিসের সৃষ্টি ও উৎপাদনে পানির ভূমিকা অপরিসীম। তারপর এ পানি বায়ুর সাথে মিশে গিয়ে আবার তার মূল ভান্ডারের দিকে ফিরে যায়। সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পানির এ মওজুদ ভান্ডারের বিন্দুমাত্রও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। তিনি কে-যিনি একই সময় এ বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিশ্রিত করে পানির বিশাল ভান্ডার পৃথিবীর অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন ? কোন সে প্রতিপালক-যিনি এখন আর দুটো গ্যাসকে সে বিশেষ অনুপাতে মিশতে দেন না যার ফলে পানি উৎপন্ন হতে পারে ? অথচ এ দুটো পৃথিবীতে মওজুদ রয়েছে। আর পানি যখন বাষ্পাকারে বাতাসে মিশে যায় তখন অক্সিজেন ও হাড্রোজেন কেন পৃথক হয়ে যায় না ? যিনি এসব নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। পানির জগতকেও তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ-

তুমি কি দেখো না, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীর গতিতে সঞ্চালন করেন, এরপর তার খন্ডগুলোকে

পরস্পর সংযুক্ত করেন, তারপর তাকে একত্র করে একটি ঘন মেঘে পরিণত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার খোল থেকে বৃষ্টি বিন্দু অবিরাম ঝরে পড়ছে। (সূরা আন্ নূর-৪৩)

পৃথিবী যে অজস্র ধরনের বিচিত্র সৃষ্টির আবাসস্থল ও অবস্থান স্থল হয়েছে, এটা কোন সহজ বিষয় নয়। যে বৈজ্ঞানিক সমতা ও সামঞ্জস্যশীলতার মাধ্যমে পৃথিবী নামক এই গ্রহটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। যারা এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেন তারা অনুভব করতে থাকেন যে, এমন ভারসাম্য ও সাম স্যশীলতা একজন জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ ও পূর্ণশক্তি সম্পন্ন সত্তার ব্যবস্থাপনা ব্যতিত প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। পৃথিবী নামক এই ভূ-গোলকটি মহাশূন্যে ঝুলন্তাবস্থায় বিদ্যমান। এটি কোন জিনিসের ওপর ভর করে অবস্থান করছে না। কিন্তু এরপরও এর মধ্যে কোন কম্পন ও অস্থিরতা নেই। পৃথিবীর কোন অঞ্চলে মাঝে মধ্যে সীমিত পর্যায়ে ভূমিকম্প হলে তার যে ভয়াবহ চিত্র আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়, তাতে গোটা পৃথিবী যদি কোন কম্পন বা দোদুল্যমানতার শিকার হতো, তাহলে এখানে মানুষ বসবাস করতে সক্ষম হতো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ جَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا-

আর তিনি কে, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তার মধ্যে গেড়ে দিয়েছেন (পর্বতমালার) পেরেক, আর পানির দুটো ভান্ডারের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা আন নাম্‌ল-৬১)

পৃথিবী নামক এই গ্রহটি নিয়মিতভাবে সূর্যের সম্মুখ ভাগে একবার আসে এবং আবার পিছনের দিকে সরে যায়। এরই ফলে দিন ও রাতের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যদি পৃথিবীর একটি দিক সব সময় সূর্যের দিকে অবস্থান করতো এবং অন্য দিকটি সময় সময় সূর্যের আড়ালে অবস্থান করতো, তাহলে এই পৃথিবীতে কোন প্রাণী বসবাস করতে সক্ষম হতো না। কারণ একদিকের সার্বক্ষণিক শৈত্য ও আলোকহীনতা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্মলাভের উপযোগী হতো না এবং অন্যদিকের ভয়াবহ দাবদাহ প্রচন্ড উত্তাপ পৃথিবীর সূর্যের দিকে একইভাবে অবস্থানরত অংশকে পানিহীন, উদ্ভিদহীন ও প্রাণহীন করে দিতো।

উল্কা পতনের ভয়াবহ প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এই ভূ-মন্ডলের প্রায় আটশত কিলোমিটার ওপর পর্যন্ত বাতাসের একটি ঘনস্তর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি এ ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে প্রতিদিন কোটি কোটি বিশালাকারের উল্কাপিন্ড প্রতি সেকেন্ডে আট চল্লিশ কিলোমিটারেরও অধিক গতিতে এসে পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাত হানতো। এর ফলে পৃথিবীতে যে ধ্বংস লীলা সাধন হতো তাতে করে মানুষ, পশু-প্রাণী, বৃক্ষতরু-লতা কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতো না। সমস্ত কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চর্বিত তৃণের ন্যায় ধারণ করতো।

এই পৃথিবীতেই শুধু পাথরের খনি বিদ্যমান নেই, আল্লাহ তা'য়ালা যে আরো অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সেখানেও পাথর বিদ্যমান। মাহশূন্য সম্পর্কে যাদের সামান্য লেখাপড়া রয়েছে, তারা এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে, মহাশূন্যে বিশালাকারের একটি পাথরের জগৎ রয়েছে। মহাকাশে শূন্যতার মহাসমুদ্রে ভাসমান পাথরের জগৎ বিদ্যমান।

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্য বলয়ে এসটিরয়েড ও মিটিওরিট বেল্ট রয়েছে। এটাই হলো এককভাবে পাথরের জগৎ। এ ছাড়াও প্রায় প্রতিটি গ্রহেই পাথর রয়েছে। মহাশূন্যে ভাসমান পাথরের এই জগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ জানতে পেরেছেন মাত্র উনিশ শতকে। অথচ আল্লাহর কোরআন এ জগৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেশ করেছে সেই সপ্তম শতাব্দীতে।

আল্লাহর কিতাবের সূরা জ্বিন-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, কিভাবে মহাশূন্যে পাথর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বিজ্ঞান অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে যে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে রয়েছে একটি সুবিশাল পাথরের বেল্ট, একটি ভাসমান পাথরের জগৎ। পাথরের এই জগৎ নিয়ে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ মারাত্মক শঙ্কিত রয়েছেন। কি জানি, কখন কি অবস্থায় এসব পাথর পৃথিবীর দিকে সেকেন্ডে শত শত কিলোমিটার গতিতে ছুটে এসে আঘাত হেনে মানব সভ্যতাকে অস্তিত্বহীন করে দেয়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই আকাশে যে শতকোটি নানা ধরনের জগৎ বিদ্যমান, এসব জগতই একদিন পৃথিবী নামক গ্রহটির সর্বনাশ করে ছাড়বে। হয়ত তাদের ধারণা একদিন বাস্তবে পরিণত হলে হতেও পারে। কারণ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আল্লাহর আদেশে সমস্ত আকর্ষণ বলয় ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা যে মহাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করে মহাশূন্যে শতকোটি বিশালাকারের গ্রহ-উপগ্রহ পরিচালিত করছেন, সে আকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব থাকবে না, তখন তা পৃথিবীতে পতিত হবে।

বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, সুমেকার লেভী-৯ নামক একটি গ্রহের মাত্র একুশটি পাথর নিপতিত হয়েছিল বৃহস্পতি গ্রহের ওপর। যার ক্ষমতা ছিল প্রায় আড়াই কোটি মেগাটন টিএনটি'র ধ্বংযজ্ঞের। ছয়শত পঞ্চাশ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে একবার প্রায় দশ কিলোমিটার ব্যাসের একটি ঝুলন্ত পাথর আঘাত করে এক মহাধ্বংস যজ্ঞের সূত্রপাত করেছিল।

জীব বিজ্ঞানীদের ধারণা সে আঘাতেই বিরাটাকারের প্রাণী ডাইনোসোর পৃথিবী থেকে অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহের মাঝে অসংখ্য পাথরের দল মহাশূন্যে চলমান অবস্থায় রয়েছে। এগুলো পৃথিবীতে পতিত হচ্ছে না। কে এগুলোর পতন রোধ করেছেন? আল্লাহ বলেন–

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ-وَحِفْظًا-ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ-

আর পৃথিবীর আকাশকে আমি উজ্জ্বল প্রদীপ দিয়ে সজ্জিত করলাম এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সুরক্ষিত করে দিলাম। এসবই এক মহাপরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার পরিকল্পনা।(সূরা হামীম আস সাজদাহ্-১২)

মহাশূন্য থেকে শুধু উল্কাই নয়, এমন অসংখ্য রশ্মি পৃথিবীর দিকে প্রতি মুহূর্তে ছুটে আসছে যে, তা পৃথিবীতে পতিত হবার সুযোগ পেলে মুহূর্তে পৃথিবী নামক এই গ্রহটি প্রাণী বসবাসের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলতো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর আকাশকে সুরক্ষিত ছাদের মতো না করলে সূর্য থেকে আগত সৌর ঝন্‌ঝা পৃথিবীর ওপরে প্রচন্ড উত্তাপ আর ঝড়ের ধ্বংস আঘাত হানতো যে, পৃথিবীর বুকে কোন জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করা কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। শুধু তাই নয়, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে এসটিরয়েড ও মিটিওরের বেল্ট থেকে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় কমবেশী ত্রিশ লক্ষ উল্কা পতিত হচ্ছে পৃথিবীর দিকে। কোন সে বিজ্ঞানী যিনি বিশালাকারের উল্কাগুলো মহাশূন্যের গ্যাসীয় বলয়ে মিশিয়ে দিচ্ছেন ? আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا-

আর আমি আকাশকে করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদ। (সূরা আল আম্বিয়া-৩২)

রাব্বুল আলামীন বায়ু মন্ডলে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করেছেন। বায়ুমন্ডলীয় অদৃশ্য অথচ দৃঢ় ছাদই ক্ষতিকর বিকিরণ ছেঁকে যা পৃথিবীর পরিবেশের জন্য কল্যাণকর সেসব রশ্মি প্রবেশ করতে দেয়। এক্সরে আয়নোস্ফিয়ারে, আলট্রাভায়োলেট স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে, মাত্রাতিরিক্ত অবলোহিত রশ্মি ট্রপোস্ফিয়ারে বিশোষিত হয়ে যায়।

শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় রশ্মিরাই প্রতিপালন ব্যবস্থায় বিস্ময়করভাবে পৃথিবী পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে সোলার উইন্ড এবং লক্ষ লক্ষ উল্কাপতনের কবল থেকে নিরাপদ রাখার জন্য এই অদৃশ্য ছাদই প্রতিরোধ্যতায় অটল-অবিচল। আল্লাহ তা'য়ালা বাতাস সৃষ্টি করেছেন। এ বাতাসই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, সমুদ্র থেকে মেঘ উঠিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে এবং মানুষ, পশু ও উদ্ভিদের জীবনে প্রয়োজনীয় গ্যাসের যোগান দেয়। বাতাসের অনুপস্থিতিতে এ পৃথিবী কোন প্রাণী বসবাসের উপযোগী অবস্থান স্থলে পরিণত হতো না।

এই ভূ-মন্ডলের ভূ-ত্বকের নিকটবর্তী বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খনিজ ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বিপুল পরিমাণে স্তূপীকৃত করেছেন। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের জীবনের জন্য এগুলো একান্ত অপরিহার্য। পৃথিবীর যে অঞ্চলে এসবের অবস্থান নেই, সে অঞ্চলের ভূমি জীবন ধারনের উপযোগী নয়।

পৃথিবী নামক এই গ্রহটিতে নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, হ্রদ, ঝরণা ও ভূগর্ভস্থ স্রোতধারার আকারে বিপুল পরিমাণ পানির ভান্ডার গড়ে তুলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। পাহাড়ের ওপরও পানির বিশাল ভান্ডার ঘনীভূত করে এবং পরবর্তীতে তা গলিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা

তিনি করেছেন। তিনি রব্ব, এ ব্যবস্থা যদি তিনি না করতেন, তাহলে পৃথিবী নামক গ্রহ প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হতো না। আবার এই পানি, বাতাস এবং পৃথিবীতে অন্যান্য যেসব বস্তুর অবস্থান রয়েছে সেগুলোকে একত্র করে রাখার জন্য এই গ্রহটিতে অত্যন্ত উপযোগী মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। এ মধ্যাকর্ষণ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের থেকে কম হতো তাহলে পৃথিবী বাতাস ও পানি শূণ্য হয়ে যেতো এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি লাভ করে এমন প্রচন্ড আকার ধারণ করতো যে, প্রাণের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতো।

মাধ্যাকর্ষণ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী হতো, তাহলে বাতাস এতটা ঘন হয়ে যেতো যে, কোন প্রাণী নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারতো না, মৃত্যু ছিল অনিবার্য। বাতাসের চাপ বৃদ্ধি লাভ করতো এবং জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হতো না, ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হতো না, শীতলতা বৃদ্ধি লাভ করতো, ভূ-পৃষ্ঠের কোন এলাকাই বাসযোগ্য হতো না বরং ভারীত্বের আকর্ষণ অনেক বেশী হলে মানুষ ও পশুর শারীরিক দৈর্ঘ-প্রস্থ কম হতো কিন্তু তাদের ওজন এতটা বৃদ্ধি লাভ করতো যে, তাদের পক্ষে চলাফেরা করা সম্ভব হতো না।

রাব্বুল আলামীন পৃথিবী নামক এ গ্রহটিকে সূর্য থেকে জনবসতির সবচেয়ে উপযোগী একটি বিশেষ দুরত্বে রেখেছেন। এরচেয়ে কম দূরত্বে যদি রাখতেন, তাহলে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে নিঃশেষে ভস্ম হয়ে যেতো। যদি অধিক দূরত্বে রাখতেন তাহলে পৃথিবী প্রচন্ড ঠান্ডায় বরফে পরিণত হতো। প্রতিটি জগতকে যিনি সঠিক পরিমাপে নির্দিষ্ট কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করার ব্যবস্থা করেছেন, তিনিই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

বহুমাত্রিক জগৎ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত ধারণা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এসব জগৎ তিনি ঠিকানা বিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেননি। প্রতিটি জগত-ই তার নির্দিষ্ট গতি পথে পরিভ্রমণ করছে। রাব্বুল আলামীন বলেন–

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ-وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ-

সূর্যের ক্ষমতা নেই চাঁদকে অতিক্রম করে এবং রাতের ক্ষমতা নেই দিনের ওপর অগ্রবর্তী হতে পারে, সবাই এক একটি কক্ষ পথে সন্তরণ করছে। (সূরা ইয়াছিন-৪০)

সুদূর অতিত থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষ যে জ্ঞানার্জন করেছে, এটাই শেষ না এর পরেও আরো কিছু জানার অবশিষ্ট আছে ? এ কথা দৃঢ়তার সাথে কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয় যে, জ্ঞানের শেষস্তর পর্যন্ত সে পৌছতে সক্ষম হয়েছে। চূড়ান্ত কথা তখনই বলা সম্ভব হবে, যখন বিশ্বজগতের নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষ সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে।

পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞানের বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এটাই যে, মানুষের অর্জিত জ্ঞান প্রতিটি যুগে পরিবর্তনশীল ছিল এবং বর্তমানেও মানুষ যে জ্ঞানার্জন করেছে, যে কোন সময় তা পরিবর্তন হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবী ও চন্দ্র, সূর্য সম্পর্কে মানুষ যুগে যুগে বিভিন্ন ধরনের ধারণা পোষণ করেছে। এক সময় লোকজন চাক্ষুষ দর্শনের ভিত্তিতে সূর্য সম্পর্কে এ নিশ্চিত বিশ্বাস অন্তরে লালন করতো যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এ ধারণা কিছু দিন প্রতিষ্ঠিত থাকার পর বিভিন্ন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে এ ধারণা আবার প্রতিষ্ঠিত হলো যে, সূর্য তার নিজের অবস্থানে স্থির রয়েছে এবং গোটা সৌরজগৎ তাকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করছে।

কালের আবর্তনে উল্লেখিত ধারণা স্থায়ী হলো না। পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হলো যে, শুধু সূর্যই নয়, মহাশূন্যে যা রয়েছে, তা সবই একদিকে ছুটে চলেছে। যে যার কক্ষপথে সঞ্চালনশীল। এসব কিছুর চলার গতি হলো প্রতি সেকেন্ডে সাড়ে ষোল কিলোমিটার থেকে একশত একষট্টি কিলোমিটার পর্যন্ত। আল্লাহর কিতাবের সূরা ইয়াছিনের উক্ত আয়াতে যে 'ফালাক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ হলো গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ এবং আকাশের অর্থ থেকে ভিন্ন। আয়াতে বলা হয়েছে, সমস্ত কিছুই কক্ষপথে সন্তরণশীল। মুফাচ্ছিরগণ এ আয়াতের চার ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কেউ বলেছেন, শুধুমাত্র চন্দ্র, সূর্য নয়-বরং সমস্ত তারকা ও গ্রহ এবং সমগ্র আকাশ জগৎ আবর্তন করছে। আবার কেউ বলেছেন, এদের প্রতিটির আকাশ অর্থাৎ প্রতিটির আবর্তন পথ বা কক্ষপথ ভিন্ন ভিন্ন। কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আকাশসমূহ তারকারাজিকে নিয়ে আবর্তন করছে না বরং তারকারাজি আকাশসমূহে আবর্তন করছে। কারো ব্যাখ্যা হলো, আকাশসমূহে তারকাদের আবর্তন এমনভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যে, যেমন কোন তরল পদার্থে কোন বস্তু ভেসে চলে, ঠিক তেমনি মহাশূন্যে সমস্ত কিছুই ভেসে চলছে।

যে বা যিনি যে ধরনের ব্যাখ্যাই দিন না কেন, একটি কথা স্মরণে রেখে আল্লাহর কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে যে, কোরআন মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের বিষয়সমূহ উপস্থাপন করতে গিয়ে সৃষ্টির বিভিন্ন দিকের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর ভেতর দিয়েই বিজ্ঞানের নানা তথ্য বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, কোরআন নিরেট বিজ্ঞানের কিতাব।

বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের প্রতি ইঙ্গিত দেয়ার অর্থ হলো, মানুষকে এ কথা বুঝানো যে, যদি সে সমস্ত কিছুর ওপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং নিজের জ্ঞান, বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করে তাহলে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, সেদিকেই তার সামনে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের অসংখ্য ও অগণিত যুক্তি-প্রমাণের এক বিশাল সমাবেশ দেখতে সক্ষম হবে।

এসব সৃষ্টিসমূহের ভেতরে মানুষ কোথাও আল্লাহর অস্তিত্বহীনতার ও অংশীদারিত্বের স্বপক্ষে সামান্যতম যুক্তি ও প্রমাণও অনুসন্ধান করে পাবে না। তিনি অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এসব যথা নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে, এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এ জন্যই করা হয়েছে যে, কোন সুদক্ষ

স্রষ্টা ব্যতিত এসব কি এমনিতেই চলতে পারে ? শতকোটি জগৎ একটি নিয়মের অধীনে চলছে, স্রষ্টার যদি কোন অংশীদার থাকতো, তাহলে এসব পরিচালনা করতে গিয়ে অবশ্যই মতানৈক্য ঘটতো এবং তার বহিঃপ্রকাশ অবশ্যই মানুষ দেখতে সমর্থ হতো। সুতরাং কোথাও যখন কোন অনিয়ম মানুষের চোখে পড়ছে না, তখন এ কথা কি অনুভব করতে অসুবিধা হয় যে, সৃষ্টি জগতসমূহের পেছনে একজন স্রষ্টা রয়েছেন এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয় ? সমস্ত কিছুই যখন একটি নিশ্চিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন কি এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয়, পৃথিবীর মানুষেরও একটি পরিণতি রয়েছে ? তোমরাই বলছো, সমস্ত কিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছো, কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে–এসব ধ্বংসের পরে তাঁর পক্ষে এসব আবার দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি অসম্ভব ? প্রথমবার যিনি অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বদান করেছেন, দ্বিতীয়বারও তো তিনি অস্তিত্বদান করতে সক্ষম–এই সহজ সরল কথাটি তোমাদের মাথায় প্রবেশ করে না ? সুতরাং আখিরাত অবশ্যম্ভাবী–এ কথা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহুমাত্রিক জগতের ধারণা দিয়ে অবিশ্বাসীদের সামনে তাঁর অস্তিত্বই প্রকাশ করেছেন। এসব দেখেও যারা তাঁর অস্তিত্বে, তাঁর একত্বে, রিসালাতের ওপরে, আখিরাতের প্রতি সংশয়যুক্ত মানসিকতা লালন করবে, তাদেরকে কপাল পোড়া ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে। আমাদের এ পৃথিবী যে সৌরজগতের অন্তরভুক্ত তার বিশালত্বের অবস্থা হলো এই যে, তার কেন্দ্রীয় সূর্যটি পৃথিবীর ভরের তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার আট শত গুণ। আর সূর্যের ব্যাস হলো পৃথিবীর ব্যাসের একশত নয় গুণ। ঘনত্ব একহাজার চারশত দশ গ্রাম বা ঘন সেন্টিমিটার।

সূর্যের সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ–যার নাম দেয়া হয়েছে নেপচুন, সূর্য থেকে এর দূরত্ব কমপক্ষে দুই শত উনআশি কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। বরং যদি প্লুটো নামক গ্রহটিকে দূরবর্তী গ্রহ হিসাবে ধরা হয় তাহলে সূর্য তার দূরত্ব চারশত ষাট কোটি মাইলে গিয়ে উপনীত হয়। এত বড় বিশাল হবার পরও এ সৌরজগৎ একটি বিরাট বিশাল গ্যালাক্সী বা ছায়াপথের নিছক একটি ছোট্ট অংশ মাত্র।

মানুষ যেখানে অবস্থান করছে, এই সৌরজগৎ যে গ্যালাক্সী বা ছায়াপথটির অন্তরভুক্ত তার মধ্যে প্রায় তিন হাজার মিলিয়ন অর্থাৎ তিনশত কোটি সূর্য রয়েছে এবং সে সূর্যের সবচেয়ে কাছের সূর্যটি এই পৃথিবী থেকে এতদূরে অবস্থান করছে যে, তার আলো পৃথিবীতে পৌছতে চার বছর সময়ের প্রয়োজন হয়।

এই ছায়াপথই গোটা সৃষ্টিজগৎ নয়। বরং দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীগণ যে অনুমান করেছেন, তাহলো প্রায় বিশ লক্ষ নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে এই ছায়াপথও একটি এবং ঐ বিশ লক্ষ নীহারিকাপুঞ্জের ভেতর থেকে সবচেয়ে কাছের নীহারিকা এত দূরে অবস্থিত যে, তার আলো আমাদের পৃথিবীতে পৌছতে দশ লক্ষ বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। বর্তমান বিজ্ঞানীগণ যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূরের যে নীহারিকাটি দেখেছেন, তার আলো পৃথিবীতে পৌছতে দশকোটি বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। তারা বলছেন, এটাই শেষ নয়–এরপরও আরো অসংখ্য জগৎ রয়ে গিয়েছে, অসংখ্য নীহারিকা রয়ে গিয়েছে, যেগুলো বিজ্ঞানীদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে

এখনো ধরা পড়েনি। ভবিষ্যতে আরো শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হলে, তার সাহায্যে অনেক কিছুই দেখা যেতে পারে। সুতরাং এ যাবৎ বিজ্ঞানীগণ আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের যে নমুনা দেখেছে, তার তুলনা করা যেতে পারে, গোটা পৃথিবীর সমস্ত বালুকণার মধ্যে মাত্র একটি বালুকণার সাথে। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির তুলনা যদি পৃথিবীর সমস্ত বালুকণার সাথে করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে, বিজ্ঞানীগণ মাত্র একটি বালুকণার সমান অংশের সন্ধান পেয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীগণ যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী যেসব উপাদানে গঠিত হয়েছে এবং যে নিয়মের অধীন, গোটা সৃষ্টি জগতসমূহ সেই একই উপাদানে গঠিত হয়েছে এবং সেই একই নিয়মের অধীন। পার্থক্য রয়েছে শুধু পরিবেশের। পৃথিবী সৃষ্টির উপাদান ও অন্যান্য জগৎ সৃষ্টির উপাদান যদি একই না হতো, তাহলে এই পৃথিবীতে অবস্থান করে মানুষ যে অতি দূরবর্তী জগতসমূহ পর্যবেক্ষণ করছে, দূরত্ব পরিমাপ করছে এবং তাদের গতির হিসাব বের করছে, এসব করা কখনো সম্ভব হতো না।

সমস্ত সৃষ্টি জগতে একই ধরনের উপাদান ও নিয়ম কার্যকর রয়েছে বলেই বিজ্ঞানীদের পক্ষে এসব করা সম্ভব হচ্ছে। সমস্ত জগতে যে নিয়ম-শৃংখলা, প্রজ্ঞা-দক্ষতা, কলাকৌশল, শিল্পকারিতা, সৃষ্টির নিপুণতা, নান্দনিক সৌন্দর্য, উন্নত রুচির প্রকাশ, নিঁখুত শিল্পকর্ম, একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক এবং অগণিত গ্যালাক্সী ও তাদের মধ্যে সঞ্চরণশীল শত শত কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে দেখা যায়, এসব দেখে কি কোন জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধিমান মানুষ এ কথা কল্পনা করতে পারে যে, এসব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে ? এসব নিয়ম-শৃংখলার পেছনে কোন ব্যবস্থাপক, কোন কৌশলী শিল্পী, কোন মহাবিজ্ঞানী এবং মহাপরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব অনুপস্থিত ?

বিজ্ঞানীদের এসব আবিষ্কার ও কার্যাবলীই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, সৃষ্টি জগতসমূহের স্রষ্টা আছেন এবং তিনি একজন। একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন মাত্র একটি সত্তাই সমস্ত সৃষ্টিজগৎ নিয়ন্ত্রণ করছেন–আর তিনিই হলেন রাব্বুল আলামীন–সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব–প্রতিপালক।

বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির বিশ হাজার কোটি তারার মধ্যে একটি মধ্যম ধরনের তারা হলো সূর্য। এই সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর সৌরজগৎ গড়ে উঠেছে। সৌরজগতে যতো কিছু রয়েছে তার নিরানব্বই দশমিক পঁচাশি ভাগই সূর্যের দখলে রয়েছে। এই সূর্যের থেকেও লক্ষ কোটি গুণ উজ্জ্বল আলো সম্পন্ন কোয়াসার ঊর্ধ্ব জগতে বিদ্যমান রয়েছে। মহাবিশ্বের পরিমাপে সূর্য অত্যন্ত নগণ্য প্রকৃতির নক্ষত্র যার উজ্জ্বলতাও অত্যন্ত নগণ্য। সূর্যের থেকেও পঞ্চাশ গুণ বড় এবং চল্লিশ লক্ষ গুণ উজ্জ্বল একটি নক্ষত্রের নাম বিজ্ঞানীগণ দিয়েছেন, 'ইটা ক্যারিনা'। মহাশূন্যে অসংখ্য গ্যালাক্সি রয়েছে এবং নিত্য নতুন গ্যালাক্সি সৃষ্টি হচ্ছে। এ ধরনের এক একটি গ্যালাক্সির ভেতরে সূর্যের থেকেও বিশাল আকৃতির অগণিত নক্ষত্র প্রবেশ করার পরও অসংখ্য জায়গা শূন্য রয়ে যাবে। সূর্যের চেয়ে বিশালাকৃতির আরেকটি তারকার নাম হলো 'বেটলজিয়ুজ'। এই বেটলজিয়ুজ নক্ষত্রের মধ্যে বর্তমান সূর্যের

মতো পঞ্চাশ কোটি সূর্য অবস্থান করতে পারে। এ ধরনের অসংখ্য নক্ষত্র আল্লাহ তা'য়ালা গ্যালাক্সির ভেতরে সৃষ্টি করে রেখেছেন। সূর্যের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ উজ্জ্বল তারকা উর্ধ্বাকাশে রয়েছে। এসব এক একটি তারকা একটির কাছ থেকে আরেকটি কত দূরে অবস্থিত ? একটি তারকা থেকে আরেকটি তারকায় পৌছতে সহস্র সহস্র বিলিয়ন আলোকবর্ষের প্রয়োজন হবে। অথচ আলোর গতি হলো প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। পৃথিবী থেকে তের লক্ষ গুণ বড় হলো সূর্য, আর এ ধরনের পঞ্চাশ কোটি সূর্যের থেকেও বড় হলো বেটলজিয়ুজ তারকা। এসব তারকার থেকেও বিশাল দানব আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করে রেখেছেন। বিজ্ঞানীগণ সেগুলোর নাম দিয়েছেন 'ব্লাকহোল বা অন্ধকূপ'। এই ব্লাকহোল সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ-وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ-

শপথ সে পতন স্থানের, যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তোমরা যদি জানতে তা এক মহা গুরুত্বপূর্ণ শপথ। (সূরা ওয়াকিয়া-৭৫-৭৬)

এই ব্লাকহোল বা অন্ধকূপ এক অদৃশ্য দানবীয় শক্তি। নক্ষত্র তা যতো বড়ই হোক না কেন, পরিভ্রমণ করতে করতে তা এই ব্লাকহোলের রেঞ্জের মধ্যে বা আওতায় এসে গেলে, এমনভাবে শোষণ করে নেয় যে, তার আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ধরনের ব্লাকহোল মহাশূন্যে দু'একটি নয়, আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য ব্লাকহোল সৃষ্টি করেছেন। বিজ্ঞানীগণ বলেন, আমাদের এই পৃথিবী কোনভাবে যদি ব্লাকহোলের আওতায় এসে পড়ে, তাহলে মুহূর্তের ভেতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ব্লাকহোল এই বিশাল পৃথিবীকে সংকুচিত করে এমন এক ক্ষুদে পিন্ডে পরিণত করবে যে, এর ব্যাসার্ধ হবে মাত্র এক সেন্টিমিটার। এই সৌরজগতের আয়তনের সমান একটি ব্লাকহোল শত লক্ষ কোটি সূর্যকে মুহূর্তে সংকুচিত করে নিঃশেষ করে দিতে পারে।

মহাকাশের রহস্যময় আবেগদীপ্ত জ্যোতিষ্কের নাম বিজ্ঞানীগণ দিয়েছেন 'কোয়াসার'। এই কেয়াসারের আলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সমস্ত নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা ম্লান করে দিয়েছে। অথচ সৌরজগতের সবচেয়ে কাছের কোয়াসার থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময়ের প্রয়োজন হয় দেড় শতকোটি বছর। আর দূরতম কোয়াসার থেকে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে পৌছতে সময়ের প্রয়োজন হবে এক হাজার কোটি বছর।

বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেছেন, বর্তমান পৃথিবীর বয়স হলো চারশত ষাট কোটি বছর। তাহলে দূরতম কোয়াসার পৃথিবীতে পৌছবে আরো পাঁচশত কোটি বছর পরে। এই বিশাল ও উজ্জ্বল আলো সম্পন্ন কোয়াসারের সংখ্যা মহাকাশে অগণিত। এক একটি ধুমকেতুর কাছে ঐ বিশালাকের সূর্য ছোট্ট একটি বালুকণার মতো। সৃষ্টির শুরু থেকে এসব বিশাল আকৃতির জগৎ সেকেন্ডে শতকোটি কিলোমিটার গতিতে বিরামহীনভাবে একদিকে ছুটে চলেছে। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে ছুটতেই থাকবে, ধ্বংস না পর্যন্ত তা চলতে থাকবে। তবুও তা গন্তব্যে পৌছতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা অসংখ্য সৃষ্টিজগতের রব্ব। শুধুমাত্র তিনি মহাকাশেই কত বিশাল জায়গা সৃষ্টি করেছেন, তা কল্পনাও করা যায় না।

সুরক্ষিত আকাশ জগৎ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আকাশে তথা উর্ধ্বজগতে কত সহস্র ধরনের বিশালাকারের অকল্পনীয় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সে সম্পর্কে সামান্য ধারণা ওপরে পেশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এই আকাশ মন্ডল কিসের ওপর নির্ভর করে ওপরে অবস্থান করছে ? এই প্রশ্নের জবাব কোন মানুষ বিজ্ঞানীদের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি। কোন বিষয়ে মানুষ জ্ঞানার্জন করলে বা জ্ঞান থাকলে তাকে সে বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব পাওয়া যেতে পারে। আসলে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ আকাশের কোন সন্ধানই লাভ করতে সমর্থ হয়নি। সর্বাধুনিক দূরবিক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাদের চোখে যা ধরা পড়েছে, সে সম্পর্কে তারা পৃথিবীবাসীর কাছে ধারণা পেশ করেছেন। আকাশের কোন ঠিকান তারা খুঁজে পাননি। মহাশূন্যের অসংখ্য জগৎ সম্পর্কে তারা বলেছেন, সেখানে এমন ধরনের অদৃশ্য শক্তি বিরাজ করছে যে, তারা প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহকে এক আকর্ষণী শক্তির মাধ্যমে যার যার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে বাধ্য করছে। সূরা আর রাদ-এর ২ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا-

তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলকে দৃশ্যমান নির্ভর ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কোন পিলার নেই, কোন স্তম্ভ নেই–মানুষের দৃষ্টিতে কোনকিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ আকাশ ঠিকই যথাস্থানে অবস্থান করছে। অদৃশ্যমান কোন নির্ভরের ওপরে আকাশ স্থির রয়েছে। এই আকাশ জগতে আল্লাহ তা'য়ালা যে অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যার বিশলতা সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না, সেসব জগৎ একটির সাথে আরেকটি সংঘর্ষ বাধিয়ে ধ্বংসলীলা সংঘটিত করছে না। উর্ধ্বজগতের এমন সব অংশ যার ভেতরকার প্রতিটি অংশকে অত্যন্ত শক্তিশালী সীমান্ত অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক করে রেখেছে। যদিও এ সীমান্ত রেখা মহাশূন্যে অদৃশ্যভাবে অঙ্কিত রয়েছে তবুও সেগুলো অতিক্রম করে কোন জিনিসের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সূরা হিজর-এর ১৬ নং আয়াতে রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ-

আকাশে আমি অনেক শক্তিশালী দূর্গ নির্মাণ করেছি, দর্শকদের জন্য সেগুলো সুসজ্জিত করেছি।

উল্লেখিত আয়াতে 'বুরুজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই বুরুজ শব্দের অর্থ করা হয়েছে, দূর্গ, শক্তিশালী ইমারত বা প্রাসাদ। মহান আল্লাহই ভালো জানেন তিনি উর্ধ্বজগতে কি ধরনের বুরুজ নামক জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তবে আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, উর্ধ্বজগৎ থেকে যে ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে, তা যেসব স্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছেঁকে প্রয়োজনীয় রশ্মি পৃথিবীতে প্রেরণ করে, সেসব স্তরই বুরুজ হতে পারে। আবার উর্ধ্বজগতে শয়তানের প্রবেশ পথে যেসব বাধা নির্মাণ করা হয়েছে, তাও বুরুজ হতে পারে।

সুতরাং আকাশ জগতসমূহে কোথাও কোন দুর্বলতা নেই। সবকিছু নির্মিত হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ভিত্তির ওপরে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ-

এরা কি কখনো নিজেদের ওপরে অবস্থিত আকাশমন্ডলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে না? কিভাবে আমি তা নির্মাণ করেছি এবং সুসজ্জিত করেছি আর তাতে কোথাও কোন ধরনের ফাঁক ও ফাটল নেই। (সূরা ক্বাফ-৬)

আকাশ জগতের এই বিস্ময়-উদ্দীপক বিশালতা সত্ত্বেও এই বিরাট বিস্তীর্ণ মহাবিশ্ব ব্যবস্থা একটি ধারাবাহিক ও সুদৃঢ় ব্যবস্থা এবং এর বন্ধন, গ্রন্থনা এতই দৃঢ়-দুশ্ছেদ্য যে, তার কোথাও কোন ধরনের ফাটল বা অসামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায় না। এর ধারাবাহিকতা কোথাও গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا

অসীম বরকত সম্পন্ন তিনি-যিনি আকাশে বুরুজ নির্মাণ করেছেন এবং তার মধ্যে একটি প্রদীপ ও একটি আলোকময় চাঁদ উজ্জ্বল করেছেন। তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। (সূরা আল ফুরকান-৬১-৬২)

যে আল্লাহর প্রশংসা করতে বলা হয়েছে, তিনি অসীম বরকত সম্পন্ন। তিনি আকাশকে পৃথিবীর ছাদ হিসাবে নির্মাণ করে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করেননি। সূর্যকে সেখানে প্রদীপ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা এই সূর্যরশ্মির ভেতরে এমন উপাদান রেখেছেন, যা পৃথিবীর প্রাণীসমূহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সূর্যের তাপ ব্যতিত পৃথিবীতে কোন কিছুই টিকে থাকতে পারে না, নতুন কিছু সৃষ্টিও হতে পারে না। আকাশ মন্ডলে তিনি অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করে তার ভেতরে আলো দান করেছেন। মাথার ওপরে তারাজ্বলা অপূর্ব সৌন্দর্য মন্ডিত আকাশ দেখে মানুষ আমোদিত হবে, মায়াবী চাঁদের জ্যোসনায় অবগাহন করে হৃদয়-মন জুড়াবে। ক্লান্তি দূরিকরণে রাতকে তিনি দিয়েছেন বিশ্রামের জন্য, দিনকে দিয়েছেন জীবন ধারনের উপকরণ সন্ধানের জন্য। এসব দান করে মানব জাতিকে যিনি ধন্য করেছেন-তিনিই হলেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

যিনি পরম মেহেরবান ও অসীম করুণাময়

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যার শুরুতেই এ কথা বলা হয়েছে যে, এটা একটি অভিনন্দন-পত্রের মতো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে তাঁর বান্দাগণ তাঁরই শেখানো ভাষায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে। প্রথমে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, সমস্ত প্রশংসাই তাঁর। অন্য কেউ প্রশংসা লাভের যোগ্য বলে কোনক্রমেই বিবেচিত হতে পারে না। তাঁর প্রশংসা এ জন্যই করা হয় এবং করতে হবে যে, তিনি হলেন আল্লাহ। আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জানানো হলো যে, তিনি সৃষ্টি জগতসমূহের স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক, ব্যবস্থাপক, পরিচালক, নিয়ন্ত্রক, আইন রচয়িতা, আইন প্রয়োগকারী, বিধানদাতা ইত্যাদি। ইতিপূর্বে তাঁর যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলোই শেষ নয়–তাঁর আরো গুণাবলী রয়েছে। তিনি আপন মহিমায় গৌরবান্বিত। আল্লাহর কোরআন বলছে–

اَللّٰهِ الْعَزِيْزِالْحَمِيْدِ-الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ-

যিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং নিজ সত্তায় স্ব-প্রশংসিত, যিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সাম্রাজ্যের অধিকারী। (সূরা আল বুরুজ-৯-৮)

তিনি অসংখ্য গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে তাঁরই সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমে। তাঁর দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সৃষ্টি কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্টতই অনুভূত হয়, তিনি অসীম দাতা ও দয়ালু। তাঁর দয়া ও দানের কোন শেষ সীমা নেই। এই কথাটিরই স্বীকৃতি বান্দা দেয়া হয় সূরা ফাতিহার মাধ্যমে। বান্দা বলে, তুমি সৃষ্টি জগতসমূহের রব্বই শুধু নও–তুমি মেহেরবান, তুমি এমন দাতা যে, কোনকিছু চাওয়ার পূর্বেই দিয়েছো। তুমি এমনই করুণাময় যে, আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছো এবং জীবন ধারণের জন্য যতকিছু প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা তুমি করেছো। সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, রাহ্মান ও রাহীম। এ দুটো শব্দ হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুণবাচক বা সিফাতী নাম। এই দুটো নামই সূরা আল ফাতিহায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ দুটো শব্দের উৎস হলো 'রহম' ধাতু থেকে।

এ দুটো শব্দই তথা গুণবাচক নাম দুটোই আল্লাহ তা'য়ালার অসীম দয়া–করুণার কথা প্রকাশ করছে। কিন্তু রহমান শব্দ দিয়ে আল্লাহর যে দয়া ও অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে, তাহলো অস্থায়ী দয়া ও অনুগ্রহ। আর রাহীম শব্দ দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার যে দয়া–করুণা, অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে, তাহলো স্থায়ী। রাহ্মান শব্দের মাধ্যমে যে গুণ প্রকাশিত হয় তার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক হলেও তা অস্থায়ী ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর রহমত সর্বত্র সর্বব্যাপক। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা সবই তাঁরই রহমত লাভ করে। কিন্তু এ রহমত সবাই চিরস্থায়ীভাবে লাভ করবে না। পৃথিবীতে রাহ্মানের রহমত সমস্ত শ্রেণীর মানুষ লাভ করলেও

আখিরাতের ময়দানে তা বিশেষ শ্রেণীর জন্যই প্রযোজ্য হবে এবং তা হবে চিরস্থায়ী রহমত। পক্ষান্তরে রাহীম শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার যে দয়া-করুণা-রহমতের কথা বলা হয়েছে, তা শুধু পরকালীন বিশেষ রহমতকে বুঝানো হয়েছে। প্রতিটি সৃষ্টির ওপরে তাঁর অসীম রহমত বৃষ্টি ধারার মতই প্রতি মুহূর্তে বর্ষিত হচ্ছে। এই রহমত বর্ষণের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা হচ্ছে না।

পৃথিবীতে যারা মুসলিম, যারা কোরআন সুন্নাহ্ অনুসরণ করার দাবি করছে, তারাই শুধু তাঁর রহমতের অংশ লাভ করছে না বা তারা যে দেশসমূহে বসবাস করে, সেই দেশের বুকেই তাঁর রহমত বর্ষিত হচ্ছে না। যারা তাঁকে অস্বীকার করছে, তাঁর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করছে, তাঁর কোরআনের সাথে অসম্মানজনক আচরণ করছে, ইসলামের লেবাস পরিধান করে প্রতারণা করছে, কোরআন উৎখাতের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তারাও আল্লাহর রহমত লাভ করছে। কিন্তু আল্লাহর এই রহমত তারা লাভ করবে শুধুমাত্র এই পৃথিবীতেই, পরকালে তারা আল্লাহর রহমত লাভ করবে না। এই অর্থে আল্লাহর রহমত হলো অস্থায়ী। অর্থাৎ তাদের ওপরে যে রহমত বর্ষিত হচ্ছে, এর ধারাবাহিকতা মৃত্যুর পরে আর চলতে থাকবে না। মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে রহমত বর্ষণের প্রক্রিয়া বন্ধ ঘোষিত হবে।

আর যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় দিবারাত্রি অহর্নিশি চেষ্টা-সাধনায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে, অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে সাধ্যানুযী জীবন পরিচালিত করছে, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন করছে, আন্দোলনের পথে কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছে, সময়ের কোরবানী দিচ্ছে, স্বার্থ ত্যাগ করছে, জুলুম-নির্যাতন বরদাশ্ত করছে, অপমানিত ও প্রহৃত হচ্ছে, কারাগারকে হাসি মুখে স্বাগত জানাচ্ছে, ফাঁসির মঞ্চের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে, প্রয়োজনে নিজের প্রিয় জীবনটাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে দিয়ে শাহাদাতবরণ করছে, তাদের ওপরেও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হচ্ছে, এর ধারাবাহিকতা তাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে না, বরং রহমতের মাত্রা সীমাতিরিক্ত বৃদ্ধি লাভ করছে এবং তার ধারাবাহিকতা কখনো কোনদিন শেষ হবে না, অনন্ত কাল ধরে তা চলতে থাকবে।

মহান আল্লাহর অসংখ্য গুণবাচক নামের মধ্যে রাহীম অপেক্ষা রাহ্মান অত্যন্ত বেশী ব্যাপক অর্থবোধক। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক বেশী। আল্লাহ হলেন রাহ্মান–তিনি রাহ্মান পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের জন্য আর কিয়ামতের ময়দানে শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য। তিনি রাহীম–তাঁর এই দয়া তিনি কিয়ামতের ময়দানে তাঁর একান্ত অনুগত বান্দাদের জন্য করবেন। এ জন্য তাফসীরে বলা হয়েছে–

اَلرَّحْمٰنُ هُوَ ذُو الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ بِجَمِيْعِ الْخَلاَئِقِ فِى الدُّنْيَا وَالْمُؤْمِنِيْنَ فِى الاخِرَةِ–

রহমান হলেন তিনি–যিনি এমন রহমতের গুণ-সম্পন্ন, তাঁর রহমত পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকেই আবৃত করেছে এবং আখিরাতে তা শুধুমাত্র তাঁর অনুগত বান্দাগণই লাভ করবে।

আর রাহীম শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাফসীরে বলা হয়েছে–

اَلرَّحِيْمُ ذُو الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

রাহীম হচ্ছেন তিনি–যিনি এমন রহমতের গুণ-সম্পন্ন, আখিরাতের ময়দানে কেবলমাত্র মুমিনগণই সে রহমতের অধিকারী হবে।

আল্লাহর রহমত ব্যতিত গোটা সৃষ্টিজগৎ এক মুহূর্তের জন্যেও সচল থাকতে পারে না। সৃষ্টির সর্বত্র তাঁর অসীম করুণা ঝর্ণাধারার মতোই প্রবাহিত হচ্ছে। তাঁর রহমতের সরোবরে অবগাহন করছে সমস্ত সৃষ্টি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلرَّحْمٰنُ–رَحْمٰنُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ–اَلرَّحِيْمُ–رَحِيْمُ الْاٰخِرَةِ–

আল্লাহ হচ্ছেন রাহ্‌মান-তিনি পৃথিবী ও আখিরাতে সর্বত্রই তাঁর দয়া-অনুগ্রহ বর্ষণ করছেন এবং রাহীম হচ্ছেন তিনি, যিনি আখিরাতে তাঁর বিশেষ দয়া-করুণা বর্ষণ করবেন।

কিয়ামতের ময়দানে রাহ্‌মানের দয়া ও অনুগ্রহ শুধুমাত্র তাঁরাই লাভ করবে, যারা এ পৃথিবীতে তাঁরই বিধান অনুসরণ করেছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন করেছে। আর যারা বিরোধিতা করেছে, পৃথিবীতে আল্লাহ যেমন তাদের প্রতি রাহ্‌মান রয়েছেন, কিয়ামতের ময়দানে তেমনি তিনি রাহ্‌মান থাকবেন না। কোরআন বলছে–

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا–وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا–لاَ يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا–

সেদিনটি অচিরেই আসবে যেদিন আল্লাহভীরুদেরকে মেহমান হিসাবে রাহ্‌মানের সামনে পেশ করা হবে এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত পশুর মতো জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সে সময় যে রাহ্‌মানের কাছ থেকে পরোয়ানা অর্জন করেছে তার ছাড়া আর কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না। (সূরা মার্‌য়াম-৮৫-৮৭)

আল্লাহকে যারা ভয় করে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করে এবং যারা তাঁকে ভয় করে না, তাঁর বিধানের প্রতি বিদ্রোহী ভূমিকা পালন করে, এ দুটো দলই আল্লাহ রাহ্‌মান হিসাবে তাঁর দয়া ও অনুকম্পা ভোগ করছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ বিরোধী দল রাহ্‌মানের করুণার একবিন্দু পরিমাণও লাভ করবে না। পশু যেমন পানির পিসাসায় জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে, আল্লাহর বিধান অমান্যকারী দলও কিয়ামতের দিন পানির পিপাসায় জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকবে। এই অবস্থায় তাদেরকে বন্য পশুর মতই তারিয়ে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ

করা হবে। এই কাজ সম্পাদন করতে রাহ্মানের সামান্য দয়ারও উদ্রেক হবে না। কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তি সুপারিশ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, তিনিও ঐ রাহ্মানের অসীম দয়ার কারণেই সুপারিশের যোগ্য হবেন। সেদিন তাঁর সামনে কোন কথা বলার সাহস তো দূরে থাক, মানুষ চোখের পলক ফেলতেও ভুলে যাবে। রাহ্মানের অনুমতি ব্যতিত কেউ কথা বলতে সক্ষম হবে না। সূরা নাবা-এর ৩৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন–

لاَيَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ–

কেউ কোন কথা বলবে না সে ব্যতিত, যাকে রাহ্মান–পরম দয়াবান অনুমতি দিবেন।

পৃথিবীতে একশ্রেণীর মানুষ নানাভাবে অহঙ্কারের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। হাঁটা চলাফেরায়, কথা বলায়, পোষাক-পরিচ্ছদে গর্বিত ভঙ্গী প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে কিয়ামতের ময়দানে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যাবে। কোরআনের সূরা ত্বা-হা ঘোষণা করা হয়েছে–

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِىَ لاَعِوَجَ لَهُ–وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلاَ تَسْمَعُ اِلاَّ هَمْسًا–يَوْمَئِذٍ لاَّتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلاً–

সেদিন সবাই আহ্বানকারীর আহ্বানে সোজা চলে আসবে, কেউ কোন সামান্য দর্পিত ভঙ্গীর প্রকাশ ঘটাতে পারবে না এবং রাহ্মান–করুণাময়ের সামনে সমস্ত আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে, মৃদু খসখস শব্দ ব্যতিত কোন শব্দ শোনা যাবে না। সেদিন কোন সুপারিশ কার্যকর হবে না, তবে যদি রাহ্মান–করুণাময় কাউকে অনুমতি দেন এবং তার কথা শুনতে পছন্দ করেন।

উল্লেখিত আয়াতে 'মৃদু খসখস শব্দ' বলতে বুঝানো হয়েছে, চলাচলের শব্দ। সেদিন এমন এক ভীতিপ্রদ পরিবেশ বিরাজ করবে যে, মানুষ তো দূরের কথা, কোন ফেরেশতাও কোন কথা বলতে পারবে না। তারা প্রয়োজনে চলাচল করবে। তাদের চলাচলের শব্দের কথাই বলা হয়েছে উক্ত আয়াতে। নীরবে নিভৃতে নিঃশব্দে, অত্যন্ত সন্তর্পণে ভয়-কম্পিতাবস্থায় তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে চলাচল করবে। আর যিনি সুপারিশ করবেন, তিনি স্বাধীনভাবে যার ব্যাপারে খুশী, তার ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারবেন না। বরং সুপারিশ লাভের যোগ্য বলে আল্লাহ যাকে নির্বাচিত করবেন, তিনিই শুধু সুপারিশ লাভ করবেন।

তিনি রাহ্মান

পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহর রাহ্মান নাম উল্লেখ করে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ যে রাহ্মান–অসীম দাতা ও দয়ালু, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো এই যে, তিনি মানব জাতিকে সঠিক পথ ও জ্ঞান দান করার লক্ষ্যে নবী-রাসূল প্রেরণ করে তাঁদের মাধ্যমে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যেহেতু এই পৃথিবীর প্রতিটি বাঁকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য অসংখ্য প্রতারক শক্তি বাঁকা পথ রচনা করে মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

তাদের সৃষ্ট পথ ও মত মানব গোষ্ঠীকে এক চরম অরাজকতার মধ্যে নিক্ষেপ করে। মানব সভ্যতাকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেয়। শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও নির্যাতনের প্লাবন বইয়ে দেয়। পরিশেষে পরকালীন জীবনে এক অবশ্যম্ভাবী নিকৃষ্ট পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। মানবতাকে এই করুণ পরিণতি থেকে হেফাজত করার দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করবেন তিনিই হবেন মানবতার সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং অসীম দয়ালু। এই কঠিন দায়িত্ব কে পালন করবে? সূরা নাহ্লের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ-

পৃথিবীতে অসংখ্য বাঁকা পথের অস্তিত্ব রয়েছে, সুতরাং মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আমার। (সূরা আন্ নাহ্ল)

অন্ধকে পথ প্রদর্শন না করলে সে মারাত্মক বিপদে পতিত হয়। মানব জাতিও ছিল অন্ধ, প্রকৃত সত্য ও শান্তির পথের সন্ধান ছিল তাদের কাছে অজানা। সুতরাং অজানা পথের সন্ধান যিনি দান করেন, তিনি যে কত দয়ালু-তা সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে। চরম বিপদের মুহূর্তে এক জন মানুষ যখন আরেকজন মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে। তখন সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাহায্য দানকারীর প্রতি তার হৃদয়ের সবটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। মানুষও ছিল চরম বিপদাপন্ন। সঠিক পথ না পেয়ে তারা অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁর অসীম দয়া প্রদর্শন করলেন-

كَذَالِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِىْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لِّتَتْلُوْا عَلَيْهِمُ الَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ-

(হে রাসূল!) এভাবে মর্যাদা সহকারে আমি তোমাকে রাসূল নির্বাচিত করে প্রেরণ করেছি এমন এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে, যাদের পূর্বে বহুসংখ্যক মানবগোষ্ঠী অতীত হয়ে গিয়েছে, আমি যে পয়গাম তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তা তুমি এই লোকদের কাছে পৌছাতে সক্ষম হও এই অবস্থায় যে, এই লোকগুলো তাদের অতীব দয়াময় আল্লাহর প্রতি অমান্যকারী হয়ে রয়েছে। (সূরা আর রা'দ-৩০)

সত্য-সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে মানবতা ভ্রান্তপথ অনুসরণ করছিল। অসংখ্য অরাজকতা তাদেরকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল। জুলুম-অত্যাচারে-নিপিড়ীতের ক্রন্দন-রোল আকাশ-বাতাসে এক করুণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ঠিক এ অবস্থাতেই আল্লাহ তা'য়ালা রাহ্মান হিসাবে মানবতার মুক্তির জন্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর মাধ্যমে এমন এক কিতাব মানব জাতিকে দান করেছেন, যে কিতাব মানব জাতিকে যাবতীয় অরাজকতা মুক্ত করে উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে পৌছে দিয়ে তার পরকালীন জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করার একমাত্র মাধ্যম। মহান আল্লাহ যে রাহ্মান-তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো তিনি মানুষকে কোরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং কলম দান করে তার মাধ্যমে

জ্ঞান সংরক্ষণ ও বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারীদের ভেতরে বিতরণ করার ব্যবস্থা করেছেন। কোরআন বলছে–

اَلرَّحْمٰنُ-عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ-خَلَقَ الْاِنْسَانَ-عَلَّمَهُ الْبَيَانَ-

পরম দয়াময় এই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আর রাহ্মান-১-৪)

এটাই আল্লাহর সবচেয়ে বড় রহমত যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সত্য পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি নিরতিশয় অনুগ্রহশীল ও করুণা-প্রবণ। তাঁর বান্দাগণ অন্ধকারে পথের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ছোটাছুটি করবে, এটা আল্লাহ সহ্য করতে পারেননি বলেই তিনি কোরআনের জ্ঞানদান করেছেন। তাঁর অসীম-অনুগ্রহ পূর্ণত্বে পরিণত হয়েছে এভাবে যে, তিনি মানব জাতিকে এমন জ্ঞানদান করেছেন, যার ওপর পৃথিবীতে মানুষের সদাচরণ ও ত্রুটিমুক্ত জীবন-যাপন এবং পরকালে মানুষের সামষ্টিক কল্যাণ একান্তভাবে নির্ভরশীল। সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি, সুতরাং তাঁরই দায়িত্ব হলো নিজের সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শন করা। যে পথে চললে তারা নিজেদের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে সফল ও পূর্ণ করতে সক্ষম হবে, এ পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা যিনি করেছেন, তিনিই হলেন রাহ্মান। তাঁর দয়াশীলতার অনিবার্য দাবি ছিল কোরআন অবতীর্ণ করা, তা অবতীর্ণ করে তিনি সে দাবি পূরণ করেছেন। সূরা সাজ্দায় আল্লাহ বলেন–

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

এটা পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত জিনিস। (আয়াত নং ২)

তিনি শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন–তিনি রাহ্মান। একারণে সৃষ্টি করেই তিনি বিরত হননি, সৃষ্টির প্রতি যে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সে দায়িত্ব তিনি প্রতি মুহূর্তে পালন করে যাচ্ছেন। সৃষ্টির যা যেখানে যখন প্রয়োজন, তিনি তার ব্যবস্থা করছেন। সৃষ্টিজনিত কারণে তিনি ক্লান্ত হয়ে কোথাও বিশ্রাম গ্রহণ করছেন না। এই সীমা সংখ্যাহীন রাজ্যে তিনি স্বয়ং রাজত্ব করছেন। তিন শুধু স্রষ্টাই নন–সমস্ত কিছুর শাসকও তিনি। আল্লাহর কোরআন বলছে–

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى-لَه مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى-وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّوَاَخْفٰى-اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ-لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى-

তিনি রাহ্মান–পরম দয়াবান। সৃষ্টিজগতের শাসন কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন। যা কিছু পৃথিবীতে ও আকাশে রয়েছে, যা কিছু পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে রয়েছে এবং যা কিছু ভূগর্ভে রয়েছে সমস্ত কিছুরই মালিক তিনি। তুমি যদি নিজের কথা উচ্চকণ্ঠে বলো, তবে তিনি

তো চুপিসারে বলা কথা বরং তার থেকেও গোপনে বলা কথাও জানেন। তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ। (সূরা ত্বা-হা-৫-৮)

এক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুসারে দেশ ও জাতিকে পারিচালিত করতে থাকে। আল্লাহর কিতাবের অনুসারীগণ তাদেরকে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে দেশ ও জাতিকে পরিচালিত করার কথা বললে তারা এদেরকে শত্রু মনে করে এবং এদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এরা অনুভব করে না, দয়াময় আল্লাহ এদের ওপরে যে কোন মুহূর্তে আযাব নাজিল করতে পারেন। আল্লাহ বলেন–

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ-

হে রাসূল ! আপনি ওদেরকে জানিয়ে দিন, কে তোমাদেরকে রাতে ও দিনে দয়াময়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারে ? (সূরা আল আম্বিয়া-৪২)

ইসলাম বিরোধিরা নিজেদেরকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী মনে করে অন্যায় অত্যাচারের তান্ডব চালাতে থাকে। তারা ভুলে যায়, তাদের এসব কর্মকান্ডের জবাব একদিন দিতে হবে। ভুলে যায়, যে কোন সময় আল্লাহ সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড করে দিতে সক্ষম। রাতে যখন তারা অবৈধ পন্থায় নির্মিত বিলাস ভবনে দুগ্ধ ফেনিল শয্যায় গভীর সুসুপ্তিতে নিমগ্ন থাকে, ভূমিকম্পের একটি মাত্র কাঁপুনিতেই তাদের সাধের বালাখানা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে স্বযত্নে লালিত দেহটাকে চর্বিত গোস্তের একটি পিন্ডে পরিণত করে দিতে পারে। জাতীয় অর্থ ছিনতাই আর লুটপাট করে মহাকাশ যানে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যখন তারা বিলাস ভ্রমণে আত্মহারা হয়ে ওঠে, সে মুহূর্তে মহাকাশযানটিকে বিকল করে অসংখ্য টুকরায় পরিণত করে আল্লাহ তা সাগরের অতল তলদেশে চিরতরে অদৃশ্য করে দিতে পারেন। তিনি অসীম ক্ষমতাবান, সবকিছুই তাঁর পক্ষে সম্ভব। তিনি যেমন দয়ালু, তেমনি তিনি কঠিনতম শাস্তি দাতাও।

তৎকালীন আরবে রাহ্মান শব্দের প্রচলন

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আল্লাহর পরিচয় উপস্থাপন করতে গিয়ে যখন তাঁর গুণবাচক নাম 'রাহ্মান' শব্দটি উল্লেখ করেছিলেন, তখন ইসলাম বিরোধী শক্তি বিদ্রুপ করে প্রশ্ন করেছিল, এই রাহ্মান আবার কে ? ঠিক অনুরূপ প্রশ্ন এসেছিল ফেরাউনের পক্ষ থেকে। হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম যখন তাকে বলেছিল, তুমি তোমার রব্ব-এর আনুগত্য স্বীকার করো। সেও তখন বিদ্রুপ করে বলেছিল, 'ওয়া মা রাব্বুল আলামীন ?' রাব্বুল আলামীন আবার কে ? তার পক্ষ থেকে এ প্রশ্নটি এসেছিল এ কারণে নয় যে, সে রব্ব সম্পর্কে অবগত ছিল না। বরং সে জানতো, গোটা সৃষ্টিজগতের একজন রব্ব আছেন। এ জন্য সে বলেছিল, 'আমিই সমস্ত রব্ব-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রব্ব।'

তেমনিভাবে রাসূলের সামনে যারা 'রাহ্মান' সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল, সে প্রশ্ন অজ্ঞতার কারণে নয়। এমনটি নয় যে, তারা কখনো কোনদিন এই রাহ্মান শব্দটি শোনেনি। বরং বিদ্রুপ

করেই তারা এ প্রশ্ন উথাপন করেছিল। কেননা, ইতিহাস বলে–আরবে বহুপূর্ব থেকেই রাহ্মান নামের প্রচলন ছিল এবং এর অর্থও তারা অবগত ছিল। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে যে সমস্ত উপাসনালয় পাওয়া গিয়েছে এবং এসবের গাত্রে যে শিলালিপি রয়েছে, তাতে 'ইলাহ্ এবং রাহ্মান' শব্দ স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এ কথার প্রমাণ পেয়েছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের বহুপূর্বেও লোকজন তাওহীদবাদী ছিল, তারা এক আল্লাহকেই দাসত্বের অধিকারী বলে মনে করতো। তারা সে আল্লাহর গুণবাচক নাম রাহ্মান শব্দের সাথেও পরিচিত ছিল এবং সে নামে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতো। ইসলাম চির পুরাতন এক শ্বাশত আদর্শের নাম।

আর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন, তিনি হলেন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণতা দানকারী। বিদায় হজ্জের সময়ে কোরআনের যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, সে আয়াতেও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, আজ আপনার আদর্শকে পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো। যদিও ইসলাম বৈরী মহল বিশ্বব্যাপী প্রচার করেছে এবং তাদের প্রচারিত কথাই মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শিক্ষাঙ্গণে শিক্ষাদান করা হচ্ছে যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম জাতির ভেতরে এই কথাটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে–ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু কোরআন-হাদীস ও ইতিহাসের মোকাবেলায় ঐ কথার কোন ভিত্তি নেই।

আদম আলাইহিস্ সালামের থেকে ইসলামের যাত্রা শুরু। সে কারণে প্রতিটি নবী এবং রাসূলও ইসলামের দিকেই মানুষকে এই কথা বলে ডেকেছেন যে, হে আমার জাতির লোকেরা ! তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া আর কেউ দাসত্ব লাভের যোগ্য নয়। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামও মামুষকে নির্ভেজাল ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আদর্শ, তাওহীদের শিক্ষা মহাকালের ঘূর্ণায়মান চক্রের আবর্তন ও বিবর্তনে একশ্রেণীর মানুষের ভ্রান্তির কারণে বিকৃত হয়ে যায়। নির্ভেজাল একত্ববাদের মধ্যে তারা অংশীবাদের মিশ্রণ ঘটায়।

যে কা'বাঘর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর সন্তান ও আল্লাহর নবী হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামকে সাথে করে পুনঃনির্মাণ করেন, সেই কাবাঘরের মাথায় পৌত্তলিকগণ মূর্তি স্থাপন করে। তাওহীদের অমীয় আদর্শ পৌত্তলিকতার ঘৃণ্য আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। এক সময়ে তাওহীদের প্রজ্জ্বলিত আলোক শিখা গোটা আরবকে আলোকিত করেছিল, সে আলোক শিখা জোনাকীর আলোর ন্যায় মিটমিট করে জ্বলতে থাকে। মুশরিকদের শত অপচেষ্টাতেও তাওহীদের শিখা নির্বাপিত হয়নি।

তদানীন্তন সমাজে কিছু সচেতন সতর্ক দৃষ্টির অধিকারী, সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষ ছিলেন, যারা মনে প্রাণে মূর্তিপূজা ঘৃণা করতেন। কালের মহাস্রোতে এই শ্রেণীর মানূষ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে সময়ে ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন,

সে সময় পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব ছিল। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আদর্শের অনুসারী বা নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসন্ধানকারীদেরকেই সে সময়ে হানিফী বলা হতো। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আদর্শকে সে যুগে কেন হানিফী বলা হতো ? এ সম্পর্কে গবেষণালব্ধ জ্ঞান আমাদের কাছে নেই। তবে কোরআন-হাদীস, ইতিহাস ও গবেষকদের গবেষণা থেকে যতটুকু জানা যায়, যারা সে যুগে মূর্তিপূজা বর্জন করেছিল তাদেরকে হানিফী বলা হতো।

পবিত্র কোরআনেও এই 'হানিফ' শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের বলা কথাটি মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এভাবে বলেছেন, হানিফাঁও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন—আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই। এখানে হানিফ্ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বিরত থাকার অর্থে। পবিত্র কোরআনের তাফসীরকারদের মধ্যে এই শব্দের অর্থ নিয়ে কিছুটা মতান্তর লক্ষ্য করা যায়। একদল তাফসীরকার বলেন, হানিফ শব্দের অর্থ হলো—বর্জন করা, ত্যাগ করা বা বিরত থাকা।

কারণ, আরবে যারা মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিল তাদেরকে হানিফা বলা হতো। আরেক দল তাফসীরকার বলেন, হানিফ শব্দটা সুরিয়ানী এবং ইবরানী ভাষায় কপটতার অর্থে, মোনাফেকীর অর্থে, কাফের হবার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ একদল মানুষ মূর্তির সাথে বিদ্রোহ করেছিল, সুতরাং আরবের পৌত্তলিকদের ভাষায় তারা মোনাফিক, কাফের হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে পৌত্তলিকরা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আদর্শের অনুসারীদেরকে হানিফা উপাধি দান করেছিল। সুতরাং তাওহীদের অনুসারীগণও গর্বের সাথে নিজেদেরকে হানিফা হিসাবে পরিচয় দান করতো।

গোটা আরবে মূর্তিপূজার প্লাবন বয়ে গেলেও একশ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব সেখানে ছিল যারা মূর্তিকে সমস্ত অন্তর দিয়ে যে শুধু ঘৃণাই করতো তা নয়, তারা বিরোধিতাও করতো। প্রতি বছরের শেষে মূর্তিপূজকরা মূর্তির সমাবেশ ঘটাতো। এই ধরণের এক সমাবেশে জায়েদ ইবনে আমর, ওয়ারাকা ইবনে নওফেল, ওসমান ইবনে হুওয়াইরেস, আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ প্রমুখ বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কোরায়েশ গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা। ওসমান ছিলেন আব্দুল উজ্জার নাতি, আব্দুল্লাহ ছিলেন হযরত হামজার ভাইয়ের সন্তান, জায়েদ ছিলেন হযরত ওমরের চাচা আর ওয়ারাকা ছিলেন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার চাচাত ভাই। মূর্তির সমাবেশে তারা অজস্র মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ করেই তাদের মনের জগতে গুঞ্জন আরম্ভ হলো, 'আমরা কেন নিষ্প্রাণ পাথরের সামনে নিজেদের মাথানত করি ? কেন আমরা এই জড়পদার্থের আরাধনা করি ? এসব কাজ তো অনর্থক ! এসব পাথরের মূর্তি তো কারো কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, তাহলে কেন আমরা এসব পাথরের আরাধনা করবো ?'

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করার অনেক পূর্ব থেকেই তাঁর সাথে জায়েদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। জায়েদ মূর্তিকে ঘৃণা করে মহাসত্যের

অনুসন্ধানে সে সময়ে সিরিয়া গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ঐসব ধর্মে সত্যের সন্ধান পেলেন না বিধায় তাঁর মনের অস্থিরতা দূর হলো না। তিনি পুনরায় মক্কায় ফিরে এলেন। পরিচিতদের কাছে তিনি বলতেন, 'আমি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আদর্শকে বিশ্বাস করি। হানিফী ধর্ম মেনে চলি।' হযরত আছমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমি জায়েদকে দেখেছি, সে কা'বাঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে সমবেত কোরাইশদের লক্ষ্য করে আক্ষেপের স্বরে বলতেন, 'হে কোরাইশের দল ! আমি ছাড়া আর কেউ তোমাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আদর্শের ওপরে প্রতিষ্ঠিত নেই।' তদানীন্তন আরব সমাজে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। এই ধরণের অমানবিক প্রথার জায়েদই প্রথম বিরোধিতাকারী ব্যক্তি। তিনি এধরণের অনেক কন্যা সন্তানকে নিয়ে নিজে প্রতিপালন করেছেন। (বোখারী)

মক্কার গোত্রপতি ওতবা ছিল হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নানা এবং উমাইয়ার মামাত ভাই। উমাইয়া দেওয়ানের অস্তিত্ব বর্তমানেও আছে। সে ছিল উঁচু স্তরের কবি। এই উমাইয়াও মূর্তি পূজার বিরোধিতা করতো। এসবের বিরোধিতা করে সে কাব্য রচনা করেছিল। বদর যুদ্ধ যখন অনুষ্ঠিত হয় সে সময়েও সে জীবিত ছিল। বদরের যুদ্ধে ওতবা নিহত হলে সে খুবই ব্যথিত হয়েছিল। কবিতার মাধ্যমে সে তাঁর শোক প্রকাশ করেছিল। হাদীস শরীফে এসেছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর এক সাহাবীকে নিয়ে ভ্রমণে ছিলেন। পথে উক্ত সাহাবী কবি উমাইয়ার কবিতা আবৃত্তি করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে আরো উৎসাহিত করলেন কবিতা পাঠ করার জন্য এবং তিনি অনেক বড় একটা কবিতা আবৃত্তি করলেন। সমস্ত কবিতা শুনে আল্লাহর রাসূল মন্তব্য করলেন, 'উমাইয়া মুসলিম হবার কাছাকাছি এসেও সে মুসলমান হতে পারেনি।'

কায়েস ইবনে নুশবাহ নামক এক ব্যক্তি মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিল। সেই মূর্তির যুগেও সে এক আল্লাহর ওপরে বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন, তখনই সে ইসলামে শামিল হয়েছিল। আরবের বিখ্যাত বাগ্মী কায়েস ইবনে ছায়েদাল আইয়াদিও নিজেকে মূর্তিপূজা হতে বিরত রেখেছিল। এ ধরণের অনেকেই তদানীন্তন আরবে মূর্তিপূজার বিরোধিতা করতো।

ওয়ারাকা ইবনে নওফেল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ মূর্তিপূজা ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। বনী আমের ইবনে সা'সায়া বংশের একজন ব্যক্তি–তাঁর নাম ছিল আন্না বিগাতুল জা'য়াদী। তিনি মূর্তিপূজার কঠোর বিরোধী ছিলেন। তিনি পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস করতেন। জীবনের সমস্ত কর্মকান্ডের জবাব আদালতে আখেরাতে দিতে হবে তা তিনি বিশ্বাস করতেন এবং মানুষের কাছে বলতেন। তিনি রোজা পালন করতেন এবং আল্লাহর কাছে তওবাহ করতেন। বনী আদী ইবনে নাজ্জার বংশের সিরমা ইবনে আনাসও ছিলেন মূর্তিপূজার ঘোর রিরোধী। মহানবীর আগমনের পূর্বে তিনি অত্যন্ত সহজ সরলভাবে জীবন-যাপন করতেন। কোন ধরণের মাদকদ্রব্য তিনি ব্যবহার করতেন না। নিজের স্ত্রীর

মাসিক হলে তিনি স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন না। স্ত্রীর সাথে মিলিত হলে তিনি গোসল ফরজ হয়েছে মনে করতেন। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু পরে তা গ্রহণ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহর কোন শরীক নেই। ইসলামী পদ্ধতিতে তিনি পাক-নাপাক বুঝে চলতেন। রাসূলের দরবারে তিনি যখন এসে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি বয়সের শেষ প্রান্তে পৌছে গিয়েছিলেন। সুতরাং তারা আল্লাহর গুণবাচক নাম রাহ্মান শব্দের সাথে পরিচিত ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে তাদেরকে যখন আদেশ দিয়েছিলেন–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ-

তাদেরকে যখন বলা হয়, এই রাহ্মান–পরম করুণাময়কে সিজ্দা করো তখন তারা বলে, রাহ্মান আবার কি ? (সূরা আল ফুরকান-৬০)

তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাহ্মান কি এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট কি তার ব্যাখ্যা দেয়া হলো। বলা হলো–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا-وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا-

অসীম বরকত সম্পন্ন তিনি–যিনি আকাশে বুরুজ নির্মাণ করেছেন এবং তার মধ্যে একটি প্রদীপ ও একটি আলোকময় চাঁদ উজ্জ্বল করেছেন। তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে শিক্ষা গ্রহণ করতে অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়। (সূরা আল ফুরকান–৬১-৬২)

কোরআনে রাহ্মানের বান্দাদের পরিচয়

স্বয়ং আল্লাহই রাহ্মান এবং তাঁর অসীম করুণার কারণেই তোমরা জীবত আছো–এ কথা মানুষকে জানিয়ে দেয়া হলো। রাতের মধ্যে কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং মানুষের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেয়া হলো। দিনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞানদান করা হলো। উর্ধ্বজগৎ থেকে যে ক্ষতিকর রশ্মি ধেয়ে আসে, তা প্রতিরোধ করার জন্য আকাশে বুরুজ নির্মাণ করা হয়েছে, এ সম্পর্কে বলা হলো। চন্দ্র ও সূর্যের প্রয়োজনীয়তা ও তার উপকারিতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো। এ কথা বুঝিয়ে দেয়া হলো যে, তিনিই রাহ্মান–যিনি অসীম দয়া করে তোমাদের জন্য এসব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন, সুতরাং তাঁরই দাসত্ব করো। যারা এ কথাগুলো বুঝে তাঁর দাসত্ব কবুল করেছে, তাদের পরিচিতিসহ গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا-

রাহ্মানের বান্দাহ তারাই যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে। (সূরা ফুরকান-৬৩)

রাহ্মানের অসীম দয়া-করুণা দেখে যারা এ কথা অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছে যে, প্রশংসা ও দাসত্ব একমাত্র তাঁরই করা উচিত, যাঁর করুণাধারায় টিকে আছে এ সৃষ্টিজগৎ। এ কথা অনুধাবন করার পরে তারা নিজেদের সমস্ত কিছুই ঐ রাহ্মানের কাছেই নিবেদন করেছে, যিনি সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব। এই রাহ্মানের ওপরে ঈমান এনে যারা তাঁর গোলাম হয়েছে, তাদের ভেতরে অহঙ্কারের কোন অস্তিত্ব থাকে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপরে ঈমান আনে, সে ব্যক্তি হয় বিনয়ী। রাহ্মানের গোলাম ঈমানদার হয় বিনম্র। তাঁর ব্যবহারে কখনও দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় না। কথায় এবং আচরণে অহংকারের ছোঁয়া থাকে না। মন-মানসিকতায় স্বৈরাচারী চিন্তাধারার উদ্রেক হয় না।

করুণাময়ের গোলাম ঈমানদার ব্যক্তি যদি ধনাঢ্য হয়, বিশাল বিত্ত বৈভবের অধিকারী হয় তবুও তাঁর ভেতরে অহংকারের চিহ্নমাত্র থাকে না। কারণ ঈমানদার ব্যক্তি জানে যে, তাঁর এই সম্পদ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। রাহ্মান দয়া করে দান করেছেন আবার যে কোন মুহূর্তে তিনি তাঁর কাছ থেকে এ সম্পদ-ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিতে পারেন। আজ তিনি দেশের ধনীদের কাতারের একজন আছেন, দেশে-বিদেশে তাকে বিশিষ্ট নাগরিকের সম্মান-মর্যাদা দান করা হচ্ছে, রাহ্মান ইচ্ছে করলেই মুহূর্ত কাল পরেই তাকে কপর্দক শূন্য করে দেশের ভিখারীদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম।

রাহ্মানের গোলামদের চলাফেরা হয় একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো। নম্রভাবে চলার অর্থ দুর্বল ও রোগীর মতো চলা নয় এবং একজন প্রদর্শন অভিলাষী নিজের বিনয় প্রদর্শন করার বা নিজের আল্লাহ ভীতি প্রদর্শনের জন্য যে ধরনের কৃত্রিম চলার ভঙ্গী সৃষ্টি করে সে ধরনের চলাও নয়। আল্লাহর রাসূল নিজে পথ চলার সময় এমন দৃঢ়ভাবে কদম নিক্ষেপ করতেন যেন মনে হতো তিনি কোন উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে নেমে আসছেন। একদিন এক যুবককে হযরত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দুর্বলভাবে হেঁটে যেতে দেখে ডাক দিয়ে জানতে চাইলেন, সে অসুস্থ কিনা। যুবক নেতিবাচক জবাব দিলে তিনি হাতের ছড়ি উঠিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, শক্ত হয়ে সবল মানুষের মতো হাঁটো।

সুতরাং নম্রভাবে চলার অর্থ হলো একজন ভালো মানুষের মতো স্বাভাবিকভাবে চলা। কৃত্রিম বিনয়ের সাহায্যে যে চলার ধরণ সৃষ্টি করা হয় অথবা যে চলার মধ্য দিয়ে বানোয়াট দীনতা ও দুর্বলতার প্রকাশ ঘটানো হয়, তাকে নম্রভাবে চলা বলা যেতে পারে না। একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, মানুষের চলা শুধুমাত্র তার হাঁটার একটি ভঙ্গীর নাম নয়। হাঁটা-চলা হলো মানুষের মন-মানস, চরিত্র ও নৈতিক কর্মকান্ডের প্রত্যক্ষ ফতিফলন। একজন আল্লাহভীরু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির হাঁটা-চলা, আর একজন চরিত্রহীন, জালিম, স্বৈরাচার, আত্মম্ভরী অহঙ্কারী ব্যক্তির হাঁটা-চলা অথবা একজন চরম গরীব মানুষের হাঁটা-চলা দেখলে অনুমান করা যায় যে, তাদের মধ্যে কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব সক্রিয় রয়েছে। সুতরাং যারা রাহ্মানের গোলাম-আল্লাহর বান্দাহ তাদের চলাফেরার মধ্য দিয়েই তাদের পরিচিতি প্রকাশ পায়।

আল্লাহর গোলাম জানে, মৃত্যু যদি এই মুহূর্তে তার দিকে হীম শীতল থাবা বিস্তার করে, তাহলে তার এই বিশাল সম্পদ মুহূর্তে অন্যের মালিকানায় চলে যাবে। এসব সম্পদ তাঁর কোন কাজেই আসবে না। তাঁর কাছে যে ধন-সম্পদ রয়েছে, এসব আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে কিছুই নয়। কারণ তাঁর সম্পদ হারিয়ে যেতে পারে, ছিনতাই হতে পারে, খরচ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহর কাছে যে সম্পদ রয়েছে, তা কখনও হারাবে না, ছিনতাই হবে না, বিনষ্ট হবে না, তিনি দান করেন, কিন্তু ফুরিয়ে যায় না। অসীম দয়ালু রাহ্‌মান বলেন–

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَا-

আল্লাহ অভাবমুক্ত, তিনি সম্পদশালী এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন আর তোমরা সবাই মুখাপেক্ষী, অভাবী। (আল কোরআন)

আল্লাহ তা'য়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তাঁর ভান্ডার কখনও শূন্য হয় না। তাঁর সম্পদের ভান্ডার প্রতি মুহূর্ত পরিপূর্ণ। গোটা পৃথিবীবাসীকে তিনি এক মুহূর্তে অতুলনীয় সম্পদের অধিকারী বানিয়ে দিতে সক্ষম। ঈমানদার তাঁর আশ্রয়স্থল মহান আল্লাহ সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখেন, এ কারণে অহংকারের পরিবর্তে তাঁর গোটা দেহ বিনম্রতার বর্মে আবৃত থাকে। তাঁর কথামালায় নম্রতার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সম্পদের অহংকার সে করে না। ঈমানদারের চেতনা এ ব্যাপারে শানিত থাকে যে, আল্লাহ যদি এই মুহূর্তে তাঁর দেহে এমন কোন রোগ প্রবেশের নির্দেশ দেন, যে রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে তার অর্জিত ধন-সম্পদের এই বিশাল স্তূপ ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যাবে, তবুও তিনি রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করবেন না। আল্লাহর নির্দেশে তার মস্তিষ্কের একটি নার্ভ যদি একটির সাথে আরেকটি অর্থাৎ পরস্পরে জড়িয়ে যায়, তাহলে মুহূর্তে তার স্বাভাবিক চেতনা লোপ পাবে, ঘনিষ্ঠ মহল, পরিচিত মহলের কাছে তিনি উন্মাদ নামে আখ্যায়িত হবেন। ভোগ-বিলাসের উপকরণে সজ্জিত বিশাল বালাখানা থেকে তাকে বের করে পাগলা গারদে প্রেরণ করা হবে।

সুতরাং অহংকার শোভনীয় নয়। অহংকার একমাত্র আল্লাহর জন্য। মুমিন ব্যক্তির কথা বলার মধ্যেও নম্রতা প্রকাশ পায়। কথা বলার সময় সে তার প্রতিপক্ষের প্রতি কোন ধরনের অবজ্ঞা প্রকাশ করে না। কারণ তাঁর স্মরণে থাকে যে, তাঁর দয়াময় আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দান করেছেন–

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ-

মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না। (সূরা লোকমান-১৮)

ঈমানদার ব্যক্তির চাল-চলন হয় বিনম্রতার মাধুর্য মন্ডিত। সে অহংকারের পদভারে পাহাড়কে ধ্বসিয়ে দিতে পারবে না। কারণ সে তাঁর মালিক আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ জেনেছে–

وَلاَتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا-اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ-

জমীনের ওপরে অহংকারের সাথে চলাফেরা করবে না। আল্লাহ কোন অহংকারী, দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না। (সূরা লোকমান-১৮)

যাঁর দয়া আর দানের কোন শেষ নেই, সেই রাহ্‌মান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন–

وَلاَتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَا الاَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولاً-

খবরদার ! আমার জমীনের ওপরে অহংকারের পদভারে চলাফেরা করো না। তুমি এই জমীনকে পদাঘাতে ধ্বসিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখো না। তুমি ঐ পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়াকেও ছাড়িয়ে যেতে পারো না।

অর্থাৎ অহঙ্কারের সাথে বুক উঁচু করে চলাফেরা করো না। তোমার চলাফেরার মাধ্যমে যেন গর্বিত স্বৈরাচারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর চিহ্ন প্রকাশিত না হয়। আচার-আচরণের মাধ্যমে তোমার ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর শক্তি প্রদর্শন করো না। যে ব্যক্তি রাহ্‌মানকে চিনেছে এবং তাঁর সত্ত্বার প্রতি ঈমান এনে মুমীনে পরিণত হয়, সে তাঁর চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে সে কথা বলে না। কারণ তাঁর চেতানায় একথা জাগ্রত থাকে যে–

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ-اِنَّ اَنْكَرَا لاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ-

নিজের চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং নিজের কণ্ঠস্বর নমনীয় রাখো। জেনে রেখো, সব আওয়াজের মধ্যে গর্দভের আওয়াজই হচ্ছে সবচেয়ে কর্কশ। (সূরা লোকমান-১৯)

ঈমানদার ব্যক্তি শক্তির অহংকার করে না। কারণ সে জানে যে, আল্লাহর শক্তিই সবচেয়ে বেশী। কোন মানুষের এ শক্তি নেই যে, সে আল্লাহর সাম্রাজ্যের বাইরে কোথাও চলে যাবে। যারা অহংকার করে, দাম্ভিকতা প্রকাশ করে, শক্তিতে মদমত্ত হয়ে জাতির ওপরে জুলুম করে, তাদেরকে সাবধান করে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন–

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا-لاَ تَنْفُذُوْنَ اِلاَّ بِسُلْطَانٍ-

হে জ্বিন ও মানুষ ! যদি তোমাদের এমন ক্ষমতা থাকে যে, তোমরা এই আকাশ ও পৃথিবীর বাইরে কোথাও চলে যাবে, তাহলে চলে যাও। কিন্তু কোথায় যাবে, সমস্ত জায়গার সার্বভৌমত্ব আমার। (সূরা আর রাহ্‌মান)

যাবার স্থান কোথাও নেই। পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরে, এই সৌর মন্ডলে দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান যেখানে যা কিছুই রয়েছে, এসব কিছুর মহান অধিপতি হলেন আল্লাহ। এই অনুভূতি ঈমানদার বান্দার মন-মস্তিষ্কে সক্রিয় থাকে, এ জন্য মুমীন ব্যক্তি প্রচন্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়েও স্বৈরাচারী মনোভাব পোষণ করে না। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আল্লাহ পাক দান করলে সে বারবার আল্লাহর দরবারে শোকর গুজার করতে থাকে।

দৈহিক শক্তির অধিকারী কোন ব্যক্তি যখন ঈমান আনে তখন সে তাঁর শৌর্য-বীর্য শক্তির কারণে অহংকার করে না। কারণ সে জানে, তাঁর এই দৈহিক শক্তি যে কোন মুহূর্তে হারিয়ে যেতে পারে। আল্লাহর আদেশে তাঁর দেহের সমস্ত নার্ভগুলো অবশ হয়ে যেতে পারে। তাঁর চলতশক্তি হারিয়ে যেতে পারে। তাঁর পূর্বে প্রচন্ড দৈহিক শক্তি দিয়ে বিভিন্ন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে মুছে গিয়েছে। এভাবে ঈমান মানুষকে অহংকার মুক্ত করে তার স্বভাবে বিনয় ও নম্রতার আবরণে অচ্ছাদিত করে।

রাহ্‌মানের গোলাম ঈমানদার ব্যক্তি প্রখ্যাত জ্ঞানী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও সে জ্ঞানের অহংকার করে না। কারণ আল্লাহর কোরআনে সে পাঠ করেছে যে, মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। জ্ঞানের সমস্ত ভান্ডার রয়ে গিয়েছে আল্লাহর কাছে। মানুষ সে-তার জ্ঞান পরিপূর্ণ নয় এবং নির্ভুলও নয়। যে সামান্য জ্ঞান সে অর্জন করেছে, মস্তিষ্কে কোন ত্রুটি ঘটলে, স্মৃতিশক্তির কেন্দ্রস্থল বিকল হয়ে গেলে মুহূর্তে সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে যাবে। তাঁর জ্ঞান থাকে সব সময় সঠিক তথ্য দান করবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তাঁর জ্ঞান তাকে কোন অজেয় ক্ষমতা দান করতে পারে না। অর্জিত জ্ঞান তাকে চিরঞ্জীব করতে পারে না। জ্ঞানের মাধ্যমে সে রোগ-ব্যধি-জরাকে জয় করতে পারেনি। মহান আল্লাহই হলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। রাহ্‌মানের বান্দাদের গুণাবলী সম্পর্কে সূরা ফোরকানের ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا-

তারা নিজেদের রব্ব-এর সামনে সিজদায় অবনত হয়ে থাকে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটায়।

রাহ্‌মানের যারা গোলাম, তাদের দিনের জীবন আর রাতের জীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের রাত ভোগ-বিলাসে, অহেতুক গল্প করে, অর্থহীন কোন কর্মকান্ডে অতিবাহিত হয় না। তাদের রাত কেটে যায় আল্লাহর নিয়ামত ঘুমের মধ্য দিয়ে, নামাজ আদায়ের ও দোয়া করার মধ্য দিয়ে। নীরব নিঝুম রাত-সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, রাহ্‌মানের বান্দাগণ তখন সেজদায় পড়ে অশ্রুধারায় সেজদার স্থান ভিজিয়ে দেয়। স্বয়ং রাহ্‌মান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সেই অনুগত বান্দাদের পরিচয় সূরা সাজ্দার ১৬ আয়াতে এভাবে দিচ্ছেন-

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا-وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

তাদের পিঠ বিছানা থেকে পৃথক থাকে, নিজেদের রব্বকে ডাকতে থাকে আশা ও আশঙ্কা সহকারে এবং যা কিছু রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

সূরা কাসাসের ৫৫ আয়াতে তাদের আরেকটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরা কোন অশালীন অর্থহীন কথা বলে না, যারা বলে তাদের সাথেও যোগ দেয় না। সূরা যারিয়াতে এদের আরেকটি গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ-وَبِالاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ-

এ সকল জান্নাতবাসী ছিল এমন সব লোক যারা রাতে সামান্যই ঘুমাতো এবং ভোর রাতে মাগফিরাতের দোয়া করতো। (সূরা যারিয়াত-১৭-১৮)

রাহ্মানের বান্দাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহর কোরআনে সূরা যুমারে বলা হয়েছে–

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ الَّيْلِ سَاجِداً وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهِ-

যে ব্যক্তি হয় আল্লাহর আদেশ পালনকারী, রাতের বেলা সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে থাকে, আখিরাতকে ভয় করে এবং নিজের রব্ব-এর রহমতের প্রত্যাশা করে–তার পরিণাম কি মুশরিকের মতো হতে পারে ? (সূরা যুমার-৯)

রাহ্মানের গোলাম–ইসলামী আন্দোলন যারা করে, তাদের চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা এভাবে করা হয়েছে যে–

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ-اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا-

তারা দোয়া করতে থাকে, হে আমাদের রব্ব ! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও, তার আযাব তো অত্যন্ত ভয়াবহ। (সূরা ফুরকান-৬৫)

রাহ্মানের বান্দাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা কৃপণ হয় না। আবার দান করতে করতে একেবারে কপর্দকহীনও হয়ে যায় না। অযথা তারা অর্থ অপচয় করে না। প্রদর্শনীমূলক ব্যয় তারা করে না। কোন বৈধ অনুষ্ঠানেও তারা বিলাসিতার আশ্রয় গ্রহণ করে না। সর্বাবস্থায় তারা মধ্যমপন্থা গ্রহণ করে থাকে। আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا-

তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। (সূরা ফুরকান-৬৭)

আল্লাহর কিতাবের এ কথার দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, নিজের অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা মানুষের জ্ঞানবান হবার অন্যতম আলামত।

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা নিয়োজিত থাকে, তারাই হলো রাহ্মানের বান্দাহ্। এরা আল্লাহকে ভয় করে, বিপদাপন্ন হলে তারা এক আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সাহায্যকারী বলে মনে করে না। যে কোন প্রয়োজনে তারা একমাত্র আল্লাহকেই ডাকে। ইসলাম অনুমোদিত পন্থা ব্যতিত এরা কাউকে হত্যা করে না বা আল্লাহর কোরআন যাকে মৃত্যুদন্ড দান করে, সে দন্ড কার্যকর করা ব্যতীত এরা কাউকে হত্যা করে না। এরা চরিত্রহারা হয় না। আল্লাহর কোরআন এভাবে এদের গুণগুলো বর্ণনা করেছে-

وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَيَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ-

তারা আল্লাহ ব্যতিত আর কোন উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন কোন সংগত কারণ ব্যতিত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। (সূরা ফুরকান-৬৮)

যারা রাহ্মানের বান্দাহ্, তারা একমাত্র তাঁকে ব্যতিত অন্য কাউকে রব্ব হিসাবে অনুসরণ করে না এবং কারো কাছে সাহায্য কামনা করে না। তারা বলে-

وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ-

আমাদের রাহ্মান-দয়াময় রব্বই আমাদের সাহায্যকারী। (সূরা আল আম্বিয়া-১১২)

যারা রাহ্মানের গোলাম, তারা নিজেরা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চলে এবং আল্লাহর যমীনে তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলামী আন্দোলন করে। এই আন্দোলন করার কারণে ইসলাম বিরোধীশক্তি তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। কিছু সংখ্যক মানুষ অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। এদেরকে ভয়ঙ্কর ধরনের সন্ত্রাসী বলে ধারণা করে। নানাভাবে এদেরকে কষ্ট দেয়। এ অবস্থায় রাহ্মানের বান্দারা প্রবল ধৈর্য্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে থাকে। আল্লাহ বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا-

নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করছে অত্যন্ত দ্রুত রাহ্মান-দয়াময় তাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। (সূরা মার্‌য়াম-৯৬)

অর্থাৎ যারা তাদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতো, এ ধারণা তাদের পরিবর্তন হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা রাহ্মান-তিনি দেখছেন, তাঁর সৈনিকগণ কিভাবে নির্যাতিত হচ্ছে।

যাবতীয় কষ্ট তারা হাসিমুখে বরণ করছে। সমাজের একশ্রেণীর মানুষ তাদের সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে কটুক্তি করছে। সন্ত্রাসী শক্তি সন্ত্রাস করে প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে, অর্থের জোরে, প্রচার মাধ্যমের জোরে তাদের মতো শান্তি প্রিয় লোকগুলোকেই সন্ত্রাসী বানিয়ে ছাড়ছে। আল্লাহ বলেন, এ অবস্থা বেশী দিন থাকবে না। পরম ধৈর্য্যের সাথে ইসলামী আন্দোলন করতে থাকলে আল্লাহ তা'য়ালা সম্পূর্ণ অবস্থা পরিবর্তন করে দেবেন। প্রচার মাধ্যমের অপপ্রচার শুনে যারা তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে ধারণা করতো, তাদের ভুল ধারণা দ্রুত মুছে যাবে এবং তারা আল্লাহর সৈনিকদের প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা পোষণ করবে।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে জনগণের সাহায্য সহানুভূতি লাভ করতে হলে অবশ্যই পূর্ণ ঈমানদার হতে হবে এবং আল্লাহর বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হবে–উল্লেখিত আয়াতের প্রথমেই সে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। অন্তরে কপটতা লালন করে তথা প্রদর্শনীমূলকভাবে, পার্থিব লাভের আশায় ইসলামী আন্দোলনে শামিল হলে আল্লাহর সাহায্য লাভ করা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার মনের সংবাদও রাখেন। তিনি দৃশ্য এবং অদৃশ্য সম্পর্কে পূর্ণ অবগত রয়েছেন। সূরা সাজ্‌দা-এর ৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

ذَالِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ–

তিনিই প্রতিটি অদৃশ্য ও দৃশ্যমানকে জানেন, মহাপরাক্রমশালী ও রাহ্‌মান-করুণাময় তিনি।

রাহ্‌মানের প্রতি ঈমান আনলে সে ঈমান মানুষকে তাঁর জীবনের প্রতিটি বিভাগ থেকে অহংকারের আবর্জনা দূরিভূত করে বিনয় আর নম্রতার আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে। ঈমান এনেছি, এ দাবি করার পরে যদি তার ভেতরে এসব গুণাবলীর সৃষ্টি না হয়, তাহলে তার পক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। বাতিলের মোকাবেলায় উত্তপ্ত ময়দানে টিকে থাকাও সম্ভব হয় না। চরিত্রে বিনয় এবং নম্রতা না থাকলে অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় না। আর নিজের প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করতে না পারলে ইসলামের দাওয়াতও কারো কাছে আকর্ষণীয়ভাবে পৌছানো যায় না।

রাহ্‌মানের দান থেকে কেউ বঞ্চিত থাকে না

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি সৃষ্টি জগতসমূহের রব্ব–তাঁর অসীম দয়া। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতিত সমস্ত সৃষ্টি মুহূর্তকালও নিজের স্থানে অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। মানুষ এই পৃথিবীতে বিচরণ করছে, এ পৃথিবী আপন ইচ্ছায় মানুষের জন্য বিচরণযোগ্য হয়নি। এখানে মানুষ জীবন ধারনের জন্য যে রিয্‌ক লাভ করছে, সে রিয্‌কও স্বতস্ফূর্তভাবে প্রস্তুত হয় না। এসবই ঐ আল্লাহর সৃষ্টি যিনি রাহ্‌মান–তাঁর অসীম অনুগ্রহেই এসব সৃষ্টি হয়েছে।

যিনি তাঁর কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতার ভিত্তিতে এমনভাবে এসব নির্মাণ করেছেন যে, প্রাণীজগৎ এবং মানুষ যেন এখান থেকে রিয্‌ক লাভ করতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় কাল পর্যন্ত তারা জীবিত থাকতে পারে। তিনি অনুগ্রহ করে এই বিশাল ভূ-গোলককে এমন অবিচল শান্ত ও ধীর স্থির করে নির্মাণ করেছেন যে, মানুষ যেন এখানে ভাবনাহীন চিত্তে

বিচরণ করতে পারে। এই পৃথিবীকে তিনি দয়া করে এমন এক নিয়ামতের ভান্ডার হিসাবে গড়েছেন যে, এখানে মানুষের জীবন-যাপনের জন্য সীমা-সংখ্যা-পরিমাণহীন দ্রব্য-সামগ্রী পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। মানুষ যেদিকেই অগ্রসর হয়, সেখানেই তার জন্য খাদ্য আর জীবন ধারনের উপকরণে পরিপূর্ণ দেখতে পায়। আল্লাহ বলেন-

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ-

সেই আল্লাহই তোমাদের জন্য ভূ-তলকে অধীন বানিয়ে রেখেছেন, তোমরা চলাচল করো এর বক্ষের ওপর এবং ভক্ষণ করো আল্লাহর দেয়া রিয্ক। (সূরা মূল্ক-১৫)

এ পৃথিবীতে যা কিছু দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান রয়েছে, এসব কিছুকেই তিনি অনুগ্রহ করে রক্ষা করছেন বলেই বর্তমান প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যেসব দ্রব্য-সামগ্রী প্রয়োজনীয় তা ঐ রাহ্মানই সংগ্রহ করে দেন। তিনি যাকিছু সৃষ্টি করেছেন, এসব সৃষ্টির প্রয়োজন যথাযথভাবে পূর্ণ হচ্ছে কি না তার প্রতি রাহ্মানের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। আকাশ সাম্রাজ্যে মহাশূণ্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখিই উড়ছে, আল্লাহ রাহ্মান-তিনি দয়া না করলে এসব পাখি কখনো শূন্যে উড়তে সক্ষম হতো না। যেসব প্রাণীকে তিনি ওড়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোকে তিনি শূন্যালোকে বাতাসে উড়ে বেড়ানোর উপযোগী দেহ-কাঠামো ও দেহসংস্থা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। পাখি কিভাবে উড়বে, সে নিয়ম-পন্থাও তিনিই শিখিয়েছেন। বাতাসকে তিনি এমন সব নিয়মের অনুসারী করেছেন যে, বাতাসের থেকেও অধিক ওজনের জিনিসের পক্ষে শূন্যে উড়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। উড্ডয়নশীলকে শূণ্যালোকে ধরে রাখার দায়িত্বও সেই রাহ্মান-আল্লাহই পালন করছেন। তিনি যে নিয়মের মাধ্যমে এসব ব্যবস্থা চালু রেখেছেন, এসব নিয়ম যদি তিনি প্রত্যাহার করে নেন, তাহলে কোন কিছুর পক্ষেই আর মহাশূন্যে ওড়া সম্ভব হবে না। কোরআন বলছে-

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ-مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ الرَّحْمٰنُ-اِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ بَصِيْرٌ-

এই লোকেরা কি নিজেদের ওপরে উড়ন্ত পাখিগুলোকে পাখা বিস্তার করতে ও গুটিয়ে নিতে দেখে না ? একমাত্র রাহ্মান-করুণাময় ব্যতিত তাদেরকে অন্য কেউ ধরে রাখে না। তিনিই সমস্ত জিনিসের সংরক্ষক। (সূরা মূল্ক-১৯)

দূর আকাশে মহাশূন্যে বিশালাকারের পাখিগুলো ডানা ঝাপটায়-উড়তে থাকে। হঠাৎ করেই তারা ডানা ঝাপটানো বন্ধ করে সে দুটো দু'দিকে বিস্তার করে দিয়ে শূন্যে ভেসে বেড়াতে থাকে, কখনো বা ডানা দুটো নিজের দেহের সাথে গুটিয়ে নিয়ে শূন্যে অবস্থান করতে থাকে। এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় শুধু রাহ্মানের অসীম অনুগ্রহের কারণেই। তাঁর কত দয়া, তা

ফর্মা-৩৩

কারো পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীগণ বলছেন, প্রতি মুহূর্তে সূর্যে হাজার হাজার বিস্ফোরণ সংঘটিত হচ্ছে। এক একটি বিস্ফোরণ এক মিলিয়ন হাইড্রোজেন বোমার শক্তিতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সূর্যের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সে গ্যাস ধূলিকণায় মিশ্রিত হয়ে সৃষ্টি করছে সৌর বায়ু। এই সৌর বায়ু প্রতি সেকেন্ডে পাঁচ শত মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হতে থাকে। পরম করুণাময় রাহ্‌মান উর্ধ্বজগতে বায়ুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন।

এই বায়ুমন্ডল প্রচন্ড শক্তিতে সূর্য সৃষ্ট সৌর বায়ু বা সৌর ঝড়কে ওপরের দিকেই ফিরে যেতে বাধ্য করছে। সৌর ঝড় যদি পৃথিবীতে আঘাত হানার সুযোগ পেতো, তাহলে গোটা পৃথিবী এর ভেতরের সমস্ত কিছু নিয়ে মুহূর্তে ধ্বংস স্তুপে পরিণত হতো। আল্লাহ রাহ্‌মান-তিনি এ ব্যবস্থা করেছেন বলেই পৃথিবী সচল-সজীব রয়েছে।

মহাশূন্য রয়েছে বিশালাকারের পাথরের সাম্রাজ্য। উত্তপ্ত উল্কা রয়েছে। এ কথা সপ্তম শতাব্দীতেই আল্লাহর কোরআন পৃথিবীবাসীকে অবগত করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান এ তথ্য পৃথিবীর মানুষকে জানিয়েছে মাত্র কিছুদিন পূর্বে। মহাশূণ্য থেকে প্রতিদিন বিশ লক্ষ উল্কা পৃথিবীকে আঘাত হানার জন্য সেকেন্ডে ত্রিশ মাইল বেগে ছুটে আসছে। রাতের নিকষ কালো অন্ধকারে উল্কা পতনের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে। একশ্রেণীর নির্বোধ মানুষ উল্কা পতনের দৃশ্য দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। এই সুন্দরের মাঝেই যে নিহিত রয়েছে মৃত্যুগরল-এ কথা নির্বোধ মানুষগুলো ভুলে যায়।

পৃথিবীতে মারাত্মক বিষধর সর্পগুলোই দেখতে অদ্ভুত সুন্দর হয়। কিন্তু এসব দৃষ্টিনন্দন সর্পগুলোই যদি একবার মাত্র ছোবল হানার সুযোগ পায়, তাহলে বাঁচার কোন আশাই থাকে না। উল্কা বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে-অন্ধকারের বুক চিরে আলোর স্ফুরণ ঘটছে, দৃষ্টি নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে আলোর রেখা তীর্যক গতিতে এদিক-ওদিক ছুটে গিয়ে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের গুহায় হারিয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে সৌন্দর্যের পূজারিরা উল্লসিত হয়ে উঠছে। নির্বোধেরা জানে না, এসব উল্কাকে যদি দয়াময় রাহ্‌মান পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌছতে দিতেন, তাহলে গোটা পৃথিবী মুহূর্তে ধ্বংস স্তুপে পরিণত হতো। আকাশে তিনি সুরক্ষিত ছাদ-বাতাসের অদৃশ্য স্তর নির্মাণ করেছেন। এসব অদৃশ্য প্রতিরোধক শক্তির সাথে সংঘর্ষ ঘটিয়ে মুহূর্তে উল্কাগুলো ভস্মে পরিণত করার ব্যবস্থা করেছেন দয়াময় রাহ্‌মান।

মাথার ওপরে তারাজ্বলা আকাশের সেই অদৃশ্য জগৎ থেকে প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর দিকে অবর্ণনীয় গতিতে মৃত্যু দুতের মতই ছুটে আসছে অসংখ্য ক্ষতিকর আলোক রশ্মি। পরম করুণাময় আল্লাহ যে অদৃশ্য প্রতিরোধক শক্তি মহাশূন্যে সৃষ্টি করেছেন, এসব রশ্মির গতি পথে তারা প্রচন্ড বাধার সৃষ্টি করে। কতকগুলো রশ্মি ফিল্টারে প্রবেশ করে। এভাবে ছেঁকে ক্ষতিকর কণাগুলো ধ্বংস করে কল্যাণকর কণাগুলোকে পৃথিবীতে আসার অনুমোদন দেয়া হয়। করুণার সাগর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন।

উর্ধ্বজগৎ থেকে ক্ষতিকর কণাগুলোর দু'চারটি যদিও বা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে, ঐসব চৌম্বক ক্ষেত্র তখন দয়াময়ের নিদের্শে সক্রিয় হয়ে ওঠে। চৌম্বককে দান করা প্রবল আকর্ষণী

ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেসব ক্ষতিকর কণাগুলোকে টেনে নিয়ে যায় মেরু অঞ্চলের দিকে–যেখানে কোন জীবনের স্পন্দন নেই। রাহ্মান তাঁর সৃষ্টির সুরক্ষার জন্য এসব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন।

রাহ্মান হচ্ছে সমস্ত মানুষ এবং প্রাণী ও যাবতীয় সৃষ্টির জন্য। তাঁর দান থেকে কেউ বঞ্চিত থাকে না। সবার জন্য তাঁর দানের দরোজা উন্মুক্ত-অবারিত। এই পৃথিবীর বুকে সচরাচর যে দৃশ্য মানব সমাজে দেখা যায়, তাহলো মানুষ প্রথমে তাদের নিকটাত্মীয়দের সর্বপ্রথমে প্রাধান্য দান করে। তারপর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দিকে দৃষ্টি দেয়। এরপর পরিচিতজনদের, তারপর নিজের থানা-জেলা এবং সর্বশেষে নিজের মাতৃভূমির লোকদেরকে প্রাধান্য দেয়। সাহায্য করার ক্ষেত্রে ও দান করার ক্ষেত্রে মানুষ এ ধরনের নীতি অনুসরণ করে থাকে। এটা মানুষের সহজাত প্রবণতা। এই প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকা কারো পক্ষে সম্ভব হয় না।

দান ও সাহায্য করার ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহও মানুষকে প্রথমে নিজের আত্মীয়দেরকে প্রাধান্য দান করতে আদেশ দিয়েছেন। দানের ক্ষেত্রে মানুষের আরেকটি দিক লক্ষণীয়–মানুষ কখনো তার শত্রুকে দান করে না। একজন মানুষ যদি আরেকজন মানুষের বিরোধিতা করতে থাকে, তার নিন্দাবাদ করতে থাকে, তার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে থাকে, তার প্রিয়জনদেরকে নির্যাতন করতে থাকে, হত্যা করতে থাকে তাহলে এই ব্যক্তিকে কোনক্রমেই সে কোন ধরনের সাহায্য করবে না।

কিন্তু আল্লাহ হলেন রাহ্মান–তিনি তাঁর শত্রুকেও দান করেন, তাঁর প্রিয়জনদেরকেও দান করেন। নবী-রাসূলদেরকে যারা হত্যা করেছে, তাঁর কিতাবকে যারা অসম্মান অমর্যাদা করেছে এবং এখনো করে, তাঁর দেয়া জীবন বিধানকে যারা মৌলবাদ বলে গালি দেয়, তাঁর দৈনিক ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদেরকে যারা শত্রু মনে করে তাদের ওপরে নির্যাতন চালায়, হত্যা করে, তাঁর অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার করে–তাদেরকেও তিনি দান করেন। বরং আল্লাহভীরু লোকদের তুলনায় এদেরকে বেশী দিয়ে থাকেন। পৃথিবীতে দেখা যায়, যারা ইসলামের বিধান অনুসরণ করে চলে, তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুবই দুর্বল। এরা সুদ খায় না, ঘুষ খায় না, হারাম পথে উপার্জন করে না, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদের পক্ষে দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক।

আর যারা আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করে, নামাজ আদায় করেনা, মুরতাদ, প্রতিটি পদক্ষেপে তারা ইসলামের সাথে শত্রুতা করে, তারা সবদিক দিয়েই শক্তিশালী। গোটা পৃথিবীর বিলাস সামগ্রী তাদের হাতের মুঠোয়। বিশাল বিশাল কলকারখানার মালিক, ব্যাংকের মালিক, শত শত একর ভূমির মালিক তারা। আল্লাহ রাহ্মান–এদেরকেও আল্লাহ দেন–তবে এ দান শুধুমাত্র এই পৃথিবীতেই শেষ। আদালতে আখিরাতে এরা কিছুই পাবে না। আর পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চলার কারণে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে, তারা আদালতে আখিরাতে অফুরন্ত নিয়ামত লাভ করবে।

এই পৃথিবীতে যারা আল্লাহর সাথে বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করে, তারাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, পৃথিবীর সমস্ত নিয়ামত তারাই ভোগ করে। সর্বত্র তারাই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

কিন্তু কেন ? এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এই পৃথিবীর কোন মূল্য নেই। ক্ষুদ্র প্রাণী একটি মশার পাখার যে মূল্য রয়েছে, এই পৃথিবীর সে মূল্য আল্লাহর কাছে নেই। আল্লাহর কাছে এই পৃথিবীর মূল্য যদি একটি মশার ডানার তুল্যও হতো, তাহলে আল্লাহর সাথে যারা বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করে, তাদেরকে তিনি একফোটা পানিও পান করার সুযোগ দিতেন না। আল্লাহর দৃষ্টিতে এ পৃথিবীর কোনই মূল্যই নেই। মশার ডানার যদি কোন মূল্য থেকেই থাকে, সেই মূল্যের সমপরিমাণ মূল্যও এই পৃথিবীর নেই। এ জন্য এই পৃথিবীতে তাঁর অবাধ্য বান্দারা জাগতিক সমস্ত নিয়ামত ভোগ করার সুযোগ লাভ করেছে। রোদ, বৃষ্টি, আলো, পানি, বাতাসের উপকারিতা সবশ্রেণীর মানুষ লাভ করছে।

পৃথিবীতে যেসব বস্তু উৎপন্ন হচ্ছে, তা ভোগ করার সুযোগ আল্লাহ মুমিন ও কাফিরকেও দিয়েছেন। কিন্তু যে মেয়াদকালের জন্য তা দিয়েছেন, মানুষের দৃষ্টিতে এই মেয়াদকাল দীর্ঘ বলে মনে হতে পারে। পঞ্চাশ বছর, একশত বছর, একশত বিশ-ত্রিশ বছর মানুষের কাছে অনেক বেশী বলে প্রতিয়মান হয়। কিন্তু আল্লাহর কোরআন এই সময়কে মাতাউ'ন কালিল-খুবই অল্প সময় বলে উল্লেখ করেছে। এই সময়কাল আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বিদ্রোহী বান্দাদেরকে দিয়ে থাকেন সংশোধন হবার জন্য। যেন কিয়ামতের ময়দানে তারা অভিযোগ করে বলতে না পারে যে, 'আমরা তো পৃথিবীতে কোন সময়ই পাইনি, সময় পেলে অবশ্যই তোমার বিধান অনুসরণ করতাম।' এই পৃথিবীর চাকচিক্য একটি ধোকা মাত্র। এর কোন মূল্য নেই। আল্লাহ বলেন-

وَمَاهٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَهْوٌ وَّلَعِبٌ-وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ-

আর এ পৃথিবীর জীবন একটি খেলা ও মন ভুলানোর সামগ্রী ব্যতিত আর কিছুই নয়। প্রকৃত জীবনের গৃহ হলো পরকালীন গৃহ। (সূরা আল 'আনকাবূত-৬৪)

রাহ্মানের রাহ্মত সৃষ্টিজগৎ ব্যাপী পরিব্যাপ্ত

আল্লাহর কিতাবের প্রথম সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতেই বলা হয়েছে, তিনি রাহ্মান। আরবী ভাষায় রাহ্মান শব্দের ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে। রাহ্মান শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'অন্তর জগতের এমন একটি নমনীয়, কমনীয়, দয়ার্দ্র, করুণা মিশ্রিত উচ্ছসিত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে, যার ফলে রাহ্মান গুণের অধিকারী সত্তার স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহানুভবতা, প্রীতি-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, স্নেহ-ঔদার্য্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।' এ জন্য আল্লাহর রহমতের মধ্যে রয়েছে স্নেহ, প্রীতি-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, করুণা-অনুগ্রহ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করার প্রবণতা, অকৃতজ্ঞকে বার বার সুযোগ দেয়ার প্রবণতা, অপরাধীকে ক্ষমা করার ও সংশোধন হবার সুযোগ দানের প্রবণতা ইত্যাদি মহৎ গুণের সমাহার।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীকে পরিচালিত করছেন তাঁর প্রীতি-ভালোবাসা, করুণা, মায়া-মমতা, দয়া-অনুগ্রহ দিয়ে। তাঁর রহমত সমস্ত সৃষ্টিজগতের ওপরে বৃষ্টিধারার মতই বিরামহীন গতিতে বর্ষিত হচ্ছে। মানুষ যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, সেদিকেই তাঁর

অফুরন্ত রাহ্মত দেখতে পাবে। নিজের দেহসহ প্রতিটি প্রাণী ও সৃষ্টি বস্তুর গঠন প্রণালীর ভেতরেও তাঁরই অসীম রাহ্মত দেখতে পাবে। আল্লাহ্ বলেন–

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ–

আমার রাহ্মত সমস্ত সৃষ্টিকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। (সূরা আল আ'রাফ–১৫৬)

সর্বত্র আল্লাহর রাহ্মত বৃষ্টিধারার মতোই বর্ষিত হচ্ছে–আল্লাহর এ কথার অর্থ এ নয় যে, কোন অপরাধীকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রেও তাঁর রাহ্মত এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে এবং সেই সুযোগে আল্লাহদ্রোহীরা মুক্তি পেয়ে যাবে। একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহর রাহ্মত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষন করে যে, তিনি রাহ্মান-অসীম দয়ালু, তাঁর দয়ার কোন শেষ নেই। সুতরাং মানুষ যতই অপরাধী হোক না কেন, তিনি অপরাধী মানুষকে শাস্তি দান করবেন না। তাঁর ক্রোধকে তাঁরই রাহ্মত এসে আবৃত করে ফেলবে। যারা এ ধারণা পোষন করে, তারা এ কথাটি ভুলে যায় যে, সীমালংঘনকারী-অপরাধীকে শাস্তি দেয়াও তাঁর আরেকটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য, তিনি আহ্কামুল হাকিমিন–মানুষ যেমন আল্লাহর রাহ্মত লাভ করে থাকে, সেই সাথে তারা যদি আল্লাহর রাহ্মাত লাভ করে বেপরোয়া হয়ে ওঠে, স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে, মানুষের ওপরে অন্যায় অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিতে থাকে, তখন অবশ্যই আল্লাহ্ আযাব নাযিল করে থাকেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

رَبُّكُمْ ذُوْرَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ–وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ–

তোমাদের রব্ব ব্যাপক রাহ্মতের মালিক এবং অপরাধী লোকদের প্রতি তাঁর দেয়া আযাব প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। (সূরা আন'আম–১৪৭)

সুতরাং মজলুম জনতার আর্তনাদ যখন আল্লাহর আরশে গিয়ে পৌঁছায়, তখন জালিমের ওপরে অবশ্যই নিষ্ঠুরদন্ড নেমে আসবে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রতিটি জাতির ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, সেসব জাতির ভেতরে যারাই স্বৈরাচারীর নির্মম দন্ড হাতে নিয়ে জগদ্দল পাথরের মতো জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছে, মহান আল্লাহ তাদেরকে ইতিহাসের আস্তাকুড়োয় এমনভাবে নিক্ষেপ করেছেন, তাদের নাম শুনলে একটা অবিমিশ্র ঘৃণায় মানুষের মন বিষিয়ে ওঠে।

মানুষ ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে নিষ্ঠুরতায় মেতে উঠবে, অন্যায়, অবিচার ও অরাজকতায় গোটা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে ফেলবে, এসব থেকে মানবতাকে মুক্ত রাখার জন্য মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে নবীকে কিতাবসহ প্রেরণ করেছেন। তিনি রাহ্মান, তাঁর প্রিয় বান্দারা ভ্রান্তপথে চলতে গিয়ে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে আর তিনি নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন–এ ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি পরম করুণাময়। মানুষের দুরাবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ-সচেতন। এ জন্য তিনি অসীম অনুগ্রহ করে মানুষের ভেতর থেকেই একজন মহান ব্যক্তিকে নবী হিসাবে নির্বাচিত করে তাঁকে কিতাব দান করেছেন। আল্লাহর অন্য কোন রাহ্মতের কথা বাদ দিলেও শুধুমাত্র নবী-রাসূল আর কিতাব দান সম্পর্কিত

রাহ্মাতের শোকর আদায় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পথহারা মানবতাকে পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে নবী-রাসূল আর কিতাব দান করা যে কত বড় রহমত–এ সম্পর্কে আল্লাহ স্বয়ং বলছেন–

اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ-اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا-

এই যে তুমি যা কিছু লাভ করেছো, এসব তোমার রব্ব-এর রাহ্মত, প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাহ্মত তোমার প্রতি অনেক বড়। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮৭)

কোন ফেরেশ্তাকে নবী হিসাবে নির্বাচিত না করে মানুষের মধ্য থেকে নবী-রাসূল নির্বাচিত করাও আল্লাহ তা'য়ালার আরেকটি বিরাট রাহ্মত। মানবীয় গুণাবলীর বাইরের সৃষ্টি হলো ফেরেশ্তাগণ। একজন মানুষের পক্ষে আরেকজন মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যতটা সহজ এবং স্বাভাবিক, মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য শূণ্য একজন ফেরেশতার পক্ষে তা সহজ ও স্বাভাবিক নয়। মানুষের আহার, নিদ্রা, মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন রয়েছে। রিযিক লাভের জন্য তাকে কর্ম করতে হয়, সংসার ধর্ম পালন করতে হয়।

কিন্তু ফেরেশ্তার এসব কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। ফেরেশ্তা নবী হলে মানুষের এসব কর্মের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। ফলে ফেরেশ্তা নবীর আহ্বানে সাড়া দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ফেরেশ্তা নবীর সাথে তাঁর অনুসারী মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে যেতো, নবী ও অনুসারীর মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হতো। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের আবেগ-উচ্ছাস ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রেখে মানুষের মধ্য থেকেই একজন মহৎ প্রাণ-অতিমানবকে নবী হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। তিনি রাহ্মান–এটা তাঁর অসীম দয়ার প্রকাশ।

মহান আল্লাহ অসীম রাহ্মাতের অধিকারী। যারা তাঁর ওপরে ঈমান আনবে এবং তাঁর নবীর ওপরে ঈমান আনবে, আল্লাহর বিধান এ পৃথিবীতে অনুসরণ করবে, তাদেরকে তিনি এ পৃথিবীতেও 'নূর' দান করবেন এবং কিয়ামতের ময়দানেও 'নূর' দান করবেন। তাদের প্রতি তিনি তাঁর রাহ্মতকে দ্বিগুণ করে দিবেন। সূরা হাদীদের ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهِ وَيَغْفِرْلَكُمْ-

আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর রাহ্মতের দ্বিগুণ অংশ দান করবেন এবং তোমাদেরকে সেই নূর দান করবেন যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।

পৃথিবীতে ঈমানদারও আল্লাহর রাহ্মত লাভ করে এবং আল্লাহ বিরোধী লোকও তাঁর রাহ্মত লাভ করে। কিন্তু ঈমানদারদের ওপরে আল্লাহ আরেকটি বিশেষ রাহ্মত করে থাকেন। তাহলো তাদেরকে তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। কোরআনে সূরা হাদীদে এই অন্তর্দৃষ্টিকে 'নূর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঈমানদারগণ এই নূর দিয়েই পৃথিবীর জাহিলিয়াতকে চিনতে

পারে। ইজ্‌মা-কিয়াস যা হয়ে থাকে, তার ভিত্তিও হলো আল্লাহর দান করা সেই নূর। পৃথিবীতে নিত্য-নতুন বস্তু আবিষ্কার হচ্ছে, নানা ধরনের পথ ও মতের প্রচলন ঘটছে। আল্লাহর বিধানের সাথে এসবের সাংঘর্ষিক দিকগুলো ঈমানদারগণ কোরআনের জ্ঞান দিয়ে অতি সহজেই নির্ণয় করতে সক্ষম হন। আবার কিয়ামতের ময়দানেও তাদেরকে নূর দান করা হবে। অন্ধকার বিপদ শঙ্কুল পথ অতিক্রম করে তারা আল্লাহর জান্নাতে পৌছে যাবেন। আল্লাহ রাহ্‌মান-তিনি ঈমানদারকে এই পৃথিবীতেও নূর দান করবেন এবং কিয়ামতের ময়দানেও নূর দান করবেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাদের পাপসমূহও ক্ষমা করে দিবেন। ঈমান আনার পূর্বে তারা যেসব পাপ করেছিল এবং ঈমান আনার পরে ভুলে বা অসতর্কতার দরুণ তাদের দ্বারা যেসব পাপ সংঘটিত হয়েছে, সেসব পাপ তিনি ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ সম্পর্কে বর্ণনা করা কোন মানুষের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাঁর অনুগ্রহের বিশালতা সম্পর্কে শত-সহস্র কোটি কলম যদি কিয়ামত পর্যন্ত লিখতে থাকে, তবুও তাঁর করুণার কণামাত্র লিখে শেষ করতে সক্ষম হবে না। পৃথিবীতে কেউ কি এমন আছে যে, তার কাছে কেউ গুরুতর অপরাধ করে ফেললো। সেই তিনিই আবার অপরাধীকে ডাক দিয়ে বললেন, 'তুমি এই ভাষায় আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি ক্ষমা করে দেবো।' এমন দয়াবানের সাথে মানবতার সাক্ষাৎ কখনো ঘটেনি। কিন্তু অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের সাথে ঠিক এমনি আচরণ সেই সৃষ্টির শুরুতেই করেছেন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের দ্বারায় অপরাধ সংঘটিত হলো। তিনি অনুতপ্ত হলেন। আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, এই ভাষায় আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি ক্ষমা করে দেবো। আল্লাহর কিতাবে সূরা বাকারার ৩৭ নং আয়াতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ-اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

তখন আদম তার রব্ব-এর কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তওবা করলো তার রব্ব তার এই তওবা মঞ্জুর করলেন। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।'

অপরাধের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে তিনি অবশ্যই তওবা মঞ্জুর করবেন। কোন কারণে তিনি তওবা মঞ্জুর করবেন-অনুতপ্ত অপরাধীকে ক্ষমা করে দিবেন-এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং অনুগ্রহকারী। পৃথিবীর একশ্রেণীর মানুষ 'পাপ করলে শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে' এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে। মানুষ এই পৃথিবীতে মনগড়া যত কথা আবিষ্কার করেছে, উল্লেখিত কথাটিও তার মধ্যে অন্যমত।

হতাশাবাদের অনুসারীবৃন্দ কর্তৃক এই কথাটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কথাটি মানুষকে অপরাধ সংঘটিত হবার পরে অনুতপ্ত হয়ে পাপপথ থেকে বিরত হবার পরিবর্তে পাপের গহ্বরের দিকেই নিক্ষেপ করে। কারণ তার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল থাকে যে, 'পাপ থেকে আমি যতই তওবা করি না কেন, পাপের শাস্তি আমাকে লাভ করতেই হবে।' এই মারাত্মক ধারণা মানুষকে আল্লাহ বিরোধী পথ থেকে ফিরে আসতে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে।

পক্ষান্তরে আল্লাহর কিতাব বলছে, মানুষ ভালো কাজ করলে উত্তম বিনিময় দান যেমন আল্লাহর ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে, তেমিন মানুষ অপরাধ সংঘটিত করলে তার শাস্তি দেয়াও আল্লাহর ইচ্ছার ওপরে নির্ভরশীল। মানুষ কল্যাণমূলক কর্ম করে তা থেকে শুভ পরিণতি লাভ করলো এটা সেই কল্যাণমূলক কর্মের স্বাভাবিক ফল নয়—এটা মহান আল্লাহর রাহমত বিশেষ। আবার মানুষ তার অপরাধের কারণে কোন খারাপ পরিণতির মুখোমুখী হলো, এটাও খারাপ কাজের স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি নয়, প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারেও ক্ষমা করা অথবা শাস্তি দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা মহান আল্লাহরই ইখতিয়ারে। তবে এ ব্যাপারে একটি কথা অত্যন্ত ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও রাহ্মত তাঁর একটি বিশেষ নীতির ওপরে ভিত্তিশীল।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অসীম ক্ষমতা যথেচ্ছা ও নির্বিচারে ব্যবহার করেন না। তিনি তাঁর কোন বান্দার উত্তম কাজের বিনিময় যখন দান করেন, তখন তিনি প্রত্যক্ষ করেন—তাঁর বান্দাহ একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে উত্তম কাজ সম্পাদন করেছেন। তিনি কোন বান্দার উত্তম কাজ নামঞ্জুর করলেও তা এ কারণে করে থাকেন যে, বাহ্যিক দিক দিয়ে তা উত্তম কর্ম হলেও সে কাজ একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করা হয়নি।

কোন বান্দাহ্ অপরাধ করলেই তিনি তাকে সাথে সাথে শস্তি দেন না। তিনি দেখেন, বান্দাহ বিদ্রোহাত্মক মন-মানসিকতা নিয়ে অপরাধ সংঘটিত করেছে কিনা। অপরাধ করার পরে বান্দার মনে অনুশোচনা এসেছে কিনা। বান্দাহ অপরাধ করে আপন কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়েছে, অনুতপ্ত হয়েছে, অনুশোচনা করছে, বার বার তওবা করছে, দৃঢ় সঙ্কল্প করছে—ভবিষ্যতে সে আর এমন অপরাধ করবে না, এভাবে আত্মসংশোধনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, তখন সে তো শাস্তিলাভের যোগ্যই থাকে না—বরং ক্ষমার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। এরপরেও যারা সজ্ঞানে আল্লাহ বিরোধী ভূমিকা পালন করেছে, তারাও যদি প্রকৃত অর্থে তওবা করে আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে, আল্লাহ অত্যন্ত খুশী হন, তিনি অনুগ্রহ করে তাকেও ক্ষমাপ্রাপ্ত দলে শামিল করে নেন।

মহান আল্লাহ সীমায়িত, সঙ্কীর্ণমনা, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও সঙ্কীর্ণ হস্ত নন, আল্লাহর সাম্রাজ্য অত্যন্ত বিশাল এবং তাঁর দৃষ্টিকোণ ও রাহ্মত—অনুগ্রহ বিতরণের ক্ষেত্রও অত্যন্ত প্রশস্ত। তাঁর কোন বান্দাহ পৃথিবীর কোন কোণে বসে কি উদ্দেশ্যে তাঁকে ডাকছে, সেটাও তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি রাহ্মান, পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি যার যার ভাষায় একযোগে তাঁকে ডাকে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তিনি সবার প্রার্থনা শোনেন। তিনি তাঁর বিশেষ রাহ্মত দানের জন্য কাকে নির্বাচিত করবেন, সেটা তাঁরই এখ্তিয়ারে। আল্লাহ্ বলেন—

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ-وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ-

তিনি নিজের রাহ্মত-অনুগ্রহের জন্য যাকে খুশী নির্বাচিত করে নেন, আর তাঁর অনুগ্রহও অনেক বেশী এবং বিরাট। (সূরা আলে ইমরাণ-৭৪)

তিনি অসীম রাহ্মতের অধিকারী। তাঁর রাহ্মত ব্যতিত কারো তক্দির পরিবর্তন হয় না। তিনি যদি কাউকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে চান তাহলে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। কোন ব্যক্তি, দল বা জাতি যখন আল্লাহর বিধানের মোকাবিলায় বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করে, আল্লাহ তাদেরকে বার বার সতর্ক করতে থাকেন। সতর্ক না হলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ওপরে আযাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জালিম দলকে লাঞ্ছিত করে ক্ষমতা থেকে বিদায় করে দেন, বিদ্রোহী জাতির ওপরে ভিন্ন জাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে তাদেরকে গোলামীর জীবন বরণ করতে বাধ্য করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। আর সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা ময়দানে জান-মাল দিয়ে আন্দোলন করে, শয়তানের অনুসারীরা তাদের ক্ষতি করার জন্য নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করতে থাকে। আর আল্লাহ যদি সত্যপন্থীদের কল্যাণ করতে চান, তাহলে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র পানির বুদ্বুদের মতই শূন্যে মিলিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন–

قُلْ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا اَوْاَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً-

তাদেরকে বলো, কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে আল্লাহর হাত থেকে যদি তিনি তোমাদের ক্ষতি করতে চান ? আর কে তাঁর রাহ্মতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে যদি তিনি চান তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করতে ? (সূরা আল আহ্যাব–১৭)

সূরা যুমারে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রাহ্মাতের অধিকারী মনে করে তার দাসত্ব করতে থাকে, আল্লাহর আযাবকে প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। আর আল্লাহ যদি কারো ওপরে রহম করতে চান, তাঁর রাহ্মতকেও তারা প্রতিরোধ করতে পারে না। সুতরাং তিনিই রাহ্মাতের অধিকারী–তাঁর কর্তৃত্বের মূলধারাই হলো করুণা। তাঁর করুণা থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। যারা তাঁর করুণা সম্পর্কে হতাশ হয়, তারা মুমিন নয়। সূরা ইউসুফের ৮ ও ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَلاَ تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ-اِنَّهُ لاَيَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ-

আল্লাহর রাহ্মত থেকে নিরাশ হয়ো না, তাঁর রাহ্মত থেকে নিরাশ হয় তো শুধু কাফিররাই।

যারা সত্য পথের পথিক নয়–পথভ্রষ্ট, মহাসত্য চিনতে যারা অক্ষম তারাই কেবল হতাশায় ভুগতে থাকে। আল্লাহর কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ اِلاَّ الضَّالُّوْنَ-

পথভ্রষ্ট লোকেরাই তো তাদের রব্ব-এর রাহ্মত থেকে নিরাশ হয়। (সূরা আল হিজ্‌র-৫৬)

যে আল্লাহ না চাইতেই বান্দার প্রতি রাহ্‌মত নাযিল করেন, তাঁর রাহ্‌মত থেকে নিরাশ হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর মোকাবেলায় ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা। বান্দাহ কেন তাঁর রাহ্‌মতের ব্যাপারে হতাশ হবে ? কারণ সে তো দেখছে, সৃষ্টির সমস্ত কিছুই আল্লাহর নির্দেশে তার খেদমতের জন্য নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে। এসব কিছু দেখে ও উপলব্ধি করে কেউ যদি আল্লাহর রাহ্‌মত থেকে নিরাশ হয় তাহলে তা হবে অকৃতজ্ঞতা। রাত এবং দিনের আবর্তনের মধ্যে মানুষ দেখতে পায়, তা কিভাবে তার জন্য রাহ্‌মত হিসাবে এসেছে। আল্লাহ্ বলেন–

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًاوَّ النَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا–

আর তিনিই রাতকে তোমাদের জন্য পোশাক, ঘুমকে মৃত্যুর শান্তি এবং দিনকে জীবন্ত হয়ে ওঠার সময়ে পরিণত করেছেন। (সূরা আল ফুরকান–৪৭)

পোশাক যেমন মানুষকে লজ্জা থেকে আবৃত করে, মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তেমনি রাত মানুষকে ঢেকে নেয়, বিরক্তিকর কোলাহল থেকে মানুষকে নির্জনতা দেয়। পার্থিব দৃষ্টিতে মৃত্যু যেমন মানুষকে যাবতীয় দুঃখ-বেদনার অনেক উর্ধ্বে নিয়ে যায়, তেমনি ঘুমও মানুষকে যাবতীয় দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখে, ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহকে পুনরায় কর্মক্ষম করে দেয়। এগুলোই আল্লাহর রাহ্‌মত, যিনি মানুষের জন্য এসবের ব্যবস্থা করেছেন, তিনিই রাহ্‌মান। তাপ ব্যতিত পৃথিবীতে কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না। যাবতীয় উদ্ভিদ উৎপন্ন হতে হলে তাপ, আলো ও বাতাসের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তা'য়ালা প্রয়োজনীয় এবং পরিমিতভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে যে তাপ সূর্যের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর জন্য দান করছেন, সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে তাদের বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রয়োগ করেও এর শতভাগের একভাগও সৃষ্টি করতে পারবে না।

তিনি রাহ্‌মান–তাঁর বান্দাদের জন্য প্রয়োজনীয় শীতলতা দান করছেন, বাতাস দান করছেন। মানুষ সীমিত পরিসরে কৃত্রিম শীতলতা সৃষ্টি করে গরমের অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকার প্রয়াস পায়। কিন্তু আল্লাহ যে বাতাসকে রাহ্‌মত হিসাবে দান করেছেন, তার মোকাবেলায় মানুষ কর্তৃক আবিষ্কৃত যান্ত্রিক শীতলতার কোনই মূল্য নেই। সূর্যের প্রখর খর-তাপে গোটা পৃথিবীর পরিবেশ যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, পৃথিবীর সমস্ত এয়ার কন্ডিশনগুলো একসাথে চালনা করলেও তখন পৃথিবীর শতভাগের একভাগও ঠান্ডা হবে না। আর আল্লাহ এক পশলা বৃষ্টির মাধ্যমেই উত্তপ্ত পরিবেশকে আরামদায়ক পরিবেশে রূপান্তরিত করে দেন। আল্লাহ বলেন–

وَهُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ–وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا–

আর তিনিই নিজের রাহ্‌মতের পূর্বে বাতাসকে সুসংবাদদাতারূপে প্রেরণ করেন। তারপর আকাশ থেকে বর্ষণ করেন বিশুদ্ধ পানি। (সূরা আল ফুরকান–৪৮)

বৃষ্টিধারাকে আল্লাহ তা'য়ালা রাহ্মত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি উর্ধ্বজগৎ থেকে যে পানি বর্ষণ করে থাকেন, তা অত্যন্ত বিশুদ্ধ পানি। এই পানি এমন যে, এর মধ্যে কোন ধরনের পঙ্কিলতা নেই, কোন ধরনের বিষাক্ত পদার্থ ও জীবানুও নেই। বৃষ্টির এই পানিকে আল্লাহ তা'য়ালা 'ত্বাহুরা' বলে উল্লেখ করেছেন। ত্বাহুরা এমন জিনিসকে বলা হয়, যা নিজে স্বয়ং পবিত্র এবং অন্যকেও পবিত্র করার ক্ষমতা রাখে। তেল, দুধ, মধু, শিরকা, যে কোন ফলের রস নিজে পবিত্র। কিন্তু এগুলো অন্য জিনিসকে পবিত্র করতে পারে না। এগুলো ব্যবহার করে অপবিত্রতা দূর করা যায় না। এগুলো দিয়ে অজু হবে না।

আর পানি দিয়ে অপবিত্রতা দূর করা যাবে, অজু করা যাবে, গোসল করা যাবে, যে কোন জিনিস ধুয়ে পরিষ্কার করা যাবে। এ জন্য বৃষ্টির পানি হলো, যে কোন ধরনের কলুষতা মুক্ত পানি। এই পানির ব্যবস্থা যিনি করেন, তিনিই রাহ্মান–তাকে চিনতে হবে এবং তাঁরই দাসত্ব করতে হবে। আল্লাহ বলেন–

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ-

আর কে তিনি–যিনি জল-স্থলের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেন এবং কে নিজের অনুগ্রহ প্রেরণের পূর্বে বাতাসকে সুসংবাদদাতারূপে প্রেরণ করেন? (সূরা আন নাম্ল-৬৩)

তিনিই রাহ্মান–মানুষ যেন রাতের অন্ধকারে পথ হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এ জন্য চাঁদে স্নিগ্ধ আলো দান করেছেন। নাবিক যেন মহাসমুদ্রে পথ হারিয়ে না ফেলে এ জন্য তিনি দিক নির্ণয়ের জন্য আকাশে তারকা দান করেছেন। তারকার সাহায্যে এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষ রাতের নিকষ কালো অন্ধকারেও নিজেদের পথের সন্ধান করতে সক্ষম হয়। মানুষ জলে-স্থলে ভ্রমণ করে, সেখানে তাকে পথপ্রদর্শন করার জন্য করুণাময় আল্লাহ এমন সব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যার সাহায্যে সে নিজের গন্তব্য স্থলের দিকে চলার পথ নির্ধারণ করে নিতে পারে। দিনে ভূ-প্রকৃতির বিভিন্ন চিহ্ন এবং সূর্যের উদয় ও অস্তের দিক তাকে পথ চিনতে সাহায্য করে এবং রাতের অন্ধকারে আকাশের তারকারা পথ দেখায়।

পাহাড়ে পথ চলতে গিয়ে মানুষ পথ হারিয়ে খানা-খন্দে পড়ে প্রাণ হারাতে পারে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। এ জন্য দয়াময় আল্লাহ পাহাড়ের ভেতরে পথ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে, এদের রিযিকের ব্যবস্থাও তিনি করেন। সূরা হুদ-এর ৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا-

যমীনে বিচরণশীল কোন জীব এমন নেই, যার রিযিক দানের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত নয়।

মহান আল্লাহ হলেন রাহ্মান–তাঁর জ্ঞান-সীমা ও অবহিতির ব্যাপকতা ও গভীরতা এতটা সীমাহীন যে, পৃথিবীর কোন কোণে ক্ষুদ্র একটি ঝোপের ভেতরে অথবা মাটির গর্তে, সমুদ্রের

অতল তলদেশে পাথরে নিচে শৈবাল দামের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি কীট–যা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিত দেখা যায় না, এদের যখন যে প্রয়োজন হয়, তিনি তা পূরণ করে থাকেন। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। সবাইকে তিনি নিজ নিজ অবস্থানেই জীবন জীবিকা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছেন। আল্লাহ্ বলেন–

وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ–

আর কে তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে ? (সূরা আন নাম্‌ল-৬৪)

মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে অতিবাহিত হয় আল্লাহর রাহ্‌মত পরিবেষ্টিত অবস্থায়। কিন্তু সে ভুলে যায় ঐ দয়াময় আল্লাহকে। তাঁর দাসত্ব করতে হবে, একমাত্র তাঁরই প্রশংসা করতে হবে, এ কথা সে ভুলে যায়। এ ধরনের লোকদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ বলেন–

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ–قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ–

আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত পতিত ভূমিকে সঞ্জীবিত করেছেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। (সূরা আনকাবূত-৬৩)

এই মানুষ যখন সমুদ্র পথে চলতে থাকে, তখন সমুদ্রের ভয়াল রূপ দেখে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। সাগরের উত্তাল ঊর্মিমালা–পর্বত সমান তরঙ্গ জলযানের গায়ে আঘাত করে, মানুষ তখন ভয়ে আতঙ্কে একমাত্র আল্লাহর নাম ব্যতিত নিজের অস্তিত্বের কথাও ভুলে যায়। নিজের সমস্ত সত্তাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করতে থাকে। অভিজ্ঞতায় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ব্যক্তিও বিপদের সেই চরম মুহূর্তে 'আল্লাহ আল্লাহ' নামের যিকির করতে থাকে। যখনই জলযান বিপদ মুক্ত হয়ে যথাস্থানে পৌঁছে যায়, তখনই এই মানুষ আল্লাহর বিধানের মোকাবিলায় বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করে। জলযানের চালকের প্রশংসা করে বলে, 'চালকের দক্ষতার কারণেই প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।' মানুষের এই অকৃতজ্ঞ অবস্থার বিষয়টি কোরআন এভাবে বর্ণনা করছে–

فَاذَا رَكِبُوا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ–فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ–

যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে তখন নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে ভিড়িয়ে দেন তখন হঠাৎ করেই তারা শিরক করতে থাকে। (সূরা আনকাবূত-৬৫)

শিরক করতে থাকে–এ কথার অর্থ হলো, বিপদ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষগুলো আল্লাহর গোলামী

না করে অন্যের গোলামী করতে থাকে। ভয়াবহ্ বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করে তারা আল্লাহর শোকর আদায় না করে জলযান পরিচালকের প্রশংসা করে। মাজারে গিয়ে মৃত ব্যক্তির কাছে শোকর আদায় করে। এসব করা সম্পূর্ণ শিরক, আর যারা শিরক করবে তাদের জন্য আল্লাহর জান্নাত হারাম।

মানুষ ক্ষেতে চাষ করে ফসল লাভের আশায় বীজ বপন করে বাড়িতে চলে আসে। কৃষক ক্ষেতে বীজ বপন করে তারপর তার পক্ষে আর মূল বিষয়ে করণীয় কিছুই থাকে না। যে ভূমিতে সে বীজ বপন করলো, এই ভূমি তার সৃষ্টি নয়। ভূমিতে উর্বরা শক্তি ও ফসল উৎপাদনের যোগ্যতা কোন মানুষ দান করেনি। বর্তমান বিজ্ঞানীগণ বলছেন, যে ঋতুতে বজ্রপাত অধিকহারে সংঘটিত হয়, সে ঋতুতে ফসলের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। কারণ বজ্রপাতের মাধ্যমে ভূমিতে যে নাইট্রোজেন চক্র ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, এতে করে ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি লাভ করে। এই নাইট্রোজেনই গাছের প্রাণশক্তি। যেসব মৌল উপাদান খাদ্য সামগ্রীতে সংগৃহীত হয়, সেটা মানুষের চেষ্টার ফসল নয়।

জমিতে যে বীজ মানুষ বপন করে, তাকে বিকশিত করা ও প্রবৃদ্ধি লাভের যোগ্যতাও মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। এই চাষাবাদ ও বীজ বপনকে সবুজ আভায় হিল্লোলিত চারাগাছে পরিপূর্ণ ক্ষেতে পরিণত করার জন্য ভূমির মধ্যে যে কার্যক্রম এবং মাটির ওপরে যে আলো, বাতাস, তাপ, শীতলতা ও মৌসুমী অবস্থার আবর্তন হওয়া প্রয়োজন, তার ভেতরে একটি জিনিসও মানুষের সৃষ্টি নয়। ফসলের ভেতরে দানা সৃষ্টির ব্যাপারেও মানুষের কোন ভূমিকা নেই। এগুলো সবই ঐ দয়াময় রাহ্মান-আল্লাহই অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদের জন্য করে থাকেন। তিনি বলেন-

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ - ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ - لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ -

তোমরা কি কখনো চিন্তা-বিবেচনা করে দেখেছো, তোমরা যে বীজ বপন করো, তা থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন করো না আমি করি ? আমি ইচ্ছা করলে এই ফসলকে দানাবিহীন ভূষি বানিয়ে দিতে পারতাম। (সূরা আল ওয়াকী'আ-৬৩-৬৫)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আমার নাম রাহ্মান। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পর্কে তোমরা একটু ভেবে দেখো। আমি তোমাদের জন্য পানির ব্যবস্থা কিভাবে করেছি। এই পানি তোমাদের জীবন, তোমাদের জীবন ধারণের জন্য অন্যান্য বস্তুর থেকে পানির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এই পানির স্রষ্টা তোমরা নও-আমিই দয়া করে তোমাদের জন্য সে পানি পরিবেশন করেছি। পৃথিবীর বুকে এই নদী-সমুদ্র, খাল-বিল-হাওড়, বিশালাকারের জলাধার আমিই সৃষ্টি করেছি। আমি সূর্য সৃষ্টি করে তার ভেতরে তাপ দান করেছি। এমন পরিমাণে তাপ দান করেছি যেন সে তাপে পানি শোষিত হয়ে বাষ্পাকারে মহাশূন্যের দিকে উত্থিত হয়। পানির ভেতরে এই গুণ-বৈশিষ্ট্য আমিই দান করেছি যে, একটি বিশেষ মাত্রার তাপ লাভ করলেই পানি বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। আমি বাতাস সৃষ্টি করেছি। আমার আদেশে বাতাস সেই

বাষ্প কণাগুলো ওপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে জমা করতে থাকে। তারপর আমার আদেশে তা মেঘমালায় পরিণত হয়। আমার আদেশে সেই মেঘ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যে স্থানের জন্য যতটুকু পানির অংশ ও পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়, সেখানে ততটুকু পৌঁছে দেয়া হয়। উর্ধ্বজগতে আমি এমন এক শীতলতা সৃষ্টি করেছি যার ফলে পৃথিবী থেকে উত্থিত বাষ্প পুনরায় সেখানে পানিতে রূপান্তরিত হয়। তারপর আমারই আদেশে তা পৃথিবীতে বর্ষিত হয়।

পানির ভেতরে মহান আল্লাহ যে বিশেষত্ব দান করেছেন, তা দেখলে সিজ্‌দায় মাথানত হয়ে আসে। সমুদ্রের পানি একদিকে লবণাক্ত, তারপরে এই মানুষ পানিতে কতকিছুর মিশ্রণ ঘটাচ্ছে। কলকারখানার নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ এই পানির সাথে মিলেমিশে একাকার হচ্ছে। মলমূত্র, বিষাক্ত দ্রব্য ও অজস্র মৃতদেহ এই পানিতে মিশে যাচ্ছে। পানির নিচে নানা ধরনের অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে। এভাবে পানি মারাত্মক আকারে দূষিত হয়ে পড়ছে। এই পানি পান করলে মানুষের পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা সূর্য থেকে তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তাপের মাধ্যমে পানি শোষিত হয়ে বাষ্পাকারে ওপরের দিকে উত্থিত হচ্ছে। মহাশূন্যে আল্লাহ এমন এক অদৃশ্য শক্তিশালী ছাকনি (Filter) নির্মাণ করেছেন যে, পানিতে যত জিনিস মিশ্রিত হয়েছে, তাপের দরুন পানি যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখন সব ধরনের মিশ্রিত জিনিস নিচে পড়ে থাকে এবং শুধুমাত্র পানির জলীয় অংশসমূহ ওপরের দিকে উঠে গিয়ে জমা হতে থাকে।

আল্লাহ রাহ্‌মান, তিনি দয়া করে এ ব্যবস্থা না করলে পানি যখন ওপরের দিকে উত্থিত হতো, তখন সেই পানির মিশ্রিত যাবতীয় বস্তুও উঠে যেতো। এ অবস্থায় পানি হতো দুর্গন্ধময় পানের অযোগ্য। সমুদ্র থেকে যে বাষ্প ওপরের দিকে উঠে যায়, তা লবণাক্ত বৃষ্টির আকারে নেমে এসে পৃথিবীর সমস্ত ভূমিকে লবণাক্ত করে দিতো। ফলে পৃথিবীর ভূমিতে কোন ফসল হওয়া তো দূরের ব্যাপার, ক্ষুদ্র একটি উদ্ভিদও জন্ম নিত না। মানুষ ও মিষ্টি পানির জীবজগৎ এ পানি পানও করতে সক্ষম হতো না।

পানি থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ আর দ্রবণীয়-অদ্রবণীয় বর্জ্য পদার্থ এবং লবণ নিষ্কাশনের এই ব্যবস্থা যিনি করেছেন, তিনিই রাহ্‌মান–অসীম দয়ালু আল্লাহ। যিনি পানির এই বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন তিনি সমস্ত দিক বিবেচনা করে তার অসীম জ্ঞানের মাধ্যমে আপন রাহ্‌মতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই উদ্দেশ্যে করেছেন যে, তার তাঁর প্রিয় সৃষ্টিসমূহের জীবন ও প্রতিপালনের মাধ্যম ও উপায় হয়ে দাঁড়াবে। যেসব সৃষ্টি লবণাক্ত পানিতে জীবিত থাকতে ও লাতিত-পালিত হতে পারে, তিনি সেসব সৃষ্টিকে সমুদ্রে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানেই তারা অত্যন্ত আরামদায়ক অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছে। কিন্তু স্থলভাগ ও বায়ুমন্ডলে বসবাসের জন্য সৃষ্টি জীবের জীবন ও লালন-পালনের জন্য মিষ্টি পানি ছিল অপরিহার্য। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য বৃষ্টির ব্যবস্থা কার্যকর করার পূর্বেই তিনি পানির ভেতরে এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন যে, পানি তাপের প্রভাবে বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় এতে সংমিশ্রিত কোন জিনিসসহ উত্থিত হবে না বরং তা সম্পূর্ণ গন্ধ ও দূষিত বস্তু পরিশোধিত হয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পান ও জীবন ধারনের উপযোগী অবস্থায় উত্থিত হবে। তিনি রাহ্‌মান–তাঁর রাহ্‌মত সৃষ্টিজগৎ ব্যাপী পরিব্যাপ্ত।

আল্লাহর রাহ্মত লাভের আবশ্যক শর্তাবলী

মহান আল্লাহ্ অসীম দাতা এবং দয়ালু, তাঁর রাহ্মত গোটা সৃষ্টিজগৎ ব্যাপী পরিব্যাপ্ত। মানুষ ও প্রাণী জগতসহ অন্যান্য সৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর রাহ্মত লাভ করছে। এই রাহ্মত লাভ করার ব্যাপারে মানুষকে কোন ধরনের শর্ত পালন করতে হয় না। বৃষ্টির পানি, আলো, বাতাস, তাপ, অক্সিজেন এবং জীবন ধারনের জন্য অন্যান্য অগণিত অজস্র রাহ্মত লাভ করার পেছনে মানুষের কোন চেষ্টা-সাধনা নেই, এসব রাহ্মত পৃথিবীতে আসার পূর্বে একান্তই মানুষের প্রয়োজন হবে, এ কথা পূর্ব থেকেই জেনে সে এগুলো পৃথিবীতে মওজুদ করে রাখার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আবেদন করেনি। তিনি রাহ্মান-চাওয়ার ও প্রয়োজনের পূর্বেই তিনি এগুলো মওজুদ করেছেন।

পক্ষান্তরে মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সফলতা অর্জনের জন্য যে রাহ্মতের প্রয়োজন, সে রাহ্মত তিনি এমনতিই দেন না। এটা লাভের জন্য যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন, যেসব শর্তাবলী পূরণ করা প্রয়োজন, তা না করে শুধু মুখে মুখে চাইলেও সে রাহ্মত পাওয়া যায় না।

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি মাছির ডানার যে মূল্য রয়েছে-আল্লাহর কাছে এই পৃথিবীর সে মূল্যও নেই। এ জন্য মহান আল্লাহ তাঁর রাহ্মতকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ দান করেছেন সমস্ত সৃষ্টিকে। মানুষের মধ্যে যারা তাঁর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তারা তাঁর সে রাহ্মত লাভ করে থাকে এবং যারা তাঁর বিধানের মোকাবেলায় বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করছে, তারাও লাভ করে থাকে। এই শ্রেণীর লোকদের প্রতি তাঁর রাহ্মতের ধারাবাহিকতা তাদের জীবন কালেই শেষ হয়ে থাকে।

আর যারা আল্লাহভীরু, তাদের ওপরে তাঁর রাহ্মাতের ধারাবাহিকতা কখনো শেষ হয় না। এ ক্ষেত্রে আল্লাহভীরু লোকদেরই লাভ বেশী। পৃথিবীতে সর্বসাধারণের জন্য আল্লাহ যে রাহ্মত বর্ষণ করেন, তারা এসবেরও অংশ লাভ করে থাকে এবং মৃত্যুর পর থেকেও তারা আল্লাহর বিশেষ রাহ্মত অনন্তকালের জন্য লাভ করতে থাকে। আল্লাহর এই বিশেষ রাহ্মত লাভের অধিকারী কোন শ্রেণীর মানুষ হবে, এ সম্পর্কে সূরা আ'রাফের ৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ-

নিশ্চয়ই আল্লাহর রাহ্মত মুহ্ছিনীন-সচ্চরিত্রবান লোকদের অতি কাছে।

যারা মহান আল্লাহর মুহ্ছিন বান্দা, তাদের জন্য তিনি আখিরাতের ময়দানে সর্বোত্তম প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। পবিত্র কোরআন এই মুহ্ছিন বান্দাদের লক্ষ্য করে সূরা আহ্যাবের ২৯ আয়াতে ঘোষণা করেছে-

فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا-

তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ্ মহাপ্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ রাহ্মত লাভ করতে হলে অবশ্যই তাঁকে মুহ্ছিন বান্দা

হতে হবে। মুহ্ছিন বান্দা কারা, তাদের পরিচয় স্বয়ং আল্লাহই এভাবে দিয়েছেন-

وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ-اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ-اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا-جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

(এই কিতাব) সৎ আচরণ গ্রহণকারীদের জন্য সুসংবাদ দান করে। যারা ঘোষণা করেছে আল্লাহই আমাদের রব্ব-এরপর তার ওপরে স্থির থেকে নিশ্চয়ই তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে না। এ ধরনের সব মানুষ জান্নাতে যাবে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। তাদের সেই কাজের বিনিময়ে যা তারা পৃথিবীতে করেছিলো। (সূরা আল আহ্কাফ-১২-১৪)

মুহ্ছিন কোন ধরনের লোকদেরকে বলা হয়, তাদের পরিচয় আল্লাহ দিলেন। এরা একমাত্র আল্লাহকে রব্ব-হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার পর আমৃত্যু সে কথা ও কাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। রব্ব কাকে বলে এবং আল্লাহকে রব্ব বলে স্বীকৃতি দেয়ার অর্থ কি, এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে এতটুকু বলা হচ্ছে যে, জীবনের প্রতিটি বিষয়ে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে যারা একমাত্র আল্লাহকেই আইনদাতা, বিধানদাতা, দাসত্ব লাভের অধিকারী, সাহায্যদাতা, আশ্রয় দানকারী, আশা পূরণকারী, রোগ থেকে আরোগ্য দানকারী, বিপদে মুক্তি দানকারী ইত্যাদি বলে মুখে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং দৈনন্দিন জীবনে এ কথার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর রবুবিয়াত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন করেছে এবং এই আন্দোলন করতে গিয়ে সম্পদের কোরবানী দিয়েছে, কারাজীবনকে স্বাগত জানিয়েছে, নির্যাতন সহ্য করেছে, দেশত্যাগ করেছে, প্রয়োজনে শাহাদাতবরণ করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা এই লোকগুলোকেই কোরআনে মুহ্ছিন বান্দা বলে উল্লেখ করেছেন। সূরা তওবায় এদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ-وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ-يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ-خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا-اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ-

যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে এবং আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে এদের মর্যাদা অনেক বিরাট আর এরাই হলো সফলকাম। তাদের রব্ব

তাদেরকে নিজের রাহ্মত ও সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী সুবিন্যস্ত রয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর কাছে কাজের প্রতিফল দেয়ার অফুরন্ত সামগ্রী রয়েছে। (সূরা আত-তাওবা-২০-২২)

একশ্রেণীর মানুষ ঐ ধরনের লোকদেরকে সফলকাম বলে থাকে, যারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেছে, সুরম্য অট্টালিকা গড়তে সক্ষম হয়েছে, মনের মতো স্ত্রী লাভ করেছে, অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে, এক কথায় মানে-সম্মানে, ধনে-জনে, অর্থ-বিত্তে, সুনাম-যশে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এই ধরনের লোকদেরকেই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ সফলকাম ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে থাকে। পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের সফলতা বলতে যা বুঝায়, তার সাথে উল্লেখিত মানবীয় চিন্তাধারার কোন সাদৃশ্য নেই।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে হবে, আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী নিজের ও অন্যান্য মানুষের সার্বিক জীবনের পুনর্বিন্যাস সাধন করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে যারা রব্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে আমৃত্যু পর্যন্ত এই কথার ওপরে দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পেরেছে, তারাই সফলতা অর্জন করেছে এবং তারাই আল্লাহর রাহ্মাতের অধিকারী। এইশ্রেণীর লোকদেরকেই বলা হয় মুহ্ছিনীন।

সুতরাং আল্লাহর রাহ্মত লাভের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হলোঃ (১) আল্লাহর গুণাবলীসহ তাঁর ওপরে ঈমান আনতে হবে। (২) রাসূলের ওপরে ঈমান এনে একমাত্র তাঁকেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদর্শ নেতা হিসাবে অনুসরণ করতে হবে। (৩) আল্লাহকে রব্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সে কথার ওপরে আমৃত্যু অটল অবিচল থাকতে হবে। (৪) আল্লাহর রবুবিয়াতকে অনুসরণ করতে গিয়ে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। (৫) যে কোন নির্যাতনের মোকাবিলায় আল্লাহর রবুবিয়াতকে প্রাধান্য দান করতে হবে।

এসব শর্তাবলী অনুসরণ করে চললে নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাহ্মত লাভ করা যাবে। আরেক শ্রেণীর লোক আল্লাহর রাহ্মত লাভের অধিকারী বলে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা তওবায় ঘোষণা দিয়েছেন। তারা হলো সেই সবশ্রেণী, যাদের হৃদয়-মন আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কিন্তু প্রকৃত অক্ষমতার কারণে তারা আল্লাহর পথে জিহাদের হক আদায় করতে সমর্থ হয় না।

সুন্নাতি পোষাক হিসাবে প্রচলিত পোষাক পরিধান করে, মাথায় টুপি-পাগড়ী পরিধান করে, দাড়ি রাখে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করে, রামজানের রোজা আদায় করার পরও নফল রোজা প্রতি মাসে আদায় করে, তস্বীহ-তাহ্লীল ও তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়সহ অন্যান্য নফল কাজ যথাযথভাবে পালন করে। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে দূরে অবস্থান করে। এই শ্রেণীর মানুষও কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর সেই বিশেষ রাহ্মত লাভ করতে সমর্থ হবে না।

তাঁর বিশেষ রাহ্মত লাভ করতে হলে, অবশ্যই তাকে আল্লাহর সৈনিক হতে হবে, উল্লেখিত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। যারা নিজেদেরকে আল্লাহর মুহ্ছিন বান্দাহ্ হিসাবে গড়তে সক্ষম

হবেন, তাদের জন্য এই পৃথিবীতেই সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো, স্বয়ং আল্লাহ তাদের অভিভাবক হয়ে যাবেন−তিনি তাদের সাথে থাকবেন। সূরা নাহ্‌লে মহান আল্লাহ্ বলেন−

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ−

আল্লাহ তো তাদের সাথে রয়েছেন, যারা আল্লাহভীতি সহকারে কাজ করে এবং যারা মুহ্‌ছিন।

তিনি রাহীম−অত্যন্ত দয়াবান

মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম রাহ্‌মান ও রাহীম। এ শব্দ দুটো 'রহম' ধাতু থেকে নির্গত ও গঠিত। রহম শব্দের মূল অর্থ হলো অনুগ্রহ বা দয়া। সুরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। প্রশংসা এ জন্য করা হলো যে, তিনি রাব্বুল আলামীন তথা জগতসমূহের রব্ব। তিনি রব্ব কিন্তু তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাব কি ? এ প্রশ্নের উত্তর এলো, তিনি রাহ্‌মান ও রাহীম। তিনি অসীম দয়াবান-করুণাময়। করুণা-মন্ডিত তাঁর রবুবিয়াত। তিনি তাঁর সৃষ্টিসমূহকে প্রতিপালিত করছেন আপন রাহ্‌মত দিয়ে। অসীম ভালোবাসা আর করুণা দিয়ে তিনি তাঁর সৃষ্টিসমূহকে লালন-পালন এবং পরিচালিত করছেন। তিনি আপন রাহ্‌মত দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে আবৃত করে রেখেছেন। তাঁর রাহ্‌মত সার্বজনীন−সবাই তাঁর রাহ্‌মত লাভ করে ধন্য হচ্ছে।

কিন্তু রাহ্‌মান হিসাবে তিনি যে রাহ্‌মত করছেন, তা এই পৃথিবীতেই সর্বব্যাপক। আকাশ ও যমীন এবং এর মধ্যে যা কিছুই রয়েছে, এর সবকিছুই তাঁর রাহ্‌মত লাভ করে বটে−পক্ষান্তরে এটা কোন স্থায়ী রাহ্‌মত নয়। আখিরাতের ময়দানে তাঁর এই রাহ্‌মত পৃথিবীর অনুরূপ সার্বজনীনভাবে সবাই লাভ করবে না। সেদিন বিশেষ বিশেষ লোকজন তাঁর রাহ্‌মত লাভ করবে এবং সে রাহ্‌মতের ধারাবাহিকতা অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে।

রাহ্‌মান ও রাহীম শব্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন তাফসীরকার উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ রাহ্‌মান হলেন এই পৃথিবীর জন্য, আর রাহীম হলেন পরকালীন জগতের ক্ষেত্রে। আদালতে আখিরাতে তাঁর বিশেষ রাহ্‌মত কিভাবে লাভ করা যেতে পারে, সে পন্থা তিনি অনুগ্রহ করে এই পৃথিবীতেই মানুষকে অবগত করেছেন তাঁর নবী ও কিতাবের মাধ্যমে। মহান আল্লাহর রাহ্‌মত−তথা তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ্ বলেন−

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا−

(হে রাসূল!) বলুন, আমার রব্ব-এর কথা লেখার জন্য সমুদ্র কালিতে পরিণত হয় তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার রব্ব-এর কথা শেষ হবে না। বরং যদি এ পরিমাণ কালি পুনরায় নিয়ে আসি তবুও তা যথেষ্ট হবে না। (সূরা আল কাহ্‌ফ-১০৯)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে কত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এসব সৃষ্টির ওপরে তাঁর রাহ্‌মত কিভাবে বর্ষিত হচ্ছে, কোন মানুষের পক্ষে তা গণনা করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তা বর্ণনা

করাও সম্ভব নয়। মানুষ সম্মিলিতভাবে যদি তাঁর সৃষ্টিকর্ম এবং দয়া-অনুগ্রহ সম্পর্কে লিখতে চায়, এ ধরনের কোন প্রকল্প যদি মানুষ গ্রহণ করে, শোচনীয়ভাবে তারা ব্যর্থ হবে। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা লোকমানের ২৭ আয়াতে বলেন–

وَلَوْ اَنَّ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلاَمٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّانَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ-

পৃথিবীতে যত গাছ রয়েছে তা যদি সবই কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (কালিতে পরিণত হয়), তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে তবুও আল্লাহর কথা (লেখা) শেষ হবে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসীম দয়াবান, তাঁর বান্দাদের প্রতি তিনি যে কতভাবে দয়া করেছেন, এই মানুষ যদি ক্ষণিকের জন্যে নীরবে নিভৃতে কোথাও বসে চিন্তা করতো, তাহলে সিজ্দায় মাথানত হয়ে আসতো। আল্লাহ বলেন–

هُوَالَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّ مِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ-

তিনিই আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষন করেন, যা পান করে তোমরা নিজেরাও পরিতৃপ্ত হও এবং যার সাহায্যে তোমাদের পশুদের জন্যও খাদ্য উৎপন্ন হয়। এই পানির সাহায্যে তিনি শস্য উৎপন্ন করেন। (সূরা আন্ নাহ্ল-১০)

আল্লাহ তা'য়ালা গোটা পৃথিবীকে একই ধারায় সৃষ্টি করেননি। তিনি পৃথিবীর প্রতিটি এলাকাকে নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। এ ব্যবস্থার নানা উপকারিতার মধ্যে একটি অন্যতম উপকারিতা হলো, মানুষ নিজের পথ ও গন্তব্য পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর এই অসীম রাহ্মতের গুরুত্ব মানুষ তখনই অনুধাবন করতে পারে, যখন কোন মানুষ এমন কোন মরুপ্রান্তরে যেতে বাধ্য হয় এবং যেখানে এ ধরনের বৈশিষ্ট্যমূলক চিহ্নের প্রায় কোন অস্তিত্বই থাকে না এবং মানুষ প্রতি মুহূর্তে পথ হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত থাকে। জলপথে ভ্রমণের সময় মানুষ এর থেকে আরো বেশী মারাত্মকভাবে আল্লাহর এই বিরাট রাহ্মতের বিষয়টি অনুভব করতে থাকে।

কারণ সেখানে পথের চিহ্ন প্রায় থাকেনা বললেই চলে। কিন্তু মরুভূমি ও সমুদ্রের বুকেও মহান আল্লাহ দয়া করে তাঁর বান্দাদের জন্য পথ চেনার জন্য প্রাকৃতিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সেই ব্যবস্থাটি হলো, প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষ আকাশের তারকার সাহায্যে পথের সন্ধান করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তাঁর এই রাহ্মতের কথা এভাবে বলেছেন–

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-وَعَلٰمٰتٍ-وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ-

তিনি নদী প্রবাহিত করেছেন এবং প্রাকৃতিক পথনির্মাণ করেছেন, যেন তোমরা গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হও। তিনি ভূ-পৃষ্ঠে পথনির্দেশক চিহ্নসমূহ রেখে দিয়েছেন এবং তারকার সাহায্যেও মানুষ পথনির্দেশ লাভ করে থাকে। (সূরা আন্ নাহ্ল-১৫-১৬)

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি সমস্ত নিয়ামত ভোগ করে, কিন্তু ভোগকৃত জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করে দেখে না, যা ভোগ করা হচ্ছে এগুলো কে দিলেন–কিভাবে দিলেন। চোখে অনেক কিছু দেখে, কিন্তু সেসব দৃশ্য নিয়ে কখনো চিন্তা করে দেখে না। পাখি অসীম নীলিমায় ডানা ঝাপ্‌টিয়ে উড়তে থাকে, তারপর এক সময় ডানা ঝাপ্‌টানো বন্ধ করে তা দু'দিকে মেলে দিয়ে স্থির হয়ে উড়ে বেড়ায়। চিল, শকুন ও বাজ পাখিই এ ধরনের অবস্থায় বেশী থাকে। মানুষ এ দৃশ্য দেখে কিন্তু তাদের মনে কোন বিস্ময় সৃষ্টি হয় না, এসব নিয়ে তারা চিন্তা করে না, কে তিনি–যিনি পাখিকে আপন রাহ্‌মত দিয়ে এভাবে থাকার তওফিক দিলেন ? আল্লাহ বলেন–

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَاءِ-مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ-

এরা কি কখনো পাখিদের দেখেনি, আকাশ নিঃসীমে কিভাবে তারা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে ? আল্লাহ ব্যতিত কে তাদেরকে ধরে রেখেছে ? (সূরা আন্ নাহ্ল-৭৯)

দাম্পত্য জীবনে মানুষ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে পরম শান্তির একটি নিবিড় গৃহকোণে সৃষ্টি করে। মানুষের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা পশু সৃষ্টি করেছেন এবং সে পশুর মধ্যে অসংখ্য উপকারিতা রেখেছেন। পশুর গোস্ত মানুষ ভক্ষণ করে, এর রক্ত, হাড় ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ দিয়ে ক্ষেতে সারের কাজ চালায়। পশুর চামড়া দিয়ে পোষাক, পাদুকা ও তাঁবু নির্মাণ করে। এই তাঁবু প্রয়োজনে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে স্থানান্তরিতও করতে পারে। আল্লাহ বলেন–

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ-وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ-

আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে বানিয়েছেন শান্তির আবাস। তিনি পশুদের চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমনসব ঘর নির্মাণ করে দিয়েছেন যেগুলোকে তোমারা ভ্রমণকালে ও স্বগৃহে অবস্থানকালে-উভয় অবস্থাতেই সহজে বহন করতে পারো। তিনি পশুদের পশম, লোম ও চুল থেকে তোমাদের জন্য পরিধেয় ও ব্যবহার-সামগ্রীসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা জীবনের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের কাজে লাগবে। (সূরা আন্ নাহ্ল-৮০)

সূর্যের তাপে মানুষ কষ্ট পাবে, এটাও আল্লাহ সহ্য করেননি। এ পৃথিবীতে তিনি এমন অসংখ্য বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষকে ছায়াদান করবে, মেঘের ব্যবস্থা করেছেন, সূর্যকে আড়াল করে মানুষের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করে দিবে। মানুষ ঠান্ডায় কষ্ট পাবে, এ জন্য তিনি পশুর পশম থেকে পোষাক প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আবার এমন ধরনের পোষাকের ব্যবস্থাও তিনি করেছেন, যা মানুষের ঊর্ধ্বজগত ভ্রমণে সহায়ক হয়, যুদ্ধে ব্যবহার করে,

মরুভূমির লূ-হাওয়া থেকে হেফাজত করে। এভাবে অসংখ্য কাজে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পোষাক ব্যবহার করবে, এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে পৃথক পোষাকের ব্যবস্থা করেছেন। এসবই হলো তাঁর দয়া এবং অনুগ্রহ। তাপ ব্যতিত এই পৃথিবীতে কোন কিছুই জন্ম নিতে পারে না। আল্লাহ দয়া করে সূর্যে তাপ দান করেছেন, যেন তা মানুষের কল্যাণ করতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঐ তাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না, সূর্য প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ তাপ নির্গত করছে। মানুষ নিজের আবাসস্থল নির্মাণ করবে, সেখানে সে মানসিক প্রশান্তি, স্থিতি ও স্বস্তি লাভ করবে।

এই ঘর বানানোর উপকরণও তিনিই দান করেছেন। যেখানে ইট, পাথর, কাঠ, টিন দিয়ে ঘর বানানোর পরিবেশ নেই, আল্লাহ তা'য়ালা সেখানে পশুর চামড়া দান করেছেন। তাপমাত্রা যেখানে হিমাঙ্কের নীচে অবস্থান করতে থাকে। বরফের দেশ, সেখানে মানুষ তাঁবু নির্মাণ করে পশুর চামড়া দিয়ে। সেই তাঁবু দিয়ে ঘর বানিয়ে মানুষ বাস করে। মানুষের যেখানে যে অবস্থায় যা প্রয়োজন, তিনি সেখানে তাই দান করে বান্দার প্রয়োজন পূরণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلاً وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّوَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ-كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ-

তিনি নিজের সৃষ্ট বহু জিনিস থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়ে তোমাদের জন্য আশ্রয় নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের এমন পোষাক দিয়েছেন, যা তোমাদের গরম থেকে রক্ষা করে আবার এমন কিছু অন্যান্য পোষাক তোমাদের দিয়েছেন যা পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদের হেফাজত করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করেন, হয়তো তোমরা অনুগত হবে। (সূরা আন্ নাহ্ল-৮১)

পৃথিবীর মানুষের প্রতি তিনি তাঁর নিয়ামতসমূহ পূর্ণ করেছেন–এ কথার অর্থ হলো, এখানে মানুষের জীবন ধারনের জন্য যেসব উপায়-উপকরণ প্রয়োজন, তার কোন কিছুই তিনি বাদ রাখেননি। সবকিছুই তিনি পরিপূর্ণভাবে দান করেছেন। শুধু তাই নয়, মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ সম্পর্কে যে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে, এর জবাবে আল্লাহ সাথে সাথে গযব দিয়ে মানুষের ঠুনকো অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতেন।

সূরা নূরে বলা হয়েছে, মানুষের প্রতি তাঁর অসীম দয়া ও করুণা না থাকলে মহাশাস্তি নেমে আসতো। ইবলিস শয়তান, জ্বিন শয়তান, মানুষ শয়তান ও নফ্স শয়তান প্রতি মুহূর্তে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে থাকে। এসব শক্তি মানুষকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে। এদের কবল থেকে হেফাজত করার জন্যই তিনি মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য অনুগ্রহ করে নবী দিয়েছেন–কিতাব দিয়েছেন। মানুষ যদি নবী ও কিতাব লাভ না করতো, তাহলে সে নিজের শক্তিতে কোনক্রমেই সত্যপথের সন্ধান পেতো না, ফলশ্রুতিতে ধ্বংস গহ্বরে নিমজ্জিত

হতো। আল্লাহ অসীম করুণা করেছেন তাঁর বান্দার প্রতি। কোরআন মানুষকে এই করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ-وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَانَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ-وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا-(نُور)

হে ঈমানদারগণ ! শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না। যে কেউ তার অনুসরণ করবে তাকে সে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না থাকতো তাহলে তোমাদের একজনও পবিত্র হতে পারতে না। কোরআন না থাকলে মানুষের পক্ষে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা তা জানার কোন উপায় ছিল না। তেমনি মহাশূন্য আর পৃথিবীর বস্তু নিচয় সম্পর্কে কোরআনের সাহায্য ব্যতিত সঠিক তথ্য লাভ করা মানুষের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হতো না। এটা আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ যে, তিনি গোটা পৃথিবীর ভূ-মন্ডলকে একই ধরনের বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেননি। একে বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত করেছেন, যা পরস্পর মিলিত ও সংযোজিত হওয়ার পরও এর রূপ, বর্ণ, গন্ধ, গঠন-প্রণালী, উপাদান, বিশেষত্ব, উর্বরা শক্তি, উৎপাদন যোগ্যতা ও রাসায়নিক অথবা খনিজ সম্পদের দিক দিয়ে পরস্পর বিভিন্ন প্রকারের। আল্লাহ তা'য়ালা এই ব্যবস্থা করেছেন, এর মধ্যে মানুষের জন্য অসংখ্য কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

একই যমীনের পাশাপাশি দুটো গাছ অবস্থান করছে, মাটির গঠন প্রণালী ও রাসায়নিক গুণাগুণও একই ধরনের। একই সার ও পানি লাভ করার পরেও দুটো গাছের ফুল ও ফল দু'ধরনের। খেজুর গাছ থেকে শীত মৌসুমে সুস্বাদু রস নির্গত হয়। এই গাছের পাশেই এমন গাছ অবস্থান করছে যার ফলের স্বাদ অম্ল বা তিক্ত। খেজুর গাছ যেখানে অবস্থান করছে, সেখানে গভীর গর্ত করেও এক ফোটা সুস্বাদু রস পাওয়া যাবে না। আল্লাহ রাহ্‌মান ও রাহীম, তিনি দয়া করে তাঁর বান্দাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করেছেন। সূরা রাদ-এর আল্লাহ বলেন–

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّ نَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ-وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ-

আর লক্ষ্য করো, পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল রয়েছে, যা মূলত পরস্পর সংযুক্ত। আঙ্গুরের বাগান রয়েছে, ক্ষেত-খামার রয়েছে, খেজুরের গাছ রয়েছে, যাদের কিছু এক কান্ডবিশিষ্ট এবং কিছু দ্বৈত কান্ডবিশিষ্ট। একই পানি সবকিছুকেই সিক্ত করে; কিন্তু স্বাদের দিক দিয়ে আমি কিছুকে অত্যন্ত সুস্বাদু বানিয়ে দিই এবং কিছুকে ভিন্ন স্বাদের বানিয়ে দিই।

আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের জন্য এমনভাবে রাহ্‌মত করেছেন যে, মাটির ওপরে মানুষ বাস করছে, এই মাটিকে তিনি এমনভাবে গঠন করেছেন যে-মানুষের প্রয়োজনে এই মাটি কর্দমাক্ত হয়ে যায়। মৃত্তিকা শিল্পে নিয়োজিত লোকজন এই মাটিকে যেমনভাবে খুশী, তারা তা তেমনভাবে ব্যবহার করতে পারছে। মাটি দিয়ে তারা মানুষের ব্যবহার যোগ্য তৈজষ-পত্র নির্মাণ করছে। ইট প্রস্তুত করে তা দিয়ে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করছে। কৃষক এই মাটিকে ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন করছে।

এই মাটিকে এতটা নরম করা হয়েছে যে, তার ভেতরে গর্ত করে পানি বের করা হচ্ছে। ওজন সহ্য করার মতো গুণ আল্লাহ্ তা'য়ালা এই মাটির ভেতরে দান করেছেন। অগণিত অট্টালিকা এই মাটির ওপরে নির্মাণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। আল্লাহর এই রাহ্‌মত লাভ করেও মানুষ যদি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে, তাঁর দাসত্ব ও প্রশংসা না করে, তাহলে আল্লাহর আযাব যে অকৃজ্ঞদেরকে গ্রেফতার করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ বলেন-

وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ-تَبْصِرَةً وَّذِكْرَاى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ-وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبٰرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ-وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ-

আর আমি পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছি এবং তাতে পাহাড়সমূহ সংস্থাপন করেছি এবং এর মধ্যে সর্বপ্রকারের সুদৃশ্যময় উদ্ভিদরাজি উৎপাদন করেছি। এসব কিছুই চক্ষু উন্মোচনকারী ও অতীব শিক্ষাপ্রদ-এমন প্রতিটি বান্দার জন্য, যে প্রকৃত সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকরে। আর আমি উর্ধ্বজগৎ থেকে অতীব বরকতময় পানি অবতীর্ণ করেছি। তারপর তার সাহায্যে বাগান ও কৃষিজাত শস্যাদি এবং সুউচ্চ সমুন্নত খেজুর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যার ভেতরে ফলের সম্ভারপূর্ণ ছড়া একের পর একটা ধরে। (সূরা ক্বাফ-৭-১০)

মানুষকে আহার দান করার জন্য আল্লাহর রাহ্‌মত কিভাবে সক্রিয় রয়েছে তা লক্ষ্য করে দেখার মতো। মানুষ ক্ষেতে বীজ বপন করে বাড়িতে গিয়ে হিসাব নিকাশ করা শুরু করে, এবারে সে কত মণ ফসল ক্ষেত থেকে লাভ করবে। আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছা করলে সে ফসলে কোন দানা না দিয়ে ভূষিতে পরিণত করে দিতে পারতেন। তিনি তা না করে বীজকে আদেশ দেন তা যেন অঙ্কুরিত হয়। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গাছ বের হলো। শিকরগুলো যমীনের গভীরে যেতে থাকলো। মাটিতে যে উপাদান রয়েছে, তা শিকরগুলো শোষণ করতে থাকলো। কিন্তু যমীনের ওপরে গাছের সদ্যজাত পাতাগুলো সূর্যের প্রখর তাপে নুয়ে পড়লো। এমনভাবে তা নুয়ে পড়ে যে, দেখলে মনে হয় এই গাছ আর হবে না।

সুতরাং, ফসল লাভেরও কোন আশা নেই। কৃষক হতাশ হয়ে পড়ে। দিনের বেলা সূর্য প্রখর তাপ বিকিরণ করে পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়। দিবাবসানে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

নিশীথ শিশির আল্লাহর রাহ্মত হিসাবে উর্ধ্বজগৎ থেকে ঝরতে থাকে। বইতে থাকে স্নিগ্ধ শীতল দক্ষিণা মলয় সমীরণ। কণা কণা নিশীথ শিশির বিন্দু আর শীতল সমীরণ–উভয়ের সমন্বিত মমতা সিক্ত যত্নে নুয়ে পড়া সদ্য প্রস্ফুটিত পাতাগুলো পুনরায় সজীব-প্রাণবন্ত হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ তাঁর রাহ্মত দিয়ে গাছ বড় করেন, ফুলের সৃষ্টি করে তার ভেতরে ফলদান করেন। এই ফলগুলো আল্লাহ আবরণহীন দেন না। প্রতিটি দানা ও ফলই খোসা দিয়ে আবৃত করে দেন। পরম যত্নে এসব কিছুকে তিনি উৎপাদন করে তাঁর সম্মানিত বান্দার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, এসব খাও আর আমার দাসত্ব করো–আমারই প্রশংসা করো।

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অসীম স্নেহশীল। তিনি তাঁর বান্দার যা প্রয়োজন হবে, তা বান্দাহ না চাইতেই দান করেছেন। তিনি রোগ সৃষ্টি করেছেন, রোগে বান্দাহ্ আক্রান্ত হবে এ জন্য তিনি ওষুধ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে এমন কোন রোগ নেই যে রোগের ওষুধ আল্লাহ দেননি। সমুদ্রের মধ্যে আল্লাহ মাছ দিয়েছেন, এমন অনেক মাছ রয়েছে, যার তেল ও কাঁটা দিয়ে বিভিন্ন রোগের ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। অসংখ্য উদ্ভিদ তিনি সৃষ্টি করেছেন, যা বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

বনৌষধি সম্পর্কে যারা ধারণা রাখে, তারা জানে কোন গাছ দিয়ে কোন রোগের উপশম হয়। পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে কোন ডিগ্রীধারী ডাক্তার নেই, সেখানের মানুষ যেন রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট না পায়, এ জন্য অসীম দয়ালু আল্লাহ তাদের হাতের কাছেই নানা ধরনের উদ্ভিদ দান করেছেন, যেন তারা এসব ব্যবহার করে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। মানুষ তরকারীতে যেসব মসল্লা ব্যবহার করে, তার প্রতিটি মসল্লা-ই বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রতিষেধক। তরকারী হিসাবে যেসব সব্জী আহার করা হয়, সেগুলোও রোগের প্রতিষেধক।

সজনে ডাটা এমন ঋতুতে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়ে থাকেন, যে ঋতুতে মানুষ পানি পক্সে আক্রান্ত হতে পারে। এই সজনে ডাটার ভেতরে রয়েছে পানি পক্সের প্রতিষেধক। বরই বা কুল–এর ভেতরেও রয়েছে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক। কম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন যারা, তাদের জন্য কচু শাকের ভেতরে রয়েছে প্রতিষেধক। কচু শাক আহার করলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি লাভ করে।

উচ্ছে বা করলার ভেতরে রয়েছে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক। এই সব্জী ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এর রস প্রতিদিন সকালে অন্য কিছু আহার করার পূর্বে পান করলে ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে। যেখানে বসন্ত রোগের টিকা গ্রহণ করার কোন ব্যবস্থা নেই, সেখানের মানুষ এসব আহার করে ঐ সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারে, এ জন্য দয়াময় আল্লাহ নানা ধরনের সব্জীর ভেতরে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা দিয়ে তা সহজ লভ্য করে দিয়েছেন।

ঠান্ডা প্রবণ যারা অর্থাৎ যারা অতি সহজেই সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হয়, সামুদ্রিক কটক মাছের তেলের ভেতরে তাদের জন্য প্রতিষেধক রেখে দিয়েছেন। পরিমিত পরিমাণ ঐ মাছের তেল আহার করলে সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যারা বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত, নিয়মিত মেথী আহার করলে বহুমূত্র রোগ তেমন ক্ষতি করতে

পারে না। কালোজিরা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'কালোজিরা মৃত্যু ব্যতিত সকল রোগের ওষুধ।' যে কোন রোগ উপশমে কালোজিরার ভূমিকা অদ্বিতীয়। সদ্য প্রসূতিকে কালোজিরা আহার করালে তার শরীরের ব্যথা দ্রুত উপশম হয়। যে কোন বাতে আক্রান্ত ব্যক্তি কালোজিরা নিয়মিত আহার করলে বাতের ব্যথা উপশম হয়।

মধু সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে বলেছেন, এর মধ্যে মানুষের জন্য নিরাময় রয়েছে। মধু যে একটি উপকারী ও কল্যাণময় এবং সুস্বাদু খাদ্য তা কোন মানুষেরই বোধহয় অজানা নেই। এই মধুর ভেতরে যে রোগ নিরাময় শক্তি নিহিত রয়েছে, একথাটা তুলনামূলকভাবে অনেকের কাছেই অজানা রয়ে গিয়েছে। মধু স্বয়ং কোন কোন রোগে এমনিতেই উপকারী।

এই মধুর মধ্যে রয়েছে ফুল ও ফলের রস এবং তাদের উন্নত মানের গ্লুকোজ। মধুর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তা স্বয়ং পচে না এবং অন্য জিনিসকেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজের মধ্যে পচন থেকে সংরক্ষিত রাখে। এ কারণে ওষুধ প্রস্তুত করার সময় মধুর সাহায্য গ্রহণ করার মতো গুণগতমান এর ভেতরে সৃষ্টি হয়। এ জন্যই ওষুধ নির্মাণ শিল্পে এ্যালকোহলের পরিবর্তে মধুর ব্যবহার চলে আসছে সেই প্রাচীন কাল থেকে। এটা ছাড়াও মৌমাছি যদি এমন কোন এলাকায় বাসা বাঁধে যেখানে কোন বিশেষ ধরনের বনৌষধি বিপুল পরিমাণে সহজ লভ্য হয় তাহলে সেই এলাকার মধু নিছক মধুই থাকে না, বরং তা ঐ ঔষধির সর্বোত্তম উপাদান ধারণ করে এবং যে রোগের ওষুধ আল্লাহ ঐ ঔষধির মধ্যে দিয়েছেন, তার জন্য সেটাও উপকারী হয়।

গবেষকগণ বলেন, যদি পরিকল্পিত উপায়ে মধুমক্ষিকাদের দিয়ে এ কাজ করানো হয় এবং বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষের উপাদান তাদের মাধ্যমে নির্গত করে তাদের মধু পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষিত করা হয়, তাহলে সেই মধু গবেষণাগারে প্রস্তুত উপাদানের থেকেও অধিক কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হবে। এই মধু সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন এবং মৌমাছির নামে একটি সূরা রয়েছে। সে সূরাটির নাম হলো নাহ্ল। আরবী নাহ্ল শব্দের অর্থ হলো মৌমাছি। আল্লাহর কোরআন বলছে–

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ- ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً- يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ-

আর দেখো তোমার রব্ব মৌমাছিদেরকে এ কথা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন, তোমরা পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও মাচার ওপর ছড়ানো লতাগুল্মে নিজেদের চাক নির্মাণ করো। তারপর সব ধরনের ফলের রস শোষণ করে নিজের রব্ব-এর তৈরী করা পথে চলতে থাকে। এই মাছির ভেতর থেকে একটি বিচিত্র রংগের শরবত বের হয়, যার মধ্যে রয়েছে নিরাময় মানুষের জন্য। (সূরা আন নাহ্ল-৬৮-৬৯)

করুণাময় আল্লাহ মধুমক্ষিকাদেরকে যেখানে যেখানে আদেশ করেছেন, তারা সেখানেই চাক নির্মাণ করে। পাহাড়ী এলাকায় যেসব মানুষ বাস করে, তারা যেন মধু সংগ্রহ করে তা থেকে উপকারিতা গ্রহণ করতে পারে, এ জন্য তাদের প্রতি আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন পাহাড়ে চাক বাঁধে। যে এলাকায় পাহাড় নেই, সে এলাকার মানুষ মধু থেকে যেন বঞ্চিত না হয়, এ জন্য তাদের প্রতি আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন গাছে চাক নির্মাণ করে। আর যে এলাকায় পাহাড় নেই, গাছও তেমন নেই, সে এলাকায় মৌমাছি চাক বাঁধে বড় বড় বিল্ডিংয়ের কার্ণিশে বা ঘরের মাচানের সাথে।

আল্লাহ রাহ্‌মান, তিনি তাঁর বান্দাকে যাবতীয় কল্যাণ দান করেছেন। মধুর মতো উপকারী জিনিস থেকে কোন এলাকার মানুষ যেন বঞ্চিত না থাকে, এ জন্য তিনি মৌমাছির ওপরে যথাস্থানে চাক বাঁধার আদেশ দিয়েছেন। মৌমাছি শুধু মধুই সংগ্রহ করে না। এরা ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ানোর মাধ্যমে ফুলের পরাগ সংযোগ ঘটায়। এমন অসংখ্য উদ্ভিদ রয়েছে, যারা পরাগায়নের জন্য একান্তভাবে মৌমাছির ওপরে নির্ভরশীল। প্রাণী বিজ্ঞানীগণ এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার প্রজাতির মৌমাছির সন্ধান পেয়েছেন।

এদের চাক নির্মাণের কৌশল দেখলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়। মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে সেই কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। প্রতিটি মৌচাকে মৌমাছিদের মধ্যে একজন রাণী মৌমাছি থাকে। এদের মধ্যে কিছু পুরুষ মৌমাছি ও কর্মী মৌমাছি রয়েছে। আর স্থান-পরিবেশের কারণে এরা বিভিন্ন ধরনের চাক নির্মাণ করে থাকে। মৌচাক অসংখ্য ষড়ভূজের সমষ্টি অর্থাৎ প্রতিটি প্রকোষ্ঠ ছয়টি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই বাহুগুলো মোম দিয়ে নির্মিত। আবার মোম তৈরী হচ্ছে মৌমাছির পেটের ওপরের অংশে অবস্থিত গ্রন্থী থেকে নিঃসৃত লালার মাধ্যমে। মৌমাছিরা মোমকে চিবাতে থাকে ফলে মুখের লালার সাথে তা মিশে যায়। তখন তারা তা পাতলা বেড়ি আকারে মৌচাকের মধ্যে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে।

মৌমাছিরা যে আশ্চর্যজনকভাবে ষড়ভুজ রচনা করে তা অত্যন্ত কার্যকর প্রক্রিয়ায় খুবই অল্প জায়গার মধ্যে নির্মিত হয়। তারা এসব প্রকোষ্ঠে মধু সঞ্চিত করে। এই প্রকোষ্ঠগুলো আবার দুইভাবে নির্মাণ করা হয়। ছোট আকারের প্রকোষ্ঠে কর্মী মৌমাছি বাস করে এবং এতে পরাগরেণু ও মধু সঞ্চিত থাকে। বড় আকারের প্রকোষ্ঠগুলোয় পুরুষ মৌমাছি বাস করে। এক পাউন্ড মোম দিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার প্রকোষ্ঠ নির্মিত হতে পারে এবং এই পরিমাণ কক্ষে প্রায় দশ কেজি মধু সঞ্চয় করা যায়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দয়া করে মধুর ব্যবস্থা করেছেন। মানুষ এই মধু পান করে কিন্তু এ সম্পর্কে চিন্তা করে না, কিভাবে আল্লাহর নির্দেশে মধুমক্ষিকারা মধু সঞ্চয় করে মানুষকে উপহার দেয়। মাত্র আধা কেজি মধু উৎপাদন করার জন্য পাঁচশত পঞ্চাশটি মৌমাছিকে অনূন্য পঁচিশ লক্ষ ফুল থেকে রস ও পরাগ সংগ্রহ করতে হয়। আর এ জন্য তাদেরকে পঁচাত্তর হাজার বার ফুলে ফুলে ভ্রমণ করতে হয়। যখন ফুল থাকে না, তখন তারা ফল থেকে মধু সংগ্রহ করে। একটি মৌচাকে ত্রিশ থেকে ষাট হাজার কর্মী মৌমাছি থাকে। মধুর ভেতরে আনুপাতিক হারে লেভলুজ থাকে চল্লিশ দশমিক পাঁচ ভাগ। ডেক্সট্রোজ চৌত্রিশ ভাগ।

সুক্রোজ এক দশমিক নয় ভাগ। পানি সতের দশমিক সাত ভাগ। ডেক্সট্রিন ও গাম এক দশমিক নয় ভাগ। এ্যাশ থাকে শূন্য দশমিক আঠার ভাগ। এছাড়া মধুতে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের সদস্য, নানা ধরনের এনজাইম, খনিজ পদার্থ, সিলিকা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্লোরিন, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস, সালফার, এ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম।

মধু বাতাস থেকে পানি শোষণ করে এ জন্য মধু কখনো জমাট বাঁধে না। মধুর ভেতরে বিভিন্ন ধরনের রোগে উপশমের উপাদান বিদ্যমান। এর অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদেরকে এই মধু দান করেছেন। আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ–

আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ। (নাহ্ল)

আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ, মায়া ও বদান্যতা প্রবণ। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে তার এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন যোখানে কারো দৃষ্টি যায় না। সে প্রয়োজনগুলো তিনি এমনভাবে পূরণ করেন যে, বান্দা নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না কে কখন তার কোন প্রয়োজন পূরণ করেছে। মহান আল্লাহর এই দয়া ও মেহেরবানী তাঁর সমস্ত বান্দার জন্য। পবিত্র কোরআন বলছে–

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ–وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ–

আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। তিনি যাকে ইচ্ছা তাই দান করেন। তিনি মহা শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী। (সূরা শূরা-১৯)

ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে তিনি ভালোবাসেন

পরম প্রিয় সন্তানও যখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, মাতা-পিতাও তাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দেয়–পৃথিবীতে এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এমনকি বিদ্রোহী-অপরাধী সন্তানকে জন্মদাতা পিতা, গর্ভধারিণী মাতা আপন হাতে হত্যা করতেও দ্বিধান্বিত হন না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে মাতা-পিতার যে হাত দুটো পরম মমতায় সন্তানকে বুকে তুলে নিয়েছিল, সন্তানকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনে নিজের জীবন বিপন্ন করার জন্য অনুক্ষণ প্রস্তুত ছিল, মাতা-পিতার সেই মমতার হাতই একদিন সময়ের বিবর্তনে সন্তানের মুখে জীবন সংহারী নীলকণ্ঠ–গরলে পরিপূর্ণ পাত্র উঠিয়ে দেয়।

পক্ষান্তরে এই মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসীম ধৈর্য্যশীল। তাঁরই সৃষ্টি বান্দাহ তাঁর অস্তিত্ব, গুণাবলী, শক্তি, রাহ্‌মত, বিধানাবলী সম্পর্কে অসহনীয় কটুক্তি করে, তাঁর বিধানের ধারক-বাহকদেরকে হত্যা করে, তাঁরই সৃষ্টি পৃথিবী থেকে তাঁর নাম-নিশানা মুছে দেয়ার চেষ্টা-সাধনা করে, অথচ তিনি নির্বাকার।

তিনি পরম মমতাভরে-করুণাসিক্ত দৃষ্টিতে বিদ্রোহী–মারাত্মক অপরাধী বান্দাকে দেখতে থাকেন। সমস্ত সৃষ্টিকে বিদ্রোহী বান্দার খেদমত থেকে বিরত থাকার কোনই আদেশ দেন না। যাবতীয় নিয়ামতসমূহ ভোগ করার সুযোগ দেন। আপন ঔদার্য্য আর বদান্যতা বার বার

প্রদর্শন করে অপরাধীকে সংশোধনের নীরব আহ্বান জানান। তাঁর ক্ষমা বিদ্রোহী আর অপরাধীর পেছনে ছুটতে থাকে। আল্লাহর রাহ্‌মত বিদ্রোহী-অপরাধী বান্দাকে যেন ডাক দিয়ে বলতে থাকে, অপরাধ করেছো তো কি হয়েছে-তুমি মানুষ। তোমার ভেতরে রয়েছে অপরাধ প্রবণতা। তুমি অপরাধ করবেই। আল্লাহর ক্ষমা তোমার সাথেই রয়েছে, তিনি তোমার দিকে ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রেখেছেন। শোন, তোমার রব্ব তোমাকে কি বলছেন-

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ-وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ-

তোমার রব্ব মানুষের অত্যাধিক বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনই করে থাকেন। আর এ কথাও সত্য যে, তোমার রব্ব কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা আর রা'দ-৬)

উল্লেখিত আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, 'তোমাদের আল্লাহ মানুষের অত্যাধিক বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে থাকেন'-বরং বলা হয়েছে তোমাদের রব্ব। অর্থাৎ পৃথিবীতে আবহমান কাল থেকে মানুষ আল্লাহর রবুবিয়াত নিয়েই বাড়াবাড়ি করেছে এবং এখনো করছে। আল্লাহকে আইনদাতা-বিধানদাতা হিসাবে গ্রহণ করতে চায়নি। এরপরও তিনি তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ বর্ষণ করেই যাচ্ছেন। তিনি বিদ্রোহীদের প্রতি-তাঁর অবাধ্য বান্দাদের প্রতি ক্ষমা ও দয়ার যে হাত প্রসারিত করে রেখেছেন, তা তিনি সঙ্কুচিত করেননি।

আল্লাহর ক্ষমার এই সুযোগ লাভ করে বিদ্রোহীরা যদি আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে, তখন তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা আমার ক্ষমা আর দয়া দেখে ভাবছো, তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে ? আসলে তোমরা ভুল ধারণা পোষণ করছো। আমি যেমন দয়া-অনুগ্রহ করেছি, তেমনি আমি কঠিন শাস্তিও দিতে সক্ষম। সুতরাং তোমরা যারা বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছো, সময় থাকতে সংশোধন হয়ে যাও। নতুবা যে কোন মুহূর্তে আমার আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করবে। তোমরা যা করছো, সে সম্পর্কে আমার পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে-সমস্ত কিছুই আমি দেখছি। আল্লাহ বলেন-

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ-لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ-

আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, গোনাহ্ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং দয়ালু, তিনি ব্যতিত দাসত্ব লাভের আর কেউ অধিকারী নেই। (সূরা আল মুমিন-৩)

করুণাময় আল্লাহ তাঁর বিদ্রোহী বান্দাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি পরাক্রমশালী-মহাশক্তিবান, সমস্ত কিছুর ওপরে তিনি বিজয়ী। কারো ব্যাপারে তিনি যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা তিনি নিশ্চিতভাবে কার্যকরী করেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কেউ বিজয়ী হতে পারে না। কেউ তাঁর গ্রেফতারী এড়িয়ে চলতে পারে না। সুতরাং তাঁর বিধান ত্যাগ করে কেউ যদি সফলতার আশা পোষণ করে, কখনো সে সফল হতে পারবে না। তিনি সমস্ত কিছুই দেখছেন। তিনি অনুমান এবং ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। এখন পর্যন্ত তোমরা যারা বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করে চলছো, তোমাদের নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। তোমরা তওবা করে আমার বিধানের আনুগত্য করো, আমি

তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো এবং আমার রাহ্মত দানে ধন্য করবো। আর যদি তোমরা তোমাদের ভূমিকা পরিবর্তন না করো, তাহ্লে জেনে রেখো, আমি কঠিন শাস্তিদাতা।

পবিত্র কোরআনে অনেক স্থানে আল্লাহ্ তাঁর অসীম রাহ্মতের কথা বলেই নিজেকে কঠিন শাস্তিদাতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার অসংখ্য গুণের মধ্যে এটাও একটি অন্যতম গুণ যে, তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। তিনি তাঁর এই গুণটি উল্লেখ করে মানব জাতিকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর দাসত্বের পথ অনুসরণকারীদের জন্য তিনি যতটা দয়াবান ও করুণাময়, তিনি ঠিক ততটাই কঠোর বিদ্রোহী ও অবাধ্য বান্দাদের প্রতি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব আসার যে সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, সেই সীমা পর্যন্ত তিনি মানুষের যাবতীয় অপরাধ উপেক্ষা করতে থাকেন। যখন কোন ব্যক্তি বা জাতি সেই সীমা অতিক্রম করে, তখন তারা শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। তখন তাঁর শাস্তি এমন ভয়াবহ আকারে অবতীর্ণ হয় যে, সমস্ত কিছু মুহূর্তের ভেতরে লন্ডভন্ড হয়ে যায়। মানুষকে অবকাশ দেয়া হয়েছে, আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হবার পূর্বেই মানুষ যেন তওবা করে তাঁর ক্ষমা লাভ করে। তিনি ক্ষমাকারী–তাঁর এই গুণ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন–

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَاتَفْعَلُوْنَ–

তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করেন। (সূরা আশ্ শূরা-২৫)

মানুষের ভেতরে অপরাধ প্রবণতা বিদ্যমান। তারা অপরাধ করবে এবং পরক্ষণেই তারা আল্লাহর ভয়ে অনুতপ্ত হবে, অনুশোচনা করবে, সংঘটিত অপরাধের কারণে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে কাঁদবে, আল্লাহ্ খুশী হয়ে তাদেরকে ক্ষমা করবেন। মানুষ আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসরণ করবে, হঠাৎ করে তার দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হবে। শয়তানের প্রবঞ্চনায়, নফ্সের তাড়নায় গোনাহ্ সংঘটিত হবার পরে আল্লাহর ভয়ে তার অন্তর থর থর করে কেঁপে উঠেছে। সেজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে কাঁদছে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا–عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ–اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ–

আরো কিছু লোক এমন আছে, যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের আমল মিশ্রিত ধরনের, কিছু ভালো কিছু মন্দ। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাদের প্রতি আবার অনুগ্রহশীল হবেন–কারণ তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা আত্ তাওবা-১০২)

আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করবেন এবং বান্দা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় যা দান করবে, তা তিনি কবুল করবেন। আল্লাহ্ বলেন–

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

তারা কি জানে না যে, তিনিই আল্লাহ–যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের দান কবুল করেন, আর প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা তাওবা)

পৃথিবীতে যারা সামান্য ক্ষমতার অধিকারী, তাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি এমন নেই যে–তার বিরুদ্ধে কেউ অপরাধ সংঘটিত করলে বা তার নির্দেশ অমান্য করলে সে ডাক দিয়ে বলবে, 'আমি শাস্তি দেয়ার পূর্বেই অপরাধীরা এসো, আমার কাছে ক্ষমা চাও–আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো।' এমন কথা বলা তো দূরে থাক, অপরাধীকে ধরার জন্য পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হয়। পত্র-পত্রিকা প্রচার মাধ্যমে অপরাধীর ছবি দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা হয়, তাকে ধরে দিলে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসীম দয়ালু, তিনি তাঁর নবীকে বলছেন–আমার বান্দার মধ্যে যারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, আমার নির্দেশ অমান্য করে অপরাধ করেছে, তাদেরকে আপনি জানিয়ে দিন–

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ-اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا-اِنَّهٗ هُوَالْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ-

(হে রাসূল !) আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দারা যারা নিজের আত্মার ওপরে জুলুম করেছো আল্লাহর রহ্মত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিতভাবে আল্লাহ সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ফিরে এসো তোমাদের রব্ব-এর দিকে এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাও তোমাদের ওপরে আযাব আসার পূর্বেই। (আযাব এসে গেলে) তখন কোন দিক থেকেই আর সাহায্য পাওয়া যাবে না। (সূরা আয যুমার–৫৩-৫৪)

আল্লাহর কাছে খুশীর বিষয় এবং প্রিয় জিনিস

হযরত শু'আইব আলাইহিস্ সালাম বার বার তাঁর জাতিকে আহ্বান জানালেন, তারা যেন আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করে। কিন্তু তাঁর জাতির অবাধ্য নেতৃবৃন্দ আল্লাহর রাসূলের কথা মানলো না। তারা নবীর সাথে বিদ্রোহী ভূমিকা পালন করতে থাকলো। তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, পূর্বে হযরত নূহ, হযরত হূদ, হযরত সালেহ্ ও হযরত লূত আলাইহিস্ সালাম এসেছিলেন। হযরত লূত মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে গত হয়েছেন। তাঁর সাথে যারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল, তাদের যে কি করুণ পরিণতি ঘটেছে, সে ইতিহাস তোমরা অবগত রয়েছো। একই পরিণতি লাভ করার পূর্বেই তোমরা তোমাদের

রব্ব-এর কাছে ক্ষমা চাও, ফিরে এসো তাঁরই বিধানের দিকে। আল্লাহর রাহ্‌মত অনেক ব্যাপক এবং বিরাট। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে ক্ষা করে দিবেন। তিনি তাঁর জাতিকে লক্ষ্য করে কি কথা বলেছিলেন, তা সূরা হূদরে ৯০ নং আয়াতে আল্লাহ শোনাচ্ছেন–

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ-اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ-

শোন, তোমরা আপন রব্ব-এর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁরই দিকে ফিরে এসো। নিঃসন্দেহে আমার রব্ব বড়ই দয়াবান এবং আপন সৃষ্টির প্রতি অতীব ভালোবাসা পোষণকারী।

ইতিহাসে দেখা যায়, পৃথিবীর অনেক রাজা-বাদশাহ্ তার অধীনস্থ্ লোকদেরকে অযথা কষ্ট দিয়ে আনন্দানুভ করতো। রোম ও পারস্য সম্রাটদের অধিকাংশই ছিল প্রকৃতিতে নিষ্ঠুর। সর্বগ্রাসী হুতাশনে যখন রোম জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলো, আর রোম সম্রাট নিরো তখন মনের আনন্দে বাঁশী বাজাচ্ছিলো। তারা বিশাল আকৃতির খাঁচা বানিয়ে তার ভেতরে হিংস্র জানোয়ার রেখে দিতো। অসহায় প্রজাদের ধরে এনে সে খাঁচার ভেতরে ছেড়ে দিতো। হিংস্র বাঘ বা সিংহ কিভাবে মানুষটিকে আহার করতো তা তারা দেখতো। মানুষের মরণ আর্তনাদ তাদের আনন্দ বৃদ্ধি করতো। বর্তমানেও সেই একই ধারাবাহিকতা চলছে দেশে দেশে এবং জাতিতে জাতিতে।

শক্তিহীন দুর্বল জাতির ওপরে শক্তিশালী কোন জাতি আক্রোশভরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে পা ধরে ছুড়ে দিচ্ছে পাথর বা দেয়ালে। শিশুর মাথার মগজ ছিট্‌কে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মরণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে করতে শিশুটি মারা যাচ্ছে, ওদিকে শিশুর মা বুকফাটা আর্তনাদ করছে। এই দৃশ্য দেখে ঘাতকদল অট্টহাস্যে ফেটে পড়ছে। এভাবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানুষ চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিচ্ছে। অথচ এই মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে যে কতটা ভালোবাসেন, তা কোন দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো যাবে না।

ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, মানুষের জীবন ধারণ ও ভোগের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা কিভাবে গোটা সৃষ্টিজগতকে তার সেবায় নিয়োগ করেছেন। তিনি তাঁর রাহ্‌মত দিয়ে কিভাবে সৃষ্টিকে আবৃত করে রেখেছেন। এসব থেকেই তো প্রমাণ হয়, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে কতটা ভালোবাসেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা হৃদয়হীন, নির্দয় ও পাষাণের মতো সামান্যতম আচরণও তাঁর বান্দাদের সাথে করেন না। নিজের সৃষ্টির প্রতি তাঁর কোন শত্রুতা থাকতে পারে না। সুতরাং তিনি অযথা এবং অকারণে বান্দাকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিবেন, কোন ধরনের কষ্টে ফেলবেন, বান্দাদের কষ্ট দেখে তিনি আনন্দিত হবেন, এ ধরনের চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই।

বান্দাহ্ যখন তাঁর বিধানের সাথে বিদ্রোহের সীমা অতিক্রম করে, পৃথিবীতে একের পর এক অশান্তি আর বিপর্যয় সৃষ্টি করতেই থাকে, বার বার সতর্ক করার পরও এসব অপকর্ম থেকে বিরত হয় না, তখন তাদেরকে শাস্তি দেয়া ইনসাফের দাবি হয়ে যায়। অন্যথায় বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা তো এমন যে, বান্দার অসংখ্য অপরাধ তিনি এমনিতেই ক্ষমা করে দেন। বান্দাহ্ যত অপরাধই করুক না কেন, সে তার কৃতকর্মের দরুণ লজ্জিত হয়ে–অনুতপ্ত হয়ে

আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলেই তিনি তাঁর রাহ্মতের বাহু প্রসারিত করে তাকে কাছে টেনে নেন।

এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে যে, রাসূলের একজন সাহাবী পথ চলতে গিয়ে অনুভব করলেন, পথিপার্শ্বে একটি ঝোপের ভেতরে পাখির ছানা রয়েছে। তিনি কৌতুহল বশতঃ পাখির ছানাগুলো নিজের চাদরের ভেতরে নিলেন। ছানাগুলোকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে−দেখে তাদের মা পাখিটি বার বার সাহাবীর মাথার ওপরে এসে উড়তে লাগলো। তিনি তাঁর চাদর মেলে ধরলেন। মা পাখিটি নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ছানাগুলোর ওপরে এসে বসে পড়লো। সাহাবী মা পাখি ও ছানাগুলোসহ দরবারে রেসালাতে নিয়ে এলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! দেখুন ছানার প্রতি মা পাখিটির কত মায়া ! পাখিটি জানে, সে বন্দী হতে যাচ্ছে এবং তাকে জবেহ্ করা হতে পারে। তবুও সে তাঁর প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ছানার কাছে এলো।'

সাহাবীর কথা শুনে আল্লাহর নবী বললেন, সন্তানের প্রতি মায়ের কত মায়া তা তুমি আমাকে দেখাচ্ছো। তুমি কি জানো, বান্দাকে আল্লাহ্ কত ভালোবাসেন ? সমুদ্রে হাতের সবচেয়ে ছোট্ট আঙ্গুলটি ডুবিয়ে তুললে তার অগ্রভাগে একফোটা পানি ঝরে পড়ার অপেক্ষায় থাকে। আল্লাহ সেই একফোটা মায়া তাঁর সমস্ত সৃষ্টির ভেতরে বন্টন করে দিয়েছেন। এই সামান্য মমতার অধিকারী হয়ে মা তার সন্তানের জন্য প্রাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তাহলে যে আল্লাহ মমতা সৃষ্টি করেছেন, বান্দার প্রতি সেই আল্লাহর কতটা মমতা রয়েছে, তা কি তোমরা কল্পনা করতে পারো ?

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মমতা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে মানুষকে ধারণা দিয়েছেন। তিনি সাহাবীদেরকে বলেন, একটি উটের ওপরে জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ সজ্জিত করে তোমাদের কেউ মরুভূমিতে পথ চলতে থাকলো। তারপর এমন এক স্থানে সে উটটি হারিয়ে গেল, যেখানে বেঁচে থাকার মতো খাদ্য এবং পানীয় কিছুই নেই। এমনকি কোন ধরনের লতা-গুল্ম কিছুই নেই। লোকটি সাম্ভাব্য উপায়ে উটটির সন্ধান করে না পেয়ে নিজের জীবনের আশা ত্যাগ করে নিরাশ হয়ে গাছের নিচে হতাশ ভঙ্গীতে বসে পড়লো। এমন সময় যদি জীবন ধারনের উপকরণে সজ্জিত উটটি এসে লোকটির সম্মুখে উপস্থিত হয়, লোকটির কেমন আনন্দ হবে ?

বেঁচে থাকার সমস্ত আশা-ই যেখানে মুছে গিয়েছিল, অনাহার আর পিপাসার চরম যন্ত্রণা ভোগ করে নিষ্ঠুর মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করা ব্যতিত দ্বিতীয় পথ যখন খোলা ছিল না, তখন জীবিত থাকার যাবতীয় উপকরণ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে গেল, এ অবস্থায় লোকটি যতটা আনন্দিত হবে, তার থেকে অনেক বেশী আনন্দিত হন আল্লাহ্ তা'য়ালা−যখন তাঁর কোন অবাধ্য বান্দাহ্, গোনাহ্গার বান্দাহ্ অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে তাঁর দিকে ফিরে আসে।

আল্লাহ যে রাহ্মান ও রাহীম−তাঁর দয়ার পরিধি কোন সীমার গন্ডীতে আবদ্ধ নেই, উল্লেখিত দৃষ্টান্ত দিয়ে রাসূল সেটাই বুঝিয়েছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একবার বেশ কিছু যুদ্ধবন্দীকে দরবারে রেসালাতে উপস্থিত করা হয়েছিল। বন্দীদের মধ্যে

একজন নারীও ছিল। সে নারীর দুগ্ধপোষ্য শিশুটি হারিয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর মা উন্মাদ প্রায় হয়ে উঠেছিল। আপন গর্ভজাত সন্তানের মমতায় মহিলাটির অবস্থা এমনই হয়ে পড়েছিল যে, সামনে কোন শিশু দেখলেই সে তাকে গভীর মমতায় নিজের বুকের মাঝে টেনে নিয়ে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করতো। আল্লাহর রাসূল মমতভরা দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কি বলতে পারো, এই মা কি তার নিজের শিশু সন্তানকে নিজের হাতে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে ?' আমরা উত্তর দিলাম, 'অসম্ভব ! নিজের শিশুকে আগুনে নিক্ষেপ করা তো দূরের কথা, শিশু যদি হঠাৎ করে আগুনে পড়ে যায়, মা তাকে জীবনের শেষ শক্তি দিয়ে হলেও বাঁচানোর চেষ্টা করবে।' তখন আল্লাহর নবী বললেন-

الله ارحم بعباده من هذه بولدها-

এই মা তাঁর সন্তানের জন্য যত না মমতাময়ী, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি তারচেয়ে অনেকগুণ বেশী দয়াবান।

মানুষ অসংখ্য অন্যায় করে এবং অন্যায় করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে গ্রেফতার করেন না। তিনি দয়া করে তাঁর বান্দাকে সময় দিতে থাকেন। যদি বান্দাহ্ অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, ফিরে আসে আবার সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে-আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'য়ালা অভাব শূণ্য, তাঁর দরবারে কোন জিনিসের অভাব নেই। কিন্তু দুটো জিনিসের অভাব রয়েছে মহান আল্লাহর দরবারে। এ জন্য সেই দুটো জিনিসকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন। সে দুটো জিনিস হলো, কান্না এবং কাকুতি-মিনতি। কারণ ফেরেশতারা কোন গুনাহ্ করে না। তাঁরা গোনাহ্ থেকে মুক্ত। তাঁদের কোন জিনিসের প্রয়োজন হয় না। এ কারণে তাঁরা আল্লাহর কাছে কোন জিনিস কাকুতি-মিনতি করে চায় না। কিন্তু মানুষের ভেতরে পাপ প্রবণতা বিদ্যমান ও তাদের জীবন ধারনের জন্য অসংখ্য জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে। মানুষ গোনাহ্ করে এবং পরবর্তীতে সে যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে কান্নাকাটি করে, আল্লাহ বড় খুশী হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। আর বান্দা যখন কোন প্রয়োজনের জন্য দু'হাত তুলে তাঁর দরবারে কাকুতি-মিনতি করে চাইতে থাকে, আল্লাহ্ তখন ভীষণ খুশী হন।

কোন কোন কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বান্দার কান্নাকাটি ও কাকুতি-মিনতির দৃশ্য দেখে আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করেন, আমার বান্দাহ্ কেন কাঁদছে ? ফেরেশতারা আল্লাহর প্রশংসা করে বলে, 'হে আল্লাহ ! তোমার বান্দাহ্ তোমারই ভয়ে কাঁদছে।' আল্লাহ বলেন, 'বান্দাহ্ কি আমাকে এবং আমার জাহান্নামকে কি দেখেছে ?' তাঁরা জবাব দেন, 'না, তোমার বান্দাহ্ তোমাকে এবং তোমার জাহান্নামকে না দেখেই বিশ্বাস করেছে।' আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাক্ষী থাকো, আমার যে বান্দাহ্ আমাকে না দেখে আমার ভয়ে কাঁদে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।'

মানুষ সারা দিন পরিশ্রম করে আল্লাহর দেয়া রিয্ক অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে। রাতে এশার নামাজ আদায় শেষে আল্লাহর দেয়া রিয্ক আহার করে কর্মক্লান্ত দেহটা বিছানায় এলিয়ে দেয়।

ক্ষণিকের মধ্যেই গভীর ঘুম এসে তাকে অচেতন করে ফেলে। আল্লাহর দাসত্বে সচেতন তার অন্তর শেষ রাতে তাকে জাগিয়ে দেয়। প্রচন্ড ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে দেহের ওপর থেকে শীত থেকে হেফাজতের উপকরণ সরিয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যায়। বান্দার এ ধরনের কর্মকান্ড আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত ভালোবাসেন। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে ডেকে দেয়া তো দূরের কথা, ক্ষেত্র বিশেষে চাইলেও পাওয়া যায় না। আর করুণাময় আল্লাহ শেষ রাতে বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন, 'কে আছো অভাবগ্রস্থ, আমার কাছে চাও–আমি অভাব দূর করে দেবো। তোমাদের মধ্যে যে ঋণগ্রস্থ, আমার কাছে বলো–আমি ঋণ পরিশোধের পথ করে দেবো। তোমাদের মধ্যে যারা রোগী, আমাকে বলো–আমি আরোগ্য দান করবো। তোমরা যারা পর্বত সমান গোনাহ্ করেছো, আমার কাছে ক্ষমা চাও–আমার রাহ্মত অনেক বিশাল, আমি তোমাদের গোনাহ্ ক্ষমা করে দেবো।' এভাবে দয়াময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন।

বান্দাহ্ একমাত্র তাঁরই কাছে কেঁদে কেঁদে নিজেকে নিবেদন করবে, নিজের যাবতীয় প্রয়োজনের কথা তাঁরই কাছে নিবেদন করবে, এটাই আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দের জিনিস। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। যেমন দুধ দোহন করে নেয়ার পরে পুনরায় তা ওলানে প্রবেশ করানো অসম্ভব। আল্লাহর পথের ধূলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না। (তিরমিযী)

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে এবং যে চোখ আল্লাহর পথে রাত জেগে প্রহরা দিয়েছে। (তিরমিযী)

কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, কোন ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয় যে, গোনাহ্ করতে করতে তার আমলনামা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তারপর সে অনুতপ্ত হলো এবং তওবা করে আল্লাহর ভয়ে কাঁদলো, তার চোখের পানি গড়িয়ে নাকের অগ্রভাগ ছাড়িয়ে যাবার পূর্বেই ক্ষমার যোগ্য গুনাহ্সমূহ আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে তাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْا-اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

আর যারা খারাপ কাজ করার পরে (অনুতপ্ত হয়ে) তওবা করে ও ঈমান আনে, নিশ্চিতই এই তওবা ও ঈমানের পরে তোমার রব্ব অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (আ'রাফ-১৫৩)

হযরত ইউছুফ আলাইহিস্ সালামকে হত্যা করার লক্ষ্যে কূপে নিক্ষেপ করা হলো। তাঁর পিতার সাথে তাঁরই অন্যান্য ভাইগণ প্রতারণামূলক কথা বললো। তারপর কালের ব্যবধানে একদিন আল্লাহ তা'য়ালা সত্য সবার সম্মুখে প্রকাশ করে দিলেন। তখন অপরাধী সন্তানরা

পিতা ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের কাছে আবেদন জানালো, 'আপনি আমাদের পাপ ক্ষমার জন্য দেয়া করুন। আমরা সত্যই অপরাধী।' জবাবে হযরত ইয়াকুব (আঃ) মহান আল্লাহর অসীম করুণা ও ক্ষমাশীলতার কথা তাঁর অপরাধী সন্তানদেরকে কাছে এভাবে বললেন–

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّى-اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ-

সে বললো, আমি আমার রব্ব-এর কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমার আবেদন করবো, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা ইউসুফ-৯৮)

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের অন্যান্য সন্তানদের অপরাধ কোন মামুলি অপরাধ ছিল না। তাদের পিতা ও ভাই ছিলেন আল্লাহর নবী। তারা আল্লাহর একজন নবীর সাথে করেছিল প্রতারণা ও আরেকজন নবীকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়ার লক্ষে কুপে নিক্ষেপ করেছিল। এতবড় মারাত্মক অপরাধ করার পরেও আল্লাহর নবী সেই অপরাধীদেরকে শোনাচ্ছে, অপরাধ করেছো তো কি হয়েছে ! তোমাদের অপরাধের তুলনায় আল্লাহর রাহ্মত অনেক বিশাল। তিনি করুণাময়-ক্ষমাশীল। তাঁর কাছেই ক্ষমা চাও, তিনি ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহ তা'য়ালা হতাশা পছন্দ করেন না। তাঁর বান্দারা অপরাধ করে হতাশ হয়ে পড়বে যে, তাদের অপরাধের বুঝি ক্ষমা নেই, নিশ্চিতই তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। মহান আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমে এই শ্রেণীর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিতে বলছেন–

نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

হে নবী ! আমার বান্দাহ্দেরকে জানিয়ে দাও, আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (হিজর-৪৯)

বান্দার প্রতি আল্লাহর কত দয়া ! পৃথিবীর বুকে এমন অসংখ্য পথ রয়েছে, যেখানে প্রয়োজনীয় কোন বোঝা বহন করে মানুষের পক্ষে পৌছানো অত্যন্ত কষ্টদায়ক। বান্দা কষ্ট করবে আর আল্লাহ দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন, তা হতে পারে না। বান্দার কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেন না। বান্দাকে যেন কষ্ট করতে না হয়, এ জন্য বোঝা বহন করার উপযুক্ত পশু তিনি সৃষ্টি করে দিলেন। আল্লাহ বলেন–

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلاَّ بِشِقِّ الْاَنْفُسِ-اَنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

এরা (পশুদল) তোমাদের ভার-বোঝা বহন করে এমন এমন স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায় যেখানে তোমরা চরম কঠিন পরিশ্রম ব্যতিত পৌছতে সক্ষম হতে না। প্রকৃত বিষয় হলো, তোমাদের রব্ব বড়ই অনুগ্রহ সম্পন্ন এবং মেহেরবান। (সূরা আন নাহ্ল-৭)

এই পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু রয়েছে, তার মালিক হলেন আল্লাহ। কোন মানুষ তাঁর দাসত্ব করলেও তাঁর ক্ষমতা এতটুকু বৃদ্ধি লাভ করে না এবং না করলেও এতটুকু কমে না। তাঁর প্রশংসা করলে বা না করলে তাঁর ধনভান্ডার এবং ক্ষমতায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। আল্লাহ বলেন–

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ-وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ-

আকাশ ও যমীনে এবং এর ভেতরে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুই তাঁর। তিনি যে মহাধনী ও সর্ব প্রশংসিত এতে কোন সন্দেহ নেই। (সূরা হজ্জ-৬৪)

সমস্ত কিছুই তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনি তাঁর বান্দাকে অপরিসীম ভালোবাসেন। পৃথিবীর সমস্ত কিছু তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কর্মোপযোগী করে দিয়েছেন, সমস্ত সৃষ্টিকে তিনি বান্দার খেদমতে নিয়োজিত করেছেন। আকাশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন, যেন তা তাঁর বান্দাদের জন্য কোন বিপদের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। আল্লাহ বলেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَلَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِه-وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلاَّ بِاِذْنِه-اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

তুমি কি দেখো না, তিনি পৃথিবীর সব কিছুকে তোমাদের জন্য অনুগত করে রেখেছেন এবং তিনিই নৌযানকে নিয়মের অধীন করেছেন, যার ফলে তাঁর আদেশে তা সমুদ্রে বিচরণ করে আর তিনিই আকাশকে এমনভাবে ধারণ করে আছেন যে, তাঁর অনুমতি ব্যতিত তা যমীনের ওপরে আপতিত হতে পারে না ? প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ মানুষের অধিকারের ব্যাপারে বড়ই দয়ার্দ্র ও অনুগ্রহ সম্পন্ন। (সূরা হজ্জ-৬৫)

আল্লাহর স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা আর অনুগ্রহের সুযোগ গ্রহণ করে একশ্রেণীর মানুষ যা খুশী তাই করতে থাকে। এই শ্রেণীর লোকগুলো আল্লাহর অনুগ্রহকে দুর্বলতা মনে করে। প্রকৃত বিষয় হলো, সীমাতিক্রম করলে আল্লাহ যে বরদাশ্ত করেন না, এ কথা এরা ভুলে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ-

প্রকৃত সত্য বিষয় হলো, তোমার রব্ব প্রবল পরাক্রান্ত এবং করুণাময়। (সূরা শূ'আরা-৯)

সুতরাং আল্লাহর করুণায় সিক্ত হয়ে কেউ যদি বিদ্রোহীর ভূমিকা অবলম্বন করে, তাহলে তাঁর সতর্ক হওয়া উচিত যে, আল্লাহ শুধু করুণাই করেন না, তিনি অসীম ক্ষমতাশালী। যারা তাঁর দ্বীনের সাথে বিরোধিতা করে, তাদেরকে শায়েস্তা করতে তাঁর কোন বেগ পেতে হয় না। ইসলামের শত্রুরা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে, তাদের ষড়যন্ত্র দেখে আল্লাহর সৈনিকদেরও ভয় পাবার বা হতাশ হবার কোন কারণ নেই। আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে, তিনি তাঁর করুণা দিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী দলকে হেফাজত করবেন। আল্লাহ বলেন–

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ-الَّذِىْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ-وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ-

এবং সেই মহাশক্তিশালী ও করুণাময়ের ওপর ভরসা করো। যিনি তোমাকে সেই সময়ও দেখতে থাকেন যখন তুমি দাঁড়াও এবং সিজ্‌দাকারীদের মধ্যে তোমার ওঠা-বসা ও নড়া চড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। (সূরা শূ'আরা-২১৭-২১৯)

বাতিলের নির্যাতনের মুকাবিলায় আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকদেরকে প্রতি পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি দয়াবান, আমার ওপরে ভরসা করো। তোমরা যখন নামাজে দাঁড়াও, আমার কাছে সাহায্য চাও–আমি তা দেখি। সুতরাং ময়দানে তোমরা একা নও। আমি আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছি। নির্ভয়ে ময়দানে এগিয়ে যাও।

আল্লাহ তা'য়ালা এমনটি চান না যে, তিনি তাঁর বান্দাদের দিয়ে জাহান্নাম পরিপূর্ণ করতে চান,। বান্দাকে যেন জাহান্নামে প্রবেশ করতে না হয়, এ জন্যই তিনি নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব দান করেছেন। তাঁর এত আদরের সৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্থ হবে, এটা তাঁর কাম্য নয়। তিনি তাঁর সীমাহীন দয়ার কথা বান্দাকে জানিয়ে দিয়েছেন এ কারণে যে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বান্দাহ্ যেন তাঁর দয়ার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহর ক্ষমা আর রাহ্‌মত তাঁর বান্দার পেছনে ছুটে বেড়ায়। বান্দাহ্ যদি একহাত আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহর রাহ্‌মত তার দিকে দশহাত ছুটে আসে। বান্দার পাপ যদি হিমালয় পর্বত সমান হয়, আল্লাহর রাহ্‌মত তখন আটলান্টিক মহাসাগরের সমান হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাঁর দয়ার কথা এত জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, তা একত্রিত করতে গেলে বিশালাকারের গ্রন্থ প্রণয়ন করতে হবে।

মানুষ পাপ করে, পাপ করতে করতে হৃদয় এতটা কঠোর হয়ে যায় যে, আল্লাহর ভয়ে আর কান্না আসে না। আল্লাহ বলেন, কান্না না এলেও কাঁদার চেষ্টা করো, কাকুতি-মিনতি করো–আমি রাহ্‌মান ও রাহীম–ক্ষমা করে দেবো। সুতরাং, হতাশ হবার কোন কারণ নেই। অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে ফিরে এলেই আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি করুণাময়–তাঁর এই গুণাবলীর কথাই সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে যখন বলা হলো, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য–যিনি জগতসমূহের রব্ব। প্রশ্ন এলো, তাঁর কি আরো কোন গুণ আছে ? আল্লাহর শেখানো বাক্যে বান্দাহ্ জানিয়ে দিলো, তিনি রাহ্‌মান ও রাহীম–অসীম দয়াবান ও করুণাময়।

যিনি বিচার দিবসের মালিক

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

সূরা ফাতিহার শুরুতেই এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সূরাটি একটি অভিনন্দন-পত্রের মতো এবং এটা আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদেরকে শিখিয়েছেন। বান্দাহ্ যখন একমাত্র আল্লাহরই প্রশংসা করে তখন প্রশ্ন আসে–তুমি কার প্রশংসা করছো ? বান্দাহ্ জবাবে জানিয়ে দেয় যে, প্রশংসা তাঁরই করা হচ্ছে, যিনি জগতসমূহের রব্ব। আবার প্রশ্ন আসে, সেই রব্ব-এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য কি কি ? আল্লাহর শেখানো বাক্যে বান্দাহ্ জানিয়ে দেয়, তিনি রাহ্মান–তিনি রাহীম এবং বিচার দিনের মালিক। সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতে মহান আল্লাহর অসীম দয়া আর করুণার কথা বলা হলো। এমন করুণা আর দয়ার কথা জানানো হলো যে, তার কোন সীমা নেই। তাঁর দয়া আর করুণা কোন সীমার গন্ডীতে আবদ্ধ নয়।

এই কথার পাশাপাশি এ কথাও জানানো হলো যে, তিনি শুধু দয়ালুই নন–তিনি বিচার দিনেরও একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি দয়া করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার পূর্বেই তিনি মানুষের জন্য যা প্রয়োজন হবে, তা মওজুদ করেছেন এবং গোটা সৃষ্টিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এসবই তাঁর দয়া আর করুণার মূর্ত প্রকাশ।

দয়া আর করুণার বিষয়টি এমনই যে, শক্তি ব্যতিত তার প্রকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। শক্তি ও সামর্থ না থাকলে দয়া, অনুগ্রহ ও করুণার প্রকাশ ঘটানো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কেউ যদি কাউকে অর্থ দিয়ে, কোন জিনিস দিয়ে দয়া প্রদর্শন করতে চায়, তাহলে প্রথম শর্তই হচ্ছে, যিনি দয়া প্রদর্শন করবেন, তার কাছে অর্থ বা সেই বস্তু মওজুদ থাকতে হবে–যা দিয়ে তিনি দয়া প্রদর্শন করবেন। একজন মানুষ এসে আরেকজন মানুষের কাছে যখন বলে, 'এই পরিমাণ অর্থ সাহায্য করে আপনি আমার প্রতি দয়া করুন।' সাহায্য প্রার্থী যে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এ কথাটি বলবে, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে যে, দান করার মতো শক্তি ও সামর্থ লোকটির রয়েছে। জালিমের জুলুম থেকেও কেউ যদি কাউকে হেফাজত করতে চায় অর্থাৎ দয়া প্রদর্শন করতে চায়, তাহলে তাকে শক্তির অধিকারী হতে হবে। শক্তি না থাকলে জালিমকে সে কিভাবে পরাস্ত করবে এবং মজলুমকে হেফাজত করবে ?

সুতরাং, আল্লাহর যে অসীম দয়া ও করুণার প্রকাশ সৃষ্টির প্রতি পরতে পরতে ঘটেছে, তার কণামাত্র দেখেও যে কোন নির্বোধ লোকও অনুভব করতে সক্ষম যে, তিনি যেমন অসীম দয়ালু–তেমনি সীমাহীন শক্তি ও সামর্থের অধিকারী। যে কোন ধরনের শক্তির একচ্ছত্র অধিপতি তিনি। সমস্ত শক্তির একচ্ছত্র মালিক না হলে তাঁর পক্ষে এত বিশাল করুণা করা সম্ভব হতো না। আর মানুষ ঐ অসীম করুণাময় আর মহাশক্তিশালীরই গোলাম–তাঁরই ছত্রচ্ছায়ায় মানুষ এই পৃথিবীতে প্রতি পালিত হচ্ছে।

মানুষের ভেতরে একটা প্রবণতা রয়েছে যে, মানুষ যখন কোন মহাপ্রতাপশালীর ছত্রচ্ছায়া লাভ করে, তখন সে নিজেকেও একজন শক্তিশালী বলে কল্পনা করে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়, একজন লোক দেশের চেয়ারম্যান-মেম্বারের পদ থেকে শুরু করে মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের পদে

আসীন হয়, তখন তার আপন আত্মীয়-স্বজনের মনে এ ধারণা জাগে যে, 'আমাদের অমুক বিশাল ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই ঘটাতে পারেন।' এই ধারণা মানুষের ভেতরে সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শুধু তাই নয়, ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন হবার কারণে মানুষ নিজেকেও ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে এবং তার আচার-আচরণ, কথা-বার্তায় প্রকাশও ঘটে থাকে। বর্তমান পৃথিবীতে তো এ কথা সর্বজনবিদিত যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের সন্তান-আত্মীয়-স্বজনও নিজেদেরকে ক্ষমতাদর্পী বলে মনে করে এবং তাদের দাপটে দেশের সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

ক্ষমতাসীন ব্যক্তির ছত্রচ্ছায়া লাভ করে একজন মানুষের যদি অবস্থা এই হয়, তাহলে ঐ মহাশক্তিশালী আল্লাহর গোলাম–যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আমি অসীম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক, আমি অনুক্ষণ তোমাদের সাথে রয়েছি, আমার ওপরেই ভরসা করো, আমার দয়া ও অনুগ্রহ তোমাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে, আমি তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটাবো, তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবো।' সেই গোলামদের পক্ষে বাতিলের মোকাবেলায় দুর্বলতা প্রদর্শনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর অসীম দয়া, করুণা ও প্রচন্ড ক্ষমতার কথা প্রকাশ করে পরোক্ষভাবে আল্লাহ তাঁর সৈনিকদেরকে এ কথা বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, পৃথিবীতে সামান্য ভঙ্গুর ক্ষমতার অধিকারীদের সন্তান, আত্মীয়-স্বজনদের আচার-আচরণ থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। ক্ষমতার অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিমন্ডলে বাস করে তারা যদি বিপুল ক্ষমতা প্রদর্শন করতে চায়, তাহলে তোমাদের কি হলো–তোমরা তো অসীম ক্ষমতার অধিকারীর ছত্রচ্ছায়া লাভ করেছো। কেন তোমরা বাতিলদের দেখে কম্পিত হচ্ছো ? পৃথিবী থেকে শয়তানি শক্তিকে উৎখাত করার লক্ষ্যে কেন তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়ছো না ?

ইসলামী আন্দোলন তথা আল্লাহর পথের সৈনিকদেরকে সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় তৃতীয় আয়াতের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা দান করা হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ তাঁর বিদ্রোহী বান্দাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, তোমরা নিজেদেরকে অপ্রতিরোধ্য মনে করো না। আমার অসীম ক্ষমতা ও সামর্থ আছে বলেই আমার দয়া ও করুণাও অসীম এবং যার প্রকাশ তোমরা দেখতে পাচ্ছো। আমার দয়ার সুযোগে তোমরা সীমালংঘন করো না। যে অসীম দয়া দিয়ে তোমাদেরকে প্রতিপালিত করছি, সেই অসীম শক্তির সামান্য প্রভাব প্রয়োগ করে মুহূর্তের ভেতরে তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। সুতরাং সময়-সুযোগ থাকতে সতর্ক ও সংশোধন হও।

আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতে নিজের অসীম অনুগ্রহের কথা জানানোর সাথে সাথে তৃতীয় আয়াতে নিজেকে 'বিচার দিবসের মালিক' বলে প্রকাশ করার মাধ্যমে এ কথাই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা স্বাধীন নও। যা খুশী তাই তোমরা আমার দয়ার সুযোগে ঘটাতে পারো না। সামান্য স্বাধীনতা তোমাদেরকে দান করা হয়েছে। স্বাধীনতার সঙ্কীর্ণ পরিবেশে নিজেদেরকে দুর্দমনীয়, অপ্রতিরোধ্য-সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করো না। তোমাদের সমস্ত কাজের হিসাব আমার কাছে দিতে হবে। জবাবাদিহির চেতনা শানিত রেখে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করো।

পৃথিবীতে মানব সমাজে এ ধরনের অসংখ্য ব্যক্তি রয়েছেন, যারা তাদের দান, উদারতা ও ঔদার্য্যের কারণে মানুষের কাছে দয়ালু হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। সমাজে এই ধরনের প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল লোকগুলোই সাধারাণতঃ মধ্যমণি হয়ে থাকে। সামাজিক সালিশ-বিচারের দায়িত্বও এদের ওপরে নিপতিত হয়। অপরাধ করে যারা ধরা পড়ে বিচারের মুখোমুখী হয়, তখন তারা মনে মনে আশা পোষণ করে, বিচারে রায় দেয়ার কর্তৃত্ব যার হাতে-তিনি দয়ালু ব্যক্তি। তিনি অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে বিচার পর্ব সমাধা করবেন। ক্ষেত্র বিশেষে ঘটেও তাই।

একদিকে পৃথিবীর বিচারকগণ পক্ষপাতিত্ব করার প্রবণতা থেকে মুক্ত নন-অপরদিকে যদি তিনি দয়ার্দ্র চিত্তের অধিকারী হন, তাহলে তার এই মানসিক প্রবণতাই ক্ষেত্র বিশেষে তাকে বাধ্য করে অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে। অপরাধী যখন করুণ দৃষ্টিতে বিচারকের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নীরব ভাষায় ক্ষমার আবেদন করতে থাকে, দয়ালু বিচারকের মনে করুণার উদ্রেক ঘটে। যেখানে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া প্রয়োজন ছিল, সেখানে তার করুণা তাকে ক্ষমা করতে বাধ্য করে। এভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হন। চক্ষু লজ্জার কারণে প্রতিপত্তিশীল দয়ালু বিচারককে তারা এ কথাও বলতে সাহস করে না, 'আপনার বিচার সঠিক হলো না।' বাধ্য হয়ে তারা বিচারের রায় মেনে নেন। তাহলে দেখা গেল, পৃথিবীতে দয়ালু বিচারকের দ্বারাও ক্ষেত্র বিশেষে অবিচার সংঘটিত হয়।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর দ্বারা এ ধরনের অবিচার সংঘটিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি অসীম দয়ালু-কিন্তু তাঁর দয়া ন্যায়-নীতির গন্ডী অতিক্রম করে শাস্তি লাভের যোগ্য কোন অপরাধীর ওপরে আপতিত হয় না। দয়া ও করুণার অনিবার্য দাবিই হলো ন্যায় বিচার সংঘটিত করা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সেটাই করবেন। তিনি দয়ালু-এ কারণেই প্রত্যেকেই যার যার প্রাপ্য সেদিন বুঝে পাবে। পৃথিবীতে মানুষ বিচারক নানাভাবে প্রভাবিত হতে পারে। লঘু শাস্তি লাভের যোগ্য এক ব্যক্তির বিচার পর্ব আদালাতে শুরু হলো, এ অবস্থায় অপরাধী ব্যক্তির প্রতি আক্রোশ বশতঃ দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলো ক্রমাগত এমন ধরনের সংবাদ পরিবেশন করে চললো যে, দেশের সাধারণ জনগণও বিচারাধীন ব্যক্তির প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। বিচারক তখন দেশের জনগণের সেন্টিমেন্ট দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য হন। তিনি লঘু শাস্তির পরিবর্তে গুরুদন্ড দিয়ে বসেন।

এভাবে বিচারক সেন্টিমেন্টের কাছে, প্রভাব-প্রতিপত্তির কাছে, অর্থের কাছে, সুপারিশের কারণে প্রভাবিত হতে বাধ্য হন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এসব দুর্বলতা থেকে মুক্ত। তাঁর বিচার কার্য কোনকিছুর প্রভাবে প্রভাবিত হবে না। কোন নবী-রাসূলেরও ক্ষমতা নেই যে, তাঁরা কোন অপরাধীর পক্ষে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন-আর এমন ধরনের সুপারিশ তাঁরা করবেন, এমন ধারণা পোষণ করাও তাদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি আঘাত করার শামিল। নবী-রাসূল তাদের জন্যই সুপারিশ করবেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে যারা সুপারিশ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সুতরাং, বিচার দিবসের তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি-সেদিন তাঁর বিচারে হস্তক্ষেপ করার মতো কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই।

কেন বিচার দিবসের প্রয়োজন

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। পৃথিবী ও আকাশ এবং এর মধ্যস্থিত কোন কিছুই নিছক খেয়ালের বশে সৃষ্টি করা হয়নি। তাঁর এই সৃষ্টি কোন শিশুর খেলনার মতো নয়। শিশুদের মতো মনের সান্ত্বনা লাভ ও মন ভুলানোর জন্য কোন খেলনার মতো করে এই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়নি যে, শিশু কিছুক্ষণ খেলে তৃপ্তি লাভ করার পরে উদ্দেশ্যহীনভাবে একে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল অথবা অবহেলা আর অনাদরে রেখে দিল বা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে দিল। নিজের দেহ থেকে শুরু করে আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির প্রতি সাধারণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই এমন ধারণা করার কোন অবকাশ থাকে না। বরং তাঁর এ সৃষ্টি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, ঐকান্তিকতা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, এ কথা দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে যায়।

সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি পরতে পরতে বিরাট উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এবং এর প্রতিটি অধ্যায়ে লক্ষ্যও স্থির করা হয়েছে। সৃষ্টির অভ্যন্তরীণ একটি পর্যায় সমাপ্ত ও অতিবাহিত হবার পরে আল্লাহ তা'য়ালা নিশ্চিতভাবে যাবতীয় কার্যের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন এবং তার ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী অধ্যায় রচিত করবেন। তিনি সমগ্র সৃষ্টিসমূহকে মহাসত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরে সংস্থাপিত করেছেন। সৃষ্টির প্রতিটি দিক ন্যায়বিচার, সত্যতার নিময়-নীতি ও বিচক্ষণতার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছুর বাদশাহী একমাত্র তাঁরই এবং তিনি যখন ইচ্ছা পোষণ করবেন, তখনই আদেশ দানমাত্র সৃষ্টির প্রতিটি অনু-পরমাণু তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে বাধ্য। কোরআন বলছে–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ-وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ-قَوْلُهُ الْحَقِّ-وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ-عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ-وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ-

তিনিই আকাশ ও যমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং যেদিন তিনি বলবেন, হাশর হও, সেদিনই হাশর হবে। তাঁর কথা সর্বাত্মকভাবে সত্য এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন নিরঙ্কুশ বাদশাহী তাঁরই হবে। গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতায়, তিনি অত্যন্ত সুবিজ্ঞ, সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। (সূরা আল আন'আম-৭৩)

সৃষ্টিজগতে সাধারণ মানুষ চর্মচোখে যা কিছু দেখতে পাচ্ছে এবং বিজ্ঞানীগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যা কিছু পর্যবেক্ষণ করছেন, সবকিছুর ভেতরে প্রতিনিয়ত একটি পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পরিবর্তন সৃষ্টির শুরু থেকেই চলে আসছে। উর্ধ্বজগত ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে। সৃষ্টির নিপুণতা ও বিজ্ঞ-কৌশলীর নান্দনিক নির্মাণ শৈলী দেখে এ কথা ভাবার কোন যুক্তি নেই যে, এসব কিছু শিশুর খেলার ছলে সৃষ্টি করা হয়েছে।

বরং সৃষ্টিসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টির ব্যাপারে গভীর উদ্দেশ্যবাদের স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান দেখা যায়। সুতরাং, স্রষ্টাকে যখন বিজ্ঞানী, যুক্তিবাদী বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান

হচ্ছে এবং তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার স্পষ্ট নিদর্শন মানুষের সামনে বিরাজমান, তখন তিনি মানুষকে জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি, নৈতিক চেতনা, স্বাধীন দায়িত্ব ও প্রয়োগ-ক্ষমতা দেয়ার পর তার জীবনে কৃত ও সংঘটিত কার্যাবলীর কোন হিসাব গ্রহণ করা হবে না এবং বিবেক ও নৈতিক দায়িত্বের ভিত্তিতে শাস্তি ও পুরস্কার লাভের যে অধিকার অনিবার্যভাবে জন্মে থাকে, তা স্রষ্টা নিষ্ফল ও ব্যর্থ করে দিবেন এ ধারণার কোন সত্যনিষ্ঠ ভিত্তি থাকতে পারে না। আল্লাহ বলেন–

مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ-

আল্লাহ তা'য়ালা এসব কিছুই স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ইউনুছ-৫)

বর্তমান কালে যেমন কিছু সংখ্যক মানুষ ধারণা করে, পৃথিবীর এই জীবনই শেষ জীবন। পুনরায় আর জীবন লাভ করা যাবে না তথা পরকাল বলে কিছু নেই। এই ধারণা নতুন কিছু নয়–একই ধরনের ধারণা সুদূর অতীত কাল থেকেই এক শ্রেণীর ভোগবাদী পরকাল অবিশ্বাসী মানুষ পোষণ করে আসছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সে সময়েও মানুষের ধারণা ছিল, মানুষকে পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মানুষ এখানে যা ইচ্ছা তাই করবে। এমন কোন উচ্চশক্তির অস্তিত্ব নেই, যার কাছে মানুষ তার যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে বাধ্য। জীবন একটিই–সুতরাং যা খুশী, যেমনভাবে খুশী জীবনকে ভোগ করতে হবে। মৃত্যুর পরে আর কোন দ্বিতীয় জীবন নেই। পৃথিবীতে সংঘটিত কোন কর্মকান্ডের হিসাব কারো কাছেই দিতে হবে না।

অতএব জীবনকালে সম্পাদিত কোন কাজের জন্য কোন শাস্তি ও পুরস্কার লাভের কোন প্রশ্নই আসে না। জীবন সৃষ্টিই হয়েছে ভোগ করার জন্য। অতএব জীবনকে কানায় কানায় ভোগ করতে হবে। তারপর একদিন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। কবি ওমর খৈয়াম জীবনকে যেভাবে খুশী সেভাবে ভোগ করার অনুপ্রেরণা দিয়ে বলেছিল–

নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূণ্য থাক
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।

এদের ধারণা হলো, পৃথিবী হলো দৃশ্যমান। এর অস্তিত্ব চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে। অতএব এটাকেই যে কোন প্রক্রিয়ায় ভোগ করতে হবে। আর পরকালের বিষয়টি হলো বাকি। সেটা হবে কি হবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যে বিষয়টি সংশয়পূর্ণ, সেটাকে প্রাধান্য দিয়ে পৃথিবীর ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকা সম্পূর্ণ বোকামী। বহুদূর থেকে যে বাদ্য ঝংকার ভেসে আসছে, তা শোনার মধ্যে কোন তৃপ্তি নেই। চাক্ষুষ দর্শনের ভিত্তিতে যে হৃদয়গ্রাহী মনমাতানো বাদ্য ঝংকার উপভোগ করা যায়, তার ভেতরেই রয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। পরকালে অবিশ্বাসী এসব ধারণা ও চিন্তা-চেতনা প্রকৃতপক্ষে এ কথাই ব্যক্ত করে যে, বিশ্ব জগতের সমগ্র ব্যবস্থা নিছক একজন খেলোয়াড়ের খেলা ব্যতিত আর কিছুই নয়। কোন গুরুগম্ভীর ও পরিকল্পনা ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এই সৃষ্টিজগৎ পরিচালিত হচ্ছে না। এদের এই যুক্তিহীন ধারণার প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِيْنَ-لَوْأَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا-اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ-

এ আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছুই রয়েছে এগুলো আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। যদি আমি কোন খেলনা সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হতাম এবং এমনি ধরনের কিছু আমাকে করতে হতো তাহলে নিজেরই কাছ থেকে করে নিতাম। (সূরা সূরা আম্বিয়া-১৬-১৭)

মহান আল্লাহ বলেন, আমি খেলোয়াড় নই। খেল-তামাসা করা আমার কাজ নয়। আর এই পৃথিবী একটি বাস্তবানুগ ব্যবস্থা। কোন ধরনের মিথ্যা শক্তি পৃথিবীর মাটিতে টিকে থাকে না। মিথ্যা যখনই এই পৃথিবীতে স্বদম্ভে নিজের ক্ষয়িঞ্চু অস্তিত্ব প্রকাশ করেছে, তখনই সত্যের সাথে তার অনিবার্য সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তা অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছে। আমার পরিকল্পনা ভিত্তিক সৃষ্টি এই পৃথিবীকে তুমি খেলাঘর মনে করে জীবন পরিচালিত করো অথবা আমার বিধানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মতবাদ রচিত করে তার ভিত্তিতে নিজেদেরকে পরিচালিত করে থাকো, তাহাল এসবের পরিণতিতে তুমি নিজের ধ্বংসই ডেকে আনবে।

তোমার নিকট ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, আমার সৃষ্টিকে যারা খেলাঘর মনে করেছে, পৃথিবীকে যারা ভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ একটি বিশালাকারের থালা মনে করেছে, পৃথিবীকে যারা ভোগ-বিলাসের লীলাভূমি মনে করেছে, আমার ইসলামের সাথে যারা বিরোধিতা করেছে, তাদের কি করুণ পরিণতি ঘটেছে, পৃথিবীটাকে ভ্রমণ করে দেখে নাও। তোমরা কি এ কথা মনে করেছো নাকি যে, তোমাদেরকে আমি এমনিই খেলাচ্ছলে আমোদ-আহ্লাদ করার জন্য সৃষ্টি করেছি ? তোমাদের সৃষ্টির পেছনে কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই-নিছক একটি উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি হিসাবে বানিয়ে পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছি, তোমাদের কোন কাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে না, এ কথা ভেবেছো নাকি ? আল্লাহ বলেন-

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ-

তোমরা কি মনে করেছিলে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না ? (সূরা মু'মিনূন-১১৫)

গোটা বিশ্বের কোন একটি অণুও অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তা যথার্থ সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে এবং একটি দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনায় এটি পরিচালিত হচ্ছে। সমস্ত সৃষ্টির প্রতিটি অণু ও পরমাণু এই কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সমস্ত জিনিস পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সহকারে নির্মিত হয়েছে। গোটা সৃষ্টির ভেতরে একটি আইন সক্রিয় রয়েছে। দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সমস্ত কিছুই উদ্দেশ্যমুখী। মানব জাতির সমগ্র সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থব্যবস্থা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এই কথারই সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে স্রষ্টা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসের পেছনে সক্রিয় নিয়ম-নীতি উদ্ভাবন করে এবং প্রতিটি বস্তু যে উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করেই মানুষ

এখানে এসব কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। যদি একটি অনিয়মতান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টির মধ্যে একটি খেলনার মতো মানব জাতিকে রেখে দেয়া হতো, তাহলে তাদের পক্ষে কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা চিন্তাই করা যেত না।

অতএব যে অসীম বৈজ্ঞানিক সত্তা এমন প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্যমূখীতা সহকারে এই পৃথিবী নির্মাণ করেছেন এবং এর ভেতরে মানুষের মতো একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে যাবতীয় দিক দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক শক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, ইচ্ছা ও স্বাধীন ক্ষমতা এবং নৈতিক অনুভূতি দিয়ে স্বীয় পৃথিবীর অসংখ্য উপকরণ মানুষের হাতে অর্পণ করেছেন, তিনি মানুষকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করতে পারেন, এমন কথা কি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কল্পনা করতে পারে ? মানুষ কি এ কথা মনে করেছে যে, তারা এই পৃথিবীতে ভাঙবে, গড়বে, অন্যায় কর্ম করবে, সৎ কর্ম করবে, ভোগ করবে, ত্যাগ করবে এরপর একদিন মৃত্যুবরণ করে মাটির সাথে মিশে যাবে–তারপর তোমরা যে কাজ করে গেলে, তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না, এটা কি করে কল্পনা করলে ?

তোমরা নানাজনে নানা ধরনের কাজ করবে, তোমাদের কোন কাজের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তোমাদের মৃত্যুর পরও অসংখ্য নিরীহ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকবে, তোমরা এমন একটি মতবাদ বা নিয়ম-নীতির প্রতিষ্ঠিতা করে যাবে, এর ফলে যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে অরাজকতা চলতে থাকবে, মানুষ তার নিষ্ঠুর পরিণতি ভোগ করতে থাকবে, আর তোমাদের মৃত্যুর পরই এসব কর্মের হিসাব গ্রহণ না করে তা গুটিয়ে নিয়ে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা হবে, এ কথাই কি তোমরা কল্পনা করো ? সূরা সা-দ-এর ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا–

আমি আকাশ ও পৃথিবীকে এবং তাদের মাঝখানে যে জগৎ রয়েছে তাকে অনর্থক সৃষ্টি করিনি।

সেই আদিকাল থেকেই পরকাল বা বিচার দিবসকে সামনে রেখে মানব সমাজ পরস্পর বিরোধী দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল মানুষ ভেবেছে পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন, মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই। আরেক দল যুক্তি প্রদর্শন করেছে, মানুষ পৃথিবীতে যা কিছুই করছে, এর পূর্ণাঙ্গ হিসাব দিতে হবে। পরকালের প্রতি যারা অবিশ্বাস পোষণ করে, তাদের কথার পেছনে যুক্তি একটিই রয়েছে, 'পরকাল বলে কিছুই নেই' এই কথাটি ব্যতিত দ্বিতীয় আর কোন যুক্তি তাদের কাছে নেই। আর পরকাল যে অবশ্যম্ভাবী, এ কথার পেছনে অসংখ্য যুক্তি-প্রমাণ বিদ্যমান।

সাধারণভাবে এই পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের জীবন একইভাবে পরিচালিত হয় না। মানব সমাজে দেখা যাচ্ছে, কোন মানুষ তার গোটা জীবন ব্যাপীই অন্যের অবহেলা, অবজ্ঞা, বঞ্চনা-লাঞ্ছনা, অত্যাচার, শোষণ-নির্যাতন-নিস্পেষণ সহ্য করে আসছে। প্রভাব-প্রতিপত্তি না থাকার কারণে তাকে এসব কিছু সহ্য করে একদিন মৃত্যুর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। এখানে ইসাফের দাবি ছিল, ঐ ব্যক্তির প্রতি যে অন্যায়-অবিচার অন্য মানুষে করলো, তার সুষ্ঠ বিচার হওয়া। সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিতাবস্থায় সে পৃথিবীর বন্ধন ত্যাগ করলো। গোটা

পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে লোকটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে আগ্রহী হয়, তাহলে তা কখনোই সম্ভব হবে না। সুতরাং এখানে ইনসাফ দাবি করছে যে, মৃত্যুর পরে আরেকটি জগৎ থাকা উচিত। যে জগতে পৃথিবীতে অধিকার বঞ্চিত ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল শক্তির অধিকারী নেতার ষড়যন্ত্রের কারণে গোটা জাতি অধিকার বঞ্চিত হয়, দেশের স্বাধীনতা হারিয়ে ভিন্ন জাতির গোলামী করতে বাধ্য হয়, ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় নেতৃবৃন্দের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে লক্ষ লক্ষ অসহায় জনগণ প্রাণ দিতে বাধ্য হয় অথচ বাস্তবে দেখা গেল, সেই নেতার গোপন ষড়যন্ত্রের কথা কোনদিন প্রকাশিত হলো না এবং তার কোন বিচারও হলো না। একশ্রেণীর মানুষ সেই ষড়যন্ত্রকারী রক্ত লোলুপ হিংস্র নেতাকে দেবতার আসনে আসীন করে পূজা করলো। মৃত্যুর পরেও সেই নেতার মূর্তি নির্মাণ করে, প্রতিকৃতি বানিয়ে ফুল দিয়ে পূজা করতে থাকলো।

এ অবস্থায় জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি, ইনসাফ কি দাবি করে? দাবি তো এটাই করে যে, ষড়যন্ত্রকারী নেতার গোপন ষড়যন্ত্র জাতির সামনে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। তার ষড়যন্ত্রের কারণে জাতি পরাধীন জাতিতে পরিণত হলো, অসংখ্য মানুষ নির্মমভাবে নিহত হলো। এসব অপরাধের কারণে তাকে চরম দন্ডে দন্ডিত করা উচিত ছিল। কিন্তু সে দন্ড ভোগ করা তো দূরের কথা, জীবিতকালে বিপুল ঐশ্বর্য্য আর ভোগ-বিলাসের মাধ্যম দিয়ে সে কানায় কানায় তার জীবনকে পূর্ণ করলো। তারপর মৃত্যুর পরেও তার দলের লোকজন তার সীমাহীন বিশ্বাসঘাতকতা আর ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ জাতির কাছে গোপন করে তার প্রতিকৃতি বেদীতে স্থাপন করে রাষ্ট্রীয়ভাবে পূজা করতে বাধ্য করলো।

এভাবে গোটা জাতিকেই ইনসাফ থেকে বঞ্চিত করা হলো এবং প্রকৃত অপরাধীকে দন্ড দানের পরিবর্তে আকাশ চুম্বী সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হলো। যদি বলা হয় যে, জাতীয় সেই নেতাকে চরম দন্ডদান করলেই তো জাতি ইনসাফ লাভ করলো। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কিভাবে সেই বিশ্বাসঘাতক নেতাকে দন্ড দান করা হবে? তার অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কি তাকে দন্ডদান করা যাবে? খুব বেশী হলে তাকে মৃতুদন্ড দিয়ে তা কার্যকর করা যেতে পারে।

আবার প্রশ্ন ওঠে, যে ব্যক্তি জাতীয় নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে গোটা জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ধ্বংস করলো, জাতিকে ভিন্ন জাতির গোলামে পরিণত করলো, অবাধে নিজে সন্তান-সন্ততি সাথে করে জাতীয় অর্থ-সম্পদ লুট করলো, দলের লোকদের দিয়ে লুট করালো, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানী ঘটালো। তার কারণে অসংখ্য নারী সতীত্ব হারালো–অর্থাৎ বিশাল পর্বত সমান অপরাধের পরিবর্তে লাভ করলো শুধু মৃত্যুদন্ড। অগণিত মানুষ নিহত হলো যার কারণে, আর সে একবার মাত্র নিহত হলো–এটা কি ইনসাফ হলো?

আসলে মানুষ ইনসাফ করবে কিভাবে? মানুষের পক্ষে তো সম্ভব নয়, লক্ষ লক্ষ নরহত্যার অপরাধে দন্ডিত ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বার হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। মানুষের পক্ষে কাউকে একবারই হত্যা করা বা মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা সম্ভব–বার বার নয়। এখানেও ইনসাফের দাবি হলো, মৃত্যুর পরে আরেকটি

জীবন থাকা উচিত। যেখানে লক্ষ নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত অপরাধীকে লক্ষ বার শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

পৃথিবীর কারাগারগুলোয় যেসব বন্দী রয়েছে, এসব বন্দীদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিই কি প্রকৃত অপরাধী ? কোন একটি দেশের সরকারও এ কথা হলফ করে বলতে পারবে না যে, তার দেশের কারাগারের সকল বন্দী প্রকৃত অপরাধী। এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, যারা প্রতিহিংসা, ষড়যন্ত্র, প্রতিশোধ, আক্রোশ ইত্যাদির শিকার হয়ে বছরের পর বছর ধরে অন্যায়ভাবে কারাগারে অমানবিক নির্যাতন ভোগ করছে। আল্লাহর দেয়া পৃথিবীর মুক্ত আলো-বাতাস থেকে নির্দোষ লোকগুলোকে বঞ্চিত করা হয়েছে। স্বামী সঙ্গ থেকে স্ত্রীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সন্তান-সন্ততিকে পিতার স্নেহ থেকে মাহ্রুম করা হয়েছে।

পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তিকে কারাবন্দী করার কারণে তার সংসার তছ্নছ্ হয়ে পড়েছে। স্ত্রীকে অপরের বাড়িতে কঠোর শ্রমের বিনিময়ে ক্ষুন্নি বৃত্তি নিবৃত্ত করতে হচ্ছে। নাবালেগ সন্তানগণ শিক্ষা জীবন থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এক মুঠো অন্নের জন্য শ্রম বিক্রি করতে হচ্ছে। এভাবে অবিচার মানব সভ্যতার মেকি মানবাধিকারের গালে বার বার চপেটাঘাত করছে। নেই-কোথাও এদের সুবিচার লাভের এতটুকু আশা নেই। সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তিশালী কামনা তাড়িত ব্যক্তির দৃষ্টি পড়লো গরীব-দিন মজুর এক ব্যক্তির সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি। তার যৌবনকে লেহন করার যাবতীয় প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, তখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সাথে ষড়যন্ত্র করে সেই দিন-মজুরকে চোর বা ডাকাত সাজিয়ে কারাগারে ঢুকিয়ে দিয়ে কয়েক বছর জেল দেয়া হলো। এরপর দিন-মজুরের অসহায় সুন্দরী স্ত্রীকে ভোগ করার অবাধ পরিবেশ সৃষ্টি করা হলো।

এই অবিচারের কোন প্রতিকার করার মতো শক্তি সামর্থ গরীব-দিন মজুরের নেই। তার অর্থ নেই, প্রভাব নেই, প্রতিপত্তি নেই। আইন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে সে জামিন নেবে, সে অর্থও তার নেই। কারণ পৃথিবীতে প্রচলিত মানুষের তৈরী করা আইনের অবস্থা হলো মাকড়শার জালের মতোই। মাকড়শার জালে যেমন কোন শক্তিশালী মাছি আট্কা পড়লে তা ছিন্ন করে বের হয়ে যায় এবং দুর্বল কোন প্রাণী ধরা পড়লে সেই জাল ছিন্ন করতে পারে না। মাকড়শা তাকে কুরে কুরে খায়। পৃথিবীতে আইন প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থের কাছে বিক্রি হয়। এখানে অসহায় দুর্বল মানুষগুলোর সুবিচার লাভের কোন আশা করা যেতে পারে না। কিন্তু মানুষ হিসাবে, মানবাধিকারের দৃষ্টিতে তারও তো সুবিচার পাবার অধিকার ছিল। তাহলে অসহায় আর দুর্বলরা কি কোনদিন সুবিচার লাভ করবে না ?

বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, আলজিরিয়া, ম্যাসেডোনিয়া, ফিলিস্তীন, কাশ্মির, সোমালিয়া, ফিলিপাইন, সুদান ও আফগানিস্থানসহ অনেক দেশেই মুসলিম বিদ্বেষী পৃথিবীর সুপার পাওয়ার মোড়ল রাষ্ট্রটির প্রত্যক্ষ মদদে অগণিত মুসলিম নারী-পুরুষ আবাল বৃদ্ধ-বণিতা লোমহর্ষক হত্যা কান্ডের শিকারে পরিণত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। পৃথিবীতে এদের জন্মই যেন হয়েছে নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে জীবনকে বলী দেয়া। পৃথিবীবাসীর চোখে ধূলো দেয়ার জন্য তথাকথিত শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বছরের পর বছর ধরে রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ বৈঠকের নামে ভোজ

সভার আয়োজন করছে। প্রকৃতপক্ষে হত্যাযজ্ঞকে দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যেই বৈঠকের নামে কলক্ষেপণ করা হচ্ছে। একদিকে হত্যাযজ্ঞ বন্দ করার নামে যে মুহূর্তে বৈঠক চলছে, অপরদিকে সেই মুহূর্তেই অগণিত আদম সন্তান মারণাস্ত্রের নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হচ্ছে। এভাবে সর্বত্র চলছে অন্যায় আর অবিচার। কিন্তু কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা আজ পর্যন্তও করা হয়নি। বিচারের আশায় অসহায় মানুষের করুণ আর্তনাদ অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠের কঠিন দেয়ালে মাথা কুটে ফিরছে। নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর মর্ম যন্ত্রণার করুণ হাহাকার পৃথিবী জুড়ে বেদনা বিধুর পরিবেশ সৃষ্টি করছে। প্রতিকার আর সুবিচার লাভের সামান্য আশার আলোও কোথাও চোখে পড়ছে না।

পৃথিবীর এই বাস্তব অবস্থাই মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, বিচার দিবসের প্রয়োজনীয়তা আর মৃত্যুর পরের জীবনের আবশ্যকতা। পৃথিবীতে যদি যাবতীয় কাজের যথার্থ প্রতিফল লাভের বাস্তব অবস্থা বিরাজ করতো, তাহলে পরকালের জীবন সংশয়পূর্ণ হতো। পৃথিবীতে কর্মের যথার্থ মূল্যায়ন ও প্রতিফল দানের ক্ষমতা মানুষের নেই। এই ব্যবস্থা মানুষ কোনদিনই যথার্থভাবে করতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি এটাই দাবি করে যে, এমন একটি জীবন অবশ্যই থাকা উচিত, যে জীবনে মানুষ তার প্রতিটি কর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল লাভ করবে। আর কর্ম সম্পাদনের পূর্বে যেমন ফল আশা করা যায় না, তেমনি মৃত্যুর পূর্বে মানুষও তার কর্মফল আশা করতে পারে না। কারণ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার কর্মের অবসান ঘটে। এ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বিচার দিবস নির্ধারণ করেছেন। সেদিন তিনি প্রতিটি মানুষের কর্মলিপি অনুসারে বিচার কার্য অনুষ্ঠিত করবেন।

সৃষ্টি হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য

সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথম বিষয় বলা হলো, কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি হয়নি—সমস্ত কিছুই একটি নির্দিষ্ট ছক অনুসারে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রতিটি সৃষ্টির পেছনেই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। এরপর মানব জাতির সামনে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসেছে, এসব সৃষ্টি নশ্বর না অবিনশ্বর ? এ প্রশ্নের জবাব লাভের জন্য চিন্তাবিদ ও গবষেকগণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন সৃষ্টিসমূহের প্রতি। তারা নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এখানে কোন জিনিসই অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী নয়। প্রতিটি জিনিসেরই একটি নির্ধারিত জীবনকাল নির্দিষ্ট রয়েছে। নির্দিষ্ট সেই প্রান্ত সীমায় পৌঁছানোর পরে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। সামগ্রিকভাবে গোটা সৃষ্টি জগতসমূহও একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে, এ কথা আজ বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। তারা বলছেন, এখানে দৃশ্যমান—অদৃশ্যমান যতগুলো শক্তি সক্রিয় রয়েছে তারা সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ পরিসরে তারা কাজ করে যাচ্ছে। সমস্ত শক্তি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করবে। তারপর কোন এক সময় তারা অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এ ব্যবস্থাটির পরিসমাপ্তি ঘটবে।

সুদূর অতীতকালে যেসব চিন্তাবিদগণ পৃথিবীকে আদি ও চিরন্তন বলে ধারণা পেশ করেছিলেন, তাদরে বক্তব্য তবুও সর্বব্যাপী অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি লাভ করতো। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে নাস্তিক্যবাদী ও আল্লাহ বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্ব-জগতের

নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক চলে আসছিল, আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় চূড়ান্তভাবেই সে ক্ষেত্রে আল্লাহ বিশ্বাসীদের পক্ষে রায় দিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে নাস্তিক্যবাদীদের পক্ষে বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামাবলী গায়ে দিয়ে এ কথা বলার আর কোন অবকাশ নেই যে, এই পৃথিবী আদি ও অবিনশ্বর। কোনদিন এই জগৎ ধ্বংস হবে না, নাস্তিক্যবাদীদের জন্য এ কথা বলার মতো কোন সুযোগ বিজ্ঞানীগণ আর রাখেননি। তারা কোরআনের অনুসরণে স্পষ্টভাবে মত ব্যক্ত করেছেন যে, এই পৃথিবী ও সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছুই একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে।

অতীতে বস্তুবাদিরা এ ধারণা প্রচলন করেছিল যে, বস্তুর কোন ক্ষয় নেই-বস্তু কোনদিন ধ্বংস হয় না, শুধু রূপান্তর ঘটে মাত্র। তাদের ধারণা ছিল, প্রতিটি বস্তু পরিবর্তনের পর বস্তু-বস্তুই থেকে থেকে যায় এবং তার পরিমাণে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এই চিন্তা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে বস্তুবাদীরা প্রচার করতো যে, এই বস্তু জগতের কোন আদি-অন্ত নেই। সমস্ত কিছুই অবিনশ্বর। কোন কিছুই চিরতরে লয় প্রাপ্ত হবে না।

পক্ষান্তরে বর্তমানে আনবিক শক্তি আবিষ্কৃত হবার পরে বস্তুবাদীদের ধ্যান-ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীগণ বলছেন, শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হয় এবং বস্তু আবার শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই বস্তুর শেষ স্তরে এর কোন আকৃতিও থাকে না এবং এর কোন ভৌতিক অবস্থানও বজায় থাকে না। তারপর Second law of thermo-Dynamics এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এই বস্তুজগৎ অবিনশ্বর নয়, এটা অনন্ত নয় এবং তা হতে পারে না। এই বস্তুজগৎ যেমন শুরু হয়েছে, তেমনি এটি একদিন শেষ হয়ে যাবে। কোরআন সপ্তম শতাব্দীতে যে ধারণা মানব জাতির সামনে পেশ করেছিল, বর্তমানের বিজ্ঞানীগণ তা নতুন মোড়কে মানব জাতির সামনে উত্থাপন করছে।

কোরআন বলেছে, এই জগতের একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে-বিজ্ঞান এ কথার স্বীকৃতি দানে বাধ্য হয়েছে। কোরআন বলেছে, এই সৃষ্টিজগৎ ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে-বিজ্ঞান অনেক জল ঘোলা করে তারপর এ কথার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে যে, সত্যই-মহাশূন্যে সমস্ত কিছু সম্প্রসারিত হচ্ছে। একটি গ্যালাক্সি আরেকটি গ্যালাক্সির কাছ থেকে প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার বেগে অজানার পথে সৃষ্টির সেই শুরু থেকেই ছুটে চলেছে। কোথায় যে এর পরিসমাপ্তি-তা বিজ্ঞান অনুমান করতে যেমন পারছে না, তেমনি অনুমান করতে পারছে না, মহাশূন্য কতটা বিশাল। এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার একদিন সমাপ্তি ঘটবে, তখন শুরু হবে আবার সংকোচন প্রক্রিয়া। মহাশূন্যে সমস্ত কিছুই যে ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে, এ সম্পর্কে সূরা যারিয়াতের ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ-

আমি আকাশ মন্ডলীকে নিজস্ব শক্তিবলে সৃষ্টি করেছি আর একে আমি সম্প্রসারিত করছি।

সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ একসাথে অনেকগুলো গ্যালাক্সির ওপরে গবেষণা করে দেখেছেন যে, সম্প্রসারণের ধরণটা কেমন। তারা দেখতে পেয়েছেন যে, সম্প্রসারণের ধরণটি

একটি অন্যটির সমান্তরাল নয়। তারা ধারণা করেন, একটি গ্যালাক্সি অন্য আরেকটি গ্যালাক্সি অথবা একাধিক গ্যালাক্সি ক্রমশঃ দূরত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। বিষয়টিকে তারা সহজবোধ্য করার জন্য বেলুনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একটি বেলুনে বাতাস দিতে থাকলে তা যেমন ক্রমশঃ ফুলতেই থাকে, তারপর তা এক সময় ফেটে যায় এবং রাবারের টুকরোগুলো চারদিকে ছিটকে পড়ে। বেলুন ফুলতে থাকাবস্থায় তার ভেতরের স্থান যেমন সম্প্রসারিত হতে থাকে, তেমনি এই মহাশূন্য সম্প্রসারিত হচ্ছে। নক্ষত্রসমূহ কোন গ্যালাক্সি ব্যবস্থার পরিমন্ডলে যেমন সম্প্রসারিত হচ্ছে, তেমনি এই মহাবিশ্ব প্রতি মুহূর্তে প্রবল গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

পৃথিবী এবং গ্যালাক্সী কেন্দ্রের মাঝে অবস্থিত বাহুটি প্রতি সেকেন্ডে তিপ্পান্ন কিলোমিটার বেগে এবং তার বিপরীত বাহুটি প্রতি সেকেন্ডে একশত পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার বেগে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কোন গ্যালাক্সি সেকেন্ডে পঁয়তাল্লিশ হাজার মাইল বেগে, কোনটি সেকেন্ডে নব্বই হাজার মাইল বেগে আবার কোনটি সেকেন্ডে আলোর গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

সৃষ্টির আদি থেকেই এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলছে। কোথায় যে এরা ছুটে যাচ্ছে, তা বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করতে সমর্থ হননি। এই গ্যালাক্সিগুলো একটি আরেকটিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে না। তারা একেবারে সোজা পিছে সরে যাচ্ছে। মহাকর্ষ বলের কারণে প্রতিটি গ্যালাক্সি একে অপরকে আকর্ষণ করে। এরপরও তারা পরস্পরের কাছে ছুটে আসতে পারে না। কারণ গোটা মহাবিশ্ব ব্যাপী একটি সম্প্রসারণ বল সক্রিয় রয়েছে। এই বল এখনো মহাকর্ষ বলের থেকে অনেক বেশী এবং এ কারণেই মহাবিশ্ব সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু মহাকর্ষ বল প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করছে গ্যালাক্সিগুলোকে পরস্পরের দিকে টেনে নিয়ে আসার জন্য। এই মহাকর্ষ বলের কারণেই ক্রমশঃ একদিন গ্যালাক্সিগুলোর পশ্চাদপসরণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এক কথায় মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি হঠাৎ করেই স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীগণ মতামত দিচ্ছেন।

তারপর মহার্কষ বলের কারণেই গ্যালাক্সিগুলো পরস্পরের দিকে ছুটে আসতে শুরু করবে আর এভাবেই শুরু হবে মহাবিশ্বের সংকোচন প্রক্রিয়া। ক্রমান্বয়ে মহাবিশ্ব কেন্দ্রের দিকে সংকুচিত হতে থাকবে, সময় যতই অতিবাহিত হবে, গ্যালাক্সিগুলোর পরস্পরের প্রতি ছুটে আসার গতি ততই বৃদ্ধি লাভ করবে। এভাবে এক সময় সমস্ত গ্যালাক্সি তাদের যাবতীয় পদার্থ তথা নক্ষত্র, উন্মুক্ত গ্যাস, ধূলিকণা ইত্যাদিসহ মহাবিশ্বের কেন্দ্রে পরস্পরের ওপরে পতিত হবে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, সংকোচনের শেষ পর্যায়ে মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র তথা সৃষ্টি জগতের যাবতীয় পদার্থ, মহাবিশ্বের কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র পিন্ডে পরিণত হবে। সমাপ্তিতে সৃষ্টি জগতের এই একত্রিত অবস্থাকে বিজ্ঞানীগণ বিগ্ ক্রাঞ্চ (Big Crunch) নামে আখ্যায়িত করেছেন।

পৃথিবীর ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যত তথা পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখিত ধারণা পোষণ করছে বর্তমানের বিজ্ঞানীগণ। তারা বলছেন, তাপের উৎস হলো সূর্য। আর এই তাপের কারণেই গোটা সৃষ্টিজগৎ সচল রয়েছে। অথচ এই সূর্য ক্রমশঃ তার জ্বালানি শক্তি নিঃশেষ করে

ফেলছে। অর্থাৎ সূর্য একটি পরিণতির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির জন্যই একটি নির্দিষ্ট সীমা রেখা অঙ্কন করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ-مَاخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى-

তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করেনি ? আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সবকিছু সঠিক ও উদ্দেশ্যে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আর রূম-৮)

এই পৃথিবীতে যা কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে, তা অনাদি ও অনন্ত নয়, এ কথা বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। দৃষ্টির সামনেই মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছে, পুরাতনের স্থানে নতুনের আগমন ঘটছে। কিন্তু এর একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিভাবে-কি করে ঘটবে তা গবেষকদের কাছে আর অনাবৃত নেই।

বিচার দিবস নির্দিষ্ট হওয়া বিবেক ও ইনসাফের দাবি

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসীম দয়ালু-কথাটি অনুধাবন করার জন্য কোন গবেষণার প্রয়োজন নেই। মাত্র একটি বারের জন্য গোটা সৃষ্টির প্রতি এবং নিজের দেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই বিষয়টি দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনের প্রথম সূরা-সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতেই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অসীম দয়া ও অনুগ্রহের কথা মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। এরপর তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ কিভাবে কোথায় কার্যকর করেছেন, তা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আলোচনা করে মানব জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতে দয়া ও অনুগ্রহের কথা জানিয়েই তিনি ঘোষণা করেছেন-তিনিই বিচার দিবসের মালিক।

দয়া অনুগ্রহ ও বিচার দিবসের মালিক-দুটো বিষয়ের পাশাপাশি উল্লেখ করার কারণ হলো, পৃথিবীর মানব-মন্ডলীর কাছে তিনি এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন-তিনি শুধু অসীম দয়ালুই নন, তিনি ন্যায় বিচারক, ইনসাফকারী, তিনি অধিকার প্রদানকারী। পৃথিবীতে আল্লাহর উন্মুক্ত ও অবারিত দয়া পরিবেষ্টিত থেকে শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে যারা ন্যায় বিচারকে ভূলুণ্ঠিত করছে, অপরের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে, দুর্বলকে ইনসাফ থেকে বঞ্চিত করছে, তিনিই আল্লাহ-যিনি বিচার দিবসে বিচারকের আসনে আসীন হয়ে ন্যায় বিচার করবেন। পৃথিবীতে যারা অধিকার বঞ্চিত ছিল, তাদেরকে তিনি প্রাপ্য অধিকার প্রদান করবেন-ইনসাফ করবেন।

একজন ব্যক্তি দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে মহান আল্লাহর দেয়া জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলো এবং সে নিয়ম-পদ্ধতি দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালালো। প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে সে কারাগারে যেতে বাধ্য হলো, নির্যাতিত হলো, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলো। দেশের জনগণ এবং

জাতির কর্ণধারগণ লোকটির আবিষ্কৃত কল্যাণকর নিয়ম-পদ্ধতির কল্যাণকারিতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে অথবা অবহেলা করে তার নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করলো না বরং তার প্রতি নানা ধরনের নির্যাতন অনুষ্ঠিত করলো। এরপর নিয়ম মাফিক লোকটি একদিন এ পৃথিবী থেকে একবুক হাহাকার নিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করলো। তার ইন্তেকালের অনেক বছর পরে নতুনভাবে যারা দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো, তারা এসে দেখলো, ঐ লোকটি কর্তৃক আবিষ্কৃত নিয়ম-পদ্ধতি দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে এবং তারা বাস্তবে তাই করলো। দেশ ও জাতি লোকটির প্রবর্তিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে সমৃদ্ধশালী জাতিতে পরিণত হলো।

জাতি যখন লোকটির প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করতে সক্ষম হলো, তখন তার প্রতি শ্রদ্ধায় গোটা জাতি বিগলিত হলো। লোকটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য দেশের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোর নামকরণ তার নামে করা হলো। প্রতি বছরে তার জন্ম-মৃত্যু দিবসে সংবাদ পত্রসমূহ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলো। তাকে মূল্যায়ন করে নানা ধরনের বই-পুস্তক প্রকাশ হলো। কেউ কেউ তার আবক্ষ মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করা শুরু করলো। তার নামে বিভিন্ন ধরনের পদক প্রবর্তন করা হলো।

এসব করা হলো ঐ ব্যক্তির জন্য, যাকে একদিন গোটা জাতি লাঞ্ছিত করেছিল, নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত করেছিল, কারারুদ্ধ করেছিল, তার সহায়-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তাকে দেশান্তরী করেছিল। তারপর লোকটির ইন্তেকালের বহু বছর অতিক্রান্ত হবার পর উপলব্ধিবোধ ফিরে আসার পরে জাতি তাকে পুরস্কৃত করার জন্য উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। অর্থাৎ মানুষের পক্ষে বিনিময় দেয়ার যতগুলো পন্থা রয়েছে, তার সবগুলোই অবলম্বন করা হলো।

এখন প্রশ্ন হলো, পরবর্তীতে মৃত সেই লোকটির জন্য যা করা হলো, এসবই কি লোকটির যথার্থ প্রাপ্য ছিল, না এরচেয়ে আরো বেশী কিছু প্রাপ্য ছিল ? আর প্রাপ্য থাকলেও মানুষের পক্ষে লোকটির জন্য আরো বেশী কিছু করা কি সম্ভব ? মাত্র একটি লোকের প্রচেষ্টায় অসংখ্য অগণিত লোক উপকৃত হলো, একটি দেশ ও জাতি বিশ্বের দরবারে সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত হলো, তার কারণে জাতি অনিয়ম, দুর্নীতি, অরাজকতা, বিশৃংখলতা, দারিদ্র থেকে মুক্তি লাভ করে শান্তি ও স্বস্তির জীবন লাভ করলো, তাকে কি কোনভাবেই মানুষের পক্ষ থেকে তার কর্মের বিনিময় স্বরূপ যথার্থ পুরস্কার প্রদান করা সম্ভব ?

অনুরূপভাবে আরেকজন লোক এমন এক মতবাদ আবিষ্কার করলো, রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করে এমন নিময়-পদ্ধতির প্রবর্তন করলো এবং একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলো। তার সেই ঘৃণ্য মতবাদের কারণে যুগের পর যুগ ধরে অগণিত মানুষ চরম দুরাবস্থার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হলো। এখন সেই মতবাদের আবিষ্কারককে কি কোনভাবেই দন্ড প্রদান করা সম্ভব ? আর মানুষের নিয়ন্ত্রণে যত ধরনের দন্ড রয়েছে, তার সবগুলোই প্রয়োগ করলে কি লোকটিকে যথার্থ দন্ড দেয়া হবে ? সুতরাং, মানুষের পক্ষে আরেক জন মানুষের কর্মের যথার্থ মূল্যায়ন করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ মানুষের শক্তি ও সামর্থ সীমিত। এ

জন্য মানুষের পক্ষে যথার্থ পুরস্কার ও দন্ড দেয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাহলে কি মানুষ প্রকৃত পুরস্কার ও দন্ড লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে ? প্রকৃত পুরস্কার ও দন্ডের ব্যবস্থা মানুষের আয়ত্বে নেই, এ কারণে মানুষের ভেতরে যে হতাশা, এই হাতাশা বোধেই কি মানবাত্মা অনন্তকাল ধরে আর্তনাদ করতে থাকবে ?

এই হতাশা দূর করার জন্যই আল্লাহ রাহ্‌মান ও রাহীম। তিনি অসীম অনুগ্রহ ও করুণার অধিকারী। পৃথিবীতে যেমন তিনি মানুষের ওপরে অসীম করুণা করেছেন, তেমনি তিনি করুণা করবেন বিচার দিবসে। যেদিন তিনি করুণা করে যথার্থ পুরস্কার ও দন্ডের ব্যবস্থা করবেন এবং ন্যায় বিচার পরিপূর্ণ করার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবেন। এ কারণেই তিনি সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতে দয়া ও অনুগ্রহের বিষয়টি উল্লেখ করার পরপরই তৃতীয় আয়াতে বিচার দিবসের বিষয়টি নিশ্চিত করে মানব জাতিকে হতাশা মুক্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا-وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ-

যে সৎ কাজ করবে সে নিজের জন্যই কল্যাণ করবে। আর যে দুষ্কর্ম করবে তার মন্দ পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। তোমার রব্ব বান্দাদের জন্য জালিম নন। (হামীম সেজ্‌দা-৪৬)

যার যা প্রাপ্য তাকে না দেয়াই হলো তার ওপরে জুলুম অনুষ্ঠিত করা এবং পৃথিবীতে এই জুলুম প্রতি মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি এই জুলুমের অবসান কল্পে আর্তচিৎকার করছে। আল্লাহ তা'য়ালা বিচার দিবসে এই জুলুমের অবসান ঘটাবেন। মানুষের জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি এটাই দাবি করছে যে, যথার্থভাবে মানুষের কর্মের মূল্যায়ন ও তদানুযায়ী পুরস্কার এবং দন্ডের আয়োজন করা হোক। আর যেহেতু জীবিত থাকাবস্থায় মানুষের কর্মের মূল্যায়ন করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

এজন্য মৃত্যুর পরে আরেকটি বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে সেখানে এসবের ব্যবস্থা করা উচিত। জীবিত কালে মানুষের কর্মের মূল্যায়ন করা এ কারণে সম্ভব নয় যে, মানুষ এমন একটি কর্ম সম্পাদন করলো, যার ফলে গোটা জাতির কাছে সে প্রশংসিত হলো। আবার সেই একই ব্যক্তির দ্বারা এমন এক জঘন্য কর্ম অনুষ্ঠিত হলো, গোটা জাতির কাছে সে নিন্দিত হলো। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ ধরনের নিন্দিত ও প্রশংসিত নেতার অভাব নেই। সারা জীবন ধরে এক ব্যক্তি প্রশংসামূলক কর্ম সম্পাদন করলো, মৃত্যু শয্যায় শায়িত থেকে সেই একই ব্যক্তি, এমন এক নিন্দিত কাজের অনুমোদন দিয়ে গেল যে, গোটা জাতি তার মৃত্যুর পরে শোকাহত হবার পরিবর্তে তার প্রতি ধিক্কারই জানালো। এ জন্য জীবিত থাকাবস্থায় কোন মানুষের কর্মের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। মানুষের প্রতিটি খুটিনাটি কাজের মূল্যায়ন পূর্বক পুরস্কার ও দন্ডদানের ব্যবস্থার জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে বিচার-দিবস। এটা মহান আল্লাহর উন্মুক্ত ও অবারিত দয়া-অনুগ্রহের অসীম প্রকাশ।

পৃথিবীর বিচারালয় সম্পর্কে মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো, বিচারক স্বয়ং নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে বিচার কার্য অনুষ্ঠিত করে থাকেন। যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিচারক বিচার করেন, সে

বিষয়টি যেখানে সংঘটিত হয়, সেখানে বিচারক স্বশরীরে উপস্থিত থেকে ঘটনার প্রতিটি দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার কোন উপায় তার থাকে না। বিচার কার্য পরিচালনার সাথে যারা জড়িত, তাদের কাছ থেকে ঘটনাবলী শুনে বিচারক বিচার করে থাকেন। এ ক্ষেত্রেও পূর্ণ ঘটনা তার গোচরে আসার সম্ভাবনা নেই। উভয় পক্ষের উকিল এবং সাক্ষীগণ নিজের স্বার্থে প্রকৃত ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা করে থাকে। এক কথায় পৃথিবীতে বিচার কার্য পরিচালনা করার সময় মানুষ বিচারককে যতগুলো দুর্বলতা পরিবেষ্টন করে রাখে, এর সবগুলো থেকে মহান আল্লাহ পাক ও পবিত্র। ঘটনা যেখানে সংঘটিত হয়, তা মহান আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকে না। কেন ঘটনা সংঘটিত হলো, সেটাও তিনি অবগত থাকেন এবং যেখানে যার দ্বারাই সৎকাজ ও অসৎকাজ সংঘটিত হচ্ছে, সমস্ত কিছুই তিনি অবগত থাকেন। আল্লাহ বলেন–

يُسَبِّحُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ-لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ-وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّ مِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ-وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ-

আল্লাহর তাস্‌বীহ করছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশ জগতে রয়েছে এবং এমন প্রতিটি জিনিস যা পৃথিবীর বুকে রয়েছে। তিনিই সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকারী এবং প্রশংসাও তাঁরই জন্য। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন আর কেউ কাফির। আর আল্লাহ সেসব কিছুই দেখেন যা তোমরা করে থাকো। (সূরা আত তাগাবুন-১-২)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিচার দিবসের মালিক, সৃষ্টিজগতে যা কিছুই রয়েছে সমস্ত কিছুই তাঁর প্রশংসা করছে। সমস্ত সৃষ্টির ওপরে একমাত্র তাঁর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সৃষ্টির ওপরে কারো কর্তৃত্ব চলে না, কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁর। পৃথিবীতে মানুষকে প্রেরণ করে তিনি তাদেরকে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য দেখিয়ে দিয়ে স্বাধীন ক্ষমতা দান করেছেন, মানুষ আল্লাহ প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে মুমিনও হতে পারে আবার শয়তানের পথ অনুসরণ করে কাফিরও হতে পারে।

মানুষ কোথাও কোন অবস্থায় অন্ধকারে চার দেয়ালের মধ্যে লোক চক্ষুর অন্তারালে কি করছে সেটাও তিনি দেখছেন। সুতরাং একমাত্র তাঁর পক্ষেই যাবতীয় ঘটনার ন্যায় বিচার করা সম্ভব। বিচারক যদি ন্যায় বিচার করে, তাহলে সেটা তার সততা, দয়া ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। আর বিচারক যদি ন্যায় বিচার না করে নির্দোষকে আসামী করে শাস্তি প্রদান করেন আর দোষীকে ক্ষমা করে দিয়ে কোন দন্ডদান না করেন, এটা বিচারকের হীন ও কলুষিত মানসিকতার স্বাক্ষর বহন করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে বিচার দিবসকে নির্দিষ্ট করেছেন এবং সেদিন তিনি ন্যায় বিচারের মাধ্যমে অপরাধীকে দন্ডদান করবেন এবং পুরস্কার লাভের অধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করবেন। সৎকর্মের পুরস্কার হিসাবে যারা জান্নাতে গমন করবেন, তারাও যেমন

আল্লাহর অনুগ্রহ লাভে ধন্য তেমনি যারা অসৎ কাজের বিনিময় হিসাবে জাহান্নামে গমন করবে, তারাও আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ও ইনাসাফ লাভ করেই যথাস্থানে গমন করবে। একদল মানুষ শাস্তি লাভের জন্য জাহান্নামে গমন করছে, এটা আল্লাহর ক্রোধের প্রকাশ নয়। এটাও তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের প্রকাশ। কারণ তিনি দয়া করে ন্যায় বিচার করবেন এবং যেখানে যার স্থান তাকে সে স্থানেই প্রেরণ করার ব্যবস্থা করবেন। মানুষের যাবতীয় কার্যাবলী তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তার হৃদয় কি কল্পনা করে, তাও তিনি জানেন। আল্লাহ বলেন-

يَعْلَمُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَاتُسِرُّوْنَ وَمَاتُعْلِنُونَ-وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ-

পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের প্রতিটি বিষয় তিনি জানেন। তোমরা যা কিছু গোপন করো আর যা কিছু প্রকাশ করো, তা সবই তিনি জানেন। তিনি মানুষের হৃদয়সমূহের অবস্থাও জানেন।

একদিকে আল্লাহ স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে মানুষের গতিবিধি, যাবতীয় কার্যকলাপ ও তার চিন্তা-কল্পনা, কামনা-বাসনা সমস্ত কিছুই জানেন। অপরদিকে প্রতিটি মানুষের সাথে দু'জন করে ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করেছেন। তারা মানুষের সাথে সম্পর্কশীল প্রতিটি কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ করে রাখছে। মানুষের কোন কথা বা কাজ রেকর্ডের বাইরে অলিখিত থাকে না। বিচার দিবসে আল্লাহর আদালতে যখনই মানুষকে উপস্থিত করা হবে, তখন পৃথিবীর জীবনে কে কি করেছে, তখন তাদের সামনে তা প্রদর্শন করা হবে।

শুধু তাই নয়, দু'জন ফেরেশ্‌তাও সাক্ষী হিসাবে দন্ডায়মান থাকবেন। তারা মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপের লিখিত ও ধারণকৃত ছবি প্রমাণ হিসাবে পেশ করবেন। বিচার দিবসে আল্লাহর আদালতে মানুষ পৃথিবীতে যত কথা বলেছিল, সে কথাগুলো নিজের কানে নিজের কণ্ঠেই শুনতে পাবে। শুধু তাই নয়, নিজের চোখ দিয়ে তার যাবতীয় কর্মকান্ডের চলমান ছবি এমনভাবে দেখতে পাবে যে, ঘটনার যথার্থতা ও নির্ভুলতাকে অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। সূরা ক্বাফ্-এ আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ-وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ-اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ-مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ-

মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমি এবং তার মনে প্রতি মুহূর্তে কখন কি কল্পনা-কামনা-বাসনার উদয় তাও আমি জানি। আমি তার কণ্ঠের শিরার থেকে অত্যন্ত কাছে অবস্থান করছি। দু'জন লেখক তার ডান ও বাম দিকে অবস্থান করে প্রতিটি বিষয় লিপিবদ্ধ করে রাখছে। মানুষ এমন কোন শব্দই উচ্চারণ করে না যা সংরক্ষণের জন্য একজন চির-উপস্থিত পর্যবেক্ষক মওজুদ থাকে না।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে-মানুষ নানা বয়সের হায়াত লাভ করে। কেউ একশো বছরেরও

বেশী হায়াত পায়। যে ব্যক্তি একশো দশ বছর হায়াত পেয়েছিল তার ওই একশো দশ বছরের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব যে খাতা বা আমলনামায় লেখা হবে, সে আমলনামার সাইজ বা আকৃতি তো বিরাট হবে! অতবড় খাতা বহন করতে তো একটা ট্রাক দরকার হবে। মানুষ তা কিয়ামতের দিন হাতে নেবে কিভাবে ? কিন্তু এ ব্যাপারে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই উত্তরটা সহজে পাওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞান ফিল্ম এবং কম্পিউটার আবিষ্কার করেছে। সর্বক্ষেত্রে তা ব্যবহার হচ্ছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে ফিল্‌ম এবং কম্পিউটার ছাড়া বর্তমানে সবই অচল।

এই ফিল্‌মের মধ্যেই বিশাল ওই আকাশ, সূর্য, বিরাট সমুদ্র, বিশাল আকৃতির হাতী, পূর্ণাঙ্গ মানুষের ছবি ধরে রাখা হচ্ছে যুগের পর যুগ ধরে। এই ফিল্‌ম আবিষ্কার করার জ্ঞান মানুষকে আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন। ছোট একটা ফিল্‌মের মধ্যে যদি মানুষ পারে ওই বিশাল আকাশের, সমুদ্রের ছবি ধরে রাখতে, তাহলে আল্লাহ কি পারেন না ওই ধরণের ক্ষুদ্র কোন ফিল্‌মের মধ্যে মানুষের মাত্র একশো দেড়শো বছরের কর্মকাণ্ডের ছবি ধরে রাখতে?

কম্পিউটারের ছোট একটা ডিস্‌ক। যা তিন আঙ্গুলে ধরা যায়। ওই ডিস্‌কের মধ্যে শত শত কোটি টাকার হিসাব ধরে রাখা যায়। মাউস আর কী-বোর্ডের সাহায্যে সব হিসাব বের হয়ে পড়ে। ওই ছোট একটা ডিস্‌কের মধ্যে লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠার বই ধরে রাখা যায়। মানুষ যদি ইচ্ছা করে ওই বইয়ের চল্লিশ হাজার চারশত তিরানব্বই পৃষ্ঠায় কি আছে তা পড়বে। মাউস আর কী-বোর্ডের সাহায্যে ওই কাংখিত পৃষ্ঠা কম্পিউটারের মনিটরে ভেসে উঠবে-মানুষ তা পড়তে পারবে। যে আল্লাহ তার সৃষ্টি মানুষের মথায় কম্পিউটার আবিষ্কারের জ্ঞান দান করেছেন, ওই আল্লাহ কি এর চেয়েও উন্নত কোন কিছুর মাধ্যমে মানুষের সামান্য এক দেড়শত বছরের কর্মকান্ড ধরে রেখে তা মানুষের হাতে দিতে পারবেন না ? নিশ্চয়ই তিনি পারবেন।

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ন্যায় ও ইনসাফের মুখাপেক্ষী। যার দ্বারায় অন্যায় সংঘটিত হয়, সে ব্যক্তিও তা ন্যায় মনে করে সংঘটিত করে না। তার বিবেকই তাকে কর্মটি সম্পর্কে জানিয়ে দেয় যে–এটা অন্যায় কর্ম। সুতরাং মানুষের দ্বারা সংঘটিত যাবতীয় কর্মই দাবি করে যে, এসব কর্মের চুলচেরা বিচার হওয়া উচিত এবং উপযুক্ত কর্মফল লাভ করা উচিত। আল্লাহ রাহ্‌মান ও রাহীম, এটা তাঁর অসীম অনুগ্রহ যে, তিনি মানুষের যাবতীয় কর্মফল যথাযথভাবে দান করার জন্যই ইনসাফের দাবি অনুসারে বিচার দিবস নির্দিষ্ট করেছেন।

বিচার দিবসের প্রতি সন্দেহ পোষনকারীদের যুক্তি

মানব-মন্ডলীকে সঠিক পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে এই পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল আগমন করেছেন এবং তাঁরা সকলেই মানুষকে বিচার দিবস সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তাঁরা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিচার দিবস নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু বলছে এবং করছে, বিচার দিবসে এসব কিছুর চুলচেরা বিচার করা হবে ও কর্মলিপি অনুসারে মানুষ পুরস্কৃত হবে এবং দন্ডলাভ করবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী জীবনই হলো মানুষের আসল জীবন–সেই জীবনে যে ব্যক্তি সফলতা অর্জন করতে পারবে, সেটাই প্রকৃত সফলতা। আর সেই সফলতা অর্জন করতে হলে পৃথিবীতে মানুষকে অবশ্যই মহান

আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করতে হবে। নবী-রাসূলগণ যখনই বিচার দিবসের কথা বলেছেন, তখনই এক শ্রেণীর মানুষ মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে নানা ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করেছে এবং এ ব্যাপারে বিদ্রোহীর ভূমিকা অবলম্বন করেছে। এ ধরনের বিদ্রোহী ভূমিকা শুধু সেই যুগের মানুষই অবলম্বন করেনি, প্রতিটি যুগেই এটা করা হয়েছে। পরকালে অবিশ্বাসী মানুষগুলো প্রতিটি যুগেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করেছে, এখনও করছে এবং পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত করতে থাকবে।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, বিচার দিবসের কথা শোনার সাথে সাথে একশ্রেণীর মানুষ কেন প্রচন্ডভাবে ক্ষেপে উঠেছে এবং প্রবল বিরোধিতার ঝান্ডা উড্ডিন করেছে ? কেন তারা নানা ধরনের যুক্তির অবতারণা করে বিচার দিবসকে অস্বীকার করেছে ? কেন তারা ঐ লোকগুলোর ওপরে নির্যাতন শুরু করেছে, যারা বিচার দিবস সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছে ? এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে সেই শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাহলো, যুগে যুগে যারা পরকাল অস্বীকার করেছে, বিচার দিবস সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করেছে, ঐ দিনটি সম্পর্কে বিতর্ক করেছে, এই বিতর্ক-সন্দেহ-সংশয়ের পেছনে একটি মনস্তাত্বিক কারণ সক্রিয় ছিল।

যারা বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসী এই পৃথিবীতে তাদের জীবনধারা হয় এক ধরনের আর যারা বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাসী, তাদের জীবনধারা হয় ভিন্ন ধরনের। বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসীদের জীবনধারা হলো, তারা যে কোন কাজই করুন না কেন, তাদের প্রতিটি কথা ও কাজের পেছনে এই অনুভূতি সক্রিয় থাকে যে, আল্লাহর কাছে বিচার দিবসে জবাবদিহি করতে হবে। এই পৃথিবীতে তারা যা কিছুই বলছে এবং করছে, এসবের জন্য মহান আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। সে যদি কোন অসৎ কথা বলে এবং কাজ করে তাহলে তাকে আল্লাহর দরবারে শাস্তি পেতে হবে। এই পৃথিবীর জীবনই শেষ নয়, মৃত্যুর পরের জীবনই হলো আসল জীবন। সেই জীবনে তাকে সফলতা অর্জন করতে হবে। এই অনুভূতি নিয়ে সে পৃথিবীর জীবনকে পরিচালিত করে।

আর যারা বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাসী, পৃথিবীতে তাদের জীবনধারা হলো বল্গাহীন পশুর মতোই। তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ্ বলছেন–

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ–

আর এরা বলে, যখন আমরা মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবো তখন কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে ? (সূরা আস্ সাজ্দাহ্-১০)

অর্থাৎ এদের বিশ্বাস হলো, মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই। নির্দিষ্ট সময়ের পরে একদিন আমরা মৃত্যুবরণ করবো, যার যার নিয়ম অনুসারে আমাদের অন্তেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে, আমাদের দেহ যেসব উপকরণ দিয়ে নির্মিত হয়েছিল, সেসব উপকরণ এই পৃথিবীতেই যখন বিদ্যমান রয়েছে, তখন সেসব উপকরণ পৃথিবীতেই মিশে যাবে। কারো দরবারেও আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে না এবং আমাদের কোন কর্ম বা কথা সম্পর্কে কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতেও হবে

না। বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাসীদের এই অনুভূতির কারণে পৃথিবীতে এদের কথা ও কাজের ব্যাপারে কোন নিয়ম এরা অনুসরণ করে না। তার কথায় কার কি ক্ষতি হতে পারে, কে মনে আঘাত পেতে পারে এসব চিন্তা তারা করে না। নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য এরা যে কোন কাজই করতে পারে। তার কাজের দ্বারা ব্যক্তি বা দেশ ও জাতি কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হলো, এ চিন্তা এদের মনে স্থান পায় না।

এদের একমাত্র চিন্তাধারা হলো, এই পৃথিবীর জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন, তা যে কোন কিছুর বিনিময়ে হলেও অর্জন করতে হবে। যৌন অনাচারের মাধ্যমে যদি প্রভূত অর্থ আমদানী করা যায়, তাহলে তা করতে কোন দ্বিধা এদের থাকে না। সুদের প্রচলন ঘটিয়ে, অশ্লীলতার প্রসার ঘটিয়ে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে, মিথ্যা-শঠতা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ইত্যাদির মাধ্যমে যদি নিজের স্বার্থ অর্জিত হয়, তাহলে অবশ্যই তা করতে হবে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটিই–জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করো। এই জীবন একবার হারালে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, সুতরাং জীবিত থাকাবস্থায় ভোগের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে হবে। খাও দাও আর ফূর্তি করো–(Eat, Drink and Be Maerry) এটার নামই হলো জীবন।

আল্লাহর বিধান মেনে নিয়ে বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে গেলেই পৃথিবীর জীবন হয়ে যাবে নিয়ন্ত্রিত। আল্লাহর বিধান বলছে, মানুষের প্রতিটি কথা রেকর্ড করা হচ্ছে এবং বলা কথা সম্পর্কে বিচার দিবসে জবাবদিহি করতে হবে–অতএব হিসাব করে কথা বলতে হবে। আল্লাহর বিধান বলছে, যৌন অনাচারের মুখে লাগাম দিয়ে বিয়ের মাধ্যমে বৈধভাবে যৌবনকে ভোগ করতে হবে। অতএব ফুলে ফুরে ঘুরে বিচিত্র উপায়ে যৌবনকে আর ভোগ করা যাবে না। আল্লাহর বিধান বলছে, বৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন করতে হবে–এতে যদি সংসারে টানাটানি দেখা দেয় তবুও অবৈধ উপার্জনের পথ অবলম্বন করা যাবে না। অতএব অবৈধভাবে উপার্জন বন্ধ হবে, ভোগ্-বিলাসের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, কালো টাকার পাহাড় গড়ার রাস্তা বন্ধ হবে, অপরের স্বার্থে আঘাত হানার যাবতীয় পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

এক কথায় গোটা জীবনকে একটি নিয়মের অধীন করে দিতে হবে। তাহলে তো পৃথিবীতে যেমন খুশী তেমনভাবে চলা যাবে না, জীবনকেও ভোগ করা যাবে না। সুতরাং আল্লাহর ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস–এই মতবাদকে কোনক্রমেই মেনে নেয়া যাবে না এবং এই মতবাদ যেন দেশের বুকে প্রচার না হতে পারে, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ, এই মতবাদ দেশের বুকে প্রচার করতে দেয়া হলে, দেশের জনগণ ক্রমশঃ এই মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, এই মতবাদে বিশ্বাসীদের দল ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করবে, তখন এদের চাপে বাধ্য হয়েই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

উল্লেখিত কারণেই নবী-রাসূলদের সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে এবং সুদূর অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলন যারা করছে, তাদের সাথে বিচার দিবস অস্বীকারকারীদের সাথে সংঘাত চলছে। বিচার দিবসকে যারা অস্বীকার করে তারা ভোগবাদে বিশ্বাসী। জীবনকে কানায় কানায় ভোগ করার প্রবণতাই এদেরকে বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাসী করেছে। এই

চিন্তাধারার অধিকারী ব্যক্তিগণই জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। জীবনের একভাগে থাকবে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে কোনক্রমেই ধর্ম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আর দ্বিতীয় ভাগে ব্যক্তি জীবনে যদি কেউ ধর্ম অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়, তাহলে সে ব্যক্তিগতভাবে তা অনুসরণ করতে পারে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না আর এটারই নাম দেয়া হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাসের প্রবণতাই জন্ম দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ।

নির্যাতন নিষ্পেষনের অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়েই ইসলামী আন্দোলন অগ্রসর হয়েছে এবং বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসীদের সংখ্যা এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, অবিশ্বাসীরা তখন প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বাসীদের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি না করে শঠতা আর ধূর্ততার চোরা পথে এগিয়ে গিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ অনুসরণ করলে একদিকে যেমন জীবনকেও যথেচ্ছাভাবে ভোগ করা যাবে, অপরদিকে বিচার দিবসে জবাবদিহির অনুভূতি সক্রিয় রেখে যারা জীবন পরিচালিত করতে আগ্রহী, তারাও ব্যক্তিগত জীবনে তাদের আদর্শানুসারে চলতে পারবে। ফলে উভয় দলের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাতও দেখা দিবে না এবং ধর্মনিরপেক্ষতার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে দেশে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হবে, সেই পরিবেশই মানুষের অন্তর থেকে বিচার দিবসে জবাবদিহির অনুভূতি বিদায় করে দেবে। এভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীরা নাস্তিক্যবাদকে বিকশিত করার ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করে থাকে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ অন্যান্য নবী-রাসূলগণ যখন সত্য সঠিক পথ অবলম্বন করার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তোমরা যদি অন্যায় পথেই চলতে থাকো, তাহলে বিচার দিবসে আল্লাহর আদালতে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। তখন তারা রাসূলের আহ্বানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে নানা ধরনের ভিত্তিহীন যুক্তি প্রদর্শন করেছে। তাদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন–

اِنْ هِيَ اِلاَّ مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَانَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ–

এরা বলে, আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতিত আর কিছুই নেই। এরপর আমাদের পুনরায় আর উঠানো হবে না। যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের জীবিত করে আনো। (সূরা আদ দুখান-৩৫-৩৬)

অর্থাৎ মানুষের জীবনে মৃত্যু বার বার আসে না–একবারই আসে। এই একবারেই মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। যারা বিচার দিবসের কথা বলে, তারা যদি তাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়, তাহলে আমাদের পূর্বে যারা এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে, তাদের ভেতর থেকে দু'চারজনকে উঠিয়ে নিয়ে এসে প্রমাণ করে দিক যে, মৃত্যুর পরেও আরেকটি জীবন রয়েছে।

এ ধরনের হাস্যকর যুক্তি শুধু সে যুগেই প্রদর্শন করা হয়নি, বর্তমান যুগেও তথাকথিত বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে, মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। মূল বিষয় হলো সময়। সময় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এই সময়ই মানুষকে

ক্রমশঃ নিঃশেষের দিকে নিয়ে যায়। কালের গর্ভে সমস্ত কিছুই বিলীন হয়ে যায়। কালের অন্ধকার বিবরে একবার যা প্রবেশ করে তা পুনরায় ফিরে আসে না। মানুষ এক সময় শিশু থাকে, কালের বিবর্তনে এই শিশু একদিন বৃদ্ধ হয়ে যায়। এ ধরনের যুক্তি তথাকথিত বিজ্ঞানের যুগেই দেয়া হচ্ছে না। যে যুগটিকে মূর্খতার যুগ (Days of ignorance) নামে অভিহিত করা হয়, সেই যুগেও একই যুক্তি প্রদর্শন করা হতো। তারা কি যুক্তি প্রদর্শন করতো, এ সম্পর্কে সূরা জাসিয়ার ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা শোনাচ্ছেন–

وَقَالُوْا مَاهِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَاوَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ–

এরা বলে, জীবন বলতে তো শুধু আমাদের পৃথিবীর এই জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই এবং কালের বিবর্তন ব্যতিত আর কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করে না।

বিচার দিবস সম্পর্কে যারা সন্দেহমূলক প্রশ্ন তোলে, তারা এ ধরনের বালখিল্য যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে। মানুষ ইন্তেকাল করে এবং আর কোনদিন ফিরে আসে না, এটাই এদের কাছে বড় প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরে আর দ্বিতীয় কোন জীবন নেই। ইন্তেকালের পরে মানুষের দেহ পচে যায়, মাটির সাথে গোস্ত মিশে যায়। রয়ে যায় হাড়গুলো, তারপর সে হাড়ও একদিন মাটির সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মানুষের আর কোনই অস্তিত্ব থাকে না। বিচার দিবসে বিশ্বাসীগণ যখন বলেন, মাটির মিশে যাওয়া অস্তিত্বহীন মানুষই বিচার দিবসে পুনরায় দেহ নিয়ে উত্থিত হবে, তখন এদের কাছে বিষয়টি বড় অদ্ভুত মনে হয়। বিস্ময়ে এরা প্রশ্ন করে, অস্তিত্বহীন মানুষ কি করে পুনরায় অস্তিত্ব লাভ করবে ? এটা অসম্ভব ! সুতরাং বিচার দিবস বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এদের বলা কথাগুলো মহান আল্লাহ এভাবে কোরআনে পরিবেশন করেছেন–

وَقَالُوا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا–

তারা বলে, আমরা যখন শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করে উঠানো হবে ? (সূরা বনী ইসরাঈল-৪৯)

শুধু তাই নয়, বিচার দিনের ব্যাপারটিকে তারা বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করে থাকে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মানুষকে পরকালে জবাবদিহির বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতেন, তখন তারা বলতো, লোকটি নিজে এ সম্পর্কে কথা রচনা করে তা আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছে অথবা তার মাথা ঠিক নেই। কারণ মাথা ঠিক থাকলে সে কি করে বলে যে, মাটির সাথে হাড়-মাংস মিশে যাওয়া মানুষ পুনরায় নিজের অস্তিত্বে প্রকাশ হয়ে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করবে ? এই লোকগুলো পথ চলতে যার সাথেই দেখা হতো, তার কাছেই রাসূল সম্পর্কে বিদ্রূপ করে যে কথাগুলো বলতো, তা পবিত্র কোরআন এভাবে পেশ করেছে–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ–اِنَّكُمْ لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ–اَفْتَرَاى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ–

অবিশ্বাসীরা লোকদেরকে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলবো, যে ব্যক্তি এই ধরনের সংবাদ দেয় যে, যখন তোমাদের শরীরের প্রতিটি অণু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তখন তোমাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করে দেয়া হবে, না জানি এই ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে, না কি তাকে পাগলামিতে পেয়ে বসেছে। (সূরা সাবা-৭-৮)

বিচার দিবস সম্পর্কে কোরআনের যুক্তি

অবিশ্বাসীদের যুক্তি হলো, এ পর্যন্ত কোন মানুষ ইন্তেকাল করার পরে পুনরায় ফিরে আসার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই, সুতরাং পরকালে মানুষকে পুনরায় জীবিত করো হবে, এ কথা কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। তারা চ্যালেঞ্জ করে বলতো যে, যদি সত্যই বিচার দিবস নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে, সেদিন আল্লাহর আদালতে মৃত মানুষগুলো জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করার বিষয়টি সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের পূর্বে যারা ইন্তেকাল করেছে, তাদের মধ্য থেকে যে কোন ব্যক্তিকে জীবিত করে এনে আমাদেরকে দেখাও-তাহলে আমরা বিশ্বাস করবো, বিচার দিবস বলে কিছু আছে। এদের এই দাবিই অপ্রাসঙ্গিক।

কারণ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর অনুসারীগণ বর্তমান সময় পর্যন্ত এমন কথা কখনো বলেননি যে, আমরা মৃত মানুষকে জীবিত করে দেখাতে পারি। ইশারা ইঙ্গিতেও তারা কখনো এ ধরনের অমূলক দাবি করেননি। তাহলে যে বিষয়ে কোন কথা বলা হয়নি বা দাবি করা হচ্ছে না, সে বিষয়কে কেন প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে ? তাদের উদ্দেশ্য একটিই আর তাহলো, তারা বিচার দিবসকে মেনে নেবে না। বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ইচ্ছে থাকলে তর্কের রীতি অনুসরণ না করে অপ্রাসঙ্গিক কথা টেনে আনা হতো না।

মৃতকে জীবিত যদি কেউ দেখতে আগ্রহী হয়, তাহলে কবরের মানুষগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত না করে প্রথমে নিজের দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। প্রতিদিন অসংখ্য দেহকোষ কিভাবে মৃত্যুবরণ করছে এবং কিভাবে নতুন দেহকোষ জীবিত হচ্ছে। প্রাণহীন ভ্রূণ থেকে কিভাবে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু জন্ম লাভ করছে। মানুষের জন্মের বিষয়টির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। এক বিন্দু নাপাক পানির মধ্যে এমন কি রয়েছে, যা চোখে দেখা যায় না। তা থেকে কিভাবে পূর্ণাঙ্গ একটি মানব শিশু প্রস্তুত হয়ে পৃথিবীতে আগমন করছে। ক্রমশঃ সেই শিশু একটি সুন্দর দেহধারী মানুষে পরিণত হচ্ছে। এভাবে মানব সৃষ্টির গোটা প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে কি মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়ার বিষয়টিকে অসম্ভব বলে মনে হয় ? প্রাণী জগতের দিকে তাকালেও সেই একই বিষয় ধরা পড়ে। ডিমগুলোর মধ্যে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই, অথচ সেই ডিম থেকে কিভাবে জীবিত বাচ্চা পৃথিবীতে বেরিয়ে আসছে।

চৈত্র মাসের খর-তাপে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। নদী-নালা-খাল-বিল-হাওড় শুকিয়ে মরুভূমির মতো হয়ে যায়। এক সময় যেখানে সবুজের সমারোহ ছিল, দৃষ্টি-নন্দন নৈসর্গিক দৃশ্য বিরাজিত ছিল। প্রচন্ড দাবদাহে সেখানে কোন মানুষের পক্ষে মুহূর্ত কাল দাঁড়ানো কষ্টকর হয়ে ওঠে। যমীন প্রাণশক্তি হারিয়ে মৃত পতিত আকার ধারণ করে। আল্লাহ বলেন-

وَاللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا-كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ-

আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন তারপর তা মেঘমালা উঠায় এরপর আমি তাকে নিয়ে যাই একটি জনমানবহীন এলাকার দিকে এবং মৃত-পতিত যমীনকে সঞ্জীবিত করে তুলি। মৃত মানুষদের জীবিত হয়ে ওঠাও তেমনি ধরনের হবে। (সূরা ফাতির-৯)

বিচার দিবস তথা পরকাল হবে কি হবে না, এ বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য কোন গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না। পদতলে নিষ্পেষিত দুর্বা ঘাসগুলোর দিকে তাকালেই অনুভব করা যায়। বিশেষ মৌসুমে এই ঘাসগুলো গালিচার মতোই হয়ে ওঠে। সৌন্দর্য পিয়াসী ব্যক্তিগণ নরম তুলতুলে এই ঘাসগুলোর ওপরে শুয়ে নীল আকাশের সৌন্দর্য উপভোগ করে। কবি, সাহিত্যিকদের কল্পনার বদ্ধ দুয়ার দ্রুত অর্গল মুক্ত হয়। আবার বিশেষ এক মৌসুমের আগমন ঘটে, তখন সেই সুন্দর ঘাসগুলো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। যে স্থানে সবুজ ঘাসের নীল গালিচার ওপরে শুয়ে কবি একদিন তার কল্পনার বদ্ধ দুয়ার অর্গল মুক্ত করেছিল, সে স্থানে সবুজের কোন চিহ্ন থাকে না, রুদ্র প্রয়াগের তপ্ত নিঃশ্বাস আর মৃতের হাহাকার সেখানে ভেসে বেড়ায়।

এরপর মাত্র এক পশলা বৃষ্টি বর্ষিত হলো, তারপর মৃত-ভূমি অকস্মাৎ সবুজ শ্যামল আভায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো এবং দীর্ঘকালের মৃত শিকড়গুলো সবুজ চারাগাছে রূপান্তরিত হয়ে মাটির বুকে আবার বিছিয়ে দিল নমনীয় নীল গালিচা। দৃষ্টি বিমোহিত এই দৃশ্য দেখেও কি মনে হয়, মৃত মানুষকে পুনরায় আল্লাহর পক্ষে জীবন দান করা অসম্ভব ? এসব কিছু দেখার পরেও বিচার দিবস সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে ? সূরা হজ্জ-এর ৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন-

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ-وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَانَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ-

হে মানব মন্ডলী ! যদি তোমাদের মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা জেনে রেখো, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর রক্তপিন্ড থেকে, তারপর গোশ্তের টুকরা থেকে, যা আকৃতি বিশিষ্টও হয় এবং আকৃতিহীনও হয়। (এসব বর্ণনা করা হচ্ছে) তোমাদের কাছে সত্য সুস্পষ্ট করার জন্য। আমি যে শুক্রকে চাই একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত গর্ভাশয়ে স্থিত রাখি, তারপর একটি শিশুর আকারে তোমাদের বের করে আনি, (তারপর তোমাদের প্রতিপালন করি) যেন তোমরা পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে যাও।

বিচার দিবসে কিভাবে মাটির সাথে মিশে যাওয়া মানুষগুলো পুনরায় জীবিত হবে, এ ব্যাপারে যদি তোমাদের কারো মনে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয় তাহলে তোমরা নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে

একটু চিন্তা করে দেখো, তোমরা কি ছিলে। তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। এমন এক ফোটা পানি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করা হলো, যে পানি দেহ থেকে নির্গত হলে গোসল ফরজ হয়ে যায়। সেখানে তোমাদেরকে আমি অস্তিত্ব দান করেছি। তারপর তোমাদেরকে আমিই প্রতিপালন করে সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী যুবকে পরিণত করি। এভাবে তোমাদেরকে আমি প্রথমবার যখন সৃষ্টি করেছি, তখন তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কি আমার পক্ষে অসম্ভব মনে করো ? শুধু তাই নয়, অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে তোমাদেরকে আমিই সৃষ্টি করে মাতৃগর্ভ থেকে শিশুর আকারে পৃথিবীতে এনে যুবকে পরিণত করি। এরপর তোমাদেরকে আমি কোন পরিণতিতে পৌঁছে দেই শোন–

وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا-

আর তোমাদের মধ্য থেকে অনেককেই তার পূর্বেই আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসি এবং কাউকে হীনতম বয়সের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যেন সবকিছু জানার পরেও আর কিছুই না জানে। (সূরা আল হাজ্জ-৫)

তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না, সেখান থেকে অস্তিত্ব দান করলাম। তারপর তোমাদেরকে কৈশোর, যুবক ও বৃদ্ধাবস্থার দিকে নিয়ে যেতে থাকি। এভাবে নিয়ে যাওয়ার মধ্যস্থিত সময়ে অনেককেই আমি মৃত্যু দান করি। তোমরা কেউ কিশোর অবস্থায়, তরুণ বয়সে, যুবক বয়সে মৃত্যুবরণ করো। আবার কাউকে কাউকে আমি বয়সের এমন এক প্রান্তে পৌঁছে দেই, তখন সে নিজের শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন যত্ন নেয়া দূরে থাক, সংবাদই রাখতে সক্ষম হয় না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যকে জ্ঞান বিতরণ করতো, সে বয়সের শেষ প্রান্তে পৌঁছে শুধু শিশুর মতো জ্ঞানহীনই হয়ে যায় না, একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তির এত পান্ডিত্য ছিল, জ্ঞান ছিল, নানা ধরনের বিদ্যা অর্জন করেছিল, বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে বিশেষজ্ঞ ছিল, কত অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা ছিল। তার এসব গর্বের বস্তুকে এমনই অজ্ঞতায় পরিবর্তিত করে দেই যে, একদিন তার কথা অসংখ্য জ্ঞানী মানুষ নিবিষ্ট চিত্তে মনোযোগ দিয়ে শুনতো, এখন তার কথা শুনলে ছোট্ট একটি শিশুও হাসে। কোথা থেকে তোমাদেরকে আমি কোন অবস্থায় নিয়ে আসি, তা দেখেও কি তোমরা বুঝো না, বিচার দিবসে তোমাদেরকে আমি একত্রিত করতে সক্ষম হবো ? রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ-ذَالِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَالْحَقُّ وَاَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لاَّرَيْبَ فِيْهَا-وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ-

আর তোমরা দেখছো যমীন বিশুষ্ক পড়ে রয়েছে তারপর যখনই আমি তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি তখনই সে সবুজ শ্যামল হয়েছে, স্ফীত হয়ে উঠেছে এবং সবধরনের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদ্গাত করতে শুরু করেছে। এসব কিছু এজন্য যে, আল্লাহ সত্য, তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী। আর এই (এ কথার প্রমাণ) যে, কিয়ামতের সময় অবশ্যই আসবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে উঠবেন যারা কবরে চলে গিয়েছে। (সূরা আল হাজ্জ-৫-৭)

যারা বিচার দিবস সম্পর্কে সন্দেহ সংশয়ের আবর্তে দোলায়িত হচ্ছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ আছেন একথা অবশ্যই সত্য। মানুষ যখন মরে গিয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে, তারপর তাদের আর জীবিত হবার কোনই সম্ভাবনা নেই-যারা এ ধারনা পোষণ করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আল্লাহর অস্তিত্ব নিছক কাল্পনিক কোন বিষয় নয়। কোন বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতা পরিহার করার লক্ষ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব আবিষ্কার করা হয়নি।

তিনি নিছক দার্শনিকদের চিন্তার আবিষ্কার, অনিবার্য সত্তা ও সকল কার্যকারণের প্রথম কারণই নয় বরং তিনি প্রকৃত স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তা, যিনি সময়ের প্রতি মুহূর্তে নিজের অসীম শক্তিমত্তা, সংকল্প, জ্ঞান ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ এবং এর প্রতিটি বস্তু পরিচালনা করছেন। তিনি খেয়ালের বশে এসব কিছু সৃষ্টি করেননি। এসব সৃষ্টি করার পেছনে কোন শিশু সুলভ মনোভাবও কাজ করেনি যে, শিশুর মতো খেলা শেষ হলেই সমস্ত কিছুই ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ ধূলায় উড়িয়ে দেয়া হবে। বরং তিনি সত্য এবং তাঁর যাবতীয় কাজই গুরুত্বপূর্ণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ। বিজ্ঞানের সুষমায় প্রতিটি সৃষ্টিই সুষমা মন্ডিত।

বিচার দিবসের প্রতি যারা সন্দেহ পোষণ করে, তারা যদি সৃষ্টি জগতের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্মের প্রক্রিয়া নিয়ে সামান্য চিন্তা করে, তাহলে সে অবগত হতে পারবে যে, একজন মানুষের অস্তিত্বের ভেতরে মহান আল্লাহর প্রকৃত ও বাস্তব ব্যবস্থাপনা এবং বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় রয়েছে। প্রতিটি মানুষের অস্তিত্ব, বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রত্যেকটি পর্যায়েই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্বেচ্ছামূলক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। অবিশ্বাসীরা বলে থাকে যে, এসব সৃষ্টির পেছনে কোন নিয়মতান্ত্রিক স্রষ্টা বলে কেউ নেই। যা ঘটছে তা একটি প্রাকৃতিক নিয়মের অধিনেই ঘটছে।

পক্ষান্তরে এই হতভাগারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাবে যে, প্রতিটি মানুষ যেভাবে অস্তিত্ব লাভ করে এবং তারপর যে প্রক্রিয়ায় অস্তিত্ব লাভের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে, তার ভেতরে একজন সুবিজ্ঞ, মহাবিজ্ঞানী ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী প্রচন্ড শক্তিশালী সত্তার ইচ্ছামূলক সিদ্ধান্ত কিভাবে সুপরিকল্পিত পন্থায় সক্রিয় রয়েছে। মানুষের গ্রহণকৃত খাদ্যের মধ্যে কোথাও মানবিক বীজ গোপন থাকে না যা মানবিক প্রাণের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। গ্রহণকৃত খাদ্য উদরে প্রবেশ করে কোথাও গিয়ে রক্ত, কোথাও গিয়ে হাড়, কোথাও গিয়ে গোশ্তে পরিণত হয়। আবার বিশেষ স্থানে তা পৌঁছে গ্রহণকৃত সেই খাদ্যই এমন শুক্রে পরিণত হয়, যার ভেতরে যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ মানুষের পরিণত হবার যোগ্যতার অধিকারী বীজ লুকায়িত থাকে। এই লুকায়িত বীজের সংখ্যা এতটা অধিক যে, একজন পুরুষ থেকে প্রতিবারে যে শুক্র নির্গত

হয় তার মধ্যে কয়েক কোটি শুক্রকীট অবস্থান করে এবং তার প্রতিটি নারীর ডিম্বাণুর সাথে মিশে মানুষের রূপ লাভ করার যাবতীয় যোগ্যতা ধারণ করে। কিন্তু একজন মহাবিজ্ঞানী, অসীম শক্তিশালী একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন শাসকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেই অসংখ্য শুক্রকীটের মধ্য থেকে মাত্র একটিকে নির্বাচিত করে নারীর ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হবার সুযোগ করে দেয়া হয়। এভাবে চলে গর্ভধারণ প্রক্রিয়া এবং গর্ভধারণের সময় পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ডিম্বকোষের মিলনের ফলে প্রাথমিক অবস্থায় এমন একটি জিনিস অস্তিত্ব লাভ করে এবং সেটা এতই ক্ষুদ্র যে, তা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিত চোখে দেখা সম্ভব নয়।

সেই ক্ষুদ্র জিনিসটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গর্ভাশয়ে প্রতিপালিত হয়ে বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে অপূর্ব সুন্দর একটি দেহ কাঠামো ধারণ করে পূর্ণাঙ্গ একটি মানুষে পরিণত হয়। মানুষের জন্মের প্রতিটি জটিল স্তরের বিষয়টি সম্পর্কে কেউ চিন্তা-করলেই তার মন-মস্তিষ্ক দ্বিধাহীন চিত্তে দৃঢ়ভাবে সাক্ষী দেবে যে, এসব বিষয়ের ওপরে প্রতি মুহূর্তে একজন সদা তৎপর মহাবিজ্ঞানীর ইচ্ছামূলক সিদ্ধান্ত সঠিক পন্থায় কাজ করে চলেছে। সেই সুবিজ্ঞ মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তা'য়ালাই সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, কোন মানুষকে তিনি পূর্ণতায় পৌঁছাবেন, কাকে তিনি ভ্রুণ অবস্থাতেই শেষ করে দিবেন, কাকে তিনি গর্ভে দেহ কাঠামো দান করার পরে শেষ করবেন, কাকে তিনি পৃথিবীতে আসার পরে প্রথম নিঃশ্বাস গ্রহণের সুযোগ দেবেন অথবা দেবেন না।

মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যেই তিনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কাকে তিনি জীবিত নিয়ে আসবেন আর কাকে তিনি মৃত নিয়ে আসবেন। কাকে তিনি মাতৃগর্ভ থেকে সাধারণ মানুষের আকার আকৃতিতে বের করে আনবেন, আবার কাকে তিনি অস্বাভাবিক কোন আকার দিয়ে পৃথিবীতে আনবেন। কাকে তিনি সুন্দর অবয়ব দান করে আনবেন অথবা কুৎসিত অবয়ব দান করে পৃথিবীর আলো-বাতাসে নিয়ে আসবেন। কাকে তিনি পূর্ণাঙ্গ মানবিক অবয়ব দান করবেন অথবা বিকলাঙ্গ করে আনবেন। কাকে তিনি পুরুষ হিসাবে আনবেন অথবা কাকে তিনি নারী হিসাবে আনবেন। কাকে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার মতো যোগ্যতা দিয়ে আনবেন, অথবা কাকে তিনি একেবারে নির্বোধ-বোকা হিসাবে পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন।

মানুষের সৃজন ও আকৃতিদানের এসব প্রক্রিয়া সময়ের প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর অসংখ্য নারীর গর্ভাশয়ে বিরামহীন গতিতে সক্রিয় রয়েছে। এই প্রক্রিয়ার ভেতরে কোন একটি পর্যায়েও একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত পৃথিবীর কোন একটি শক্তিও সামান্যতম প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ নয়। এসব অসম্ভব প্রক্রিয়া দেখেও কেউ যদি বলে যে, বিচার দিবসে মানুষকে পুনরায় জীবনদান করা অসম্ভব ব্যাপার–তাহলে তাকে হতভাগা ও নির্বোধ ব্যতিত আর কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যেতে পারে ?

মহান আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করবেন, এ কথা শুনে অবাক হবার কিছুই নেই। প্রতিটি বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা কোন প্রক্রিয়ায় মৃতকে জীবিত করছেন। এখানে পুনরায় বলতে হচ্ছে, গ্রহণকৃত খাদ্যের যেসব উপাদান দ্বারা মানুষের দেহ গঠিত হচ্ছে এবং যেসব উপকরণ দ্বারা সে প্রতিপালিত হচ্ছে, সেসব

উপায়-উপকরণসমূহ বিশ্লেষণ করলে নানা ধরনের পদার্থ ও অন্যান্য উপাদান পাওয়া যাবে কিন্তু জীবন ও মানবাত্মার কোন বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব তার ভেতরে পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে এসব মৃত, নির্জীব উপায়-উপকরণগুলোর সমাবেশ ঘটিয়েই মানুষকে একটি জীবিত ও প্রাণের স্পন্দন সম্বলিত অস্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। তারপর নানা উপাদান সম্বলিত খাদ্য মানুষের শরীরে পরিবেশন করা হয় এবং দেহের অভ্যন্তরে গ্রহণকৃত খাদ্যের নির্যাসের সাহায্যে পুরুষের মধ্যে এমন শুক্রকীট এবং নারীর মধ্যে এমন ডিম্বকোষের সৃষ্টি হয়, যাদের মিলিতরূপে প্রতি মুহূর্তে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত মানুষ প্রস্তুত হয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাসে বের হয়ে আসছে।

আল্লাহ তা'য়ালা কিভাবে মৃত থেকে জীবিত বের করেন, মানুষ দেখতে পারে তার চার পাশের পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে। বাতাস, পাখি ও অন্যান্য প্রাণী অসংখ্য উদ্ভিদের বীজ ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে রাখে। নানা ধরনের উদ্ভিদের মূল মাটির সাথে মিশে ছিল। এসবের মধ্যে উদ্ভিদ জীবনের সামান্যতম লক্ষণও বিদ্যমান ছিলনা। এসব বীজ ও মূল যেন কবরে প্রথিত রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। ওমনি উদ্ভিদের নিষ্প্রাণ বীজ আর বৃক্ষমূলগুলো মাটির কবর থেকে চারাগাছ রূপে মাথা উঁচু করে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করলো। মৃতকে জীবিত করার এই দৃষ্টি নান্দনিক দৃশ্য–এসব দেখেও যারা মনে করে, বিচার দিবসে আল্লাহর পক্ষে মৃত মানুষদেরকে জীবিত করা অসম্ভব, তাদেরকে চোখ-কান থাকার পরেও অন্ধ-বধির বিশেষণে বিশেষিত করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় থাকে না।

সৃষ্টিজগতের এসব নিদর্শনই বলে দিচ্ছে যে, মহান আল্লাহ অসীম শক্তিশালী এবং সেই শক্তির সামান্য অংশ প্রয়োগ করেই তিনি বিচার দিবসে মৃতদেরকে জীবিত করবেন। উদ্ভিদের জীবনধারার মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার মক্তিমত্তার যে অভাবনীয় কর্মকুশলতা দেখা যায়, সেগুলো দেখার পর কি কোন জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এ কথা বলতে পারে যে, সৃষ্টিজগতে এ পর্যন্ত যেসব কর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্পাদন করা হয়েছে এবং হচ্ছে, আল্লাহ এসবের বাইরে আর কোন নতুন কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম ?

এ ধরনের অবাঞ্ছিত ধারণা আল্লাহ সম্পর্কে যারা করেন, তাদের কাছে আমরা বিনয়ের সাথে নিবেদন করতে চাই, মানুষের সম্পর্কে স্বয়ং মানুষের ধারণা আজ থেকে মাত্র এক শতাব্দী বা পঞ্চাশ বছর পূর্বে কেমন ছিল ? বাষ্প ইঞ্জিন আবিষ্কারের পূর্বে এই মানুষ ধারণা করতে সক্ষম হয়নি যে, তারা এরচেয়ে বড় কোন কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। অথচ তারা ঐ বাষ্প ইঞ্জিনের থেকেও লক্ষ কোটি গুণে কার্যোপযোগী যন্ত্রযান নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৭ সনে আমি যখন লন্ডন সফর করি তখন সেখানের কিছু লোকজন আমাকে এমন একটি ডিজিটাল ডায়েরী দিয়েছিল, যার ভেতরে অসংখ্য তথ্য সংরক্ষণ করা ছাড়াও হাজার হাজার টেলিফোন নম্বর সংরক্ষণ করা যায়। এই ধরনের ডায়েরী মানুষ আবিষ্কারে সক্ষম হবে, এ কথা তারা মাত্র কিছুদিন পূর্বেও কল্পনা করতে পারেনি। মানুষ কম্পিউটার আবিষ্কার করেছে। এই কম্পিউটারের ভেতরে গোটা পৃথিবীর অসংখ্য তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। এভাবে প্রযুক্তিগত দিক থেকে মানুষ যে উন্নতি করছে, কিছুদিন পূর্বেও মানুষ এসব বিষয় সম্পর্কে কল্পনা করতে

সক্ষম হয়নি। মহাশূন্য যান সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণা ছিল না। অথচ বর্তমানে তা কঠিন বাস্তবতা এবং এসব দেখে মানুষ আর বিস্ময়বোধ করে না। সীমিত ক্ষমতার অধিকারী মানুষের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে যখন কোন সীমা নির্ধারণ করা যায় না, অথচ এই মানুষ কি করে সেই অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর কর্ম ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে বলে যে, মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবন দেয়া আল্লাহর পক্ষে সম্ভব নয় এবং বিচার দিবসে তিনি সমস্ত মানুষকে একত্রিত করতে পারবেন না ? তিনি এ পর্যন্ত যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, এসবের থেকে অন্য কিছু নতুন করে সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ?

অথচ সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টির নিপুণতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করছে যে, তিনি অসীম ক্ষমতা ও বিজ্ঞতার অধিকারী। তিনিই মানুষকে হাসিয়ে থাকেন আবার তিনিই মানুষকে কাঁদিয়ে থাকেন। জীবন ও মৃত্যুর বাগডোর একমাত্র তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। সূরা নাজ্‌ম-এর ৪৩ থেকে ৪৮ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে-

وَاَنَّهٗ هُوَاَضْحَكَ وَاَبْكٰى-وَاَنَّهٗ هُوَاَمَاتَ وَاَحْيَا-وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى-مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى-وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى-وَاَنَّهٗ هُوَاَغْنٰى وَاَقْنٰى-

আর এই যে, তিনিই মানুষকে আনন্দানুভূতি দিয়েছেন এবং তিনিই দুঃখানুভূতি দিয়েছেন। তিনিই মৃত্যু দিয়েছেন এবং তিনিই জীবনদান করেছেন। তিনিই পুরুষ ও স্ত্রীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এক ফোটা শুক্র থেকে যখন তা নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিতীয়বার জীবনদান করাও তাঁরই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তিনিই ধনী বানিয়েছেন এবং বিষয়-সম্পত্তি দান করেছেন।

নিত্য নতুন নানা ঘটনা আল্লাহ তা'য়ালা ঘটিয়ে চলেছেন। পত্র-পত্রিকায় মাঝে মধ্যে সংবাদ পরিবেশিত হয়, মানুষ চোখেও দেখে থাকে, মাতৃগর্ভের গর্ভাশয়ে একসাথে পাঁচটি দশটি পর্যন্ত সন্তান আল্লাহ দান করে থাকেন। এসব দেখেও মানুষ কি করে ধারণা করে, নতুনভাবে তিনি দ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারবেন না ? আল্লাহ প্রশ্ন করছেন-

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ-ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

তোমরা আল্লাহর সাথে কি করে কুফরীর আচরণ করতে পারো ? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনিই তোমাদেরকে জীবনদান করেছেন। তারপর তিনিই তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন এবং পুনরায় তিনিই তোমাদেরকে জীবনদান করবেন। অবশেষে তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা-২৮)

মানুষ মৃত্যুর পরের জীবন তথা বিচার দিবস সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে, এ জন্য তিনি পৃথিবীতেই মৃত্যুর পরে জীবনদানের প্রক্রিয়া সংঘটিত করেছেন, যেন মানুষের মনে কোন

ধরনের সন্দেহ-সংশয় দানা বাঁধতে না পারে। অস্তিত্বহীন মানুষকে তিনি অস্তিত্ব প্রদান করেছেন, আবার তিনিই তাকে মৃত্যুদান করবেন। আবার তিনিই পুনরায় জীবনদান করে বিচার দিবসে একত্রিত করবেন। কিভাবে করবেন, তিনি তা মানুষকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা হাদীদের ১৭ নং আয়াতে বলেন–

اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا-

এ কথা ভালোভাবে জেনে নাও যে, পৃথিবীর এই মৃত যমীনকে তিনিই জীবনদান করেন।

পৃথিবীতে মানুষের চোখের সামনে মৃত জিনিসগুলোকে পুনরায় জীবনদান করে মানুষকে দেখানো হয়, এভাবেই তিনি বিচার দিবসে মানুষকে পুনরায় জীবনদান করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কর্মগুলোকে শক্তিমত্তার দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন সাক্ষী দেয় যে, তিনি যখনই ইচ্ছা করবেন, তখনই সমস্ত মৃতকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। ইতিপূর্বে যাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না, তাদেরকে তিনি অস্তিত্ব দান করেছেন। অপরদিকে আল্লাহর কাজগুলোকে যদি তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি সাক্ষী দেয় যে, তিনি মানুষকে পুনরায় জীবনদান করে হিসাব গ্রহণ করবেন।

মানুষ যে সীমিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করেছে এর অনিবার্য ফল হিসাবে দেখা যায় যে, তারা যখনই নিজের অর্থ-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য অন্য কারো হাতে সোপর্দ করে দেয়, তখন এমনটি কখনো ঘটে না যে, সে কোন হিসাব গ্রহণ করে না। কারো কাছে কোন কিছু সোপর্দ করলে সে তার পূর্ণ হিসাব গ্রহণ করে। পিতা তার সন্তানের পেছনে অর্থ ব্যয় করে সন্তান যেন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। সন্তান কোন কারণে তা অর্জন করতে ব্যর্থ হলে পিতা তাকে বলে, এবার হিসাব দাও–তোমার পেছনে আমি এত কষ্ট করে যে অর্থ ব্যয় করলাম, তা কোন কাজে লাগলো ? ব্যবসা করার জন্য অর্থ প্রদান করে পিতা দেখতে থাকেন, তার সন্তান কতটা সফলতা অর্জন করলো বা ব্যর্থ হলো।

অর্থাৎ আমানত ও হিসাব-নিকাশের মধ্যে যেন একটি অনিবার্য যৌক্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। মানুষের সীমিত জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা কোন অবস্থাতেও এ সম্পর্ক উপেক্ষা করতে পারে না। এই জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই মানুষ ইচ্ছাকৃত কর্ম ও অনিচ্ছাকৃত কর্মের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। আবারা ইচ্ছাকৃত কর্মের সাথে নৈতিক দায়-দায়িত্বের ধারণা ওৎপ্রোতাভাবে জড়িত এবং তা কল্যাণ ও অকল্যাণের পার্থক্য নির্দেশ করে। কল্যাণমূলক কর্মের পরিসমাপ্তিতে সে প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করতে আগ্রহী হয় এবং অকল্যাণমূলক কর্মের শেষে উপযুক্ত প্রতিফল দাবি করে। এই উদ্দেশ্য সাধন করার লক্ষ্যে মানুষ আবহমান কাল থেকে পৃথিবীতে একটি প্রতিষ্ঠিত বিচার ব্যবস্থাও রচিত করেছে।

সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎকর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করতে হবে–এই ধারণা যে আল্লাহ মানুষের মস্তিষ্কে দান করেছেন, স্বয়ং সেই আল্লাহ সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎকর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করার ধারণা হারিয়ে ফেলেছেন, এ কথা কি কোন নির্বোধেও বিশ্বাস করবে ? বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলে পরিপূর্ণ সৃষ্টি এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু মানুষের অধীন করে দিয়েছেন, পৃথিবীর

যাবতীয় উপায়-উপকরণ মানুষের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন-বিপুল ক্ষমতা লাভ করে মানুষ এসব কোন পন্থায় কিভাবে কোন কাজে ব্যবহার করলো, আল্লাহ এসব সম্পর্কে কোন হিসাব গ্রহণ করবেন না, এ কথা কি কোন সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে ? সামান্য পুঁজি বিনিয়োগ করে মানুষ যদি বার বার হিসাব গ্রহণ করে, হিসাবে যদি দেখতে পায় যে, যার হাতে পুঁজি দেয়া হয়েছিল, সে সফলতা অর্জন করেছে। তখন তাকে পুঁজি বিনিয়োগকারী পুরস্কার দান করে। আর যদি হিসাব করে দেখে যে, বিনিয়োগকৃত পুঁজির অপব্যবহার করা হয়েছে, তখন তাকে শাস্তি প্রদান করে। এটা যদি মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে, তাহলে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহ মানুষের হাতে অর্পণ করার পরে তা কিভাবে মানুষ ব্যবহার করলো, এ সম্পর্কে তিনি কোন হিসাব গ্রহণ করবেন না, এ কথা কি বিশ্বাস করা যায় ?

আল্লাহ তা'য়ালা নিজের এতবড় বিশাল পৃথিবীর সাজ-সরঞ্জাম ও ব্যাপক ক্ষমতা সহকারে মানুষের হতে সোপর্দ করার পর তিনি হিসাব গ্রহণ করার কথা কি ভুলে গিয়েছেন ? মানুষ অসৎ কর্ম সম্পাদন করে অর্থ আর প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে পৃথিবীর আইনের চোরাগলি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, কোন শাস্তি তাকে প্রদান করা যায়নি, কখনো কোনদিন তাকে এ ব্যাপারে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কোন আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে না, এ কথা কি মেনে নেয়া যায় ? মানুষের চোখের সামনে পরিদৃশ্যমান যাবতীয় বস্তু এ কথারই সাক্ষী দিচ্ছে যে, সবকিছুর পরিসমাপ্তিতে আরেকটি জগৎ সৃষ্টি হতেই হবে এবং সেখানে মানুষের যাবতীয় কথা ও কর্ম সম্পর্কে মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে। মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে ভুলে যায় যে, সে অতীতে কি করেছে। তার ভুলে যাওয়া কর্ম সম্পর্কে সেদিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا--اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ-وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ-

সেদিন আল্লাহ তা'য়ালা এদের সবাইকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন এবং তারা যা কিছু করে এসেছে তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। তারা তো ভুলে গিয়েছে (নিজেদের কর্ম সম্পর্কে), কিন্তু আল্লাহ তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম গুণে গুণে সংরক্ষিত করেছেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে সাক্ষী। (সূরা আল মুজাদালা-৬)

বিচার দিবসে মানুষ যা করেছে, তাই তার সামনে পেশ করা হবে। এ ব্যাপারে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করা হবে না। মানুষের কর্মই নির্ধারণ করবে তার ভবিষ্যৎ। তারই কর্মই তার জন্য স্থান নির্বাচন করবে। মানুষ নিজের হাতে যা উপার্জন করেছে, তার ভিত্তিতেই আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কাউকে তিনি অযথা অভিযুক্ত করবেন না। আল্লাহ বলেন-

ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ-

এ হচ্ছে তোমার ভবিষ্যৎ, যা তোমার হাত তোমার জন্য প্রস্তুত করেছে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না। (সূরা আল হাজ্জ-১০)

সুনির্দিষ্ট দিনে মহাধ্বংস যজ্ঞ ঘটবে

সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতে মহান আল্লাহর অসীম দয়া সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বত্র তাঁর রাহ্‌মত বৃষ্টির মতোই বর্ষিত হচ্ছে। তিনি দয়া করছেন আর তাঁর দয়ার সুযোগে একশ্রেণীর লোক তাঁর বিধান একের পর এক লঙ্ঘন করেই চলেছে। তাঁর বিধান লঙ্ঘন করা হচ্ছে, অথচ সাথে সাথে তাদেরকে কোন ধরনের শাস্তির মুখোমুখী হতে হচ্ছে না, এ কারণে তারা বেপরোয়া হয়ে ধারণা করছে যে, কিয়ামতও ঘটবে না এবং তাদের কোন কর্মেরও হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে না। আল্লাহ বলেন-

كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ-لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ-

তিনি নিজের ওপর দয়া ও অনুগ্রহের নীতি অবলম্বন করার বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। (এ কারণেই তোমাদের আইন অমান্য ও আল্লাহদ্রোহীতার শাস্তি সাথে সাথেই দেন না।) কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। বস্তুত এটা এক সন্দেহাতীত সত্য। (সূরা আল আন'আম-১২)

তাঁর বিধান অমান্য করার সাথে সাথে তিনি এই পৃথিবীতে কাউকে গ্রেফতার করবেন না বা আযাব অবতীর্ণ করবেন না-এই নীতি তিনি গ্রহণ করেছেন। এ কারণেই দেখা যায় যে, বান্দাহ্ বিদ্রোহ করার পূর্বেও যেমন এই পৃথিবীর যাবতীয় নিয়ামত তার খেদমতে নিয়োজিত ছিল, বিদ্রোহ করার পরেও সেসব নিয়ামত তার খেদমতেই নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তিনি তাদেরকে গ্রেফতার করবেন না। তিনি কিয়ামত সংঘটিত করবেন এবং সেদিন সবাইকে একত্রিত করে হিসাব গ্রহণ করবেন। সেদিনটি পূর্ব নির্ধারিত এবং কিয়ামত সংঘটিত হবার ব্যাপারে বিন্দমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অগণিত সৃষ্টির মধ্যে এমন এক অদৃশ্য শক্তি যার নাম মধ্যকার্ষন-অভিকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করেছেন। যে শক্তি আমরা চোখে দেখতে পাই না কিন্তু অনুভব করি। পৃথিবীর আকার আয়তন যত বড় তার চেয়েও আকার আয়তনে বড় ওই সূর্য, আবার যে সমস্ত তারকা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই, তা ওই সূর্যের চেয়েও বড় আবার যে সমস্ত তারকার আলো এ পর্যন্ত পৃথিবীর এসে পৌছেনি, ওই সমস্ত তারকা আরো বড়। এক অদৃশ্য শক্তির কারণেই ওই সমস্ত তারকা, গ্রহ, নক্ষত্র যার যার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। ক্বিয়ামতের দিন ওই অদৃশ্য শক্তি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিষ্ক্রিয় করে দিবেন। ফলে সমস্ত তারকা, গ্রহ, নক্ষত্র নিজের কক্ষচ্যূত হয়ে যাবে। সংঘর্ষ ঘটবে একটির সাথে অপরটির। ফলে সমস্ত কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। মধ্যাকর্ষণ শক্তি নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার ফলে পৃথিবীর সমস্ত কিছু তুলার মতো ভেসে বেড়াবে। তখন একটার সাথে আরেকটার সংঘর্ষ ঘটে বিকৃত হয়ে অবশেষে তা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। এ ঘটনা ঘটবে মুহূর্তের মধ্যে। কিয়ামত সংঘটিত হতে কতটুকু সময় লাগবে সে ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন-

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْهُوَاَقْرَبُ-اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

মহাধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হতে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না। শুধু এতটুকু সময় মাত্র লাগবে, যে সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়ে বা তার চেয়েও কম। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ সব কিছু করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (নাহ্ল-৭৭)

কোন প্রক্রিয়ায় সেই মহাধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে সূরা যুমারের ৬৮ নং আয়াতে বলেছেন–

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا شَاۤءَ اللّٰهُ-

আর সেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। সাথে সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা সমস্তই মরে পড়ে থাকবে। তবে আল্লাহ যাদের জীবিত রাখতে ইচ্ছুক তারা ব্যতিত।

এই পৃথিবী যে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে, এ কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সুদূর সপ্তম শতাব্দীতে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে এই পৃথিবী নির্দিষ্ট সময়ে ধ্বংস হবে, সে কথাটি বিজ্ঞান নতুন করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং কিয়ামতের ব্যাপার যারা সন্দেহ করে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন–

اِذَا وَقَعَتِ الْوَا قِعَةُ-لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ-

যখন সেই সংঘটিত হবার ঘটনাটি হয়েই যাবে, তখন তার সংঘটনের ব্যাপারে মিথ্যা বলার মতো কেউ থাকবে না। (সূরা ওয়াকিয়াহ্-১-২)

সমস্ত কিছুই মুহূর্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে সেদিন, পার্থিব কোন কিছুই টিকে থাকবে না। শুধু টিকে থাকবে মহান আল্লাহর আরশে আযিম। তাঁর চিরঞ্জীব সত্তা ব্যতিত অন্য কোন কিছুই টিকে থাকবে না। সূরা রাহ্মানের ২৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ -وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ -

সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে শুধু টিকে থাকবে তোমার মহীয়ান-গরীয়ান রবের মহান সত্তা।

সৃষ্টি জগতের ধ্বংস, নতুন জগত সৃষ্টি ও মানুষের পুনর্জীবন লাভ সবই আল্লাহর মহান পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর আওতাভুক্ত। মহাধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার জন্য ফেরেশতা হযরত ইসরাফীল আলাইহিস্ সালাম সিঙ্গা মুখের কাছে ধরে আরশে আজিমের দিকে আগ্রহে তাকিয়ে আছেন, কোন মুহূর্তে আল্লাহ আদেশ দান করবেন। ব্যাপারটা সহজে বুঝার জন্যে এভাবে ধারণা করা যায়, ইসরাফীল আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর আদেশে এক মহাশক্তিশালী সাইরেন বাজাবেন বা বংশী ধ্বনি করবেন। কোরআনে এই বংশীকে বলা হয়েছে 'সূর'। ইংরেজীতে যাকে 'বিউগল' বলা হয়। সে বংশী ধ্বনি এক মহাপ্রলয়ের মহা তান্ডবলীলার পূর্বাভাস। সেটা

যে কি ধরণের বংশী এবং তার আওয়াজই বা কি ধরনের তা মানুষের কল্পনারও অতীত। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টা সহজ হয়ে যায়। যেমন বর্তমান কালে যুদ্ধের সময় সাইরেন বাজানো হয়। যুদ্ধকালীন সাইরেনের অর্থ হলো বিপদ-মহাবিপদ আসন্ন। মহাবিপদের সংকেত ধ্বনি হিসেবে যুদ্ধের সময় সাইরেন বাজানো হয়।

তেমনি কিয়ামত সংঘটিত হবার মুহূর্তে চরম ধ্বংস, আতংক ও বিভীষিকা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে–এটা জানানোর জন্যই সিংগায় ফুঁক বা সাইরেন বাজানো হবে। সিংগা থেকে ভয়ংকর শব্দ হতে থাকবে এবং বিরতিহীনভাবে এক ধরনের আতংক সৃষ্টিকারী আওয়াজ হতে থাকবে। সে শব্দে মানুষের কানের পর্দা ফেটে যাবে। সবাই একই গতিতে সেই বিকট শব্দ শুনতে পাবে। মনে হবে যেন তার কানের কাছেই এই শব্দ হচ্ছে। ভয়ংকর সেই শব্দ কেউ একটু কম কেউ একটু বেশী শুনবে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম কুদরতের মাধ্যমে সবার কানে সেই শব্দ একই গতিতে পৌঁছে দেবেন।

হাদিস শরীফে এই 'সূর' বা সিংগাকে তিন ধরনের বলা হয়েছে। নাফখাতুল ফিযা–অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্ত ও আংকতগ্রস্থ করার সিংগা ধ্বনী। নাফখাতুস সায়েক–অর্থাৎ মরে পড়ে যাওয়ার সিংগা ধ্বনী। নাফখাতুল কিয়াম–অর্থাৎ কবর হতে পুনর্জীবিত করে হাশরের ময়দানে সকলকে একত্র করার সিংগা ধ্বনী। অর্থাৎ হযরত ইসরাফীল আলাইহিস্ সালাম তিনবার সিংগায় ফুঁক দিবেন। প্রথমবার সিংগায় ফুঁক দেয়ার পরে এমন এক ভংকর প্রাকৃতিক বিশৃংখলা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে যে, মানুষ ও জীবজন্তু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উম্মাদের মতো ছুটাছুটি করবে। গর্ভিনীর গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যাবে। বাঘের পেটের নিচে ছাগল আশ্রয় নেবে কিন্তু বাঘের স্মরণ থাকবে না ছাগলকে ধরে খেতে হবে। অর্থাৎ এমন ধরনের ভয়ংকর সন্ত্রাসের সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয়বার সিংগায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথেই যে যেখানে যে অবস্থায় থাকবে, সে অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে। তারপর কিছু সময় অতিবাহিত হবে। সে সময় কত বছর, কত মাস, কতদিন বা কত ঘন্টা হবে তা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। এরপর তৃতীয়বার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। সাথে সাথে সমস্ত মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে হাশরের ময়দানে জমায়েত হবে। হাশরের ময়দানের বিশালতা কি ধরনের হবে তা আল্লাহই জানেন। মহান আল্লাহ্ বলেন–

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوَاتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ-وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ-سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ-لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ-اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-

(তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও) যেদিন যমিন আসমানকে পরিবর্তন করে অন্যরূপ দেয়া হবে। তারপর সকলেই মহাপরাক্রান্তশালী এক আল্লাহর সামনে হাতে পায়ে শিকল পরা এবং আরামহীন অবস্থায় হাজির হয়ে যাবে। সেদিন তোমরা পাপীদেরকে দেখবে আলকাতরার পোষাক পরিধান করে আছে আর আগুনের লেলিহান শিখা তাদের মুখমন্ডলের উপর ছড়িয়ে

পড়তে থাকবে। এটা এ জন্যে হবে যে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেবেন। আল্লাহর হিসাব গ্রহণ করতে বিলম্ব হয় না। (সূরা ইবরাহীম-৪৮-৫১)

গভীরভাবে কোরআন হাদীস অধ্যায়ন করলে অনুমান করা যায় যে, কিয়ামতের দিন বর্তমানের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার অবসান ঘটিয়ে নতুন একজগত মহান আল্লাহ প্রস্তুত করবেন। সে জগতের নামই পরকাল বা পরজগত। সে জগতের জন্যেও নিয়ম কানুন রচনা করা হবে। তারপর তৃতীয়বার সিংগায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারী সমস্ত মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। এই উপস্থিত হওয়াকেই কোরআনে হাশর বলা হয়েছে। হাশর শব্দের অর্থ হলো চারদিক থেকে গুটিয়ে একস্থানে সমাবেশ করা। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন−

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا-

পৃথিবীটা তখন হঠাৎ করেই কাঁপিয়ে দেয়া হবে। (সূরা ওয়াকিয়াহ্-৪)

কিয়ামতের দিন প্রচন্ড ভূমিকম্প হবে। এ ভূমিকম্পের কম্পনের মাত্রা যে কত ভয়ংকর হবে তা অনুমান করা কঠিন। পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোন এলাকায় ভূমিকম্প হবে না, বরং গোটা পৃথিবী জুড়ে একই সময়ে হবে। হঠাৎ করেই পৃথিবীটাকে ধাক্কা দেয়া হবে। ফলে পৃথিবী ভয়াবহভাবে কাঁপতে থাকবে। সেদিন মহাশূন্যে পাহাড় উড়বে। আল কোরআন ঘোষণা করছে, পৃথিবী সৃষ্টির পরে তা কাঁপতে থাকে, পরে পাহাড় সৃষ্টি করে মধ্যাকর্ষণ শক্তিদ্বারা পেরেকের ন্যায় পৃথিবীতে বসিয়ে দেয়া হয়। পৃথিবী তখন স্থির হয়। কিন্তু কিয়ামতের দিন মধ্যাকর্ষণ শক্তি আল্লাহ উঠিয়ে নেবেন। ফলে পাহাড়সমূহ উড়তে থাকবে অর্থাৎ মহাশূন্যে ভেসে বেড়াবে। মহান আল্লাহ বলেন−

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا-

পাহাড় চালিয়ে দেয়া হবে। অবশেষে তা কেবল মরিচিকায় পরিণত হবে। (সূরা নাবা-২০)

মহাশূন্যে বিক্ষিপ্তভাবে পাহাড়সমূহ চলতে থাকবে। ফলে একটার সাথে আরেকটির ধাক্কা লেগে ধ্বংসের এক বিভিষীকা সৃষ্টি হবে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন−

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا-

আর মানুষ আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি জানিয়ে দিন আমার রব্ব তা সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দিবেন। (সূরা ত্ব-হা-১০৫)

পাহাড় বলতে মানুষ অনুমান করে এমন একবস্তু যা কোন দিন হয়ত ধ্বংস হবে না। মানুষ কোন বিষয়ের স্থিরতা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে পাহাড়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে কথা বলে। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন−

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ-

আজ তুমি পাহাড় দেখে মনে করছো যে এটা বোধহয় অত্যন্ত দৃঢ়মূল হয়ে আছে, কিন্তু সেদিন তা মেঘের মতোই উড়তে থাকবে। (সূরা নামল-৮৮)

পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যার যার স্থানে স্থির রয়েছে−আল্লাহর সৃষ্টি বিশেষ এক আকর্ষণী শক্তির কারণে। সেদিন এসব আকর্ষণী শক্তি আল্লাহর আদেশে অকেজো হয়ে পড়বে। ফলে পাহাড়গুলো যমীনের ওপরে আছাড়ে পড়তে থাকবে এবং তার অবস্থা কেমন হবে, আল্লাহ বলেন−

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ-

পাহাড়গুলো রংবেরংয়ের ধুনা পশমের মতো হয়ে যাবে। (সূরা মায়ারিজ-৯)

পৃথিবীর পাহাড়সমূহকে শূন্যে উঠিয়ে তা আবার যমীনের বুকে আছড়ে ফেলা হবে। ফলে তা প্যাঁজা ধুনা তুলার মতো করে-বালির মতো করে মহাশূন্যে উড়িয়ে দেয়া হবে। পৃথিবীতে কোথায় কোনদিন পাহাড় ছিল, এ কথা কল্পনাও করা যাবে না। সূরা কারিয়ায় বলা হয়েছে−

اَلْقَارِعَةُ مَاالْقَارِعَةُ-وَمَاادْرَاكَ مَاالْقَارِعَةُ-يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ-وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ-

ভয়াবহ দূর্ঘটনা! কী সেই ভয়াবহ দূর্ঘটনা? তুমি কি জানো সেই ভয়াবহ দূর্ঘটনা কি? সেদিন যখন মানুষ বিক্ষিপ্ত পোকার মতো এবং পাহাড়সমূহ রংবেরংয়ের ধুনা পশমের মতো হবে।

পৃথিবীর সমস্ত পর্বত একই ধরনের নয়। সব পর্বতের রং ও বর্ণও এক নয়। কোনটা লাল কোনটা কালো আবার কোনটা শুধু বরফের। পশম যেহেতু বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে সে হেতু পশমের সাথে আল্লাহ তুলনা দিয়েছেন। পশম বাতাসে উড়ে। পাহাড়সমূহও কিয়ামতের দিন পশমের মতো উড়তে থাকবে। শুধু তাই নয়, সেদিন ওই বিশাল পর্বতমালা শুন্যে উঠিয়ে মাটির উপর প্রচন্ড বেগে আছাড় দেয়া হবে। মহান আল্লাহ সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে বলেন−

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً-فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ-

পৃথিবী ও পর্বতসমূহকে শুন্যে প্রচন্ড আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন সেই সংঘটিতব্য ঘটনা ঘটবেই। (সূরা হাক্কাহ্-১৪-১৫)

পাহাড়সমূহ কিয়ামতের দিন মরিচীকার ন্যায় অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। যেখানে পাহাড়সমূহ স্থির অটলভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কোন চিহ্নই থাকবে না। কোরআন বলছে−

وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا-فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا-

পাহাড়সমূহকে এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে যে, তা শুধু বিক্ষিপ্ত ধুলিকনায় পরিণত হবে। (সূরা ওয়াকিয়া-৫-৬)

মহাশূন্যের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্রমালা, তারকামন্ডলী জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সমস্ত

কিছুর আলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। উর্ধ্বজগতের সে সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার কারণে প্রতিটি তারকা ও গ্রহ-উপগ্রহসমূহ নিজ নিজ কক্ষ পথে অবিচল হয়ে রয়েছে এবং যে কারণে বিশ্বলোকের প্রতিটি জিনিস নিজ নিজ সীমার মধ্যে আটক হয়ে আছে, তা সবই চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়া হবে। যাবতীয় বন্ধান সেদিন শিথিল করে দেয়া হবে। সূরা মুরসালাতে বলা হয়েছে–

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ-وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ-وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ-

এরপর যখন নক্ষত্রমালা ম্লান হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হবে। তখন পাহাড়-পর্বত চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। (সূরা মুরসালাত-৮-১০)

কিয়ামতের দিন ওই বিশাল পাহাড়ের অবস্থা যখন ধূলিকণায় পরিণত হবে, তখন মানুষের অবস্থা যে কি ধরনের হবে তা কল্পনা করলেও শরীর শিহরিত হয়। শূন্যে ভাসমান পাহাড়কে জমিনের উপরে আছড়ানো হবে। ভাসমান অবস্থায় একটার সাথে আরেকটার সংঘর্ষ ঘটতে থাকবে, ফলে গোটা পৃথিবী জুড়ে এক ভয়াবহ বিভীষিকার সৃষ্টি হবে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলেন–

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ-يَّغْشَى النَّاسَ-هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

তোমরা অপেক্ষা করো সেই দিনের যখন আকাশ-মন্ডল সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে। তা মানুষদের উপর আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। এটা হলো পীড়াদায়ক আযাব। (সূরা দুখান-১০-১১)

সেদিন আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। অসংখ্য তারকামালা খচিত সৌন্দর্য-মন্ডিত আসমান বর্তমান অবস্থায় থাকবেনা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ-

যখন আকাশ-মন্ডল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। (সূরা ইনফিতার-১)

সেদিন এমন ভায়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করা হবে যে, ভয়ে-আতঙ্কে, দুশ্চিন্তায় অল্প বয়স্ক বালকগুলোকে বৃদ্ধের ন্যায় দেখা যাবে। সূরা মুয্যামিলের ১৭-১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا-السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ-كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلاً-

তাহলে সেদিন কিভাবে রক্ষা পাবে যেদিন বালকদেরকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেয়া হবে। এবং যার কঠোরতায় আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আর ওয়াদা তো অবশ্যই পূর্ণ করা হবে।

অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়ংকর ঘটনা যে ঘটবে–আল্লাহ বারবার তা বলেছেন। সুতরাং, আল্লাহ যা বলেন তা অবশ্যই হবে। আসমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে-পৃথিবীর মাটি ওলট–পালট হতে থাকবে। ফলে মাটির নিচে যা কিছু আছে, কিয়ামতের দিন মাটি তা উদগিরণ করে দেবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনবলেন–

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ-وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ-وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ-وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ-

যখন আকাশ মন্ডল ফেটে যাবে এবং নিজের রবের নির্দেশ পালন করবে, আর তার জন্যে এটাই যথার্থ। যখন মাটিকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার গর্ভে যা কিছু আছে, তা সব বাইরে নিক্ষেপ করে মাটি শূন্য হয়ে যাবে। (সূরা ইনশিকাক-১-৪)

সেদিন আকাশ মন্ডল ভয়ংকরভাবে কাঁপতে থাকবে। কিয়ামতের দিন উর্ধ্বলোকের সমস্ত শৃংখলা ব্যবস্থা চুরমার হয়ে যাবে। তখন আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মনে হবে, যে জমাট-বাঁধা দৃশ্য চিরকাল একই রকম দেখাতো-একইরূপ অবস্থা বিরাজমান মনে হতো, তা ভেঙে-চুরে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে আর চারদিকে একটা প্রলয় ও অস্থিরতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধরিত্রীর যে শক্ত পাঞ্জা পর্বতগুলোকে অবিচল করে রেখেছিল, তা শিথিল হয়ে যাবে। পর্বতগুলো নিজের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন ও উৎপাটিত হয়ে মহাশূন্যে এমনভাবে উড়তে থাকবে, যেমন আকাশে মেঘমালা উড়ে। সূরা তুর-এ ৯-১০ নং আয়াতে ঘোষনা করছে-

يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا-وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا-

সেদিন আসমান থর থর করে কাঁপতে থাকবে। আর পর্বতসমূহ শূন্যে উড়ে বেড়াবে।

কিয়ামতের দিন কোন বস্তুই তার নির্দিষ্ট স্থানে থাকবে না। প্রতিটি বস্তু সেদিন নিজের স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে দ্রুত গতিতে ছুটাছুটি করতে থাকবে। ফলে একটার সাথে আরেকটার সংঘর্ষ ঘটে সব কিছু প্রকম্পিত হয়ে উঠবে। আকাশ মন্ডল এমনভাবে কাঁপতে থাকবে যেমনভাবে প্রচন্ড ঝড়ে বৃক্ষ তরুলতা কাঁপে। (কত জোরে কাঁপবে তা আল্লাহই ভালো জানেন। সাধারণভাবে বুঝার জন্য ঝড় এবং বৃক্ষ তরুলতার উদাহরণ দেয়া হলো।) তাবিজ বানানোর পূর্বে পাত বানোনো হয়। পরে পাত গুটিয়ে তাবিজ বানানো হয়। সেদিন আকাশের সেই অবস্থা হবে। কোন বই-পুস্তকের বন্ধন শিথিল করে প্রবল বাতাসের সামনে মেলে ধরলে যেমন একটির পর আরেকটি পৃষ্ঠা উড়তে থাকে, সেদিন আকাশমন্ডলী তেমনিভাবে উড়তে থাকবে। আকাশকে এমনভাবে গুটিয়ে নেয়া হবে, কাগজকে গুটিয়ে যেভাবে বান্ডিল বাঁধা হয়। মহান আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ-كَمَابَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ-وَعْدًا عَلَيْنَا-اِنَّا كُنَّافَاعِلِيْنَ-

সেদিন, যখন আকাশকে আমি এমনভাবে গুটিয়ে ফেলবো যেমন বান্ডিলের মধ্যে গুটিয়ে রাখায় হয় লিখিত কাগজ। যেভাবে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, অনুরূপভাবে আমরা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবো। এটা একটা ওয়াদা বিশেষ যা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমার। এটা আবশ্যই আমি করবো। (সূরা আম্বিয়া-১০৪)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, চূড়ান্ত বিচারের দিন একটি পূর্ব নির্দিষ্ট দিন। সেদিন সিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে। আর আকাশমন্ডল উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, ফলে তা কেবল দুয়ার আর দুয়ারে পরিণত হবে। পাহাড় চালিয়ে দেয়া হবে, পরিণামে তা নিছক মরীচিকায় পরিণত হবে। মহান আল্লাহ যতগুলো আকাশ সৃষ্টি করেছেন, তা একটির পর আরেকটি উন্মুক্ত হতে থাকবে। কোরআনের অন্যস্থানে আকাশ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ-

সেদিন আসমানসমূহ গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। (সূরা মায়ারিজ-৮)

কিয়ামতের দিন এমন অবস্থা হবে যে, যে ব্যক্তিই তখন আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে শুধু আগুনের ন্যায় দেখতে পাবে। গলিত তামা যেমন অগ্নিকুন্ডে রক্তবর্ণ ধারণ করে টগবগ করে ফুটতে থাকে, সেদিন মহাশূন্যলোক তেমনি আগুনের রূপ ধারণ করবে। সূরা রাহমানের ৩৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

فَاذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ-

যখন আকাশ মন্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তা রক্তিমবর্ণ ধারণ করবে।

সেদিন আকাশ মন্ডল উন্মুক্ত করে দেয়া হবে অর্থাৎ উর্ধ্বজগতে কোনরূপ আড়াল বা বাধা প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব থাকবেনা, যেন বর্ষনের সমস্ত দরোজা খুলে দেয়া হয়েছে, গযব আসার কোন দরোজাই আর বন্ধ নেই। উর্ধ্বজগতে প্রতি মুহূর্তে বিশাল বিশাল উল্কাপাত হচ্ছে। যে উল্কা কোন দেশের উপর পড়লে সে দেশ মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ মধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং উর্ধ্বে শূন্যলোকে এমন অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে ওই সমস্ত উল্কা পৃথিবীর মানুষের উপর পতিত না হয়। মাঝে মধ্যে দু'একটি উল্কা পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌছে, কিন্তু সেটাও মরুপ্রান্তরে পতিত হয়। কোন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পতিত হয় না। আল্লাহ বলেন–

وَّفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا-وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا-

আকাশ মন্ডল উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। ফলে তা দুয়ার আর দুয়ার হয়ে যাবে। পাহাড়কে চলমান করে দেয়া হবে। পরিণামে তা শুধু মরিচিকায় পরিণত হবে। (সূরা নাবা-১৯-২০)

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে এই পৃথিবী ক্রমশঃ এক মহাধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ পৃথিবীও একদিন মৃত্যুবরণ করবে। চন্দ্র, সূর্য, তারকা, গ্রহ-নক্ষত্র সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ এ সমস্ত কথা পৃথিবীর মানুষকে বহু শতাব্দী পূর্বে মহাগ্রন্থ আল কোরআন জানিয়ে দিয়েছে। কোরআন ঘোষণা করেছে–

فَاذَابَرِقَ الْبَصَرُ-وَخَسَفَ الْقَمَرُ-وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ-يَقُوْلُ

اَلْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ-كَلاَّ لاَ وَزَرَ-اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ-

দৃষ্টিশক্তি যখন প্রস্তরীভূত হয়ে যাবে এবং চন্দ্র আলোহীন হয়ে যাবে এবং সূর্যকে মিলিয়ে একাকার করে দেয়া হবে। তখন মানুষ (সন্ত্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করে) বলবে কোথায় পালাবো? কখনো নয়, সেদিন তারা পালানোর জায়গা পাবে না। সেদিন সবাই তোমার রবের সামনে অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। (সূরা কিয়ামাহ-৮-১২)

চন্দ্রের আলোই শুধু নিঃশেষ হবে যাবে না, চন্দ্রের আলোর মূল উৎস স্বয়ং সূর্যও জ্যোতিহীন ও অন্ধকারময় হয়ে যাবে। ফলে আলো ও জ্যোতিহীনতা উভয়ই সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন এই পৃথিবী অকস্মাৎ বিপরীত দিকে চলতে শুরু করবে ফলে সেদিন চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই একই সময় পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। চন্দ্র আকস্মিকভাবে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ও সূর্যের গহ্বরে নিপতিত হবে। মহাশূন্যে যে সর্বভূক ব্লাকহোল সৃষ্টি করা হয়েছে, এই ব্লাকহোলের মধ্যে সমস্ত কিছু হারিয়ে যাবে। আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে–

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ-وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ-

যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে এবং নক্ষত্ররাজি আলোহীন হয়ে যাবে। (সূরা তাকভীর-১-২)

কোন বস্তুকে প্যাঁচানো বা গুটানোকে আরবী ভাষায় "তাকভির" বলা হয়। যেহেতু কিয়ামতের দিন সূর্যকে আলোহীন করা হবে সে কারণে রূপকভাবে বলা হয়েছে সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে। অর্থাৎ সূর্যের আলোকে গুটিয়ে ফেলা হবে। সমস্ত নক্ষত্রমালা জ্যোতিহীন হয়ে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলোয় চন্দ্র উজ্জ্বল দেখায়। সুতরাং সূর্যের আলো ছিনিয়ে নেয়ার পরে চন্দ্র আর আলোকিত দেখাবে না। চন্দ্র আর সূর্য বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকবে। ফলে সূর্য পশ্চিম দিকে দেখা যাবে। এমনটিও হতে পারে চন্দ্র হঠাৎ করেই পৃথিবীর মধ্যাকর্ষন শক্তি হতে বন্ধনমুক্ত হয়ে সূর্যের কক্ষপথে গিয়ে পড়বে। ফলে চন্দ্র, সূর্য মিলে একাকার হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন কোন কিছুই সুশৃংখলভাবে নিজ অবস্থানে থাকতে পারবে না। সমস্ত বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলায় মিশে যাবে। নদী-সমুদ্র ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। পবিত্র কোরআন মজিদে মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ-

যখন নদী-সমুদ্রকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে। (সূরা ইনফিতার-৩)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিয়ামতের সময় গোটা পৃথিবী জুড়ে জলে-স্থলে এবং অন্তরীক্ষে এক মহাকম্পন সৃষ্টি করা হবে। ঐ কম্পনের ফলে নদী এবং সমুদ্রের তলদেশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। পানি বলতে কোন কিছুই নদী-সমুদ্রে অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ বলেন–

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ-

এবং যখন নদী, সমুদ্র আগুনে পরিণত হবে। (সূরা আত-তাকভীর-৬)

কিয়ামতের দিন পানি পূর্ণ নদী ও অগাধ জলধী-সমুদ্রে, মহাসাগরে আগুন জ্বলতে থাকবে। কথাটা অনেকের কাছে নতুন অবিশ্বাস্য দুর্বোধ্য ও আশ্চর্যজনক মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞান যাদের পড়া আছে সেই সাথে পানির মূল উপাদান সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে, তাদের কাছে ব্যাপারটা নতুন কিছু নয় এবং অবিশ্বাস্য তো নয়ই। আল্লাহর অসীম কুদরতের বলে পানি হচ্ছে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক দু'টো গ্যাসের মিশ্রণ। হাইড্রোজেন দাহ্য, এই গ্যাস নিজে জ্বলে। আর অক্সিজেন জ্বলতে সাহায্য করে। পানি অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রন হলেও আল্লাহর অসীম কুদরত যে, পানিই আগুন নেভায়। পানি-আগুনের শত্রু। আবার পানির অপর নাম জীবন। এক আয়াতে কোরআন বলছে নদী, সমুদ্র কিয়ামতের সময় আগুনে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। অপর আয়াত বলছে, সেদিন নদী ও সমুদ্র দীর্ণ-বিদীণ হয়ে যাবে। এখানে দু'টো ব্যাপার, (এক) আগুনে পরিপূর্ণ হবে নদী ও সমুদ্র। (দুই) নদী, সমুদ্র, দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে। দু'টো বিষয়কে সামনে রাখলে নদী, সমুদ্রে আগুন জ্বলার বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান বলছে এবং টিভির মাধ্যমে মানুষকে দেখাচ্ছেও মহাসাগরের অতল তলদেশে আগ্নেয়গিরি আছে। সেখান থেকে উত্তপ্ত লাভা নির্গত হচ্ছে। কিয়ামতের সময় প্রচণ্ড কম্পনের ফলে নদী ও সমুদ্রের তলদেশ ফেটে সমস্ত পানি এমন এক স্থানে গিয়ে পৌছবে, যেখানে প্রতি মুহূর্তে এক কঠিন উত্তপ্ত লাভা টগবগ করে ফুটছে ও আলোড়িত হচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশের এই স্তরে পানি পৌছে পানির দু'টো মৌল উপাদানে-হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিভক্ত হয়ে যাবে। অক্সিজেন প্রজ্জ্বালক ও হাইড্রোজেন উৎক্ষেপক। তখন এভাবে বিশ্লেষিত হওয়া এবং অগ্নি উদগীরণ হওয়ার এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। এভাবেই পৃথিবীর নদী ও সমুদ্র কিয়ামতের সময় আগুনে পরিপূর্ণ হবে। সমস্ত প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হবে, সে বিষয়ে মানুষের সঠিক জ্ঞান নেই, প্রকৃত বিষয় আল্লাহই ভালো জানেন।

তবে মানুষ যদি সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে সামান্য ধারনা লাভ করতে চায়, তাহলে বিভিন্ন আগ্নেয়গিরি থেকে ধারণা লাভ করতে পারে।এমন অনেক আগ্নেয়গিরি রয়েছে, যাদের অবস্থান মহাসমুদ্রের গভীরে অথবা সমুদ্র নিকটবর্তী। সমুদ্রের পানির প্রচন্ড চাপকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে রক্তিমবর্ণ উত্তপ্ত লাভা তীব্র বেগে ছুটতে থাকে। পানির ভেতর দিয়ে লাভা যে পথে অগ্রসর হয়, চারদিকের পানি উত্তপ্ত লাভা শোষণ করতে থাকে বা বাষ্পাকারে উড়ে যায়। পানির ভেতরেও তপ্ত লাভা টগবগ করে ফুটতে থাকে।

সেদিন ভয়ে ত্রাসে মহাতঙ্কে মানুষ দিশাহারা হয়ে যাবে

সেদিন ভয়ে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটবে। মায়ের কাছে সন্তান সবচেয়ে প্রিয়। সন্তানের জন্য মা প্রয়োজনে নিজের জীবনও দান করতে পারে। কিন্তু কিয়ামতের সময় যে ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হবে, তা দেখে মা সন্তানের কথা ভুলে যাবে। পৃথিবীতে ভূমিকম্প পূর্বাভাস দিয়ে সংঘটিত হয় না। মাত্র কিছু দিন পূর্বে তুরুস্কে এবং ভারতের গুজরাটের ভূজ শহরে যে ভূমিকম্প হয়ে গেল, সেখানে মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় নিয়োজিত ছিল। কেউ আহারে, ভ্রমণে, সাংসারিক উপকরণ যোগানের কাজে, কেউ গান-বাজনায়-নৃত্যে, কেউ বা অবৈধভাবে যৌন

সম্ভোগে নিয়োজিত ছিল। ভূমিকম্পে তুরুস্কে যেসব নামি-দামী হোটেল, তথাকথিত আধুনিকতার দাবিদারদের আবাসস্থল ধ্বংস হয়েছিল, সেসব ধ্বংসাবশেষ থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের সময় এমন সব নারী-পুরুষের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যারা অবৈধভাবে যৌন সম্ভোগে নিয়োজিত ছিল। যে মুহূর্তে তারা কিয়ামত, বিচার দিবসের কথা ভুলে আল্লাহর বিধান অমান্য করে কুকর্মে নিয়োজিত ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ভূমিকম্পের কবলে তারা পড়েছিল। কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই অবগত আছেন। মানুষ সে সময়ে নানা ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকবে। মাতৃস্তন সন্তান মুখে নিয়ে চুষতে থাকবে, সেই মুহূর্তেই মহাধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে। মায়েরা নিজেদের শিশু সন্তানদেরকে দুধ পান করানো অবস্থায় ফেলে দিয়ে পালাতে থাকবে এবং নিজের কলিজার টুকরার কি অবস্থা হলো, তা কোন মায়ের মনে থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

يَاَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ- يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكْرٰى وَمَا هُمْ بِسُكْرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ

হে মানুষ ! তোমাদের রব্ব-এর গযব থেকে বাঁচো। আসলে কিয়ামতের প্রকম্পন বড়ই ভয়ঙ্কর জিনিস। সেদিনের অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক স্তন দানকারিনী (ভীতগ্রস্থ হয়ে) নিজের স্তনদানরত সন্তান রেখে পালিয়ে যাবে। ভয়ে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটে যাবে। তখন মানুষদের তুমি দেখতে পাবে মাতালের মতো, কিন্তু তারা কেউ নেশাগ্রস্থ হবে না। আল্লাহর আযাব অত্যন্ত ভয়ংকর হবে। (সূরা হজ্জ্ব-২)

কিয়ামতের দিন মানুষ নেশাগ্রস্থের মতো আচরণ করতে থাকবে। মদপান না করেও ভয়ে আতঙ্কে মানুষ মাতালের মতো হবে। মানুষের তাকানোর ভঙ্গি দেখে মনে হবে যেন চোখের তারা কোটর ছেড়ে ছিট্‌কে বের হয়ে যাবে। চোখের পলক ফেলতেও মানুষের মনে থাকবে না। ভয়ে আতঙ্কে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকবে, মনে হবে যেন পাথরের চোখ। মহান রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ-اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ-مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ-وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ-

আল্লাহ তো তাদেরকে ক্রমশঃ নিয়ে যাচ্ছেন সে দিনটির দিকে, যখন চোখগুলো দিকভ্রান্ত হয়ে যাবে। আপন মস্তকসমূহ উর্ধ্বমুখী করে রাখবে। তাদের দৃষ্টি আর তাদের দিকে ফিরে আসবে না এবং ভয়ে তাদের অন্তরসমূহ উড়ে যাবে। (সূরা ইবরাহীম-৪২-৪৩)

ভয়ে আতঙ্কে মানুষের বুকের কলিজা কণ্ঠনালীর কাছে চলে আসবে। পবিত্র কোরআনের সূরা নাযিয়াতে বলা হয়েছে–

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ-

তাদের দৃষ্টিসমূহ তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। (সূরা নাযিয়াত-৯)

সূরা কিয়ামাহ্ বলছে, 'তখন তাদের দৃষ্টি সমূহ প্রস্তরীভূত হয়ে যাবে।' সেদিন মানুষ ওই ভয়ংকর অবস্থা এমন ভীত সংকিত, বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে দেখতে থাকবে যে, নিজের শরীরের দিকে তাকানোর কথা সে ভুলে যাবে। কিয়ামতের দিন মানুষ এমন কাতরভাবে তাকাবে, দেখে মনে হবে মানুষের চোখগুলোয় বুঝি প্রাণ নেই–পাথরের নির্মিত চোখ। সবার দৃষ্টি বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। সূরা মু'মিনের ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَأَنْذِرْ هُمْ يَوْمَ الازِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ-

হে নবী, ভয় দেখাও এ মানুষদেরকে সেদিন সম্পর্কে, যা খুব সহসাই এসে পড়বে। যখন প্রাণ ভয়ে উষ্ঠাগত হবে এবং মানুষ নীরবে ক্রোধ হজম করে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে।

আল-কোরআন জানাচ্ছে–

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ-تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ-قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ-

যেদিন ধাক্কা দিবে মহাকম্পনের একটি কম্পন, তারপর আরেকটি ধাক্কা, মানুষের অন্তরসমূহ সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে। (সূরা নাযিয়াত-৬-৮)

মানুষ যখন চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয় তখন তাকে দেখে অনেকেই মন্তব্য করে, মানুষটিকে চিন্তায় বুড়ো মানুষের মতো দেখাচ্ছে। এর অর্থ হলো মানুষটি ভীষণভাবে চিন্তাগ্রস্থ। এ ধরনের উদাহরণ দিয়েই মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলেন–

كَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَا-السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ-كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُوْلاً-

সেদিন কেমন করে রক্ষা পাবে যেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে দেবে এবং যার কঠোরতায় আসমান দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। (সূরা মুয্যাম্মিল-১৭-১৮)

কি ধরনের বিপদে পড়লে মানুষ নিজ সন্তান-প্রাণের প্রিয়জনকে ছেড়ে পালায় তা কল্পনাও করা যায় না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ নগ্ন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় উঠবে। রাসূলের স্ত্রীদের একজন (কোন বর্ণনানুযায়ী হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এবং কোন বর্ণনানুসারে হযরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, আবার কোন বর্ণনাকারীর মতে অন্য একজন নারী) আতঙ্কিত হয়ে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের গোপন অঙ্গসমূহ সেদিন সবার সামনে অনাবৃত ও

উন্মুক্ত হবে ? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর রাসূল কোরআন থেকে জানিয়ে দিলেন, সেদিন কারো প্রতি দৃষ্টি দেয়ার মতো সচেতনতা কারো থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

فَاذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ-يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ-وَاُمِّهِ وَاَبِيْهِ-وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ-لِكُلِّ امْرِىءٍ-مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ- شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ-وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ-وَجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَاغَبَرَةٌ-تَرْهَقُهَاقَتَرَةٌ -

সবশেষে যখন সেই কান বধিরকারী ধ্বনি উচ্চারিত হবে। সেদিন মানুষ তার নিজের ভাই, মাতা-পিতা ও স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে পালিয়ে যাবে। তাদের প্রত্যেকের উপর সেদিন এমন একটি সময় (ভয়ংকর ও বিভীষিকাপূর্ণ সময়) এসে পড়বে যখন নিজকে ছাড়া (নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা ছাড়া) আর কারো প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অবকাশ থাকবে না। সেদিন কতিপয় মুখমন্ডল আনন্দে উজ্জ্বল থাকবে, হাসি-খুশী ভরা ও সন্তুষ্ট-স্বচ্ছন্দ হবে। আবার কতিপয় মুখমন্ডল ধুলি মলিন হবে। অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হবে। (সূরা আবাসা-৩৩-৪১)

কোন স্নেহদাতা পিতা ও স্নেহময়ী মাতা যদি ফাঁসির আসামী হয় এবং কোন সন্তানকে মঞ্চে উঠিয়ে প্রস্তাব দেয়া হয়, 'তোমাকে মুক্তি দিয়ে যদি তোমার কোন সন্তানকে ফাঁসি দেয়া হয়, তাতে তুমি রাজী আছো কিনা ?' পৃথিবীর কোন পিতা-মাতাই বোধহয় এ প্রস্তাব গ্রহণ করবেনা, নিজে ফাঁসিতে ঝুলবে কিন্তু সন্তানের মৃত্যু সে কামনা করবে না। পৃথিবীতে রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য, অর্থ-সম্পদ নিজের দখলে নেয়ার লক্ষ্যে কত মামলা মোকদ্দমা, একজন সুন্দরী মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে লাভের জন্য কত চেষ্টা। কিন্তু কিয়ামতের দিন! সেদিন বিপদের ভয়াবহতা দেখে মানুষ গোটা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে হলেও নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করবে। পরিচিত-আপনজনদের অবস্থা যে কি, তা জানারও চেষ্টা করবেনা। নিজের চিন্তা ছাড়া সে আর কারো চিন্তা করবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلاَيَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا-يُّبَصَّرُوْنَهُمْ-يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ-وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْهِ-وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُئْوِيْهِ-وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا-ثُمَّ يُنْجِيْهِ-

সেদিন কোন প্রাণের বন্ধু নিজের প্রাণের বন্ধুকেও প্রশ্ন করবে না। অথচ তাদের পরস্পর দেখা হবে। অপরাধীগণ সেদিনের আযাব হতে মুক্তি পাবার জন্য নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই, তাকে আশ্রয়দানকারী অত্যন্ত কাছের পরিবারকে এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বিনিময় দিয়ে হলেও মুক্তি পেতে চাইবে। (সূরা মায়ারিজ-১০-১৪)

কিয়ামতের দিন পৃথিবীর সব রকমের আত্মীয়তা, সম্পর্ক-বন্ধন ও যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। দল, বাহিনী, বংশ, গোত্র, পরিবার ও গোষ্ঠী হিসেবে সেদিন হিসাব নেয়া হবে না। এক এক ব্যক্তি একান্ত ব্যক্তিগতভাবেই সেদিন হিসাব দেবে। সুতরাং আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, স্ত্রী-সন্তান ও নিজ দলের খাতিরে কোন ক্রমেই অন্যায় কর্মে লিপ্ত হওয়া বা অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা, ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করা উচিত নয়। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিতদেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে ইসলামী আন্দোলনের সাথে অসহযোগিতা করলে নিশ্চিত জাহান্নামে যেতে হবে। কারণ সেদিন নিজের কৃতকর্মের দায়-দায়িত্ব নিজেকেই বহন করতে হবে। দল, আত্মীয়তা, স্ত্রী-সন্তান কোন উপকারেই আসবে না। আল্লাহ বলেন-

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ-يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-

কিয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক, তোমাদের কোন কাজে আসবে, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি। (সূরা মুমতাহিনা-৩)

তবে হ্যাঁ, কোন মানুষ যদি নিজের স্ত্রী-সন্তানকে ইসলাম শিক্ষা দেয়, ইসলামী বিধান মেনে চলার ব্যাপারে সহযোগিতা করে, আল্লাহ চাইলে তারা উপকারে আসতেও পারে। সেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না।, কারো কোন ক্ষমতাও থাকবে না। পৃথিবীর রাজা, বাদশাহ্, ক্ষমতাসীন দল, ক্ষমতাবান মানুষ কত অত্যাচার করে দুর্বলদের ওপর। ভুলে যায় কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন জলদ গম্ভীর স্বরে ডাক দিয়ে বলবেন, আজ কোথায় পৃথিবীর সেই রাজা, বাদশাহগণ? কোথায় সেই অত্যাচারীগণ?' কোরআন ঘোষণা করছে-

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ-لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ-اَلْيَوْ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ-لاَظُلْمَ الْيَوْمَ-اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-

(কিয়ামতের দিন চিৎকার করে প্রশ্ন করা হবে) আজ বাদশাহী কার ? (পৃথিবীর ক্ষমতাগর্বী শাসকগণ আজ কোথায়?) (উত্তরে বলা হবে) আজ বাদশাহী কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব একমাত্র পরম পরাক্রান্তশালী আল্লাহর। (বলা হবে) আজ প্রত্যেক মানুষকে সে যা অর্জন করেছে-তার বিনিময় দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। আর আল্লাহ হিসাব নেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষীপ্র। (সূরা মুমিন-১৬-১৭)

অবিশ্বাসের আবরণ সৃষ্টি করে যারা নিজেদের দৃষ্টিকে আবৃত করে রেখেছে, তাদের চোখে সত্য ধরা পড়ে না। কিয়ামত, বিচার, জান্নাত-জাহান্নাম তথা অদৃশ্য কোন শক্তিকে যারা বিশ্বাস করেনি, এসব ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেয়ারও প্রয়োজন অনুভব করেনি, সেদিন এদেরকে বলা হবে, যে অবিশ্বাসের পর্দা দিয়ে নিজেদের দৃষ্টিশক্তিকে আড়াল করে রেখেছিলে,

আজ সে পর্দা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন দেখো না, আমার ঘোষণা কতটা সত্য ছিল। মহান আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ-

(সেদিন আল্লাহ প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে বলবেন, এ দিনের প্রতি অবিশ্বাস করে তুমি অবহেলায় জীবন কাটিয়েছো) আজ তোমার চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। যা তুমি বিশ্বাস করতে চাওনি, অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাওনি, তা আজ দেখো এ সত্য দেখার জন্যে আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দিয়েছি। (সূরা কাফ-২২)

দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেয়ার অর্থ হলো, চোখের সামনের যাবতীয় পর্দাকে অপসারিত করা। মৃত্যুর পরে কি ঘটবে, মানুষ এ পৃথিবী থেকে তা দেখতে পায় না। যেসব কারণে তা দেখতে পায় না, সেদিন সেসব কারণসমূহ কার্যকর থাকবে না। ফলে পৃথিবীতে যারা ছিল অবিশ্বাসী, তারা নিজ চোখে সমস্ত দৃশ্য দেখে হতচকিত হয়ে যাবে। বিপদের ভয়াবহতা অবলোকন করে মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পালাতে থাকবে। কিন্তু পালানোর জায়গা সেদিন থাকবে না।

এই পৃথিবীই হবে হাশরের ময়দান

এই পৃথিবীটিই হাশরের ময়দান হবে। বর্তমানে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ একই রূপ নয়। কোথাও পানি, কোথাও বরফ, কোথাও বন-জঙ্গল, কোথাও আগ্নেয়গিরি, কোথাও পাহাড়-পর্বত উঁচু নিচু ইত্যাদি। কিন্তু কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দান কেমন হবে। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেসমস্ত মানুষ একটি ময়দানে একত্র হবে। তাহলে ময়দানটা কেমন হবে? বোখারী শরীফে এসেছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন-বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যমীনকে চাদরের মতো এমনভাবে বিছিয়ে দেয়া হবে, কোথাও একবিন্দু ভাঁজ বা খাঁজ থাকবে না।' ইসলামী পরিভাষায় হাশর বলা হয় কিয়ামতের পর পুনরায় পৃথিবীকে সমতল করে সেখানে সমস্ত সৃষ্টিকে হিসাব নিকাশ নেয়ার জন্যে একত্র করাকে। হাশর আরবী শব্দ। হাশর শব্দের আভিধানিক অর্থ একত্রিত করা, সমাবেশ ঘটানো। আল্লাহ বলেন-

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا-لاَّ تَرَى فِيْهَا عِوَجًا وَّلاَ اَمْتًا-

এ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে, সেদিন এই পাহাড়গুলো কোথায় চলে যাবে? আপনি বলে দিন, আমার রব্ব তাদেরকে ধূলি বানিয়ে উড়িয়ে দিবেন এবং যমীনকে এমন সমতল, রুক্ষ-ধূসর ময়দানে পরিণত করা হবে যে, যেখানে তুমি কোন উঁচু-নীচু এবং সংকোচন দেখতে পাবে না। (সূরা ত্ব-হা-১০৬-১০৭)

মানুষের ভেতরে এমন অনেকে রয়েছে, যারা পরকাল অস্বীকার করে না। পরকাল বিশ্বাস করে কিন্তু কোরআনের আলোকে বিশ্বাস করে না। এদের ধারণা সমস্ত কিছু সংঘটিত হবে একটি

আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্য দিয়ে। সেদিন যে দ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যার ভেতরে আল্লাহর আরশ, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি অবস্থান করবে, তা হবে সম্পূর্ণ এক আধাত্মিক জগৎ। কোরআনের ঘোষণার সাথে তাদের ঐ বিশ্বাসের কোন সামঞ্জস্য নেই। কোরআন বলছে, যমীন ও আকাশের বর্তমান রূপ ও আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হবে। বর্তমানে যে প্রাকৃতিক আইন কার্যকর রয়েছে, সেদিন তা থাকবে না। ভিন্ন আইনের অধীনে দ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন মহান আল্লাহ। এই পৃথিবীর যমীনকে পরিবর্তন করে হাশরের ময়দান বানানো হবে। এখানেই বিচার অনুষ্ঠিত হবে। মানুষের সেই দ্বিতীয় জীবনটি-যেখানে এসব পরকালীন জগতের ব্যাপার ঘটবে-তা নিছক আধ্যাত্মিক ব্যাপার হবে না, বরং তা ঠিক এমনভাবেই দেহ ও প্রাণকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হবে, এমনভাবে মানুষদেরকে জীবন্ত করা হবে, যেমন বর্তমানে মানুষ জীবিত হয়ে পৃথিবীতে রয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তি সেদিন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সহকারে সেখানে উপস্থিত হবে, যা নিয়ে সে পৃথিবী থেকে শেষ মুহূর্তে বিদায় গ্রহণ করেছিল। সেদিনের সে ময়দান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوَاتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ-

যখন যমীন ও আসমান পরিবর্তন করে অন্য কিছু করে দেয়া হবে এবং সবকিছু পরাক্রমশালী প্রভুর সম্মুখে উন্মোচিত-স্পষ্ট হয়ে উপস্থিত হবে। (সূরা ইবরাহীম-৪৮)

হাশরের দিন গোটা ভূ-পৃষ্ঠকে, নদী-সমুদ্রকে ভরাট করে পাহাড় পর্বতকে যমীনের উপর আছাড় দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে এবং বন-জঙ্গলকে দূর করে গোটা ভূ-পৃষ্ঠকে মসৃন ধূষর রংয়ের এক বিশাল ময়দানে পরিণত করা হবে। এ ময়দানের আকৃতি যে কত বড় হবে, তা আল্লাহই জানেন। সূরা কাহাফে বলা হয়েছে-

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا هُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا-

যখন আমি পাহাড়-পর্বতগুলোকে চালিত করবো তখন তোমরা যমীনকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখতে পাবে। আর আমি সমস্ত মানুষকে এমনভাবে একত্রিত করবো যে (পূর্বের ও পরের) কেউ বাকী থাকবে না। (সূরা কাহাফ-৪৭)

সেদিন মৃত্তিকা গর্ভে কিছুই থাকবে না। কারণ পৃথিবীতে মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর প্রয়োজনে আল্লাহ তা'য়ালা নানা স্থানে অজস্র ধরণের সম্পদ ও খাদ্যভান্ডার মওজুদ রেখেছেন। মাটির নীচে প্রচুর সম্পদসহ অন্যান্য বস্তু রয়েছে। এসব কিছু আল্লাহ তায়ালা আপন কুদরত বলে তার বান্দাহ্দেরকে দান করেছেন। পৃথিবীতে জীবন ধারনের জন্যে এসবের প্রয়োজন। কিন্তু কিয়ামতের সময় মানুষের জীবন ধারনের কোন প্রশ্নই আসেনা। সুতরাং সম্পদের থাকারও প্রয়োজন নেই। জান্নাতে যা প্রয়োজন এবং দোযখে যা প্রয়োজন সবই আল্লাহ মওজুদ রেখেছেন। অতএব সেদিন মাটির নিচের সম্পদের কোন প্রয়োজন হবে না। আল্লাহ বলেন-

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا-وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا-وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا-

পৃথিবী তার গর্ভের সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে। মানুষ প্রশ্ন করবে-পৃথিবীর হলো কি?

সেদিন কবরে শায়িতদেরকে উঠানো হবে

মানুষ মৃত্যুর পর হতে অনন্ত অসীম জীবনে মহাবিশ্বের যে অংশে অবস্থান করে ইসলামী পরিভাষায় সে অংশকেই আলমে আখিরাত বা পরলোক বলে। আখিরাত দু'ভাগে বিভক্ত। আলমে বারযাখ এবং আলমে হাশর। মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরে কিয়ামতের মাঠে উঠার অর্থাৎ পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত যে জগতে অবস্থান করে, সে জগতই হলো আলমে বারযাখ। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আল কোরআনের সূরা মুমিনুনে বলেছেন–

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ–

এখন এসব মৃত মানুষদের পিছনে একটি বরযাখ অন্তরায় হয়ে আছে পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত। (সূরা মু'মিনূন-১০০)

বারযাখ শব্দের অর্থ হচ্ছে পর্দা বা যবনিকা। পৃথিবী ছেড়ে বিদায় গ্রহণের পরে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবী, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক জগতে মানুষের আত্মা অবস্থান করবে। এ আলমে বারযাখ এমনি একটি স্থান যেখান থেকে মানুষের আত্মা পৃথিবীতেও ফিরে আসতে পারবেনা বা জান্নাত-জাহান্নামেও যেতে পারবে না। এ আলমে বারযাখকেই কবর বলা হয়। আলমে বারযাখের দুটো স্তর। একটির নাম ইল্লিন অপরটির নাম সিজ্জিন। পৃথিবীতে যে সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহর আইন কানুন-বিধান মেনে চলেছে সে সমস্ত মানুষের আত্মা ইল্লিনে অবস্থান করবে। ইল্লিন যদিও কোন বেহেশ্ত নয়-তবুও সেখানের পরিবেশ বেহেশতের ন্যায়। পৃথিবীতে জীবিত থাকতে যারা আল্লাহর আইন মেনে চলেছে তারা মৃত্যুর পরে ইল্লিনে আল্লাহর মেহমান হিসেবে অবস্থান করবে।

আর যে সমস্ত মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চলেনি, এমনকি ইসলামকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছে, মৃত্যুর পরে তাদের অপবিত্র আত্মা সিজ্জিনে অবস্থান করবে। এটা জাহান্নাম নয় কিন্তু এখানের পরিবেশ জাহান্নামের মতোই। কবর আযাব বলতে যা বুঝায় তা এই সিজ্জিনেই হবে। কবর বলতে মাটির সে নির্দিষ্ট গর্ত বা গুহাকে বুঝায় না যার মধ্যে লাশ কবরস্থ করা হয়। ইন্তেকালের পরে মানুষের দেহ ব্যঘ্র, সর্প যদি ভক্ষণ করে ফেলে বা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অথবা সমুদ্রে কোন জীব জন্তুর পেটে চলে যায় তবুও তার আত্মা কর্মফল অনুযায়ী ইল্লিন অথবা সিজ্জিনে অবস্থান করবে। মানুষ মৃত্যুর পর এমন এক জগতে অবস্থান করে, যে জগতের কোন সংবাদ, বা তাদের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ স্থাপন পৃথিবীর জীবিত মানুষের পক্ষে অসম্ভবই শুধু নয়–সম্পূর্ণ অসাধ্য।

মৃত মানুষগণ কি অবস্থায় কোথায় অবস্থান করছে, তা পৃথিবীর জীবিত মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এ কারণেই মৃত্যুর পরের ও কিয়ামতের পূর্বের এ রহস্যময় জগতকে বলা হয় আলমে বারযাখ বা পর্দা আবৃত জগত। মৃত্যুর পরবর্তী জগত সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে কবরের বর্ণনা করা হয়েছে। আলমে বারযাখই হলো সেই কবর। কিয়ামতের সময় তৃতীয় ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মানুষ ঐ কবর থেকে বের হয়ে হাশরের

ময়দানের দিকে দ্রুত ধাবিত হবে এবং তারপরই শুরু হবে বিচার পর্ব। মহান আল্লাহ বলেন-

وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لاَّرَيْبَ فِيْهَا-وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ-

কিয়ামতের মুহূর্তটি অবশ্যই আসবে। এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আল্লাহ সেই মানুষদের অবশ্যই উঠাবেন যারা কবরে শায়িত। (সূরা হজ্ব-৭)

পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তারা সবাই কবর থেকে বেরিয়ে আসবে। সূরা ইয়াছিনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَاهُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ-

পরে একবার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। আর অমনি তারা নিজেদের রব্ব-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য কবরসমূহ থেকে বের হয়ে পড়বে। (সূরা ইয়াছিন-৫১)

মানুষকে মৃত্যুর পরে যেখানে যে অবস্থায়ই দাফন দেয়া হোক অথবা পুড়িয়ে ফেলা হোক না কেন, সবার আত্মা আলমে বারযাখ বা কবরে অবস্থান করছে। সেখান থেকেই তারা হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। কবর থেকে উঠে এমনভাবে মানুষ আদালতে আখেরাতের দিকে দৌড়াবে যেমনভাবে মানুষ কোন আকর্ষণীয় বস্তু দেখার জন্য ছুটে যায়। আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ-

সেদিন তারা কবর হতে বের হয়ে এমনভাবে দৌড়াবে যে, দেবতার স্থানসমূহের দিকে দৌড়াচ্ছে। তখন তাদের দৃষ্টি অবনত হবে। অপমান লাঞ্ছনা তাদেরকে (পাপীদেরকে) ঘিরে রাখবে। এটা সেই দিন যার ওয়াদা তাদের নিকট করা হয়েছিল। (সূরা মায়ারিজ-৪৩)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আদিয়াতে বলেছেন-

اَفَلاَ يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَافِى الْقُبُوْرِ -

তারা কি সে সময়ের কথা জানে না, যখন কবরে সমাহিত সবকিছু বের করা হবে।

কিয়ামতের দিন ভয়বিহ্বল চেহারা নিয়ে মানুষ আল্লাহর দরবারের দিকে দৌড়াতে থাকবে। পবিত্র কোরআনের সূরা ক্বামার-এর ৬-৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَىْءٍ نُّكُرٍ-خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ-

যেদিন আহ্বানকারী এক কঠিন ও দুঃসহ জিনিসের দিকে আহ্বান জানাবে, সেদিন মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে নিজেদের কবর সমূহ হতে এমনভাবে বের হবে, যেন বিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহ।

আধুনিক বিজ্ঞান জানাচ্ছে সমস্ত বিশ্বজগৎ অসংখ্য পরমাণু দ্বারা গঠিত। এ থিউরি অনুযায়ী কোন বস্তু বা জিনিষের নিঃশেষে ধ্বংস নেই। কোন প্রাণীর দেহকে যা-ই করা হোকনা কেন,

তা নিঃশেষে ধ্বংস হয় না। মাটির সাথে মিশে থাকে। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে থাকা পরমাণুগুলো পুনরায় একত্রিত হয়ে পূর্বের আকৃতি ধারণ করবে। মানুষের দেহ পচে গলে যে অবস্থাই ধারণ করুক না কেন, তা সেদিন পূর্বের আকৃতি ধারণ করে নিজের কৃতকর্মের হিসাব দেয়ার জন্যে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ প্রশ্নের ভাষায় বলেন–

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ-بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ-

আমি কি প্রথম বার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? মূলত একটি নবতর সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে এই লোকগুলো সংশয়ে নিমজ্জিত। (সূরা ক্বাফ-১৫)

সে যুগেও ছিল বর্তমান যুগেও এক শ্রেণীর অজ্ঞ, মূর্খ, জ্ঞান পাপী আছে, যাদের ধারণা এই মানুষের দেহ সাপের পেটে বাঘের পেটে মাছের পেটে যাচ্ছে। মাটির গর্তে পচে গলে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এই শরীর কি পুনরায় বানানো সম্ভব ? সুতরাং হাশর, বিচার কিয়ামত একটা বানোয়াট ব্যাপার। পৃথিবীতে যতক্ষণ আছো, খাও দাও ফূর্তি করো। এদেরকে উদ্দেশ্য করে সূরা কিয়ামাহ্-এর ৩-৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ-بَلَى قَدِرِيْنَ عَلَى أَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ-

মানুষ কি মনে করে আমি তার হাড়গুলো একস্থানে করতে পারবো না? কেন পারবো না ? আমি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গিরা (JOINT) সমূহ পর্যন্ত পূর্বের আকৃতি দিতে সক্ষম।

এই পৃথিবীতে মানুষ যে দেহ নিয়ে বিচরণ করছে, যে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে আল্লাহর বিধান পালন করেছে অথবা অমান্য করেছে, সেই দেহ নিয়েই সেদিন উত্থিত হবে। সূরা আম্বিয়ার ১০৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ-

আমি যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি ঠিক অনুরূপভাবেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবো।

সেদিন কেউ বাদ পড়বেনা। প্রথম মানব সৃষ্টির দিন হতে চূড়ান্ত প্রলয়ের দিন পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীর আলো-বাতাসে এসেছে, তাদের সকলকেই একই সময়ে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ-لَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ-

সেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে। তারপর (সেদিন) যা কিছু ঘটবে তা সকলের চোখের সামনেই ঘটবে। (সূরা হুদ-১০৩)

অর্থাৎ পৃথিবীতে কারো বিচার চলাকালিন অনেক অবিচারই করা হয়। আসামীর চোখের আড়ালে তাকে ফাঁসানোর জন্যে কত কিছু করা হয়। কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে এমন করা হবে না। মানুষ প্রতি মুহূর্তে যা কিছু করছে তার রেকর্ড সংরক্ষণ করছেন সম্মানিত দু'জন

ফেরেশতা। সে সব রেকর্ড মানুষ নিজেই পড়বে। সেই রেকর্ডের ভিত্তিতেই বিচার করা হবে। তার দৃষ্টির আড়ালে কিছুই করা হবে না। সূরা ওয়াকিয়ায় বলা হয়েছে–

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ-لَمَجْمُوْعُوْنَ-اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ-

হে রাসূল ! আপনি বলে দিন, প্রথম অতীত হওয়া ও পরে আসা সমস্ত মানুষ নিঃসন্দেহে একটি নির্দিষ্ট দিনে একত্রিত করা হবে, এর সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

কিয়ামতের দিন শরীর প্রকম্পিত হওয়ার মতো অবস্থা দেখে মানুষ ভয়ে এমনই দিশেহারা হয়ে পড়বে যে, তারা কিছুতেই স্মরণ করতে পারবে না পৃথিবীতে জীবিত থাকা কালে তারা কত দিন জীবিত ছিল। পরকালের সূচনা এবং তার দীর্ঘতা দেখে পৃথিবীর শত বছরের হায়াতকে তারা মনে করবে বোধ হয় এই ঘন্টাখানেক পৃথিবীতে ছিলাম। ইসলামী বিধান যারা মানেনি তারা সেদিন পৃথিবীতে কত হায়াত পেয়েছিল তা ভুলে যাবে। এ ভুলে যাওয়া কোন স্বাভাবিকভাবে ভুলে যাওয়া নয় বরং ভয়ে আতঙ্কে ভুলে যাবে। আল্লাহ বলেন–

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا-يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ عَشْرًا-

অপরাধীদেরকে এমনভাবে ঘিরে আনবো যে তাদের চক্ষু আতংকে বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। তারা পরস্পর ফিসফিস করে বলাবলি করবে, আমরা পৃথিবীতে বড় জোর দশদিন মাত্র সময় কাটিয়েছি। (সূরা ত্ব-হা-১০২)

মহান আল্লাহ সেদিন মানুষকে প্রশ্ন করবেন–

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَسِنِيْنَ-قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ-

তোমরা পৃথিবীতে কতদিন ছিলে? উত্তরে তারা বলবে একদিন বা তার চেয়ে কম সময় আমরা পৃথিবীতে ছিলাম। (সূরা মুমিনুন-১১২-১১৩)

আল্লাহর কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ-مَالَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ-

যখন সে সময়টি এসে পড়বে, তখন অপরাধীগণ শপথ করে বলবে যে পৃথিবীতে আমরা এক ঘন্টার বেশি ছিলাম না। (সূরা রূম-৫৫)

সেদিন আল্লাহ বিরোধিদের চেহারা ধূলি মলিন হবে

কিয়ামতের ময়দানে ঐলোকগুলোর মুখমন্ডল ধূলিমলিন হবে, পৃথিবীতে যারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করেছিল এবং আল্লাহর বিধান অনুসরণে অবহেলার পরিচয় দিয়েছে। এই পৃথিবীতে শত কোটি মানুষ। কেউ কালো কেউ ফর্সা। কেউ মোটা কেউ পাতলা। কেউ সুন্দর কেউ অসুন্দর কুৎসিত। কারো চেহারা এতই সৌন্দর্য মন্ডিত যে, একবার দেখে সাধ মিটে না, বার বার দেখতে ইচ্ছে করে। আবার কারো চেহারা এতই কুৎসিত যে, প্রথম দৃষ্টিতেই মনে বিতৃষ্ণা চলে আসে।

কিন্তু কতক কুৎসিত মানুষের মন, আমল-আখলাক এতই সুন্দর যে, মহান আল্লাহ তাদের উপর রাজী-খুশী থাকেন। আবার কতক সুন্দর চেহারার মানুষ আছে, যাদের মন-মানসিকতা, স্বভাব-চরিত্র এতই জঘন্য যে, খোদ শয়তানও তাদের ক্রিয়াকর্ম দেখলে দূরে সরে যায়। এই পৃথিবীতে বোধহয় সবচেয়ে কঠিন মানুষকে চেনা। সুন্দর মিষ্টি ভদ্র চেহারার আড়ালে জঘন্য মন লুকিয়ে থাকে। ভদ্রতার মুখোশ পরে ভদ্র-সৎ মানুষদের সাথে এই পাপীরা মেশে। পৃথিবীতে এদের চেহারা দেখে অনুমান করা যায় না এরা কত জঘন্য অপরাধী। কিন্তু কিয়ামতের দিন! সেদিন ওই পাপীদের চেহারা এমন হবে যে, ওদের চেহারার দিকে তাকালেই স্পষ্ট চেনা যাবে এরা পাপী। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনবলেন–

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ-وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ-تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ-أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ-

এবং সেদিন কতিপয় মুখমন্ডল ধূলিমলিন হবে। কালিমা লিপ্ত অন্ধকার লিপ্ত অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হবে। এরাই হলো অবিশ্বাসী ও পাপী লোক। (সূরা আবাসা-৪০-৪২)

যারা আসামী-অপরাধী তাদের চেহারা-ই বলে দেবে সেদিন তারা পাপী। কোরআন বলছে–

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ-

অপরাধীগণ সেখানে নিজ নিজ চেহারা দিয়েই পরিচিত হবে এবং তাদেরকে কপালের চুল ও পা ধরে চ্যাংদোলা করে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাওয়া হবে। (সূরা আর-রহমান-৪১)

সূরা ইবরাহীমে বলা হয়েছে–

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ-سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ-

সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে, শিকল দ্বারা শক্ত করে হাত-পা বাঁধা রয়েছে এবং গায়ে গন্ধকের পোষাক পরানো হয়েছে। আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ তাদের মুখমন্ডল আচ্ছন্ন করে রেখেছে। (সূরা ইবরাহীম-৪৯-৫০)

গন্ধক আগুনের স্পর্শ পেলে যে কিভাবে জ্বলে ওঠে তা সবাই জানে। সেদিন পাপীদের শরীরে গন্ধকের পোষাক পরিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আগুন তাদের হাড় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু কখনো মৃত্যু হবে না। আযাবের পরে কঠিন আযাবই শুধু ভোগ করবে। মানুষ পৃথিবীতে সামান্য দু'দিনের জীবন সুন্দর করার জন্য কত রকমের সাধনা-চেষ্টা করে। সন্তান যখন দু'আড়াই বছর বয়সে কথা বলতে শেখে তখন থেকেই তাকে লেখা-পড়া শিক্ষা দেয়। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রী অর্জন করার পরেও তাকে আরো উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিদেশে পাঠায়।

এ সবই করা হয় পৃথিবীতে সুন্দরভাবে জীবন-যাপনের জন্য। কিন্তু এই দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত স্বল্প সময়ের। স্বল্প সময়ের এই জীবনকে সুন্দর করার জন্য এত চেষ্টা-সাধনা। অথচ পরকালের অনন্তকালের জীবন সুন্দর করার জন্য কোন প্রচেষ্টা নেই। বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করে শিক্ষিত হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। কিন্তু নিজের ঘরে কোরআন শরীফ, সেটা একবার খুলেও দেখছে না এর ভেতর কি আছে। ইসলাম সম্পর্কে যারা জ্ঞান অর্জন না করে শুধু অন্যান্য বিষয়েই বিরাট বিরাট পন্ডিত, বুদ্ধিজীবী সেজেছে, তাদেরকে আল্লাহ অন্ধ বলেছেন। কারণ এদের চোখ থাকতেও এরা কোরআন হাদিস, ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে সেই অনুযায়ী কাজ করেনি। সত্য পথ এই সব জ্ঞানপাপী, পন্ডিত, বুদ্ধিজীবীগণ দেখার চেষ্টা করেনি। আল্লাহ্ বলেন-

وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلاً-

আর যারা পৃথিবীতে (সত্য দেখার ব্যাপারে) অন্ধ হয়ে থাকবে, তারা আখেরাতেও অন্ধ হয়েই থাকবে। বরং পথ লাভ করার ব্যাপারে তারা অন্ধদের চেয়েও ব্যর্থকাম। (বনী-ইসরাইল-৭২)

পৃথিবীতে কত দৃষ্টিবান মানুষ এই চোখ দিয়ে নানা ধরনের পুস্তক পড়ে, গবেষণা করে, পর্যবেক্ষণ করে বিরাট বিরাট পন্ডিত হচ্ছে। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে অন্ধই থেকে যাচ্ছে। আবার কত দৃষ্টিহীন অন্ধ মানুষ, যারা অপরের সাহায্যে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে ইসলামের বিধান মেনে চলছেন। জ্ঞানপাপীদের লক্ষ্য করেই আল্লাহ বলেছেন এরা প্রকৃত অন্ধদের চেয়েও অন্ধ ব্যর্থকাম। মহান আল্লাহ বলেন-

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا-مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ-

আমি তাদেরকে কিয়ামতের দিন অন্ধ, বোবা ও কালা (বধির) করে উল্টো করে টেনে নিয়ে আসবো। এদের শেষ পরিণতি জাহান্নাম। (সূরা বনী-ইসরাইল-৯৭)

এই সমস্ত জ্ঞান পাপী মূর্খ পন্ডিতগণ যারা ইসলামী জ্ঞান অর্জনও করেনি মেনেও চলেনি বা বিশ্বাসও করেনি। এরা যখন কিয়ামতের ময়দানে অন্ধ হয়ে উঠবে তখন এরা কি বলবে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى-قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا-

কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাবো তখন সে বলবে, হে রব! পৃথিবীতে তো আমি দৃষ্টিমান ছিলাম কিন্তু এখানে কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালে? (সূরা ত্বা-হা-১২৪-১২৫)

পৃথিবীতে যারা জীবিত থাকতে নিজের খেয়াল খুশী মতো চলেছে, তারা কিয়ামতের ময়দানে ভয়াবহ অবস্থা স্বচোক্ষে দেখে অনুশোচনা-অনুতাপ করবে। আফসোছ করে বলবে কেন আমি এই পরকালের জীবনের জন্যে কিছু অর্জন করে পাঠাইনি! কিন্তু মৃত্যুর পরে তো কোন অনুতাপ আফসোছ কাজে আসবে না। কোরআন শরীফে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন ওই পাপীদেরকে আফসোছ করতে দেখে তিনি বলবেন, 'কেন, পৃথিবীতে তো আমি তোমাদেরকে যথেষ্ট হায়াত দিয়েছিলাম, তখন তো আজকের এই অবস্থাকে তোমরা অবিশ্বাস করেছো।' সূরা ফজর-এর ২৩-২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَجِاىْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ-يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى-يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ-

আর জাহান্নামকে সেদিন সবার সামনে হাজির করা হবে। তখন মানুষের বিশ্বাস জন্মাবে। কিন্তু তখন তার বিশ্বাস অবিশ্বাসের তো কোন মূল্য থাকবে না। আফসোস করে তখন সে বলতে থাকবে, হায়! আমি যদি এই জীবনের জন্যে অগ্রিম কিছু পাঠাতাম!

পৃথিবীতে মানুষ যা করছে, তা সবই কিয়ামতের দিন সে নিজ চোখে দেখতে পাবে। আল্লাহর সৃষ্টি এই মানুষ আল্লাহর দেয়া জ্ঞান দিয়েই কত কিছু আবিষ্কার করেছেন এবং করছে। মানুষে কণ্ঠস্বর, ছবি, ক্রিয়াকান্ড, হাসি, কান্না শত শত বছর ফিতার মাধ্যমে ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছে। তেমনিভাবে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষের সকল কর্মকান্ড, কথা ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের নিজের আমলসমূহ কিয়ামতের দিন পেশ করা হবে। সূরা নাবা-এর ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَاقَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا-

সেদিন মানুষ সবকিছু প্রত্যক্ষ করবে যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রিম পাঠিয়েছে। তখন প্রতিটি অবিশ্বাসী কাফের চিৎকার করে বলবে, ''হায়! আমি যদি (আজ) মাটি হয়ে যেতাম।

সেদিন নেতা ও অনুসারীগণ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করবে

পৃথিবীর এমন মানুষের সংখ্যা অগণিত, যারা নিজেদের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগায় না। অপরের পরামর্শ অনুযায়ী চলে। কেউ চলে পিতা-মাতার কথা অনুযায়ী। কিন্তু চিন্তা করে দেখে না পিতা-মাতার কথা ইসলাম সম্মত কিনা। আবার কেউ চলে নেতাদের কথা

অনুযায়ী। চোখে দেখছে, মসজিদে আজান হচ্ছে, নামাজের সময় চলে যাচ্ছে তবুও নেতা বক্তৃতা করেই যাচ্ছেন। নেতা নিজেও নামাজ আদায় করছে না দলের লোকদেরকে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিচ্ছে না। এই ধরনের খোদাদ্রোহী নেতৃবৃন্দের কথা অনুযায়ী এক শ্রেণীর মানুষ চলে। আবার আরেক ধরনের মানুষ আছে যারা অন্ধভাবে পীর-মওলানাদের কথা অনুযায়ী চলে। চিন্তা করে দেখে না, পীর বা মওলানা সাহেবের কথার সাথে আল্লাহ রাসূলের কথার মিল আছে কিনা। পীর বা মাওলানা হলেই যে সে ফেরেশতা হয়ে যাবে এটা তো কোন যুক্তি নয়। পৃথিবীতে যারা নিজে ইসলামী জ্ঞান অর্জন না করে অন্যের পরামর্শে ভুল পথে চলে তাদের অবস্থা কিয়ামতের দিন কেমন হবে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً-يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً-لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْجَاءَ نِىْ-

অপরাধী জালিমগণ সেদিন নিজের হাত কমাড়াতে থাকবে এবং বলবে-হায়, আমি যদি রাসুলের সংগ গ্রহণ করতাম। (অর্থাৎ রাসুলের দেয়া আদর্শ যদি মেনে চলতাম) হায় আমার দুর্ভাগ্য! অমুক ব্যক্তিকে যদি আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। তার প্ররোচনায় পড়েই আমি সে নসীহত গ্রহণ করিনি যা আমার নিকট এসেছিল। (সূরা ফুরকান-২৭-২৯)

অর্থাৎ ওই সমস্ত ব্যক্তিকে যদি অনুসরণ না করতাম, যারা আমাকে ভুল পথে চালিয়েছে। তাদের কারণেই আমি ওই সমস্ত মানুষদের কথা শুনিনি–যারা আমাকে ইসলামের পথে ডেকেছে। অপরাধীগণ আযাবের ভয়াবহ অবস্থা দেখে বলবে, যদি এই হাশর বিচার না হতো! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا-وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ-تَوَدُّلَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ اَمَدًا بَعِيْدًا-

নিশ্চয়ই সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে। (সে ফল) হোক ভালো অথবা মন্দ, সেদিন তারা কামনা করবে যে, এ দিনটি যদি তাদের নিকট হতে দূরে অবস্থান করতো, তবে কতই না ভালো হতো। (আল-ইমরান-৩০)

পৃথিবীর আদালতে উকিল-ব্যারিষ্টারকে টাকার বিনিময়ে আসামীর পক্ষে নিয়োগ করা হয়। তারা নানা যুক্তি দিয়ে, কথার কূটকৌশল প্রয়োগ করে, মিথ্যে কারণ দেখিয়ে স্পষ্ট চিহ্নিত খুনী আসামীকেও নির্দোষ বানানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন! সেদিন এ সমস্ত কূট কৌশল চলবে না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের প্রতিটি মানুষের সাথে আল্লাহ কোন মাধ্যম ছাড়াই কথা বলবেন, (অর্থাৎ হিসাব নেবেন) সেখানে

আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে কোন উকিল বা দো-ভাষী থাকবে না। আর তাকে লুকিয়ে রাখার কোন আড়াল থাকবে না। সে যখন ডান দিকে তাকাবে তখন নিজের কৃতকর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। আবার যখন বাম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে সেদিকেও নিজের কর্মসমূহ ছাড়া আর কিছুই দেখবেনা। যখন সামনের দিকে তাকাবে তখন জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখবেনা। অতএব অবস্থা যখন এই তখন তোমরা একটি খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন হতে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করো। (বোখারী, মুসলিম)

পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধানে সাথে বিরোধিতা করেছে, ইসলামী আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে, কিয়ামতের ময়দানে যখন জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন জাহান্নামের দ্বাররক্ষী তাদেরকে প্রশ্ন করবে। পবিত্র কোরআন বলছে–

اذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ-تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ-كُلَّمَا اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ-

তারা যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন জাহান্নামের ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ ধ্বনি শুনতে পাবে। জাহান্নাম উথাল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ-আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় তা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। প্রতিবারে যখনই তার ভেতরে কোন জনসমষ্টি (অপরাধী দল) নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার দ্বার রক্ষী সেই লোকদেরকে প্রশ্ন করবে, কোন সাবধানকারী কি তোমাদের কাছে আসেনি ? (সূরা মুল্‌ক-৭-৮)

জাহান্নামের দ্বাররক্ষী বলবে, এই ভয়ঙ্কর স্থানে তোমরা কেমন করে এলে ? এই জাহান্নামের মতো কঠিন স্থান আল্লাহ আর দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করেননি। আল্লাহর বিধান অমান্য করলে এই স্থানে আসতে হবে, পৃথিবীতে এ সংবাদ কি তোমাদেরকে কেউ অবগত করেনি ? তখন জাহান্নামীগণ কি জবাব দিবে আল্লাহ তা শোনাচ্ছেন–

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ-فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ-اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ-

তারা জবাবে বলবে, হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের কাছে এসেছিল বটে কিন্তু আমরা তাকে অমান্য ও অবিশ্বাস করেছি এবং বলেছি যে, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। আসলে তোমরা মারাত্মক ভুলের ভেতরে নিমজ্জিত রয়েছো। (সূরা মুল্‌ক-৯)

ইসলামী আন্দোলন বিরোধী জাহান্নামের যাত্রীরা প্রশ্নকারীকে বলবে, 'আমাদের কাছে নবী-রাসূল, আলেম-ওলামা, ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী এসেছিল। তারা আমাদেরকে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য করার জন্য দাওয়াত দিয়েছিল। আমরা তাদের দাওয়াত কবুল করিনি। তাদের সাথে আমরা বিরোধিতা করেছি। আমরা তাদেরকে মৌলবাদী আর সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিয়ে বলেছি, তোমরা সেকেলে আদর্শ অনুসরণ করে চলছো। আল্লার বিধান বলে তোমাদের কাছে কিছুই নেই। ইসলামের নামে তোমরা নিজেদের বানানো আদর্শ

দেশ ও জাতির বুকে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছো। দেশ ও জাতিকে তোমরা প্রগতির পথ থেকে সরিয়ে অধঃগতির দিকে নিয়ে যেতে চাও।' এই লোকগুলো সেদিন আফসোস করে নানা কথা বলবে। সূরা মূল্ক-এর ১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ শোনাচ্ছেন, সেদিন তারা কি বলবে-

وَقَالُوْا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ-

আর তারা বলবে, হায় ! আমরা যদি শুনতাম ও অনুধাবন করতাম তাহলে আমরা আজ এই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম না !

আমরা যদি কোরআনের কথা শুনতাম, ইসলামের বিধান অনুধাবন করে তা অনুসরণ করতাম, তা হলে আজ এই জাহান্নামে যেতে হতো না। ইন্না কুন্না লাকুম তাব'আন-আমরা যদি অনুসরণ করতাম-আমরা যদি আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে নিজেদের জীবন পরিচালিত করতাম, তাহলে আজ এই কঠিন অবস্থার মধ্যে নিপতিত হতাম না।

পৃথিবীর মানুষ একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করে, গোপনে খুন, নারী ধর্ষণ, চুরি করে। ঘুষ খায়। সমাজে সে সব হয়ত কোনদিন প্রকাশ পায় না। কিন্তু সেদিন! সেদিন যে কত সাধু ধরা পড়ে যাবে তা আল্লাহই জানেন। সূরা হাক্কায় মহান আল্লাহ্ বলেন-

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لاَ تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ-

সেদিন সমস্ত বিষয় প্রকাশ করা হবে। তোমাদের কোন তত্ত্ব ও তথ্যই লুকিয়ে থাকবে না।

এই পৃথিবীর মাটির উপরে মানুষ বিচরণ করছে। কিয়ামতের দিন এই মাটি কথা বলবে। মহান আল্লাহ্ বলেন-

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا-

সেদিন তা (জমিন) নিজের উপর সংঘটিত সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে? (সূরা যিলযাল-৪)

কোরআনের এই আয়াত প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল বলেন, 'তোমরা কি বলতে পারো, সেই অবস্থাটা কি-যা সে (মাটি) বলবে?' উপস্থিত লোকেরা বললো, 'আল্লাহ এবং তার রাসূলই এ বিষয়ে অধিক জানেন।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মাটি প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী লোক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে যে, তার উপর (মাটির উপর) থেকে কে কি করেছে। মাটি এসব অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিবে। মানুষের আমল বা কর্ম সমূহকেই এ আয়াতে আখবার (সংবাদের নিদর্শন) বলা হয়েছে। (তিরমিজ ও আবু দাউদ)

যমীন তার উপরে যা কিছু ঘটবে সব কিছু কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে প্রকাশ করে দিবে, এ কথাটি সে যুগের মানুষের কাছে অদ্ভুত বিস্ময়কর মনে হয়েছে। অনেকে অবিশ্বাসও করেছে। মাটি কথা বলবে, এটা তাদের বোধহয় বোধগম্য হতো না। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের অপূর্ব আবিষ্কার সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, টেপ-রেকর্ডার, আলট্রাসনোগ্রাফী, কার্ডিওলজি, টেলেক্স, ফ্যাক্স, কম্পিউটার প্রভৃতির ব্যাপক প্রচলন ও ব্যবহার-মানুষকে স্পষ্ট ধারণা দিচ্ছে-মাটি কথা বলবে এটা অসম্ভবের কিছু নয়।

মানুষ নিজের মুখে যা বলে, তা বাতাসে ইথারের প্রবাহ, ঘরের প্রাচীর, ঘরের ছাদ ও মেঝেতে, ঘরের আসবাবপত্রের প্রতিটি বিন্দুতে বিন্দুতে সমস্ত কিছুর অণু-পরামাণুতে মিশে থাকে। মানুষের বলা কথা কণ্ঠ হতে উচ্চারিত যে কোন ধ্বনির ক্ষয় নেই ধ্বংস নেই।

মহাবিজ্ঞানী পরম করুণাময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনযখন চাইবেন তখন পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুতে মিশে থাকা মানুষের কণ্ঠস্বর ও উচ্চারিত ধ্বনি ঠিক তেমন ভাবেই পুনরায় উচ্চারণ করাতে পারবেন-যেমন তা প্রথমবার মানুষের কণ্ঠ হতে উচ্চারিত বা ধ্বনিত হয়েছিল। মানুষ বহু শত বছর পূর্বে তার নিজের বলা কথা তখন নিজ কানেই শুনতে পাবে। তার পরিচিত লোকরাও শুনে বুঝতে পারবে এই কণ্ঠস্বর অমুকের। মানুষ পৃথিবীর বুকে যে অবস্থায় এবং যেখানে যে কাজ করেছে তার প্রত্যেকটি গতিবিধি ও নড়াচড়ার ছবি বা প্রতিবিম্ব মানুষের আশে পাশে নিচে উপরে যা থাকে অর্থাৎ পরিবেশের প্রতিটি জিনিষের উপরেই পড়ছে। মানুষের স্পন্দনের প্রতিটি ছায়া প্রতিটি বস্তুর উপরে প্রতিফলিত হচ্ছে।

বর্তমানে মানুষ স্যাটালাইটের মাধ্যমে যে কেরামতি দেখাচ্ছে, কিন্তু যে আল্লাহ মুষকে ঐ স্যাটালাইট আবিষ্কারের জ্ঞানদান করেছেন, সেই আল্লাহ কি স্যাটালাইট বানিয়ে মানুষের প্রতিটি গতিবিধির ছবি ধরে রাখছেন না? মানুষ পানির অতল প্রদেশে, তিমিরাচ্ছন্ন ঘন অন্ধকারে স্পষ্ট চবি তোলার জন্যে ক্যামেরা বানিয়ে তা ব্যবহার করছে। ঠিক তেমনি মানুষ নিঃছিদ্র ঘন অন্ধকারে কোন কাজ করলেও তার ছবি উঠে যাচ্ছে।

কারণ আল্লাহর এ বিশাল পৃথিবীর এমন শক্তিশালী ক্যামেরা বা আলোকরশ্মি চলমান আছে যার কাছে আলো অন্ধকারের কোন তারতম্য বা পার্থক্য নেই, তা যে কোন অবস্থায় কাছের ও দূরের যে কোন ছবি তুলতে সক্ষম। মানুষের যাতবীয় কর্ম তো বটেই এমনকি তার পায়ের নিচে চাপা পড়ে ছোট একটা উকুনও যখন মারা যাচ্ছে তখন তখনই সে ছবি উঠে যাচ্ছে। এসব ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব কিয়ামতের দিন চলচ্চিত্রের মতোই সমস্ত মানুষের দৃষ্টির সামনে ভাসমান ও ভাস্কর হয়ে উঠবে।

মানুষ নিজের চোখেই দেখবে সে ডাকাতি, ছিনতাই করেছে, ষড়যন্ত্র করেছে, হত্যা করেছে, নারী ধর্ষন করেছে, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করেছে, সুদ, ঘুষ খেয়েছে সব কিছুই দেখতে পাবে। শুধু তাই নয়-মানুষের মনের মধ্যে যে সব চিন্তা চেতনা কামনা বাসনার উদয় হয় তা-ও বের করে মানুষের দৃষ্টির সামনে সারিবদ্ধভাবে রেখে দেয়া হবে।

বিচার দিবসে পাপীগণ নিজের দোষ অন্যে ঘাড়ে চাপাবে। মানুষ তার মানবিক দূর্বলতার কারণে অন্যের খেয়াল খুশী মতো কাজ করতে বাধ্য হয়, অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর জন্যে, স্ত্রী-স্বামীর জন্যে, পিতা সন্তানের জন্যে, সন্তান পিতার জন্যে, বন্ধু-বন্ধুকে খুশী করার জন্যে, রাজনৈতিক নেতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে, পীর ও শিক্ষককে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে, উর্ধ্বতন অফিসারকে খুশী করে নিজের চাকরী পাকাপোক্ত করার জন্য, অথবা চাকরিতে প্রমোশনের জন্যে, মন্ত্রী, এম, পি, চেয়ারম্যান-মেম্বারকে সন্তুষ্ট করার জন্য এমন কাজ করে, যে কাজ করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

এ সমস্ত মানুষদের নির্বুদ্ধিতার জন্যে হাশরের ময়দানে তাদেরকে চরমভাবে প্রতারিত ও নিরাশ হতে হবে এবং আযাব ভোগ করতে হবে। পরকালে তারা কঠিন আযাব ভোগ করবে, এ কথা পবিত্র কোরআনে বার বার উল্লেখ করে এ ধরনের আত্মপ্রবঞ্চিত দলকে সর্তক করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ-وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا-كَذَالِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ-وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ-

যাদের কথায় (নেতা বা ক্ষমতাবান) মানুষ চলতো, তারা (নেতাগণ) কিয়ামতের দিন তাদের দলের লোকদের কাছ থেকে সম্পুর্ণ কেটে পড়বে। নেতা এবং অনুসারীগণ সেদিনের ভয়ংকর শাস্তির ভয়াবহতা দর্শন করবে। নেতা এবং অনুসারীদের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসারীগণ বলতে থাকবে, যদি কোন প্রকারে আমরা একবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে আমরা সেখানে (পৃথিবীতে নেতাদের) এদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম যেমন করে আজ তারা (নেতাগণ) আমাদের থেকে (বিচ্ছিন্ন) হয়েছে, কিন্তু মহান আল্লাহ সকলকেই (নেতা ও অনুসারীদেরকে) তাদের কর্মফল দেখিয়ে দিবেন যা তাদের জন্যে অবশ্যই অনুতাপ-অনুশোচনার কারণ হবে। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা সে জাহান্নামের আগুন থেকে কোনক্রমেই বের হতে পারবে না। (সূরা বাকারাহ্-১৬৬-১৬৭)

অতএব হায়াত থাকতে অবশ্যই মানুষকে সাবধান হতে হবে। কারো নির্দেশ মেনে চলা যাবে না, সে যত বড় নেতা হোক, যত বড় পীর-মাওলানা হোক না কেন। কেউ কোন নির্দেশ দিলে সে নির্দেশ ইসলাম সম্মত কিনা-তা যাচাই করে তারপর মেনে চলতে হবে। পৃথিবীতে যারা যাচাই-বাছাই না করে, যে কোন নেতা গোছের মানুষের অনুসরণ করেছে তাদের ও তাদের নেতাদের মৃত্যুকালের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়ংকর। মৃত্যুর সময়ে ফেরেশ্তা তাদেরকে প্রশ্ন করবে-সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

قَالُوْا اَيْنَ مَاكُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ-قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ-قَالَ ادْخُلُوْا فِىْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ-كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا-حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا-قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِاُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ

النَّارِ-قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لاَّتَعْلَمُوْنَ-وَقَالَتْ أُوْلٰهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের আইন-নির্দেশ মেনে চলতে, তারা আজ কোথায়? (উত্তরে) তারা বলবে, তারা (নির্দেশদাতাগণ) তাদের কাছ থেকে সরে পড়েছে। তারপর তারা স্বীকার করবে যে, তারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসই করেছে। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের মধ্যে জ্বিন এবং মানুষের মধ্যে যে দল অতিত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো। অতঃপর এদের একটি দল (অনুসারীগণ) যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন তাদেরই অনুরূপ দলের (নেতাগণের) প্রতি অভিশাপ করতে থাকবে। যখন সব দলগুলো (অনুসারী দল ও খোদাদ্রোহী নেতাদের দল) সেখানে প্রবেশ করবে তখন (অনুসারী দল-নেতাদের সম্পর্কে) পরবর্তী দল তার পূর্ববতী দল সম্পর্কে একথা বলবে-হে প্রভু, ওরা (খোদাদ্রোহী নেতাগণ) আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। আল্লাহ বলবেন, 'তোমাদের উভয়ের জন্যেই দ্বিগুণ শাস্তি। কিন্তু এ সম্পর্কে তোমরা কোন জ্ঞান রাখোনা।' তাদের প্রথমটি শেষেরটিকে বলবে, তোমরা আমাদের চেয়ে মোটেই উত্তম নও, অতএব তোমরা তোমাদের কর্মের প্রতিফল ভোগ করো। (সূরা আরাফ)

ইসলাম বিরোধী নেতা-কর্মীরা জাহান্নামে কঠিন আযাব ভোগ করতে থাকবে এবং এরা একে অপরের প্রতি অভিশাপ দিতে থাকবে। এদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ-وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَدَتَنَا وَكُبَرَاَءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ-رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مَنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا-

যেদিন তাদের চেহারা আগুনে ওলট-পালট করা হবে তখন তারা বলবে, হায় ! যদি আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করতাম। তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব্ব ! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। হে আমাদের রব্ব ! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর আভিশাপ বর্ষণ করো। (সূরা আহ্যাব-৬৬-৬৭)

মানুষের বানানো আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যারা পৃথিবীতে আন্দোলন করেছে, চেষ্টা-সাধনা করেছে, সেসব নেতাদের যারা অনুসরণ করেছে, সেসব কর্মীদেরকে যখন জাহান্নামের আগুনের ভেতরে জ্বালানো হবে, তখন তারা বলবে, পৃথিবীর ঐ সব নেতা এবং সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকগুলো আমাদেরকে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ভুল ধারণা দান করেছে, তাদের কারণেই আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। হে আল্লাহ ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও। আল্লাহ বলবেন, তোমাদের উভয়ের (অনুসারীগণ ও

খোদাদ্রোহী নেতাগণ) জন্যেই দ্বিগুণ আযাব। কিন্তু এ সম্পর্কে তোমরা কোন জ্ঞান রাখো না। তাদের প্রথমদল (অনুসারী দল) শেষের দলটিকে বলবে (নেতাদের দল) তোমরা আমাদের চেয়ে মোটেই উত্তম নও। অতএব তোমাদের অর্জিত কর্মের শাস্তি ভোগ কর।

পৃথিবীতে সাধারণত দেখা যায় যাদের অর্থ নেই, বিত্ত নেই, দুর্বল, যারা শোষিত তারাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ক্ষমতাবান মানুষদের অত্যাচারী খোদাদ্রোহী শাসকদের আইন-কানুন, নির্দেশ মেনে চলে। মানতে বাধ্য হয়। কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দানে এদের পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে–

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰؤُا لِلَّذِيْنَ سْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ -قَالُوْا لَوْهَدَانَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ-سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ-

যখন উভয়দলকে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে, তখন দুর্বল মানুষগুলো ক্ষমতা গর্বিত উন্নত শ্রেণীর (ক্ষমতাবানদের) লোকদের বলবে, আমরা তোমাদেরই কথা মেনে চলেছিলাম। আজ তোমরা কি আল্লাহর আযাবের কিছু অংশ আমাদের জন্যে লাঘব করে দিতে পারো? তারা বলবে, তেমন কোন পথ আল্লাহ আমাদের দেখালে তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। এখন এ শাস্তি আমাদের জন্যে অসহ্য হোক অথবা ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করি উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। এখন আমাদের পরিত্রানের কোন উপায় নেই। (সূরা ইবরাহীম-২১)

অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে কর্মিদের দল আযাবের ভয়াবহতা দেখে তাদের নেতাদের বলবে, পৃথিবীতে আমরা ইসলামের বিধান মানিনি, তোমাদের নির্দেশ মেনে চলেছি। আজ জাহান্নামের এই যে ভয়ংকর আযাব আমরা ভোগ করছি, ও নেতারা, আজ কি পারো আল্লাহর আযাব কিছুটা কমিয়ে দিতে। পৃথিবীতে তো তোমরা অনেক বড় বড় কথা বলেছো, অনেক ক্ষমতা দেখিয়েছো। আজ সেই ক্ষমতা একটু দেখাও না! খোদাদ্রোহী নেতারা বলবে, আযাব থেকে বাঁচার কোন পথ আমাদেরই জানা নেই, তোমাদের জানাবো কিভাবে? এখন আমরা সবাই যে শাস্তি ভোগ করছি, তা যতই অসহ্য হোক না কেন, অথবা ধৈর্যের সাথেই আযাব ভোগ করি না কেন। একই ব্যাপারে আজ আমরা ধরা পড়েছি। এই আযাব থেকে বাঁচার কোন পথ আর খোলা নেই। পবিত্র কোরআন শরীফ বলছে–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ-وَلَوْتَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ-يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ

اِلٰى بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ الْقَوْلَ-يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلاَ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ-قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ-وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْتَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا-وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ-وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِىْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

এসব অবিশ্বাসীগণ বলে, কিছুতেই কোরআন মানবো না। এর আগের কোন কিতাবকেও মানবো না। তোমরা যদি তাদের অবস্থা (হাশরের দিন) দেখতে যখন ও জালেমরা তাদের প্রভুর সামনে দন্ডায়মান হবে এবং একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে থাকবে। সেদিন অসহায় দূর্বলগণ (পৃথিবীতে যারা ছিল অর্থবিত্তহীন) গর্বিত সমাজ পতিদের (পৃথিবীতে যারা ছিল ক্ষমতাবান) বলবে, তোমরা না থাকলে তো আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনতাম। (অর্থাৎ তোমরাই আমাদেরকে ইসলামী আইন মানতে দাওনি।) গর্বিত সমাজপতিরা দূর্বলদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট হেদায়েতের বানী পৌছার পর আমরা কি তোমাদেরকে সৎপথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম? তোমরা নিজেরাই তো অপরাধ করেছো। দুর্বলেরা বড় লোকদের বলবে-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বরং তোমাদের দিবারাত্রির চক্রান্তই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে রেখেছিল, আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তার আইন মানার ব্যাপারে, তার সাথে শরীক করতে তোমরাই তো আমাদের নির্দেশ দান করতে। তারা যখন তাদের জন্যে নির্ধারিত শাস্তি দেখতে পাবে তখন তাদের লজ্জা ও অনুশোচনা গোপন করার চেষ্টা করবে। আমরা এসব অপরাধীদের গলায় শৃংখল পরিয়ে দেব। যেমন তাদের কর্ম, তেমনি তারা পরিণাম ফল ভোগ করবে। (সূরা সাবা-৩১-৩৩)

ইসলামের বিধান অমান্যকারীরা ওই সমস্ত মানুষদের সাথে শত্রুতা করে যারা পৃথিবীতে আল্লাহর আইন মেনে চলে। ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, মারধোর করে, নানাভাবে কষ্ট দেয়। হাশরের পরে ইসলামের দুশমনরা যখন জাহান্নামের যাবে –তখন তারা জাহান্নামের মধ্যে ওই মানুষগুলোকে খুঁজবে-পৃথিবীতে যারা ইসলামের আইন মেনে চলেছে। কোরআন শরীফ বলছে–

وَقَالُوْا مَالَنَا لاَنَرٰى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ-

এবং তারা (অবিশ্বাসীরা জাহান্নামের মধ্যে থেকে) বলবে, কি ব্যাপার তাদেরকে তো দেখছি না, যাদেরকে আমরা দুষ্ট মানুষদের মধ্যে গণ্য করতাম। (অর্থাৎ পৃথিবীতে যাদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ, শত্রুতা করেছি, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিয়েছি) (সূরা সোয়াদ-৬২)

পৃথিবীতে মানুষ কখনো মুক্ত স্বাধীন হতে পারে না-হবার উপায়ও নেই। মানুষ কারো না কারো আইন মেনে চলেই। কেউ নিজের মনের আইন মানে, কেউ সমাজের সমাজপতিদের আইন মানে, নেতা-নেত্রীদের নির্দেশ মেনে চলে অর্থাৎ মানুষ একটা নিয়ম মেনে চলে। সে নিয়ম তার নিজের মনের বানানো অথবা অন্য মানুষের বানানো। হাশরের ময়দানে নেতা অর্থাৎ সমাজে বা দেশে, নিজ এলাকায় ছিল প্রভাবশালী, তারা এবং ওই সমস্ত মানুষ, যারা প্রভাবশালীদের নির্দেশ মেনে চলতো মুখোমুখি হবে। চোখের সামনে ভয়ংকর আযাব দেখে ওই প্রভাবশালী লোকদেরকে অর্থাৎ নেতাদেরকে সাধারণ মানুষ ঘিরে ধরবে। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলবে-এই তোমরা, তোমাদের কারনেই আজ আমরা জাহান্নামের যাচ্ছি। তোমাদেরকে আমরা নেতা বানিয়ে ছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেরাও ইসলামী আইন মানোনি আমাদেরকেও মানতে আদেশ করোনি।

প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় মানুষগুলো তখন বলবে-দেখো, আমরা তোমাদেরকে জোর করে আমাদের আদেশ মানতে বাধ্য করিনি। কেন তোমরা পৃথিবীতে আমাদের পেছনে ছুটতে? আমাদের কি ক্ষমতা ছিল? আসলে তোমরা ইচ্ছা করেই ইসলামের আইন অমান্য করেছো। আমরাও ভুল পথে ছিলাম তোমরাও ভুল পথে ছিলে। এখন আমাদের সবাইকে জাহান্নাম যেতে হবে। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে যারা ইসলামের পথে চলতো, ইসলামের দিকে ডাকতো তারাই সত্য পথের পথিক ছিল।

সেদিন শয়তান নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করবে

কিয়ামতের ময়দানে শাস্তির ভয়াবহতা অবলোকন করে সমস্ত অপরাধীগণ সম্মিলিতভাবে ইবলিস শয়তানকে চেপে ধরে বলবে-আজ তোকে পেয়েছি। তুই আমাদেরকে পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট করেছিলি। আমাদের কাছে তুই ওয়াদা করেছিলি, আমরা যদি তোর কথা মতো চলি তাহলে সুখ শান্তি পাবো। কিন্তু কোথায় আজ সেই সুখ শান্তি? তখন শয়তান বলবে–দেখো, আজ আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ো না। আজ আমার কোন দায় দায়িত্ব নেই। আমি তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলাম সে ওয়াদা ছিল মিথ্যে, আমার দেখানো পথে চলতে আমি তোমাদেরকে বাধ্য করিনি, আমি তোমাদের ঘাড় ধরে আমার দলে ডাকিনি। দোষ আমার এতটুকুই যে, আমি তোমাদের ডাক দিয়েছি আর অমনি তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। সূরা ইবরাহীমের ২২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন–

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ-وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ

دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ-فَلاَ تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ-مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ-اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ-اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

আর যখন চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হবে, তখন শয়তান বলবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ যেসব ওয়াদা করেছিলেন, তা সবই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদাই করেছিলাম, তার মধ্যে একটিও পূরণ করিনি। তোমাদের ওপর আমার তো কোন জোর ছিল না। আমি এ ছাড়া আর কিছুই করিনি, শুধু এটাই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহ্বান করেছি। আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছো। এখন আমাকে দোষ দিও না, তিরস্কার করো না, নিজেরাই নিজেদেরকে তিরস্কার করো। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে রব্ব-এর ব্যাপারে অংশীদার বানিয়ে ছিলে, আমি তার দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ ধরনের জালিমদের জন্য তো কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নিশ্চিত।

অর্থাৎ শয়তান ও তার অনুসারীরা পরস্পর দোষারোপ করতে থাকবে, তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন, আমার আইন মেনে চললে জান্নাত পাবে, না মানলে জাহান্নামে যাবে তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর আমি তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলাম, তা ভঙ্গ করেছি। এখন আমার উপর তোমাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই। আমি তো শুধু পৃথিবীতে তোমাদেরকে ডাক দিয়েছি, আর অমনি তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো। সুতরাং আজ আমার উপর দোষ চাপিও না বরং নিজেদেরকে দোষ দাও। কারণ আমি তোমাদের ঘাড় ধরে কিছু করাইনি আর তোমারাও আমাকে জোর করে কিছু করাওনি। তোমরা আমার পথ ধরে যে কুফরি করেছো, সে সবের দায় দায়িত্ব আমার নয়, আমি সব অস্বীকার করছি।

চুলচেরা হিসাবের দিন হাশরের ময়দান। কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দানে যখন মানুষের সমস্ত কাজের বিচার অনুষ্ঠিত হবে-সেদিনটিকে মহান আল্লাহ কোরআন শরীফে মানুষের জয় পরাজয়ের দিন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সফলতা ও ব্যর্থতার দিন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا-قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ-وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ-فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا-وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ-يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ-وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ

وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا-ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا-وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

অবিশ্বাসীগণ বড় অহংকার করে বলে বেড়ায়, মৃত্যুর পরে আর কিছুতেই তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে না। (হে নবী) তাদেরকে বলে দিন, আমার প্রভুর শপথ-নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পরকালে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। তারপর তোমরা পৃথিবীতে যা যা করেছো, তা জানানো হবে। আর এসব কিছুই আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই 'নূরের' প্রতি যা আমি অবতীর্ণ করেছি। তোমরা যা কিছু করো, তার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ অবগত। এসব কিছুই তোমরা জানতে পারবে সেই দিন, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সেই মহাসম্মেলনের (হাশরের দিনে মানুষের জমায়েত) জন্যে একত্র করবেন। সেদিনটা হবে পরস্পরের জন্যে জয়-পরাজয়ের দিন। যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, আল্লাহর তাদের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার দান করবেন। যে জান্নাতের নিম্নভাগে দিয়ে প্রবাহিত হবে স্রোতস্বিনী। তারা সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে। আর এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য। অপরদিকে যারা আল্লাহ ও পরকালের অস্বীকার করবে এবং মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে আমার বানী ও নিদর্শন, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সে স্থান হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা তাগাবুন-৭-১০)

এই আয়াতে 'নূর' বলতে কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। কোরআন শরীফের অনেকগুলো নাম আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। নূর আরবী শব্দ। যার অর্থ হলো স্পষ্ট উজ্জ্বল আলো। সুতরাং কোরআন শরীফ এমনি উজ্জ্বল আলোর ন্যায়-যা অবতীর্ণ হয়েছে পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায় অবিচারের অন্ধকারকে দূর করে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করতে। মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সৃষ্টি করে তাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছেন। সে ইচ্ছে করলে তার স্রষ্টা আল্লাহ, তার নবী-রাসূল, তার জীবন বিধান কোরআন অস্বীকার করে পৃথিবীতে যেমনভাবে মন চায় তেমনভাবে চলতে পারে। অবশ্য এভাবে চললে মানুষের পরিণাম যে কি হবে, তা-ও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। আবার মানুষ ইচ্ছে করলে আল্লাহ, রাসুল, কোরআন ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে পৃথিবীতে অত্যন্ত সৎভাবে জীবন-যাপন করতে পারে। এভাবে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করলে তার ফলাফল যে কি, তা-ও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যেমন স্বাধীনতা দান করেছেন, সৎ এবং অসৎ পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সৎপথে চললে পুরস্কার এবং অসৎপথে চললে শাস্তি-এ ঘোষনাও দিয়েছেন, তেমনিভাবে এ পরীক্ষাও তিনি মানুষের কাছ থেকে নেবেন পৃথিবীর জীবনে কোন মানুষ জয়ী বা সফল হলো আর কোন মানুষ পরাজিত বা ব্যর্থ হলো।

হাশরের ময়দানে সবেচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি

পৃথিবীতে একজন মানুষ তার নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধি ও কর্মশক্তি নিয়ে জীবন পথে চলা শুরু করে। পৃথিবীতে একটু স্বচ্ছলতা, একটু শান্তি, সুন্দরভাবে বসবাসের জন্যে তার চেষ্টা সাধনার অন্ত থাকে না। প্রতিটি মানুষই জীবনের পথে সফলতা অর্জন করতে চায়। মানুষের প্রতিদিনের এই যে চেষ্টা সাধনা, এত শ্রমদান এর পরিণামেই হয় জয়-পরাজয়ের নির্ধারণ–অর্থাৎ এত কিছু করে কে সফল হলো আর কে হলো ব্যর্থ। পৃথিবীতে সফলতা ও ব্যর্থতার সংজ্ঞা সমস্ত মানুষের কাছে এক রকম নয়। এর কারণ হলো সমস্ত মানুষের আদর্শ এক রকম না। মানুষ বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী, সেহেতু তাদের কাছে সফলতা ও ব্যর্থতার ধরণও আলাদা। কোন মানুষ হয়তঃ চরম অন্যায় পথ অবলম্বন করে অসৎভাবে তার উদ্দেশ্য হাছিল করলো, অনেকে তার সম্পর্কে মন্তব্য করলো মানুষটি তার সাধনায় সফল হয়েছে।

এই সফলতা অর্জন করতে গিয়ে যদি অন্যায় অবিচার, চরম দুর্নীতি, অসত্য, হীন ও জঘণ্য পন্থা অনুসরণ করতে হয়, তবুও তাকে মনে করা হয় সাফল্য। জোর করে শক্তি দিয়ে অন্যায়ভাবে অপরের ধন-সম্পদ হস্তগত করে, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমানাদীর দ্বারা কাউকে সর্বশান্ত করে কেউ হচ্ছে বিজয়ী, কোটি কোটি টাকার মালিক, হরেক রকমের গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়ে স্ত্রী-সান্তনাদিসহ পরম সুখে বিলাস বহুল জীবন-যাপন করে, অনেকের দৃষ্টিতে এটা সফলতা। মানুষ বলে লোকটা সফল।

অসৎ পথ ধরে অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হয়ে কেউ বা সমাজে তার আধিপত্য বিস্তার কতে সক্ষম হয়। সে চায় সবাই তার কাছে নত হয়ে থাক। তার বিরুদ্ধে সামান্য টু-শব্দও সে সহ্য করতে পারে না, স্বার্থবাদী চাটুকারের দল দিনরাত তার জয় গান গেয়ে বেড়ায়। তার দাপটে কেউ সত্য কথা বলতে পারে না। যারা সত্য পথে চলে সত্য কথা বলে তারা ওই ব্যক্তি কর্তৃক নির্যাতিত হয়। ক্ষমতার দাপটে দিশেহারা হয়ে সে সবার উপরে খোদায়ী করতে চায়। অনেকের মতে এটাও সফলতা।

অপরদিকে কোন ব্যক্তি সত্যকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সৎভাবে জীবন-যাপন করে। দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ, কালোবজারী, মিথ্যা প্রতারণা, প্রবঞ্চনা সে করে না, ফলে সমাজে সে ক্ষমতাবান অর্থশালীও হতে পারে না। অন্যয়ের বিরুদ্ধে সে কথা বলে, সমাজ থেকে দেশ থেকে সে সবধরনের অন্যায় উৎখাত করে সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ফলে সমাজ বা দেশের ক্ষমতাবান অসৎ মানুষগুলো তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠে। পরিণামে সে অত্যাচারিত হয়। তার সকল আত্মীয়-স্বজন তাকে ত্যাগ করে। সমাজ তাকে অবহেলা করে। অনেকে ওই সৎমানুষটি সম্পর্কে মন্তব্য করে, মানুষটা দারুণ বোকা, তা না হলে এভাবে সত্য কথা বলতে গিয় এমন অত্যাচার সহ্য করে নাকি? অযথা নিজের জীবনটা ব্যর্থ করে দিল! এই ধরণের সফলতা ও ব্যর্থতা বর্তমান পৃথিবীতে চারদিকেই দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু সত্যিকারের সফলতা ও ব্যর্থতা, জয়-পরাজয় নির্ধারণ হবে কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দানে আল্লাহর আদালতে। বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা

আনহু কর্তৃক বর্ণনাকৃত একটি হাদীসে পাওয়া যায়। যারা বেহেশতে যাবে তাদের সবাইকে জাহান্নামের একটি অংশ দেখিয়ে জানানো হবে-ওই অংশটা তোমার ভাগে পড়তো, যদি তুমি পাপী হতে। ফলে বেহেশ্তবাসীগন আল্লাহর প্রতি আরো বেশী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। আবার জাহান্নামবাসীদের জান্নাতের একটি অংশ দেখিয়ে জানানো হবে-জান্নাতের ওই অংশটা তোমার নছিবে জুটতো, যদি তুমি পৃথিবীতে ইসলামী বিধান মেনে চলতে। ফলে জাহান্নামবাসীদের অনুতাপ-অনুশোচনা আরো বেশী বৃদ্ধি পাবে।

পৃথিবীতে যারা ক্ষমতাবান জালিম ব্যক্তির দ্বারা যতটুকু অত্যাচারীত হবে, কিয়ামতের ময়দানে ওই জালিমের যদি নেক কাজ থেকে থাকে, তা দিয়ে দেয়া হবে তাদেরকে, যাদের সাথে সে অন্যায় করেছে। যদি নেক কাজ না থাকে তাহলে যে ব্যক্তির সাথে সে অন্যায় করেছে। যদি নেক কাজ না থাকে তাহলে যে ব্যক্তির সাথে সে অন্যায় করেছে, ওই ব্যক্তির গোনাহ্ থাকলে তা চাপানো হবে জালিমের ঘাড়ে। যে পরিমাণ জুলুম করবে, সেই পরিমান নেক কাজ দিয়ে দিতে হবে বা গোনাহ্ নিজের কাঁধে নিতে হবে। কারণ সেদিন তো মানুষের কাছে কোন ধন-সম্পদ থাকবে না। সুতরাং তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সে যার যার সাথে জুলুম করেছে, তাকে তাকে নেক দিয়ে দেয়ার মাধ্যমে।

এভাবে নেক কাজ দিতে দিতে যখন আর দেয়ার মতো নেক কাজ থাকবে না, তখন ওই সমস্ত মানুষের গোনাহ তাকে নিতে হবে যাদের উপরে সে জুলুম করেছে। অবশ্য যার সাথে যে পরিমান অন্যায় করা হবে, ঠিক সেই পরিমানই সে প্রতিপক্ষের নেকি লাভ করবে। অথবা জালিমের আমল নামায় কোন নেকি না থাকলে মজলুমের ততো পরিমাণ গোনাহ্ জালিমের ঘাড়ে চাপানো হবে। বোখারী শরীফে অন্য একটি হাদীসে আছে হযরত আবু হোরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, কোন মানুষ যদি অন্য মানুষের সাথে অন্যায় করে থাকে তাহলে তার উচিত এই পৃথিবীতেই তা মিটিয়ে ফেলা। কারণ আখেরাতে কারো কাছে কোন দেয়ার মতো সম্পদ থাকবে না। নেকী ও গোনাহ ছাড়া। অতএব সেদিন তার নেকীর কিছু অংশ সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে হবে। অথবা তার কাছে যথেষ্ট নেকী না থাকলে মজলুমের ততো পরিমান গোনাহের অংশ তাকে দেয়া হবে।

মুসনাদে আহমদে জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন উনায়েস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন জান্নাতী জান্নাতে এবং কোন জাহান্নামী জাহান্নমে প্রবেশ করতে পারবে না-যতক্ষণ সে যার যার সাথে অন্যায় করেছে তাদের দাবী না মিটানো পর্যন্ত। এমনকি সে যদি কাউকে অন্যায়ভাবে একটি চড় দিয়ে থাকে, তার বিনিময় তাকে অবশ্যই মিটিয়ে দিতে হবে। সাহাবাগণ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাইলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেদিন তো আমরা কপর্দকহীন থাকবো, বিনিময় দেবো কি দিয়ে?' আল্লাহর রাসুল বললেন, 'নেকী-গোনাহের দ্বারা বিনিময় দিতে হবে।' মুসলিম শরীফে এবং মুসনাদে আহমদে হযরত আবু হোরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, একদিন আল্লাহর রাসুল সমবেত সাহাবাদেরকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কি জানো, সব চেয়ে নিঃস্ব কোন ব্যক্তি? সাহাবাগণ বললেন, 'যে কপর্দকহীন এবং যার কোন সম্পদ নেই, সেই তো সবচেয়ে নিঃস্ব।'

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে ওই ব্যক্তি সব চেয়ে নিঃস্ব যে ব্যক্তি নামজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য নেকির পাহাড় সাথে নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে হাজির হবে। সে ব্যক্তি তার চারদিকে শুধু নেকীই দেখতে পাবে। ব্যক্তিটির চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল থাকবে। তারপর একের পর এক লোক এসে দাবী জানাবে, সে অন্যায়ভাবে আমাকে মেরেছিল, কেউ দাবী করবে সে আমার সম্পদ কেড়ে নিয়েছিল, কেউ দাবী করবে ওই ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করে আমাকে হত্যা করিয়েছিল, কেউ বলবে সে আমাকে গালি দিয়েছিল, কেউ দাবী করবে সে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অপবাদ দিত, কেউ দাবী করবে আমার পাওনা টাকা সে দেয়নি।

তখন সমস্ত পাওনাদারের দাবী মিটানো হবে ওই ব্যক্তির নেকী দ্বারা। লোকটির নেকী শেষ হয়ে যাবে কিন্তু পাওনাদার শেষ হবে না। তখন অবশিষ্ট পাওনাদারের গোনাহ তার উপরে চাপানো হবে। নেকীর পাহাড় সাথে নিয়ে কিয়ামতে উঠেও গোনাহের পাহাড় কাঁধে নিয়ে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। এই ব্যক্তিই সবেচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি।

সেদিন আল্লাহই মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন

মাহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনএ গোটা বিশ্বজগতের স্রষ্টা। এই বিশ্বে বা এর বাইরেও যা কিছু রয়েছে, সেসব কিছুরই একমাত্র মালিক তিনি। আখিরাতের ময়দানেরও মহান মালিক তিনিই। পরকালে কার ব্যাপারে তিনি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন-সে ক্ষমতা শুধু তারই। আল্লাহ বলেন–

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ-يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ-

সেদিন (কিয়ামতের দিন) একচ্ছত্র ক্ষমতা শুধু মহান আল্লাহর। তিনিই মানুষের ভবিষ্যত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। (সূরা হজ্ব-৫৬)

অর্থাৎ হাশরের ময়দানে শতশত কোটি মানুষের বিচার কার্য পরিচালনার জন্যে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্যে, কারো কোন সাহায্য বা কারো কোন পরামর্শের প্রয়োজন আল্লাহর নেই। তিনি নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সর্বজ্ঞ। প্রতিটি মানুষের প্রকাশ্য ও গোপন কর্মকান্ড সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন তদুপরি ন্যায় ও ইনছাফ প্রদর্শনের জন্য মানুষের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন কর্ম পুংখানুপুংখরূপে তাঁর নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে আমলনামায় রেকর্ড বানিয়ে রেখেছেন।

এ আমলনামা ফেরেশ্তাগণ লেখেন। তাদের কোন ভুল হয় না। ভুল-ভ্রান্তি ও পাপ করার প্রবণতা তাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাই বলে মহান আল্লাহ ফেরেশতা কর্তৃক লিখিত আমলনামার উপরে নির্ভরশীল নন।

কারণ ফেরেশতাগণ অদৃশ্যে কি ঘটছে, মানুষ কি চিন্তা করে, ইশারা ইঙ্গিতে পরস্পরে কি বলে, এসব তারা জানতে পারেন না। মানুষ ভবিষ্যতে কি করবে, সে সম্পর্কে ফেরেশতাদের জ্ঞান নেই। কিন্তু আল্লাহর নিকট বর্তমান, ভবিষ্যত ও অতীত বলে কিছু নেই। মানুষ ভবিষ্যতে কি করবে তার বর্তমানরূপ তার সামনে উপস্থিত থাকে।

সুতরাং, ফেরেশ্‌তাদের লিখিত আমলনামা ছাড়াই তিনি তার সঠিক জ্ঞান দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম। কিন্তু ন্যায় ও ইনছাফের দৃষ্টিতে এবং মানুষের বিশ্বাসের জন্যে আমলনামা লেখার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। অন্য আল্লাহর উপর প্রভাব বিস্তার করবে, সুপারিশ করে আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাতে পারবে এ ধরনের বিশ্বাস যারা মনে স্থান দেবে তারা আর যা-ই হোক অবশ্যই মুসলমান নয়। সুতরাং বিচারের দিনে কোন পীর, ওলী, মাওলানার পরামর্শ বা সুপারিশ গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন আল্লাহর নেই। মহান আল্লাহ বলেন–

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَّ لاَشَفَاعَةٌ–

সেদিন (হাশরের দিন) আসার পূর্বে-যেদিন না লেন-দেন হবে, না বন্ধুত্ব উপকারে আসবে, আর না চলবে কোন সুপারিশ। (সূরা বাক্বারাহ্‌-২৫৪)

সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ–

কে এমন আছে যে তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ব্যতিত তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে?

কিন্তু পৃথিবীতে কিছু সংখ্যক মানুষের ধারণা এবং বিশ্বাস যে, এমন কিছু পীর, মাওলানা, ওলী আছেন যাঁরা হাশরের ময়াদানে তাদের জন্যে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের সুপারিশ অনুযায়ী তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে পাঠাবেন। যারা বিশ্বাস করে অমুক 'বাবা' অমুক 'পীর' অমুক 'ওলী' কিয়ামতের ময়দানে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে, তারা আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করার চেয়ে তথাকথিত 'সুপারিশ কারীদের' কাছে বেশী ধর্না দেয়। কারণ তারা মনে করে ওই ব্যক্তি আল্লাহর খুব কাছের, আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি, আল্লাহর উপর ওই ব্যক্তির সাংঘাতিক প্রভাব। এই ধরণের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে এক শ্রেণীর মানুষ নিজের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে পৃথিবীর ভোগ-বিলাস থেকে দূরে সরে আল্লাহর আইন মেনে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে–ওই সমস্ত মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে, যাদেরকে তারা সুপারিশকারী হিসেবে বিশ্বাস করে। তাদের সন্তুষ্টির জন্যে নযর নিয়ায দান করা, তাদের নামে গরু, খাসী, মুরগী, নগদ টাকা মানত করা, তাদের কবরে ফুল, মিষ্টি, গোলাপ পানি, মোমবাতি, আগরবাতি, কবরে শায়িত ব্যক্তির নামে ওরশ করা-নিজেরা এগুলো অতি উৎসাহের সাথে করে এবং অপরকেও করতে উৎসাহ দান করে। তাদের বিশ্বাস এসব করলে তিনি হাশরের মাঠে তার জন্য সুপারিশ করবেন।

আল্লাহর দেয়া বিধান ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবেই এক শ্রেণীর মানুষ ওই ধরণের ভুল করে থাকে। কিছু মানুষের ধারণা মৃত্যুর পরে যদি সত্যই কোন জীবন থেকেই থাকে, তাহলে সে জীবনে সহজে মুক্তি পাবার উপায় কি? এ প্রশ্ন যখন তাদের মনে জাগে তখন শয়তান এসে কুমন্ত্রণা দেয়, 'অমুক মাজারে গিয়ে সেজদা দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করো। তিনি পরকালে তোমার জন্যে সুপারিশ বা শাফায়াত করবেন।'

শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুযায়ী তারা দল বেঁধে আল্লাহর ওলীদের মাজারে গিয়ে এমন ভক্তি শ্রদ্ধা ও আবেদন নিবেদন জানায়, যে আবেদন নিবেদন জানানো উচিত ছিল মহান আল্লাহর দরবারে। ওই হতভাগা মানুষগুলো একথা বুঝতে চায় না. তাদের আবেদন-নিবেদন কবরের ওই মানুষটি শুনতে পারছে না। শুধু তাই নয় কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যখন তার ওলীদের জানিয়ে দেবেন, 'তোমাদের মাযারকে কেন্দ্র করে ওই মানুষগুলো এই এই কাজ করেছে।' তখন ওলীগণ ওই হতভাগাদের আচরণের কারণে চরম অসন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা জীবিত অথবা মৃত মানুষকে নিজের প্রভু বানিয়ে নেয় অথবা তাদেরকে আল্লাহর শরীক বানায় তাদের জন্যে অভিশাপ ছাড়া কোন বুজুর্গ-ওলীর পক্ষ থেকে দোয়া বা সুপারিশের আশা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বর্তমান পৃথিবীতে কিছু মানুষ তাদের দরবারে যাতায়াত করে তাদের মধ্যে ওই শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাই বেশী–সমাজে যারা অসৎ হিসেবে চিহ্নিত। এই অসৎ দুষ্কৃতিকারী মানুষগুলো প্রকৃত ইসলামের অনুসারী না হয়ে ছুটে যায় এক শ্রেণীর পীরদের দরবারে বা মাজারে। তাদের বিশ্বাস পরকালে তার পীর সাহেব আল্লাহর দরবারে তাদের জন্যে সুপারিশ করে তাদের নাজাতের ব্যবস্থা করে দেবেন। এ আশায় তারা তাদের পীর সাহেবকে নানা ধরণের মূল্যবান উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। একথা অবশ্যই সত্য যে, কিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে যে সমস্ত ব্যক্তিগণকে শাফায়াত বা সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন-তারা অবশ্যই ও সমস্ত মানুষ, পৃথিবীতে জীবিত থাকতে যারা নবী এবং তার সাহাবাগণের ন্যায় জীবন-যাপন করেছেন–এরা আল্লাহর ওয়াদা অনুসারে জান্নাতি হবেন। পক্ষান্তরে কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তির নিজেরই মুক্তির কোন আশা নেই, সেই ব্যক্তি আরেকজনের জন্যে সুপরিশ করার সৌভাগ্য লাভ করবে কি করে? সত্যিকারের যারা পীর, যারা ওলী তাদের জীবন-যাপনের ধরণ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবাগণের ন্যায়। তারা সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকেন। সত্যিকারের পীর-ওলী জেল-জুলুম পরোয়া করেন না। কোন দৃষ্কৃতিকারী, সূদখোর, ঘুষখোর, কালোবাজারি, জ্বেনাকার মদ্যপ পীর-ওলীদের বন্ধু হতে পারে না। কিয়ামতের দিন দুষ্কৃতিকারী অসৎ লোকদের কোন বন্ধুও থাকবে না, কোন সুপারিশকারীও থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ–

অন্যায় আচরণকারীদের জন্যে (হাশরের দিন) কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও থাকবে না এবং থাকবেনা কোন সুপারিশকারী যার কথা শুনা যাবে। (সূরা মুমিন-১৮)

বর্তমানে কিছু সংখ্যক নামধারী তথাকথিত পীর-ওলীদের দরবারে ওই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীদের দেখা যায়-যারা প্রচুর কালোটাকার মালিক। এই তথাকথিত পীরগণ ওই দুষ্কৃতিকারীগণের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা না করে তাদের কাছ থেকে শুধু নয়রানাই গ্রহণ করে। এদের নিজেদের নাজাত তো মিলবেইনা বরং দুষ্কৃতিকারীদের প্রশ্রয় দেয়ার কারণে পরকালে

শাস্তিরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এই ধরণের ভন্ড অর্থলোভী পীর, মাওলানাদের সম্পর্কে সূরা বাকারার ১৬৬-১৬৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ-وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا-كَذَالِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ-وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ-

(কিয়ামতের দিন) ওই সব ব্যক্তি পৃথিবীতে যাদেরকে অনুসরণ করা হতো, (তারা) তাদের অনুসারীদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা করবে কিন্তু তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে এবং তাদের মধ্যকার সব ধরণের সম্পর্ক ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যারা এসব ব্যক্তিদের অনুসরণ করেছিল তারা বলবে হায়রে, যদি পৃথিবীতে আমাদেরকে একটিবার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আজ যেভাবে এরা আমাদের প্রতি তাদের অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করছে, আমরাও তাদের প্রতি আমাদের বিরক্তি দেখিয়ে দিতাম। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে তাদের কৃত কর্মকান্ড এভাবে উপস্থিত করবেন যে, তারা দুঃখ ও অনুশোচনায় কাতর হয়ে পড়বে। কিন্তু জাহান্নামের আগুন থেকে তারা বের হবার পথ পাবে না।

পূর্ববর্তী উম্মতের ধর্মীয় নেতাগণ অর্থ উপার্জনের লোভে মানুষকে ধর্মের নামে আল্লাহ-রাসূলের পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে যেত। তারা নিজেদের মুরীদদেরকে সত্যিকারের মুক্তির পথ না দেখিয়ে মুরীদদের কাছ থেকে নযর-নেয়াজ গ্রহণ করে নিজেদের মনগড়া পথে পরিচালিত করতো। সূরা তওবায় এ ধরনের পীর, দরবেশ আলেমদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

(আহলে কিতাবদের) অধিকাংশ আলেম, পীর, দরবেশ-অবৈধ উপায়ে মানুষের অর্থ-সম্পদ ভক্ষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে রাখে। (সূরা তওবা-৩৪)

এসব অর্থলোভী পথভ্রষ্ট পীর, আলেম নামধারী যালেমগণ তাদের ধর্মীয় সিংহাসনে বসে ফতোয়া বিক্রি করে। তারা সত্যিকারের দ্বিনদার, পহেজগার আলেম, ওলামা, পীর, মাশায়েখদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়। এদেরই কারণে সত্যিকারের পীরগণ সমাজে মর্যাদা পায় না। কিয়ামতের ময়দানে সুপারিশ বা শাফায়াত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করে কোরআন ও হাদীস প্রকৃত ঘটনা মানুষের সামনে পেশ করেছে। সেদিন সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী হবেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট মহামানব, মানুষের মুক্তির দিশারী, নবী সম্রাট, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পক্ষান্তরে সাধারণ

মানুষের মধ্য থেকেও কিছু নেক মানুষ অন্যের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবে। এই সুপারিশ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। যারা সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবে–তারা হলো ওই সমস্ত ব্যক্তি, যারা পৃথিবীতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে চরম কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা, সহ্য করেও ইসলামের আদেশ-নিষেধ পালনে সদাসর্বদা তৎপর ছিলেন। তারা আল্লাহর নিকট কোন অন্যায় আবদার করবেন না। কোন দুষ্কৃতিকারীর জন্যে তারা সুপরিশ করবেন না। সুপারিশ তাদের জন্যেই করবেন–পৃথিবীতে যারা ইসলামের আদেশ-নিষেধ পালন করে চলেছে বটে কিন্তু সামান্য ভুল ভ্রান্তিও করেছেন। তবুও শাফায়াতের পুরো ব্যাপারটা মহান আল্লাহর মর্জি মোতাবেক হবে। আল্লাহ বলেন–

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا–

(হে রাসূল) বলে দিন, শাফায়াতের সমগ্র ব্যাপারটি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। (সূরা যুমার-৪৪)

মহান আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো জন্য শাফায়াত করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন–

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ–

তাঁর অনুমতি ব্যতিত কে তাঁর নিকট শাফায়াত করবে? (সূরা বাক্বারাহ-২৫৫)

যে ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ অন্য কাউকে শাফায়াত করার অনুমতি প্রদান করবেন, সে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছে মতো শাফায়াত করা দূরে থাক–আল্লাহর সামনে মুখ খুলতেই পারবে না। সূরা আম্বিয়ার ২৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلاَ يَشْفَعُوْنَ–اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى–

যাদের উপর আল্লাহ খুশী হয়েছেন তারা ব্যতিত আর কারো জন্যে শাফায়াত করা যাবে না।

সুপারিশকারী যা সুপারিশ করবে তা হবে সকল বিচারে সত্য ও ন্যায় সঙ্গত। কোরআন বলছে–

لاَيَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا–

করুণাময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাদেরকে অনুমতি দিবেন তারা ব্যতিত আর কেউ কোন কথা বলতে পারবেনা এবং তারা যা কিছু বলবে তা ঠিক ঠিক বলবে। (সূরা নাবা-৩৮)

যারা সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবে তারা নির্দিষ্ট শর্ত অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে একটা সীমারেখার ভেতরে সুপারিশ করবে। আর এই সুপারিশের ধরণ সাধারণ কোন সুপারিশের মতো হবে না। আল্লাহর নিকট সুপারিশের ধরনও হবে ইবাদত ও বন্দেগীর ন্যায়। মানুষ আল্লাহর কাছে যে পদ্ধতিতে নিজের পাপের ক্ষমা চায় অর্থাৎ কান্নাকাটি, অনুনয়-বিনয় এবং অত্যন্ত দীনহীন ভঙ্গিতে-তেমনি ভঙ্গিতে শাফায়াতকারী শাফায়াত করবে। তবে শাফায়াতের এই ধরণ আল্লাহর রাসূলের জন্য প্রজোয্য নয়। কারণ তার মর্যাদা আল্লাহর নিকট সবেচেয়ে বেশী। তিনি কি ভঙ্গীতে আল্লাহর দরবারে উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন সেটা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় বন্ধু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যেকার ব্যাপার। যিনি

সুপারিশ করবেন তার মনে কখনো এ ধারণা জন্মাবেনা যে, তাঁর সুপারিশের কারণে আল্লাহ তার নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। পরম মেহেরবান আল্লাহর অনুগ্রহসূচক অনুমতি পাবার পরে সুপারিশকারী অত্যন্ত দীনতা, হীনতা ও বিনয় সহকারে অনুনয় করে বলবে, 'হে দুনিয়া ও আখিয়াতের মহান মালিক আল্লাহ! তুমি তোমার অমুক বান্দাহর গুনাহ ও ভুল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও। তাকে তোমার অনুগ্রহ ও রহমত দান করে ধন্য করো।'

সুতরাং সুপারিশ করার অনুমতিদানকারী যেমন আল্লাহ তেমনি তা কবুলকারীও আল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন–

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ وَلِىٌّ وَّلاَ شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ-

তিনি (আল্লাহ) ব্যতিত তাদের জন্যে না আর কেউ ওলী বা অভিভাবক আছে, আর না কেউ শাফায়াতকারী। (সূরা আনয়াম-৫১)

শাফায়াতকারী তারাই হবেন যারা আল্লাহর অতি প্রিয়। আর যাদের জন্যে শাফায়াত করা হবে তাদের পাপের অবস্থা এই যে, পাপ ও নেকীর ক্ষেত্রে তাদের পাপ সামান্য বেশী। অর্থাৎ ক্ষমা পেয়েও যেন ক্ষমা না পাওয়ার অবস্থা, ক্ষমার যোগ্যতা লাভে সামান্য অভাব। এই অভাবটুকু পুরণের জন্যেই মহান মালিক আল্লাহর রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে তাদের জন্যে শাফায়াত করার অনুমতি দান করবেন। সুতরাং একথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কারো ইচ্ছে অনুযায়ী কেউ কারো পক্ষে সুপারিশ করতে পারবে না। যাদের জন্য সুপারিশ করা হবে তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে ক্ষমা করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই কাউকে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন। এখানে একটা প্রশ্ন জাগে, সুপারিশ করার অনুমতিদান করবেন আল্লাহ, আবার তা কবুলও করবেন তিনি। তাহলে সুপারিশকারী নিয়োগ করার যুক্তিটা কী? এর জবাব অত্যন্ত স্পষ্ট। কিয়ামতের ময়দানে সেই মুসিবতের দিনে, যে মুসবিতের মহাবিভিষীকা দেখে সাধারণ মানুষের অবস্থা যে কি হবে তা কল্পনারও বাইরে-স্বয়ং কোন কোন নবীগণও ভয়ে কাঁপতে থাকবেন এবং আল্লাহর সামনে কোন কথা বলার সাহস পাবেন না। সেই অবস্থায় আল্লাহ তার কিছু প্রিয় বান্দাহদেরকে শাফায়াত করার অনুমতি প্রদান করে তাদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করবেন। এই মর্যাদার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থান পাবার অধিকারী হবেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তবে এ কথাও সত্য-মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চললেই যে, সে কিয়ামতের ময়দানে জান্নাত পাবে এ ধারণা করা উচিত নয়। বরং মনের আকাংখা এটাই হওয়া উচিত, 'জান্নাতের লোভ নেই জাহান্নামেরও ভয় নেই-চাই শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি।' সুতরাং, আল্লাহর রহমত ছাড়া মুক্তি পাওয়া যাবে না। সূরা নাবা-এর ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا-لاَّيَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا-

সেদিন সকল আত্মা ও ফেরেশতাগণ কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়াবে কেউ কোন কথা বলবেনা সে ব্যতীত, যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দিবেন। এবং যথাযথ ও সঠিক কথা সে বলবে।

মানব চরিত্রের দুর্ভেদ্য বর্ম-বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস

দেশ, সমাজ ও জাতির নিরাপত্তার লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই নানা ধরনের আইন-কানুন রচিত হয়েছে। আইন প্রণীত হয়েছে মানুষকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেও মানুষকে সৎ হিসাবে গড়ার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো হয়ে থাকে। অপরাধ প্রবণতা দমন করে মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যে মানবেতিহাসে সবচেয়ে অধিক প্রচেষ্টা চালানে হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, মানুষ এ ব্যাপারে কোথাও সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। বার বার তাদেরকে ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করতে হয়েছে। এর মূল কারণ হলো, যে বিষয়টি প্রধানতঃ মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখতে পারে, সে বিষয়টিকেই পরিহার করে নানা ধরনের অপরাধ দমন আইন ও অপরাধ প্রতিরোধক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

একজন মহা ক্ষমতাবান সর্বদর্শী স্রষ্টার দরবারে মানব জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের জবাবদিহি করতে হবে–এই অনুভূতি মানুষের হৃদয় জগতে সদাজাগ্রত না থাকলে সে মানুষ কোনক্রমেই অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে থাকতে পারে না, এ কথা ঐতিহাসিকভাবে পৃথিবীতে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা চরম সত্য যে, জাতির পরিচালকগণ উল্লেখিত মূলনীতি পরিত্যাগ করেই চরিত্র সৃষ্টির যাবতীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করে থাকে। এ যেন ঘি–কে উত্তপ্ত অগ্নিকুন্ডের পাশে রেখে জমাট বাঁধার সাধনা করার মতো হাস্যকর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

প্রকৃত বিষয় হলো, বিচার দিবস তথা পরকাল অমান্য ও অস্বীকার করার অনিবার্য এবং নিশ্চিত পরিণাম হচ্ছে, চরিত্রহীনতার অতল তলদেশে নিমজ্জিত হওয়া। বিচার দিবস সম্পর্কিত ভীতি শূন্য মন-মানসিকতার অধিকারী মানুষ এমন সব কদর্যতামূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়, যার পরিণাম ধ্বংস, পাপাচার, অরাজকতা, অশান্তি, বিশৃংখলা ইত্যাদি ব্যতিত আর কিছুই নয়। অগণিত বছরের মানবীয় আচরণ ও কর্মকান্ড এ কথার জ্বলন্ত সাক্ষী। বিষয়টির সত্যতা যাচাই করার জন্য সুদূর অতিতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিক্ষেপের কোন প্রয়োজন নেই, নিজের চারপাশের পরিবেশের দিকে দৃষ্টি দিলেই সহজে অনুমান করা যাবে, বিচার দিবসে জবাবদিহির অনুভূতিহীন আইন-কানুন আর শিক্ষানীতি কি ধরনের নিরাপত্তাহীনতা আর বিশ্বাসহীনতার পরিবেশের জন্ম দিয়েছে।

যারা নিজেদেরকে বিচার দিবসে জবাবদিহি করতে বাধ্য মনে করে না, পরিশেষে নিজের সমস্ত কাজের হিসাব বিচার দিবসে প্রদান করতে হবে, এর কোন ভয় বা আশঙ্কাই মনে বোধ করে না, যারা নিশ্চিত ধরে নিয়েছে যে, এই পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন, এরপরে আর কিছুই নেই, এই পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, সম্মান-মর্যাদা, খ্যাতি-যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা অর্জনকে সাফল্য লাভের একমাত্র মানদন্ড বলে মনে করে, সর্বোপরি যারা এই ধরনের বস্তুবাদী চিন্তা, বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসরণের অযোগ্য বলে বিবেচনা করে, তাদের গোটা জীবনই অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

এরা পৃথিবীতে বাধা-বন্ধন মুক্ত লাগামহীন জীবন-যাপন করে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর পরিচিত অপরিচিত যাবতীয় অসৎ গুণাবলী তাদের চরিত্রে বাসা বাঁধে। এদের অশুভ পদচারণায় গোটা দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। বিচার দিবসে জবাবদিহির অনুভূতিহীন মন-মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিগণ দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরে দেশের সম্মানিত ও মর্যাদাবান আলেম-ওলামা তথা আল্লাহভীরু লোকদেরকে অসম্মানিত করে। তাদেরকে মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ করে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায়। তাদের মতের বিরোধিদেরকে সমূলে উৎখাত করার প্রচেষ্টা চালায়। সবর্ত্রে দলীয় ও আত্মীয়করণ করে। জাতির সম্পদ অবাধে লুট-পাট করে। মিথ্যা-প্রচার প্রপাগান্ডা চালাতে এদের বিবেকে বাধে না।

গোটা দেশব্যাপী জুলুম আর অন্যায়-অত্যাচারের প্লাবন বইয়ে দেয়। জাতি অনাহারে থাকলেও এদের বিলাসিতার সরঞ্জামের কোন অভাব ঘটে না। ক্ষুধার যন্ত্রণায় জাতির পেটের চামড়া পিঠের সাথে লেগে গেলেও এদের দেহ ক্রমশঃ স্ফীত হতে থাকে। এদের লজ্জানুভূতি এতটা নিম্নস্তরে নেমে যায় যে, ভিন্ন নারীর সাথে তাদের অবৈধ সম্পর্কের কথা সদম্ভে প্রচার মাধ্যমে ঘোষণা করতেও এসব লজ্জাহীনের দল দ্বিধাবোধ করে না।

চরিত্রহীনা নারী বৃটেনের প্রিন্সেস ডায়না অবৈধ সন্তান গর্ভে নিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করার পরে লজ্জার পরিবর্তে এই শ্রেণীর মানুষগুলো শোকাহত হয়ে পড়েছিল। মাত্র কিছুদিন পূর্বে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের ষোল বছরের সন্তান 'ইউয়েন' মদপান করে রাস্তায় পড়েছিল। বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমে সচিত্র প্রকাশ হলেও বিচার দিবসের প্রতি জবাবদিহির অনুভূতিহীনতার কারণে তারা কেউ লজ্জানুভব করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের যৌন নারী মনিকা লিউনস্কির অবৈধ সম্পর্কের কথা প্রকাশ হলে দেশব্যাপী যে আলোড়ন সৃষ্টি হলো, বিচার দিবসে জবাবাদিহির অনুভূতি না থাকার কারণে কোন লজ্জাই তাকে স্পর্শ করেনি।

শিক্ষাঙ্গনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, মাদ্রাসায় তথা যেসব শিক্ষাঙ্গনে বিচার দিবসে জবাবদিহি সৃষ্টির অনুভূতিমূলক সামান্য শিক্ষা দেয়া হয়, সেখানের ছাত্রদের চারিত্রিক মান আর যেখানে ঐ অনুভূতিমূলক শিক্ষার নাম-নিশানা নেই, সেখানের ছাত্রদের চারিত্রিক মানে শত যোজন পার্থক্য বিদ্যমান। দেশের সন্ত্রাসী, ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ, চোর-ডাকাত, আত্মসাৎকারী, নারী ধর্ষকদের তালিকা প্রায় থানাতেই রয়েছে। এসব তালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, মাদ্রাসা তথা যেখানে বিচার দিবসের অনুভূতিমূলক শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সে শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কতজন, আর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে বস্তুবাদী শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সেই শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কতজন।

প্রকৃতপক্ষে বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসের স্বপক্ষে এটা একটি অভিজ্ঞতামূলক প্রামাণ্য দলীল। এ জন্য এ কথা আমরা নিশ্চয়তা সহকারে এবং অটল বিশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারি যে, বিচার দিবসে জবাবদিহির অনুভূতিই কেবলমাত্র মানুষকে সৎ ও চরিত্রবান করতে সক্ষম–ভিন্ন কোন ব্যবস্থা নয়। মানুষের চরিত্র পৃথিবীর কোন আইন দিয়েই সংশোধন করা যেতে পারে না। নানা অপরাধের শাস্তি হিসাবে পৃথিবীতে অসংখ্য আইন-কানুনের প্রচলন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব

অভিজ্ঞতা বলে, মানুষকে সে অপরাধ থেকে মুক্ত করা যায়নি। এ্যাসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেও অপরাধীদেরকে ঐ ঘৃণ্য নিষ্ঠুর কর্ম থেকে বিরত করা যায়নি। কঠোর আইন প্রয়োগ করেও দুষ্কৃতিকারীদেরকে মাদকদ্রব্য সেবন ও তার ব্যবসা থেকে দূরে রাখা যায়নি। পৃথিবীর সবচেয়ে সুসভ্য বলে দাবিদার দেশ–আমেরিকার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ যোগ্য। মদ্য পানকারীদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে, এই ঘোষণাই মিঃ রুজভেল্টের প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়কে তরান্বিত করেছিল। এরপর ১৯৩৩ সনে আমেরিকার শাসনতন্ত্রের ১৮ নম্বর সংশোধনীটি বাতিলের মাধ্যমে গোটা আমেরিকায় মদের উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও মদ সংক্রান্ত যাবতীয় কিছু নিষিদ্ধ করা হয়।

মদপান থেকে জাতিকে মুক্ত করার লক্ষে ১৮ নম্বর সংশোধনীটি বাতিল করার বেশ কয়েক বছর পূর্ব থেকেই এ্যান্টি সেলুন লীগ নামক একটি সংস্থা মদের অপকারিতা সম্পর্কে আধুনিক যুগের যাবতীয় সহযোগিতা গ্রহণ করে প্রচার চালিয়ে ছিল। এভাবে তারা প্রচার কার্য চালাতে গিয়ে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছিল। মদের অপকারিতা সম্পর্কে যতগুলো বই-পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছিল, তার মোট পৃষ্ঠা ছিল প্রায় নয় কোটির মতো। মদ্য নিবারক আইনটি কার্যকর করতে গিয়ে চৌদ্দ বছরে আমেরিকার সরকার ৬৫ কোটি পাউন্ড ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছিল। দুইশত লোককে নিহত হতে হয়েছিল। ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩ শত ৩৫ জনকে জেল দেয়া হয়েছিল। ১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউন্ড জরিমানা করা হয়েছিল। ৪০ কোটি ৪০ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের নানা ধরনের সম্পদ সরকার বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হয়েছিল।

আমেরিকায় মদ্যপান নিষিদ্ধ হবার সাথে সাথে গোপনে মদ উৎপাদনকারী অসংখ্য কারখানা দেশের আনাচে কানাচে প্রতিষ্ঠিত হলো। আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তা-পথে গোপনে মদ উচ্চমূল্যে বিক্রি শুরু হলো। প্রকাশ্যে যখন মদ বিক্রি হতো, তখনকার মূল্যের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি মূল্যে গোপনে মদ বিক্রি হচ্ছে–এই সুযোগ দেশবাসী হাতছাড়া করলো না। দেশের একশেণীর জনগণ গোপনে মদের ব্যবসা শুরু করলো। পূর্বের তুলনায় মদপানকারীর সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি লাভ করলো।

পূর্বে যেখানে বৈধ মদের বিপনন কেন্দ্র ছিল গোটা আমেরিকায় ৪ শত, আর মদ নিষিদ্ধ হবার পরে মদের গোপন বিপনন কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল অগণিত। ৭ বছরে নিষিদ্ধ ঘোষিত মদের বিপনন কেন্দ্রের ৭৯ হাজার ৪ শত ৩৭ জন মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ৯৩ হাজার ৮ শত ৩১ টি মদের বিপনন কেন্দ্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এ ধরনের অসংখ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেও মানুষকে মদ থেকে বিরত রাখতে আমেরিকার সরকার চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। পরবর্তীতে তারা পুনরায় মদ বৈধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

আমেরিকা সরকারের এই ব্যর্থতার পেছনে যে কারণটি সক্রিয় ছিল তাহলো, তারা মানুষের মনে বিচার দিবসে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করেনি। মদপান করলে আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হতে হবে–এই অনুভূতি যদি তাদের ভেতরে সৃষ্টি করা হতো, তাহলে অবশ্যই জাতিকে মদপান থেকে বিরত রাখা যেতো। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভূখন্ডে আগমন করেছিলেন, সে জাতি ছিল অজ্ঞতা আর বর্বরতায় নিমজ্জিত। সভ্যতা-সংস্কৃতি,

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন স্পর্শ ছিল না তাদের জীবনে। হিংস্রতা আর অপরাধ প্রবণতা ছিল শিরা-উপশিরায় ধাবমান। জেনা-ব্যভিচার তাদের দৈনন্দিন জীবনের উপকরণ ছিল। পানির মতই তারা মদপান করতো। মদ তাদের কাছে এত অধিক প্রিয় ছিল যে, সেযুগের কাব্য আর সাহিত্য মদের উল্লেখ ব্যতিত রচিত হতো না। মদকে ভালোবেসে তারা আড়াই শতেরও অধিক নাম দিয়েছিল। সেই লোকগুলোর ভেতরে বিচার দিবসের ভীতি সৃষ্টি করে আল্লাহর রাসূল তাদের সম্পূর্ণ জীবনধারা কিভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন, তা বর্তমানে আধুনিক যুগের পন্ডিতদের কাছে গবেষণার বিষয়। মদ সম্পর্কে রাসূলকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তা'য়ালা মদ-জুয়া সম্পর্কে বলছেন–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ-قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ-وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا-

লোকজন আপনাকে প্রশ্ন করছে মদ-জুয়া সম্পর্কে কি নির্দেশ ? আপনি বলে দিন, এ দুটো জিনিস বড়ই অকল্যাণকর, যদিও এতে লোকদের জন্য কিছুটা কল্যাণও রয়েছে, কিন্তু উভয় কাজের অকল্যাণ–কল্যাণের তুলনায় অনেক বেশী। (সূরা বাকারা-২১৯)

প্রথমবারে মদ-জুয়া সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন আদেশ বা নিষেধ বাণী উচ্চারিত হলো না। শুধু এর কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হলো। যখন বলা হলো, এসবের মধ্যে অকল্যাণের দিকই বেশী, তৎক্ষণাত জাতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মদপান থেকে বিরত হলো। বেশ কিছুদিন গত হবার পরে দেখা গেল লোকজন মদপান করে নামাজ আদায় করার সময় নামাজে ভুল-ভ্রান্তি করছে। রাসূলকে পুনরায় প্রশ্ন করা হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সূরা নেছার ৪৩ নং আয়াতে জানিয়ে দেয়া হলো–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ-

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্থ থাকো, তখন নামাজের কাছেও যেও না। নামাজ আদায় তখনই করবে যখন তোমরা কি বলছো, তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে মদ সম্পর্কে যখন এই আদেশ অবতীর্ণ হলো, তখন লোকজনের পক্ষে মদপান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। ফজরের নামাজের পরে মদপান করলে সাংসারিক এবং ব্যবসায়িক কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে লাগলো। যোহরের নামাজের পরে মদপান করলে আসরের নামাজ পর্যন্ত নেশা থাকতো। আসরের নামাজের পরে মদপান করলে মাগরিবের নামাজ পর্যন্তও নেশা থাকতো। সুতরাং তারা মদপানের জন্য দুটো বিশেষ সময় নির্ধারণ করলো। ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময় আর এশার নামাজের পরে। এই আদেশের ফলেও আরো কিছু সংখ্যক লোকজন মদপান থেকে বিরত হলো। কিন্তু মদের প্রকৃত ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে লোকজন তখন পর্যন্ত অন্ধকারে ছিল। মদপান করে হিতাহিত

জ্ঞানশূন্য হয়ে মানুষ অরাজকতা সৃষ্টি করতো, হত্যাকান্ডের মতো ঘটনা ঘটিয়ে বসতো নেশাগ্রস্থ হয়ে। এরপর মহান আল্লাহ সূরা মায়িদার ৯০-৯২ নং আয়াতে তাদের চোখের সামনে থেকে অন্ধকারের পর্দা উঠিয়ে নিলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ-فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ-وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ-

হে ঈমানদারগণ। এই মদ, জুয়া, মূর্তি, পাশাখেলা ইত্যাদি হলো অপবিত্র এবং শয়তান কর্তৃক উদ্ভাবিত নোংরা কর্ম। অতএব তোমরা এসব কাজ বর্জন করো। এসব কাজ বর্জনের ফলে তোমরা কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে। শয়তানের আকাংখা হলো, মদ-জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে বিরত রাখবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসরণ করো এবং ঐসব কাজ থেকে বিরত হও। আর তোমরা যদি এই আদেশের বিরোধিতা করো, তাহলে জেনে রেখো যে, আমার রাসূলের ওপরে দায়িত্ব ছিল, তিনি স্পষ্ট ভাষায় আমার আদেশ পৌঁছে দিবেন।

ইতিহাস সাক্ষী, আল্লাহর পক্ষ থেকে মদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার সাথে সাথে ঐ লোকগুলোই মদ পান থেকে শুধু বিরতই হয়নি, মদভর্তি পাত্রগুলো তারা ভেঙে এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল যে, রাস্তা-পথে মদের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। মদ নিবারক এই আইন কার্যকরী করতে গিয়ে কোন বাহিনীর প্রয়োজন হয়নি, দীর্ঘ দিন ধরে কোন প্রচার প্রপাগান্ডা চালাতে হয়নি। কাউকে গ্রেফতার করতে হয়নি। মদ ছিল যাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় পানিয়-সেই মদই আল্লাহর আদেশের কারণে তাদের কাছে চরম ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হলো। কোথাও বসে কিছু সংখ্যক লোকজন মদপান করছিল। রাসূলের ঘোষণাকারীর কণ্ঠশব্দ তাদের কানে প্রবেশ করলো, 'এখন থেকে মদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে'। এই ঘোষণা নেশাগ্রস্থ কানে প্রবেশ করার সাথে সাথে যে ব্যক্তি মুখের কাছে সবেমাত্র মদের পাত্র তুলে ধরেছিল, সে তা ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষেপ করেছিল। যাদের সামনে মদ পরিপূর্ণ পাত্র ছিল, তারা তা চরম ঘৃণায় পদাঘাত করে ফেলে দিল। বিচার দিবসে প্রতিটি কাজের জবাবদিহি করতে হবে, এই বিশ্বাস-ই মানুষের চরিত্রে এভাবে সার্বিক পরিবর্তন সাধিত করেছিল।

রাতের অন্ধকারে দুধের সাথে পানি মিশ্রিত করে বিক্রি করলে কেউ দেখতে পাবে না-কিন্তু সর্বদর্শী আল্লাহ দেখবেন, বিচার দিবসে জবাবদিহি করতে হবে, এই অনুভূতি এতটাই প্রবল

ছিল যে, অবরোধপুরের অধিবাসিনী যুবতী নারীও দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জনের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করতো। বিক্রেতা ক্রেতাকে জানিয়ে দিতো, তার পণ্যে কোথায় কি ত্রুটি রয়েছে। বস্ত্র বিক্রেতা যদি ভুল ক্রমে কারো কাছে ত্রুটি যুক্ত বস্ত্র বিক্রি করতো, বিষয়টি স্মরণে আসার সাথে সাথে সে বিচার দিবসে জবাবদিহির ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্যের মতই অনুসন্ধান করতে থাকতো, কোথায় গেল সেই বস্ত্রের ক্রেতা। তাকে খুঁজে বের করে অর্থ ফেরৎ দেয়া হতো। পথ চলতে গিয়ে অলঙ্কারে সুসজ্জিতা তন্বী তরুণী অনিন্দ সুন্দরী ষোড়ষী যুবতী দেখেছে তার দিকে এগিয়ে আসছে সুন্দুর সুঠাম দেহের অধিকারী যুবক। লুণ্ঠিতা আর ধর্ষিতা হবার ভয়ে আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে সে পথের ধূলায় বসে পড়েছে।

যুবক ধীর গতিতে এগিয়ে এসে সামনে স্থির দাঁড়িয়ে ভয়বিহ্বলা যুবতীর চোখের ওপরে চোখ রেখে মমতাভরা কণ্ঠে আবেদন করেছে, 'মা, কোন ভয় নেই। আপনি কোথায় যাবেন বলুন আমি প্রহরা দিয়ে নিরাপত্তার সাথে আপনাকে গন্তব্যস্থলে পৌছে দেবো, আমার পরিচয় শুনুন, আমি মুসলমান।' বিচার দিবসে জবাবদিহির অনুভূতি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে আল্লাহর রাসূল এই ধরনের চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন।

বিচার দিবসে জবাবদিহির অনুভূতি সক্রিয় না থাকলে কোনক্রমেই মানুষের চরিত্র ভালো হবে না, মানুষের ভেতর থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর হবে না, এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরকাল সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সবচেয়ে বেশী আলোচনা করেছেন। মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আলোচনা এতটাই অধিক যে, তা একত্রিত করলে ত্রিশপারা কোরআনের প্রায় দশপারার সমান হবে। একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কোরআনে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার সারমর্ম হলো, মানুষের ব্যক্তিগত আচার আচরণ এবং মানব গোষ্ঠীসমূহের সামাজিক ও সামগ্রিক আচরণ কোনক্রমেই নির্ভুল ও সঠিক হতে পারে না, যতক্ষণ না মানুষের যাবতীয় কাজকর্মের চূড়ান্ত হিসাব আল্লাহর কাছে পেশ করতে হবে-এই চেতনা ও দৃঢ় বিশ্বাস মানবীয় চরিত্রের গভীর বুনিয়াদে সম্পৃক্ত ও সংযোজিত হবে।

অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে, আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস এবং বিচার দিবসে জবাবদিহির অনুভূতি না থাকার পরেও অনেক মানুষ এমন রয়েছে যে, তারা অত্যন্ত সৎ এবং নীতিবান। পরকালে অবিশ্বাসী অনেক লোকের নীতিদর্শন ও কর্মবিধি সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা ভিত্তিক হওয়ার পরেও তারা বহুলাংশে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে। জুলুম, বিপর্যয়, অন্যায়, পাপ ইত্যাদি ধরনের কাজ থেকে তারা দূরে অবস্থান করে। তাদের পারস্পরিক লেন-দেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন হয় এবং তারা প্রকৃত দেশ প্রেমিক হিসাবে জাতির একনিষ্ঠ সেবক হয়ে থাকে। এটা কিভাবে সম্ভব হয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, গোটা বস্তুবাদী ও ধর্মহীন নীতি দর্শন ও চিন্তা চেতনা-পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, এসব সৎ স্বভাব সম্পন্ন নাস্তিক লোকদের যেসব নৈতিক সৌন্দর্য ও সৎকাজের জন্য তাদেরকে চরিত্রবান বলা হয়, প্রকৃত পক্ষে তার ভিত্তি নির্মিত হয় দেশ-জাতি ও বস্তুবাদী আদর্শকে কেন্দ্র করে। এসব ধর্মহীন দার্শনিক চিন্তা-বিশ্বাসে ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, বিশ্বাসপরায়ণতা, অঙ্গীকারপূরণ,

ইনসাফ-সুবিচার, দয়া-অনুগ্রহ, বদান্যতা, উদারতা, ত্যাগ-তীতিক্ষা, সহানুভূতি, আত্মসংযম, পবিত্রতা, সত্যকে জানা, অধিকার আদায় ইত্যাদি সৎ কাজের মূলেও সংকীর্ণ জাতিয়তাবাদ আর নাস্তিক্যবাদী আদর্শ ক্রিয়াশীল। জাতিয়তাবাদ আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উল্লেখিত সৎ গুণাবলী আংশিকভাবে অর্জন করা যেতে পারে শুধুমাত্র দেশ ও জাতির স্বার্থে। আবার দেশ ও জাতির স্বার্থেই তা যে কোন মুহূর্তে পরিহারও করা যেতে পারে। এদের কাছে চিরন্তন মূল্যবোধ বলে কিছুই নেই। এ ধরনের লোকগুলোর খোদা হয় চারটি। নিজের নফ্স, দেশ, জাতি এবং নিজেদের তৈরী করা বিধান। এই চার খোদায় বিশ্বাসী লোকগুলো ক্ষেত্র বিশেষে আংশিকভাবে সৎ গুণাবলী অর্জন করলেও তা যেমন ঐ চার খোদার প্রয়োজনে করে, আবার পরিহার করলেও তা ঐ চার খোদার প্রয়োজনেই পরিহার করে।

এক নম্বর খোদা নফ্স-এর নির্দেশে এরা যে কোন মুহূর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য নীতি আদর্শ বিবর্জিত গর্হিত কর্মে জড়িয়ে পড়তে পারে। দুই নম্বর খোদা দেশ–এই দেশের স্বার্থে এরা যে কোন নিন্দনীয় নীতি গ্রহণ করতে পারে। তিন নম্বর খোদা জাতি–জাতির স্বার্থে এরা অন্য জাতি বা দেশের ক্ষতি করতে সামান্য দ্বিধাবোধ করে না। চার নম্বর খোদা হলো দেশের প্রচলিত আইন-কানুন–যা তাদের নিজেদেরই রচনা করা। যখনই এই আইন তাদের মন-মর্জ্জির বিপরীত নির্দেশ দান করবে, তখনই তারা তা সংশোধন করে নিজেদের স্বার্থের অনুকূল করে নেবে।

মানুষ কামনা-বাসনা, লোভ-লালসার উর্ধ্বে নয়। কারো কাছে জবাবদিহির অনুভূতি যখন হৃদয়ে থাকে না, তখন সে অবৈধ কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য অন্য মানুষের অলক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। নিজ দেশের ও জাতির স্বার্থে সে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দ্বিধা বা লজ্জাবোধ করবে না। দেশ ও জাতির স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যদি অন্য দেশ দখল করতে হয়, অন্য জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রয়োজন হয়, বিশ্ব বিবেকের শত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তারা তা করবেই।

এরবড় প্রমাণ ভারত, রাশিয়া, ইসরাঈল, ইউরোপ, আমেরিকা ও বৃটেন। কাশ্মিরে ভারত পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছে। প্রতিদিন তারা সেখানে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে। কাশ্মিরীদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তারা বুলেট আর বুটের নিচে পিষ্ট করছে। রাশিয়া আফগানিস্থানে আগ্রাসন চালিয়ে অগণিত আবাল বৃদ্ধ বণিতাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। আমেরিকা ভিয়েতনামে নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে। বিশ্বমোড়ল আমেরিকার প্রত্যাক্ষ সহযোগিতায় মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোড়া ইসরাঈল ফিলিস্তীনের আবাল বৃদ্ধ বণিতাদেরকে পাখির মতোই গুলী করে হত্যা করছে।

বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় ইউরোপীয় হায়েনা আর আমেরিকা-বৃটেনের প্রত্যক্ষ সগযোগিতায় লোমহর্ষক গণহত্যা চালানো হয়েছে। ইরাকের সাথে বর্বর আচরণ করা হচ্ছে। আলজিরিয়া আর আলবেনিয়ায় গণহত্যা চালানো হচ্ছে। এসব অমানবিক কর্মকান্ডের সাথে যারা জড়িত এবং প্রত্যক্ষভাবে যারা সহযোগিতা করছে, তারা সবাই মানবাধিকারের প্রবক্তা। ব্যক্তি হিসাবে এদের সবার চরিত্রে কিছু না কিছু সৎ গুণাবলী অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু দেশ ও জাতির স্বার্থকে

প্রাধান্য দিয়ে এরা লজ্জা, ঘৃণা, নিয়ম-নীতি, মানবতা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, বিশ্বাসপরায়ণতা, অঙ্গীকারপূরণ, ইনসাফ-সুবিচার, দয়া-অনুগ্রহ, বদান্যতা, উদারতা, ত্যাগ-তীতিক্ষা, সহানুভূতি, আত্মসংযম, পবিত্রতা ইত্যাদি সৎগুণাবলীর পোষাক দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। বিশ্ব বিবেক এদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বার বার প্রতিবাদ করছে, কোন প্রতিবাদই তারা গ্রাহ্য করছে না। বিচার দিবসে জবাবদিহির অনুভূতিহীন মানবগোষ্ঠীর কাছ থেকে এরচেয়ে ভিন্ন কোন আচরণ আশা করা যায় না।

বিচার দিবসে জবাবদিহির অনুভূতি সম্পন্ন মুসলিম সৈন্যবাহিনী কোন অমুসলিম দেশ জয় করলে সে দেশের অমুসলিম জনগণের সাথে তাঁরা এমন আচরণ করেছেন যে, বিজিত দেশের জনগণ তাঁদের স্বজাতীয় শাসকের কাছ থেকে এতটা ভালো আচরণ লাভ করেনি। একমাত্র মুসলমানরা ব্যতিত অন্য সমস্ত জাতি যে সাম্প্রদায়িক দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত তার প্রমাণ অতীতেও যেমন তারা দিয়েছে–বর্তমানেও তারা সাম্প্রদায়িক কাপালিকদের মতো আচরণ করছে। আসমুদ্র হিমাচল রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাভিলাষী ভারতের বর্ণহিন্দুরা ভিন্ন জাতি ও তাদের ধর্মীয় স্থানসমূহ সহ্য করতে পারে না।

পাশ্চাত্যের সামাজ্যবাদী অশুভ খৃষ্টশক্তি ইউরোপের বুকে মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনাও করতে নারাজ। হার্জেগোভিনা–বসনিয়া–চেচনিয়া থেকে মুসলমানদের শেষ চিহ্ন মুছে দেয়ার জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। মসজিদগুলো অস্ত্রের আঘাতে ধূলোর সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিম শক্তিসমূহ বর্তমান পৃথিবীতে নিজেদেরকে সবচেয়ে সভ্য বলে দাবী করে থাকে। গোটা বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের শ্লোগানে তারা উচ্চকণ্ঠ। পক্ষান্তরে অতীত ইতিহাস এবং তাদের বর্তমান কর্মকান্ড এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ইহুদী–খৃষ্ট অপশক্তি ও তাদের দোসর জড়বাদী বর্ণহিন্দুরা পৃথিবীতে মানবাধিকার সবচেয়ে বেশী লংঘন করেছে এবং করছে।

ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাথে বর্ণ হিন্দুদের আচরণ, মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদীদের নির্মম অত্যাচার ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ নীতি, হর্জেগোভিনা-বসনিয়া-চেচনিয়া-কাশ্মির ও ইরাকে খৃষ্টশক্তি কর্তৃক পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন, এ সমস্ত ঘটনাই প্রমাণ করে যে, অমুসলিমরাই সাম্প্রদায়িক কাপালিকের ভূমিকায় শাণিত কৃপাণ হস্তে বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধনযজ্ঞে অবতীর্ণ হয়েছে।

১০৯৯ সনে খৃষ্টশক্তি জেরুজালেম দখল করে ৭০ হাজার মুসলিম নারী-পুরুষ-শিশুদের একটি প্রাণীকেও জীবিত রাখেনি। মুসলমানদের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে বর্শার অগ্রভাগে গেঁথে উল্লাস প্রকাশ করেছে। ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে তারা যখন শহরে প্রবেশ করেছে, তখন তাদের ঘোড়ার পা মুসলমানদের রক্তে ডুবে গিয়েছে। কবরস্থান থেকে মুসলমানদের হাড়গোড় তুলে অপমানিত করেছে। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে গোটা জেরুজালেম নগরী খৃষ্টানদের পৈশাচিকতায় মুসলিম শূন্য হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে পুনরায় ১১৭৮ সনে–মাত্র ৮৮ বছর পরে মুসলমানেরা যখন জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করে, তখন একজন অমুসলিমেরও কোন ক্ষতি মুসলমানরা করেনি। মুসলিম হত্যাযজ্ঞের

মহানায়ক নরঘাতক রিচার্ড−যে রিচার্ড হাজার হাজার মুসলিম নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-তরুণকে লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছিল, যার সম্পর্কে তারই জ্ঞাতি ভাই ঐতিহাসিক "লেনপুল" তার বর্বর হত্যাকান্ড সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "নিষ্ঠুর কাপুরুষোচিত" বলে। এই খৃষ্টান নরপশু রিচার্ডকে ঐতিহাসিক "গিবন" চিহ্নিত করেছেন, "শোণিত পিপাসু" হিসেবে। আর ঐতিহাসিক কক্সবার্টের ভাষায় রিচার্ড হলো, "মানব জাতির নির্মম চাবুক"। যুদ্ধের ময়দানে এই নরঘাতকের অস্ত্র যখন ভেঙ্গে গিয়েছিল, মানবতার বন্ধু সালাহ্ উদ্দিন আইয়ুবী তখন তাকে হত্যা না করে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

নরপশু রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তার খৃষ্টান সাথীরা তাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল। তখন মুসলিম বীর সালাহ্ উদ্দিন গোপনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে এবং বর্তমানে মুসলমানরা এভাবে মানবতা প্রদর্শন করেছে−করছে, আর সেই নির্মল নিষ্কলুষ মানবতাকে নিষ্ঠুর পায়ে বার বার পদদলিত করেছে অমুসলিম শক্তি। পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি যাদের ভেতরে নেই তাদের চরিত্র আর ঐ অনুভূতি যাদের ভেতরে রয়েছে, তাদের চরিত্রে শতযোজন পার্থক্য বিরাজিত, পৃথিবীর জাতিসমূহের ইতিহাসই তা প্রমাণ করে দিয়েছে। আল্লাহ এবং পরকালের ব্যাপারে যারা কোন গুরুত্ব দেয় না, তাদের অবস্থা সম্পর্কে সূরা ইউনুসের ৭-৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন−

اِنَّ الَّذِيْنَ لاَيَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَاوَ الَّذِيْنَ هُمْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ-اُولٰئِكَ مَاْوٰا هُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, যারা আমার সাথে (বিচার দিবসে) মিলিত হবার কোন আশা পোষণ করে না এবং পৃথিবীর জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে, আমার নিদর্শনগুলোর প্রতি উদাসীন থাকে, তাদের শেষ আবাসস্থল হবে জাহান্নাম, ঐসব কৃতকার্যের বিনিময়ে যা তারা (তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে) করেছে।

বিচার দিবসের অনুভূতি মানুষের চরিত্রকে কলুষিত হওয়া থেকে বর্মের মতোই পরিবেষ্টন করে রাখে। পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলো ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যত দেশে গণহত্যা চলেছে−এক কথায় যত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং হচ্ছে, তা সবই বিচার দিবসে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির অনুভূতি না থাকার কারণেই সংঘটিত হয়েছে, এ কথা অভিজ্ঞতা বার বার প্রমাণ করে দিয়েছে।

বিচার দিবস হিসাব গ্রহণ ও প্রতিফল লাভের দিন

সূরা ফাতিহার তৃতীয় আয়াতে মহান আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বিচার দিবসের অধিপতি। বিচার দিবস বলতে 'ইয়াও মিদ্দীন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় 'দ্বীন' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শক্তি-ক্ষমতা, শাসন-কর্তৃত্ব, অন্যকে আইন পালন করতে বাধ্য করা এবং তার ওপরে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা, কাউকে নিজের দাসে পরিণত করে আদেশ পালনে বাধ্য করা, কোন ক্ষমতাসীনের পক্ষ থেকে

প্রভাব-প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তার করা, আনুগত্য- দাসত্ব এবং ক্ষমতাসীনের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দেয়া, এমন নিয়ম-নীতি যা মেনে চলা হয়, প্রতিদান দেয়া, প্রতিফল দান করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা ফাতিহার তৃতীয় আয়াতে 'দ্বীন' শব্দটি হিসাব-নিকাশ গ্রহণের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রতিফল, প্রতিদান বা বিনিময় দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই 'দ্বীন' শব্দ দিয়েই আরবী ভাষায় গোটা জাতির জীবন পদ্ধতি বা জীবনাদর্শকে বুঝানো হয়ে থাকে। হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম যখন ফেরাউন ও তার জাতির কাছে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ফেরাউন তাঁকে নানা ধরনের হুমকি দেয়া শুরু করেছিল। আল্লাহর রাসূলকে সে বলেছিল, তুমি যদি এই আদর্শ প্রচার থেকে বিরত না হও, তাহলে তোমাকে আমি কারারুদ্ধ করবো। পক্ষান্তরে হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর নির্দেশে তাঁর কাজ তিনি চালিয়ে যেতেই থাকলেন। তখন ফেরাউন তার সরকারের উচ্চ মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের ডেকে যা বলেছিল, সূরা মুমিনে তা এভাবে এসেছে-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِي أَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ-إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْأَنْ يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ-

আমাকে ছাড়ো, আমি এই মুছাকে হত্যা করবো। সে তার রব্বকে ডেকে দেখুক। আমার আশঙ্কা হয়, সে তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে দিবে অথবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

ফেরাউন আল্লাহর নবী হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামের ভয়ে এমনিতেই কম্পমান ছিল। স্বৈরাচার ক্ষমতা হারানোর দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়েও ভয় আর আতঙ্ক গোপন করে যেমন আস্ফালন প্রদর্শন করতেই থাকে, তেমনি ফেরাউনের মতো স্বৈরাচারী জালিমও আতঙ্ক গোপন করার উদ্দেশ্যে তার জাতিকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করছিল যে, সে মুছাকে হত্যা করতে সক্ষম। তার উপদেষ্টারা মুছাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছে বলেই মুছাকে সে হত্যা করছে না। নতুবা সে মুছাকে হত্যা করেই ছাড়তো। এ জন্যই সে দম্ভোক্তি করে বলেছিল, 'আমাকে ছাড়ো, আমি এই মুছাকে হত্যা করবো'।

আসলে আল্লাহর রাসূলের গায়ে হাত উঠানো যে কোনক্রমেই সম্ভব নয়, এ কথা সে ভালোভাবেই বুঝেছিল। এ জন্যই সে হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামের বিরুদ্ধে গোটা জাতিকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য বলেছিল, এই মুছা তোমাদের 'দ্বীন'কে পরিবর্তন করে দিবে। অর্থাৎ যে চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হচ্ছে, জাতি যে আদর্শ অনুসরণ করছে, যে সভ্যতা-সংস্কৃতি দেশে প্রচলিত রয়েছে, যে পদ্ধতিতে জাতি ধর্ম পালন করছে, যে পদ্ধতিতে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হচ্ছে, তা মুছা পরিবর্তন করে তার ওপরে যে আদর্শ অবতীর্ণ হয়েছে বলে সে দাবি করছে-সেই আদর্শ অনুসারেই সে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে শুরু করে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির ঘরের পরিবেশ পরিচালিত করবে। সে বিপ্লব সংঘটিত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

বিচার দিবসে অবিশ্বাসী স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী ও দলীয় প্রধানগণ কল্পিত 'চেতনার' ধুঁয়া তুলেই প্রতিটি যুগে মহাসত্য গ্রহণ থেকে জাতিকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করেছে। তথাকথিত

চেতনা ব্যবসায়ী স্বার্থন্বেষী অসৎ রাজনীতিবিদগণই প্রতিটি যুগেই জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে এবং ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে জাতিকে ক্ষেপিয়ে তোলার হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের ভেতরে তারা নিজেদের অবধারিত ধ্বংস দেখে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে জাতির সাথে এভাবে ধোকাবাজি করেছে যে, 'অমুক ব্যক্তিকে বা দলকে ভোট দিলে অথবা ক্ষমতায় আসতে দিলে অমুক চেতনা ভূলুণ্ঠিত হবে। জাতি স্বাধীনতা হারাবে।' এভাবেই স্বৈরাচারী গোষ্ঠী প্রতিটি যুগেই মানুষকে বিভ্রান্ত করে সত্য গ্রহণের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে।

সূরা মুমিনের উল্লেখিত আয়াতে যে দ্বীন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেই দ্বীন বলতে একটি পরিপূর্ণ আদর্শ, জীবন ব্যবস্থা ও জাতীয় দর্শন বুঝায়। এই দ্বীন শব্দটি পবিত্র কোরআনে বহুস্থানে বিচার দিবস, বিনিময়, প্রতিফল বা প্রতিদান দিবস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে সূরা যারিয়াতের ৫-৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

إِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ-وَّإِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ-

প্রকৃত বিষয় হলো, তোমাদেরকে যে ব্যাপারে অবহিত করা হচ্ছে (অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবন) তা নিশ্চয়ই বাস্তব ও যথার্থ। কর্মের প্রতিফল অবশ্য অবশ্যই দেয়া হবে।

উক্ত আয়াতে 'দ্বীন' শব্দ প্রতিফল বা বিনিময় দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে জীবন-যাপন করতো, তাদেরকেও বিনিময় দেয়া হবে, আর যারা পরকালকে অবিশ্বাস করে পৃথিবীর জীবনকেই প্রথম ও শেষ মনে করতো এবং এই ধারণার ভিত্তিতেই এরা জীবন পরিচালিত করতো তাদেরকেও বিনিময় দেয়া হবো। মৃত থেকে কিভাবে জীবিত হচ্ছে গোটা সৃষ্টিজগৎ ব্যাপী অসংখ্য নিদর্শন দেখেও এরা পরকাল সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে। পরকালের ব্যাপারে এদের ধারণা সম্পর্কে সূরা সাফ্ফাতে আল্লাহ বলেন-

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ-اَوَاٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ-قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ-

আমরা যখন মরে একেবারে মাটি হয়ে যাবো এবং থেকে যাবে শুধু হাড়ের পিঞ্জর তখন আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে, এমনও কি কখনো হতে পারে? আর আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকেও কি উঠানো হবে? এদেরকে বলো, হ্যাঁ-এবং তোমরা অসহায়।

তোমরা অসহায়-বলতে বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের কোন শক্তিই নেই। সমস্ত শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করা এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ। সেই কঠিন কাজই আমার একটি মাত্র আদেশে সংঘটিত হয়। আর আমি যা করতে ইচ্ছুক, এ ব্যাপারে তোমরা এতটাই অসহায় যে, আমার ইচ্ছা বাস্তবায়নের কাজে তোমরা কোন আপত্তিই করতে পারো না। কিভাবে সেই বিচার দিবস সংঘটিত হবে এবং তোমরা তখন কি বলবে শোন-

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ-وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ-هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ-

শুধুমাত্র একটি বিকট ধমক দেয়া হবে এবং সহসাই এরা নিজের চোখে (পরকালের ঘটনাসমূহ) দেখতে থাকবে। সে সময় এরা বলবে, হায় ! আমাদের দুর্ভাগ্য, এতো প্রতিফল দিবস–'এটা সে ফায়সালার দিন যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে'। (আস্ সা-ফ্ফাত-১৯-২১)

পৃথিবীতে মানুষ যেভাবে ঘুমিয়ে থাকে, মৃত মানুষগুলো সেই অবস্থাতেই থাকবে। মহান আল্লাহর আদেশে এমন ধরনের ভয়াবহ শব্দ করা হবে যে, সমস্ত মানুষগুলো একযোগে উত্থিত হবে। সমস্ত ঘটনাবলী তারা নিজেদের চোখে যখন দেখবে, তখন আর সন্দেহ থাকবে না যে, এটাই সেই দিন, যেদিনের কথা নবী-রাসূল, আলেম-ওলামা পৃথিবীতে বলেছে। তখন তারা পরস্পরে বলবে অথবা নিজেদেরকেই শোনাবে, এই দিনটি সম্পর্কে তোমরা মিথ্যা ধারণা পোষণ করতে। কত বড় হতভাগা তোমরা, যে পূঁজি থাকলে আজকের এই দিনে মুক্তিলাভ করা যেতো, সে পূঁজি তো আমাদের নেই।

উল্লেখিত আয়াতেও 'ইয়াও মুদ্দিন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং যার অর্থ প্রতিফল দিবস। ইবলিস শয়তান যখন আল্লাহর আদেশ পালন না করে বিতর্ক করেছিল, তখন আল্লাহ তাকে বলেছিলেন–

وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ-

প্রতিদান দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি আমার অভিশাপ। (সূরা সা-দ–৭৮)

এ আয়াতেও ইয়াও মিদ্দীন শব্দ ব্যবহার করে প্রতিদান দিবসকেই বুঝানো হয়েছে। সূরা ইনফিতারে তিনটি আয়াতে ঐ একই শব্দ ব্যবহার করে বিচার দিবস তথা প্রতিফল দিবসকে বুঝানো হয়েছে। বিচার দিবসে বিদ্রোহীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সেখান থেকে তারা মুহূর্ত কালের জন্যও বের হতে পারবে না। ঐ দিনটির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য সূরা ইনফিতারের ১৫-১৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা প্রশ্নাকারে বলেছেন–

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ-وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ-وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ-ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ-يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا-وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ-

বিচারের দিন তারা তাতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম থেকে কক্ষণই অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। আর তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি ? আবার (প্রশ্ন করি) তুমি কি জানো সেই বিচারের দিনটি কি ? সেটা ঐ দিন, যখন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না। সেদিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ারে থাকবে।

পৃথিবীতে মানুষের অবস্থা হলো, এদের মধ্যে অনেকে গুরুতর অপরাধ সংঘটিত করে। অর্থ, ক্ষমতা আর প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে অপরাধ করেও সমাজে সম্মান ও মর্যাদার আসন দখল করে বসে থাকে। বিচার পর্বের কাজে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে। ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের দিয়ে সুপারিশ করিয়ে জেল-জরিমানা থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু বিচার দিবসে কেউ কারো পক্ষে সুপারিশ করার চিন্তাও করতে পারবে না। পরিস্থিতি এমনই ভয়াবহ আকার ধারণ করবে যে, প্রতিটি মানুষ নিজের চিন্তায় উন্মাদের মতই হয়ে পড়বে। ঘটনার আকস্মিকতা আর আসন্ন বিপদের গুরুত্ব অনুধাবন করে মানুষ মাতালের মতই হয়ে পড়বে। পৃথিবীতে যে একান্ত আপনজন ছিল, যাকে এক মুহূর্ত না দেখে থাকা যায়নি, তার দিকে তাকানোর প্রয়োজনও সে অনুভব করবে না। নিজে পৃথিবীতে যা করেছিল, তার কি ধরনের প্রতিফল সে লাভ করতে যাচ্ছে, এ চিন্তাতেই সে বিভোর হয়ে থাকবে আর মনে মনে বলতে থাকবে, আজকের এদিনটি যদি কখনো না হতো–তাহলে কতই না ভালো হতো। সূরা ইমরাণের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا-وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ-تَوَدُّلَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا-

সেদিন নিশ্চয়ই আসবে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের বিনিময় লাভ করবে, সে ভালো কাজই করুক আর মন্দ কাজই করুক। সেদিন প্রত্যেকেই এই কামনা করবে যে, এই দিনটি যদি তার কাছ থেকে বহুদূরে অবস্থান করতো, তাহলে কতই না ভালো হতো।

অবিশ্বাসীরা বিচার দিবস সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। এরা বলে বিচার দিবস হবে কি হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং সন্দেহপূর্ণ একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে নিজেকে বঞ্চিত করো না। সামনে যেভাবে যা আসছে, যা পাচ্ছো, তা ভোগ করে নাও। বিচার দিবসে এদেরকে যখন উঠানো হবে এবং যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, সে সম্পর্কে এরা কোনদিন কল্পনাও করেনি। অকল্পিত বিষয় যখন বাস্তবে দেখতে পাবে, তখন এরা নিজেদের নিকৃষ্ট পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে তা থেকে মুক্তি লাভের আশায় কি করবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ বলছে–

وَلَوْاَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ-وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَاكَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ-

এসব জালিমদের কাছে যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদরাজি এবং তাছাড়াও আরো অতটা সম্পদ থাকে তাহলে কিয়ামতের ভীষণ আযাব থেকে বাঁচার জন্য তারা মুক্তিপণ হিসাবে সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু তাদের সামনে আসবে যা তারা কোনদিন অনুমানও করেনি। সেখানে তাদের সামনে নিজেদের কৃতকর্মের সমস্ত মন্দ

ফলাফল প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর যে জিনিস সম্পর্কে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো তা-ই তাদের ওপরে চেপে বসবে। (সূরা আয যুমার-৪৭-৪৮)

বিচার দিবসের অপরিহার্যতা সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন অসংখ্য যুক্তি উপস্থাপন করেছে। এমন একটি সময় অবশ্যই আসা উচিত যখন জালিমদেরকে তাদের জুলুমের এবং সৎ কর্মশীলদেরকে তাদের সৎকাজের প্রতিদান দেয়া হবে। যে সৎকাজ করবে সে পুরস্কার লাভ করবে এবং যে অসৎকাজ করবে সে শাস্তি লাভ করবে। সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি এটা চায় এবং এটা ইনসাফেরও দাবি। এখন যদি মানুষ দেখে, বর্তমান জীবনে প্রত্যেকটি অসৎলোক তার অসৎকাজের পরিপূর্ণ সাজা পাচ্ছে না এবং প্রত্যেকটি সৎলোক তার সৎকাজের যথার্থ পুরস্কার লাভ করছে না বরং অনেক সময় অসৎকাজ ও সৎকাজের উল্টো ফলাফল পাওয়া যায়, তাহলে মানুষকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, যুক্তি, বিবেক-বুদ্ধি ও ইনসাফের এ অপরিহার্য দাবি একদিন অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে। সেদিনের নামই হচ্ছে বিচার দিবস বা আখিরাত। বরং আখিরাত সংঘটিত না হওয়াই বিবেক ও ইনসাফের বিরোধী। আল্লাহ বলেন–

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ-اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ-وَالَّذِيْنَ سَعَوْفِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ

আর এ কিয়ামত এ জন্য আসবে যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে তাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন, তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিয্ক। আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা সাবা-৪-৫)

বিচার দিবসে মানুষকে এককভাবে জবাবদিহি করবে

বিচার দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে। পৃথিবীতে মানুষের কত আপনজন থাকে, শুভাকাংখী থাকে, অসংখ্য পরিচিতজন ও বন্ধু থাকে। একজন বিপদাপন্ন হলে আরেকজন তাকে সাহায্য করতে দৌড়ে আসে। আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা হলে যামিন নিতে গেলে বা হাজিরা দিতে গেলে তার সাথে কেউ না কেউ যায়। কিন্তু আল্লাহর আদালতে সে কাউকে সঙ্গী হিসাবে পাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে একাকী জবাবদিহি করতে হবে। তার কৃতকর্মের সাফাই আরেকজন গাইবে, এমনটি সেখানে হবে না। আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ-وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ

زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰؤُا-لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ-

(বিচার দিবসের দিন আদালতে আল্লাহ বলবেন) নাও, এখন তোমরা ঠিক তেমনিভাবে একাকীই আমার সামনে উপস্থিত হয়েছো, যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার একাকী সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে আমি পৃথিবীতে যা কিছু দান করেছিলাম, তা সবই তোমরা পিছনে রেখে এসেছো। এখন আমি তোমাদের সাথে সেসব পরামর্শ দাতাগণকেও তো দেখি না, যাদের সম্পর্কে তোমরা ধারণা করেছিলে যে, তোমাদের কার্যোদ্ধারের ব্যাপারে তাদেরও অংশ রয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং তোমরা যা কিছু ধারণা করতে, তা সবই আজ তোমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছে। (সূরা আল আন'আম-৯৪)

পৃথিবীতে মানুষ অসংখ্য সঙ্গী-সাথী জুটিয়ে নেয়। বৈধ-অবৈধ পথে সে সম্পদের পাহাড় রচিত করে তবুও সম্পদ আহরোণের নেশা যায় না। এসব ত্যাগ করে যেতে হবে, সেদিন এসব কোনই কাজে আসবে না। যারা সৎকাজ করেছে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালনা করেছে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকেই রব্ব হিসাবে অনুসরণ করেছে, কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গী হবে তাদের কৃত সৎকাজসমূহ। কোন বিপদ দেখা দিলে বা কোন কামনা-বাসনা পূরণের আশায় মানুষ পীর-দরবেশ-মাজার-ফকিরের কাছে ধর্ণা দিয়ে মনে করতো, এরা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে, তার মনের কামনা পূরণ করতে পারে, তাকে ধনবান বানিয়ে দিতে সক্ষম, বিচার দিবসে সুপারিশ করতে সক্ষম, সেদিন তারা কেউ কোন সাহায্য করতে পারবে না।

আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে যেসব নেতা-নেত্রীরা মানুষকে ভাতের অধিকার, ভোটের অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তির অধিকারের লোভ দেখিয়ে পরামর্শ দিতো যে, তাদেরকে সহযোগিতা করা হোক, যারা এসব প্রতারণামূলক কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে ঐসব নেতা-নেত্রীদের পেছনে ছুটেছে, তাদেরকে যখন আল্লাহর আদালতে উপস্থিত করা হবে, তখন আল্লাহ প্রশ্ন করবেন−তোমাদেরকে যারা পরামর্শ দিতো, তাদেরকে তো আজ দেখা যাচ্ছে না। তারা সবাই আজ সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

মানুষ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি স্বতন্ত্র নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর সামনে এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ব্যক্তিগত দায়িত্বের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তার সাথে অংশীদার নেই। পৃথিবীতে যতই অধিক সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ, বিপুল সংখ্যক জাতি, দল ও গোষ্ঠী বা বিপুল সংখ্যক সংগঠন একটি কাজে বা একটি কর্মপদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করুক না কেন, বিচার দিবসে আল্লাহর আদালতে তাদের এ সমন্বিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত দায়িত্ব পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হবে এবং তার যা কিছু শাস্তি বা পুরস্কার সে লাভ করবে তা হবে তার সেই কর্মের প্রতিদান−যা করার জন্য সে নিজে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দায়ী বলে প্রমাণিত হবে। এ ইনসাফের মানদন্ডে অপরের গর্হিত

কর্মের বোঝা একজনের ওপর এবং তার গোনাহের বোঝা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকবে না। সুতরাং মানুষের জন্য জ্ঞান-বিবেক ও বুদ্ধির পরিচয় হলো এটাই যে, আরেকজন কি করছে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে নিজের কর্ম কতটুকু গ্রহণযোগ্য, তার দিকে দৃষ্টি দেয়া। যদি তার মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্বের সঠিক অনুভূতি থাকে, তাহলে অন্যেরা যাই করুকনা কেন, সে নিজের সাফল্যের সাথে আল্লাহর সামনে যে কর্মধারার জবাবদিহি করতে পারবে তার ওপরই অটলভাবে দন্ডায়মান থাকা। মহান আল্লাহ বলেন-

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ-وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا-وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى-

যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, তার সৎপথ অবলম্বন তার নিজের জন্যই কল্যাণকর হয়। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, তার পথভ্রষ্টতার ধ্বংসকারিতা তার ওপরেই বর্তায়। কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল-১৫)

ময়দানে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে, যারা মনে করে-'আমরা ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত কবুল করে ইসলামের দল ভারী করলাম। কারণ সমাজে আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে, লোকজন আমাদেরকে গুরুত্ব দেয়, সম্মান করে, মর্যাদা দেয়।' এদের মনোভাব এ ধরনের যে, তারা ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়ে যেন ইসলামের প্রতি করুণা করেছে। এরা আন্দোলনে শামিল না হলে, ইসলাম কোনদিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। এ ধরনের চিন্তা-চেতনা নিয়ে যারা ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়, তাদের অনুধাবন করা উচিত-কেউ আল্লাহর রবুবিয়াত কবুল করে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হলে, এতে তার নিজেরই কল্যাণ হবে। অন্য কেউ তার কল্যাণে অংশ নিতে পারবে না। সে সৎপথ লাভ করলো, এ জন্য আল্লাহর দরবারে বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কেননা আদালতে আখিরাতে তার ব্যাপারে তাকে একাই জবাবদিহি করতে হবে, অন্য কেউ তার অবস্থা পরিবর্তন করে দিতে পারবে না। আল্লাহ বলেন-

مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ-

সেদিন তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টাকারীও কেউ থাকবে না। (সূরা আশ শূরা-৪৭)

বিচার দিবসে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হবে না

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যা করছে এবং বলছে, তার সবকিছুই তিনি দেখছেন এবং শুনছেন। তিনি কোন কিছুই ভুলে যাবেন না। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত শেষ যে মানুষটি জন্ম নেবে, অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষের বলা কথা ও কর্ম সম্পর্কে তিনি অবগত থাকবেন। তাঁর জানার ভিত্তিতে তিনি সমস্ত মানুষের বিচার করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু তিনি তা করবেন না-মানুষ যেন

নিজের কর্মের রেকর্ড ও চলমান ছবি দেখতে পায়, এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যখনই কোন মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, তখন তার সাথে দু'জন ফেরেশ্তা নিয়োগ করেন। তাঁরা সেই মানুষের কথা ও কর্মসমূহ রেকর্ড করেন। আল্লাহর প্রতি কোন মানুষ যেন এই অভিযোগ আরোপ না করে যে, তিনি আমার প্রতি জুলুম করেছেন। কারণ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ–এরা নিজেদের অপকর্মের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় আর দোষ চাপিয়ে দেয় আল্লাহর ওপরে। বিপদ দেখলে আল্লাহকে ডাকতে থাকে আর বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেই তাঁকে ভুলে যায়। এ জন্য মানুষ পৃথিবীর জীবনে যা কিছু করছে তার চলমান ছবি রাখা হচ্ছে, রেকর্ড রাখা হচ্ছে এবং কণ্ঠ শব্দও রেকর্ড করা হচ্ছে। বিচার দিবসে চলমান ছবিতে যে যখন দেখতে পাবে, কোথায় কোন অবস্থায় নির্জনে একাকী সে কি ঘটিয়ে ছিল, কবে কোনদিন কাকে কি কথা বলেছিল–তখন তার পক্ষে কোন কিছুই অস্বীকার করা সম্ভব হবে না। সেদিন কি অবস্থার সৃষ্টি হবে মহান আল্লাহ তা শোনাচ্ছেন–

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ
مِنْهُمْ اَحَدًا-وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا-لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا
كَمَاخَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا-وَوُضِعَ
الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّافِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ
يٰوَيْلَتَنَامَالِهٰذَا الْكِتَابُ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةً اِلَّا
اَحْصَاهَا-وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا-وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا-

সেদিনের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন যেদিন আমি পাহাড়গুলোকে চালিত করবো এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে সম্পূর্ণ অনাবৃত আর আমি সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে এমনভাবে ঘিরে এনে একত্র করবো যে, (পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্য থেকে) একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। এবং সবাইকে তোমার রব্ব-এর সামনে কাতারবন্দী করে পেশ করা হবে। (তখন বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাসীদেরকে বলা হবে) নাও দেখে নাও, তোমরা এসে গেছো তো আমার সামনে ঠিক তেমনিভাবে যেমনটি আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম ! তোমরা তো মনে করেছিলে আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত ক্ষণ নির্ধারিতই করিনি। আর সেদিন আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। সে সময় তোমরা দেখবে অপরাধীরা নিজেদের জীবন খাতায় যা লেখা আছে সে জন্য ভীত হচ্ছে এবং তারা বলছে, হায় ! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা কেমন খাতা, আমাদের ছোট বড় এমন কোন কিছুই এখানে লেখা থেকে বাদ পড়েনি। তাদের যে যা কিছু করেছিল সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং তোমার রব্ব কারো প্রতি জুলুম করবেন না। (সূরা আল কাহ্ফ-৪৭-৪৯)

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে নিয়ে কিয়ামতের পূর্বে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত যেসব মানুষ পৃথিবীতে আগমন করবে, তারা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাসে মুহূর্তের জন্য নিঃশ্বাস গ্রহণ করলেও তাদের প্রত্যেককে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে এবং সবাইকে একই সাথে একত্রিত করা হবে। কোথাও কেউ বাদ পড়বে না। পৃথিবীতে পঞ্চাশ বা একশজন মানুষকে একত্রে আসামী করে মামলা দায়ের করা হলে কোর্টে যখন তারা হাজিরা দেয়, তখন অনেক আসামীই উপস্থিত না থেকে অন্য কাউকে আদালতে পাঠিয়ে দেয়। মূল আসামীর পক্ষে আরেকজন হাজিরা দিয়ে আসে। বিচারক প্রত্যেক আসামীর চেহারা চিনে রাখতে পারেন না। এ জন্য আসামীগণ এ ধরনের কৌশল করে থাকে। আসামীদের নাম ধরে ডাকার সময় মূল আসামীর পরিবর্তে অন্য লোক তার উপস্থিতি জানিয়ে দেয়। মাত্র দশজন বিশজন পঞ্চাশ জন আসামীর হাজিরার ক্ষেত্রে পৃথিবীর মানুষ বিচারককে এভাবে ধোকা দেয়া যায়, কিন্তু বিচার দিবসে আল্লাহর আদালতে এভাবে ধোকা দেয়া যাবে না। সেদিন কত শতকোটি মানুষ যে আল্লাহর আদালতে একত্রে দাঁড়াবে, তা কল্পনাও করা যায় না। কোন একজন মানুষও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হবে না।

সবাইকে আপন রব্ব আল্লাহ্ তা'য়ালার সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াতে হবে। পৃথিবীতে যারা বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে সেদিন সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো, মৃত্যুর পরে পুনরায় সৃষ্টি করা অসম্ভব বলে ধারণা করতো, তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যে বিষয়টির প্রতি অবিশ্বাস করতে, এখন তো দেখলে কিভাবে তা বাস্তবায়িত হলো ! যে বিচার দিবস সম্পর্কে তোমরা তামাশা করতে, তোমাদের সেই তামাশাই আজ রূঢ় বাস্তবে পরিণত হয়েছে সেটা নিজের চোখে দেখে নাও।'

এরপর ঐসব অবিশ্বাসীদের সামনে সেই কিতাব রাখা হবে, যে কিতাবে তাদের পৃথিবীর জীবনের যাবতীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোথায় কোনদিন চার দেয়ালের মধ্যে নিভৃত কক্ষে নিজ দলীয় বা বিরোধী দলীয় প্রতিপক্ষকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল, কোনদিন কোন মুহূর্তে কোন নারীকে ধর্ষন করেছিল, কি অবস্থায় কোন ব্রান্ডের মদ পান করেছিল, কোন ফাইলে কলমের এক খোঁচা দিয়ে জাতিয় অর্থ আত্মসাৎ করেছিল, নির্দোষ প্রতিপক্ষকে আসামী বানানোর জন্য কোথায় কিভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছিল, কোন টেবিলে বসে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট তৈরী করে পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, এ ধরনের অসংখ্য অপরাধের কোনকিছুই বাদ পড়েনি।

অসংখ্য ক্রাইম রিপোর্ট সম্বলিত নিজের জীবনলিপি দেখে অপরাধীরা আযাব থেকে বাঁচার জন্য সমস্ত কিছু অস্বীকার করে বলবে, এসব কাজ আমরা একটিও করিনি। অপরাধীরা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলবে। তারা তাদের অপরাধ মেনে নিতে অস্বীকার করবে। সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলবে এবং ক্রাইম রিপোর্ট সম্বলিত নিজের জীবনলিপির নির্ভুলতাও মেনে নেবে না। ফেরেশ্‌তাদেরকে দোষারোপ করে বলবে, তারা মনগড়া রিপোর্ট রচিত করেছে, এসবের কোন কিছুই আমাদের দ্বারা ঘটেনি। তারপর সেই চলমান ছবি তাদের সামনে উত্থাপন করা হবে। অপরাধীরা দেখতে থাকবে পৃথিবীতে কোথায় তারা কি করেছিল এবং

নিজের কণ্ঠ শুনতে থাকবে, কবে কোনদিন কি বলেছিল। এরপর আল্লাহ আদেশ দেবেন, তোমাদের এসব মিথ্যা কথা বন্ধ করো এবং এখন দেখো তোমাদের নিজেদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমাদের কৃতকর্মের কি বর্ণনা দেয়। আল্লাহ বলেন–

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

আজ আমি এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এরা পৃথিবীতে কি উপার্জন করে এসেছে। (সূরা ইয়াছিন-৬৫)

শুধু যে হাত ও পা-ই সাক্ষ্য দেবে তাই নয়–যে কণ্ঠ দিয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে, আল্লাহর দেয়া বিধানের বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে কথা বলেছে, শ্লোগান দিয়েছে, সেই কণ্ঠও তারই বিরুদ্ধে আল্লাহর আদেশে বিচারের দিনে সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ

তারা যেন সেদিনের কথা ভুলে না যায় যেদিন তাদের নিজেদের কণ্ঠ এবং তাদের নিজেদের হাত-পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। সেদিন তারা যে প্রতিদানের যোগ্য হবে, তা আল্লাহ তাদেরকে পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসাবে প্রকাশকারী। (সূরা নূর-২৪-২৫)

এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীসে বলা হয়েছে, যেসব অপরাধী আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েও নিজের অপরাধের স্বীকৃতি দিবে না, তখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একে একে সাক্ষ্য দেবে যে, ঐগুলোর সাহায্যে কোথায় কি অবস্থায় কোন কাজের আঞ্জাম দেয়া হয়েছে। আখিরাতের জগত কোন আত্মিক জগৎ হবে না। বরং মানুষকে সেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে পুনরায় ঠিক তেমনি জীবিত করা হবে যেমনটি বর্তমানে তারা এই পৃথিবীতে জীবিত রয়েছে। যেসব উপাদান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অণু-পরমাণুর সমন্বয়ে এই পৃথিবীতে তাদের দেহ গঠিত, কিয়ামতের দিন সেগুলোই একত্রিত করে দেয়া হবে এবং যে দেহে অবস্থান করে সে পৃথিবীতে কাজ করেছিল পূর্বের সেই দেহ দিয়েই তাকে উঠানো হবে। আল্লাহ বলেন–

حَتّٰى اِذَا مَاجَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا-قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

পরে যখন সবাই সেখানে পৌছে যাবে তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া তারা পৃথিবীতে কি করতো সে সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের শরীরের চামড়াসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন ? (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও চামড়া) জবাব দেবে, সেই আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন যিনি প্রতিটি বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখন তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (সূরা হামীম সাজ্‌দাহ্-২০-২১)

পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের মোকাবিলায় যারা বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করেছে, এরা বিচার দিবসেও নিজেদের অপরাধ ঢাকা দেয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলবে। অনিবার্য শাস্তি ও তার ভয়াবহতা দেখে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যখন তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবে, তখন তাদের পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব ও অবিচার করার অভিযোগও তোলা মোটেও অসম্ভব নয়। এ জন্য পৃথিবীতে মানুষের জীবনলিপি-কণ্ঠস্বর রেকর্ড ও চলমান ছবি সংরক্ষণের ব্যবস্থাই শুধু করা হয়নি, পক্ষপাতহীন বিচারের লক্ষ্যে এমন এক ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, মানুষ অপরাধ সংঘটনের সময় তার দেহের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করেছিল, সেসব কিছুই যেন তার কৃতকর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে। মহান আল্লাহ এমনিতেই মানুষের অসংখ্য অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তারপরেও বান্দা যেন শাস্তিভোগ না করে, এ জন্য তিনি অত্যন্ত সুক্ষ্ম বিচার করবেন। সেদিন কারো প্রতি সামান্যতম জুলুম করা হবে না। যারা পৃথিবীতে সৎকাজ করেছে, তাদের সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর যারা অসৎ কাজ করেছে, সেই অসৎ কাজের পরিমাণ অনুযায়ীই শাস্তি প্রদান করা হবে, এর জন্য কোন বর্ধিত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে না। আল্লাহ বলেন–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا-وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى اِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ-

প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি (আল্লাহর দরবারে) সৎকাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য দশগুণ বেশী পুরস্কার রয়েছে। যে পাপের কাজ নিয়ে আসবে তাকে ততটুকুই প্রতিফল দেয়া হবে, যতটুকু সে অপরাধ করেছে। আর কারো ওপরে জুলুম করা হবে না। (সূরা আন'আম-১৬০)

'মিযান' আরবী শব্দ। যার অর্থ নিক্তি, দাঁড়িপাল্লা, পরিমাপক যন্ত্র, ওজনের মাধ্যম। কিন্তু ইসলামী শরীয়তের ভাষায় মিযান বলা হয় সেই 'পরিমাপক যন্ত্রকে যা দ্বারা পরকালে বিচার দিবসে মানুষের ভালো-মন্দ তথা নেকী ও গোনাহ ওজন করা হবে। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কোন বস্তুর আকার, আয়তন নেই, তা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে কিভাবে ? মানুষের মনে এ ধরনের প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো অজানাকে জানা। এই প্রশ্নের উত্তর দু'ধরনের হতে পারে। যথা (১) হাশরের ময়দানে নেকী ও গোনাহকে ওজন দেয়ার জন্যে মহাশক্তিশালী আল্লাহ রব্বুল আলামীন নেকী ও গোনাহের আকার, আয়তন প্রদান করতে পারেন। এ কথার সমর্থন হাদিসে পাওয়া যায়,

'বিচারে দিন মানুষ বড় বড় পাহাড়ের আকৃতিতে তাদের নেকসমূহ দেখতে পাবে।' (২) মানুষ পৃথিবীতে এক এক বস্তু ওজন করার জন্যে এক এক ধরনের পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। দাঁড়িপাল্লা দিয়ে নানা ধরনের ফসল, গোস্ত, মাছ ইত্যাদি ওজন করে। আবার পানি, তৈল, মধু, তথা তরল জিনিষ ওজন করার জন্য ভিন্ন ধরনের পরিমাপক ব্যবহার করা হয়। তরল পদার্থের ঘনত্ব পরিমাপ করা হয় ল্যাক্টোমিটার দিয়ে। তামপাত্রা ও হিমাংক্ক পরিমাপক করা হয় থার্মোমিটার দ্বারা। বায়ু বা বাতাসের চাপ পরিমাপ করা হয় বেরোমিটার দিয়ে।

সুতরাং, হাশরের ময়দানে মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার বান্দাদের সওয়াব ও গোনাহ পরিমাপ করার জন্য এমন ধরনের পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করবেন–যা পৃথিবীর মানুষ কোনদিনই কল্পনা করতে পারবেনা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানুষের সওয়াব ও গোনাহ অবশ্যই ওজন করা হবে। এখন কি দিয়ে কেমন করে ওজন দেয়া হবে সেটা আল্লাহই ভালো জানেন।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই এবং প্রত্যেক মানুষের কাছে পরিমাপকযন্ত্র হলো ইনসাফ ও ন্যায়ের প্রতীক। আবহমান কাল থেকেই পৃথিবীতে নানা পদ্ধতির পরিমাপকযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কম্পিউটার আবিষ্কার হবার পরে তার ভেতরেও পরিমাপের পদ্ধতি সংযোজন করা হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ কোন বস্তুর ওজন জানার জন্য এবং নানা ধরনের বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এই পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার এ জন্য করে যে, তারা যেন না ঠকে। বিচার দিবসেও আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের যাবতীয় সৎ ও অসৎ কর্মসমূহ ওজন করবেন।

যে মিযান বা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে, তা কোন ধরনের দাঁড়িপাল্লা বা পরিমাপকযন্ত্র হবে, সে সম্পর্কে মানুষের পক্ষে অনুমান করা কষ্টকর। আধুনিক বিজ্ঞান অত্যন্ত দ্রুত শত শত কোটি টন জিনিস ওজন করার জন্য অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির পরিমাপকযন্ত্র আবিষ্কার করেছে। যে মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাকে বাতাস, গ্যাস ও তাপ ওজন করার মতো জ্ঞান দান করেছেন, তিনি মানুষের সৎ ও অসৎ গুণাবলীর সঠিকভাবে পরিমাপ করার জন্য এমন বিশেষ ধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করবেন, যা সম্পর্কে মানুষ কল্পনাও করতে সক্ষম নয়। এই পরিমাপক যন্ত্রের নাম পবিত্র কোরআনে দাঁড়িপাল্লা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের কাছে সহজবোধ্য করার জন্যই দাঁড়িপাল্লা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًاوَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا-وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ-

কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ ওজন করার দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো। ফলে কোন ব্যক্তির প্রতি সামান্যতম জুলুম হবে না। যার তিল পরিমাণও কোন কর্ম থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসাব করার জন্য আমি যথেষ্ট। (সূরা আল আম্বিয়া-৪৭)

সেদিন আল্লাহর সুবিচারের মানদন্ডে ওজন ও সত্য উভয়ই সমার্থবোধক হবে। সত্য ব্যতিত সেদিন অন্য কোন জিনিসেই ওজন পরিপূর্ণ হবে না এবং ওজন ছাড়া কোন জিনিসই সত্য বলে

বিবেচিত হবে না। যার কাছে যত সত্য থাকবে, সে ততটা ওজনদার হবে এবং সিদ্ধান্ত যা-ই হবে তা ওজন হিসাবে ও ওজনের দৃষ্টিতেই হবে। অপর কোন জিনিসের বিন্দুমাত্র মূল্য স্বীকার করা হবে না। ইসলাম বিরোধিদের জীবন পৃথিবীতে যত দীর্ঘ হোক না কেন, যত শানশওকতপূর্ণ ও বাহ্যিক কীর্তিপকলাপে পরিপূর্ণ হোক না কেন, আল্লাহর পরিমাপকযন্ত্রে তার কোন ওজনই হবে না। মৃত্যুর পরে তার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে মহাআড়ম্বরে শোক প্রকাশ-প্রচার মাধ্যমে তার কীর্তিগাঁথা প্রচার, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে রাখা, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন, তোপধ্বনীর মাধ্যমে কবরে অবতরণ,এসবের কোন মূল্যই আল্লাহ দিবেন না।

যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কুলি-মজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছে, বাঘের বা সাপের কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তারপর তার লাশ বাঘের পেটে হজম হয়ে গিয়েছে, সে যদি আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে থাকে, আল্লাহর কাছে তার ওজন হবে অপরিসীম এবং তার মর্যাদা হবে বিরাট। পৃথিবীতে জাঁকজমকের সাথে চলাফেরা করেছে অথচ আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেনি, বিচার দিবসে সে ওজনদার হবে না। সেদিন শুধু তারাই ওজনদার হবে, পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেছে। আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ-

আর ওজন ও পরিমাপ সেদিন নিশ্চিতই সত্য-সঠিক হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারা নিজেদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে। কারণ তারা আমার আয়াতের সাথে জালিমের ন্যায় আচরণ করছিল। (আ'রাফ-৯)

আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধও অন্তরে নেই, নামাজ-রোজা আদায় করার কোন প্রয়োজন অনুভব করে না। কেউ কেউ হজ্জ আদায় করে এ জন্য যে, নির্বাচন এলে নামের পূর্বে 'আল হাজ্জ' শব্দটি ব্যবহার করে ধর্মভীরু মানুষদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার জন্য। এদের মধ্যে অনেকে বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে। অর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে এরা দেশের বিশিষ্ট নাগরিকে পরিণত হয়েছে। সাধারণ লোকজন এদেরকে মূল্য দিয়ে থাকে, সম্মান-মর্যাদা দেয়। মহান আল্লাহর আদালতে বিচার দিবসে এদের কোনই মূল্য নেই। আল্লাহ বলেন-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً-اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا-

হে রাসূল ! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ কারা ? সে লোকগুলো তারা, যারা পৃথিবীর জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সব সময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো এবং যারা মনে করতো যে, তারা সব কিছু সঠিক করে যাচ্ছে। এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রব্ব-এর নিদর্শনাবলী মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হবার ব্যাপারটি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোন গুরুত্ব দেয়া হবে না। (কাহ্ফ-১০৩-১০৫)

অর্থাৎ যাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সাধনা পৃথিবীর জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। তারা যা কিছুই করেছে আল্লাহর প্রতি সম্পর্কহীন হয়ে ও আখিরাতের চিন্তা বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীতে অর্থ-বিত্ত, ঐশ্বর্য, সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের জন্যই করেছে। পৃথিবীর জীবনকেই তারা একমাত্র জীবন মনে করেছে। পৃথিবীর জীবনে সফলতাকেই তারা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছিল। এরা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও তাঁর সন্তুষ্টি কোন কর্মের মধ্যে নিহিত এবং তাঁর সামনে বিচার দিবসে দাঁড়াতে হবে, সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে, এ কথা তারা মনে স্থান দেয়নি। তারা নিজেদেরকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সম্মান ও মর্যাদা লাভের যোগ্য একজন মনে করতো। এরা পৃথিবীর চারণ ভূমি থেকে একমাত্র নিজেদের স্বার্থোদ্ধার ব্যতিত অন্য কোন কাজ করতো না।

বিচার দিবসের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণাবলীর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তি কোন জুলুমের বোঝা বহন করে নিয়ে যাবে, সে আল্লাহর অধিকারের বিরুদ্ধে জুলুম করুক বা আল্লাহর বান্দাদের অধিকারের বিরুদ্ধে অথবা নিজের নফ্সের বিরুদ্ধে জুলুম করুক না কেন, যে কোন অবস্থায়ই সেসব কর্ম তাকে নিকৃষ্ট পরিণতি থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। বিচার দিবসের দিনে সমস্ত মানুষ যখন মহান আল্লাহর মহাপ্রতাপ দেখবে, তখন তাদের মাথা আপনা আপনিই ঝুঁকে পড়বে। আল্লাহ বলেন-

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ-وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا-وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلاَ هَضْمًا-

লোকদের মাথা চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত সত্তার সামনে ঝুঁকে পড়বে, সে সময় যে জুলুমের গোনাহের ভার বহন করবে সে ব্যর্থ হবে। আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে এবং সেই সাথে সে মুমিনও হবে তার প্রতি কোন জুলুম বা অধিকার হরণের আশঙ্কা নেই। (ত্বা-হা-১১১-১১২)

অনেক মানুষ প্রশ্ন তোলে, পৃথিবীতে অমুসলিমগণ যে সৎকর্মসমূহ করে অর্থাৎ তাদের অনেকে অসংখ্য জনকল্যাণমূলক কর্ম করে, দান করে, তাদের দ্বারা অসংখ্য মানুষ উপকৃত হয় এদেরকে বিচার দিবসের দিনে কি ধরনের প্রতিফল দেয়া হবে ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তিনি রাহ্মান ও রাহীম। তিনি কারো সৎকর্ম বৃথা যেতে দেন না। সৃষ্টিজগৎ ব্যাপী এবং এই পৃথিবীতে মানুষের টিকে থাকার জন্য প্রতি মুহূর্তে তিনি রাহ্মত বর্ষণ করছেন, এগুলো তো শুধুমাত্র

ঈমানদারগণই ভোগ করছে না, তারাও এগুলো ভোগ করছে। শুধু তাই নয়, এই পৃথিবীতে তাদের কর্মের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে এমন অসংখ্য দুর্লভ নিয়ামত ভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, যা তিনি ঈমানদারকে দেননি। আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না, স্বীকার করলেও শির্ক করে, তাদের সৎকাজের বিনিময়ে এই পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বাড়ি, গাড়ি, অঢেল সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা, যশ-খ্যাতি দান করেছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিয়ামতসমূহ ভোগ করার সুযোগ প্রদান করেছেন, তাদের মৃত্যুর পরেও তাদের কাউকে কাউকে পরম শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করেছেন, এসব তো তারা তাদের সৎকাজের বিনিময় হিসাবে লাভ করেছে। একটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যে, যে কোন সৎকাজ কবুলের ও আখিরাতে তার বিনিময় লাভের পূর্ব শর্ত হলো, ঈমানদার হতে হবে। ঈমানহীন কোন সৎকাজের বিনিময় বিচার দিবসে পাওয়া যাবে না—এই পৃথিবীতেই তার বিনিময় দিয়ে দেয়া হবে।

এদের বিপরীতে অধিকাংশ ঈমানদারদের জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, মানুষকে আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান জানাতে গিয়ে এদেরকে অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করতে হয়, জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে আবদ্ধ থাকতে হয়, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। অর্ধাহারে-অনাহারে জীবন কাটাতে হয়, জীবন-যাপনের তেমন কোন উপকরণ থাকে না, মনের একান্ত বাসনা আল্লাহর ঘরে গিয়ে আল্লাহকে সেজ্‌দা দিবে, অর্থাভাবে সে অদম্য কামনা বুকে নিয়েই কবরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির জন্য উত্তম পোষাক, উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারে না, নিজের মেধাবী পুত্র বা কন্যাকে অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা দিতে পারে না। মাথা গোঁজার জন্য এক টুকরো যমীন কিনতে পারে না, রোগাক্রান্ত হলে তেমন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না।

এরপরেও তারা সমস্ত পরিস্থিতি হাসিমুখে মোকাবেলা করে আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করে। নিজেকে অপরাধী মনে করে সেজ্‌দায় পড়ে অঝোরে কাঁদতে থাকে। পৃথিবীতে ধন-সম্পদ না চেয়ে আল্লাহর দরবারে পরকালের কল্যাণ কামনা করে। আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারকে কিয়ামতের ময়দানে তাদের কর্মের সর্বোত্তম বিনিময় দান করবেন, সেদিন কারো প্রতি সামান্য অবিচার করা হবে না। সবাই যার যার অধিকার বুঝে পাবে।

প্রতিদান ও সুবিচারের বেশ কয়েকটি রূপ হতে পারে। প্রতিদান লাভের অধিকারী ব্যক্তিকে প্রতিদান না দেয়াও অবিচার এবং জুলুম। প্রতিদান লাভকারী যতটা প্রতিদান লাভের উপযুক্ত তার থেকে কম দেয়াও অবিচার ও জুলুম। যে ব্যক্তি শাস্তি লাভের যোগ্য নয়, তাকে শাস্তি দেয়াও অবিচার এবং জুলুম। আবার যে শাস্তি লাভের যোগ্য তাকে শাস্তি না দেয়া এবং যে কম শাস্তি লাভের যোগ্য, তাকে অধিক শাস্তি দেয়াও জুলুম ও অবিচার।

জালিম শাস্তি পাচ্ছে না, নির্দোষ অবস্থায় খালাস পাচ্ছে আর মজলুম তা অসহায়ের মতো নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখছে, এটাও অবিচার ও জুলুম। একজনের অপরাধের কারণে অন্যজন শাস্তি লাভ করছে, একের অপরাধ অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, এসবই জুলুম আর অবিচারের কারণে হয়ে থাকে। বিচার দিবসে এসবের কোনকিছুই ঘটবে না। মহান আল্লাহ

কারো প্রতি কোন ধরনের জুলুম করবেন না। বিচার দিবসের দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে ভাষণে বলা হবে-

فَالْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلاَ تَجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

আজ কারো প্রতি তিলমাত্র জুলুম করা হবে না এবং যেমন কাজ তোমরা করে এসেছো ঠিক তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে। (সূরা ইয়াছিন-৫৪)

আমরা কেবল তোমরাই ইবাদাত করি

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

এ কথা আমরা পূর্বেই কয়েক বার আলোচনা করেছি যে, আল্লাহর কিতাব পবিত্র কোরআনের প্রথম সূরা-সূরা ফাতিহা একটি অভিনন্দন পত্রের মতো। আল্লাহ তা'য়ালার অসীম নিয়ামতরাজীর মধ্যে অবগাহনরত বান্দাহ্ জানে না, সে কিভাবে তাঁর মনিবের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করবে। এ কারণে তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাহ্দেরকে শিখিয়েছেন, কোন ভাষায় এবং কোন পদ্ধতিতে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে হবে। সাধারণতঃ অভিনন্দন-পত্র রচিত হয় তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। প্রথম বিষয়টি হলো, যাঁর উদ্দেশ্যে অভিনন্দন-পত্র রচিত হয় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, পরিচিতি এবং তৃতীয় বিষয়টি হলো দাবী। সূরা ফাতিহার মাধ্যমে যে আল্লাহকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হচ্ছে, তাঁর প্রশংসা করার পরে তাঁর বিশাল বিস্তৃত প্রশংসাযোগ্য পরিচিতি উল্লেখ করা হলো। প্রশংসা পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটার পরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠলো, তোমরা যারা প্রশংসা করছো, পরিচিতি পেশ করছো এবং দাবী জানাচ্ছো, তোমাদের পরিচয় কি ?

এই প্রশ্নের উত্তরও মানুষের জানা নেই। মানুষ জানে না, কে সে ? কোত্থেকে তার আগমন ? কোথায় তাকে পুনরায় যেতে হবে ? এই পৃথিবীতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি ? কে তার মনিব ? সে কার দাসত্ব করবে ? এসব প্রশ্নের জবাব মানুষের জানা নেই। পরম করুণাময় আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাঁর নবীর মাধ্যমে মানব মনের এসব স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এবং মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবগত করেছেন। সূরা ফাতিহায় আল্লাহর প্রশংসা পর্ব শেষে মানুষের পরিচয় সম্পর্কে যে স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠেছে, সে প্রশ্নের উত্তরও আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহর কাছে মানুষ তার পরিচয় এভাবে পেশ করছে যে-

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

আমরা কেবল তোমরাই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

অর্থাৎ সমস্ত শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী তুমি, তোমার একান্ত অনুগ্রহেই তুমি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছো, আমাদের জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ তুমিই প্রতি মুহূর্তে সরবরাহ করছো। তুমিই আমাদের রব্ব-তুমি আমাদের মনিব, আমাদের ইলাহ-আমাদের মাবুদ, তুমিই

আমাদের শাসক। তুমিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছো, আমরা তোমারই গোলাম। আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করি, তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি। কেননা, তুমি ব্যতিত সাহায্য করার কেউ নেই। আমরা অপারগ, আমরা শক্তিহীন, দুর্বল, অসহায়, তোমারই মুখাপেক্ষী। তুমি মহীয়ান, গরীয়ান, সর্বশক্তিমান। তুমি আমাদের মনিব এবং আমরা তোমার গোলাম–এ কারণে আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। যাবতীয় ব্যাপারে আমরা তোমারই মুখাপেক্ষী। আর এটাই হলো আমাদের পরিচয়।

বান্দাহ্ এভাবে তাঁর মনিবের কাছে নিজের পরিচয় পেশ করলো, 'আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি।' পরিচয়টা এভাবে দেয়া হলো না যে, 'আমরা তোমার দাসত্ব করি।' পরিচয় পেশ করা হলো এভাবে যে, 'আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি।' তোমার শব্দটির সাথে 'ই' যোগ করে 'তোমারই' শব্দ ব্যবহার করে একথাই দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করা হলো যে, আমরা অন্য কোন শক্তির দাসত্ব করি না, আমরা শুধু তোমরাই গোলামী করি এবং যে কোন প্রয়োজনে আমরা তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি।

সূরা ফাতিহার মধ্য দিয়ে বান্দাহ্ এই কথাটি উচ্চারণ করে সে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকৃতি দিয়ে দিল, সে অন্য কোন শক্তির আইন মানে না। সে দেশ, জাতি ও সামাজের প্রচলিত কোন প্রথা, পূর্ব পুরুষ কর্তৃক প্রচলিত কোন প্রথা, মানুষের বানানো কোন আইন সে মানে না। কারো বানানো কোন আইনের কাছে সে মাথানত করে না। সে একমাত্র মাথানত করে মহান আল্লাহর বিধানের কাছে। এ কথার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে আল্লাহর বিধানের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলো এবং নিজেকে আল্লাহর দাস বলে স্বীকৃতি দিয়ে নিজের পরিচয় পেশ করলো।

সূরা ফাতিহা নামক অভিনন্দন-পত্রে প্রথমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যে ব্যাপক ও অসীম গুণাবলীর ভিত্তিতে যে পরিচয় পেশ করা হয়েছে, তাঁর সে পরিচয়ই মানুষের মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন সৃষ্টি করে যে, সেই অনন্ত অসীম মহাশক্তিধর কল্পনাতীত গুণাবলীর অধিকারী আল্লাহর কাছে ক্ষুদ্র এই মানুষের অবস্থান কোথায় ? মহান আল্লাহ পৃথিবীর মানুষের কাছে নিজের যে শক্তি ও গুণাবলীর পরিচয় পেশ করেছেন, এর প্ররিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীতে মানুষকে কোন ধরনের ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে ? মানুষ সেই আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে একজন মহাবিজ্ঞানী কুশলী স্রষ্টা মান্য করবে না তাঁকে মানুষ নিজের গোটা জীবনের দাসত্ব লাভের একমাত্র অধিকারী মাবুদ, আইনদাতা, বিধানদাতা, প্রতিপালক এবং সার্বভৌম প্রভু বলে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরই অবতীর্ণ করা জীবন বিধান অনুসরণ করবে ? আল্লাহর প্রশংসা পর্ব শেষ করার পর পরই এ ধরনের নানা প্রশ্ন এসে মানুষের মনকে দোলায়িত করতে থাকে। এসব প্রশ্নের যুক্তি সংগত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক উত্তর লাভ না করা পর্যন্ত মানুষের অনুসন্ধানী মন কোন ক্রমেই স্থির হয় না বা হতে পারে না।

এ জন্য মানুষকে সন্দেহ-সংশয়ের আবর্ত থেকে উদ্ধার করে তার মন-মানসিকতাকে স্থির করার জন্যই সূরা ফাতিহার মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দেয়া হলো, তুমি একমাত্র আল্লাহর গোলাম এবং সেই মহান স্রষ্টার গোলামী করাই তোমার সমগ্র জীবনের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য-যে স্রষ্টার প্রশংসা তুমি করলে, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, অসীম দাতা ও দয়ালু এবং বিচার দিবসের অধিপতি-যাঁর কাছে তোমাদের জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজের চুলচেরা হিসাব দিতে তোমরা বাধ্য।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই-সূরা ফাতিহার মাধ্যমে এ কথা মানুষকে শিখিয়ে দেয়ার অর্থই হলো, মানুষের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া হলো যে, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্কটা কি। মানুষকে জানিয়ে দেয়া হলো, তোমরা শুধু আমারই দাসত্ব করবে এবং আমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে-অর্থাৎ তোমরা কেবলমাত্র আমারই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। আর এ কথাও পরিষ্কার যে, আমার মুখাপেক্ষী না হয়ে থেকেও তোমাদের কোন গত্যন্তর নেই, বিষয়টি তোমরা ভালোভাবে অবগত আছো। আমার অনুগ্রহ ব্যতিত ক্ষণকালও তোমরা তোমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারো না, আমার অনুগ্রহের ওপরেই তোমাদের সার্বিক অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এ জন্য তোমরা একমাত্র আমারই কাছে সাহায্য কামনা করবে এবং আমারই দাসত্ব করবে, এটাই তোমাদের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বস্তুত মানুষ কোন পশু বা প্রাণীর মতো জীব নয়। যারা পৃথিবীতে এ কথা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যে, মানুষের অধঃস্তন পুরুষ হলো পশু। তারা মূলতঃ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার কৌশল অবলম্বন করে গোটা পৃথিবীতে ভোগের এক ঘৃণ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন জ্ঞানবান মানুষই নিজের এই ঘৃণ্য অবস্থান কল্পনাও করতে পারে না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষ অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এ কথা আল্লাহর কোরআন মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়ে বলেছে, মানুষকে আল্লাহর গোলামী করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ জন্য তাকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। ইতর প্রাণীর যেমন কোন ভবিষ্যৎ নেই, মানুষ তেমনি ভবিষ্যৎহীন সৃষ্টি নয়। মানুষকে বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পূর্বেই এ কথা আমরা পবিত্র কোরআন থেকে উল্লেখ করেছি যে, এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তা খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। একটি বিশেষ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা গোপন রাখা হয়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেটা পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ-

আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, শুধুমাত্র এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই দাসত্ব করবে। (সূরা আয-যারিয়াত-৫৬)

বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করাই হচ্ছে মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে। আর মানুষের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা হতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে, মানুষ নিজেকে একমাত্র আল্লাহর মালিকানাধীন সত্তা স্বীকার করে নিবে এবং নিজেকে সেই গোলাম হিসাবে প্রস্তুত করবে।

কারণ মানুষ স্বয়ং নিজে উপাস্য, দাসত্ব লাভের অধিকারী, মনস্কামনা পূরণকারী, আইনদাতা ও বিধানদাতা তথা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোনক্রমেই হতে পারে না। এই অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহর। মানুষ যদি আল্লাহর দাসত্ব করা ত্যাগ করে অন্য কোন সত্তার পূঁজা-উপাসনা করে, মূল সৃষ্টি কাজে অথবা বিশ্ব-পরিচালনায়, রিযিকদানে, সৃষ্টি রক্ষায় ও সাম স্য বিধানে, প্রার্থনা মঞ্জুর করার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কোন শক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে, তাহলে তা আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে সুস্পষ্টভাবে শির্‌ক হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

পক্ষান্তরে মৌখিকভাবে এসব দিক দিয়ে আল্লাহকে স্বীকার করেও মানুষের ব্যবহারিক জীবন তথা বাস্তব জীবনের প্রতিটি বিভাগে, আইন-বিধান দান এবং সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন শক্তিকে-যেমন রাজনৈতিক নেতা, পীর-আলেম, বিচারক, সমাজপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানকে মেনে নেয়া হয় বা তাদের আনুগত্য করা হয়, তাহলেও তা মারাত্মক শির্‌ক হবে। মৌখিকভাবে আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে, নামাজ-রোজা-হজ্জ আদায় করে সেই সাথে মানুষের বানানো আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দলকে সমর্থন দিলে আল্লাহর ইবাদাত করা হয় না।

কারণ মানুষকে যে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র হৃদয়গত বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের মাধ্যমে অর্জন হতে পারে না এবং শুধুমাত্র এর নামই ইবাদাত নয়। ইবাদাতের কাজে হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে বাস্তবে তা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের দু'চারটি দিক পালন করা হলো আর গোটা জীবন বিধানই মসজিদ-মাদ্রাসায় বন্দী করে রেখে আল্লাহর ইবাদাত যেমন করা হলো না, তেমনি নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসাবে প্রস্তুত করাও হলো না। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তার সমগ্র জীবনের প্রতিটি বিভাগেই আল্লাহর গোলামী করবে তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করবে এবং সে বিধান গোটা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম করবে।

এ লক্ষ্যেই সূরা ফাতিহা নামক অভিনন্দন-পত্রে আল্লাহর শিখানো ভাষায় বান্দাহ্ নিজের পরিচয় পেশ করছে-হে আল্লাহ ! আমরা কেবল মাত্র তোমারই গোলাম, আমরা তোমারই দাসত্ব করি।

মহান আল্লাহও তাঁর বান্দাহ্কে জানিয়ে দিলেন, আমি মানুষকে সৃষ্টিই করেছি শুধুমাত্র আমার দাসত্ব করার লক্ষ্যে, মানুষ অন্য কারো দাসত্ব করবে, এ জন্য তাদেরকে আমি সৃষ্টি করিনি। মানুষ আমার দাসত্ব করবে এ জন্য যে, আমি তাদের স্রষ্টা। অন্য কোন শক্তি যখন তাদেরকে

সৃষ্টি করেনি, তখন অন্য কোন শক্তির কি অধিকার থাকতে পারে যে, তারা আমার সৃষ্টি করা মানুষের দাসত্ব লাভ করবে ? মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমি-আমিই তাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আর সেই মানুষ অন্য কোন শক্তির দাসত্ব করবে, এটা কি করে যুক্তি সংগত ও বৈধ হতে পারে ? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমার অন্যান্য সৃষ্টিকে মানুষের সেবায় নিযুক্ত করেছি, আর মানুষকে কেবলই আমার দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছি।

বস্তুতঃ পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিজগতের দিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, সমস্ত সৃষ্টিই মানুষের খেদমতে নিয়োজিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا-

প্রকৃতপক্ষে তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন। (সূরা বাকারা-২৯)

আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টিই এই মানুষের সহযোগিতায় নিয়োজিত। মানুষ যাবতীয় বস্তু নিচয়কে যেভাবে খুশী ব্যবহার করছে। কোন বস্তুই মানুষের সাথে বিদ্রোহ পোষণ করছে না। এমনটি কখনো হয়নি যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে অথচ ধাতব পদার্থ গলছে না। কোন বৃক্ষ কর্তন করা হচ্ছে, অথচ তা পূর্বের মতোই তার নিজস্ব অবস্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করতে থাকলো। আহারের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণীকে জবেহ দেয়া হচ্ছে, অথচ উদ্দেশ্যে অর্জন করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষ যে বস্তুকে যেভাবেই ব্যবহার করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, যাবতীয় বস্তু সেভাবেই সাড়া দিচ্ছে।

কেননা এসব মানুষের খেদমতের লক্ষ্যে সৃষ্টি করে তা মানুষের অধীন করে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মানুষের প্রতি এই আদেশ দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে অনুসারে মানুষ পৃথিবীর জীবন অতিবাহিত করবে, যাবতীয় বস্তু নিচয় আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যবহার করবে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্যই মানুষের সৃষ্টি। এভাবে মানুষ যদি নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন করে তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করে, তাহলে মানুষের জীবন সার্থক হবে, আর যদি সে দায়িত্ব পালনে অবহেলার পরিচয় দেয় বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে তার জীবন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে-এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ইবাদাত শব্দের প্রকৃত অর্থ

আমরা কেবল তোমরাই ইবাদাত করি-এই কথার অর্থ এটা নয় যে, আমরা নামাজ আদায় করি, তোমাকে সেজ্দা করি, রমজান মাসে রোজা পালন করি, পশু কোরবানী দিয়ে থাকি, সামর্থ হলে হজ্জও আদায় করি, তোমার নামের যিকির করে থাকি অর্থাৎ এভাবেই আমরা ইবাদাত সম্পাদন করে থাকি। আসলে ইসলামে ইবাদাত বলতে যা বোঝানো হয়েছে, সেই ইবাদাত কি-তা না বুঝার কারণেই মাত্র গুটি কয়েক আনুষ্ঠানিক কাজকেই মানুষ ইবাদাত হিসাবে গণ্য করেছে। ইবাদাত শব্দটি 'আব্দ' শব্দ থেকে নির্গত। আব্দ বলা দাস ও বান্দাহ্কে। যেমন কোরআন যে আল্লাহর বাণী এ বিষয়ে মহান আল্লাহ অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন-

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّانَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ

আমি আমার বান্দাহ্‌র প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তা আমার প্রেরিত কি-না, সেই বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনো। (সূরা বাকারা-২৩)

উল্লেখিত আয়াতে ব্যবহৃত আব্‌দ শব্দ দিয়ে 'বান্দাহ্‌কে' অর্থাৎ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তিনি শুধু রাসূল ও নবীই নন-তিনি আল্লাহর একজন বান্দাও বটে। আরবী আব্‌দ ধাতুর মৌলিক অর্থ হলো, কোন শক্তির প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার মোকাবিলায় নিজের স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করা, নিজের অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য নিঃশেষ করে দেয়া, সেই শক্তির ইচ্ছার কাছে অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করা। মূলতঃ দাসত্ব-গোলামী বা বন্দেগী করার মূল বিষয়ই এটি। একজন আরব বা আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই আব্‌দ শব্দ শোনার সাথে সাথে প্রাথমিক যে ধারণা লাভ করে তাহলো, দাসত্ব বা বন্দেগীর ধারণা। দাসের প্রকৃত কাজই হলো নিঃশর্তভাবে স্বীয় মুনিবের আনুগত্য আদেশানুবর্তিতা।

এভাবেই বিষয়টি থেকে আনুগত্যের ধারণা জন্ম নেয়। একজন দাস শুধু নিজের মুনিবের দাসত্ব, আনুগত্য এবং বন্দেগীর ভেতরে নিজেকে সমর্পিতই করে না, তার নিজের সমগ্র সত্তার সবটুকুই সমর্পণ করে দেয়। প্রতি মুহূর্তে সে মুনিবের প্রশংসা করতে থাকে, মুনিবের প্রতি বার বার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে থাকে। মুনিবের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সে সন্তুষ্ট চিত্তে দেহ-মন-মানসিকতা অবনত করে দেয়। মুনিবের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, মুনিবের ইচ্ছার বিপরীত পথে চলে, মুনিবের বিরোধিতা করে, সে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে।

ইবাদাত বলতে আনুগত্য করা, আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং বান্দাহ্ হয়ে থাকা বুঝায়। আর যিনি আনুগত্য, পূজা-উপাসনা ও দাসত্বের ক্ষেত্রে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তিনিই হলেন আব্‌দ বা বান্দাহ্। আরবী ভাষায় সাধারণতঃ 'ইবাদাত' শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দাসত্ব ও গোলামী, আনুগত্য ও আদেশানুবর্তিতা এবং পূজা-উপাসনা। সূরা ফাতিহার উল্লেখিত আয়াতে 'ইবাদাত' শব্দটি একই সময়ে ঐ তিনটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

আমরা কেবল তোমরাই ইবাদাত করি-এই বাক্যটি উচ্চারণ করে বান্দাহ্ মহান আল্লাহকে এ কথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা একমাত্র তোমারই পূজা করি। আমরা একমাত্র তোমারই অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করি এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধু তোমারই আদেশ অনুসরণ করে চলি। আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি-তোমরাই গোলামী করি। আমাদের সাথে তোমার পূজা, দাসত্ব-গোলামী, বন্দেগী, আনুগত্যের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে শুধু তাই নয়-এই সম্পর্ক অন্য কারো সাথে নেই এমনকি এই সম্পর্কের ব্যাপারে অন্য কারো সাথে আমাদের দূরতম সম্পর্কও নেই-একমাত্র তোমারই সাথে আমাদের ঐ সম্পর্ক বিদ্যমান।

সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শুধুমাত্র নামাজ-রোজা-হজ্জ আদায় করা, তসবীহ্ ও

যিকির করার নামই ইবাদাত নয়–সমগ্র জীবনের প্রতিটি বিভাগে আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন অনুসরণ করার নামই হলো ইবাদাত। মহান আল্লাহ বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ–

হে ঈমানদারগণ ! যদি তোমরা যদি প্রকৃত পক্ষেই একমাত্র আল্লাহরই বান্দাহ্ হয়ে থাকো, তাহলে যে সব পবিত্র দ্রব্য আমি তোমাদের দান করেছি, তা অসংকোচে খাও এবং আল্লাহর শোকর আদায় করো। (সূরা বাকারা-১৭২)

আরবের ইতিহাসেই শুধু নয়, গোটা পৃথিবীর ইতিহাসেই দেখা যায় যে, মানুষ নানা ধরনের প্রথার অনুসরণ করে আসছে। পূর্বপুরুষগণ যেসব প্রথা অনুসরণ করেছে, সেসব প্রথাসমূহ কোন ধরনের বিচার বিবেচনা ব্যতিতই অন্ধভক্তির সাথে পালন করা হচ্ছে। এই পৃথিবীতে মানুষ কোন কোন দ্রব্য আহার করে জীবন ধারণ করবে, সে ব্যাপারেও মানুষ নানা ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। কোন কোন জনগোষ্ঠী নির্বিচারে যে কোন পশু-প্রাণী আহার করছে, আবার কোন জনগোষ্ঠী কিছু সংখ্যক পশু-প্রাণীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে তা আহার করা থেকে বিরত থাকছে। এ ধরনের প্রথা সে যুগে আরবেও বিদ্যমান ছিল। ইসলাম কবুল করে মুসলমান হিসাবে নিজেদেরকে দাবী করার পরে কোন ধরনের আইন-বিধান বা প্রথার অনুসরণ করার কোন অবকাশ আর থাকে না।

এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, ঈমান এনে মানুষ যদি একমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসারী হয়ে থাকে, তাহলে মুখে মুখে সে দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজপতি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে চলে আসা অবাঞ্ছিত প্রথা, আইন-বিধানের যে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে, তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা বৈধ করেছেন, তা অসংকোচে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করতে হবে। আর তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে অবশ্যই দূরে অবস্থান করতে হবে। তাহলেই ইবাদাতের হক আদায় হবে এবং মুসলমান হওয়া যাবে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামাজ আদায় করে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবেহ করা জন্তু আহার করে সে মুসলমান।' অর্থাৎ নামাজ আদায় করা ও কিবলার দিকে মুখ করার পরও একজন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে জাহিলী যুগের সমস্ত বাধা-নিষেধ, পূর্বপুরুষদের অবাঞ্ছিত প্রথাসমূহ, মানুষের বানানো আইন-বিধানের প্রাচীর চূর্ণ না করবে এবং মানব সৃষ্ট অমূলক ধারণা বিশ্বাস ও কুসংস্কারের আবর্জনা থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি ইসলামের অমীয় সুধায় সঞ্জীবিত হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম বলে দাবী করার পরও মানুষের বানানো বাধা-বন্ধনের প্রভাব যার ভেতরে বর্তমান থাকবে, তাহলে বুঝতে হবে–সে ব্যক্তির শিরা-উপশিরায় মানব সৃষ্ট বিধানের বিষাক্ত ঘৃণিত ভাবধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

ইবাদাত বলতে কি বুঝায়, তা উল্লেখিত আয়াত স্পষ্ট করে দিল যে, তোমরা যদি সত্যই আমার গোলাম হয়ে থাকো, প্রকৃতপক্ষেই যদি তোমরা নেতা-নেত্রীদের আনুগত্য, আদেশানুবর্তিতা পরিত্যাগ করে আমার আনুগত্য গ্রহণ করে থাকো, তাহলে যে কোন ব্যাপারে নেতা-নেত্রীদের মনগড়া বিধানের পরিবর্তে আমার দেয়া বিধান অনুসরণ করতে হবে।

ইবাদাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। ইবাদাত বলতে কি বোঝায় তা অনুধাবনে যদি আমরা ব্যর্থতার স্বাক্ষর রাখি, তাহলে আমাদের মানব জনম বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে চিরতরে হারিয়ে যাবে। পরিণামে আদালতে আখিরাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবো। মানুষের জীবনে সফলতা আর ব্যর্থতা নির্ভর করে এই ইবাদাত করার ওপর। ইবাদাত হলো, মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। ইবাদাতের ক্ষেত্রে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণের ক্ষেত্রে যে শক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধার সৃষ্টি করে, সে শক্তিকে কোরআনের ভাষায় তাগুত বলা হয়।

তাগুত হলো সেই শক্তি, যে শক্তি শুধু নিজেই আল্লাহর আইন অমান্য করে না–অন্যদেরকেও অমান্য করতে বাধ্য করে। এই তাগুতকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারলে ইবাতাদের পরিপূর্ণ হক যেমন আদায় করা যাবে না, তেমনি ইবাদাতও হবে শিরক মিশ্রিত। আর শিরক মিশ্রিত ইবাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর নাজিল করা বিধান পালনের ক্ষেত্রে যে শক্তি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তাকেই তাগুত বলা হয়। আল্লাহর আইন অনুসারে এক ব্যক্তি তার ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবন পরিচালিত করতে চায়, এ ক্ষেত্রে যদি তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে তারা হবে তাগুত। সামাজিক জীবনে সে আল্লাহর বিধান পালন করতে চায় অথচ সমাজপতি এ ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করছে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান পালন করতে চায়, রাষ্ট্র তাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। দলীয়ভাবে সে কোরআন-সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে চায়, অথচ সে দল আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথে তাকে অগ্রসর করাতে চায়।

এভাবে যে শক্তি আল্লাহর বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তারাই আল কোরআনের ভাষায় তাগুত হিসাবে চিহ্নিত হবে। এখন আল্লাহর আদেশ অনুসরণ না করে যারা তাগুতের আদেশ অনুসরণ করেছে, তাগুতের ইচ্ছার কাছে মাথানত করেছে, তারা আল্লাহর গোলাম না হয়ে তাগুতের গোলাম হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন, তারা তাগুতের গোলামী থেকে মানুষকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলাম বানানোর লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ–

তোমার পূর্বে আমি যে রাসূল প্রেরণ করেছি, তাঁকে আমি ওহীর দ্বারা অবগত করেছি যে, আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা শুধুমাত্র আমারই দাসত্ব করবে। (সূরায়ে আম্বিয়া,আয়াত নং-২৫)

যত সংখ্যক নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে এসেছেন, তাঁরা সবাই মানুষের প্রতি ঐ একই আহ্বান জানিয়েছেন যে, তারা যেন এক আল্লাহর ইবাদাত করে। একমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ্ বলে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর অনুসরণ করে। সমস্ত নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ জাতির প্রতি এভাবে আহ্বান জানিয়েছেন–

يقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ-

হে আমার জাতি, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতিত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। (সূরা আল আরাফ-৮৫)

ইলাহ যেমন দু'জন হতে পারে না–তেমনি ইবাদাতও দু'জনের করা যেতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল ঘোষণা করেন–

وَقَالَ اللّٰهُ لاَ تَتَّخِذُوْا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ-اِنَّمَا هُوَاِلٰهٌ وَّاحِدٌ-فَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ-وَلَهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا-اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ-

আল্লাহর আদেশ হলো, দুই ইলাহ গ্রহণ করো না, ইলাহ তো মাত্র একজন, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো। সমস্ত কিছু তাঁরই, যা আকাশে রয়েছে এবং যা রয়েছে এই পৃথিবীতে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে একমাত্র তাঁরই নিয়ম-পদ্ধতি সমগ্র বিশ্ব জাহানে চলছে। এরপরও কি তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভয় করবে ? (সূরা আন্ নাহ্ল-৫১-৫২)

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইবাদাতের অর্থ হলো–মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা আন্তর্জাতিক জীবনে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা। কেউ যদি রাজনীতি করতে চায় বা রাজনৈতিক দলের একজন হয়ে কাজ করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই কোরআনের বিধান অনুসারে তা করতে হবে। আল্লাহ ও রাসূলকে বাদ দিয়ে তথা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করবে, তারা অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর দাস হিসাবে চিহ্নিত না হয়ে তাগুতের গোলাম হিসাবে চিহ্নিত হবে। জীবনের একটি বিভাগে আল্লাহর ইবাদাত করা হবে, আর অন্যান্য বিভাগে তাগুতের ইবাদাত করা হবে, এ ধরনের শির্কপূর্ণ ইবাদাত গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করতে হবে। আল্লাহ বলেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَيُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا-

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের রব্ব-এর দীদার প্রত্যাশা করে, তার উচিত সৎকর্ম করা এবং নিজের রব্ব-এর ইবাদাতের সাথে অন্য কারো ইবাদাতকে শরীক না করা। (সূরা সূরা কাহ্ফ-১১০)

নামাজে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানুষ বারবার এই স্বীকৃতিই দিচ্ছে যে, আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যে ব্যক্তি এ কথার স্বীকৃতি দিচ্ছে, আর নামাজ শেষেই সেই ব্যক্তি রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত করছে আল্লাহর বিধানের বিপরীত আইন দিয়ে, বিচারকের আসনে আসীন হয়ে বিচার কার্য পরিচালিত করছে মানুষের বানানো আইন দিয়ে, রাজনৈতিক অঙ্গনে রাজনীতি করছে কোরআন-সুন্নাহর বিপরীত আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করছে, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে, দেশের জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস–আল্লাহর মোকাবিলায় এ ধরনের শির্কমূলক কথা বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে, এভাবে আল্লাহর সাথে যারা মোনাফেকী করছে, তারা অবশ্যই তাগুতের গোলামী করছে।

ইবাদাতকে সীমিত কোনও একটি অর্থে সীমিত করা মূলতঃ ইসলামকেই সীমিত করার নামান্তর। যারা এই সীমিত ধারণা নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাদের ইবাদাত হবে অসম্পূর্ণ–অসমাপ্ত। মনে রাখতে হবে, এই অসম্পূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার জন্য কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটেনি। নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে পরিপূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। সাহাবগণ রক্ত দিয়েছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত দিয়েছেন পরিপূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার জন্যেই। শির্কপূর্ণ ইবাদাত উৎখাত করে পরিপূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

ইবাদাতের ব্যাপক অর্থ ও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি

মিরাজ উপলক্ষ্যে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের যে চৌদ্দটি মূলনীতি দান করেছিলেন, তা সূরা বনী ইসরাঈল-এ বর্ণিত হয়েছে। সেই চৌদ্দটি মূলনীতির প্রথম নীতিই হলো–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ–

তোমার রব্ব ফায়সালা করে দিয়েছেন, তোমরা কারো ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৩)

অর্থাৎ তোমার রব্ব-এর পক্ষ থেকে এটা চূড়ান্ত রূপে ফায়সালা হয়ে গিয়েছে যে–দাসত্ব, গোলামী ও আনুগত্য করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর গোলামী ব্যতিত অন্য কারো গোলামী করা যাবে না। পূজা-উপাসনা করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর, অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোন ধরনের গোলামী, দাসত্ব-আনুগত্য ও পূজা-উপাসনা করার কোন অবকাশ মানুষের জন্য নেই। এখন আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে, এই গোলামী, দাসত্ব-আনুগত্য ও পূজা-উপাসনা কি জিনিস এবং মানুষকে কেন এটা করতে হবে।

এ কথা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মানুষ কারো না কারো আনুগত্য করতে চায়। মানুষ যত বড় শক্তির অধিকারীই হোক না কেন, একটা অবলম্বন সে চায়। কোন অসহায়

দুর্বল মুহূর্তে সে একটা অবলম্বন চায়। মনস্তত্ববিদগণ গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, প্রতিটি মানুষের মনই চেতনভাবেই হোক আর অবচেতনভাবেই হোক, এমন একটি শক্তিকে অবলম্বন করতে চায়-যে শক্তির কাছে সে নিজেকে নিবেদন করবে। তার মনের একান্ত কামনা-বাসনাগুলো সে নিবেদন করে নিজেকে ভারমুক্ত করবে। প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রণায় মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হলে, সে যন্ত্রণা মানুষ কারো না কারো কাছে নিভৃতে নির্জনে ব্যক্ত করতে চায়। দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান এমন একটি অবলম্বন সে পেতে চায়, যার কাছে সে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে, নিজের মনকে হালকা করতে চায়। তার মনের অব্যক্ত যন্ত্রণাগুলো, অবিকশিত কথাগুলো কারো কাছে ব্যক্ত করে, বিকশিত করে নিজেকে বোঝা মুক্ত করতে চায়। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও সৃষ্টিগত স্বভাব।

ঠিক তেমনি, মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিজেকে স্বাধীন রাখতে পারে না এবং সে ক্ষমতা মানুষের নেই। যেহেতু কোন মানুষই প্রবৃত্তি মুক্ত নয়-প্রবৃত্তি প্রবিষ্ট করেই মানুষকে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। মানুষের এই প্রবৃত্তির মধ্যেই সৃষ্টিগতভাবে নিহিত রয়েছে অন্য কারো আনুগত্য করা। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি হলো, সে কাউকে অসীম শক্তিধর, ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী মনে করবে এবং কারো না কারো আনুগত্য করবে, কাউকে একান্ত আপন ভাববে, কারো কাছে সাহায্য কামনা করবে, কারো আদেশ-নির্দেশের মুখাপেক্ষী হবে, চরম বিপদের মুহূর্তে সে কোন শক্তিকে একমাত্র অবলম্বন মনে করবে। এই স্বভাব মানুষের সমগ্র সত্তার মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ জন্য আনুগত্য করা, কোন প্রয়োজনের সামনে নিজেকে নত করে দেয়া মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। এই স্বভাবজাত প্রবৃত্তি থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়।

ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত্তি করা ব্যতিত কোন মানুষের পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব নয়। ক্ষুধা অনুভূত হলে সে অনুভূতি দূরিভূত করার লক্ষ্যে খাদ্যের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করলেই ক্ষুধার অনুভূতি দূর হয়ে যায়। অর্থাৎ ক্ষুধার উদ্রেক হলে মানুষ খাদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। ঠান্ডা অনুভূত হলে মানুষ শীতবস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। উষ্ণতা অনুভূত হলে মানুষ শীতলতা অনুসন্ধান করে অর্থাৎ শীতল বাতাস বা পরিবেশের আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃষ্টি তাকে সিক্ত করে দিতে পারে, এ জন্য সে মাথার ওপরে কোন আচ্ছাদনের আশ্রয় গ্রহণ করে।

নিজের মনের কথা ব্যক্ত করার প্রয়োজনে অর্থাৎ ভাবের আদান-প্রদান করার জন্য সে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে। ভীতিকর অবস্থা থেকে মানুষ নিরাপত্তার অনুসন্ধান করে। এসব হলো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং এই সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাড়িত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মানুষের সমগ্র সত্তার মধ্যে পূজা-উপাসনার প্রেরণা-অনুভূতি প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কারো না কারো সামনে সে মাথানত করে নিজেকে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করবে, কারো আনুগত্য করবে, এই প্রেরণা মানুষের সমগ্র চেতনার মধ্যে বিরাজ করছে।

বন্দেগী এবং আনুগত্যের মূল বিষয় হচ্ছে, নিজেকে কোন উচ্চতর শক্তি বা সত্তার সামনে মাথানত করে দেয়া। আরবী ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে, ইযহারে তাযাল্লুল। অর্থাৎ নিজেকে ছোট করা। এই নিজেকে ছোট করার বিষয়টি কিন্তু মোটেও তুচ্ছ করার বিষয় নয়।

মাথানত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে যেমন শ্রেষ্ঠ–তার মাথাও নত হবে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির সামনে। সমস্ত শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, সুতরাং তাঁর সামনেই কেবল মানুষ মাথানত করতে পারে, অন্য কোন শক্তির সামনে অবশ্যই নয়। পৃথিবীর পশু-প্রাণীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আহার গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা মাথা নীচু করে খাদ্যের কাছে নিয়ে যায়, তারপর খাদ্য গ্রহণ করে। গরু, ছাগল, উট, ঘোড়া মাথা নীচু করে খাদ্য গ্রহণ করে। হাঁস, মুরগী ও অন্যান্য পাখী খাদ্যের সামনে মাথা নীচু করে খাদ্য গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। সে খাদ্যের সামনে মাথা নীচু করবে না, তাকে হাত দেয়া হয়েছে। হাত দিয়ে খাদ্য উঠিয়ে সে মুখে দিবে। এই বিষয়টি থেকে মানুষের জন্য শিক্ষনীয় হলো, মানুষের এই মাথা কারো কাছে নত হবে না। যিনি খাদ্যদান করেছেন, কেবলমাত্র তাঁরই কাছে মাথানত হবে।

আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করছি। ১৯৯৬ সনে আমাকে যখন আমার নিজের এলাকা ফিরোজপুর সদর এক নম্বর আসন থেকে এলাকার জনগণ পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত করে জাতীয় সংসদে পাঠালো, তখন পার্লামেন্টে একটি বিষয় আমি অবাক-বিস্ময়ে অবলোকন করলাম। কারণ ইতিপূর্বে আমি কখনো পার্লামেন্ট সদস্য হিসাবে সংসদ ভবনে প্রবেশ করিনি। সংসদ সদস্য হিসাবে জীবনের সর্বপ্রথম আমি সংসদ ভবনে প্রবেশ করার সময় অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্য সংসদে প্রবেশ করার সময় মাথা নীচু করে প্রবেশ করছে এবং বের হবার সময়ও ঐ একই ভঙ্গিতে বের হচ্ছে। মনে হচ্ছে তারা যেন রুকু সেজদা দিয়ে আসা-যাওয়া করছে। বিষয়টি আমাকে অবাক করলো। বিস্মিত দৃষ্টিতে বিষয়টি আমি অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম। সে মুহূর্তে বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে প্রবীণ একজনকে আমি প্রশ্ন করলাম, লোকজন এভাবে রুকু সেজদা দেয়ার মতো করে আসা-যাওয়া করছে কেন ?

তিনি আমাকে জানালেন, পার্লামেন্টের রুল্‌স অব প্রসিডিওর-এ বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে যে, এভাবে মাথা নীচু করে প্রবেশ করতে হবে এবং বের হবার সময়ও সেই একই ভঙ্গিতে বের হতে হবে। যে বিধি-বিধান দিয়ে সংসদ পরিচালনা করা হয়, আমি সেই রুল্‌স অব প্রসিডিওর গ্রহণ করে তা পাঠ করে দেখলাম তার ভেতরে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৭ (২) বিধি অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের সংসদে প্রবেশ ও সংসদ থেকে বের হওয়ার সময় মাথা ঝুঁকানোর নির্দেশ রয়েছে। বিষয়টি আমাকে চরমভাবে ব্যথিত করলো। কারণ এই রীতি বা নির্দেশ ইসলামের বিধানের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। একজন মুসলমান একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত আর কারো কাছে মাথানত করতে পারে না। কেউ যদি তা করে তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ শির্‌ক। এই বিধি কোন মুসলমান অনুসরণ করতে পারে না।

সংসদে কেউ ইচ্ছে করলেই কথা বলতে পারে না। কথা বলতে হলে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে কথা বলতে হয়। আমি কার্যপ্রণালী বিধি পড়লাম। বাংলাদেশের সংবিধান

পড়লাম। এভাবে বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করে কয়েক দিন পর কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করলাম। আমি স্পীকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললাম, এই সংসদের একটি বিষয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে–যা সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে উল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে কার্যপ্রণালী বিধিতে যা উল্লেখ রয়েছে, সেটা আবার দেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ম ধারায় উল্লেখ রয়েছে–সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি। আমাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। সংবিধানে যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি–বলা হয়েছে, সেখানে এই সংসদে তার বিপরীত প্রথা চালু করা হয়েছে। মাথানত করে আপনাকে সম্মান প্রদর্শনের যে রীতি এই সংসদে প্রচলিত রয়েছে, তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী এবং শির্ক। কারণ মানুষ সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত আর কারো সামনে মাথানত করতে পারে না। মাথানত করে সম্মান প্রদর্শন করার এই প্রথা সম্পূর্ণ শির্ক–আর শির্ক সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ-

নিঃসন্দেহে শির্ক হলো বড় ধরনের জুলুম। (সূরা লুক্মান-১৩)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'তোমার দেহকে যদি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হয়, তোমাকে যদি জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া হয়, তবুও তুমি শির্কের প্রতি স্বীকৃতি দিবে না।' সুতরাং এই সংসদে স্পীকারকে মাথানত করে সম্মান প্রদর্শনের যে প্রথা চালু রয়েছে, তা সম্পূর্ণ শির্ক, এটা কবীরা গোনাহ্–এই প্রথা হারাম। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি থেকে এই প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার প্রতি এটা দায়িত্ব ছিল এই শির্কের প্রতিবাদ করা। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। যদি সেই হারাম বিধি বিলুপ্ত করা না হয় তাহলে আপনি এবং এই সংসদে যারা আছেন, যারা এই প্রথা অনুসরণ করবেন–তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে আসামী হিসাবে পরিগণিত হবেন।'

ইযহারে তাযাল্লুল–মানুষ নিজেকে ছোট করবে একমাত্র আল্লাহর সামনে–অন্য কারো সামনে নয়। আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো সামনে মানুষ মাথানত করতে পারে না। বিভিন্ন দেশের আদালতে উকিল বিচারককে লক্ষ্য করে বলে থাকে, 'মাই লর্ড–My lord অর্থাৎ আমার প্রভু। মনে রাখতে হবে, মানুষের প্রভু হলেন একমাত্র আল্লাহ। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের প্রভু কোনক্রমেই হতে পারে না। এভাবে কাউকে সম্বোধন করা সম্পূর্ণ হারাম। এসব হারাম প্রথা অমুসলিমগণ আবিষ্কার করে তা চালু করেছে। এসব প্রথা কোন মুসলমানের জন্য অনুসরণ করা বৈধ নয়।

প্রাকৃতিক আইন বনাম ইবাদাত

বন্দেগী বা আনুগত্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য বিষয়টি সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে। এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন চাকর তার মনিবের আনুগত্য করে। মনিব যা আদেশ করে, চাকর তা নিঃশর্তভাবে পালন করে থাকে। আনুগত্যের বিষয়টিকে আরো বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করতে

গেলে বলা যায়, একটি দেশের জনগণ সে দেশের সরকারের আনুগত্য করে থাকে। প্রতিষ্ঠিত সরকার কর্তৃক জারীকৃত আইনের আনুগত্য জনগণ করে থাকে। মানুষ চেতনভাবেই হোক বা অবচেতনভাবেই হোক সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে, বিচারালয়ে, স্থলপথে যান-বাহনে, আকাশ যানে, শিক্ষাঙ্গনে, রাজপথে তথা সর্বত্র দেশের সরকারের আনুগত্য করে থাকে। আকাশ যান পরিচালনার ক্ষেত্রে যে আইন প্রচলিত রয়েছে, তার বিপরীত কোন যাত্রী ভ্রমণ করতে পারে না। যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় যাত্রীকে সে আইন অনুসরণ করেই আকাশ যানে পরিভ্রমণ করতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে এভাবে বলা যেতে পারে যে, যত সংখ্যক মানুষ যে সরকারের কর্তৃত্ব সীমায় বসবাস করে এবং সরকারী আইনের অনুবর্তন করে, তারা সরকারের আনুগত্য করছে। এ কথাটিকে আরবীতে বলতে গেলে বলতে হবে, জনগণ সরকারের ইবাদাত করছে, আনুগত্য করছে, গোলামী করছে-দাসত্ব করছে।

ইবাদাতের এই ধারণাকে আরো বিস্তৃত অঙ্গনে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি জিনিসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, সৃষ্টির সর্বত্রই একটি নিয়ম ক্রিয়াশীল। সমস্ত সৃষ্টিই একটি বিশেষ নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বৃক্ষ, তরু-লতা, সাগর-মহাসাগর, বিশাল জলধী, মৃদু-মন্দ বেগে বা দ্রুত বেগে প্রবাহিত সমীরণ, জীব-জগতের প্রতিটি স্পন্দন, পাহাড়-পর্বত, অটল-অচল হিমাদ্রী, উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম ও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বর্ধিতকরণ, সবুজ শ্যামল বনানীতে পাখীর কুঞ্জন, জীবের বংশবৃদ্ধিকরণ ও নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে তার অপসারণ, মহাশূন্যে গ্রহ-উপগ্রহের নিয়ন্ত্রিত বিচরণ, বায়ুমন্ডলের কার্যকরণ, গ্যাসীয় স্তরসমূহের সতর্ক বিচরণ, তাপের আধার সূর্যতাপের ভূ-পৃষ্ঠে নিয়ন্ত্রিত আগমন-এসবের দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, তারা নিঃশর্তভাবে কারো আইন অনুসরণ করছে, আইনের আনুগত্য করছে তথা কোন শক্তির ইবাদাত করছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ-

এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্যের পন্থা পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করতে চায় ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর নির্দেশের অধীন হয়ে আছে। (সূরা আলে ইমরান-৮৩)

মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা কি আমার দেয়া জীবন ব্যবস্থা ত্যাগ করে অন্যের বানানো জীবন ব্যবস্থা অনুসন্ধান করো ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, তার সব কিছুই আমার সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছে।

এই ভূ-পৃষ্ঠের একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণা থেকে শুরু করে ঐ বিশাল বিস্তৃত মহাশূন্যে বিচরণশীল দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান গ্রহ-উপগ্রহ-নিহারিকাপুঞ্জ, নক্ষত্র জগৎ অবধি যা কিছু যেখানে রয়েছে, তার সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর নিয়মের আনুগত্য করছে তথা আল্লাহর ইবাদাত করছে।

এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ছুবহানাহু তা'য়ালা যে আইন জারী করেছেন, তার বিপরীত কিছু করা বা তার ব্যতিক্রম করার কোন অবকাশ নেই। এমনটি নয় যে, সৃষ্টির এসব কিছু মানুষের মতো ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহর আইন কিছুটা অনুসরণ করছে আবার অন্যের আইনও কিছুটা অনুসরণ করছে। সৃষ্টির এসব বস্তু শির্ক মিশ্রিত ইবাদাত করছে না, তারা পরিপূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত রয়েছে। এভাবে গোটা বিশ্বচরাচর ইবাদাত, দাসত্ব, গোলামী, আনুগত্য, পূজা-উপাসনা করছে একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার শক্তি কারো নেই। এটাকেই ইংরেজী ভাষায় বলা হয় Law of nature। আরবী ভাষায় বলা যেতে পারে কানুনে ফিতরাত আর বাংলায় বলা হয় প্রাকৃতিক আইন। এই আইনকে লংঘন করার ক্ষমতা কারো নেই।

সমগ্র সৃষ্টিজগৎ যে আইন অনুসরণ করে চলেছে অর্থাৎ সৃষ্টি জগতসমূহ ও তার যাবতীয় বস্তু যে বন্দেগী বা ইবাদাত করছে, পবিত্র কোরআন এই ক্রিয়াশীল পদ্ধতিকে তথা বন্দেগী বা ইবাদাতকে নানা শব্দে উপস্থাপন করেছে। কোরআন কোথাও এটাকে সরাসরি ইবাদাত হিসাবে উল্লেখ করেছে, আবার কোথাও তাকদীস বলেছে, কোথাও তাস্‌বীহ আবার কোথাও সুজুদ শব্দে প্রকাশ করেছে। কোন কোন স্থানে কুনুত শব্দেও বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ফেরেশ্‌তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছুই আল্লাহর এবং যেসব ফেরেশ্‌গণ তাঁর নিকটে রয়েছে তারা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করছে। বন্দেগী করার ভেতরে কোন ধরনের ত্রুটি করছে না। তারা রাত দিন তাঁর প্রশংসা কীর্তনে মাথানত করে কোন ধরনের শৈথিল্য ছাড়াই আল্লাহর আনুগত্য করছে।'

ফেরেশ্‌তাদের মানুষের ন্যায় বিশ্রামের প্রয়োজন নেই, তারা বিরামহীনভাবে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে যাচ্ছে। কত সংখ্যক ফেরেশ্‌তা আল্লাহ ছুব্‌হানাহু তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন, তার কোন পরিসংখ্যান জানার কোন উপায় মানুষের কাছে বিদ্যমান নেই। অসংখ্য ফেরেশ্‌তা সেজদায় নিয়োজিত রয়েছেন, রুকু সেজদায় রয়েছেন, দাঁড়িয়ে রয়েছেন, যার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তারা সে দায়িত্ব কোন ধরনের শৈথিল্য ছাড়াই বিরামহীন গতিতে পালন করে যাচ্ছেন। এভাবে সৃষ্টির সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর আনুগত্য করে যাচ্ছে।

আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে সৃষ্টির সমস্ত কিছুর আনুগত্যকে ইবাদাত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে, তার সমস্ত কিছুই ঐ মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ মহাপবিত্র শাসকের গুণ-কীর্তন করছে।'

সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছু আল্লাহর আনুগত্য করছে, এ বিষয়টিকে উল্লেখিত আয়াতে তাস্‌বীহ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ইউছাব্বিহু লিল্লাহি-আল্লাহর তাস্‌বীহ পড়ছে, ছাব্বাহা-ইউছাব্বিহু-তাছ্‌বিহান-অর্থাৎ তাস্‌বীহ পড়েছে, তাস্‌বীহ পড়ছে এবং তাস্‌বীহ পড়বে। এই পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আকাশ ও যমীনের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে, তার সমস্ত কিছুই আল্লাহর তাস্‌বীহ পড়তে থাকবে। হযরত ইউনুছ আলাইহিস্‌ সালাম ঘটনাক্রমে মাছের পেটে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি জীবিত থাকবেন এমন আশা ছিল না। বিশাল আকৃতির মাছ তাকে পেটে নিয়ে সাগরের অতল তলদেশে অবস্থান করছিল।

তিনি মাছের পেটে গভীর অন্ধকারে অবস্থান করে শুনতে পেলেন, সমস্ত দিক থেকে মহান আল্লাহর তাস্‌বীহ পাঠ করা হচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশের ক্ষুদ্র বালুকণা, শৈবালদাম, পাথরের নুড়িসহ সমস্ত কিছু আল্লাহ নামের যিকির করছে। এভাবে গোটা সৃষ্টিজগত থেকেই আল্লাহ নামের আওয়াজ ভেসে আসছে। এই যিকির শোনর মতো কান যাদের আছে, তাঁরা শুনতে পান। আল্লাহ বলেন–

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ-وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ-

সাত আকাশ–যমীন এবং তার মধ্যে যতসব বস্তু আছে–সকলেই আল্লাহর তসবীহ পড়ছে। এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রশংসা-স্তুতির সাথে তাঁর তসবীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ বুঝতে পারো না। (সূরা বনী ইসরাঈল-৪৪)

এ আয়াতেও তসবীহ শব্দ দিয়ে সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তু যে ইবাদাতে রত রয়েছে-আনুগত্য করছে, তা বুঝানো হয়েছে। সূর্য-চন্দ্র, বৃক্ষ, তরু-লতা আল্লাহর বন্দেগী, দাসত্ব বা আনুগত্য করে যাচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ-وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ-

চন্দ্র-সূর্য সবাই পরিক্রমণে নিয়োজিত। তারকামালা ও বৃক্ষরাজি আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করে আছে। (সূরা রাহ্‌মান-৫-৬)

এ আয়াতে ইয়াছজুদান শব্দের মাধ্যমে প্রকৃতির সকল বিষয়ের আনুগত্যকে বুঝানো হয়েছে। উদ্ভিদরাজি আল্লাহর তসবীহ পাঠ করছে। এ জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অকারণে বৃক্ষের পত্র-পল্লব ছিন্ন করবে না। কারণ বৃক্ষের পত্র-পল্লব আল্লাহর তসবীহ পাঠে রত রয়েছে।' প্রয়োজনে গাছ কাটা যেতে পারে, কিন্তু অকারণে তার পাতা ছেঁড়া যাবে না। গোটা প্রকৃতি আল্লাহর আনুগত্য, বন্দেগী, দাসত্ব, পূজা-উপাসনা করছে–এ বিষয়টি পবিত্র কোরআন কুনুত শব্দ দিয়েও উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ ছুব্‌হানাহু তা'য়ালা বলেন–

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ-كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ

আকাশ ও পৃথিবীতে যতো কিছু রয়েছে, তা সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। আর সবকিছুই তাঁর আদেশের অনুগত। (সূরা রূম-২৬)

এই পৃথিবী পৃষ্ঠের সামান্য একটি ধূলিকণা থেকে শুরু করে ঐ তুষার আবৃত অটল-অচল হিমাদ্রী, মহাশূন্যের কোয়াশার, বিশাল আকৃতির অদৃশ্য দানবীয় ব্লাকহোল, ছায়াপথ আল্লাহর গোলামী করছে। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ঐ আল্লাহর নির্দেশেই নিয়মিত হয়ে চলেছে। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত, জোয়ারের টানে এই লবণাক্ত পানি নদীর মিষ্টি পানির সাথে মিশে যায়। আবার

ভাটির টানে নদীর মিষ্টি পানি সমুদ্রের লবণাক্ত পানির সাথে মিশে যায়। এর মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। অথচ লবণাক্ত পানি মিষ্টি পানির ভেতরে মিশ্রিত হয়ে মিষ্টি পানির মৌলিক গুণাগুণ পরিবর্তন করতে পারে না। আবার মিষ্টি পানি লবণাক্ত পানির মধ্যে মিশ্রিত হয়ে লবণাক্ত পানির মৌলিক গুণাগুণ নষ্ট করে দিতে পারে না। রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে আবর্তিত হচ্ছে। সময়ের যে মুহূর্তে পৃথিবীর যে এলাকায় রাত অবস্থান করে, সেই মুহূর্তে সেখানে দিনের আলো প্রকাশিত হয়না। আবার যেখানে যে মুহূর্তে দিনের আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেখানে রাতের ঘনকালো অন্ধকার ছেয়ে যায় না। এসব কিছু আল্লাহর ইবাদাত করছে। আল্লাহ বলেন-

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَآ اَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ-وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ-

সূর্যের ক্ষমতা নেই চাঁদকে অতিক্রম করে, রাতের ক্ষমতা নেই দিনকে অতিক্রম করে; এসব কিছুই মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করছে। (সূরা ইয়াছিন-৪০)

আল্লাহ রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্যের প্রতি যে দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা তারা কোন ধরনের বিশ্রাম ব্যতিতই পালন করে যাচ্ছে। পবিত্র কোরআন বলছে, ইলা আজালিম্ মুছাম্মা-অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারা এভাবে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত থাকবে। তারপর একদিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ যে জিনিসকে যেভাবে ইবাদাত করার আদেশ দিয়েছেন, গোটা প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসই সেভাবেই ইবাদাত করে যাচ্ছে। নারকেল গাছ কখনো তাল দিবে না, আম গাছ কখনো লিচু দিবে না। কাঁঠাল গাছ কখনো বেল দিবে না। গোটা প্রকৃতি জুড়ে আল্লাহ তা'য়ালা যে নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তার পরিবর্তন কখনো হবে না হতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً -

আল্লাহর নিয়ম-যা পূর্ব থেকেই কার্যকর রয়েছে, আর কখনও আল্লাহর এ নিয়মে কোন ধরনের পরিবর্তন দেখবে না। (সূরা ফাতাহ্)

অর্থাৎ আমার প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে, আমার Law of nature-এর মধ্যে কখনো কোন পরিবর্তন হবে না। এমনটি হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে। কিন্তু সেই ব্যক্তি তার মুখের যে জিহ্বা দিয়ে মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে, সেই জিহ্বাও আল্লাহর ইবাদাত করছে। কিভাবে করছে-জিহ্বার প্রতি মহান আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, তার কাজ হচ্ছে যে বস্তুর যে স্বাদ তা গ্রহণ করে জিহ্বা ব্যবহারকারী ব্যক্তির অনুভূতির ভেতরে তা সঞ্চারিত করা। আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ব্যক্তি যে জিহ্বা ব্যবহার করে উচ্চারিত করলো, 'আল্লাহ নেই' সেই ব্যক্তি যদি তার জিহ্বার ওপরে কোন তিক্ত, কটু বা অম্ল জাতিয় বস্তু রেখে আদেশ দিল, এই বস্তুগুলোর প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করে তা আমার অনুভূতিতে সঞ্চারিত

করতে পারবে না।' অথবা বস্তু তার প্রকৃত স্বাদ সঞ্চারিত না করে ভিন্ন স্বাদ তাকে সঞ্চারিত করবে–এ ধরনের কোন আদেশ কি জিহ্বা পালন করবে ?

নাস্তিক ব্যক্তি মল-মূত্র ত্যাগের স্থলে অর্থাৎ টয়লেটে প্রবেশ করে তার ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় নাসিকার প্রতি লক্ষ্য করে গুরু গম্ভীর স্বরে আদেশ করলো, 'দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমি আমার হাত দিয়ে নাক চেপে ধরার মতো কাজটি করতে অস্বস্তি বোধ করছি। সুতরাং তুমি দুর্গন্ধ গ্রহণ করে আমার অনুভূতিতে ছড়িয়ে দিবে না, পারলে তা সুগন্ধিতে পরিণত করে আমার অনুভূতিতে ছড়িয়ে দাও।'

এভাবে দেহের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি যত আদেশই দেয়া হোক না কেন, শরীরের কোন একটি অঙ্গই তাতে সাড়া দেবে না। কারণ তারা শরীরের অধিকারী ব্যক্তির ইবাদাত করে না, দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই মহান আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল রয়েছে। যাকে যে ক্রিয়া সম্পাদনের আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা তাই পালন করে যাচ্ছে। সুতরাং প্রকৃতি যে ইবাদাত করে যাচ্ছে, যে আনুগত্য প্রদর্শন করছে, তাতে কোন পরিবর্তন হবে না। এভাবে সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই মহান আল্লাহর ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা করার মাধ্যমে জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে অঙ্গুলী সংকেত করছে–আল্লাহ আছেন এবং আমরা যেভাবে তাঁর গোলামী করছি, তোমরাও সেভাবে আল্লাহর গোলামী করো।

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কোন শক্তির আনুগত্য করা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য বা জন্মগত স্বভাব। গোটা সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করে এবং তা একটি নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, আনুগত্য করছে তা অবলোকন করে মানুষের মনে অবচেতনভাবেই সুপ্ত আনুগত্যের প্রবণতা জাগরিত হয়েছে। যারা প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানে বা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে, তারা দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান কোন শক্তিকে স্রষ্টা বা স্রষ্টার প্রতিনিধি অনুমান করে তার পূজা-উপাসনায় নিয়োজিত হয়েছে। এভাবে কেউ বিশাল আকৃতির গাছের, অগাধ জলধীর, সূর্য-চন্দ্রের, নিজ হাতে নির্মিত মৃত্তিকা মূর্তির, তারকামালার, পশু-প্রাণীর এবং পৃথিবীর মাটিকে নিজের মা মনে করে পূজা-উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে। পূজা-উপাসনা করতে করতে মানুষ এতটা নীচের স্তরে নেমে গিয়েছে যে, দেহের প্রধান প্রজনন অঙ্গকে শক্তির প্রতীক মনে করে সেটারও পূজা মানুষ করছে। মানুষ এসবকে নিজের ইলাহ মনে করে তার পূজা-অর্চনা করে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন–

إِنَّنِىْ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِىْ-

আমি-ই আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সুতরাং, তুমি কেবল আমারই ইবাদাত করো। (সূরা ত্বা-হা-১৪)

মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি আনুগত্য করা। কিন্তু আনুগত্যের ক্ষেত্রে একশ্রেণীর মানুষ নিজের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এসব প্রাকৃতিক শক্তিকে ইলাহ মনে করে তার আনুগত্য,

পূজা-উপাসনা করে থাকে। চিন্তা করে দেখে না, এসবের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। তারা যেমন আল্লাহর সৃষ্টি, যাদেরকে তারা শক্তির উৎস মনে করে পূজা-উপাসনা, আনুগত্য করছে, তারাও তেমনি ঐ আল্লাহরই সৃষ্টি। এসব কিছুই ঐ মহান আল্লাহর আনুগত্য করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যার পূজা-উপসনা, আনুগত্য করছে, তারাও তাদেরই অনুরূপ আমার গোলাম। (সূরা আল আরাফ-১৯৪)

অর্থাৎ তোমরা যাকে ইলাহ্ মনে তার আনুগত্য করছো, বন্দেগী করছো, ইবাদাত করছো, ওটাও আমারই ইবাদাত করছে এবং তুমি যেমন আমার গোলাম, তুমি যার ইবাদাত করছো, সেটাও আমারই গোলাম। সুতরাং আমার সৃষ্টির গোলামী ত্যাগ করে আমার গোলামী করো। তোমরা যাদেরকে ডাকছো, তারা এ সংবাদ পর্যন্ত জানে না যে, তোমরা তাকে ডাকছো এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা তোমাদের ডাকের সাড়া দিতে পারবে না। পবিত্র কোরআন বলছে-

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّيَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ-

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে না, তাদেরকে ডাকা হচ্ছে-এ সংবাদ পর্যন্ত যাদের জানা নেই। (আহ্কাফ-৫)

আনুগত্য প্রবণতার কারণে একশ্রেণীর মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাদের আনুগত্য বা ইবাদাত করে থাকে, তারা মানুষের কোন কল্যাণ-অকল্যাণ করতে সমর্থ নয়। আল্লাহ্ বলেন-

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ-

এবং তারা আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কিছুর ইবাদাত করছে, যা তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না। (সূরা ইউনুস-১৮)

একশ্রেণীর নির্বোধ মানুষ যাদের আনুগত্য, ইবাদাত করে থাকে, তারা কোন ক্ষতিও করতে পারে না, আবার কোন উপকারও করতে পারে না। এদের ওপরে যদি একটি মাছিও বসে, এরা সে মাছিকেও তাড়িয়ে দিতে অক্ষম। আল্লাহ্ বলেন-

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا-

বলো ! তোমরা কি আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কিছুর ইবাদাত পূজা-উপাসনা করছো ? যারা না পারে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে, না পারে কোন উপকার করতে। (সূরা মায়েদাহ্-৭৬)

একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিত কারো কোন কল্যাণ-অকল্যাণ সাধিত হতে পারে না। যেহেতু তিনিই মানুষের প্রতিপালক। তাঁরই গোলামী করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ-لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ-خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ-

সে আল্লাহই তোমাদের রব্ব ! তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি সমুদয় বস্তুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত করো এবং তিনি সব জিনিস সম্পর্কে যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত আছেন। (সূরা আনআম-১০২)

মানুষ যাদেরকে আনুগত্য, বন্দেগী, গোলামী ও ইবাদাত লাভের যোগ্য মনে করছে, তারা সবই ঐ আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টি হয়ে আরেক সৃষ্টির দাসত্ব-গোলামী করা নির্বুদ্ধিতা বৈ আর কিছু নয়। একশ্রেণীর মানুষ আগুনকে শক্তির প্রতীক মনে করে তার পূজা করে থাকে। অথচ সেই আগুনের ভেতরে যখন মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো, তখন তিনি নিরুদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নিজেকে আগুনে ফেলে দেয়ার দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, তিনি যে আল্লাহর গোলামী করেন, এই আগুনও সেই আল্লাহরই গোলাম।

আগুনকে যদি আল্লাহ আদেশ করেন, তাহলে আগুন তাকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করতে পারে। আর আল্লাহ যদি আগুনকে আদেশ না করেন, তাহলে আগুনের ক্ষমতা নেই তার দেহের একটি পশমকে পুড়িয়ে দেয়। সেই চরম মুহূর্তে আল্লাহর ফেরেশ্‌তাগণ এসে তাঁকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল, এক আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ফেরেশ্‌তাদের সাহায্য প্রস্তাব বিনয়ের সাথে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, আল্লাহ আগুনকে আদেশ দিলেন ইবরাহীমের প্রতি আরামদায়ক হয়ে যাওয়ার জন্যে, আগুন আরামদায়ক হয়ে গেল। উত্তপ্ত অগ্নিকুন্ড পরিণত হলো চিত্তাকর্ষক মনোরোম দৃশ্য সম্পন্ন পুষ্প উদ্যানে। বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বিষয়টি এভাবে প্রকাশ করেছেন-

আজ ভি হো যো ইবরাহীম কা ইমাঁ পয়দা
আগ্ কার ছাক্‌তি হ্যায় এক আন্দাজ গুলিস্তা পয়দা।
ইবরাহীমের ঈমান যদি আজও কোথাও হয় বিদ্যমান
গড়তে পারেন অগ্নিকুন্ডে খুব সুরত এক গুলিস্তান।

অর্থাৎ এখনো যদি ইবরাহীমের মতো ঈমান কারো ভেতরে জাগ্রত হয় এবং তাকে যদি অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে অগ্নিকুন্ড পুষ্প কাননে পরিণত হতে পারে।

সুতরাং গোলামী করতে হবে মহাশক্তিধর আল্লাহ তা'য়ালার। একজন গোলাম হয়ে আরেকজন গোলামের কাছে হাত বাড়ালে সে হাত অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হবে। একজন দাস আরেকজন দাসকে কিছুই দিতে পারে না। 'একজন পথের ভিখারী আরেকজন ভিখারীকে কিভাবে ভিক্ষা দিতে পারে ? সৃষ্টিজগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, একটি পশু আরেকটি পশুর আইন মানে না, আনুগত্য করে না, দাসত্ব করে না, ইবাদাত করে না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হয়ে

একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সামনে কিভাবে মাথানত করতে পারে? কিভাবে মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষের বানানো আইনের গোলামী করতে পারে? সুতরাং, বিশ্বপ্রকৃতি-প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ, প্রাকৃতিক আইন মানুষকে যেদিকে-যে শক্তির ইবাদাত করার জন্য নীরব নির্দেশ করছে, মানুষের স্বভাবজাত সেই আনুগত্যকে সেদিকেই প্রদর্শন করতে হবে।

আত্মার বিকাশ ও ইবাদাত

এই পৃথিবী বা সৃষ্টিজগতে ক্রিয়াশীল যে নিয়ম রয়েছে, তা অনুধাবন করতে হবে। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মই মহান আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এসব কিছু অনুভব করার জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের শ্রবণ শক্তি-দর্শন শক্তি দান করেছেন। চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মগজ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআন বলছে-

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ-

মানুষকে আমি এমন এক অবস্থায় তার মায়ের গর্ভ থেকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছি, যে সময় তার কোন চেতনাই ছিল না। পেটের ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও তার বলার ক্ষমতা ছিল না যে, তার ক্ষুধা পেয়েছে। সেই সাথে তাকে আমি তিনটি জিনিষ দান করেছি। তাকে শ্রবণ শক্তি দান করেছি। দৃষ্টি শক্তিদান করেছি এবং চিন্তা করার মত মগজ দিয়েছি।

জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, চোখ, কান খেল-তামাশার জন্য দেয়া হয়নি। প্রকৃতিকে অনুভব করার জন্য দেয়া হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতি কোন দিকে, কোন মহাশক্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, তা অনুধাবন করে তাঁর গোলামী-দাসত্ব করার জন্যই দেয়া হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য চোখে ধরা পড়লো, কিন্তু বিশ্ব-স্রষ্টার প্রতি তার দাসত্বের অঙ্গুলি সংকেত ধরা পড়লো না। এই কান দিয়ে মানুষ প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু শুনলো, কিন্তু মহান আল্লাহর আহ্বান সে শুনলো না, তার কানে মহাসত্যের ডাক প্রবেশ করলো না।

যে জ্ঞান মানুষকে দেয়া হলো, সে জ্ঞান প্রয়োগ করে সে দুরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করলো, মানুষ যেন শকুনের থেকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দূর-বহু দূরের বস্তু দর্শন করতে সক্ষম হয়। সে আকাশ যান আবিষ্কার করলো যেন পাখির চেয়ে দ্রুত গতিতে মহাশূন্যে উড়তে পারে। স্থলপথে দ্রুত যান আবিষ্কার করলো যেন সে চিতা বাঘের চেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে ছুটতে পারে। সে সাবমেরিন আবিষ্কার করলো যেন মহাসাগরের অতল তলদেশে মাছের থেকেও দ্রুত গতিতে চলতে পারে।

মৃত্তিকা গভীরে কোথায় কি অবস্থান করছে, শতকোটি দূরে মহাশূন্যে কোন গ্রহের কি অবস্থা, তা পর্যবেক্ষণ করছে, মহাশূন্যে উড়ন্ত পাখী যেখানে পৌঁছতে সক্ষম নয়, মানুষ সেখানে তার গর্বিত পদচিহ্ন এঁকে দিচ্ছে-অথচ তার আত্মার বিকাশ সাধনে সে চরম ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছে। এক আল্লাহর আনুগত্যের, দাসত্বের, গোলামীর মাধ্যমে মানুষের আত্মার বিকাশ সাধিত হয়, মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় এবং এটাই মানব জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত

সাফল্য–এই ক্ষেত্রেই মানুষ ব্যর্থতার গ্লানী বহন করছে। আল্লাহর গোলামীর মাধ্যমে মানুষের মনুষত্ব বিকশিত হতে না দেখে কবি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এভাবে–

মুঝে এ ডর হ্যায় কে দিলে জিন্দা তু না মর যা–য়ে
কি জিন্দেগানী ইবারাত হ্যায় তেরে জিনেছে।

হে আমার জাগরিত আত্মা, আমি তোমার অপমৃত্যু ঘটার আশঙ্কা প্রকাশ করছি। সত্যই যদি তোমার অপমৃত্যু ঘটে, তাহলে আমার জীবিত থাকার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই।

বর্তমানে আমরা আমাদের আত্মার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে কোন ভূমিকা পালন করছি না। আমাদের অসাবধানতার কারণে, আমাদের অসচেতনতা–অবহেলার কারণে জীবন্ত আত্মার অপমৃত্যু ঘটছে। মানুষ তার দেহের সৌন্দর্য বর্ধিত করার লক্ষ্যে অসংখ্য উপকরণ আবিষ্কার করেছে। পোষাক-পরিচ্ছদের উন্নতির লক্ষ্যে প্রতিদিন নিত্য-নতুন ফ্যাশন বের করছে। কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকশিত করার লক্ষ্যে আত্মার উন্নতি সাধন করার জন্য কোন ধরনের প্রচেষ্টা নেই। মানুষকে হৃদয় দেয়া হলো, চোখ-কান দেয়া হলো, চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মগজ দেয়া হলো, এসব প্রয়োগ করে তারা বস্তুগত উন্নতি সাধন করলো। অথচ প্রধান যে দিকটির উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে এসব দান করা হয়েছিল, সেদিকে তারা দৃষ্টিপাত করলো না। যারা এ ধরনের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, পবিত্র কোরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ–

এরা সব চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। (সূরা আরাফ)

কারণ মানুষের মনুষ্যত্ব তথা আত্মার বিকাশ সাধিত হলে মানুষ তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়। মানুষ নিজের আত্মার পরিচিতি যখন লাভ করে, তখন সে তার প্রতিপালকের পরিচয়ও অবগত হতে পারে। কিন্তু আত্মাকে চেনা বা মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে মানুষের কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। এ জন্যই পবিত্র কোরআন এই শ্রেণীর মানুষকে পশুর সাথে তুলনাই শুধু করেনি, পশুর থেকেও অধম হিসাবে উপস্থাপন করেছে। কারণ এক শ্রেণীর মানুষ তার মনিবের পরিচয় না জানলেও পশু তার মনিবের পরিচয় জানে। কুকুর তার মনিবকে চিনে এবং মনিবের আদেশ পালনে তৎপর থাকে। অথচ একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহকে চিনে না, তাঁকে অস্বীকার করে। সুতরাং ঐ অস্বীকারকারী মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণীর সম্মান ও মর্যাদা মনিবের কাছে অনেক বেশী।

মানুষের আত্মা কিভাবে কোন পদ্ধতিতে বিকশিত হবে, তা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কারণ এই আত্মার অবস্থান, তার আকার-আকৃতি সম্পর্কে মানুষ অবগত নয় এবং সে জ্ঞানও মানুষের নেই। সুতরাং যে জিনিস সম্পর্কে মানুষের প্রাথমিক কোন জ্ঞান নেই, সেই জিনিসের উন্নতি ও বিকাশ সাধন মানুষ করবে কিভাবে?

এ জন্য আত্মার বিকাশ ও উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে আত্মার যিনি স্রষ্টা–যিনি আত্মার আকার-আকৃতি ও অবস্থান সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন, তিনিই পদ্ধতি দান করেছেন। একটি বিষয়ের প্রতি মানুষকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। পৃথিবীতে মানুষসহ জীবকুলের

জীবিত থাকার প্রয়োজনে, জীবন ধারণের জন্যে খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অসংখ্য খাদ্য উপকরণের একটিও মহাশূন্যে পাওয়া যাবে না। সমস্ত খাদ্য পাওয়া যায় জল-স্থলে। খাদ্যসমূহ উৎপাদনের ক্ষেত্রই হলো পানি আর মাটি। কারণ মানুষের দেহ নির্মিত হয়েছে মাটির সার-নির্যাস থেকে। যা দিয়ে দেহ নির্মিত হয়েছে, দেহের প্রয়োজনে তা থেকেই উৎপাদিত খাদ্য দেহ গ্রহণ করে দেহের উন্নতি সাধিত হয়।

কিন্তু দেহের চালিকা শক্তি হলো আত্মা বা রুহ্। এই রুহ্ মাটির সার-নির্যাস দিয়ে প্রস্তুত হয়নি। এ কারণে মাটি থেকে উৎপাদিত কোন খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা রুহের নেই। মৃত্তিকা থেকে রুহ্ আহরোণ করে দেহে প্রবিষ্ট করানো হয়নি, এ জন্য মাটিতে উৎপাদিত কোন খাদ্য দ্বারা রুহের বিকাশ সম্ভব নয়। যেখান থেকে রুহ্ মানব দেহে প্রেরণ করা হয়েছে, সেই স্থান থেকেই রুহের খাদ্যও প্রেরণ করা হয়েছে। রুহ্কে এই খাদ্যদান করলেই কেবল রুহ্ বিকশিত হয় তথা মনুষ্যত্বের উন্নতি সাধন হয়। এই রুহ্ সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার কোন শেষ নেই। আল্লাহর রাসূলকেও রুহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নের উত্তরে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেছিলেন-

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ-قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً-

এরা আপনাকে রুহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দিন, এই রুহ্ আমার রব্ব-এর আদেশে আসে কিন্তু তোমরা সামান্য জ্ঞানই লাভ করেছো। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮৫)

এই রুহ্কে বিকশিত করার জন্য এর খাদ্য প্রয়োজন। রুহ্ আল্লাহর আদেশে আগমন করেছে আলমে আরওয়াহ্ থেকে আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার খাদ্যও প্রেরণ করেছেন লৌহ মাহ্ফুজ থেকে। লৌহ মাহ্ফুজ থেকে প্রেরিত রুহের সেই খাদ্যের নাম হলো কোরআন। এই কোরআন সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাভরে তেলাওয়াত করতে হবে, এর আদেশ-নিষেধ একাগ্রচিত্তে অনুসরণ করতে হবে। রুহের খাদ্যই হলো আল্লাহর কোরআন। দেহকে খাদ্যদান না করলে দেহ যেমন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে, কর্মের উপযোগী আর থাকে না, তেমনি আত্মাকেও খাদ্যদান না করলে আত্মা দুর্বল-নির্জীব হয়ে পড়ে। বাহন হিসাবে বা কৃষি কাজের জন্য যারা চতুষ্পদ জন্তু ব্যবহার করে, এসব জন্তুকে প্রয়োজনীয় খাদ্যদান করতে হয়। নতুবা জন্তু কর্ম উপযোগী থাকে না। খাদ্যদান না করে জন্তুকে কর্মে নিয়োগ করলে জন্তু অক্ষমতার পরিচয়ই দিবে।

তেমনিভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও আত্মার উন্নতিকল্পে আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্য না দিলে সে নিজেকে এবং তার বাহন দেহকে কিভাবে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত করবে ? আত্মাকে তার প্রকৃত খাদ্য না দিলে আত্মা কি নিজেকে বিকশিত করতে পারে না ? অবশ্যই পারে। মানুষ যেমন তার প্রকৃত খাদ্য না পেলে বা দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকার লোকজন অখাদ্য-কুখাদ্য আহার করে নিজেদেরকে দুর্বল করে, তেমনি আত্মা তার প্রকৃত খাদ্য লাভ না করলে অখাদ্য-কুখাদ্য আহার করবে অর্থাৎ আত্মা কদর্য রূপে গর্হিত পথে ধাবিত হবে। আত্মার প্রকৃত খাদ্য কোরআন যদি সে লাভ করতো, তাহলে সে নিজেকে বিকশিত করতো

সুন্দর ও কল্যাণের পথে। সে আত্মার দ্বারায় পৃথিবীতে মানবতার কল্যাণ সাধিত হতো। গোটা পৃথিবী জান্নাতের এক উদ্যানে পরিণত হতো।

কোরআন নামক খাদ্য লাভকারী আত্মা সুন্দর আর কল্যাণের সুষমায় বিকশিত হয়ে শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতন মুক্ত নিরাপত্তাপূর্ণ, ভীতিহীন সুখী সমৃদ্ধশালী এক পৃথিবী মানবতাকে উপহার দিতে সক্ষম হতো। ইসলামের সোনালী যুগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, সে সময়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দেশের শাসকগোষ্ঠী পর্যন্ত সবাই দেহকে অতিরিক্ত খাদ্য দিয়ে স্ফিত না করে আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্য দিয়ে পরিপুষ্ট করতেন। ফলে তারা পৃথিবীতে সত্য আর কল্যাণের পতাকা উড্ডিন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুদূর অতীতে এবং বর্তমানেও যারা আত্মাতে তার প্রকৃত খাদ্য না দিয়ে দেহকে বৈধ-অবৈধ খাদ্য দিয়ে স্ফিত করেছে বা করছে, তারা সত্য, সুন্দর আর কল্যাণের হন্তারক হিসাবে পৃথিবী ব্যাপী শোষণ, নির্যাতন আর অশান্তির দাবানল বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। কারণ এসব আত্মা প্রকৃত খাদ্য যখন লাভ করছে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই আত্মা অখাদ্য আর কুখাদ্য লাভ করে অন্যায় অসুন্দরের পথেই ধাবিত হচ্ছে।

এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাবে আশে-পাশে বিচরণশীল মানুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই। সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্যদান করে-অর্থাৎ কোরআন তেলাওয়াত করে, কোরআনের বিধান অনুসারে চলে, তারা সত্য সুন্দর আর কল্যাণ পিয়াসী। আর যারা আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্যদান করে না-অর্থাৎ কোরআনের বিপরীত পথে চলে, তারা সত্য সুন্দর কল্যাণের হন্তারক, অশান্তি সৃষ্টিকারী, অরাজকতা সৃষ্টিকারী ও মানবতার ধ্বংস সাধনকারী। এই কোরআনই আত্মার একমাত্র উৎকৃষ্ট খাদ্য। সূরা আ'রাফের ৫২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ-

আমি এদের কাছে এমন একটি কিতাব এনে দিয়েছি যাকে আমি জ্ঞান-তথ্যে সুবিস্তৃত বানিয়েছি এবং যারা ঈমান রাখে এমন সব লোকদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ।

এই কোরআন মানুষকে নিরাময়তা দান করে। কলুষিত আত্মাকে সুন্দর শুভ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। আত্মার কলুষ-কালিমা দূর করে। আল্লাহ বলেন-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

আমি এই কোরআন নাজিল প্রসঙ্গে এমন কিছু নাজিল করি যা ঈমানদারদের জন্য নিরাময়তা ও রহমত। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮২)

এই কোরআন মানুষকে সত্য সহজ সরল পথপ্রদর্শন করে। মানুষকে নিরাময়তা দান করে প্রকৃত সত্যে উপনীত করে। সূরা হামীম সেজ্দায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ-

এদেরকে বলো, এই কোরআন ঈমানদার লোকদের জন্য তো হেদায়াত ও নিরাময়তা।

এই কোরআন মানুষের আত্মাকে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্যবোধ শিক্ষা দেয়। কোরআন প্রদর্শিত পথে যে আত্মা ধাবিত হয়, সে আত্মার দ্বারাই পৃথিবীতে মানবতা বিকশিত হয়। সুতরাং কোরআন তেলাওয়াত করে এবং এর বিধান নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে আত্মাকে বিকশিত করতে হবে, তাহলেই কেবল ইবাদাতের পরিপূর্ণ হক আদায় করা সম্ভব হবে।

ইবাদাতের তাৎপর্য

ইবাদাত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। এই ইবাদাতের মধ্যে অন্য কারো ইবাদাতের মিশ্রণ ঘটানো যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ-

(হে রাসূল !) আমি তোমার কাছে হকসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তুমি একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো। (সূরা যুমার-২)

এ আয়াতে আল্লাহর ইবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, সে ইবাদাত হতে হবে এমন, যা আনুগত্যকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এ আয়াতে ইবাদাত শব্দের পরে দীন শব্দের ব্যবহার করে এ কথাই দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্বের সাথে মানুষ যেন আর কাউকে অন্তর্ভুক্ত না করে, বরং সে যেন একমাত্র আল্লাহরই পূজা-উপাসনা, বন্দেগী, আনুগত্য ও দাসত্ব করে। একমাত্র তাঁরই আদেশ অনুসরণ করে। ইবাদাত তো কেবল তারই করা যেতে পারে, যিনি অসীম শক্তিশালী এবং অক্ষয়-চিরঞ্জীব। যা ভঙ্গুর এবং ক্ষণস্থায়ী তার ইবাদাত করা যেতে পারে না। কোরআনে সূরা মু'মিনের ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

هُوَ الْحَىُّ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ-اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তোমাদের দীন তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো। গোটা সৃষ্টিজগতের রব্ব আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহই হলেন বাস্তব ও প্রকৃত সত্য। তিনি অনন্ত এবং অনাদি। একমাত্র তিনিই আপন ক্ষমতায় জীবিত। তাঁর সত্তা ব্যতিত আর কারো সত্তাই অনাদি ও চিরস্থায়ী নয়। সমস্ত কিছুর অস্তিত্বই আল্লাহ প্রদত্ত, মরণশীল ও ধ্বংসশীল। সুতরাং ইবাদাত হতে হবে একমাত্র সেই সত্তার জন্য, যিনি সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ তাঁরই ইবাদাত করবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে তাঁরই আদেশ অনুসরণ করবে এবং তাঁরই আনুগত্য করবে। এই ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে বলেই বর্তমানে মানুষ ইবাদাত বলতে শুধু কতিপয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মকেই একমাত্র ইবাদাত বলে মনে করেছে। নামাজ আদায় করা যেমন ইবাদাত তেমনি নামাজ আদায় না করাও ইবাদাত। রোজা পালন করাও ইবাদাত এবং রোজা পালন না করাও ইবাদাত। নামাজ সঠিক ওয়াক্তে আদায় করার

নাম ইবাদাত। আবার নিষিদ্ধ সময়ে অর্থাৎ সূর্য উদয়ের সময়, অস্তের সময় এবং সূর্য ঠিক যখন মাথার ওপরে অবস্থান করে, এ তিন সময়ে নামাজ আদায় না করাও ইবাদাত। এই তিন সময়ে সেজ্দা করা জায়েয নেই–হারাম করা হয়েছে। সক্ষম হলে গোটা বছর রোজা পালন করলে ইবাদাত হবে, কিন্তু বছরে পাঁচ দিন রোজা পালন না করা ইবাদাত। এই পাঁচ দিন রোজা পালন করা হারাম করা হয়েছে।

মানুষের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্মকেই ইবাদাত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। মানুষের চোখের চাওনি-এটাও ইবাদাতে পরিণত হতে পারে। এই চোখের দৃষ্টি দিয়ে কোন সন্তান যদি তাঁর গর্ভধারিণী মাতা ও জন্মদাতা পিতার দিকে পরম মমতাভরে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আল্লাহর রাসূল বলেন, সে সন্তানের আমলনামায় একটি কবুল নফল হজের সওয়াব লেখা হবে। উপস্থিত সাহাবাগণ জানতে চেয়েছেন, কোন সন্তান যদি প্রতিদিন একশত বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহলে কি সে একশত কবুল নফল হজের সওয়াব লাভ করবে ?

আল্লাহর রাসূল জবাব দিলেন, তোমরা জেনে রেখো, মহান আল্লাহর রাহ্মতের ভান্ডার অফুরন্ত। আল্লাহর কোন বান্দাহ্ যদি প্রতিদিন তার মাতা-পিতার দিকে একশত বার মমতা আর শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহলে সে বান্দার আমলনামায় প্রতিদিন একশত কবুল নফল হজের সওয়াব লেখা হবে।

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মই ইবাদাত। উঠা-বসা, হাঁটা-চলা, কথা বলা, কথা শোনা, দাঁড়ানো, ঘুমানো, আহার করা, বিশ্রাম করা, মলমূত্র ত্যাগ করা, স্ত্রীর সাথে ব্যবহার করা, সন্তান প্রতিপালন করা, চাকরী করা, ব্যবসা করা, শিক্ষা দেয়া ও গ্রহণ করা, যুদ্ধ করা, যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা, আন্দোলন-সংগ্রাম করা, নেতৃত্ব দেয়া, কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করা, বিচার-মীমাংসা করা, দেশ শাসন করা, স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা, জনসেবা করা, কল্যাণকর কোন কিছু আবিষ্কার করা তথা যে কোন ধরনের বৈধ কর্মকান্ড করাই হলো ইবাদাত। শর্ত শুধু একটিই যে, সমস্ত কর্ম হতে হবে মহান আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায়। এ জন্যই সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে–আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব বা ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

আরবী না'বুদু শব্দের মধ্যে দুটো কাল রয়েছে। একটি বর্তমান কাল এবং অন্যটি ভবিষ্যৎ কাল। নামাজের মধ্যে বান্দাহ্ ইয়্যা কানা'বুদু বলে এ কথারই স্বীকারোক্তি করে যে, আমি তোমার আদেশে এখন নামাজ আদায় করছি। ক্ষণপূর্বে আমার জন্য যেসব কাজ হালাল ছিল, নামাজের মধ্যে আমার জন্য সেসব হালাল কাজগুলো হারাম হয়ে গিয়েছে। তোমার দেয়া বৈধ খাদ্যগুলো আমার জন্য আহার করা বৈধ ছিল, নামাজ আদায়ের সময়ে তোমার আদেশে সে বৈধ খাদ্য গ্রহণ করা আমি আমার জন্য হারাম করে দিয়েছি। তুমি আমাকে বাকশক্তি দান করেছো, আমার জন্য কথা বলা বৈধ ছিল। আমি এইক্ষণে তোমার আদেশ অনুসারে কথা বলা হারাম করে দিয়েছি। তুমি আমাকে অনুগ্রহ করে দৃষ্টিশক্তি দান করেছো। চারদিকের দৃশ্য অবলোকন করা আমার জন্য বৈধ ছিল। নামাজ আদায়ের এই মুহূর্তে এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখা তোমার আদেশে আমি আমার জন্য হারাম ঘোষণা করে তা থেকে বিরত

রয়েছি। আমি আমার জন্য চিরস্থায়ী হালাল বিষয়গুলো নামাজ আদায়ের মুহূর্তে স্বল্প সময়ের জন্য যেমন তোমার আদেশে হারাম করেছি, তেমনি তুমি যে বিষয়গুলো চিরস্থায়ীভাবে হারাম করে দিয়েছো, নামাজের বাইরে আমি আমার জীবনে সে বিষয়গুলোও হারাম ঘোষণা করবো।

ইয়্যা কানা'বুদু-বলে বান্দাহ তাঁর আল্লাহর কাছে বর্তমান কালে যা করছে এবং ভবিষ্যতে কি করবে, সে কথারই স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। অর্থাৎ যেভাবে তোমার আদেশে নামাজ আদায় করছি, নামাজের বাইরের জীবনও তোমারই আদেশ অনুসারেই পরিচালিত করবো। আল্লাহকে সেজ্দা দিলেই সওয়াব লাভ কার যায়। কিন্তু আল্লাহর দেয়া নিয়ম হলো, নামাজের এক রাকাতের মধ্যে সেজদা দিতে হবে দুটো।

কোন ব্যক্তি যদি দুটো সেজদার পরিবর্তে অধিক সওয়াবের আশায় পাঁচ ছয়টি সেজদা দেয়, তাহলে তার নামাজই হবে না। ফজরের ফরজ নামাজ দুই রাকাত আদায় করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি দুই রাকাতের স্থলে চার রাকাত আদায় করে তাহলে তা ইবাদাত হবে না।

এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি যদি যোহরের ফরজ নামাজ চার রাকাতের স্থলে ছয় রাকাত আদায় করে, মাগরিবের ফরজ নামাজ তিন রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত আদায় করে, তাহলে সে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর আইন লংঘন করেছে বলে বিবেচিত হবে এবং সে হবে আল্লাহদ্রোহী। যথাযথভাবে আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করাই হলো ইবাদাতের সঠিক তাৎপর্য। এই তাৎপর্য অনুধাবন করেই আল্লাহর দাসত্ব বা ইবাদাত করতে হবে।

মানুষ নামাজ আদায় করে যার আদেশে, সে তার গোটা জীবন পরিচালিত করবে একমাত্র তাঁরই আদেশে। যাঁর আদেশে নামাজ আদায় করা হচ্ছে, তাঁরই আদেশে ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালিত হবে। নামাজে সেজ্দা দেয়া হচ্ছে যাঁর আদেশে, একমাত্র তাঁরই আদেশে রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্র নীতি, স্বরাষ্ট্র নীতি, শিক্ষানীতি, শিল্প-বাণিজ্য নীতি পরিচালিত হবে। নামাজ যাঁর আদেশে আদায় করা হচ্ছে, দেশের সরকার ব্যবস্থা, পার্লামেন্ট একমাত্র তাঁরই আদেশ অনুসারে পরিচালিত হতে হবে। তাহলেই ইবাদাতের পরিপূর্ণ হক আদায় করা হবে। এগুলো যদি না হয়, তাহলে এই অসম্পূর্ণ ইবাদাত দিয়ে সফলতা আশা করা বৃথা।

সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে আনুগত্যের মস্তক নত করে দিতে হবে ঐ মহান আল্লাহর সামনে-যিনি সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছুর পরিচালক, শাসক ও প্রতিপালক। আল্লাহর ওপরে বান্দার যেমন হক রয়েছে, তেমিন রয়েছে বান্দার ওপরে আল্লাহর হক। আল্লাহর রাসূল বলেন, বান্দার ওপরে আল্লাহর হক হচ্ছে, বান্দাহ্ কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব বা ইবাদাত করবে, এই ইবাদাতের মধ্যে অন্য কারো ইবাদাত মিশ্রিত করবে না, ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোন শির্ক করবে না। গোলামী, বন্দেগী, ইবাদাত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর। এটাই হলো বান্দার ওপরে আল্লাহর হক। আর আল্লাহর ওপরে বান্দার হক হচ্ছে, সেই ইবাদাতকারী আবেদ বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়ে জান্নাত দান করবেন।

বন্দেগী ও দাসত্বের ক্ষেত্রে ইবাদাত

আল্লাহর বিধান এবং তাঁর নির্দেশাবলী অমান্য করে কোন দার্শনিক, চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, আইনবিদের বিধান ও নেতৃত্ব অনুসরণ করা এবং এসব চিন্তাবিদগণকে বা নেতাদেরকে মৌখিকভাবে আল্লাহর শরীক বলে ঘোষণা না দিলেও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে তাদেরকে শরীক করারই শামিল। বরং এসব ব্যক্তিত্বদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেও যদি আল্লাহর বিধানের মোকাবিলায় তাদের বানানো আইন-বিধানের আনুগত্য করা হয়, তাহলেও আনুগত্যকারী শির্কের অপরাধে অভিযুক্ত হবে–এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর বিধানের মোকাবিলায় যেসব মানুষ ভিন্ন বিধান অনুসরণ করতে আদেশ দেয়, অনুপ্রাণিত করে, কোরআন এদেরকে শয়তাম হিসাবে ঘোষণা করেছে। অথচ মানুষ শয়তানের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে থাকে। এভাবে অভিশাপ দেয়ার পরও যারা এসব মানুষরূপী শয়তানদের অনুসরণ করবে, কোরআন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছে–তোমরা শয়তানদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছো। এই শির্ককে বিশ্বাসগত শির্ক না বলে–বলা হয় কর্মগত শির্ক। এই ধরনের কর্মগত শির্ক যারা করছে, কিয়ামতের দিন এরা আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হবে এবং এদের সম্পর্কে কোরআন বলছে–

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا-

তাহলে সেদিন এরা কি করবে যেদিন এদের রব্ব এদেরকে বলবেন, ডাকো সেই সব সত্তাকে যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করে বসেছিলে ? (সূরা আল আহ্কাফ-৫২)

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক, যেমন প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এই লক্ষ্য আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রণয়ন করে নেতৃবৃন্দ এবং দলের কর্মীরা তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ময়দানে তৎপরতা চালায়। অর্থাৎ নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, কর্মীরা ময়দানে তাই পালন করে। এখন এসব নির্দেশ যদি ইসলামের বিপরীত হয় এবং কর্মীরা যদি তা পালন করে, তাহলে তারা পরোক্ষভাবে ঐ দলের নেতৃবৃন্দকেই নিজেদের প্রভু বলে মেনে নিল এবং তারা নেতৃবৃন্দের ইবাদাত করলো। অথচ এই কর্মীরা মুখে আল্লাহকেই প্রভু বলে স্বীকার করে। এটাই হলো কর্মগত শির্ক। এই শির্ক থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত থাকতে হবে। আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান যারা দিল, তারাই হলো তাগুত। এদের বিধানের প্রতি বিদ্রোহ করার জন্যই কোরআন মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। কোরআন বলছে–

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى-لاَ انْفِصَامَ لَهَا-

যারা তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, তারা এমন শক্তিশালী অবলম্বন ধরেছে যে, যা কখনোই ছিঁড়ে যাবার নয়। (সূরা বাকারা-২৫৬)

মুখে মুখে আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না। প্রথমে অন্যের তথা তাগুতের আনুগত্য অস্বীকার করতে হবে, পরিত্যাগ করতে হবে। তারপর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁরই নিরঙ্কুশ আনুগত্য-ইবাদাত করতে হবে। আরবী ভাষায় কারো ফরমানের অনুগত হওয়া এবং তার ইবাদাতকারী হওয়া প্রায় একই অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কারো বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করে সে যেন তারই ইবাদাত করে।

এভাবে ইবাদাত শব্দটির তাৎপর্যের ওপর এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাঁর ছাড়া অন্য সবার ইবাদাত পরিত্যাগ করার যে আদেশ নবী-রাসূলগণ তাঁদের মহান আন্দোলনের মাধ্যমে উপস্থাপন করতেন, তার সঠিক ও পূর্ণ অর্থ কি ছিল তা অনুধাবন করা যায়। তাঁদের কাছে ইবাদাত নিছক কোন পূজা-উপাসনার অনুষ্ঠান ছিল না। তাঁরা মানুষকে এই আহ্বান জানাননি যে, তোমরা আল্লাহর পূজা-উপাসনা করো এবং দেশ ও জাতির নেতৃবৃন্দের বা অন্য দার্শনিক-চিন্তাবিদ বা ভিন্ন কোন শক্তির বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করতে থাকো। বরং তাঁরা যেমন মানুষকে আল্লাহর পূজারী হিসাবে গড়তে চাইতেন সেই সাথে সাথে আল্লাহর আদেশের অনুগতও করতে চাইতেন।

ইবাদাত শব্দের এই উভয় অর্থের দিক দিয়ে তাঁরা অন্য কারো ইবাদাত করাকে সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্টতা হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। ইবাদাত শব্দের অর্থ দাসত্ব ও আনুগত্য বুঝায় এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায় ফেরাউন ও তার রাজ পরিষদদের কথায়। হযরত মূছা ও হারুন আলাইহিস্ সালামের আহ্বানের জবাবে তারা বলেছিল–

فَقَالُوٓا۟ اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ

আমরা কি আমাদেরই মতো দু'জন লোকের প্রতি ঈমান আনবো ? আর তারা আবার এমন লোক যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস। (সূরা মু'মিনুন-৪৭)

অর্থাৎ যে জাতিকে ফেরাউন ও তার রাজ পরিষদগণ শাসন করতো, সে জাতিকে তারা নিজেদের গোলাম বা দাস মনে করতো। হযরত মূছা ও হারুন আলাহিস্ সালাম ছিলেন ফেরাউনের অধীনস্থ জাতির সন্তান। এ জন্য তারা তাদের কথার মধ্যে উল্লেখ করেছিল, এরা দু'জন নিজেদেরকে নবী হিসাবে দাবী করে নিজেদেরকে আমাদের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছে, এরা আমাদের মত মানুষই শুধু নয়–যারা আমাদের আইন-বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য, আমাদের আনুগত্য, বন্দেগী, গোলামী ও ইবাদাত করে–অর্থাৎ আমাদের দাস, সেই দাস সম্প্রদায়ের সন্তান এরা। সুতরাং উল্লেখিত আয়াত থেকে বুঝা গেল, কোন শাসকের শাসনাধীনে বাস করে শাসকের আনুগত্য করাকেও ইবাদাত বলা হয়। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামও তাঁর জাতিকে বলেছিলেন–

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ

তোমরা সবাই এক আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁকে ভয় করে চলো এবং আমার আনুগত্য করে কাজ করো। (সূরা নূহ-৩)

তিনি তাঁর জাতিকে জানিয়ে দিলেন, সমস্ত কিছুর বন্দেগী, দাসত্ব ও গোলামী সম্পূর্ণ পরিহার করে এবং কেবলমাত্র আল্লাহকেই নিজের একমাত্র মা'বুদ মেনে শুধু তাঁরই পূজা-উপাসনা-আরাধনা করবে। একমাত্র তাঁরই দেয়া আইন-বিধান, আদেশ-নিষেধের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দিবে। এ ক্ষেত্রে অন্য কারো আনুগত্য করবে না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের ওপরে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেও যেসব জাতির কাছে আল্লাহর বিধান নবী-রাসূলদের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের প্রতিও একই আদেশ দেয়া হয়েছিল। সূরা বাইয়্যেনার ৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ–

আর তাদেরকে এই আদেশ ব্যতিত অন্য কোন আদেশই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর দাসত্ব করবে নিজেদের দীনকে তাঁরই জন্য খালেছ করে, সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে।

ইবাদাতের পূর্ব শর্ত লক্ষ্য স্থির করা

আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি–সূরা ফাতিহায় বান্দাহ এ কথাটি আল্লাহর কাছে নিবেদন করলো। কিন্তু বান্দাহ্ জানে না দাসত্ব করা ও সাহায্য প্রার্থনা করার সঠিক পদ্ধতি কোনটি এবং তার ইবাদাতের লক্ষ্য কি। এ জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করে বান্দাহ্কে অনুগ্রহ করে সঠিক পদ্ধতি অবগত করেছেন বান্দার ইবাদাত কাকে লক্ষ্য করে করা হবে, তা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ–

তোমরা প্রতিটি ইবাদাতে নিজের লক্ষ্য স্থির রাখবে আর তাঁকে ডাকো, নিজের দীনকে শুধুমাত্র তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে। (সূরা আল আ'রাফ-২৯)

এ আয়াতে ইবাদাত ও প্রার্থনা সম্পর্কে লক্ষ্য স্থির করতে বলা হয়েছে। ইবাদাতের লক্ষ্য নির্ভুল না হলে সমস্ত ইবাদাত বিনষ্ট হয়ে যাবে। ইবাদাতের লক্ষ্য হলো, আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো বন্দেগীর সামান্যতম অংশও যেন আল্লাহর ইবাদাতের সাথে মিশ্রিত হতে না পারে। প্রকৃত মাবুদ ব্যতিত অন্য কারো প্রতি আনুগত্য, দাসত্ব, বিনয় ও আত্মসমর্পণের ভাবধারা যেন কোনক্রমেই মনে স্থান লাভ করতে না পারে। পথ-প্রদর্শন, সাহায্য ও মদদ লাভ এবং সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা লাভের জন্য একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করতে হবে। কিন্তু ইবাদাত ও সাহায্য প্রার্থনা করার পূর্ব শর্ত হলো, নিজের দীনকে পরিপূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

জীবনের গোটা ব্যবস্থা চলবে মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ অনুসারে, রাজনীতি-অর্থনীতি পরিচালিত হবে ইসলাম বিরোধী শক্তির নির্দেশ অনুসারে, আল্লাহ বিরোধী নেতা-নেত্রীর

আনুগত্য করা হবে, আল্লাহদ্রোহী শক্তিসমূহের দাসত্বের ভিত্তিতে জীবনের সমস্ত বিভাগ চলবে আর দোয়া চাওয়ার ক্ষেত্রে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দেয়া হবে, এ ধরনের ইবাদাত আর দোয়া-সাহায্য প্রার্থনার সামান্যতম কোন মূল্য নেই। আর এটাই হলো ইবাদাতের লক্ষ্য ভ্রষ্টতা। এ ধরনের দ্বিমুখী ইবাদাত করা আর আল্লাহর কাছে এভাবে সাহায্য চাওয়া, 'রাব্বুল আলামীন, আমরা তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, এই যমীন থেকে তোমার ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার কর্মসূচী ঘোষণা করেছি, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো-আমরা যেন আমাদের আন্দোলনে সফল হই'–সমান কথা।

সুতরাং ইবাদাত ও সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারে একমাত্র লক্ষ্য হতে হবে আল্লাহ। তাঁরই ইবাদাত ও তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। মানুষ যে কোন কাজে সফল হবার পূর্বে প্রথমে তার টার্গেট বা লক্ষ্য স্থির করে। পৃথিবীতে কোন কাজে সফলতা অর্জন করতে হলেও সর্বপ্রথমে টার্গেট নির্ধারণ করতে হয়। টার্গেট নির্ধারণ বা লক্ষ্য স্থির না করলে কোন কাজে সফলতা অর্জন করা যায় না। দাসত্ব, বন্দেগী, আনুগত্য, পূজা-উপাসনা, দোয়া প্রার্থনার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য স্থির করতে হবে যে, আমি কার দাসত্ব করবো এবং কার কাছে সাহায্য চাইবো। মুসলমান নামাজে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে এ কথারই স্বীকৃতি দেয়, আমি লক্ষ্য স্থির করেছি–আমার দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা ও সাহায্য প্রার্থনা হবে একমাত্র আল্লাহরই জন্য। আমি একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবো এবং যে কোন প্রয়োজন একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবো।

নামাজে এভাবে বলা হলো, আর কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সাহায্যের জন্য, সন্তান লাভের আশায়, চাকরী লাভের আশায়, ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য, নির্বাচনে বিজয়ের লক্ষ্যে ছুটে গেল মাজারে, পীর-মাওলানা, জ্যোতিষী-গণকদের কাছে। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, এদের ইবাদাত ও সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে কোন লক্ষ্য স্থির নেই–এরা লক্ষ্যভ্রষ্ট। অর্থাৎ কে যে এদের মাবুদ, এরা কার ইবাদাত করবে এবং কার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, সে ব্যাপারে এরা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয়ের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে থাকে। এ ধরনের লক্ষ্যহীন লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ–

এদেরকে বলো, ডাক দিয়ে দেখো তোমাদের সেই মাবুদদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কার্যোদ্ধারকারী মনে করো, তারা তোমাদের কোন কষ্ট দূর করতে পারবে না এবং তা পরিবর্তন করতেও পারবে না। এরা যাদেরকে ডাকে তারা তো নিজেরাই নিজেদের রব্ব-এর নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান করছে যে, কে তাঁর নিকটতর হয়ে যাবে এবং এরা তাঁর রাহ্মতের প্রত্যাশী এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫৬-৫৭)

ইবাদাত ও দোয়া প্রার্থনার ব্যাপারে মানুষ যখন লক্ষ্য স্থির করতে ব্যর্থ হয়, তখন সে অসংখ্য মাবুদের গোলামী করতে থাকে। ক্ষণকালের জন্য আল্লাহর গোলামী করে, আবার পীর-অলী,

মাজারের গোলামী করে, জ্বিনের গোলামী করে, নেতা-নেত্রীর গোলামী করে তথা অসংখ্য মাবুদের গোলামী করতে থাকে। এরা যাদের কাছে সাহায্য চায়, যাদেরকে এরা নিজেদের আশাপূরণকারী বলে মনে করে, তারা নিজের অজান্তেই এদেরকে মাবুদ বানিয়ে নেয়। আল্লাহ বলেন, এদের এসব মাবুদ কোন ক্ষমতাই রাখে না। এরা নিজেরাই তো আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সত্য পথের সন্ধানে রয়েছে। এরা আমার ভয়ে থরথর করে আর আমার রাহ্মত লাভের প্রত্যাশায় প্রহর অতিবাহিত করছে। সুতরাং একমাত্র আমারই দাসত্ব করো এবং আমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো।

অতএব ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা ও আনুগত্য করার পূর্বে লক্ষ স্থির করতে হবে যে, প্রকৃতই মাবুদ, ইলাহ ও রব্ব কে ? আমি কার ইবাদাত করবো, কে আমার দাসত্ব লাভের অধিকারী, আমার আনুগত্যের লক্ষ্য কোন শক্তি, কে আমার প্রার্থনা কবুল করতে পারে এবং সাহায্য করতে পারে। এভাবে লক্ষ্য স্থির করে তারপর নিজেকে ইবাদাতে নিয়োজিত করতে হবে এবং সাহায্যের আশায় প্রার্থনা করতে হবে। এভাবে লক্ষ্য স্থির করলেই, 'আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই'–নামাজে সূরা ফাতিহায় বলা কথাটি মুসলমানের জীবনে সফলতা ও সার্থকা বয়ে আনবে।

ইবাদাতের লক্ষ্য হবেন একমাত্র আল্লাহ

মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং তিনিই মানুষের একমাত্র প্রতিপালক। এই মানুষ কার দাসত্ব করবে, কোন শক্তিকে লক্ষ্য করে মানুষ ইবাদাত করবে–এ সিদ্ধান্ত কোন মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। যিনি মানুষে স্রষ্টা এবং প্রতিপালক, তিনিই কেবল সিদ্ধান্ত জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করেন, তাঁর সৃষ্টি মানুষ কার আনুগত্য, ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা করবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সে সিদ্ধান্ত অনুগ্রহ করে পবিত্র কোরআনে জানিয়ে দিয়েছেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের সেই রব্ব-এর দাসত্ব করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত লোকের সৃষ্টিকর্তা। (সূরা আল বাকারা-২১)

দাসত্ব ও আনুগত্যের একমাত্র লক্ষ্য হবেন আল্লাহ–তাঁর সামনেই মাথানত করতে হবে, আনুগত্যের মস্তক একমাত্র তাঁর সামনেই নত করে দিতে হবে। তাঁর দাসত্ব করার ব্যাপারে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না। লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে কোন দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা যাবে না। সূরা নেছার ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا-

আর তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।

দাসত্ব করার ব্যাপারে যারা লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অকল্যাণের ভয়ে-কল্যাণের আশায় লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষ যাদের আনুগত্য, দাসত্ব, বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা করে, তাদের ভ্রান্তি দূর করার জন্য সূরা মায়িদার ৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন–

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَيَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا–

তাদেরকে বলো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই জিনিসের ইবাদাত ও পূজা-উপাসনা করো, যা তোমাদের না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, না কোন উপকার করার ?

সমগ্র সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণ করছেন আল্লাহ, এ ব্যাপারে অন্য কোন শক্তির সামান্য কোন ভূমিকা নেই এবং থাকতে পারে না। তিনিই রব্ব এবং ইলাহ–দাসত্ব ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে যে আনুগত্যের প্রবণতা রয়েছে, আল্লাহ্ আনুগত্যের যে স্বভাব মানুষের ভেতরে দান করেছেন, তা যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় এবং মানুষ যেন ইবাদাতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকেই লক্ষ্য স্থির করে, সে জন্য বলে দেয়া হয়েছে–

ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ–لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ–

এই হচ্ছেন আল্লাহ–তোমাদের রব্ব–তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নেই, সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা সুতরাং তোমরা তাঁরই দাসত্ব করো। (সূরা আন'আম-১০২)

ইবাদাত বা দাসত্ব করার ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষগুলো অসংখ্য কল্পিত মাবুদের বন্দেগী করে থাকে। নির্জীব পদার্থসমূহকে তারা শক্তির প্রতীক কল্পনা করে পূজা আরাধনা করে থাকে। কেউ কল্পনা করেছে স্বয়ং স্রষ্টার সন্তান রয়েছে, ফেরেশতারা তার কন্যা, সৃষ্টি কাজে জ্বিন ও ফেরেশ্তাগণ অংশীদার, অতএব এসবের পূজা-অর্চনা করতে হবে। কোরআন অবতীর্ণের পূর্বে অন্যান্য জাতিকে নবী-রাসূলগণ ইবাদাত করার ব্যাপারে যে লক্ষ্য স্থির করে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন, তারা কালক্রমে নিজেদের সেই লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছে। এদের মধ্যে কেউ হযরত উজাইরকে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে আবার কেউ হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র হিসাবে কল্পনা করেছে। এভাবে তারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। এদের ইবাদাতের প্রকৃত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا–لاَاِلٰهَ اِلاَّهُوَ–سُبْحَانَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

অথচ এদেরকে এক আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। সেই আল্লাহ যিনি ছাড়া অন্য কেউ-ই বন্দেহী-দাসত্ব লাভের অধিকারী নয়। তিনি পাক-পবিত্র এসব মুশরিকী কথাবার্তা থেকে, যা তারা বলে। (সূরা তওবা-৩১)

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে। মানব

জাতির পিতা প্রথম মানব আদমের মধ্যে ইবাদাত, বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনার ব্যাপারে কোন ধরনের সংশয়-সন্দেহ ছিল না। তিনি তার ইবাদাতের লক্ষ্য সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। সমগ্র মানবতার জন্যেও সেই একই লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল। পরবর্তী কালে এই মানুষ সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আল্লাহ বলেন−

اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً-وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ-وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ-

তোমাদের এই উম্মত প্রকৃত পক্ষে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব্ব। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত করো। কিন্তু নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্য লোকজন পরস্পরের মধ্যে নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। (সূরা আম্বিয়া-৯২-৯৩)

এই আয়াতে তোমরা শব্দের মাধ্যমে পৃথিবীর সমগ্র মানবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে মানব গোষ্ঠী ! তোমরা সবাই প্রকৃতপক্ষে একই দল ও একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাঁরা একই আদর্শ ও জীবন বিধানসহ প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁদের সবারই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, কেবলমাত্র এক ও একক আল্লাহই মানুষের রব্ব এবং এক আল্লাহরই ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনা করতে হবে। পরবর্তী কালে ধর্মের নামে যেসব বিকৃত আদর্শ, মতবাদ ও মতাদর্শ তৈরী হয়েছে, তা সমস্ত নবী-রাসূলদের আনিত অভিন্ন আদর্শকে বিকৃত করে তৈরী করা হয়েছে। কোন চিন্তানায়ক নবীদের আদর্শের একটি দিক মাত্র নিয়েছে, কেউ দুটো দিক গ্রহণ করেছে আবার কেউ গুটিকতক নিয়ে তার সাথে নিজের চিন্তা-চেতনা মিশ্রিত করে কিম্ভুতকিমাকার একটা কিছু নির্মাণ করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে।

এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে নানা ধর্মমতের এবং মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়েছে নানা জনগোষ্ঠীতে। বর্তমানে মানুষের তৈরী করা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রবর্তক, অমুক নবী অমুক ধর্মের ভিত্তি দান করেছেন এবং নবী-রাসূলগণই মানুষকে নানা ধর্মে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন−এসব কথা ছড়িয়ে মূলতঃ পবিত্র নবী-রাসূলদের ওপরে মারাত্মক অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে।

এসব বিকৃত আদর্শ ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এবং ইবাদাতের ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন দেশের নবীদের সাথে সম্পৃক্ত করছে বলেই এ কথা প্রমাণ হয় না যে, বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় বিভিন্নতা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত পবিত্র নবী রাসূলদেরই সৃষ্টি। এসব কথা বলা ও এসব কথা বিশ্বাস করা বড় ধরনের অপরাধ। আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ একের অধিক কোন মতবাদ মতাদর্শ প্রচার করেননি এবং ইবাদাত, দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী ও পূজা-উপাসনার ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিলেন না। তাঁরা সবাই এক আল্লাহরই ইবাদাত করার আদেশ দান করেছেন এবং সমগ্র জীবনব্যাপী এই লক্ষ্যেই আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত করেছেন।

একমাত্র আল্লাহই ইবাদাত লাভের অধিকারী

একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদাত, দাসত্ব ও বন্দেগী করা জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতিরই দাবী। মানুষের সৃষ্টি ও তার প্রতিপালনের ব্যাপারে যাদের কোনই ভূমিকা নেই এবং থাকতে পারে না, তাদের ইবাদাত করা মূর্খতার নামান্তর এবং অযৌক্তিক। মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষ কেবলমাত্র তাঁরই বন্দেগী করবে এটাই হলো যুক্তি ও বিবেকের দাবী। বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত মালিক ও শাসনকর্তাই হলেন আল্লাহ এবং তিনিই হলেন প্রকৃত মা'বুদ। তিনিই প্রকৃত মা'বুদ হতে পারেন এবং তাঁরই মা'বুদ হওয়া উচিত।

রব্ব অর্থাৎ মালিক, মুনিব, শাসনকর্তা এবং প্রতিপালক হবেন একজন আর ইলাহ্ অর্থাৎ আনুগত্য, বন্দেগী ও দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী হবেন অন্যজন, এটা একেবারেই জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধির অগম্য যুক্তি। মানুষের লাভ ও ক্ষতি, তার কল্যাণ ও অকল্যাণ, তার অভাব ও প্রয়োজন পূরণ হওয়া, তার ভাগ্য ভাঙা-গড়া, তার নিজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বই যার ক্ষমতার অধীন–তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তাঁরই সামনে আনুগত্যের মাথানত করা মানুষের প্রকৃতিরই মৌলিক দাবী। এটাই তার ইবাদাত তথা দাসত্বের মৌলিক কারণ। মানুষ যখন একথাটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, ক্ষমতার অধিকারীর ইবাদাত বা দাসত্ব না করা এবং ক্ষমতাহীনের আনুগত্য বা ইবাদাত করা দুটোই জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট বিরোধী।

কর্তৃত্বশালী–ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগকারী আনুগত্য, দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী হন। যাদের কোন ক্ষমতা নেই, কর্তৃত্ব নেই, কোন কিছু করার স্বাধীন ক্ষমতা নেই, তারা আনুগত্য বা দাসত্ব লাভের অধিকারী হন না। এসব দুর্বল সত্তার দাসত্ব বা আনুগত্য করে এবং তাদের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে শুধু নিরাশই হতে হয়–কিছু পাওয়া যায় না। কারণ একজন ভিখারী আরেকজন ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে পারে না। মানুষের কোন আবেদনের ভিত্তিতে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোন ক্ষমতাই দুর্বল সত্তাদের নেই।

এদের সামনে বিনয়, দীনতা ও কৃতজ্ঞতা সহাকরে মাথানত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ঠিক তেমনিই নির্বুদ্ধিতার কাজ, যেমন কোন ব্যক্তি শাসনকর্তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার কাছে আবেদন পেশ করার পরিবর্তে তারই মতো অন্য আবেদনকারীগণ সেখানে আবেদন-পত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কারো সামনে দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা।

দাসত্ব লাভ ও প্রার্থনা মঞ্জুর করার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি শুধু পৃথিবী সৃষ্টিই করেননি, বরং তিনিই এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যেমন তাঁর সৃষ্টি করার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি তাঁর টিকিয়ে রাখার কারণেই টিকে আছে। তাঁর প্রতিপালনের কারণেই সমস্ত কিছু বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের অসীম কল্যাণে তা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে–

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ–

আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। পৃথিবী ও আকাশের ভান্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। (সূরা আয যুমার-৬৩)

যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষক, প্রতিপালক এবং যাঁর হাতে রয়েছে সবকিছুর চাবিকাঠি, তাঁরই ইবাদাত লাভের যোগ্যতা রয়েছে, আর মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাদের ইবাদাত করছে, তারা সবই ঐ আল্লাহরই গোলাম। গোলাম হয়ে যারা গোলামদের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দিয়েছে, এদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মূর্খ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ-

এদেরকে বলে দাও, হে মূর্খেরা, তাহলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব করতে বলো আমাকে ? (সূরা যুমার-৬৪)

মহান আল্লাহর ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তিনি সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র অধিকারী–প্রার্থনা মঞ্জুরকারী এবং এ জন্যই তাঁরই দাসত্ব করতে হবে। তাঁরই কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন–

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ-اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ-

তোমাদের রব্ব বলেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। যেসব মানুষ অহঙ্কার বশতঃ আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মু'মিন-৬০)

নামাজ আদায় কালে মানুষ সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে নিজেকে নিবেদন করে বলে, 'আমরা একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি' অর্থাৎ যে কোন ব্যাপারে আমরা তোমারই কাছে দোয়া করি, তোমারই কাছে সাহায্য চাই–অন্য কারো কাছে নয়। আসলে মানুষ দোয়া করে কেবল সেই শক্তিরই কাছে, যে শক্তি সম্পর্কে সে ধারণা করে, 'আমি যার কাছে দোয়া করছি, তিনি সমস্ত কিছুই শোনেন–দেখেন এবং অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী। নীরবে-সরবে, নির্জনে, প্রকাশ্যে, মনে মনে যে কোন অবস্থায়ই দোয়া করি না কেন, তিনি তা দেখছেন এবং শুনছেন।' মূলতঃ মানুষের আভ্যন্তরীণ এই অনুভূতি, এই চেতনাই তাকে দোয়া করতে প্রেরণা যোগায়-উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

এই পৃথিবী তথা বস্তুজগতের প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ যখন মানুষের কোন দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্ট নিবারণ অথবা কোন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয় বা যথেষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন কোন অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী সত্তার কাছে ধর্ণা দেয়ার জন্য মানুষের অবচেতন চেতনা অস্থির হয়ে ওঠে। বিষয়টি সে সময় মানুষের জন্য একান্তই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তখনই মানুষ দোয়া করে এবং সেই অদৃশ্য অথচ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী সত্তাকে ডাকতে থাকে, সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি স্থানে এবং সর্বাবস্থায় ডাকে। নির্জনে একাকী

ডাকে, উচ্চস্বরে ডাকে, নীরবে নিভৃতে ডাকে এবং মনে মনে একান্ত তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করে। একটি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানুষ এভাবে তাঁর স্রষ্টাকে ডাকতে থাকে। সেই বিশ্বাসটি হলো, সে যে সত্তাকে ডাকছে, সেই সত্তা তাকে সর্বত্র সর্বাবস্থায় দেখছেন এবং তাঁর মনের গহীনে যে কথামালার গুঞ্জরণ সৃষ্টি হচ্ছে, সাহায্যের প্রত্যাশায় তার মন যেভাবে আর্তনাদ করছে, মনের জগতের এই আর্তচিৎকার পৃথিবীর কোন কান না শুনলেও তাঁর স্রষ্টার কুদরতী কান অবশ্যই শুনতে পাচ্ছে। সে যে সত্তাকে ডাকছে, তিনি এমন অসীম ক্ষমতার অধিকারী যে, তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তিনি তাকে সাহায্য কতে সক্ষম। তার বিপর্যস্ত ভাগ্যকে পুনরায় কল্যাণে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম।

আল্লাহর কাছে দোয়া করার, তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করার এই তাৎপর্য অনুধাবন করার পর মানুষের জন্য এ বিষয়টির মধ্যে আর কোন জটিলতা থাকে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন সত্তার কাছে দোয়া করে বা সাহায্যের আশায় ডাকে, তার নামে মানত করে সে প্রকৃত পক্ষেই নিরেট বোকা এবং সে নির্ভেজাল শির্কে লিপ্ত হয়। কারণ যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তা সেসব সত্তার মধ্যেও রয়েছে বলে সে বিশ্বাস করে। আল্লাহর জন্য যেসব গুণাবলী নির্দিষ্ট, সে তাদেরকে ঐসব গুনাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক না করতো তাহলে তার কাছে দোয়া করতো না এবং সাহায্য চাওয়ার কল্পনা পর্যন্ত তার মনে কখনো উদয় হতো না।

দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তি যদি কারো সম্পর্কে নিজের থেকেই এ কথা মনে করে বসে যে, সে অনেক প্রচন্ড ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক, তাহলে অনিবার্যভাবেই তার কল্পিত ব্যক্তি বা সত্তা ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হয়ে যায় না। ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হওয়া একটি অবিচল বাস্তবতা, একটি দৃশ্যমান বাস্তব বিষয় যা কারো মনে করা বা না করার ওপর নির্ভরশীল নয়।

প্রকৃত ক্ষমতার মালিককে কেউ মালিক মনে করুক বা না করুক, স্বীকৃতি দিক বা না দিক–তাতে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না, প্রকৃতই যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে মালিক, সে সর্বাবস্থায়ই মালিক থাকবে। আর যে সত্তা কোন ক্ষমতার মালিক নয়, কেউ তাকে ক্ষমতার মালিক মনে করলেও, তার মনে করার কারণে সে সত্তা প্রকৃত অর্থেই ক্ষমতাবান হবে না।

এটাই অটল বাস্তবতা যে, একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সত্ত্বাই সর্বশক্তিমান, গোটা বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপক, শাসক, প্রতিপালক, সংরক্ষণকারী, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, তিনিই সামগ্রিকভাবে যাবতীয় ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অধিপতি। সমগ্র বিশ্ব জগতে দ্বিতীয় এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই, যে সত্তা দোয়া শোনার সামান্য যোগ্যতা রাখে, সাহায্য করার যোগ্যতা রাখে, বা তা মঞ্জুর করা বা না করার ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।

মানুষ যদি এই অটল বাস্তবতার পরিপন্থী কোন কাজ করে নিজের পক্ষ থেকে নবী-রাসূল, পীর-দরবেশ, অলী-মাওলানা, জ্বিন-ফেরেশতা, গ্রহ-উপগ্রহ ও মাটির তৈরী দেব-দেবীদেরকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অংশীদার কল্পনা করে, তাহলে প্রকৃত বাস্তবতার কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটবে না। ক্ষমতার অধিকারী মালিক যিনি–তিনি মালিকই থাকবেন, তাঁর

মালিকানায় এসব ব্যর্থ ও বাস্তবতা বর্জিত কল্পনা বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারে না। আর নির্বোধদের কল্পনা শক্তি কখনো ক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীন গোলামকে মালিক বানাতে পারে না, গোলাম গোলামই থাকে।

দোয়া করা ও সাহায্য কামনা করার বিষয়টি সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। মনে করা যাক কোন রাজার দরবার থেকে সাহায্য দান করা হয় এবং রাজা প্রার্থনা শুনে থাকেন। সেখানে প্রজাদের মধ্য থেকে যার যে প্রয়োজন অনুসারে সাহায্যের আবেদন নিয়ে অনেকেই উপস্থিত হয়েছে। এই প্রজাদেরই একজন যদি সাহায্যের আবেদন নিয়ে রাজার দরবারে উপস্থিত হয়ে রাজার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে–সাহায্য প্রত্যাশী অন্য প্রজাদের একজনের সামনে দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে তার গুণকীর্তন করতে থাকে এবং সাহায্যের জন্য তার কাছে কাতর কণ্ঠে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির এই আচরণকে কি বলা যেতে পারে ? এর থেকে চরম ধৃষ্টতা কি আর হতে পারে ?

বিষয়টি আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক, রাজার দরবারে রাজার উপস্থিতিতে তারই একজন প্রজা আরেকজন প্রজাকে রাজা কল্পনা করে তার কাছে কাতর কণ্ঠে দোয়া করছে, সাহায্য প্রার্থনা করছে, রাজার মধ্যে যেসব গুণাবলী রয়েছে তা ঐ প্রজা সম্পর্কে উল্লেখ করে তার কাছে সাহায্য চাচ্ছে। আর যে প্রজার কাছে এভাবে ঐ নির্বোধ প্রজা সাহায্য চাচ্ছে, সেই প্রজা বেচারী রাজার সামনে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে, বিব্রতবোধ করছে এবং বারবার নির্বোধ প্রজাকে বলছে, 'তুমি আমার গুণকীর্তন কেন করছো, আমার কাছে কেন দোয়া করছো, কেন আমার কাছে সাহায্য চাচ্ছো, আমি তো রাজা নই–তোমার মতো আমিও এই রাজার একজন প্রজামাত্র এবং রাজ দরবারে তোমার মতো আমিও একজন সাহায্য প্রার্থী। আমাকে বাদ দিয়ে তোমার চোখের সামনে যে আসল রাজা দরবারে অধিষ্ঠিত আছেন, সাহায্য তার কাছে চাও।'

বেচারী এভাবে ঐ নির্বোধ প্রজাকে বার বার বুঝাচ্ছে–কিন্তু কে শোনে কার কথা ! হতভাগা তবুও চোখ-কান বন্ধ করে তারই মতো সেই প্রজার কাছে স্বয়ং রাজার সামনে সাহায্য প্রার্থনা করেই যাচ্ছে। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হয়েছে ঐ নির্বোধ হতভাগা প্রজার মতোই। আল্লাহর যেসব বাকহীন গোলামদের দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা এরা করছে, তারা নীরবে অঙ্গুলি সঙ্কেতে জানিয়ে দিচ্ছে, 'আমরা তোমারই মতো এক গোলাম। আমাদের আনুগত্য না করে, আমাদের কাছে প্রার্থনা না করে, আমরা যার আনুগত্য করছি, যার কাছে সাহায্য কামনা করছি, সেই আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাও।'

দোয়া–দাসত্বের স্বীকৃতি

দাসত্ব করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং যে কোন প্রয়োজনে তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে। দোয়া করতে হবে শুধু তাঁরই কাছে। মনে রাখতে হবে, দোয়াও ঠিক ইবাদাত তথা ইবাদাতের প্রাণ। আল্লাহর কাছে দোয়া করা বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য ও

পূজা-উপাসনারই অনিবার্য দাবী। যারা তাঁর কাছে দোয়া করে না, এর অর্থ হলো–তারা গর্ব আর অহঙ্কারে নিমজ্জিত। এ কারণে তারা নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের কাছে দাসত্বের স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এদের জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর কাছে দোয়া না করা, সাহায্য না চাওয়া চরম অপরাধ। হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন–আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়াই ইবাদাত। আরেক হাদীসে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন–রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া হচ্ছে ইবাদাতের সারবস্তু। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি ক্রদ্ধ হন। (তিরমিজী)

দোয়া বা সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে একশ্রেণীর মানুষের মনে তাকদীর সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিছু সংখ্যক মানুষ ধারণা করে, 'কল্যাণ ও অকল্যাণ যাবতীয় কিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তিনিই তাকদীরের সমস্ত কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে ফায়সালা করেছেন সেটাই তো অনিবার্যভাবে মানুষের জীবনে ঘটবেই। অতএব নতুন করে আবার আমারা দোয়া করবো কেন এবং দোয়া করলে কি আমাদের তাকদীরের কোন পরিবর্তন ঘটবে?' মানুষের এই ধারণা একটি মারাত্মক ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণা মানুষের মন থেকে সাহায্য চাওয়া ও দোয়ার সমস্ত গুরুত্ব মুছে দেয়। এই ভুল ধারণা হৃদয়-মনে পালন করে মানুষ যদি আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, দোয়া করে, তাহলে সেসব দোয়ার মধ্যেও যেমন আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় না তেমনি কোন প্রাণও থাকে না। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা মু'মিনের ৬০ নং আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন–

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ-

তোমাদের রব্ব বলেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।

এভাবে পবিত্র কোরআনে অনেক স্থানেই বলা হয়েছে, আমি বান্দার অত্যন্ত কাছে অবস্থান করি, বান্দাহ্ যখন আমাকে ডাকে আমি সে ডাকের সাড়া দিয়ে থাকি। কোরআনের এসব ঘোষণা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বান্দার দোয়া ও আবেদন, নিবেদন ও কাকুতি-মিনতি শুনে আল্লাহ নিজে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা অবশ্যই সংরক্ষণ করেন। এ কথা চিরসত্য যে, বান্দাহ আল্লাহর সিদ্ধান্তসমূহ এড়িয়ে যেতে পারে না বা তাঁর কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সামান্যতম ক্ষমতাও রাখে না। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন।

সুতরাং দোয়া কবুল হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় দোয়ার অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। কোন দোয়া-ই বৃথা যায় না। একটি না একটি কল্যাণ অবশ্যই লাভ করা যায়। সে কল্যাণের ধরণ

হলো, বান্দাহ্ তার মালিক, মনিব, প্রভু, প্রতিপালকের সামনে নিজের অভাব ও প্রয়োজন পেশ এবং দোয়া করে, সাহায্য কামনা করে তাঁর প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় এবং নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতা, অপারগতা ও দুর্বলতার কথা স্বীকার করে। নিজের দাসত্বের এই স্বীকৃতিই যথাস্থানে একটি ইবাদাত বা ইবাদাতের প্রাণসত্তা। বান্দাহ্ যে সাহায্য কামনা করলো বা যে উদ্দেশ্যে দোয়া করলো সেই বিশেষ জিনিসটি তাকে দেয়া হোক বা না হোক, তার আশা পূরণ হোক বা না হোক, কোন অবস্থায়ই তার দোয়ার প্রতিদান থেকে সে বঞ্চিত হবে না। তিরমিজী শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لايرد القضاء الا الدعاء (ترمذى)

দোয়া ব্যতিত আর কোন কিছুই তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কোন কিছুর মধ্যেই আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। কিন্তু আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা তখনই তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন, যখন বান্দাহ্ কাতর কণ্ঠে তাঁর কাছে দোয়া করে, সাহায্য চায়। তিরমিজী শরীফের আরেকটি হাদীসে এসেছে, হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ما من احد يدعو بدعاء الا اتاه الله ما سأل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدع با هم او قطيعة رحم (ترمذى)

বান্দাহ্ যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ তখন হয় তার প্রার্থিত জিনিস তাকে দান করেন অথবা তার ওপরে সে পর্যায়ের বিপদ আসা বন্ধ করে দেন–যদি সে গোনাহের কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না করে।

মুছ্নাদে আহ্মাদে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ما من مسلم يدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله احدى ثلث-اما ان يعجل له دعوته-واما ان يد خرها له فى الا خرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها (مسند احمد)

একজন মুসলমান যখনই কোন দোয়া করে তা যদি কোন গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তা তিনটি অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় কবুল করে থাকেন। হয় তার দোয়া এই পৃথিবীতেই কবুল করা হয়, নয় তো আখিরাতে প্রতিদান

দেয়ার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় অথবা তার ওপরে ঐ পর্যায়ের কোন বিপদ আসা বন্ধ করা হয়।

বোখারী শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفرلى ان شيئت-ارحمنى ان شئت-ارزقنى ان شئت-وليغزم مسئلته (بخارى)

তোমাদের কোন ব্যক্তি দোয়া করলে সে যেন এভাবে না বলে, হে আল্লাহ ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি চাইলে আমার প্রতি রহম করো এবং তুমি চাইলে আমাকে রিযিক দাও। বরং তাকে নির্দিষ্ট করে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে, হে আল্লাহ আল্লাহ ! আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করো।

তিরমিজী শরীফে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর রাসূল থেকে বর্ণনা করেন–তিনি এভাবে আদেশ দিয়েছেন–

ادعوا الله وانتم موقنون بالا جابة (ترمذى)

আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দোয়া করো।

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে দেখায় যায়, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–

يستجاب للعبد ما لم يدع باثم او قطيعة رحم مالم يستعجل-قيل يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال يقول قد دعرت وقد دعوت فلم اريستجاب لى فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء (مسلم)

যদি গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় এবং তাড়াহুড়া না করা হয় তাহলে বান্দার দোয়া কবুল করা হয়। রাসূলের কাছে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! তাড়াহুড়োর বিষয়টি কি ? তিনি জানালেন, তাড়াহুড়ো হচ্ছে ব্যক্তির এ কথা বলা যে, আমি অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু দেখছি আমার কোন দোয়াই কবুল হচ্ছে না। এভাবে সে অবসন্নগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা থেকে বিরত থাকে।

তিরমিজী শরীফে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–

يسأل احدكم ربه حاجته كله حتى يسأل شسع نعله اذا انقطع (ترمذى)

তোমাদের প্রত্যেকের উচিত তার রব্ব-এর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।

তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফের হাদীস–হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

ليس شيئ اكرم على الله من الدعاء (ترمذى)

আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানের জিনিস আর কিছুই নেই।

তিরমিজী ও মুছ্নাদে আহ্মদ শরীফের আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত ইবনে উমর ও মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–

ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء (ترمذى)

যে বিপদ আপতিত হয়েছে তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী এবং যে বিপদ এখনো আপতিত হয়নি তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের দোয়া করা কর্তব্য।

তিরমিজী শরীফের আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত ইবনে মাস্উদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

سلوا الله مفضله فان الله يحب ان يسأل (ترمذى)

আল্লাহর কাছে তার করুণা ও রহমত প্রার্থনা করো। কারণ, আল্লাহ তাঁর কাছে প্রার্থনা করা পছন্দ করেন।

দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করার ব্যাপারে এ ধরনের অনেক হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে তা অনুগ্রহ করে তিনি তাঁর বান্দাকে শিখিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে এমন অনেক দোয়া রয়েছে। মানুষ যে বিষয়গুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে বলে ধারণা করে সে বিষয়েও ব্যবস্থা গ্রহণ বা কর্মে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। কারণ, কোন বিষয়ে মানুষের কোন চেষ্টা-সাধনা-তদবীরই আল্লাহর রহমত, তাঁর সহযোগিতা ও তাওফিক এবং সাহায্য ব্যতিত

সফল হতে পারে না। চেষ্টা-সাধনা শুরু করার পূর্বে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থ হলো, বান্দাহ্ সর্বাবস্থায় তার নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছে। সে যে আল্লাহর বান্দাহ্, একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, ইবাদাত ও পূজা-উপাসনা করছে এবং সেই সাথে মহান আল্লাহর কল্পনাতীত ক্ষমতা, সম্মান-মর্যাদার কথা দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অকপটে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এই কথাগুলোই সূরা ফাতিহার মধ্য দিয়ে বান্দাহ্ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে নামাজে বারবার বিনয়ের সাথে বলতে থাকে, হে আল্লাহ ! আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি।

যে কোন ব্যাপারে সাহায্য কামনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছে, কখন মানুষ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, মানুষ যখন আল্লাহকে সেজদা দেয়, তখন মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়ে যায়। সুতরাং কোন কিছুর প্রয়োজন হলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। সম্রাট শাহ্জাহানের জীবনীর মধ্যে একটি ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কোন একজন ভিক্ষুক কিছু পাবার আশায় তার দরবারে আগমন করেছিল।

অভাবী লোকটি সম্রাটকে না পেয়ে অনুসন্ধান করে জানতে পারলো, তিনি মসজিদে নামাজ আদায় করছেন। লোকটি মসজিদের দরজার সামনে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলো, দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাসক সম্রাট শাহ্জাহান নামাজ শেষে দুটো হাত তুলে আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করছেন, আর তার দু'চোখের কোণ বেয়ে শ্রাবণের বারি ধারার মতই অশ্রু ঝরছে। অশ্রু ধারায় তার দাড়ি সিক্ত হয়ে বুকের কাছে শরীরের জামাও ভিজে গিয়েছে।

মুনাজাত শেষ করে সম্রাট মসজিদ থেকে বাইরে এলেন। ভিক্ষুক লোকটি সম্রাটকে সালাম জানালো, তিনি সালামের জবাব দিলেন। এরপর লোকটি সম্রাটের কাছে কোন কিছু আবেদন না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে চলে যেতে লাগলো। সম্রাট অবাক হলেন। তার মনে প্রশ্ন জাগলো, তার কাছে এসে কেউ তো কোন নিবেদন না করে ফিরে যায় না-কিন্তু এ লোকটিকে দেখতে তো অভাবী মনে হয়। কিন্তু লোকটি কিছু না চেয়ে ফিরে যাচ্ছে কেন ! ভিখারী লোকটি চলে যাচ্ছে আর সম্রাট বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। সম্বিৎ ফিরে পেতেই তিনি লোকটিকে ডাক দিলেন। লোকটির কানে সম্রাটের আহ্বান পৌছা মাত্র লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে সম্রাটের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

ক্ষমতাধর সম্রাট লোকটির চোখের ওপরে চোখ রেখে মমতাভরে প্রশ্ন করলেন, আমার কাছে এসে কোন ব্যক্তি কিছু না চেয়ে তো চলে যায় না, তোমাকে দেখে তো অভাবী মনে হচ্ছে। তুমি আমার কাছে কিছু না চেয়ে কেন চলে যাচ্ছিলে ?

লোকটি দৃঢ় কণ্ঠে জানালো, সত্যই আমি অভাবী। ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করি। আপনার কাছেও এসেছিলাম ভিক্ষার আশায়। আপনার কাছ থেকে বড় রকমের কিছু সাহায্য পাবো, যেন বাকি জীবনে আমাকে আর ভিক্ষা করতে না হয়। কিন্তু আপনার কাছে এসে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। আমি দেখলাম, আপনি আমার থেকে নগণ্য ভিক্ষুকের

মতো পৃথিবীর সমস্ত সম্রাটদের সম্রাটের কাছে দু'হাত তুলে ভিখারীর মতো অনুনয়-বিনয় করে কাঁদছেন। এই দৃশ্য দেখে আমি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, সম্রাট কাঁদে যে সম্রাটের কাছে, আমিও তাঁরই কাছে কাঁদবো। আমি বাকি জীবনে ঐ রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ ব্যতিত আর কারো কাছে কখনো কিছুই চাইবো না।

আনুগত্য বনাম ইবাদাত

পবিত্র কোরআনে ইবাদাত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। নামাজের মধ্যে বারবার পড়তে হয়-ইয়্যাকা না'বুদু-অর্থাৎ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি, এই আয়াতে যে না'বুদু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আনুগত্য অর্থে ইবাদাত শব্দটি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এখন আমরা তা দেখার প্রয়াস পাবো। সূরা ইয়াছিনের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে আদম সন্তানেরা ! আমি কি তোমাদের তাগিদ করিনি যে তোমরা শয়তানের ইবাদাত করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা ইয়াছিন-৬০)

এই পৃথিবীতে বোধহয় এমন একজন মানুষও অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না, যে ব্যক্তি শয়তানকে ভালো বলে। সবাই শয়তানকে গালাগালি দেয়। কোন মানুষের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হলে, অন্য মানুষ তাকে শয়তান বলে গালি দেয়। এভাবে শয়তানের প্রতি সবাই অভিশাপ দিয়ে থাকে। শয়তানকে মানুষ অভিশাপ দেয়-কেউ তার ইবাদাত করে না।

শয়তানের পূজা-উপাসনা, ইবাদাত, বন্দেগী, আনুগত্য করতে কেউ রাজি হয় না-এর পরিবর্তে শয়তানের ওপরে শুধু চারদিক থেকে অগণিত কণ্ঠে অভিসম্পাত বর্ষিত হতে থাকে। শয়তান নামক এই অশুভ-অপশক্তির প্রতি লা'নত হতে থাকে। মানুষ অপরাধ করে, পাপের সাগরে ডুবে যায়, পাপ-পঙ্কিলতার কদর্যতায় অবগাহন করতে থাকে মানুষ আর দোষ চাপিয়ে দেয় শয়তানের ঘাড়ে। মানুষের এই স্বভাব দেখে কবি বলেন-

কিয়া হাঁসি আ-তি হায় মুঝে হযরতে ইনছান প্যর
ফেলে বদ তু খোদ ক্যারে লা'নাত ক্যারে শয়তান প্যর।

বিদ্রুপের হাসি আসে আমার, মানুষের স্বভাব দেখে। এরা নিজেরা অপরাধমূলক কর্ম করে দোষ চাপিয়ে দেয় শয়তানের প্রতি।

এই শয়তান যেন ফুটবলের মতো। ফুটবলের সৃষ্টিই হয়েছে লাথির আঘাত সহ্য করার জন্য, তেমনি এই শয়তানের সৃষ্টিই হয়েছে শুধু অভিশাপ, লা'নত আর গালাগালি শোনার জন্য। অথচ এই মানুষের প্রতি তার স্রষ্টার পক্ষ থেকে বার বার আদেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা শয়তানের ইবাদাত করবে না। শয়তানের ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে-এ কথার অর্থ

হলো, শয়তান যা বলে তা করা যাবে না। শয়তান কর্তৃক প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা যাবে না। এই অপশক্তির আনুগত্য করা যাবে না। কোরআন ও হাদীসের আদেশ অনুসরণ করার পরিবর্তে শয়তানের আদেশ অনুসারে জীবন পরিচালিত করা যাবে না। শয়তান মানুষকে যেভাবে প্ররোচনা দেয়, সেই প্ররোচনা অনুসারে জীবন পরিচালিত করার অর্থই হলো, শয়তানের ইবাদাত করা বা শয়তানের আনুগত্য করা। সূরা ইয়াছিনের উল্লেখিত আয়াতে যে তা'বুদু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ হলো আনুগত্য করা, দাসত্ব করা বা ইবাদাত করা। যারা পৃথিবীতে শয়তানের ইবাদাত করেছে তথা শয়তানের প্ররোচনা অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন বলছে,-

أُحْشُرُ الَّذِيْنَ ظَلَمُ وَاَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَهْدُوْهُمْ اِلَى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ-

পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তান এবং অন্য সত্তাদের আনুগত্য করেছে, তাদের সবাইকে একত্রিত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (কোরআন)

আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে যারা আল্লাহর গোলামী, দাসত্ব, আনুগত্য বা ইবাদাত না করে, শয়তানের আনুগত করেছে, ইবাদাত করেছে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ শয়তানের ইবাদাত বা আনুগত্য করার নির্মম পরিণতি এই আয়াতের মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এ কারণে যে, মানুষ যেন কোনক্রমেই শয়তানের আনুগত্য না করে। মানুষ আনুগত্য করবে কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এবং তাঁর প্রেরিত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। শর্তহীনভাবে কোন নেতা-নেত্রীর আনুগত্য করা যাবে না। কারো আনুগত্য করতে হলে, কারো মতামত গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই কোরআন সুন্নাহ দিয়ে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ-وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلَهًا وَّاحِدًا-لاَاِلَهَ اِلاَّهُوَ-سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

তারা নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের রব্ব বানিয়ে নিয়েছে। আর এভাবে মরিয়ম পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ব্যতিত আর কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, সেই আল্লাহ-যিনি ব্যতিত অন্য কেউ দাসত্ব লাভের অধিকারী নন। (সূরা তওবা-৩১)

আল্লাহকে বাদ দিয়ে আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদেরকে রব্ব বানিয়ে নেয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর বিধানের আনুগত্য না করে, তাদের আনুগত্য করা। এসব ব্যক্তিদের আদেশ-নিষেধ নিঃশর্তভাবে অনুসরণ করা। আল্লাহর বিধান অনুসন্ধান না করে, পীর, মাশায়েখ,

আলেম-ওলামাদের মতামত অনুসরণ করা। হাদীস শরীফে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আদী ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খৃষ্টের বিকৃত আদর্শ ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার পরে আল্লাহর রাসূলের কাছে কয়েকটি বিষয় জানতে চেয়েছিলেন। উল্লেখিত আয়াত প্রসঙ্গে তিনি জানতে চান, 'আমরা খৃষ্টানরা আমাদের আলেম-ওলামা ও দরবেশদেরকে রব্ব বানিয়ে নিয়েছিলাম বলে কোরআন যে অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছে, এর প্রকৃত অর্থ কি ?'

জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'এটা কি সত্য নয় যে, তোমাদের আলেম-ওলামা, দরবেশগণ যে বিষয়কে অবৈধ ঘোষণা দিত তা তোমরা অবৈধ হিসাবে গণ্য করতে ?' হযরত আদী বললেন, 'হ্যাঁ-অবশ্যই আমরা তা করতাম।'

হযরত আদী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর জবাব শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ ধরনের করলেই তো তাদেরকে রব্ব বানিয়ে নেয়া হলো।' উল্লেখিত আয়াত থেকে প্রমাণ হলো যে, আল্লাহর কিতাবের সনদ ব্যতিতই যারা মানব জীবনের জন্য হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধের সীমা নির্ধারণ করে, আসলে তারা নিজেদের ধারণা অনুসারে নিজেরাই রব্ব্-এর আসন দখল করে বসে।

আর যারা তাদেরকে এভাবে আইন-বিধান রচনা করার অধিকার দেয় বা অধিকার আছে বলে মেনে নেয়, মূলতঃ তারাই তাদেরকে রব্ব বানায়। আলেম-ওলামা, পাদ্রী-পুরোহিতদের রব্ব বানিয়ে নেয়ার মূল অর্থ হলো, তাদেরকে আদেশ-নিষেধকারী হিসাবে মেনে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদন ব্যতিতই তাদের কথা শিরোধার্য করে নেয়া হয়েছে।

আলেম-ওলামা, পীর-দরবেশ, ওস্তাদ-মাশায়েখ, নেতা-নেত্রী তথা যে কোন ব্যক্তি হোক না কেন, তিনি যে কথাটি বলবেন-সে কথার প্রতি কোরআন ও হাদীস সমর্থন করে কিনা, তা না জেনে কোনক্রমেই গ্রহণ করা যাবে না। পীর সাহেব বা কোন মাওলানা সাহেব যদি বলেন, মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করতে হবে পনের হাত। শুধু পনের হাত কেন, এর অধিকও ব্যবহার করা যেতে পারে-কিন্তু প্রথমে দেখতে হবে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কোন সাহাবা এ ধরনের বিশালাকৃতির কোন পাগড়ী ব্যবহার করেছেন কিনা।

পীর সাহেব শিখিয়ে দিলেন, এই ধরনের পদ্ধতিতে সকাল-সন্ধ্যায় বা গভীর রাতে যিকির করতে হবে। যিকির অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু প্রথমে এটা অনুসন্ধান করতে হবে, পীর সাহেব যে পদ্ধতিতে করতে বললেন, সে পদ্ধতিতে আল্লাহর রাসূল বা তাঁর কোন সাহাবা জীবনে ক্ষণিকের জন্যও যিকির করেছেন কিনা। যদি দেখা যায় তাঁরা করেছেন, তাহলে পীর সাহেবের কথার প্রতি আনুগত্য করা যেতে পারে-তার পূর্বে নয়।

একজন মাওলানা সাহেব ফতোয়া দিলেন, তার সে ফতোয়া কোরআন ও হাদীসের সাথে সামস্যশীল কিনা-এটা সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। কোন হুজুর, কোন পীর সাহেব, কোন মুরুব্বী কি বলেছেন, কোন কিতাবে কি লেখা রয়েছে-এসব অনুসরণ করার কোন

প্রয়োজন মুসলমানদের নেই। মুসলমানদের অনুসরণ করার প্রয়োজন, একমাত্র কোরআন ও সুন্নাহ। এ দুটো ব্যতিত অন্য কোন কিতাবের কথা, কোন ব্যক্তির কথা অনুসরণ করা যেতে পারে না। হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তির কথা ও কিতাবের লেখার সাথে কোরআন-সুন্নার বিধানের সংঘর্ষ না ঘটে, তাহলে তা অনুসরণ করা যেতে পারে। এর নামই হলো আনুগত্য এবং আল্লাহর ইবাদাত। কোরআন-সুন্নাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ব্যতিত কোন কিছুর অন্ধ অনুকরণ করা যাবে না-এর নামই হলো ইবাদাত। কেবলমাত্র চোখ বন্ধ করে আল্লাহর বিধানের সামনে মাথানত করতে হবে, আনুগত্য করতে হবে।

পূজা বনাম ইবাদাত

এই পৃথিবীতে কোন মানুষকে বা জড়-অজড় পদার্থকে ক্ষমতার উৎস মনে করে বা ক্ষমতাশালী মনে তার কাছে দোয়া করা, প্রার্থনা করা, নিজের দুঃখমোচনের লক্ষ্যে তাকে ডাকা, যেমনভাবে আল্লাহকে ডাকা উচিত, নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণের আশায়, বিপদ থেকে মুক্তি লাভের আশায় ডাকা পূজার অন্তর্ভুক্ত এবং সম্পূর্ণ শিরক। কাউকে সম্মান প্রদর্শের উদ্দেশ্যে রুকু সিজদা করা, তার সামনে দু'হাত বেঁধে দাঁড়ানো, কোন মাজার বা কবরে তাওয়াফ করা, কোন আস্তানায় চুমো দেয়া, কারো সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে উপহার-উপঢৌকন দেয়া, কোরবানী করা এবং এ জাতিয় যে কোন অনুষ্ঠান করা-যা সাধারণতঃ পূজার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, এসবই হলো শির্ক।

কারণ পূজা-উপাসনা লাভের অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। নিজের যে কোন প্রয়োজনের জন্য একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে। আল্লাহ বলেন-

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِىَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّىْ-وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

হে নবী, এসব লোককে বলে দাও, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো আমাকে সেসব সত্তার দাসত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমার কাছে আমার রব্ব-এর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী এসেছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন গোটা বিশ্ব-জাহানের রব্ব-এর সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করি। (সূরা মুমিন-৬৬)

এ আয়াতে ইবাদাত ও দোয়াকে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নবীর মাধ্যমে এ কথা বলে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহর পূজা করা ত্যাগ করে যাদের পূজা করছো, যাদের সামনে পূজা-উপাসনা করছো, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, আমি যেন তাদের পূজা-উপাসনা না করি। এ ব্যাপারে আমার কাছে আমার রব্ব-এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। আমার রব্ব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আমার মাথা বিনয়ের সাথে একমাত্র তাঁরই সামনে নত করি, যিনি গোটা জাহানের রব্ব এবং তাঁরই সামনে সমস্ত সৃষ্টি আনুগত্যের মস্তক নত করে দিয়েছে, সমগ্র সৃষ্টিলোক তাঁরই পূজা-উপাসনা করছে।

এভাবে যেসব মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে পৃথিবীতে যাদের পূজা-উপাসনা করে থাকে, এরা হলো সবচেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট। আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّيَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ-وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ-

সে ব্যক্তির চেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট কে-যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। এমনকি আহ্বানকারী যে তাকে আহ্বান করছে সে বিষয়েও সে অজ্ঞ। যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে তখন তারা নিজেদের আহ্বানকারীর শত্রু হয়ে যাবে এবং ইবাদাতকারীদের অস্বীকার করবে। (সূরা আহ্কাফ-৫-৬)

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মানুষ মাজারে গিয়ে মাজারে শায়িত ব্যক্তিদের কাছে, মূর্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, নানা আশাপূরণ করার জন্য দেয়া করে, এসব লোক হলো পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে অগ্রগামী দল। মাজারে গিয়ে, দরগায় গিয়ে, মন্দিরে মূর্তির কাছে গিয়ে তাদেরকে উপাস্য তথা আশাপূরণকারী, সাহায্যদানকারী মনে করে যেসব নালিশ বা সাহায্য প্রার্থনা করে অথবা তাদের কাছে দোয়া করে, তারা আবেদনকারীর আবেদনে কোন প্রকার ইতিবাচক বা নেতিবাচক বাস্তব তৎপরতা প্রদর্শন করতে সক্ষম নয়। এসব আহ্বানকারীদের আহ্বান আদৌ তাদের কানে পৌঁছে না। এদের নিজের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে, এরা নিজের কানে আদেবদনকারীর আবেদন শোনে বা এমন কোন সূত্র নেই, যে সূত্রে তারা অবগত হতে পারে যে, তাদের কাছে কেউ দোয়া করছে বা আবেদন করছে।

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অন্য সত্তার কাছে আবেদন-নিবেদন করে, এসব স্বকোপলকল্পিত সত্তা সাধারণতঃ তিন ধরনের হয়ে তাকে। প্রথম প্রকার হলো, একশ্রেণীর মানুষ যেসব মূর্তি নিজ হাতে নির্মাণ করে এদের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দেয়। এদের কাছে মনের ব্যথা-বেদনা, কামনা-বাসনা নিবেদন করে। এসব সত্তা প্রাণহীন জড়পদার্থ। স্বাভাবিকভাবেই এদের কোন শক্তিই নেই। আবেদনকারীর কোন আবেদন এদেরকে স্পর্শও করতে পারে না।

দ্বিতীয় যেসব সত্তার পূজা-অর্চনা, উপাসনা একশ্রেণীর মানুষ করে, তারা হলো সেই সব ব্যক্তি-যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদাত, পূজা-উপাসনা ও বন্দেগী করে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছিলেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা প্রতি নিয়ত সংগ্রাম-মুখর জীবন অতিবাহিত করতেন। এসব সম্মানিত ও মর্যাদাবান বুযর্গ লোকগুলো পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করার পরে একশ্রেণীর স্বার্থলোভী মানুষ এদের কবরকে ঘিরে নানা ধরনের অনুষ্ঠান শুরু করে দিল এবং এসব লোক সম্পর্কে নানা ধরনের কাল্পনিক অলৌকিক ঘটনার কথা অজ্ঞ লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলো। যেন লোকজন এসব মাজারে এসে সাহায্য কামনা করে, বিপদ থেকে মুক্তি চায় এবং সেই সাথে উপহার-উপঢৌকন দেয়,

অর্থ-সম্পদ বিলিয়ে দিতে থাকে। এসব বুযর্গ ব্যক্তিও আবেদনকারীর কোন আবেদন শুনতে পান না। কারণ তারা মৃত এবং মৃত লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

اِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى–

তুমি মৃত লোকদের কোন কথা শোনাতে পারবে না। (কোরআন)

আল্লাহর ওলীগণ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করার পরে আল্লাহর কাছে তারা এমন একটি জগতে অবস্থান করছেন, যেখানে কোন মানুষের আওয়াজ সরাসরি পৌছে না। কোন ফেরেশ্তার মাধ্যমে তাদের কাছে এ সংবাদ পৌছানো হয় না যে, 'আপনাদের কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বা সেজদায় অবনত হয়ে লোকজন আপনার কাছে দোয়া কামনা করছে।' এসব সংবাদ এজন্য তাদেরকে দেয়া হয় না যে, তারা তাদের গোটা জীবনকাল ব্যাপী আন্দোলন করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, মানুষ যেন কেবলমাত্র এক আল্লাহর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করে। এখন যদি তারা জানতে পারেন যে, তিনি যেসব বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, মানুষ উল্টো তারই কবরকে কেন্দ্র করে ঐসব বিষয় অনুষ্ঠিত করছে, তার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছে। তাহলে তারা মনোকষ্ট লাভ করবেন–আর আল্লাহ্ তাঁর কোন প্রিয় বান্দাকে সামান্য কষ্টেও নিক্ষেপ করেন না।

স্বার্থান্বেষী লোকগণ আল্লাহর ওলীদের মাজারকে কেন্দ্র করে শির্কের উৎসের স্থলে পরিণত করেছে। এসব লোকদের নামের পূর্বে 'পীর-মাওলানা' শব্দও ব্যবহার হতে দেখা যায়। এই ধরনের পীর ও মাওলানা উপাধিধারী মাজার পূজারী লোকগণ নিজেদের স্বার্থ টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে দল তৈরী করেছে। মানুষ যেন এদেরকে নবীর সুন্নাতের প্রকৃত অনুসারী মনে করে, এ জন্য তারা তাদের দলের নাম দিয়েছে, 'আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত।' অর্থাৎ এটা সেই দল–যে দল সুন্নাতের অনুসরণ করে থাকে।

মানুষের অর্থ-সম্পদ শোষনের লক্ষ্যে এরা সুন্নাতের নামাবলী গায়ে দিয়ে বলে থাকে, 'মাজারে যিনি শুয়ে আছেন, তিনি জীবিতকালে যতটা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন, ইন্তেকাল করার পরে তার শক্তি আরো কয়েক গুণ বৃদ্ধি লাভ করেছে, কারণ এখন তো তারা সরাসরি আল্লাহর দরবারে যাতায়াত করার অনুমতি পত্র লাভ করেছেন।'

এই সব স্বার্থান্বেষী কর্মবিমুখ-বিভ্রান্ত লোকজন, শ্রমলব্ধ উপার্জন কষ্টকর মনে করে অজ্ঞ মানুষের অর্থ হাতিয়ে নেয়ার কৌশল হিসাবে মাজারে বিশালাকৃতির বৃক্ষ তৈরী করেছে। লোকজনকে বলা হয়েছে, অমুক নির্দিষ্ট দিনে এসে এই বৃক্ষের গোড়ায় অমুক অমুক জিনিস উপহার দিয়ে গেলে মনের আশা পূরণ হবে। বৃক্ষের শাখায় কোন ভারী পাথর বা ইট বেঁধে দিলে গর্ভে সন্তান আসবে। এমন ধারণা দেয়া হয়েছে যে, পাথর বা ইট যেমন ওজনদার, তেমনি সন্তানের ভারে গর্ভ ভারী হবে, গর্ভ স্ফিত হয়ে উঠবে। মাজারের পাশে জলাশয় নির্মাণ করে সেখানে মাছ, কুমির, কাছিম ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর বিধান তথা ইবাদাত সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষের ভেতরে এই ধারণার জন্ম দেয়া হয়েছে যে, এসব মাছ, কাছিম আর কুমিরকে

খাদ্য প্রদান করলে, চুমো দিলে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে, মনের আশা পূরণ হবে, নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভ করবে। এভাবে মানুষকে আল্লাহর পূজা-অর্চনা ও উপাসনা থেকে বিরত রাখা হয়েছে এবং শির্কে নিমজ্জিত করা হয়েছে, আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহ মুখী না করে মাজার মুখী করা হয়েছে।

মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে বিরত করে এমন সব শক্তির ইবাদাত করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, যাদের কোনই শক্তি নেই। সূরা ইউনুসের ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ-

এবং তারা আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কিছুর ইবাদাত করছে, যা তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না। আর বলে, এরা আল্লাহর দরবারে আমাদের সুপারিশকারী।

যারা এ ধরনের বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত তারা বলে থাকে, আমরা এসব দরগাহ্ আর মাজারে এ জন্য প্রার্থনা করি যে, আল্লাহর এসব ওলীগণ আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন এবং এরা হলেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। পৃথিবীতে একটি সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন কোন একক ব্যক্তির পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না, সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনার জন্য মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওপরে নানা রকম দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তেমনি আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে এক একটি শক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আমরা সেসব শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যই তাদের পূজা-উপাসনা করি, তাদের দরবারে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করি।

উল্লেখিত ধারণা একটি ভয়ঙ্কর ধারণা। কোন মুসলমান যদি এমন ধারণা পোষণ করে, তাহলে সে আর মুসলিম জনগোষ্ঠীর একজন থাকবে না। সরাসরি মুশরিক হয়ে যাবে। এরা মানুষের সীমিত ক্ষমতার মতো আল্লাহর ক্ষমতাকেও সীমিত মনে করে। মানুষ দুর্বল, তার ক্ষমতা সীমিত–এ জন্য মানুষ একা দেশের সমস্ত কাজের আঞ্জাম দিতে সক্ষম নয় বলে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ তো অসীম ক্ষমতার অধিকারী–সমস্ত সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর যে ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে চান, তাঁর সে ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তিনি কুন বললেই তাঁর ইচ্ছা সাথে সাথে প্রতিফলিত হয়। সুতরা‚ং তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় অন্য কোন শক্তির পূজা-উপাসনা করার কোনই প্রয়োজন নেই। সরাসরি তাঁরই পূজা-উপাসনা, আনুগত্য, বন্দেগী বা ইবাদাত করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ কারো কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ কোন কিছুই করতে পারে না। কোন পীরের এমন ক্ষমতা নেই, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে কোন মানুষের দেহের একটি পশমের কোন ক্ষতি করতে পারে। এভাবে কোন দেব-দেবী বা অন্য কোন কল্পিত সত্তারও কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ বলেন–

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهٗ اِلاَّ هُوَ-وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

কোন দুঃখ ও বিপদ যদি তোমাকে গ্রাস করে থাকে তবে তা (আল্লাহর মর্জিতেই হয়েছে বলে মনে করতে হবে এবং তা) দূর করার কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এমনিভাবে তুমি যদি কোন কল্যাণ লাভ করে থাকো তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান। (সূরা আনআ'ম-১৭)

মানুষের জীবনে যে কোন বিপদ আসে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে এবং সে বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। যখন কোন কল্যাণ আসে সেটাও আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। এ জন্য পূজা-উপাসনা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে। সূরা ইউনুসের ১০৭ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهٗ اِلاَّ هُوَ-وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهٖ-يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ-وَهُوَ الْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ-

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন, তবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়।

পবিত্র কোরআনের এসব আয়াত যেমন মূর্তির ব্যাপোরে প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য তাদের পীর, মাজার-দরগার ব্যাপারে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তা'য়ালা নিজের জন্য যেসব কাজ নির্দিষ্ট রেখেছেন, সেসব কাজের ব্যাপারে কারো মধ্যে কোন ক্ষমতা বন্টন করেননি। তিনি কাউকে এজেন্সি দান করেননি যে, যে কেউ ইচ্ছা করলেই কোন নিঃসন্তানকে সন্তান দান করতে পারে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দিতে পারে বা কৃষিতে অধিক উৎপাদন করে দিতে পারে। ইবাদাতের ব্যাপারে কিছু সংখ্যক মানুষের বিশ্বাস এতটা নিম্ন স্তরে নেমে গিয়েছে যে, অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির আশায়, সম্মান-মর্যাদা লাভের আশায় পীর সাহেবের পা ধোয়া পানি পর্যন্ত কেউ কেউ পান করে। পীর সাহেব গোসল করলে সেই গোসলের পানিও তারা পানা করে। এমনকি নিজের স্ত্রী ও কন্যাদেরকে পীর সাহেবের খেদমতে নিয়োজিত করা হয়। পীরের প্রতি এমন সম্মান মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়, যে সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী হলেন আল্লাহ। পূজার মাধ্যমে পীরকে এরা আল্লাহর আসনে বসিয়ে ছেড়েছে।

কোন পীরের এ ক্ষমতা নেই যে, তারা কোন তদবীর দিয়ে কাউকে দশতলার মালিক বনিয়ে দিবে, শিল্প কারখানার মালিক বানাবে। আল্লাহ যদি রাজি না থাকেন, তাহলে কারো ভাগ্য কেউ পরিবর্তন করে দিতে পারে না। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় তথাকথিত পীরকে পূজা করা শির্‌ক। এই শির্‌ক থেকে নিজেকে হেফাজত করার জন্য একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করতে হবে। আল্লাহ বলেন-

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ-فَانْ فَعَلْتَ فَانَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমাকে কোন উপকার করে দিতে পারে না, তোমার কোন ক্ষতি সাধনও করতে পারে না। তুমিও যদি তাই করো তাহলে তুমিও জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা ইউনুস-১০৬)

আল্লাহ রাজি না থাকলে কারো দোয়ায় ভাগ্য পরিবর্তন হবে না। সুতরাং কোন মূর্তি নির্মাণ করে যেমন তার পূজা অর্চনা করা যাবে না, তেমনি কোন পীরের পূজা, মাজারের পূজা, দরগারও পূজা করা যাবে না। মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে যারা পূজা অর্চনা করে, মূর্তির কাছে যারা নিজেদেরকে নিবেদন করে, তাদের ব্যাপারে সূরা ফাতিরে আল্লাহ বলেন-

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَيَسْمَعُوْا دُعَاءَ كُمْ-وَلَوْسَمِعُوْا مَااسْتَجَابُوْا لَكُمْ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যারই কাছে দোয়া করো, তাদের কেউ-ই একবিন্দু জিনিসের মালিক নয়। এরপরও যদি তোমরা তাদেরই ডাকো, তাদের কাছেই দোয়া করো, তবুও তারা তোমাদের ডাকও শুনতে পারে না, শুনতে পারে না তোমাদের দোয়া।

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, কিছু সংখ্যক মানুষ পূজা-উপাসনার ব্যাপারে তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে তারা-যারা নিষ্প্রাণ মূর্তির বা জড়পদার্থের পূজা করে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে সেসব বুযর্গ, যারা মাজারে শায়িত রয়েছেন। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ঐ সব ব্যক্তি, পৃথিবীতে যারা আল্লাহ বিরোধী মতাবাদ-মতাদর্শ সৃষ্টি করেছে, নেতা হিসাবে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এসব চিন্তানায়কগণ বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জীবিত থাকা অবস্থায় কখনো আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেনি এবং তাদের অনুসারীদেরকেও অনুসরণ করতে বলেনি। আল্লাহ বিরোধী চিন্তা-চেতনা অনুসারে তারা পরিচালিত হয়েছে এবং কর্মীদেরকেও পরিচালিত করেছে। এদের মৃত্যুর পর তাদের অনুসারীগণ এদের মূর্তি নির্মাণ করে বা বিশালাকারের ছবি বানিয়ে উপাস্যের আসনে বসিয়ে ফুল দিয়ে পূজা করে থাকে। এসব ছবিতে বা এদের নামে নির্মিত স্তম্ভে ফুল দেয় এবং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে থাকে।

এসব আল্লাহ বিরোধী প্রয়াত নেতাদের নামে নির্মিত স্তম্ভে, ছবিতে ফুল দিয়ে পূজা করার ব্যাপারে বা কিছুক্ষণ নীরবতা পালনের মাধ্যমে যে পূজা-উপাসনা করা হলো, এদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হলো, এসবের মাধ্যমে তাদের আত্মার তো উপকার হলোই না, এমনকি তারা জানতেও পারে না-তাদেরকে এভাবে তার অনুসারীরা পূজা করছে। এদের ব্যাপারে যে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে সেখানে তাদের সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তৃতা করা হলো, এসব সংবাদও তারা জানতে পারে না। কারণ এরা নিজেদের মারাত্মক অপরাধের

কারণে আল্লাহর বন্দীশালায় বন্দী রয়েছে। বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে এসব জালিম আত্মাগণ। সেখানে পৃথিবীর কোন আবেদন-নিবেদন পৌছে না। আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্তাগণও তাদেরকে এ সংবাদ দেন না যে, 'তোমরা পৃথিবীতে যে ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনার প্রবর্তন করে এসেছো, তা খুবই সফলতা লাভ করেছে এবং তোমার অনুসারীরা ফুল দিয়ে-কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করে, সেমিনারের আয়োজন করে তোমার প্রতি সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন করছে।'

এ সংবাদ তাদের কাছে পৌছলে ক্ষণিকের জন্য হলেও ভ্রান্ত চিন্তাধারার প্রবর্তক, আল্লাহ বিরোধী নেতাদের কলুষিত আত্মার খুশীর কারণ হতে পারে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'য়ালা কোন জালিমের কখনো খুশী চান না। এখানে আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ইবাদাতকারী বান্দাদের আত্মার কাছে পৃথিবীর মানুষের প্রেরিত সালাম এবং তাদের রহমত কামনার দোয়া পৌছে দেন।

কারণ এসব দোয়া-সালাম তাদের খুশীর কারণ হয়। একই ভাবে আল্লাহ তা'য়ালা অপরাধী-জালিমদের আত্মাদেরকে পৃথিবীর মানুষের অভিশাপ, ক্রোধ ও তিরস্কার সম্পর্কেও অবহিত করেন। যেন তাদের মনোকষ্ট আরো বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং কারো ছবির প্রতি, মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, মৃত ব্যক্তিদের সম্মানে কোন স্তম্ভ নির্মাণ করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, আশা-আকাংখা পূরণের আশায় কারো প্রতি পূজার অনুরূপ মর্যাদা দেয়াও তাদের ইবাদাত করার শামিল। নামাজের মধ্যে 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি' এ কথা বলার পরে কোন মুসলমানের এই অধিকার নেই যে, সে অন্য কারো ছবির পূজা করবে, কোন পীরের পূজা করবে, কোন মাজারে গিয়ে ধর্ণা দেবে। এসব থেকে মুসলমান নিজেকে হেফাজত করবে এবং কেবলমাত্র তার পূজা-উপাসনা, দাসত্ব-বন্দেগী আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে।

আল্লাহর দাসত্ব মানুষের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা

মানুষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার কারণে। শয়তান যেমন ঘৃণিত এবং পৃথিবীর মানুষের অভিশাপই সে প্রতি মুহূর্তে লাভ করছে, তেমিন শয়তানের পদাঙ্ক যারা অনুসরণ করে, তারাও তেমনি ঘৃণিত এবং অভিশাপ লাভের যোগ্য এবং তারা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তা এবং আল্লাহর মুমিন বান্দাদের ও সমস্ত সৃষ্টির অভিশাপ লাভ করছে। বিষয়টি বড় আশ্চর্যের যে, সাধারণ মানুষ শয়তানকে গালি দেয় আর শয়তানের অনুসরণ যারা করে, তাদের প্রতি নানাভাবে সম্মান প্রদর্শন করে। হাদীস শরীফে এসেছে, কোন ফাসিকের প্রশংসা করা হলে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে।

সুতরাং, শয়তান এবং শয়তানের কোন অনুসারীর আনুগত্য যেমন করা যাবে না, তেমনি তাদের প্রশংসাও করা যাবে না। সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসা তো কেবল তারাই লাভ করতে পারেন, এই পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন পারিচালিত করে থাকেন তথা আল্লাহর ইবাদাত-দাসত্ব করেন।

কোন মুনাফিকও সম্মান-মর্যাদা লাভ করতে পারে না। মুনাফিক শ্রেণীর লোকজন নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে আল্লাহর আবেদ বান্দাদের অনুরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিতে থাকে।

নিজের নামের পূর্বে এমন সব বিশেষণ ব্যবহার করে যে, বিশেষণের আধিক্যের কারণে ব্যক্তির আসল নাম যে কি, তা খুঁজে পাওয়া যায় না। হাদিয়ে জামান, কাইয়ূমে জামান, মুজাদ্দেদে জামান, রাহনুমায়ে শরিয়ত, সেরাজুস সালেকিন, মেছবাহুল আরেফিন, আশেকে রাসূল, মাহবুবে খোদা, আশেকে পান্দান, সিহায়ে দান্দান, আশেকে মাওলা–এরা শুধু নামের শেষে নবীদের নামের অনুরূপ 'আলাইহিস্ সালাম' লেখাই বাদ দিয়েছে, এ ছাড়া যতগুলো বিশেষণ ব্যবহার করা প্রয়োজন, তা তারা করে থাকে। এদের ভেতরে আল্লাহ ভীতি যে নেই, তা এদের শান-শওকত পূর্ণ জীবনধারার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এরা ভেক্ ধরে মানুষকে ধোকা দিয়ে সম্মানের আসনে আসীন হতে চায় এবং অর্থ সম্পদের পাহাড় গড়তে চায়। এদের এই মুনাফেকী সম্পর্কে কবি বলেন–

ইয়ে হাল তেরা জাল হ্যায়, মাক্ছুদ তেরা মাল হ্যায়,
কেয়া আযব তেরা চাল হ্যায়, লাখো কো আন্ধা ক্যর দিয়া

তোমার এই বেশভূষা সম্পূর্ণ নকল, তোমার কর্মকান্ড চাতুরী পূর্ণ। তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো অর্থ-সম্পদ অর্জন করা, এভাবে তুমি অসংখ্য মানুষকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখেছো।

এসব মুনাফিকরা নিজেদের চিন্তার জগতে, মন-মানসিকতায় কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা তথা হৃদয় জগতকে আল্লাহর রঙে রাঙাতে পারেনি। দেহটাকেই শুধু পোষাকের মোড়কে আল্লাহর রঙে রঙিন হিসাবে প্রদর্শন করার চেষ্টা করে থাকে। নিজেদের কদর্য রূপটাকে সুন্নতী লেবাসের মোড়কে আবৃত করে রেখে সাধারণ মানুষকে ধোকা দেয়ায় ব্যস্ত এসব বেদাআত পন্থীরা। এই শ্রেণীর ভন্ডদের সম্পর্কে কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন–'মন না রাঙায়ে কেন বসন রাঙালে যোগী ?'

সুতরাং সম্মান-মর্যাদার অধিকারী কেবল তারাই, যারা আল্লাহর গোলামী করেন। আর যারা একমাত্র আল্লাহর গোলাম, তারা অবশ্যই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে থাকেন। হকপন্থী পীর সাহেবগণ অবশ্যই হক কথা বলেন, আল্লাহ বিরোধী কোন কিছু তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ার সাথে সাথে প্রতিবাদ করে থাকেন, মানুষকে নিজের গোলাম না বানিয়ে আল্লাহর গোলাম বানানোর চেষ্টা-সাধনা করে থাকেন। তারা রাজা-বাদশাহের মতো চলাফেরা করেন না।

এরা সত্যকার অর্থেই আল্লাহভীরু। অর্থ-সম্পদের প্রতি এরা দৃষ্টি দেন না, দৃষ্টি দেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে আর এই ইবাদাতই মানুষের ভেতরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে দিবে। আর যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের সম্পর্কে সূরা হুজুরাতের ১৩ নং আল্লাহ বলেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ–

তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বেশী ভয় করে।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন, তাঁর দাসত্ব করার লক্ষ্যে। সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো দাসত্ব করা। দাসত্বের মাধ্যমে যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন, তারা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত বান্দাহ্ হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ইবাদাত গুজার কোন বান্দাহ্ সম্পর্কে অনুগ্রহ করে, কিছু বলেছেন–তখন পরম স্নেহের ভাষা, আদরের ভাষা ব্যবহার করেছেন। স্নেহের সেই ভাষাটি হলো, 'আব্দ' অর্থাৎ বান্দাহ্। যারা আল্লাহর দাসত্ব করবে তিনি তাদেরকে পুরস্কার হিসাবে জান্নাত দান করবেন। সেই জান্নাতীদের সম্পর্কে আল্লাহ মমতার ভাষায় বলেছেন–

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا–

জান্নাতে আল্লাহর বান্দাদের জন্য প্রবাহিত ঝর্ণধারা রয়েছে, এসব ঝর্ণার কাছে গিয়ে তাদেরকে পানি পান করতে হবে না, বরং তাদের ইশারায় ঝর্ণা তাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে।

জান্নাতে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা রয়েছে, এসব ঝর্ণার পানি হবে অত্যন্ত সুস্বাদু। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর গোলামী করেছে, তারা জান্নাত লাভ করবে এবং সেই ঝর্ণার পানি পান করবে। পানি পান করার জন্য তাদেরকে ঝর্ণার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না, তারা শুধু ইশারা করবে আর অমনি ঝর্ণা তাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে। এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ইবাদুল্লাহ বলে, তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে কথা উল্লেখ করেছেন।

অর্থাৎ যারা আল্লাহর দাসত্ব করে, তারা আল্লাহর কাছে কতটা সম্মান ও মর্যাদা ল্যাভ করবেন, তা উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর গোলামী করে, তাঁদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা পরম মমতাভরে বলেছেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا–

রাহ্মানের বান্দাহ্ যারা তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে যমীনে চলাফেরা করে। (ফোরকান-৬৩)

যারা আল্লাহর ইবাদাত করে, আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াতে তাদেরকে অত্যন্ত আদর করে 'রাহ্মানের বান্দাহ্' বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর ইবাদাত এভাবেই মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করে দেয়। ইবলিস শয়তান আল্লাহর আদেশ অমান্য করার পরে যখন সে অভিশপ্ত হয়ে গেল, তখন সে আল্লাহর সামনে বলেছিল–হে আল্লাহ ! তোমার যে বান্দার কারণে আমি অভিশপ্ত হলাম, আমি সেই বান্দাদেরকে প্রতারণা, প্ররোচনা, লোভ-লালসা, প্রলোভন ইত্যাদির মাধ্যমে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করবো। তখন আল্লাহ তা'য়ালা ইবলিসকে বলেছিলেন–

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ–

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমার প্রকৃত বান্দাহ যারা তাদের ওপর তোর কোন আধিপত্য চলবে না। তোর কর্তৃত্ব তো শুধু সেই বিভ্রান্ত লোকদের ওপরেই চলবে, যারা তোর অনুসরণ ও আনুগত্য করবে। (সূরা হিজর-৪২)

এ আয়াতেও আল্লাহ্ তা'য়ালা পরম স্নেহের সাথে 'আমার বান্দাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহর দাসত্বকারী বান্দাহ্দেরকে এভাবে পবিত্র কোরআনে 'আব্দ' বা বান্দাহ্ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শব্দ দিয়ে তাদের প্রতি সম্মান-মর্যাদা ও আল্লাহর রহমত-করুণার কথাই বলা হয়েছে। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে একটি মারাত্মক ধারণা পোষণ করে। তারা বলে–

وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ-

খৃষ্টানারা বলে মসীহ হলেন আল্লাহর পুত্র। (সূরা তওবা-৩০)

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের এই মারাত্মক ধারণার প্রতিবাদ করে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে মমতার সাথে জানিয়ে দিলেন–

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ عَنْ عَمْنَا عَلَيْهِ-

সে আমার একজন বান্দাহ্ ব্যতিত আর কিছুই নয়। (কোরআন)

আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া লজ্জার কোন বিষয় তো নয়-ই বরং গৌরবের। মানুষ আল্লাহর বান্দাহ্, এটা মানুষের অহঙ্কার। কোন নবী এবং ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়ার ব্যাপারে কোন লজ্জাবোধ করেননি। আল্লাহ্ বলেন–

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَ لاَ الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ-

মসীহ আল্লাহর বান্দাহ্ এবং এ বান্দাহ্ হওয়ার ব্যাপারে তিনি কখনো লজ্জা অনুভব করেননি, এমনকি আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশ্তাগণও আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়ার ব্যাপারে লজ্জানুভব করেন না। (সূরা নেছা-১৭২)

আর যারা আল্লাহর গোলাম হওয়ার ব্যাপারে লজ্জানুভব করে এবং অহঙ্কার প্রদর্শন করে, আল্লাহর গোলামী করতে অস্বীকার করে, তাদের ব্যাপারে সূরা নেছার ১৭২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন–

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِه وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا-

আল্লাহর দাসত্ব করার ব্যাপারে যারা লজ্জা পোষণ করবে, অহঙ্কার প্রদর্শন করবে–তাহলে তারা সেদিন আত্মরক্ষা করবে কিভাবে, যেদিন তাদের সবাইকে একত্রিত করা হবে?

আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া এবং পৃথিবী ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করা। এটা মানুষের জন্য সব থেকে বড় নিয়ামত যে, সে আল্লাহর বান্দাহ হতে পেরেছে। কারণ পৃথিবীতে সমস্ত নবী-রাসূলই আগমন করেছিলেন, মানুষকে আল্লাহর বান্দাহ্ হিসাবে গড়ার জন্য। এই সম্মান ও মর্যাদা বড়ই দুর্লভ। আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমে এই দুর্লভ গুণে মানুষকে গুণান্বিত হতে হবে। যারা এই গুণে

গুণান্বিত হতে পারবে, তারই কেবল সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে কাছের-জন হলেন নবী-রাসূলগণ। তাঁর পরম প্রিয় নবী-রাসূলদেরকেও তিনি পরম স্নেহভরে 'বান্দাহ্' বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ-اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ-

এরূপই ঘটলো, যাতে আমি অন্যায় পাপ ও নিলর্জতা তার থেকে বিদূরিত করে দিই। প্রকৃত পক্ষে সে আমার নির্বাচিত বান্দাহ্দের একজন ছিল। (সূরা ইউসুফ-২৪)

এ আয়াতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে মহান আল্লাহ আদর করে তাঁর 'বান্দাহ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সমস্ত নবীদেরকে বিশেষ এলাকার জন্য, বিশেষ জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোটা পৃথিবীর নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। সমস্ত নবী-রাসূলদের মধ্যে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর দরবারে যে কতটা উচ্চে তা কল্পনাও করা যায় না। তাঁর থেকে প্রিয় পাত্র আল্লাহর কাছে আর কেউ নেই। তাঁকেই আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বান্দাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا-

আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয়।

সমস্ত নবী-রাসূলকে আল্লাহ তা'য়ালা নাম ধরে সম্বোধন করলেও তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো নাম ধরে অর্থাৎ 'হে মুহাম্মাদ' বলে সম্বোধন করেননি। তাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা যে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, সে মর্যাদার কারণে তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন না করে নানা ধরনের গুণবাচক নামে আহ্বান জানিয়েছেন। পরম মমতাভরে 'বান্দাহ' নামে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কোরআনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى-

অতঃপর তাঁর বান্দার কাছে যা ওহী করার ছিল, তা তিনি পূর্ণ করলেন। (কোরআন)

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বন্ধু সম্পর্কে এভাবে বলেছেন–

وَاَنَّهُ لَمَّا مَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا-

আল্লাহর এই বান্দাহ্ যখন নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে দন্ডায়মান হলো, তখন তারা তাঁর ওপরে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। (কোরআন)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা আরেক আয়াতে বলেছেন–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا-

অতীব বরকতপূর্ণ সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার ওপরে ফোরকান অবতীর্ণ করেছেন।

মেরাজের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় রাসূল প্রসঙ্গে বলেছেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا-

পাক-পবিত্রতম সেই আল্লাহ, যিনি তাঁর বান্দাহ্‌কে রাতের একটি অংশে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্‌সা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল)

এ ধরনের অনেক আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবিবকে আব্‌দ বলে সম্বোধন করেছেন। এই শব্দটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে দেয়া সবচেয়ে বড় খেতাব। এই খেতাব যারা অর্জন করতে পারবে, তারাই কেবল জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে, অন্য কেউ নয়। এই খেতাব অর্জন করতে হলে, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব, গোলামী, আনুগত্য, বন্দেগী ও পূজা, উপাসনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন শির্‌ক এবং শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না।

দাসত্বকারীর জন্য আল্লাহর ওয়াদা

যারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের লক্ষ্য করে ওয়াদা করেছেন। কর্মের মাধ্যমে যারা আল্লাহর 'বান্দাহ্‌' হওয়ার উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হবে, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই পুরস্কার দান করবেন। সে পুরস্কার এই পৃথিবীতেও যেমন দেয়া হবে, তেমিন দেয়া হবে আখিরাতে। এটা আল্লাহর ওয়াদা–আর আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, তাঁর ওয়াদাই হলো সবেচেয়ে দৃঢ় ওয়াদা। তিনি যে অঙ্গীকার করেন, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত করেন। একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতকারী বান্দাদের জন্য আল্লাহ এই পৃথিবীতে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ বলেন–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ-وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا-يَعْبُدُوْنَنِىْ لاَيُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا-

আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে ঠিক তেমনিভাবে খিলাফত দান করবেন যেমন তাদের পূর্বে

অতিক্রান্ত লোকদেরকে দান করেছিলেন, তাদের জন্য তাদের দীনকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যাকে আল্লাহ্ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের বর্তমান ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা শুধু আমার বন্দেগী করুক এবং আমার সাথে কাউকে যেন শরীক না করে। (সূরা আন নূর-৫৫)

আল্লাহর তা'য়ালার পরিষ্কার ওয়াদা, যারা আল্লাহর গোলামী করবে আল্লাহ তাদেরকে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদেরকে দান করবেন। সেই সাথে যাবতীয় সন্ত্রাস বিদূরিত করে শান্তি দান করবেন। মানুষ যে ভীতিকর অবস্থায় বর্তমানে এই পৃথিবীতে বসবাস করছে, সন্ত্রাস নামক দানব যেভাবে গোটা মানবতাকে গ্রাস করেছে, এ থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করবে। এই বিশ্ব নেতৃত্বের ক্ষমতা ও শান্তি-স্বস্তি লাভ করার শর্ত হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে এবং এই দাসত্বের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শিরক করা যাবে না অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার পাশাপাশি কোন মানুষের বানানো বিধানেরও অনুসরণ করা যাবে না। খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহরই গোলামী করতে হবে।

যারা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী বা দাসত্ব করবে, তারাই হবে এই পৃথিবীর শাসক। এরা শাসিত হবে না, গোটা বিশ্বকে এরা শাসন করবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা শাসিত (Dominated) হবে না–বরং তোমরাই শাসন (Dominate) করবে। ভীতির পরিবর্তে তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে। আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করার যে ওয়াদা দিয়েছেন তা শুধুমাত্র আদম শুমারীর খাতায় যাদের নাম মুসলমান হিসাবে লেখা হয়েছে তাদের জন্য নয় বরং এমন মুসলমানদের জন্য যারা প্রকৃত ঈমানদার, চরিত্র ও কর্মের দিক দিয়ে সৎ, আল্লাহর পছন্দীয় আদর্শের আনুগত্যকারী এবং সবধরনের শিরক মুক্ত হয়ে নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বকারী। যাদের ভেতরে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য নেই, নিছক মুখে ঈমানের দাবীদার, তারা আল্লাহর এই ওয়াদা লাভের যোগ্য নয় এবং তাদের জন্য এ ওয়াদা দেয়াও হয়নি। সুতরাং নামাজ-রোজার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে আর জীবনের অন্য সমস্ত বিভাগে মানুষের বানানো আইন-বিধান অনুসরণকারী তথাকথিত মুসলমানদের এই আশা নেই যে, তারা আল্লাহর ওয়াদানুসারে পৃথিবীতে শক্তিশালী রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে পৃথিবীর নেতৃত্ব লাভ করবে।

আল্লাহর দাসত্ব, বন্দেগী, ইবাদাত, পূজা-উপাসনাকারীদের জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালা যে পুরস্কার দান করবেন তাহলো, তিনি তাদেরকে এই পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করবেন, তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন, যাবতীয় সন্ত্রাস বিদূরিত করবেন এবং শান্তি ও স্বস্তি দান করবেন। এটা হলো পৃথিবীতে দেয়া পুরস্কার। তারপর তাদের ইন্তেকালের পরে আখিরাতের ময়দানে যে পুরস্কার দেয়া হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ–

যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করেছে অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে চলেছে, তারাই হচ্ছে সফলকাম। (কোরআন)

অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসরণ করেছে, আল্লাহকে ভয় করেছে, তারা সফল হয়েছে। আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং পৃথিবীতে যে দায়িত্ব তাদের ছিল, তারা সে উদ্দেশ্য পূরণ করেছে এবং দায়িত্ব পালন করেছে। এভাবে তারা সফলকাম হয়েছে অর্থাৎ জান্নাত লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا–وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا–وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا–

পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, তাদেরকে আমি এমন বাগিচায় স্থান দান করবো যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে এবং তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। বস্তুতঃ এটা আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে ? (সূরা নিসা-১২২)

ইসলামে ইবাদাতের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ইবাদাত যথাযথভাবে করার ওপরেই মানব জীবনের সার্থকতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। এ জন্য এই ইবাদাতের বিষয়টি পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা, যে সূরাটি মুসলমানদেরকে নামাজের মধ্যে বারবার পাঠ করতে হয়, সে সূরায় তা উল্লেখ করেছেন। ইবাদাত করলে আল্লাহ কি পুরস্কার দান করবেন, কোরআনে তাও উল্লেখ করেছেন, মুসলমানদেরকে এই ইবাদাত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। পৃথিবীর নেতৃত্ব তাদেরকে করায়ত্ব করতে হবে এবং পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসের অপশক্তিকে বিদায় করতে হবে।

ইসলাম বিরোধী শক্তি পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে সন্ত্রাস দমনের নামে গোটা পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাসের দানবকে অর্গল মুক্ত করে দিয়েছে। সন্ত্রাসের চিরাচরিত সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছে। নিজেদের সন্ত্রাসী তান্ডবকে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বলে অবিহিত করছে আর মুসলমানদের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাকে সন্ত্রাস নামে চিহ্নিত করছে। শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে তারা মুসলিম দেশসমূহে মানবতা বিধ্বংসী ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র ব্যবহার করে নারী, শিশু, কিশোর, কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে।

এই অবস্থা থেকে মানবতাকে রক্ষা করার জন্যই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর গোলামী করতে হবে। একনিষ্ঠভাবে গোলামী করলে আল্লাহ তাঁর ওয়াদানুযায়ী মুসলমানদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করবেন, তখন আল্লাহ তাঁর গোলামদের মাধ্যমেই এই পৃথিবী থেকে সন্ত্রাস বিদূরিত করে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠিত করাবেন।

ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা

এই ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা বর্তমানে গ্রহণ করা হয়েছে। ইবাদাতের এই ভুল অর্থ, ভুল ব্যাখ্যা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতরে ছড়িয়ে আছে। সাধারণ মুসলমানগণও যেমন ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে, তেমনি অসাধারণ মনে করা হয় যাদেরকে, তারাও এই ভুলের

মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমানই এই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে বলে, তারা ইবাদাতের প্রকৃত হক আদায় করছে না।

সাধারণ মুসলমানগণ ইবাদাতের যে ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে তাহলো–তারা মনে করেছে, নামাজ-রোজা, হজ্জ আদায় করা, কোরআন তেলাওয়াত করা, যিকির করা, তস্‌বীহ্ জপা ইত্যাদি হলো ইবাদাত। এসব পালন করার অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়, তখন তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। এই স্বাধীন জীবনে তারা আল্লাহর বিধানের প্রতিটি ধারাকে নিষ্ঠুরভাবে লংঘন করে। যারা রোজা পালন করে তারা বছরে একটি মাস রোজা পালন করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়ে তারা নামাজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে মনে করে, ইবাদাতের যাবতীয় হক আদায় হয়ে গেল।

এটাই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয় ? খুব বেশী হলে দেড় ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এই নামাজ আদায়ের নামই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, একজন মানুষ ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য আল্লাহর গোলাম। অবশিষ্ট সাড়ে ২২ ঘন্টার জন্য সে শয়তানের গোলাম।

এভাবে যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য আল্লাহর গোলামী যে করলো তাহলে সে ব্যক্তি প্রতিমাসে মাত্র ৪৫ ঘন্টা আল্লাহর গোলামী করলো। এক বছরে সে ৫৪০ ঘন্টা গোলামী করলো আল্লাহর। মানুষ যদি গড় আয়ু লাভ করে ৬০ বছর, তাহলে সে গোটা জীবনকালে ৩২৪০০ ঘন্টা গোলামী করলো। ২৪ ঘন্টায় একদিন অনুসারে মানুষ ৬০ বছরের জীবনকালে মাত্র ১৩৫০ দিন অর্থাৎ সাড়ে তিন বছরের সামান্য কিছু বেশী সময় আল্লাহর গোলামী করলো আর বাকি সাড়ে ৫৬ বছর শয়তানের গোলামী করলো।

একমাস রোজা পালন করার নামই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে বছরের অবশিষ্ট ১১ মাসের জন্য সে শয়তানের গোলাম। ৬০ বছরের জীবনকালে নিয়মিতভাবে প্রতি রমজান মাসে রোজা আদায় যদি করা হয়, তাহলে প্রতি বছরে ১ মাস হিসাবে মাত্র ৬০ মাস অর্থাৎ ৫ বছর হয়। মানুষ তার ৬০ বছরের জীবনকালে মাত্র ৫ বছরের জন্য আল্লাহর গোলাম হবে আর অবশিষ্ট ৫৫ বছর শয়তানের গোলামী করবে ?

কোন মুসলমানকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আপনি শয়তানের গোলাম বা চাকর হতে প্রস্তুত রয়েছেন কি না ? এই প্রশ্নের উত্তরে একজন মুসলমানও স্বীকৃতি দিবে না যে, সে শয়তানের গোলামী করবে। সুতরাং ইবাদাতের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত আদায় করার নামই ইবাদাত নয়। এগুলো অবশ্য করণীয় আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, এগুলো তো অবশ্যই আদায় করতে হবে। নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত হলো ইবাদাতের একটি অংশ। ইবাদাতের যে বিশাল পরিধি রয়েছে, তার কিছু মাত্র অংশ হলো নামাজ-রোজা। এগুলো একমাত্র ইবাদাত নয়। এই নামাজ-রোজা, হজ্জ, যাকাত মানুষকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইবাদাতের যোগ্য করে গড়ে তোলে। এগুলো যারা আদায় করে না, তারা ইবাদাতের যোগ্য

কোনক্রমেই হতে পারে না। সৈনিক জীবেন যেমন কুচকাওয়াজ করাই একমাত্র কাজ নয়, যুদ্ধের যোগ্য সৈনিক হিসাবে গড়ার লক্ষ্যেই তাদেরকে নানা ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয়, কুচকাওয়াজ করানো হয়। তেমনি নামাজ-রোজা নিষ্ঠার সাথে আদায় করার নির্দেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের বৃহত্তর ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেই দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে যোগ্যতার সাথে যেন পালন করতে সক্ষম হয়, সেই যোগ্যতা যেন মুসলমান অর্জন করতে পারে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমান যেন আল্লাহর বিধান অনুসরণের অভ্যাস সৃষ্টি করতে পারে, এ জন্যই নামাজ-রোজা আদায় করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে মুসলমানরা কতটা ভুল অর্থ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তা বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিমদের করুণ অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ওয়াদা করেছেন, মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদাত করলে তাদেরকেই পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করা হবে। পৃথিবীকে শাসন করবে তারা। এটা আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা। অথচ আমরা দেখছি, মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদাত করছে অর্থাৎ তারা নামাজ আদায় করছে, রোজা পালন করছে কিন্তু পৃথিবীর নেতৃত্ব লাভ করা তো দূরের বিষয়—গোটা পৃথিবীব্যাপী তারা লাঞ্ছিত হচ্ছে। এই পৃথিবীতে একটি কুকুর-বিড়ালের যে মূল্য রয়েছে, সে মূল্য মুসলমানদের নেই। তাহলে আল্লাহর ওয়াদা কি অসত্য ? মুসলমান আল্লাহর ইবাদাত করছে—তাদের এই দাবী যদি সত্য হয়, তাহলে আল্লাহর ওয়াদা অসত্য বলে বিবেচনা করতে হয়। আল্লাহর ওয়াদা যদি সত্য হয় (অবশ্যই সত্য) তাহলে মুসলমানদের দাবী মিথ্যা বলে বিবেচনা করতে হয়।

নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। তাঁর চেয়ে ওয়াদা রক্ষাকারী কোন সত্তার অস্তিত্ব কোথাও নেই। মুসলমানদের এই দাবীই মিথ্যা যে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করে থাকে। মুসলমানরা এই ইবাদাতের খণ্ডিত অংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ঠাহীনভাবে পালন করে থাকে। তারা নামাজ-রোজা আদায় করে অথচ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন দল করে, যে দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ইসলামের বিপরীত।

ঘুষ গ্রহণ করে, ঘুষ দেয়, মদপান করে, জিনা-ব্যভিচার করে, অশ্লীলতা আর নগ্নতা প্রসার-প্রচার করে, মিথ্যা কথা বলে, ওয়াদা ভঙ্গ করে, প্রতিবেশীর হক আদায় করে না, মাতা-পিতার অধিকার ক্ষুন্ন করে, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করে, মিথ্যা মামলা করে, মিথ্যা সাক্ষী দেয়। নারী ধর্ষন করে, নরহত্যা করে। মাজারে গিয়ে ধর্ণা দেয়, জীবিত ও মৃত মানুষকে শক্তিধর-নিজের প্রয়োজন পূরণকারী মনে করে। এক টুকরা রুটি, এক পাত্র পানির আশায় আল্লাহর দুশমনদের দরজায় ভিখারীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এমন কোন অপরাধ নেই যে, মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে না। অথচ তারা দাবী করছে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করে থাকে।

হজ্জ আদায় করে মক্কা-মদীনায় দাঁড়িয়ে মুসলমান বলে দাবীদারগণ ওয়াদা করছে, দেশে প্রত্যাবর্তন করেই সেই ওয়াদা ভঙ্গ করছে। ব্যাংকে গিয়ে সুদের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে।

সরকারের ট্যাক্স কমানোর জন্য ঘুষ দিয়ে ট্যাক্স কমিয়ে সরকারকে ধোকা দিচ্ছে। ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করছে। নির্বাচনের সময় পেশীশক্তি ব্যবহার করে জনগণের ভোট ছিন্‌তাই করছে। স্ত্রী-কন্যাদেরকে চলচিত্র জগতে পাঠিয়ে, মডেলিংয়ের নামে তাদের রূপ-যৌবন প্রদর্শনী করে দেহপসারিণী-রূপজীবিনীর ভূমিকা পালন করিয়ে অর্থ উপার্জন করছে। বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, গ্যাস বিল, পানির বিল ইত্যাদির ক্ষেত্রে শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশ ও জাতির অর্থআত্মসাৎ করে সে অর্থের সামান্য অংশ মসজিদে-মাদ্রাসায় দান করে, মাজারে-মৃত মানুষের কবর আবৃত করার জন্য মূল্যবান চাদর কিনে দিয়ে ধারণা করেছে, ইবাদাতের হক আদায় করা হলো।

এটাই যদি মুসলমানদের ইবাদাতের প্রকৃত স্বরূপ হয়, তাহলে পৃথিবীতে তারা ঘৃণিত-লাঞ্ছিত কেন হচ্ছে ? সত্যকারের ইবাদাত যদি মুসলমানদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীর নেতৃত্ব ঈমানদের হাতে নেই কেন ? মুসলমান যদি সত্যই ইবাদাত বুঝে করতো, তাহলে মানবতা আজ এতটা নিম্ন স্তরে নেমে যেতো না। বিশ্বজুড়ে অশান্তির আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তো না। সন্ত্রাস দমনের নামে অমুসলিম শক্তি মুসলিম দেশসমূহে আগ্রাসন চালাতো না, নির্বিচারে গনহত্যা করতো সক্ষম হতো না।

সাধারাণ মুসলমান এভাবে শুধু-নামাজ-রোজা, যাকাত দেয়া আর হজ্জ আদায়কে ইবাদাত মনে করেছে, রাজনীতি অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্প-সংস্কৃতি, যুদ্ধ-সমরনীতি ইত্যাদিকে ইবাদাত মনে করেনি। ব্যবসা, কৃষিকাজ চাকরীকে ইবাদাত মনে করেনি। মুসলমান চাকরী করে, অথচ সে চাকরীকে সে ইবাদাত মনে করে না বলেই চাকরীতে ফাঁকি দেয়। সুস্থ মানুষ অথচ সে মেডিকেল লিভ নিয়ে নিজেকে অসুস্থ দেখিয়ে ছুটি গ্রহণ করে তাবলিগে চিল্লা দিতে, ইজ্‌তেমায়, ইসালে সওয়াবে, ওয়াজ মাহফিলে যোগ দেয় সওয়াবের আশায়। এটা স্পষ্ট ধোকাবাজি।

চাকরী জীবনে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়, তা যথারীতি পালন করা অবশ্যকরণীয় তথা ইবাদাত। যারা চাকরী করে তাদের মধ্যে যারা নামাজ আদায় করে, নামাজের সময় হলে ফরজ নামাজ, সুন্নাত নামাজ আদায় করে পুনরায় নিজের কর্মে যোগ দিতে হবে। টাইম কিলিং করার জন্য, সময় ক্ষেপণ করার জন্য নফল নামাজ আদায় করা যাবে না। এর নাম ইবাদাত নয়-চাকরী ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করা ফরজ, সুতরাং ফরজ ত্যাগ করে নফল আদায় করা যাবে না। একশ্রেণীর মানুষ এ ধরনের কাজ ইবাদাত মনে করেই করে। কিন্তু এসব ইবাদাত নয়। ইবাদাত হলো জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আল্লাহর গোলামী করা।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান ভুল করেছে আর এদের পক্ষে ভুল করাই বর্তমান পরিবেশে স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একশ্রেণীর অসাধারণ মানুষও ইবাদাত সম্পর্কে ভুল করেছে। এরা মসজিদের চার দেয়ালে নিজেকে আবদ্ধ রাখা, খান্‌কায় বসে তস্‌বীহ জপ করা, হুজরাখানায় বসে নফলের পর নফল নামাজ আদায় করাকেই ইবাদাত মনে করেছেন। গোটা জাতি যখন জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত, ঘৃণ্য সুদ নামক দানব যখন জাতিকে গ্রাস

করছে, অশালীন অশ্লীল গান-বাজনার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে, সন্ত্রাস জনজীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে, আল্লাহর আইন-বিধানের পরিবর্তে যখন মানুষের বানানো আইন চলছে, শয়তানি শক্তির সৃষ্ট ঝড় দাপটের সাথে এসে মসজিদের দরজায়, হুজরাখানা-খানকার দরজায় আঘাত করছে, তখনও এসব অসাধারণ মুসলমানগণ চোখ বন্ধ করে আল্লাহ নামের যিকির করছেন, বিশালাকারের তস্‌বীহর দানা ঘুরিয়ে চলেছেন। এর নাম কি পরহেজগারীতা, আল্লাহভীতি বা ইবাদাত করা ?

ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে যখন সন্ত্রাসবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করছে, ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে, মসজিদ ধ্বংস করা হচ্ছে, মুসলিম মা-বোনদেরকে ধর্ষন করা হচ্ছে, মুসলিম শিশুদেরকে পা ধরে তার মাথা পাথরের ওপরে দেয়ালের সাথে আছাড় দিয়ে হত্যা করছে, প্রতিটি মুহূর্তে পৃথিবীর দেশে দেশে মুসলমানদেরকে পাখির মতো গুলী করে হত্যা করা হচ্ছে, বোমার আঘাতে মুসলিম দেশ, মসজিদ ধূলার সাথে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে, মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে অগণিত মুসলমানকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে যে মুহূর্তে, ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ শ্রেণীর অসাধারণ মুসলমানগণ হুজরাখানা, খানকা আর মসজিদের চার দেয়ালে আবদ্ধ থেকে তসবীহ জপ করতে থাকে, যিকির করতে থাকে, নফল নামাজ আদায় করতে থাকে।

এটাকেই কি ইবাদাত বলা হয় ? মুসলিম দেশ ও জাতির এই দুর্দিনে যদি এগিয়ে যাওয়া না হয়, আন্তর্জাতিক দস্যুদের বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদ না করা হয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি কণ্ঠ সোচ্চার না হয়, তাহলে যে ইবাদাতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা হয়েছে, সেই ইবাদাত কোন কাজে আসবে না এবং এ ধরনের ইবাদাতকারীর জন্য আল্লাহর ওয়াদা প্রযোজ্য নয়।

যিকির করতে হবে, তসবীহ তেলাওয়াত করতে হবে, কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে, নফল নামাজ তথা তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে হবে, নফল রোজাও রাখতে হবে, সেই সাথে অন্যায়, অবিচার, অনাচার তথা আল্লাহ বিরোধী আইন-কানুন বিধান তথা যাবতীয় কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ময়দানে সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এতে যদি দেহের তপ্ত রক্ত ময়দানে ঢেলে দিতে হয়, তাই দিতে হবে।

অর্থ-সম্পদ অকাতরে দু'হাতে বিলিয়ে দিতে হয় তাই দিতে হবে। যদি কারাগারের অন্ধ কুঠুরীতে প্রবেশ করতে হয়, হাসি মুখে প্রবেশ করতে হবে। যদি ফাসীর মঞ্চে দাঁড়াতে হবে। ইবাদাতের এই হক আদায় করার জন্য যে কোন পরিবেশ-পরিস্থিতির মোকাবেলা হাসি মুখে করতে হবে। তাহলেই ইবাদাতের পরিপূর্ণ হক আদায় হবে এবং আল্লাহর ওয়াদানুসারে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়া যাবে।

হযারত খাজা মাঈনুদ্দিন চিশ্‌তী আজমেরী (রাহ), হযরত শাহ্‌জালাল ইয়ামেনী (রাহ), হযরত খানজাহান আলী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত শাহ্‌ মাখদুম রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মুজাদ্দেদে আল-ফেছানী (রাহ), শহীদ সাইয়েদ আহ্‌মদ (রাহ), শহীদ ইসমাঈল হোসেন

(রাহ), শহীদ মাহমুদ মোস্তফা আল-মাদীন (রাহ)সহ এ ধরনের অগণিত অসাধারণ মুসলমান তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেছেন, তসবীহ তেলাওয়াত, কোরআন তেলাওয়াত, যিকির, নফল নামাজ আদায় করেছেন। সেই সাথে তারা ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে এক হাতে অস্ত্র অন্য হাতে কোরআন ধারণ করেছেন। ময়দানে তারা বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন। নিজেকে রাসূলের আওলাদ বলে দাবী করে, নামের পূর্বে অসংখ্য বিশেষণ জুড়ে দিয়ে ইবাদাতের হক আদায় করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাগণ যেভাবে ইবাদাতের হক আদায় করেছেন, সেভাবে আল্লাহর দাসত্ব, বন্দেগী তথা ইবাদাত করতে হবে।

সাধারণ এবং অসাধারণ মুসলমানগণ কথা ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে নামাজ-রোজা, হজ্জ, যাকাত, তসবীহ, কোরআন তেলাওয়াত করবেন যে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে বা তাঁকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে, সেই আল্লাহরই নির্দেশ অনুসারে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যায়-অনাচার, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে ময়দানে প্রতিবাদী পদক্ষেপে বিচরণ করতে হবে।

সুতরাং ইবাদাত বলতে কি বুঝায়, পবিত্র কোরআন কোন ধরনের কর্মকান্ডকে ইবাদাত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, কোন ইবাদাত প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছিল, এসব দিক বুঝতে হবে। ইবাদাত সম্পর্কে যদি ধারণা অর্জন করা না যায়, তাহলে মানুষ হিসাবে আমাদের পরিচয় দেয়াই বৃথা। কারণ মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিই করেছেন, তাঁর ইবাদাত করার জন্য, আল্লাহর গোলামী করার জন্য। আল্লাহর ইবাদাত বা গোলামী কি ধরনের হতে হবে, এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ দৃষ্টান্ত হিসাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে পেশ করেছেন। কেননা তিনিই আমাদের নাম দিয়েছেন মুসলমান এবং স্বয়ং আল্লাহ তাকে মুসলিম জাতির পিতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সম্পর্কে বলেন–

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ-قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

তার অবস্থা এই ছিল যে, তার রব্ব যখন তাকে বললেন, অবনত ও অনুগত হও। তখনি সে বললো, আমি অনুগত হলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে। (সূরা বাকারা-১৩১)

আল্লাহর ইবাদাতের বাস্তব নমুনা তিনি প্রদর্শন করলেন। আল্লাহ যখনই তাকে অনুগত হওয়ার আদেশ দিলেন, তিনি ওমনি কোন ধরনের শর্ত ব্যতিতই তার মাথাকে নত করে দিলেন। তিনি যেভাবে আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেকে অবনত করে দিয়েছিলেন, তিনি ইবাদাতের ব্যাপারে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, সেই একই পন্থা অবলম্বন করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর সন্তানদের প্রতি আদেশ দিয়েছিলেন–

وَوَصّٰى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ-يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ-

এ পথে চলার জন্য সে তার সন্তানদেরকেও নির্দেশ দিয়েছিল। ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে এই একই উপদেশ দিয়ে গিয়েছে। সে বলেছিল, হে আমার সন্তানগণ ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই জীবন ব্যবস্থাই মনোনীত করেছেন। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা মুসলিম হয়েই থাকবে। (সূরা বাকারা-১৩২)

হযরত ইবারাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর সন্তানদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা এক আল্লাহর গোলামী করা ব্যতিত অন্য কারো গোলামী করবে না। শুধুমাত্র আল্লাহর-ই দাসত্ব করবে। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামও তাঁর সন্তানদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা একমাত্র আল্লাহর অনুগত হয়ে থাকবে। তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবন ব্যবস্থা মনোনীত করেছেন, সে বিধান অনুসারেই জীবন পরিচালিত করবে। মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর দাস হয়ে থাকবে। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ডেকে যেসব কথা বলেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তা এভাবে শুনাচ্ছেন–

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ-اِذْقَالَ لِبَنِيْهِ مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ-

ইয়াকুব যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে ? মৃত্যুর সময় সে তার পুত্রদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল, হে পুত্রগণ ! আমার মৃত্যুর পরে তোমার কার ইবাদাত করবে ? (সূরা বাকারা-১৩৩)

পৃথিবী থেকে চির বিদায়ের পূর্বে মুসলিম পিতার যা কর্তব্য, সেই কর্তব্যই তিনি পালন করেছিলেন। তিনি সন্তানদেরকে সমবেত করে প্রশ্ন করেছিলেন, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কার দাসত্ব করবে ? সন্তানগণ জবাবে বলেছিল–

قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا-وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ-

তারা সমস্বরে জবাব দিয়েছিল, আমরা সেই এক আল্লাহরই ইবাদাত করবো, যাকে আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক–ইলাহ হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন এবং আমরা তাঁরই অনুগত হয়ে থাকবো। (সূরা বাকারা-১৩৩)

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম তাঁর প্রশ্নের জবাব সন্তানদের কাছ থেকে এভাবে পেলেন

যে, আমরা ইবাদাত করবো আপনার রব্ব-এর, যাকে আপানর পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিস্ সালাম রব্ব হিসাবে, ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর দাসত্ব ও বন্দেগী করেছিল। দাসত্বের বা গোলামীর পূর্ণাঙ্গ নমুনা হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম। গোটা পৃথিবী যখন শির্কের কৃষ্ণ কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তিনি তখন তাওহীদের উজ্জ্বল শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। আল্লাহর ইবাদাত করার ব্যাপারে যারা একনিষ্ঠ, একাগ্রচিত্ত, নিবেদিত প্রাণ-তাদের নেতা হিসাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মনোনীত করলেন। আল্লাহ বলেন-

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ-قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا-

স্মরণ করো, যখন ইবরাহীমকে তার রব্ব বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন এবং সে ঐসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো, তখন তিনি (আল্লাহ) বললেন, আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের নেতা করতে চাই। (সূরা বাকারা-১২৪)

তার প্রথম পরীক্ষা ছিল অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ হওয়া। দ্বিতীয় পরীক্ষা ছিল, আল্লাহর আদেশে নির্জন মরুপ্রান্তরে নবজাতক সন্তানসহ স্ত্রীকে রেখে আসা। তৃতীয় পরীক্ষা ছিল, নিজের সন্তানকে আল্লাহর আদেশে কোরবানী দেয়া। স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, এসব পরীক্ষা ছিল বড় কঠিন পরীক্ষা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এসব চরম কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে জানালেন-

سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ-

ইবরাহীমের প্রতি সালাম রইলো। (কোরআন)

এভাবে আনুগত্যের তথা ইবাদাতের চরম প্ররাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার পর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত জাতির পিতা হিসাবে নির্বাচিত করলেন। আল্লাহ বলেন-

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ-هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ-

তিনিই তোমাদের জাতির পিতা এবং তিনিই তোমাদের নাম দিয়েছেন মুসলমান। (সূরা হজ্জ)

ইবাদাতের পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠি হিসাবে আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীবাসীর সামনে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে পেশ করেছেন। তাঁকে মুসলিম জাতির পিতা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে এ কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইবরাহীমের মিল্লাত এবং তিনি যেভাবে আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করেছেন, সেটাই একমাত্র সত্য আর ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা যা বলে তা মিথ্যা। কোরআন বলছে-

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْنَصٰرٰى تَهْتَدُوْا-قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا-وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

ইয়াহুদীরা বলে-ইয়াহুদী হও, তাহলে সত্য পথ লাভ করতে পারবে। খৃষ্টানরা বলে-খৃষ্টান হও তবেই সত্য পথের সন্ধান পাবে। (আল্লাহ বলেন) এদের সবাইকে বলে দাও যে, এর কোনটিই ঠিক নয় বরং সবকিছু পরিত্যাগ করে ইবরাহীমের পথ অনুসরণ করো। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (সূরা বাকারা-১৩৫)

ইয়াহুদী–খৃষ্টানদের ব্যাপারে স্পষ্ট বলে দেয়া হলো, তোমাদের কোন কথা বা দাবী সত্য নয়। বরং তোমরা তোমাদের ভ্রান্তপথ ত্যাগ করে হযরত ইবরাহীমের আদর্শে দিক্ষিত হও, তার মিল্লাতের মধ্যে শামিল হয়ে যাও, তাকে অনুসরণ করো–আর এটাই হলো মুক্তির একমাত্র পথ তথা আল্লাহর আনুগত্যের পথ। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন–

اَنِ تَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا-

সমস্ত দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এনে মিল্লাতে ইবারহীমের মধ্যে শামিল হয়ে যাও–তারই অনুসরণ করো।' মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, ইবাদাতের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা হবার কারণে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বলেছেন–

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَيْرُ الْبَرِيَّا (تِرْمِذِى)

ইবরাহীম হচ্ছেন পৃথিবীর সর্বোত্তম ব্যক্তি।

এ জন্য আনুগত্য, বন্দেগী, দাসত্ব, গোলামী বা ইবাদাতের মানদন্ড হিসাবে আমাদেরকে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কিভাবে তিনি কোন ধরনের প্রশ্ন বা আপত্তি ব্যতিতই আল্লাহর আনুগত্য করেছিলেন। আল্লাহর কোরআনে এসব ঘটনা গাল-গল্প হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। এসব ঘটনা থেকে মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণ করবে, এ জন্য এসব ঘটনা ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে।

মানুষের জীবনে যতগুলো প্রয়োজন রয়েছে, তার ভেতরে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, খাদ্য এবং নিরাপত্তা। মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের অন্যতম অধিকারও এ দুটো বিষয়। মানুষ পেট ভরে আহার করতে চায়, ক্ষুধা মুক্ত থাকতে চায় এবং নিরাপত্তার সাথে জীবন-যাপন করতে চায়। নির্বাচনের সময় চিহ্নিত কোন সন্ত্রাসীকে মানুষ নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করে না। প্রার্থীদের মধ্য থেকে যার প্রতি এমন আস্থার সৃষ্টি হয় যে, এই লোকটি আমাদেরকে শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশ দান করতে সক্ষম হবে, ভোটাররা তাকেই ভোট দিয়ে

নির্বাচিত করে। কিন্তু মানুষের ভাগ্যলিপির নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, মানুষ তারই মতো আরেকজন মানুষকে খাদ্যদাতা, নিরাপত্তা বিধানকারী করে মনে করে চিরকালই ভুল করেছে। উল্লেখিত দুটো জিনিস মানুষ লাভ করতে পারেনি। অথচ আল্লাহ এই মানুষের কাছে ওয়াদা করেছেন, তোমরা আমার ইবাদাত করো, আমি তোমাদেরকে খাদ্য ও নিরাপত্তা দান করবো। সূরা কুরাইশে বলা হয়েছে–

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ-الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ-وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

সুতরাং তাদের কর্তব্য হলো এই ঘরের রব্ব-এর ইবাদাত করা, যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে খাদ্য দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে দূরে রেখে নিরাপত্তা দান করেছেন।

জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে একমাত্র আমার গোলামী করো, আমার দাসত্ব করো, আমি তোমাদেরকে খাদ্যদান করবো, আমিই তোমাদেরকে নিরাপত্তা দান করবো। একনিষ্ঠভাবে আমারই আনুগত্য করো।

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ওয়াদা করেছেন, যে এলাকার লোকজন একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্য, দাসত্ব, গোলামী, পূজা-উপাসনা করবে, একমাত্র তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করবে, তাদের কোন অভাব থাকবে না। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদেরকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। নানা ধরনের ফসল এমনভাবে উৎপাদিত হবে যে, মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার পরও তা উদ্বৃত্ত রয়ে যাবে। তিনি আকাশ ও যমীনের বরকতের দরজা উন্মুক্ত করে দিবেন। সূরা আ'রাফের ৯৬ নং আয়তে আল্লাহ বলেন–

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ-

লোকালয়ের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং আমাকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের প্রতি আকাশ ও জমিনের বরকতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিতাম।

আমাদেরকে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করো

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, এই সূরা ফাতিহা একটি অভিনন্দন-পত্রের মতো। বান্দাহ্ মহান আল্লাহর কাছে আল্লাহর শিখানো ভাষায় অভিনন্দন-পত্র পেশ করছে। এই অভিনন্দন-পত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে রয়েছে প্রশংসা, দ্বিতীয় অংশে পরিচিতি, মহান আল্লাহর পরিচয় এবং বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ও বান্দার পরিচয়। তৃতীয় অংশে রয়েছে দাবী। আমরা এই তৃতীয় অংশে উপনীত হয়েছি। প্রথমে আমরা মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছি এবং প্রশংসার ব্যাপারে আল্লাহর শিখানো ভাষায় বলেছি, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর-যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তারপর তাঁর গুণাবলীর ও বিচার দিবসের মালিক হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে। এরপর আমরা মানুষ–আমাদের পরিচয় আমরা পেশ করেছি যে, আমরা তোমারই গোলাম-তোমারই দাসত্ব করি এবং যে কোন প্রয়োজনে তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি।

এবার স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন এসে যায়, তোমরা আমার প্রশংসা করলে, আমার গুণাবলী বর্ণনা করলে, আমি বিচার দিবসের মালিক-এ কথাও স্বীকার করলে, নিজেদেরকে আমার গোলাম বলেও নিজেদের পরিচয় পেশ করলে এবং এ কথাও বললে যে, তোমরা আমারই কাছে সাহায্য চাও। তাহলে এখন বলো, কি তোমাদের প্রয়োজন-তোমরা কি সাহায্য চাও?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের সবচেয়ে বড় দাবী কি হতে পারে, এ কথাও মানুষ জানে না। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা অনুগ্রহ করে, মেহেরবানী করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এভাবে আল্লাহর কাছে দাবী জানাতে বলেছেন, আমাদেরকে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করো।

মানুষকে শিখিয়ে দেয়া হলো, এই পদ্ধতিতে এবং এই ভাষায় তোমরা অভিনন্দন পেশ করে আমার কাছে তোমাদের দাবী পেশ করো। সাতটি বাক্যের এই অভিনন্দনের জবাবে মহান আল্লাহ গোটা ত্রিশপারা কোরআন বান্দার সামনে পেশ করে দিয়ে জানালেন, তোমরা যে সহজ সরল পথের দাবী আমার কাছে পেশ করেছো, এটাই সেই সহজ সরল পথ। একমাত্র আমার দাসত্ব করবে, এটাই হলো সবচেয়ে সহজ-সরল পথ। আল্লাহ বলেন–

وَأَنِ اعْبُدُوْنِيْ-هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ -

কেবলমাত্র আমারই দাসত্ব করবে আর এটাই হলো সহজ সরল পথ। (সূরা ইয়াছিন)

পৃথিবীতে ক্ষুধা মুক্ত পরিবেশ, নিরাপত্তা, স্বস্তি, শান্তি অর্থাৎ মানুষের মৌলিক অধিকার লাভ করতে হলে যেমন আল্লাহর ইবাদাত করা অর্থাৎ একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করা প্রয়োজন, তেমনি পরকালে জান্নাত লাভ করতে হলেও আল্লাহর ইবাদাত করা অপরিহার্য। জান্নাতে কে না যেতে চায়, সবাই জান্নাতের প্রত্যাশা করে থাকে। ইবাদাতের ভুল অর্থ গ্রহণ করে যেসব মানুষ ইবাদাতের ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তারাও কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তাঁর জান্নাত লাভের

আশাতেই তা করেছে। মুসলমান বলে দাবী করে কিন্তু পাপাচারে নিমজ্জিত থাকে। এ লোকগুলোও আল্লাহর জান্নাত কামনা করে। আল্লাহ যেন তাদের ক্ষমা করে দেন, এ কারণে তাদের মৃত্যুর পর কোরআন খানির আয়োজন করা হয়, মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়, দান-খয়রাত করা হয়। লোকজন ভাড়া করে এসব আয়োজন করার মধ্যে কি স্বার্থকতা রয়েছে, তা আয়োজকরা আদৌ জানে কি না সন্দেহ। তবুও মৃত ব্যক্তি যেন জান্নাত লাভ করতে পারে, এ আশাতেই তারা ঐসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

পক্ষান্তরে আল্লাহর জান্নাত লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হলো নির্ভেজাল পদ্ধতিতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা। সূরা ফজর-এর ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ-وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ-

আমার ইবাদাতকারী বান্দাদের মধ্যে শামিল হও এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।

আল্লাহ বলেন, বান্দাহ্-আমার জান্নাতে যেতে চাও ! তাহলে আমার গোলামীর খাতায় সর্বপ্রথমে নিজের নামটি লিপিবদ্ধ করো, আমার গোলামী, বন্দেগী, দাসত্ব, ইবাদাত, পূজা-উপাসনা করো। তাহলে তোমরা আমার জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে।

জান্নাতীরা আল্লাহর জান্নাতে সমস্ত নিয়ামত লাভ করবে। সেখানে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো মহান আল্লাহর দিদার লাভ। কেউ যদি জান্নাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, সবচেয়ে বড় পাওয়া যদি কেউ পেতে চায় তাহলে তাকেও একমাত্র ঐ আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে। আল্লাহ বলেন-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَلِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا-

সুতরাং যে তার রব্ব-এর সাক্ষাতের প্রত্যাশী তার সৎকাজ করা উচিত এবং দাসত্ব করার ক্ষেত্রে নিজের রব্ব-এর সাথে কাউকে শরীক করা উচিত নয়। (সূরা কাহ্ফ-১১০)

যদি কেউ প্রশ্ন ওঠায়, আল্লাহর এই গোলামী করার কি কোন নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে বা জীবনের কতটুকু সময় এই গোলামী করতে হবে ? এই প্রশ্নের জবাবও মানুষকে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর গোলামী করতে হবে।

মানব জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত মানুষকে শুধুমাত্র আল্লাহরই গোলামী করতে হবে। পৃথিবীর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর গোলাম হয়ে থাকবে এবং তাঁরই গোলামীর মাধ্যমেই সে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করবে।

সমস্ত সৃষ্টির মালিক হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এসব সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্বও আল্লাহর। এই দায়িত্ব তিনি অন্য কারো প্রতি অর্পণ করেননি। স্বয়ং তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ জন্য মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ফাতিহার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, আমার কাছে এমন একটি পথ তোমরা কামনা করো, যে পথ হবে সত্য, সহজ-সরল। কারণ

এই পৃথিবীতে অসংখ্য বাঁকা পথ রয়েছে, এসব পথ তোমাদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বরের দিকে নিয়ে যাবে, এসব পথে চললে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ জন্য পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আমার। পবিত্র কোরআন বলছে–

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ–

আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে যেখানে সোজা পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই অর্পিত হয়েছে। (সূরা নাহ্ল-৯)

পৃথিবীর মানুষের জন্য চিন্তা-চেতনা ও কর্মের নানা ধরনের পথ হতে পারে এবং তা থাকাও স্বাভাবিক। পৃথিবীতে এই অসংখ্য পথের সবগুলোই তো আর সত্য হতে পারে না। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। যেমন যেসব শিক্ষার্থীগণ যখন অঙ্ক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে তখন যারা অঙ্কে ভুল করে, তাদের ফলাফল বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আর যারা নির্ভুল অঙ্ক করে, তাদের ফলাফল একই রকম হয়। এতে প্রমাণ হলো, সত্য হয় একটি আর মিথ্যা হয় অনেকগুলো। সুতরাং সত্য পথ হয় একটি এবং যে জীবনাদর্শটি এ সত্য অনুযায়ী গড়ে ওঠে সেটিই একমাত্র সত্য জীবনাদর্শ। অন্যদিকে কর্মের অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকা সম্ভব এবং এ পথগুলোর মধ্যে যেটা সত্য-সঠিক জীবনাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সেটিই একমাত্র সঠিক পথ। এই সত্য-সঠিক নির্ভুল আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করা মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। শুধু বড় প্রয়োজনই নয়–বরং মানব জীবনের প্রকৃত মৌলিক প্রয়োজন।

এর কারণ হলো, পৃথিবীর সমস্ত জিনিস তো মানুষের কেবলমাত্র এমন সব প্রয়োজন পূরণ করে যা মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার কারণে তার জন্য অপরিহার্য হয়। পক্ষান্তরে সহজ-সরল, সত্য পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন শুধুমাত্র মানুষ হবার কারণে মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়। এই বিষয়টি যদি পূর্ণ না হয়, তাহলে এর পরিষ্কার অর্থ এটাই হয় যে, মানুষ হিসাবে তার পৃথিবীতে আগমনই ব্যর্থ হয়েছে। যে আল্লাহ মানুষের অস্তিত্ব দানের পূর্বে মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং যিনি মানুষের অস্তিত্ব দান করার পর জীবন ধারণ করার প্রতিটি প্রয়োজন পূর্ণ করার এমন সূক্ষ্ম ও ব্যাপকতর ব্যবস্থা করেছেন, সেই আল্লাহ মানুষের মানবিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আসল প্রয়োজন পূরণের তথা পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন না, এটা তো হতে পারে না।

এ জন্য বান্দাহ যখন দাবী পেশ করছে, 'হে আল্লাহ ! আমাদেরকে সত্য সহজ-সরল পথপ্রদর্শন করো, যে পথ তোমার নিয়ামতে পরিপূর্ণ–সে পথ আমাদেরকে দেখাও।' তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেয়া হলো, 'আমার দাসত্ব করবে-আমার আনুগত্য করবে, এটাই সেই পথ–যা তোমরা দাবী করছো।' মহান আল্লাহ রাব্বুল মানব জাতিকে এই হেদায়াত দানের লক্ষ্যেই নবুওয়াতের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ বলেন, তোমরা যদি আমার এই নবুওয়াত গ্রহণ না করো, তাহলে বলে দাও তোমাদের ধারণা অনুসারে তোমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য আমি অন্য কি পদ্ধতি দান করেছি ? তোমরা যদি এই প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলো যে, আমি তোমাদেরকে যে চিন্তাশক্তি দিয়েছি, তা প্রয়োগ করে তোমরা নিজেরা পথ

আবিষ্কার করে তা অনুসরণ করবে। এ কথা তোমরা বলতে পারো না-কারণ তোমাদের এই মানবিক বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি ইতিপূর্বেই এমন অসংখ্য পথ-মত উদ্ভাবন করেছে যে, তা সবই অসত্য, অনুসরণের অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তোমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছো।

এরপর তোমরা আমার ওপর এই অভিযোগও আরোপ করতে পারো না যে, আমি তোমাদেরকে কোন পথই প্রদর্শন করিনি। কারণ, তোমরা মানুষ আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জীব। আমি তোমাদের প্রতিপালন ও বিকাশ লাভের জন্য এতসব বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করে রেখেছি অথচ তোমাদেরকে সত্য পথপ্রদর্শন না করে একেবারে তিমিরাবৃত পরিবেশে অন্ধকারের বুকে পথ হারিয়ে উদভ্রান্তের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে বেড়ানোর এবং প্রতি পদে আঘাত পাবার জন্য ছেড়ে দিয়েছি ? না, এমন করে তোমাদেরকে আমি ছেড়ে না দিয়ে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আমি আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেছি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সমস্ত সৃষ্টির ভেতরে জন্মগতভাবে, স্বভাবগতভাবে সত্য সঠিক পথে চলার প্রেরণা দান করেছেন। অন্যান্য সৃষ্টির মতো তিনি সত্য পথে চলার জন্মগত প্রেরণা মানুষের ভেতরেও দান করতে পারতেন। নবী-রাসূল, নবুওয়াত-রেসালাতের কোন প্রয়োজনই তাহলে হতো না। মানুষ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সত্য পথের অনুসারী হতো। কিন্তু মহান আল্লাহর সেটা আভিপ্রায় নয়। তাঁর অভিপ্রায় হলো, তিনি এমন একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টির উদ্ভব ঘটাবেন যে, যে সৃষ্টি তার নিজের পছন্দ ও বিচার শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা, ভ্রান্ত-অভ্রান্ত তথা যে কোন ধরনের পথে চলার স্বাধীনতা রাখবে।

এই স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য তাকে জ্ঞানের উপকরণে সজ্জিত করা হবে। বুদ্ধি ও চিন্তার যোগ্যতা এবং ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের শক্তি দান করা হবে। তাকে নিজের দেহের অভ্যন্তরের ও দেহের বাইরের অসংখ্য জিনিস ব্যবহার করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে। তার ভেতরের ও বাইরের সমস্ত দিকে এমন সব অসংখ্য অগণিত কার্যকারণ ছড়িয়ে রাখা হবে যা তার জন্য সঠিক পথ লাভ করা ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হওয়া-এ দুটোরই কারণ হতে পারে।

যদি মানুষকে স্বভাবগত বা জন্মগতভাবে সঠিক পথের অনুসারী করা হতো, তাহলে এসবই অর্থহীন হয়ে যেতো এবং উন্নতির এমন সব উচ্চতম পর্যায়ে পৌছানো মানুষের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। মানুষকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে বলেই সে তার চিন্তা শক্তি প্রয়োগ করে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগ করে সঠিক পথে পরিচালিত করার নীতি পরিহার করে নবুওয়াত-রিসালাতের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের স্বাধীনতা যেমন অক্ষুন্ন থাকবে তেমনি মানুষের পরীক্ষার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে এবং সত্য সহজ-সরল ও সর্বোত্তম যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে তার সামনে পেশ করে দেয়া হবে। সুতরাং সত্য-সঠিক পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা নিজে গ্রহণ করেছেন। মানুষ যখন তাঁর কাছে আবেদন জানালো সত্য পথের জন্য, তখন তাঁর সামনে গোটা কোরআন দিয়ে বলে দেয়া হলো, এই কোরআনের বিধান অনুসরণ করো। তোমরা যে হেদায়াত চাচ্ছো, এই কোরআনই হলো সেই হেদায়াত।

সৃষ্টিসমূহের প্রতি আল্লাহর হেদায়াত

মহান আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা-খালিক। স্রষ্টা হিসাবে তিনি নিজের কর্ম-কৌশল, নিজের সুবিচার-ইনসাফপূর্ণ নীতি ও নিজের অনুগ্রহশীলতার ভিত্তিতে মানুষকে পৃথিবীতে অজ্ঞ, পথহারা ও অনবহিত না রাখার-বরং সত্য সঠিক অভ্রান্তপথ এবং ভ্রান্তপথ বুঝিয়ে দেয়ার, পাপ-পুণ্য, বৈধ-অবৈধ তথা হারাম ও হালাল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত করার, কোন পথ-মত ও আচরণ গ্রহণ করলে সে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্ হতে সক্ষম হবে এবং কোন পথ ও মত এবং কার আনুগত্য করলে সে আল্লাহর বিদ্রোহী বান্দাহ্ বলে প্রমাণিত হবে, এসব কথা তাকে পরিপূর্ণভাবে জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ বলেন-

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى-

পথপ্রদর্শন করা নিঃসন্দেহে আমারই দায়িত্ব। (সূরা লাইল-১২)

সুতরাং হেদায়াতের পথপ্রদর্শন করা মহান আল্লাহরই দায়িত্ব। আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং এই দায়িত্ব পালন করেন বলে তিনি তাঁর বান্দাহ্কে শিখিয়েছেন আমার কাছে এভাবে দোয়া করো, 'আমাদেরকে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করো।' পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছে, প্রতিটি সৃষ্টিকেই তার সূচনা থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। এর শেষ স্তর হলো হেদায়াত। মহান আল্লাহই এই হেদায়াত দান করেছেন। আল্লাহ বলেন-

الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى-وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى-

যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্যতা স্থাপন করেছেন। (সূরা আ'লা-২-৩)

প্রতিটি বস্তু সৃষ্টির পূর্বেই পৃথিবীতে তাকে কি কাজ করতে হবে, সেই কাজের পরিমাণ কি হবে, তার আকার-আকৃতি কি হবে, তার গুণাবলী কি হবে, কোথায় তার স্থান ও অবস্থিতি হবে, তার স্থিতি, অবস্থান ও কাজের জন্য কি ক্ষেত্র ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে, কোন সময় তার অস্তিত্ব হবে, কতদিন পর্যন্ত তা নিজের অংশের কাজ করবে এবং কখন কিভাবে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে, সৃষ্টির সামঞ্জস্য ও পথ নির্দেশ ইত্যাদি-এসব কিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যথাযথরূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টি করেই সৃষ্টি সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে যাননি-হেদায়াতও তিনি দিয়ে দেন।

উদাহরণ স্বরূপ মানুষের পা যেভাবে গঠন করা হয়েছে, এই গঠন প্রণালীর দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। পায়ের নলার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পায়ের নলাটি গোটা পায়ের মাঝামাঝি নেই। সম্পূর্ণ পায়ের কেন্দ্রস্থলে এই নলাটি দেয়া হলে কোন মানুষের পক্ষে ভারসাম্য রক্ষা করে হাঁটা চলাফেরা করা কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। পায়ের পাতার অংশের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পায়ের পাতার সিংহভাগ সামনের দিকে আর ক্ষুদ্র অংশটি পেছনের দিকে। পায়ের পাতার এই পরিমাপ ঠিক না থাকলেও মানুষ স্বচ্ছন্দভাবে হাঁটতে পারতো না। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা শুধু সৃষ্টিই করেননি, তিনি এর সুসামঞ্জস্যতাও বিধান করেছেন।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানুষকে এভাবে প্রতিটি দিক থেকে সুসামঞ্জস্যভাবে, পরিমাপ ঠিক রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে। এবার পশু-প্রাণীর দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। যেসব পশু শিকার করে তাদের পায়ের থাবা সামনের দিকে। যেদিকে মুখ দিয়ে সে ছুটতে বা দৌড়াতে পারে, তার থাবাও সেদিকেই দেয়া হয়েছে। পায়ের থাবা সামনের দিকে না দিয়ে পেছনের দিকে দেয়া হলে তার পক্ষে সামনের দিকে দৌড়ানোও যেমন সম্ভব হতো না, তেমনি সম্ভব হতো না তার পক্ষে শিকার ধরে আহার করা।

মুরগীর বাচ্চা ডিম ফুটে বের হয়ে স্থলে বিচরণ করে-এটাই তার ক্ষেত্র। স্থলে বিচরণ করার হেদায়াতই তাকে দেয়া হয়েছে। মুরগী ও তার বাচ্চাগুলোকে পানির ভেতরে ফেলে দেয়া হলে ডুবে মারা যাবে। কিন্তু হাঁসের বাচ্চা ডিম ফুটে বের হবার পরে পানিতে ছেড়ে দিলে স্বচ্ছন্দে তারা সাঁতার দিতে থাকবে। এই প্রজাতির হাঁস-যেগুলো গভীর অরণ্যে বাস করে, প্রজনন মৌসুমে এরা বড় বড় বৃক্ষের উচ্চ কোঠরে ডিম দেয়। গাছের নিচের কোন কোঠরে ডিম দিলে অন্য কোন প্রাণী সে ডিম খেয়ে ফেলতে পারে, এ জন্য তারা গাছের ওপরের কোঠরে ডিম দেয়। ডিমগুলো হেফাজত করার পথ-নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

ডিমগুলো ফুটে বাচ্চা বের হবার পরে সে বাচ্চাগুলো প্রায় বিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু থেকে নিচে নামবে কি করে ? শক্ত মাটিতে বাচ্চাগুলো লাফিয়ে পড়লে আঘাত পেয়ে মারা যাবে, এ জন্য বড় হাঁসগুলো মুখ দিয়ে গাছের শুকনো পাতা ঐ গাছের গোড়ায় একত্রিত করে নরম তোষকের মতো বানিয়ে দেয়। তারপর বাচ্চাকে সংকেত দিলেই সে বাচ্চাগুলো কোঠর থেকে সখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের সাথে কোন সরোবরের দিকে চলে যায়। হাঁস ও তার বাচ্চাকে এই হেদায়াত দান করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা।

সুতরাং, তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে পথ-নির্দেশ দিয়েছেন, সৃষ্টির পরিমাপ ঠিক করেছেন ও সামঞ্জস্যতা বিধান করেছেন। সমস্ত সৃষ্টি পরিচালিত হচ্ছে মহান আল্লাহর হেদায়াত অনুসারে। মানুষকেও একমাত্র তাঁরই হেদায়াত অনুসরণ করতে হবে। মানুষের কাছে স্বয়ং আল্লাহ এই হেদায়াত পৌছান না, তিনি মানুষের মধ্যে থেকে একজন সর্বোত্তম মানুষকে নবী-রাসূল নির্বাচিত করে তাঁর মাধ্যমেই মানব-জাতিকে হেদায়াত প্রদর্শন করেছেন।

হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে যখন এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন তাকে শুধু একজন সাধারণ মানুষ হিসাবেই প্রেরণ করা হয়নি। তাকে নবী-রাসূলের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল। হেদায়াত অর্থাৎ সঠিক পথ আল্লাহ প্রদর্শন করবেন, এ কারণে পৃথিবীর প্রথম মানবকেই একজন নবী হিসাবে প্রেরণ করে তাঁর মাধ্যমে হেদায়াত দান করা হয়েছিল। সৃষ্টির অন্যান্য বস্তু ও জীবের স্বভাবের মধ্যেই যেমন আল্লাহ প্রয়োজনীয় হেদায়াত দান করেছেন, মানুষকে তা দান করা হয়নি তার উচ্চ মর্যাদার কারণে। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও জীবসমূহকে যে প্রক্রিয়ায় হেদায়াত দেয়া হয়েছে, সেই একই প্রক্রিয়ায় মানুষকে হেদায়াত দেয়া হলে, মানুষ আর অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে মর্যাদাগত দিক থেকে কোন পার্থক্য থাকতো না এবং আল্লাহ যে পরীক্ষা করতে চান, সে উদ্দেশ্য সফল হতো না।

এ জন্য মানুষকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে, সত্য-মিথ্যা যাচাই করার যাবতীয় যোগ্যতা দিয়ে এবং নবী-রাসূলের মাধ্যমে হেদায়াত দান করা হয়েছে। মানুষ যেন পৃথিবীতে চিনে নিতে সক্ষম হয়, কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা। কোনটি অনুসরণ করা উচিত আর কোনটি উচিত নয়। পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম আলাসিস্ সালামকে পৃথিবীতে প্রেরণের সময় তিনি অনুভব করেছিলেন, এই পৃথিবীতে তিনি কোন নির্দেশের ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত করবেন। তখন স্বয়ং আল্লাহ তাকে বলেছিলেন-

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

আমার কাছ থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের কাছে পৌছবে, যারা আমার সেই বিধান অনুসরণ করবে, তাদের জন্য ভয়ভীতি এবং চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। (সূরা বাকরাহ্)

যখনই মানুষের জন্য সহজ-সরল পথের প্রয়োজন হয়েছে, তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী-রাসূল প্রেরণ করে তাঁর ওয়াদানুসারে মানব জাতিকে হেদায়াত দান করেছেন। জীবন পরিচালিত করার ব্যাপারে কোন পথ আবিষ্কার করার অধিকার মানুষের স্বয়ং নেই বা এ অধিকার তাকে দেয়া হয়নি। কারণ মানুষের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, সমস্ত সমস্যাসমূহের প্রতি একই সময়ে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে পারে না এবং সে ক্ষমতাও মানুষের দৃষ্টির নেই। যাবতীয় সমস্যা সে একই সময়ে অনুধাবনও করতে পারে না বা অনুধাবন করার মতো জ্ঞানও মানুষের নেই। মানুষসহ প্রতিটি জীবের সমস্যা অনুধাবন করে তা সমাধান করার মতো সামর্থ মানুষের নেই।

মানুষের দৃষ্টি কতটা সঙ্কীর্ণ এবং সে দৃষ্টি তাকে কিভাবে প্রতারিত করে বা তার দৃষ্টির দুর্বলতা কেউ যদি পরীক্ষা করে দেখতে চায় তাহলে তাকে পাশাপাশি স্থাপন করা রেল লাইনের মাঝখানে দাঁড়াতে হবে। কিছুটা দূর পর্যন্ত দেখা যাবে যে, লাইন দুটো পাশাপাশি চলে গিয়েছে। এভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মনে হবে অনেক দূরে গিয়ে লাইন দুটো একত্রিত হয়েছে। অথচ প্রকৃত বিষয় তা নয়। আড়াল থেকে কানে কোন শব্দ প্রবেশ করলে সেটা কিসের শব্দ, তা নির্ণয়ে মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়। এভাবে প্রতিটি বিষয়েই মানুষ দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয়। সুতরাং দুর্বলতায় আচ্ছন্ন অসমর্থ মানুষের পক্ষে সবার জন্য ইনসাফমূলক সার্বজনীন কোন বিধান রচনা করা সম্ভব নয়। তাকে অবশ্যই আল্লাহর বিধানের মুখাপেক্ষী হতেই হবে, এ ছাড়া তার সম্মুখে দ্বিতীয় কোন উন্মুক্ত নেই।

মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ, তিনিই মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন। তিনিই মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের ইতিহাস পবিত্র কোরআনে বেশ কয়েক স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ সেখানে হেদায়াতের বিষয়টি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি তার জাতিকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের পূজা-উপাসনা, বন্দেগী, আনুগত্য, দাসত্ব করতে দেখে এবং মানুষের বানানো বিধান অনুসরণ করতে দেখে বলেছিলেন-

اَلَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ-وَالَّذِيْ هُوَيُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ-وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ-

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন। তিনি আমাকে আহার করান ও পান করান এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। (সূরা শু'আরা)

অর্থাৎ তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। আমি যখন ক্ষুধার্ত হই তখন তিনি আমাকে আহার দান করেন। আমি যখন তৃষ্ণা অনুভব করি তখন তিনি আমাকে পান করান। আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।

হযরত মুছা ও হযরত হারুন আলাইহিস্ সালামকে ফেরাউন প্রশ্ন করেছিল–

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى-

হে মুছা ! তোমাদের দু'জনার রব্ব কে ? (সূরা ত্বা-হা-৪৯)

আল্লাহর নবী হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন–

قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَه ثُمَّ هَدٰى-

আমাদের রব্ব তিনি–যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা ত্বা-হা-৫০)

আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি জিনিসকে শুধুমাত্র তার বিশেষ আকৃতি দান করেই এমনিভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনিই সবাইকে পথও দেখিয়েছেন। পৃথিবীর এমন কোন জিনিস নেই যাকে তিনি নিজের গঠনাকৃতিকে কাজে লাগাবার এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পদ্ধতি শেখাননি। কানকে শোনার ও চোখকে দেখার কাজ তিনিই শিখিয়েছেন। মাছকে সাঁতার কাটার, পাখিকে উড়ার শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। গাছকে ফুল ও ফল দেবার এবং মাটিকে উদ্ভিদ উৎপাদন করার নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন। সুতরাং তিনি শুধু স্রষ্টাই নন–গোটা জাহানের সমস্ত কিছুর শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকও একমাত্র তিনিই।

সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল, মানুষের ক্ষুধার সময় তিনিই আহার করান, মানুষ তৃষ্ণার্ত হলে তিনিই পান করান, মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনিই নিরাময় দান করেন অর্থাৎ তিনি মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন। সমস্ত কাজ তিনিই সম্পাদন করেন আর মানুষের হেদাতায়াতের কাজটি তিনি অন্যের জন্য রেখে দিবেন, এটা কোন যুক্তির কথা হতে পারে না। সুতরাং তিনি যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি সৃষ্টিকে হেদায়াতও তিনিই দান করেছেন। সূরা দাহারের ৩ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلٰسِلاَ وَاَغْلٰلاً وَّ سَعِيْرًا-

আমি তাদেরকে পথ দেখিয়েছি, ইচ্ছা করলে তারা শোকরকারী হবে অথবা হবে কুফরকারী।

আল্লাহ বলেন, আমি মানুষকে শুধুমাত্র জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন করেই ছেড়ে দিইনি, সেই সাথে তাকে পথও প্রদর্শন করেছি। যেন তারা জানতে যে, শোকর-এর পথ কোনটি এবং কুফরের পথ কোনটি। তারপর তারা যে পথই অবলম্বন করবে, তার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী হবে। সূরা আল বালাদে বলা হয়েছে–

وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ-

আর আমি তাদেরকে উভয় পথ অর্থাৎ ভালো ও মন্দ স্পষ্ট করে দিয়েছি। (সূরা আল বালাদ)

এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত সৃষ্টিকেই পথপ্রদর্শন করেছেন। সূরা নাহ্‌লের ৬৮-৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ-ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً-

আর দেখো তোমার রব্ব মৌমাছীদেরকে এ কথা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন, তোমরা পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ তরু-লতা ও মাচার ওপর ছড়ানো লতাগুল্মে নিজেদের চাক নির্মাণ করো। তারপর সব রকমের ফলের রস চুসে নাও এবং নিজের রব্ব-এর প্রদর্শিত পথে চলতে থাকো।

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির জন্য অন্য কাউকে পথপ্রদর্শনের জন্য নিযুক্ত করেননি। তিনি স্বয়ং এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনিই গোটা বিশ্বলোকের সমস্ত কিছুর পথ-নির্দেশ দান করেন। পবিত্র কোরআন বলছে–

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ-ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ-قَلِيْلاً مَّاتَذَكَّرُوْنَ-اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ-

কে তিনি যিনি আর্তের ডাক শোনেন যখন সে তাঁকে কাতরভাবে ডাকে এবং কে তার দুঃখ দূর করেন ? আর কে তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন ? আল্লাহর সাথে কি আর কোন ইলাহও কি এ কাজ করছে ? তোমরা সামান্যই চিন্তা করে থাকো। আর কে জলে-স্থলের অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান এবং কে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে বাতাসকে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান ? (সূরা নাম্‌ল-৬২-৬৩)

মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনে একমাত্র তিনিই সাড়া দেন, আর হেদায়াতের প্রয়োজনে তিনি হেদায়াত দেননি–মানুষ স্বয়ং তার হেদায়াতের নির্মাতা হবে, এ কথা জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধির

অগম্য। এই কথা যারা বলে, তারা মানুষকে শোষণ করা এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত অশুভ স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্যই বলে থাকে। মানুষের প্রতিটি কাজের যাবতীয় উপকরণও তিনিই সরবরাহ করে থাকেন। সূরা কাহ্‌ফ-এর ১৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا-

এবং তিনি তোমাদের কাজের উপযোগী উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করবেন।

নির্ভুল–অভ্রান্ত পথ-নির্দেশ দেয়া তাঁরই দায়িত্ব এবং তিনিই সঠিক পথপ্রদর্শনকারী। একমাত্র তিনিই সত্য পথের দিকে পরিচালিত করে থাকেন। পৃথিবীতে যারা পথ নির্দেশদানকারী বলে দাবী করে, তারা মানুষকে ভ্রান্তপথের দিকে পরিচালিত করে। সূরা আহযাবে আল্লাহ বলেন–

وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ-

আল্লাহ এমন কথা বলেন যা প্রকৃত সত্য এবং তিনিই সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।

সুতরাং নির্ভুল, অভ্রান্ত, স্থিতিস্থাপক, ইনসাফমূলক, সামঞ্জস্যমূলক, সহজ-সরল পথ একমাত্র আল্লাহ-ই রচনা করতে ও প্রদর্শন করতে পারেন। কোন মানুষের পক্ষে মানুষের জন্য অনুসরণীয় মতবাদ-মতাদর্শ, জীবন ব্যবস্থা রচনা করা কোনক্রমেই যে সম্ভব নয়, পৃথিবীর ইতিহাসই এর জ্বলন্ত সাক্ষী। এ যাবৎ কাল পর্যন্ত মানুষ যতগুলো আদর্শ উদ্ভাবন করেছে এবং তার ভিত্তিতে দেশ ও জাতিকে পরিচালিত করার প্রয়াস পেয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা শোচনীয় ব্যর্থতার গ্লানী বহন করেছেন। নিকট অতীতে মানব রচিত মতবাদ সমাজতন্ত্রের করুণ পরিণতি পৃথিবীবাসী অবলোকন করেছে এবং ঘৃণ্য পূঁজিবাদের মরণযন্ত্রণাও মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে।

নির্ভুল পথ রচনায় মানুষের দুর্বলতা

মানুষ তার নিজের সত্তার দিক দিয়েই একটি জগৎ বিশেষ। তার এই জগতের মধ্যে অসংখ্য শক্তি, যোগ্যতা ও কর্ম-ক্ষমতা বিদ্যমান। তার এই জগতের মধ্যে জাগ্রত রয়েছে কামনা-বাসনা, লোভ, লালসা, আবেগানুভূতি, ভাবাবেগ, ঝোঁক-প্রবণতা, কাম, ক্রোধ, জেদ, হঠকারিতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি। মানুষের দেহ ও মনের রয়েছে অসংখ্য দাবি। মানুষের আত্মা, প্রাণ ও স্বভাবের রয়েছে সীমাহীন জিজ্ঞাসা। প্রতি নিয়ত তার মধ্যে অসংখ্য প্রশ্নমালা সৃষ্টি হচ্ছে। এসব প্রশ্নের জবাব লাভের জন্য সে অস্থির হয়ে ওঠে। এটাই হলো মানুষের জটিল অবস্থা। এই জটিল অবস্থা সম্পন্ন মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে মানব সমাজ গড়ে ওঠে, সে সমাজও নানা ধরনের জটিল সম্পর্কের ভিত্তিতেই গঠিত হয়। মানব সমাজ অসীম ও অসংখ্য জটিল সমস্যার সমন্বয়ের ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ লাভের সাথে সাথে এসব জটিলতা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে।

এসব সমস্যা ছাড়াও পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণের জন্য যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী মানুষের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, তা ব্যবহার করা এবং মানবীয় সংস্কৃতিতে তা ব্যবহার

উপযোগী করে প্রয়োগ করার প্রশ্নেও মানুষের ভেতরে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে অসংখ্য জটিলতার সৃষ্টি করে। মানুষ তার নিজের দুর্বলতার কারণেই তার সমগ্র জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে একই সময়ে পূর্ণ ও সামঞ্জস্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে না। এ কারণে মানুষ নিজের জন্য জীবনের এমন কোন পথ স্বয়ং সে নিজেই রচনা করতে পারে না, যে পথ নির্ভুল হতে পারে।

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষের ভেতরেই একটি জগৎ রয়েছে এবং সে জগৎ অসংখ্য জটিল বিষয় সমন্বিত, অসংখ্য শক্তি-সামর্থ সে জগতে ক্রিয়াশীল রয়েছে। সুতরাং মানুষ স্বয়ং যে বিধি-বিধান, মত-পথ রচনা করবে, সে বিধান স্বয়ং মানুষের অন্তর্নিহিত যাবতীয় শক্তি-সামর্থের সাথে পূর্ণ ইনসাফ করবে, তার সমস্ত কামনা-বাসনার সাথে প্রকৃত অধিকার বুঝিয়ে দিবে, তার আবেগ-উচ্ছ্বাস ও প্রবণতার সাথে ভারসাম্যমূলক আচরণ করবে, তার দেহের ভেতরের ও দেহের বাইরের যাবতীয় প্রয়োজন সঠিকভাবে পূরণ করবে, তার গোটা জীবনের যাবতীয় সমস্যার দিকে পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টি দিয়ে সেসব কিছুর এক সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান বের করবে এবং বাস্তব জিনিসগুলোও ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনে সুবিচার, ইনসাফ ও সত্যনিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবহার করবে–এসব কোন কিছুই মানুষের পক্ষে কক্ষনো সম্ভব হবে না।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ স্বয়ং যখন নিজের পথ-প্রদর্শক, আইন-কানুন, বিধান রচয়িতার ভূমিকা পালন করে, তখন নিগূঢ় সত্যের অসংখ্য দিকের মধ্য থেকে কোন একটি দিক, জীবনের অসংখ্য প্রয়োজনের মধ্য থেকে কোন একটি প্রয়োজন, সমাধানযোগ্য সমস্যাবলীর কোন একটি সমস্যা তার চেতনার জগতে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, মানুষ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক–অন্যান্য দিক ও প্রয়োজন এবং সমস্যাগুলোর ব্যাপারে সে কোন দৃষ্টিই দিতে সক্ষম হয় না। কারণ তার চেতনার জগৎ তো আচ্ছন্ন হয়ে থাকে বিশেষ একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এভাবে বিশেষ মানুষের ওপরে বিশেষ কোন মত বা আদর্শ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চাপিয়ে দেয়ার কারণে জীবনের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে সামঞ্জস্যহীনতার এক চরম পর্যায়ের দিকে তা বক্র গতিতে চলতে থাকে।

মানব জীবনের এই চলার বাঁকা গতি যখন শেষ স্তরে গিয়ে উপনীত হয় তখন মানুষের জন্য তা অসহ্যকর হয়ে জীবনের যেসব দিক, প্রয়োজন ও সমস্যার দিকে ইতিপূর্বে দৃষ্টি দেয়া হয়নি, সেসব দিক তরিৎ গতিতে বিদ্রোহ করে এবং সেসব প্রয়োজন পূরণ করতে বলে, সমস্যাগুলো সমাধানের দাবি করতে থাকে। কিন্তু তখন আর মানুষের পক্ষে সেসব প্রয়োজন পূরণ করা ও সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব হয় না। কারণ পূর্বানুরূপ সামঞ্জস্যহীন কর্মনীতি পুনরায় চলতে থাকে। পূর্বে যেসব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়নি, প্রয়োজনগুলো পূরণ করা সম্ভব হয়নি, সামঞ্জস্যহীন কর্মনীতির ফলে মানুষের যেসব দাবি ও আবেগ-উচ্ছ্বাসকে ভয়-ভীতি ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করে রাখা হয়েছিল, তা পুনরায় মানুষের ওপর প্রচন্ড গতিতে আধিপত্য বিস্তার করে বসে এবং তাকে নিজের বিশেষ দাবি অনুযায়ী বিশেষ একটি লক্ষ্যের দিকে গতিবান করে তোলার চেষ্টা করে।

এ সময় অন্যান্য দিক, প্রয়োজন ও সমস্যাগুলোর সাথে পূর্বের ন্যায় আচরণই করা হতে থাকে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে মানুষের জীবন কখনো সঠিক, সত্য, সহজ-সরল পথে একনিষ্ঠভাবে চলার মতো পরিবেশ লাভ করে না। সমস্যার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে সে ক্রমশঃ ডুবে যেতে থাকে। একটি ধ্বংস গহ্বর থেকে কোনক্রমেই সে উঠতে সক্ষম হলেও ছুটতে গিয়ে অন্য আরেকটি ধ্বংস গহ্বরে সে আছড়ে পড়ে।

মানুষ এমনি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতায় পরিপূর্ণ এক জীব যে, কোন কাজ করতে গেলে সর্বপ্রথম তাকে নির্ধারণ করে নিতে হয় তার কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অন্য কোন জীবের ন্যায় এ মানুষ লক্ষ্যহীন কোন কাজ করতে পারে না আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে গেলেই তার সামনে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোন আদর্শের ওপর ভিত্তি করে, কোন আদর্শের দেয়া নিয়ম অনুযায়ী সে তার কাজগুলো সম্পাদন করবে। মানুষের নিজের রচনা করা কোন মতবাদ মানুষকে আদর্শের সন্ধান দান করে না বিধায় মানুষ চরম হতাশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মানব চরিত্র যে কোন মতবাদ যখন মানুষকে আদর্শহীন অবস্থায় পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়, তখন স্বাভাবিক কারণেই মানুষের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন শূন্যতা।

পক্ষান্তরে আদর্শহীন অবস্থায় চিন্তা ও চেতনার শূন্যতা নিয়ে, মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে না বলে জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য আদর্শের সন্ধানে মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে। ফলে চিন্তা ও চেতনার জগতের শূন্যতা পূরণ করার জন্য তার সামনে বিচিত্র ও মানব চিন্তার বিপরীতমুখী আদর্শের সামবেশ ঘটতে থাকে। এ অবস্থায় মানুষের যে কি করুণ পরিণতি ঘটে তা একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিষ্কার হতে পারে।

কোন একজন মানুষের অনেকগুলো বন্ধু ছিল। বন্ধুদের মধ্যে কেউ ছিল শুকনো কাঠ ব্যবসায়ী, কেউ ছিল তুলা ব্যবসায়ী, কেউ ছিল কাপড় ব্যবসায়ী, কেউ ছিল পেট্রোল ব্যবসায়ী, কেউ ছিল কেরেসিন তৈল ব্যবসায়ী, কেউ ছিল খড় ব্যবসায়ী, কেউ ছিল কাগজ ব্যবসায়ী। হঠাৎ কোন একদিন দেখা গেল, গভীর রজনীতে ঐ অনেকগুলো বন্ধুর অধিকারী ব্যক্তিটির আপন বাসগৃহে আগুন লেগেছে। তখন ঐ ব্যক্তি চিৎকার করে তার বন্ধুদের কাছে সাহায্য চেয়ে বলছে, 'আমার এই চরম বিপদের মুহূর্তে তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করো।'

লোকটির এই করুণ আর্তনাদে সাড়া দিয়ে তার সমস্ত বন্ধুরা ছুটে এলো। কাঠ ব্যবসায়ী বন্ধু প্রচুর কাঠসহ ছুটে এসে অগুনের ভেতরে তা ছুড়ে দিলো। কাপড় ব্যবসায়ী বন্ধু কতকগুলো কাপড়ের থান এনে তা আগুনের ভেতরে ছুড়ে মারলো। খড় ব্যবসায়ী বন্ধু কয়েক বোঝা খড় এনে তা আগুনের ভেতরে ছুড়ে দিল। এভাবে কাগজ ব্যবসায়ী বন্ধু কাগজ, পেট্রোল ব্যবসায়ী বন্ধু পেট্রোল, কেরেসিন ব্যবসায়ী বন্ধু কেরোসিন আগুনের ভেতরে ছুড়ে দিলো। ফল যা হবার তাই হলো। আগুন নির্বাপিত হবার পরিবর্তে আগুন আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। সমস্ত বন্ধুর কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল বিপদগ্রস্থ বন্ধুকে সাহায্য করা অর্থাৎ বন্ধুর ঘরের আগুন নিভিয়ে ফেলা। পক্ষান্তরে বিপদগ্রস্থ বন্ধুর জন্য এই লোকগুলো যা করলো, তাতে করে বিপদগ্রস্থ বন্ধুর বিপদ বৃদ্ধি বৈ কমলো না।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের জন্য যত আদর্শ, মতবাদ-মতাদর্শ রচনা করেছে তা সবই আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু বলে প্রতিভাত হয়েছে। ভুল দিক থেকে তার গতি শুরু হয় এবং ভুল দিকেই তা উপনীত হয়ে সমাপ্তি লাভ করে এবং সেখান থেকে পুনরায় অন্য কোন ভুল পথের দিকেই অগ্রসর হতে থাকে। এসব অসংখ্য বাঁকা ও ভ্রান্ত পথের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থানে অবস্থিত এমন একটি পথ একান্তই আবশ্যক। যেন মানুষের সমস্ত শক্তি ও কামনা-বাসনার প্রতি, সমস্ত ভালোবাসা, মায়া-মমতা, স্নেহ, প্রেম-প্রীতি ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রতি, মানুষের আত্মা ও শারীরিক সমস্ত দাবির প্রতি এবং জীবনের যাবতীয় সমস্যার প্রতি যথাযথ–ন্যায়-নিষ্ঠ আচরণ করা, যে আচরণে কোন ধরনের বক্রতা ও জটিলতা থাকবে না, বিশেষ কোন দিকের প্রতি অযথা গুরুত্ব আরোপ ও অন্যান্য দিকগুলোর প্রতি অবিচার ও জুলুম করা হবে না।

বস্তুত মানব জীবনের সুষ্ঠু ও সঠিক বিকাশ এবং তার সাফল্য ও সার্থকতা লাভের জন্য এটা একান্তভাবে অপরিহার্য। মানুষের মূল প্রকৃতিই এই সত্য-সঠিক পথ তথা সিরাতুল মুস্তাকিম লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। পৃথিবীর কোন অমুসলিম বা ইসলাম বিদ্বেষী চিন্তানায়ক এ কথার প্রতি স্বীকৃতি দিক আর না-ই দিক, এ কথা চরম সত্য যে, অসংখ্য বাঁকা-চোরা পথ, ভ্রান্তপথ থেকে বারবার বিদ্রোহ ঘোষণার মূল কারণ হলো, মানব প্রকৃতি সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সহজ-সরল পথের সন্ধানেই ছুটতে থাকে।

পক্ষান্তরে এ কথা সর্বজনবিদিত ও চরম সত্য যে, মানুষ স্বয়ং মুক্তির এই রাজপথ আবিষ্কার করতে ও চিনতে সক্ষম হয় না এবং সিরাতুল মুস্তাকিম মানুষ রচনা করতে পারে না–শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই সিরাতুল মুস্তাকিম রচনা করার মতো জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনিই তা রচনা করতে সক্ষম। ঠিক এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যেই আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁদের আন্দোলন-সংগ্রামের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, মানুষকে মুক্তির রাজপথে নিয়ে আসা তথা আল্লাহর গোলামীর পথ–সিরাতুল মুস্তাকিম কোনটি তা প্রদর্শন করা।

আল্লাহর কোরআন এই মহামুক্তির মহান পথ সিরাতুল মুস্তাকিমকে 'সাওয়া-আস-সাবীল' নামেও মানুষের সামনে পেশ করেছে। পৃথিবীর এই নশ্বর জীবন থেকে শুরু করে আলমে আখিরাতের দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবন পর্যন্ত অসংখ্য বাঁকা-চোরা এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন পথের মাঝখান দিয়ে সিরাতুল মুস্তাকিম বা মহামুক্তির মহান পথ সরল রেখার মতোই আল্লাহর জান্নাতের দিকে চলে গিয়েছে। সুতরাং এই পথের যিনি পথিক হবেন, তিনি এই পৃথিবীতে নির্ভুল-অভ্রান্ত পথের পথিক হবেন এবং আলমে আখিরাতের দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবনে পরিপূর্ণভাবে সার্থক ও সাফল্যমন্ডিত হবেন।

আর যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে সিরাতুল মুস্তাকিমের অভ্রান্ত পথ চিনতে ব্যর্থ হবে বা হারিয়ে ফেলবে সে ব্যক্তি এই পৃথিবীতেও বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও ভুল পথের যাত্রী আর আলমে আখিরাতে তাকে অনিবার্যরূপে আল্লাহর জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। কারণ সিরাতুল মুস্তাকিম বা সাওয়া-আস সাবীল ব্যতিত অন্য সমস্ত বাঁকা পথের শেষ প্রান্ত আল্লাহর জাহান্নাম পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে।

বস্তুবাদ আর জড়বাদের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত একশ্রেণীর চিন্তানায়কগণ বর্তমান মানুষের জীবনকে ক্রমাগতভাবে একটি প্রান্ত থেকে বিপরীত দিকের আরেকটি প্রান্তে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হতে দেখে এই ভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দ্বান্দ্বিক কার্যক্রম (Dialectical Process) মানুষের জীবনের ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক-স্বভাবসম্মত পথ। এসব চিন্তাবিদগণ নিজেদের অজ্ঞতার কারণে বুঝে নিয়েছেন যে, প্রথমে এক চরমপন্থী দাবী (Thesis) মানুষকে একদিকের শেষ প্রান্তে নিয়ে যাবে, ঠিক অনুরূপভাবে সে ঐ প্রান্ত থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আরেকটি চরমপন্থী দাবী (Antithesis) তাকে বিপরীত দিকের শেষ প্রান্তে নিয়ে পৌঁছাবে। এভাবে উভয় প্রান্তের আঘাতের সংমিশ্রণে মানুষের জন্য তার জীবন বিকাশের পথ (Synthesis) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেরিয়ে আসবে আর এটাই হচ্ছে মানুষের ক্রমবিকাশ লাভের একমাত্র অভ্রান্ত পথ।

ভোগবাদে বিশ্বাসী এসব জড়বাদীদের আবিষ্কার করা ক্রমবিকাশ লাভের এই পথকে ক্রমবিকাশ লাভের পথ না বলে চপেটাঘাত খাওয়ার পথ বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ মানুষের জীবনের সঠিক বিকাশের পথে এই পথ বারংবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, মানব জীবন বিকাশের পথে এ পথ অর্গল তুলে দেয়। প্রতিটি চরমপন্থী দাবী মানুষের জীবনকে তার কোন একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয় ও তাকে কঠিনভাবে টেনে নিয়ে যায়। এভাবে বিভ্রান্তির ঘুর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে হতে যখন সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে তা অনেক দূরে চলে যায়, তখন স্বয়ং জীবনেরই অন্যান্য যেসব সমস্যার প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি, যেসব সমস্যাগুলোর কোন সমাধান করা হয়নি, তা বিদ্রোহ শুরু করে।

এভাবে একটির পর একটি দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে, মানুষের জীবন থেকে শান্তি সুদূর পরাহত হয়ে যায়। এই অন্ধদের দৃষ্টি সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে যেতে বাধা দেয় তাদের সীমাহীন ভোগ ব্যবস্থা। এ জন্য তারা দেখতে পায় না, সিরাতুল মুস্তাকিমই হলো মানব জীবনের ক্রমবিকাশ লাভের একমাত্র সত্য-সঠিক পথ।

কোরআনই সিরাতুল মুস্তাকিম

আল্লাহর প্রতি সূরা ফাতিহার মাধ্যমে অভিনন্দন পেশ করা হলো এবং দাবী পেশ করা হলো যে, আমাদেরকে সহজ-সরল পথপ্রদর্শন করো–এটা আমাদের দাবি তোমার কাছে, কেননা সত্য-সঠিক পথপ্রদর্শন করা একমাত্র তোমারই দায়িত্ব। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহ্দের এই দাবীর জবাবে জানিয়ে দিলেন, একমাত্র আমারই দাসত্ব করবে, এটাই তোমাদের জন্য সহজ-সরল পথ আর এই কোরআনকে তোমাদের জন্য হেদায়াত হিসাবে দান করা হলো। আল্লাহ বলেন–

هَـٰذَا بَـلـٰغٌ لِّلنَّـاسِ وَلِـيُـنْـذَرُوْا بِـهٖ وَلِـيَـعْـلَـمُـوْٓا اَنَّـمَـا هُـوَ اِلٰـهٌ وَّاحِـدٌ وَّلِـيَـذَّكَّـرَ اُولُـوا الْاَلْـبَـابِ–

বস্তুত এই (কোরআন) একটি পয়গাম সমস্ত মানুষের জন্য আর এটা প্রেরিত হয়েছে এ জন্য যে, এর মাধ্যমে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হবে এবং তারা অবগত হবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ শুধু একজন আর বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যাপারে সচেতন হবে। (সূরা ইবরাহীম-৫২)

আল্লাহর এই কিতাব পৃথিবীর কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বা কোন শ্রেণী বিশেষকে পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়নি, এই কিতাব সমস্ত মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য এই কোরআন হেদায়াতের পয়গাম বহন করে এনেছে। এই কোরআন সোজা সহজ সরল পথপ্রদর্শন করতে এসেছে। এই কোরআনকে যারা অনুসরণ করবে তারা নিজেদের কল্যাণের লক্ষ্যেই তা করবে। আর যারা অনুসরণ করবে না, তারা নিজেদেরই অকল্যাণ সাধন করবে। আল্লাহ বলেন-

اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ-فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ-وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا-

আমি সমস্ত মানুষের জন্য এ সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং যে সোজা পথ অনুসরণ করবে সে নিজের জন্যই করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে তার পথভ্রষ্টতার প্রতিফলও তাকেই ভোগ করতে হবে। (সূরা যুমার-৪১)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কোরআন কেন এবং কোন উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করেছেন, তা আমরা ইতিপূর্বে 'কোরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আল্লাহর দায়িত্ব হলো নিজের সৃষ্টিসমূহকে পথপ্রদর্শন করা, যে পথে চলে তারা নিজেদের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে সফল ও পূর্ণ করতে পারবে সেই পথের সন্ধান বলে দেয়া। এ কারণেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন অবতীর্ণ হওয়া একদিকে যেমন তাঁর পরম দয়াশীলতার অনিবার্য দাবী, তেমনিভাবে তাঁর সৃষ্টিকর্তা হওয়ারও স্বাভাবিক ও অপরিহার্য দাবীও এই কোরআনের অবতরণ।

আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তাঁর সৃষ্টিসমূহের পথপ্রদর্শনের কাজ সুসম্পন্ন করেছেন এই কোরআন অবতীর্ণ করে। সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যদি তাঁর সৃষ্টির বিধি-ব্যবস্থা বলে না দেন, কর্মপথ নির্দিষ্ট না করেন, তাহলে দ্বিতীয় কে এমন আছে যে, তা করবে ? শুধু তাই নয়-সৃষ্টিকর্তাই যদি তাঁর সৃষ্টিকে হেদায়াত দিতে অক্ষম হন, তাহলে কে এমন আছে যে, তিনি হেদায়াত দান করতে সক্ষম ?

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যে জিনিস নির্মাণ করলেন, তার জীবন, উদ্দেশ্য, পরিপূরণের পন্থা ও পদ্ধতি তিনিই বলে দিয়েছেন। মানুষের দেহের প্রতিটি লোমকূপ, প্রতিটি কোষ ও টিস্যু'র যা কাজ, মানব দেহে অবস্থান করে যে কাজ তাকে করতে হয়, এই কাজের শিক্ষা দিয়েছেন মহান আল্লাহ। সুতরাং এই লোমকূপ ও কোষসমূহের সমষ্টি যে মানুষ, সে নিজে তার সৃষ্টিকর্তার শিক্ষা ও পথপ্রদর্শন থেকে বঞ্চিত থাকে কিভাবে ? মানুষকে এই হেদায়াত থেকে বঞ্চিত রাখা হয়নি, পবিত্র কোরআন সেই হেদায়াত হিসাবে আগমন করেছে। আল্লাহ বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ-

রমযানের মাস, এতেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন-যাপনের বিধান আর এটা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক ও সত্য পথপ্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলে ধরে। (সূরা বাকারা-১৮৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কোরআনকে 'হুদাল্লিন নাছ' অর্থাৎ মানব জাতির জন্য এটা হেদায়াত–বলে ঘোষণা করেছেন। সূরা নেছায় বলা হয়েছে–

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ-

হে নবী ! আমি এই কিতাব পূর্ণ সত্যতা সহকারে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন, সেই অনুসারে লোকদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করতে পারো। (সূরা নিছা-১০৫)

এই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সহজ-সরল পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে আগমন করেছে। কোনটি আলো, কোনটি অন্ধকার, কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা, কোন পথে অশান্তি আর কোন পথে শান্তি, কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায় তার স্পষ্ট পার্থক্য করে দেয় আল্লাহর এই কোরআন। এই কোরআনই মানুষকে সত্য পথপ্রদর্শন করে এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এই কোরআন দিয়েই মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেয়ার জন্য।

মানুষের হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায়, ভালো ও মন্দ বুঝানোর জন্য এবং হেদায়াতের পথপ্রদর্শনের জন্য সবচেয়ে বড় যা হতে পারে, তা-ই হলো এই কোরআন এবং সেটাই মানুষের জন্য মানুষের স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা অবতীর্ণ করেছেন। এই কোরআন থেকে মানুষ যদি হেদাতায়ত গ্রহণ না করে, তাহলে গোটা সৃষ্টিজগতের মধ্যে দ্বিতীয় এমন কোন জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে যে, মানুষ সেখান থেকে হেদায়াত গ্রহণ করতে পারে ? আল্লাহ বলেন–

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ-

এই কোরআনের পরিবর্তে আর কোন কালাম এমন থাকতে রয়েছে যে, যার প্রতি এসব মানুষ ঈমান আনবে ? (সূরা মুরসালাত-৫০)

কোরআন ব্যতীত হক ও বাতিলের পার্থক্য নিরূপণ করা এবং হেদায়াতের পথপ্রদর্শনের অপর কোন মাধ্যম নেই। সুতরাং, যারা এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করবে না তারা কোন মাধ্যম থেকে হেদায়াত পাবে না। আল্লাহ বলেন–

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا-وَاَنَّ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا-

আসলে এ কোরআন এমন পথ দেখায় যা একেবারেই সোজা। যারা একে নিয়ে ভালো কাজ করতে থাকে তাদেরকে সে সুসংবাদ দেয় এই মর্মে যে, তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আর যারা আখিরাত অস্বীকার করে তাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল-৯-১০)

কোরআন সোজা পথপ্রদর্শন করে এবং এই কোরআন থেকে যারা হেদায়াত গ্রহণ করে তারা আল্লাহর কাছে বিরাট প্রতিদান লাভ করবে। আর যারা এই কোরআনকে হেদায়াত বলে বিশ্বাস করে না বা এর থেকে হেদায়াত গ্রহণ করে না, তারা কিয়ামতের ময়দানে কঠিন শাস্তির মধ্যে নিপতিত হবে। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কোরআন থেকে যারা হেদায়াত গ্রহণ করেনি, তাদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ-تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ-كُلَّمَا اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ-

তারা যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন জাহান্নামের ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ ধ্বনি শুনতে পাবে। তা তখন উথাল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ-আক্রোসের অতিশয় তীব্রতায় জাহান্নাম যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম করবে। প্রতিবারে যখনই জাহান্নামের মধ্যে কোন জনসমষ্টি নিক্ষিপ্ত হবে, তখন এর কর্মচারীরা সেই লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন সাবধানকারী কি তোমাদের কাছে আসেনি ? (সূরা মুলক-৭-৮)

কোরআন প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ যারা গ্রহণ করেনি, কোরআনকে যারা হেদায়াত হিসাবে অনুসরণ করেনি, জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের মধ্যে যখন তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নামের দ্বাররক্ষী প্রশ্ন করবে, কেন তোমরা এই কঠিন আযাবের মধ্যে এলে ? এই ভয়াবহ আযাবের কথা কেউ কি তোমাদেরকে পৃথিবীর জীবনে বলেনি ? আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হেদায়াত কি তোমরা লাভ করনি ? সিরাতুল মুস্তাকিম কি তোমাদের সামনে ছিল না ? জাহান্নামীরা আক্ষেপ করে বলবে-

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَ نَا نَذِيْرٌ-فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ-اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ-

হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের কাছে এসেছিল বটে, কিন্তু আমরা তাঁকে অমান্য ও অবিশ্বাস

করেছি এবং বলেছি যে, আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। আসলে তোমরা অতিমাত্রায় পথ ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছো। (সূরা মুল্ক-৯)

অবশ্যই আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হেদায়াত নিয়ে আল্লাহর দ্বীনের ধারক-বাহকগণ এসেছিল। কিন্তু আমরা তা বিশ্বাস করিনি বরং তাদেরকে বলেছি, আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন হেদায়াত অবতীর্ণ হয়নি। মানুষের জন্য কোন জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি, যদি কিছু করেই থাকেন, তা ধর্মগ্রন্থ হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা এই ধর্মকেই মানুষের জীবন ব্যবস্থা তথা যাবতীয় বিধি-বিধান হিসাবে পেশ করছো। মানুষকে তোমরা প্রগতি থেকে অধঃগতির দিকে নিয়ে যেতে চাও। তোমরা দেশ ও জাতিকে সামনের দিকে না নিয়ে পেছনের দিকে নিয়ে যাবার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তোমরা নিজেরাও যেমন পথভ্রষ্ট, তেমনি আল্লাহর বিধানের নামে গোটা মানব মন্ডলীকেও বিভ্রান্ত করতে চাও। আমরা এসব কথা বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদর্শন করা সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে নিজেদেরকে পরিচালিত করিনি এবং জাতিকেও পরিচালিত করার কোন চেষ্টা করিনি।

আল্লাহর দেয়া হেদায়াত থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে কাফির মুশরিকদের কাছ থেকে আমদানী করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। এই মতবাদের যারা অনুসারী এবং যারা সমর্থক, যারা আল্লাহর দেয়া হেদায়াত অনুসরণ করেনি, তারা আল্লাহর জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব দেখে আক্ষেপ করে বলতে থাকবে-

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ-

আর তারা বলবে, হায়-আমরা যদি শুনতাম ও অনুধাবন করতাম তাহলে আমরা আজ এই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম না। (সূরা মুল্ক)

যারা সত্য পথ অবলম্বন করে এই পৃথিবীতে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করার আকাংখা পোষণ করে, এই কোরআন তাদের জন্য পথপ্রদর্শক এবং সুসংবাদ হিসাবে আগমন করেছে। সূরা বাকারার ৯৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَهُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ-

এই কোরআন ঈমানদারদের জন্য সঠিক পথের সন্ধান ও সাফল্যের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে।

সাফল্যের এই সুসংবাদ পৃথিবীতে নতুন কোন বিষয় নয়-আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে কোরআনের পূর্বেও বিভিন্ন নবী-রাসূলদের ওপরে কিতাব অবতীর্ণ করে সাফল্য ও সুসংবাদ দান করেছেন। সুতরাং সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ নতুন কোন পথ নয়, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই পৃথিবী সিরাতুল মুস্তাকিমের সাথে পরিচিত হয়নি, ইতিপূর্বেও এই পথের সাথে পৃথিবীর পরিচয় ঘটেছে। প্রতিটি নবী-রাসূলই সেই একই সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকেই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

কোরআন শান্তি ও নিরাপত্তার পথপ্রদর্শন করে

আল্লাহর এই কিতাব তাদেরকেই পথপ্রদর্শন করে, যারা অসংখ্য বাঁকা পথের অশুভ হাতছানি থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করে সহজ-সরল পথের সন্ধান লাভের জন্য চেষ্টা চালায়। আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়াদি ও শিক্ষাসমূহ অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার। এসব শিক্ষা এতটাই পরিষ্কার যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলেই সত্যের অভ্রান্ত পথ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। যারা কোরআন যথাযথভাবে অনুসরণ করে, এই কোরআন কত সুন্দর ও নির্ভুল পথপ্রদর্শন করে এবং এটা কত বড় রাহ্‌মতের ব্যাপার তা তাদের জীবনে ও কর্মে প্রত্যক্ষ করা যায়। কোরআন প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিমের প্রভাবে মানুষের মন-মানস, নৈতিক চরিত্র, আচার-ব্যবহারে যে স্বাভাবিক এক অতি উত্তম বিপ্লব সূচিত হয় তাও লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ বলেন–

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ-

এই কিতাব ঈমানদার লোকদের জন্য হেদায়াত ও রাহ্‌মত স্বরূপ। (সূরা আ'রাফ-৫২)

এই কোরআনে অপরিসীম বিচক্ষণতার আলো প্রস্ফুটিত রয়েছে। এর অত্যধিক উজ্জ্বল সৌন্দর্য হলো, যারা এর হেদায়াত অনুসরণ করে তারা অতি সহজেই জীবনের সরল-সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যায় এবং তাদের নির্মল ও উত্তম চরিত্রে আল্লাহর অফুরন্ত রাহ্‌মতের নিদর্শন প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আল্লাহ বলেন–

هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ-

বস্তুত এটা অন্তর্দৃষ্টির উজ্জ্বলতম আলো, তোমাদের রব্ব-এর কাছ থেকে অবতীর্ণ। এটা হেদায়াত ও রাহ্‌মত সেই লোকদের জন্য, যারা এটা মেনে নিবে। (সূরা আ'রাফ-২০৩)

এই পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় সমস্যাকে যদি রোগ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে, এসব রোগ নির্মূল করার লক্ষ্যেই এই কোরআনের আগমন ঘটেছে। আল্লাহ বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ-وَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

হে মানব জাতি ! তোমাদের কাছে তোমাদের রব্ব-এর পক্ষ থেকে নসীহত এসে পৌঁছেছে, এটা অন্তরের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময় আর যে তা কবুল করবে, তার হেদায়াত ও রাহ্‌মত নির্দিষ্ট হয়ে আছে। (সূরা ইউনুস-৫৭)

আল্লাহর এই কোরআন–এটা এমনি এক হেদায়াত, যেসব মানুষের অন্তর কালিমা লিপ্ত হয়ে পড়েছে, সেই মসীলিপ্ত অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে দেয়। এই কিতাবের কাছ থেকে যারা সিরাতুল

মুস্তাকিম লাভ করতে চায়, তাদের জন্য হেদায়াত ও রাহ্‌মতের ব্যবস্থা মহান আল্লাহ করে রেখেছেন। মানুষ আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানালো, তারা সত্য পথ তথা হেদায়াত লাভ করতে চায়। মহান আল্লাহ প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাদের হেদায়াতের জন্য পবিত্র কোরআন নবীর মাধ্যমে তাদের সামনে পেশ করলেন। আল্লাহ বলেন–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ–

আমি এ কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যা সব জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে এবং যা সঠিক পথনির্দেশনা, রাহ্‌মত ও সুসংবাদ বহন করে তাদের জন্য যারা আনুগত্যের মাথা নত করে দিয়েছে। (সূরা নাহ্‌ল-৮৯)

এই কোরআন এমন প্রত্যেকটি জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে, যার ওপর হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতা এবং লাভ ও ক্ষতি নির্ভর করে, যা জানা সঠিক পথে চলার জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং যার মাধ্যমে হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যারা কোরআন থেকে হেদায়াত গ্রহণ করবে এবং আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে আল্লাহর কোরআন জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে, একে অনুসরণ করে চলার কারণে তাদের প্রতি আল্লাহর রাহ্‌মত বর্ষিত হবে এবং এ কিতাব তাদেরকে এই সুসংবাদ দেবে যে, চূড়ান্ত ফায়সালার দিন আল্লাহর আদালত থেকে তারা সফলকাম হয়ে বের হয়ে আসবে।

অন্য দিকে যারা আল্লাহ কোরআনের অনুসরণ করবে না তারা যে শুধুমাত্র হেদায়াত ও রাহ্‌মত থেকে বঞ্চিত হবে তাই নয়–বরং কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর নবী তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে দাঁড়াবেন তখন এই দলীলটিই হবে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কারণ নবী এ কথা প্রমাণ করে দিবেন যে, তিনি তাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছিলেন যার মধ্যে হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছিল।

মানুষের জন্য আল্লাহর এই কোরআন সবচেয়ে বড় দান, সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার, সবচেয়ে বড় সম্পদ-নিয়ামত। মানুষের ব্যক্তি জীবন বা রাষ্ট্রীয় জীবনে একটি স্বাভাবিক বিষয় দেখা যায়, কোন ব্যাপারে যদি একজন মানুষ অথবা একটি রাষ্ট্রের জনগণ সাফল্য লাভ করে, তাহলে ব্যক্তি যেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি রাষ্ট্রও আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। নিজ দেশের সেনাবাহিনী যখন শত্রু দেশের সৈন্যদেরকে নাস্তানাবুদ করে বিজয়ী হয়ে আসে, তখন বিজয়ী দেশের জনগণ আনন্দ-উল্লাসে দিশাহারা হয়ে যায়।

অর্থাৎ লাভের পরিমাণটা যত বেশী হয়, মানুষ তত বেশী আনন্দ প্রকাশ করে থাকে, এটা মানুষের স্বভাব। এই পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনে মানুষকে সবচেয়ে অধিক লাভ করে দিতে পারে এই কোরআন। মানুষকে সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌঁছে দেয়ার জন্যই এই কোরআন প্রেরণ করা হয়েছে। মানুষের সবচেয়ে বেশী আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা উচিত যে, তারা কোরআনের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার লাভ করে শয়তানী শক্তির ওপরে বিজয়ী হয়েছে। এই যমীন ও আকাশের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, এসব প্রতিটি বস্তুর যা মূল্য হবে, সেসব মূল্য

একত্রিত করলে যে পরিমাণ দাঁড়াবে, আল্লাহর কোরআনের একটি অক্ষরের মূল্যের সাথেও তা তুলনীয় হবে না। এই কোরআন যে কত মূল্যবান, এটা মহান আল্লাহর যে কতবড় নিয়ামত, তা মানুষ অনুধাবন করতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا-هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ-

হে নবী ! আপনি বলে দিন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে, তিনি এই কোরআন প্রেরণ করেছেন। এই জন্য তো লোকদের আনন্দ স্ফূর্তি করা উচিত। এই কোরআন সেসব জিনিস থেকে উত্তম যা লোকজন সংগ্রহ ও আয়ত্ত করে থাকে। (সূরা ইউনুস-৫৮)

এই কোরআনই সেই সিরাতুল মুস্তাকিম, মানুষ যা নামাজের মধ্যে বার বার কামনা করে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে আগ্রহী, আল্লাহর এই কোরআন তাদের যাবতীয় অভাব পূরণ করে। কোরআন মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা দান করে। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। মহান আল্লাহ বলেন-

قَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ-يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রৌশনী এসেছে, সেই সাথে এমন একটি সত্য প্রদর্শনকারী কিতাবও-যার সাহায্যে আল্লাহ তা'য়ালা তার সন্তোষ-সন্ধানকারী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বলে দেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান ও সঠিক পথে পরিচালিত করেন। (সূরা মায়িদা-১৫-১৬)

এই আয়াতে পরিষ্কার বলে দেয়া হলো, যে সিরাতুল মুস্তাকিম মানুষ লাভ করার জন্য আল্লাহর দরবারে অভিনন্দন পূর্বক দাবি পেশ করে, এই কোরআনই সেই সিরাতুল মুস্তাকিম। সূরা আল জাসিয়ার এগার আয়াতে এই কোরআনকে 'হাযা হুদা' অর্থাৎ হেদায়াত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এটাই মানব জাতিকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করবে। শর্ত হলো, এই কোরআনের বিধানের সামনে মাথানত করে দিতে হবে।

মানুষের জীবন সফল হতে পারে তখনই যখন সে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু সে মানুষের জানা নেই, কোন পথে সে নিজের জীবনকে পরিচালিত করলে মহান আল্লাহ তার ওপরে সন্তুষ্ট হবেন। এই কোরআন এমনি এক হেদায়াত-যা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ. মানুষের কাংখিত পথপ্রদর্শন করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقِّ-وَيَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ-

হে নবী ! জ্ঞানবানরা ভালো করেই জানে, যা কিছু তোমার রব্ব-এর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ সত্য এবং তা (এই কোরআন) পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথপ্রদর্শন করে। (সূরা সাবা-৬)

কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের শর্ত

মানুষের হেদায়াতের জন্যে একমাত্র এই কোরআনকেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। মানুষ আল্লাহর দরবারে যে হেদায়াত কামনা করলো, সেই হেদায়াত হিসাবে তার কাছে ত্রিশপারা কোরআন দেয়া হলো এবং বলা হলো, এই কোরআন থেকে হেদায়াত গ্রহণ করো। আল্লাহর এই কিতাব থেকে হেদায়াত গ্রহণ করতে হলে কতিপয় শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। সেই শর্ত পূরণ না করলে কোনক্রমেই এই কিতাব থেকে হিদায়াত লাভ করা যাবে না।

কোন ব্যক্তি যদি মহাশূন্যে গমন করতে যায়, চাঁদ বা অন্য কোন গ্রহে ভ্রমণ করতে চায়, তাহলে কাংখিত গ্রহে ভ্রমণের উপযোগী হিসাবে দীর্ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। সেই গ্রহের উপযোগী পোষাক পরিধান করতে হয়। মহাশূন্যে কিভাবে আহার করতে হবে, ঘুমাতে হবে, মলমূত্র ত্যাগ করতে হবে ইত্যাদি বিষয় তাকে অবগত হতে হয়। তারপর পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে মহাশূন্যের পথে পা বাড়াতে হয়।

একই ভাবে কোন বস্তু থেকে উপকার বা কল্যাণ গ্রহণ করতে হলে সেই বস্তুর ব্যবহার বিধি মানুষকে অবশ্যই জানতে হয়। ব্যবহার বিধি না জেনে কোন বস্তু ব্যবহার করলে তা থেকে কল্যাণ লাভ করা যায় না।

এই কোরআন আল্লাহ মানব জাতির জন্য হেদায়াত হিসাবে প্রেরণ করেছেন। এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলেও মানুষকে হেদায়াত লাভের উপযোগী হতে হবে, তারপর সে এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভে সমর্থ হবে। এই কোরআন কোন ধরনের লোকদেরকে পথ নির্দেশ দান করবে, তা স্বয়ং কোরআন বলছে–

تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ-هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ-الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ-

এগুলো কোরআনের ও এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত, পথনির্দেশ ও সুসংবাদ এমন মুমিনদের জন্য যারা নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং তারা এমন লোক যারা আখিরাতকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। (সূরা নাম্‌ল-১-৩)

আল্লাহর কিতাব শুধুমাত্র সেসব লোকদেরই পথনির্দেশনা দেয় এবং আনন্দদায়ক পরিণামের

সুসংবাদও একমাত্র সেসব মানুষকে দেয়, যেসব মানুষ ঈমান আনে। ঈমান আনার অর্থ হলো, তারা কোরআন ও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান কবুল করেন। এক আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ, রব্ব, মা'বুদ বা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই কোরআনকে আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাব হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে তা মেনে নেয়। বিশ্বানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু নবী-রাসূল ও জীবনের অনুসরণের একমাত্র আদর্শ নেতা হিসাবে মেনে নেয়। সেই সাথে সে এই বিশ্বাসও অন্তরে পোষণ করে যে, পৃথিবীর জীবন শেষে মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন রয়েছে, সেই জীবনে এই পৃথিবীর জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে এবং প্রতিদান পেতে হবে।

কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে শুধু উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি দিলেই হেদায়াত পাওয়া যাবে না। নিজের জীবনে বাস্তবে এগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে হবে। হেদায়াত লাভের জন্য উল্লেখিত দিকগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্যের প্রথম লক্ষণই হলো, হেদায়াত কামনাকারী ব্যক্তি নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত দানের উপযুক্ত হলে যাকাত দান করবে।

এই কাজ যারা করবে, আল্লাহর কোরআন তাদেরকেই হেদায়াত দান করবে বা সত্য সহজ সরল পথের সন্ধান দান করবে। জীবন পথের প্রতিটি বাঁকে তাদেরকে সত্য আর মিথ্যা এবং ন্যায় আর অন্যায়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দিবে। মানুষ যদি কোনভাবে ভুল পথের দিকে অগ্রসর হতে চায়, কোরআন তাকে সতর্ক করবে। তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দান করবে যে, সত্য সঠিক পথ অবলম্বন করার ফলাফল এই পৃথিবীতে মিষ্ট বা তিক্ত যা-ই হোক না কেন, পরিশেষে এর বিনিময়ে চিরন্তন সফলতা তারাই অর্জন করবে এবং তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে।

কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের বিষয়টি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে স্পষ্ট করা যেতে পারে। রোগী যদি ডাক্তারের কাছ থেকে উপকৃত হতে আগ্রহী হয় তাহলে ডাক্তারকে নিজের চিকিৎসক হিসাবে গ্রহণ করে তার ব্যবস্থাপত্র (Prescription) অনুসারে রোগীকে চলতে হবে। তেমনি কেউ যদি কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে আগ্রহী হয়, তাকেও কোরআনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। আর মানুষ এই আনুগত্য যথার্থই করছে কিনা, তা নামাজ আদায় ও যাকাত দানের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায়।

মানুষ যদি নামাজ আদায় না করে, সামর্থ থাকার পরও যাকাত আদায় না করে, তাহলে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে হবে যে, সে ব্যক্তি কোরআন থেকে হেদায়াত চায় না। অর্থাৎ এমন ধরনের ব্যক্তি সে, দেশের শাসককে শাসক হিসাবে মেনে নিলেও শাসকের আদেশ মানতে মোটেও প্রস্তুত নয়। কোরআনকে কোরআন হিসাবে স্বীকৃতি সে দেয়, কিন্তু কোরআনের বিধান মানতে আদৌ প্রস্তুত নয়। এমন ব্যক্তি কখনো কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে সমর্থ হয় না।

পবিত্র কোরআন থেকে কোন শ্রেণীর লোক হেদায়াত লাভ করতে পারে এবং তাদেরকে কোন

ধরনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে, এ সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ্ ছুব্হানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন–

ذَالِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ-فِيْهِ-هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ-

এটা আল্লাহর কিতাব, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা জীবন-যাপনের ব্যবস্থা সেই মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা বাকারা-২)

অর্থাৎ এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই মুত্তাকী হতে হবে। মুত্তাকী হবার শর্তপূরণ না হলে তার পক্ষে আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করা সম্ভব হবে না। মুত্তাকীদের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে। আর আমি তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে। আর যে কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সেসবের প্রতি বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। (সূরা বাকারা-৩-৪)

এই আয়াতে মুত্তাকীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। এসব গুণাবলী যাদের মধ্যে নেই, তারা আল্লাহর কিতাব থেকে পথ-নির্দেশ লাভ করতে সমর্থ হবে না। এই কিতাব থেকে পথনির্দেশনা লাভের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে বলেছেন, তার প্রথম গুণ হলো, ব্যক্তিকে অবশ্যই এই কোরআনের প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে এবং কোরআনের প্রতি আনুগত্য পরায়ণ হতে হবে। কোরআন যে জীবন বিধান দান করেছে, সেই বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া একান্ত জরুরী।

এই পৃথিবীতে যারা একান্তই পশুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করতে চায়, পশু-প্রাণীর মতো দায়িত্ব-কর্তব্যহীন জীবন-যাপন করতে আগ্রহী, পৃথিবী যে রঙে রঙিন, সেই রঙে রঙিন হতে চায়, নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ড–তা কল্যাণকর অথবা অকল্যাণ কর, এ সম্পর্কে গুরুত্ব দেয় না, জীবন পরিচালিত করার ক্ষেত্রে সৎ ও অসৎ পথের কোন তোয়াক্কা যারা করে না, মানুষ হিসাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কোন চিন্তা করে না, এই পৃথিবীতে কে তাকে প্রেরণ করলো, কেন সে প্রেরিত হলো, সমস্ত সৃষ্টি কেন তার যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করছে, এসব সৃষ্টির পেছনে কোন গূঢ় রহস্য লুকায়িত রয়েছে ইত্যাদি বিষয় যাদের মন-মানসিকতাকে আলোড়িত করে না, তারা আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারে না।

পবিত্র কোরআনে মুত্তাকীদের অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সমস্ত গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশ নেই বিধায় আমরা এখানে এমন কতকগুলো একান্ত প্রয়োজনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করবো, যা অর্জন করতে সক্ষম না হলে আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম পরহেযগার হতে হবে। 'পরহেয' শব্দটি উর্দু ও ফারসী ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর অর্থ হলো, 'বিরত থাকা'। আর 'পরহেযগার' শব্দের অর্থ হলো, 'যিনি বিরত থাকেন।' ইসলামী সংস্কৃতিতে পরহেযগার তাকেই বলা হয়, যিনি আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বৈধ করেছেন, হালাল করেছেন–তাই করেন আর যা অবৈধ ঘোষণা করেছেন, হারাম বলেছেন, তা থেকে বিরত থাকেন।

অর্থাৎ পরহযেগার ব্যক্তি হয় সচেতন। প্রতিটি পদক্ষেপে সে ব্যক্তি সত্যের এবং ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে। কোনটি ভালো একং কোনটি মন্দ, কোনটি কল্যাণকর আর কোনটি ক্ষতিকর ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য করার মতো যোগ্যতা পরহেযগার ব্যক্তির মধ্যে থাকে। ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করার যোগ্যতা যেমন ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে, তেমনি তার মধ্যে এই মানসিকতা থাকতে হবে যে, তিনি অন্যায় পথে পরিচালিত হবেন না। সত্যের অনুসন্ধান করে তিনি সেই সত্যের অনুসরণ করবেন। গোটা পৃথিবী কোন পথে পরিচালিত হচ্ছে, এ বিষয়ের প্রতি তিনি গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র সত্যের প্রতিই গুরুত্ব দিবেন। এক কথায় সত্যাশ্রয়ী মন-মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণই আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে সমর্থ হবেন এবং কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করার এটাই হলো প্রথম গুণ ও বৈশিষ্ট্য।

মুত্তাকী ব্যক্তির দ্বিতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, ব্যক্তিকে গায়েব তথা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে। আল্লাহর কোরআনে অদৃশ্য বলতে সেই সমস্ত বাস্তব সত্যকে বুঝায়, যা মানুষ তার নিজস্ব কোন শক্তির মাধ্যমে দেখতে পায় না বা তার কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই অনুভব করতে পারে না। অর্থাৎ যা মানুষের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়–অতিন্দ্রীয়, ধরা–ছোঁয়ার বাইরে, এসব শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে–গায়েবের প্রতি দৃঢ় আস্থা থাকতে হবে। স্বয়ং আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করতে হবে। তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। তিনি অসংখ্য ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করেছেন, এসব ফেরেশ্‌তা তাঁরই আদেশের আজ্ঞাবাহী এবং তাঁরা আল্লাহর আদেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

তিনি তাঁর ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে ওহী প্রেরণ করেছেন, এসব ওহীর প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে। মানুষের ভালো-মন্দের পুরস্কার হিসাবে তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন, এসবের প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে। নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাকদীদের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। এ ধরনের অদৃশ্য বিষয়সমূহ যা কিছু রয়েছে, তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হতে হবে এবং এটাকেই বলা হয় গায়েবের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান বিল গায়েব। কোন ধরনের শর্ত ব্যতিতই গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। মুত্তাকী ব্যক্তিগণ গায়েবের প্রতি বিশ্বাসী হন, আর যাদের গায়েবের প্রতি বিশ্বাস নেই, তারা এই কোরআন থেকে কোনভাবেই উপকার গ্রহণ করতে পারবে না বা হেদায়াত লাভ করতে সমর্থ হবে না।

মুত্তাকীদের তৃতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, ঈমান বিল গায়েবের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করে তা মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার পর সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। যে অদৃশ্য শক্তি মহান আল্লাহকে সে হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করলো এবং

মৌখিকভাব স্বীকৃতি দিল, সেই আল্লাহর আইন-বিধানের প্রতি আনুগত্যের মাথা তাকে নত করে দিতে হবে। আর আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রথম নির্দশন হলো নামাজ। ব্যক্তিকে নামাজ কায়েম করতে হবে। নামাজ হলো যাবতীয় কাজের মডেল এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি ও ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগ্রত রাখার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

এক ব্যক্তি যদি যোহরের আজানের কিছুক্ষণ পূর্বে ইসলাম কবুল করে, তাহলে আজানের ধ্বনি তার কানে পৌছা মাত্র তার ওপরে সর্বপ্রথম ফরজ কাজ হিসাবে পালনীয় হয় নামাজ। নামাজ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, নামাজই হলো ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। অর্থাৎ যে নামাজ আদায় করলো সে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য করবে বলে প্রমাণ দিল। আর যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করলো না, সে এ কথারই প্রমাণ দিল যে, সে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য করবে না। অর্থাৎ সে কুফরীকেই পছন্দ করলো।

সুতরাং, কোরআন থেকে হেদায়াত গ্রহণ করতে হলে ব্যক্তিকে নামাজী হতে হবে এবং মুত্তাকী হওয়ার জন্য নামাজ আদায় অন্যতম শর্ত আর নামাজ আদায় বলতে যা বুঝায়-সেভাবেই নামাজ আদায় করতে হবে। অর্থাৎ নামাজ মানুষকে যা শিক্ষা দেয়, সে শিক্ষা অনুসারে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালিত করতে হবে। নামাজ আদায়ের তাগিদ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, নামাজ মানুষকে একমাত্র আল্লাহর গোলামে পরিণত করে। আল্লাহর গোলাম কাকে বলে এবং গোলামের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি, এ সম্পর্কে আমরা ইবাদাত শব্দের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুতরাং কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে নামাজ আদায় করতে হবে এবং এই নামাজ একাকী আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমষ্টিগত পর্যায়ে আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। জামায়াত বদ্ধ নামাজের যে শিক্ষা, তা নামাজের বাইরের জীবনে অনুসরণ করতে হবে।

মুত্তাকীদের চতুর্থ গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করে। মুত্তাকীদের পরিচয় দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন-

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ
وَالْاَرْضُ-اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ-الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ-وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ-

সেই পথে তীব্র গতিতে চলো, যা তোমাদের রব্ব-এর ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা সেই মুত্তাকী লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সব সময়ই নিজেদের অর্থ-সম্পদ খরচ করে, দুরবস্থায়ই হোক আর সচ্ছল অবস্থায়ই হোক, যারা ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। এসব নেককার লোককেই আল্লাহ খুবই ভালোবাসেন। (সূরা ইমরাণ-১৩৩-১৩৪)

মুত্তাকী ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ণমনা বা কৃপণ হয় না। পৃথিবীর বুকে তারা ধন-দৌলত, অর্থ-সম্পদের গোলামী করে না। মহান আল্লাহ্ তাকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে সম্পদ তার একার ভোগ করার জন্য এবং যেভাবে খুশী সেভাবে ভোগ করার জন্য তাকে দেয়া হয়নি, এই অনুভূতি তার মধ্যে সক্রিয় থাকে। তার এই ধন-সম্পদে অভাবী লোকদের অধিকার রয়েছে এবং সে অধিকার আদায়ে মুক্তাকী ব্যক্তি সচেতন থাকে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়, সে আন্দোলনে মুত্তাকী ব্যক্তি অকাতরে, উন্মুক্ত-অবারিত হস্তে অর্থ ব্যয় করে। অর্থ-সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে সে বৈধ-অবৈধতার সীমারেখার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে।

মুত্তাকী ব্যক্তি অভাবগ্রস্থ হলেও সামর্থানুসারে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যেমন অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তেমনি সচ্ছল অবস্থায় থাকলেও করে। অর্থাৎ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা মুত্তাকী ব্যক্তির স্বভাবে পরিণত হয়। মুত্তাকী ব্যক্তির গুণাবলী সম্পর্কে সূরা ইমরাণের উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের কথা বলতে গিয়ে এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে। ক্রোধের পরিবর্তে তাদের চরিত্রে সৃষ্টি হয় বিনয়।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, মুত্তাকীরা হলো রাহ্মানের বান্দাহ্। আর রাহ্মানের বান্দাহ্গণ যমীনে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে। অন্যরা যদি কোন অপরাধ করে, সে অপরাধ তারা ক্ষমা করে দেয়। এসব হলো মুত্তাকী ব্যক্তিদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য এবং মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার প্রশস্ততা আকাশ ও যমীনের বিস্তৃতির সমান। আল্লাহ তা'য়ালা এই মুত্তাকী ব্যক্তিদের অত্যন্ত ভালোবাসেন। সুতরাং চরিত্রে এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে হবে, তাহলে আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করা যাবে।

রাব্বুল আলামীনের কিতাব থেকে হেদায়াত লাভের পঞ্চম শর্ত হলো, কোরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন নবী-রাসূলদের প্রতি যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, ইতিপূর্বেও তিনি মানুষের জন্য হেদায়াত অবতীর্ণ করেছিলেন। আল্লাহ্ বলেন–

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ-مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ-

তিনি তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এটা সত্যের বাণী নিয়ে এসেছে এবং পূর্বের সমস্ত কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করছে। ইতিপূর্বে তিনি মানুষের হেদায়াতের ও জীবন ব্যবস্থা হিসাবে তওরাত ও ইনজীল অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি মানদন্ড অবতীর্ণ করেছেন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশকারী। (সূর ইমরাণ-২-৪)

অর্থাৎ মানুষের হেদায়াতের জন্য ইতিপূর্বে যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, আল্লাহর এই কোরআন সেসব কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করছে। এই ঘোষণা এই অর্থে যে, তা ছিল আল্লাহর বাণী–স্বয়ং আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। আল্লাহর এই ঘোষণার অর্থ এটা নয় যে, বর্তমানে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের কাছে যেসব কিতাব রয়েছে, তা তারা আল্লাহর বাণী হিসাবে দাবি করছে এবং কোরআনও তাদের দাবির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে–বিষয়টি এমন নয়।

বরং এসব জাতি আল্লাহর কিতাবের বিকৃতি সাধন করেছে, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে। এসব কিতাব যে বিকৃত করা হয়েছে, তার ভেতরে অসংখ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে, এর প্রমাণ স্বয়ং সেসব কিতাবই দিচ্ছে। আল্লাহর বাণী এবং মানুষের বাণীর মধ্যে প্রতিটি দিক থেকে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিরাজমান। বর্তমানে যে বাইবেল রয়েছে, তার ভাব ও ভাষা, বর্ণনা ভঙ্গী, উপস্থাপনা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি দিলেই স্পষ্ট অনুভব করা যায়, এসব কিতাব কিভাবে এবং কত দূর পর্যন্ত বিকৃত করা হয়েছে। নিজেদের স্বার্থের অনুকুলে এসব কিতাবে কিভাবে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। তারা যেসব কথা আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করে থাকে, কোরআন যখন অবতীর্ণ হয়েছে–তখনই তাদের মনগড়া কথার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। সুতরাং, কোরআন পূর্বে অবতীর্ণকৃত যেসব কিতাবের প্রতি মানুষকে ঈমান আনতে বলে, সেসব কিতাব অবিকৃত অবস্থায় পৃথিবীতে নেই।

সূরা বনী ইসরাঈলের ৫৫ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'আমিই দায়ুদকে যাবুর দিয়েছি।' এই যাবুর কিতাব সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ-اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ-

আর যাবুর কিতাবে নসীহতের পর আমি লিখে দিয়েছি যে, যমীনের উত্তরাধীকারী আমার সৎ বান্দারা হবে। এতে এক মহাসংবাদ নিহিত রয়েছে আবিদ বান্দাদের জন্য। (সূরা আম্বিয়া)

অর্থাৎ কোরআন যেমন ঘোষণা করছে, যারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব, বন্দেগী, গোলামী, পূজা-উপাসনা, আনুগত্য-ইবাদাত করবে, তারাই এই পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হবে, তেমনি এসব বিষয় পূর্বের কিতাবসমূহেও উল্লেখ ছিল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের প্রতি যেসব সহীফা ও কিতাব যেমন হযরত দায়ুদ আলাইহিস্ সালামের প্রতি যাবুর, হযত মুছা আলাইহিস্ সালামের প্রতি তওরাত এবং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি ইনজিল কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, এসবের প্রতি এ ধরনের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এসব কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকেই মানুষের হেদায়াতের জন্য আগমন করেছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং যুগে প্রয়োজন অনুসারে ওহীর মাধ্যমে কোরআনের পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করতে হবে। মানব মন্ডলীর জন্য আল্লাহর কাছ থেকে কোন জীবন ব্যবস্থা বা বিধান অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা যারা অস্বীকার করে, নিজেরা কোন মতবাদ-মতাদর্শ রচনা করে তা আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয় অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাবে কিছুটা বিশ্বাস রাখে এবং সেই সাথে এ কথা বলে যে, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে কিতাবকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকৃতি দিতেন, আমরা সেসব কিতাবকেই শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি' এ ধরনের কোন মানুষ কোরআন থেকে কখনো হেদায়াত লাভ করতে পারে না।

যেসব মানুষ নিজেদেরকে আল্লাহর বিধানের মুখাপেক্ষী মনে করে এ কথাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর বিধান ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিটি মানুষের কাছে অবতীর্ণ হয় না এবং এটা আল্লাহর নিয়ম নয়-বরং নবী-রাসূলদের ওপরেই তা অবতীর্ণ হয় ও তাঁদের মাধ্যমেই গোটা মানব জাতির কাছে তা পৌঁছে থাকে-আর এটাই আল্লাহর নিয়ম। এই বিশ্বাস যাদের আছে, তারাই কেবল কোরআন থেকে হেদায়াত লাভে সক্ষম হবে। সুতরাং মুত্তাকীদের এটাও একটি গুণ যে, তারা পূর্বে অবতীর্ণ করা কিতাবের প্রতি এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনের পূর্বেও মানব জাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন।

মুত্তাকীগণ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং মুত্তাকী হওয়ার জন্য এটা ষষ্ঠ শর্ত। মানুষ এই পৃথিবীতে কোন দায়িত্বহীন জীব নয় এবং সে মনিবহীন কোন সত্তাও নয়। তাঁর একজন ইলাহ, মা'বুদ ও রব্ব আছেন। সেই রব্ব-এর নির্দেশ অনুসারেই তাকে এই পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করতে হয়। এই পৃথিবীতে সে যা কিছুই করবে, তার প্রতিটি কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব তাকে মহান আল্লাহর কাছে দিতে হবে। কারণ এই পৃথিবীই একমাত্র জগৎ নয়-বরং ইন্তেকালের পরে আরেকটি জগৎ বিদ্যমান।

বর্তমানের এই পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়, এটা সৃষ্টি হয়েছে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য। একদিন এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান এই জগতটি নিমিষে মহান আল্লাহর আদেশে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সমস্ত কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে। কোনদিন এবং কখন এ পৃথিবী ধ্বংস হবে, সে সংবাদ একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত আর কারো জানা নেই।

এই পৃথিবীর পরিসমাপ্তি ঘটার পরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরেকটি নতুন জগৎ সৃষ্টি করবেন, সে জগতের নাম আখিরাত। সেখানে পৃথিবীতে মানব আগমনের দিন থেকে শুরু করে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত যত সংখ্যক মানুষের আগমন ঘটেছিল, সমস্ত মানুষকে একই সময়ে পুনরায় সৃষ্টি করে একত্রিত করবেন। পৃথিবীতে এসব মানুষ যা কিছু করেছে, তার হিসাব তিনি গ্রহণ করবেন। সৎকাজ যারা করেছিল তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং অসৎকাজ যারা করেছিল, তাদের শাস্তির বিধান করবেন। এভাবে সমস্ত মানুষের কর্মের প্রতিফল সেদিন দেয়া হবে। মানুষ তার কর্মফল অনুসারে কেউ জান্নাত লাভ করবে আবার কেউ ভয়াবহ শাস্তির স্থান জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে।

এই পৃথিবীতে যারা সম্মান-মর্যাদা লাভ করেছে, বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে, অগাধ ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে, প্রভূত শিক্ষা অর্জন করেছে, দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ লাভ করেছে অথবা সরকারী কোন সম্মানজনক পদে আসীন হয়েছে, দেশের কোন শিল্প-কারখানার সত্বাধিকারী হয়েছে, বিশ্বব্যাপী বড় ব্যবসায়ী-শিল্পপতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে, সাধারণ মানুষ এই অবস্থাকেই জীবনে সফলতা অর্জন করেছে বলে ধারণা করে। আর কোন মানুষ যদি উল্লেখিত কোন কিছুরই সুযোগ লাভ না করে, পৃথিবীতে সে চরম অভাবের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে, এক কথায় কোন প্রাপ্তিই যদি এই পৃথিবীতে না ঘটে, তাহলে মানুষ সেই ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করে, লোকটি জীবনে কোন সফলতাই অর্জন করতে পারলো না।

প্রকৃত পক্ষে বর্তমান পৃথিবীতে সচ্ছলতা এবং অসচ্ছলতা মানুষের জীবনে সফলতা অর্জনের কোন মাপকাঠি নয়। মানব জীবনের প্রকৃত সফলতা হলো আখিরাতের ময়দানে আল্লাহর বিচারালয়ে যে ব্যক্তি সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত সফলতা অর্জন করেছে বলে বিবেচিত হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিচারালয়ে গ্রেফতার হয়ে শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে, সেই ব্যক্তির গোটা জীবনই ব্যর্থ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ প্রকৃত জয়-পরাজয় ও সফলতা-ব্যর্থতা নিরুপণ হবে আখিরাতের ময়দানে।

মুত্তাকীগণ উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী এবং এসব বিষয়ের প্রতি যাদের বিশ্বাস রয়েছে, তারাই কেবল আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম। মুখে মুখে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, কোরআনের প্রতি বিশ্বাস, নবীদের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে বলে দাবি করলেই হেদায়াত লাভ করা যাবে না। বরং এসব বিশ্বাসের সমন্বয়ে চরিত্র সৃষ্টি করে ব্যক্তিকে মুত্তাকী বা পরহেযগার হতে হবে। এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি অবশ্যই এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করবে।

আর যাদের চরিত্রে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত রয়েছে, তারা কোরআন থেকে হেদায়াত পাবে না। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করতে হলে ডাক্তারকে নিজের চিকিৎসক বলে স্বীকৃতি দিয়ে তার ব্যবস্থাপত্র অনুসারে চলতে হবে, তাহলে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যাবে।

তেমনি কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে এটাকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকৃতি দিয়ে এর প্রতি ঈমান এনে আনুগত্য করতে হবে, আর আনুগত্যের প্রথম নিদর্শন হলো নামাজ আদায় এবং যাকাত ফরজ হলে তা আদায় করতে হবে। তারপর আনুগত্য পরায়ণ মন-মানসিকতা নিয়ে হেদায়াত লাভের জন্য কোরআনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। তখন এ কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করা যাবে এবং ঈমান বৃদ্ধি লাভ করবে। আল্লাহ বলেন–

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ–

যারা ঈমান এনেছে, প্রত্যেক অবতীর্ণ সূরাই তাদের ঈমান সত্যই বৃদ্ধি করে দেয়। আর তারা এ কারণে খুবই আনন্দিত হয়। (সূরা তওবা-১২৪)

আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই মুত্তাকী হতে হবে। মুত্তাকীদের অনেকগুলো গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। সূরা তওবার ১১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ-

আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁর বন্দেগী পালনকারী, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য জমীনে পরিভ্রমণকারী, তাঁর সম্মুখে রুকু ও সিজদায় অবনত, ভালো কাজের আদেশদানকারী, খারাপ কাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী।

এই আয়াতে মুমিন-মুত্তাকী লোকদের চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। মুমিন-মুত্তাকী লোকগন মানব জাতির বাইরের কোন সৃষ্টি নয়-তারাও মানুষ, মানবীয় দুর্বলতা তাদের মধ্যেও বিদ্যমান। এই মানবিয় দুর্বলতার কারণে তাদের দ্বারা যখনই আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ সংঘটিত হয়, তৎক্ষণাত তারা আল্লাহর কথা স্মরণ করে তাঁর কাছে তওবা করতে থাকে। তারা একবার মাত্র তওবা করে না, বরং বারবার তওবা করে।

এ জন্যই বলা হয়েছে, তারা বারবার আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এরা আল্লাহর বন্দেগী, ইবাদাত তথা তাঁর আইন-বিধান অনুসরণকারী। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা আল্লাহর প্রশংসা করে। আল্লাহ তাকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, সে অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থেকে তারা আল্লাহর প্রশংসা করে থাকে। অভাব দরজায় এসে মুখ ব্যদন করে দাঁড়ালেও তারা কোন অভিযোগ করে না বরং আল্লাহরই প্রশংসা করে। আল্লাহর কাছে অভাব থেকে মুক্তি চায়। সচ্ছলতা এলেও তারা অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত না হয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে।

মুমিন-মুত্তাকীগণ পৃথিবীতে ভ্রমণ করলেও তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ভ্রমণ করে। নিছক আনন্দ লাভের জন্য তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না অথবা কোন পীর-ওলীর মাজারে গিয়ে সাহায্য লাভের আশাতে ভ্রমণে বের হয় না। তারা একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করে। মুমিন-মুত্তাকী লোকগণ পবিত্র ও উন্নত ধরনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে এবং তাদের ভ্রমণের লক্ষ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এ কারণে তাদের ভ্রমণও আল্লাহর ইবাদাত হিসাবেই পরিগণিত হয়।

তারা ভ্রমণ করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ করার জন্য, ইসলামের শত্রু অধ্যুষিত এলাকা থেকে হিজরাত করার জন্য, কোরআনের আদর্শ প্রচার ও প্রসারে লক্ষ্যে, মানুষের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে, ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য, এই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে প্রস্ফুটিত আল্লাহর নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং আল্লাহ তা'য়ালা যে রিযুক দান করেছেন, তা অন্বেষণের জন্য।

মুত্তাকী-মুমিনগণ একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করেন প্রকাশ্যে ও গোপনে। নামাজের প্রতি তারা অবহেলা প্রদর্শন করেন না বা তাড়াহুড়া করে নামাজ আদায় করেন না। ধীর স্থিরভাবে নামাজ আদায় করেন। গভীর রাতে নির্জনে নিভৃতে তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে রুকু ও সেজদায় অবনত থাকেন।

এরা সৎকাজের তথা আল্লাহর বিধানের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানান। ক্ষমতা অনুযায়ী তারা মানব সমাজে সৎকাজের আদেশ দিয়ে থাকেন এবং অসৎকাজের প্রতি বাধা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ যে জীবন বিধান দান করেছেন, সে বিধানের প্রতি সজাগ থেকে তারা জীবন পরিচালিত করে। নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কর্মকে আল্লাহর দেয়া সীমার মধ্যে সীমিত রাখে। এই সীমা অতিক্রম করে তারা স্বেচ্ছাচারিতা করে না। আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজের মনগড়া আইনের বা কোন মানুষের বানানো বিধানের অনুসরণ করে না।

আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা চেষ্টা-সাধনাকারী। আল্লাহর বিধান যারা লংঘন করে, এরা তাদের গতিরোধকারী। আল্লাহর বিধান বা নির্ধারিত সীমা রেখাকে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর রাখার ব্যাপারে তারা অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালনকারী। এই ধরনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিগণই মুত্তাকী এবং এরাই কেবলমাত্র আল্লাহর নাজিল করা কিতাব থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারে।

যারা শুধুমাত্র ধার্মিক হিসাবে পরিচিতি লাভের আশায় বা নিছক ধর্ম পালনের জন্য নামাজ, রোজা, হজ্জ আদায় করে, অভাবী লোকজন একত্রিত করে যাকাত দানের প্রদর্শনী করে, নামাজের সময়টুকু ব্যতিত দিন ও রাতের অবশিষ্ট সময় মানুষের বানানো আদর্শ অনুসরণ করে, আল্লাহর কোরআনের হেদায়াত তাদের নছীবে হয় না।

আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করার জন্য যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করার কথা বলা হয়েছে, তা অর্জন করে যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে পারবে, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

أُولَـٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ-وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

বস্তুত এই ধরনের লোকজনই তাদের রব্ব-এর কাছ থেকে অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ লাভের অধিকারী। (সূরা বাকারা-৫)

অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথ প্রদর্শন করো

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদেরকে শিখিয়ে দিলেন, কিভাতে তাঁর কাছে চাইতে হবে। বান্দারা তাঁর কাছে চাইলো, 'আমাদেরকে সহজ-সরল পথপ্রদর্শন করো। তাদের পথ–যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো, তুমি নিয়ামত দান করেছো, যারা তোমার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছে, সেই অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথপ্রদর্শন করো।' আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদের প্রতি অসীম রহমত করে পবিত্র কোরআন তাদের সামনে পেশ করে বলে দিলেন, 'এই কোরআনই সেই হেদায়াত–যা তোমরা কামনা করেছো। এই সেই সহজ-সরল পথ, যা তোমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। এটাই সেই পথ, যে পথে চললে তোমরা আমার অনুগ্রহ লাভ করতে সক্ষম হবে। এ পথে যারা চলেছে, তাদের জীবন পদ্ধতিও তোমাদের সামনে কোরআনের মাধ্যমে পেশ করা হলো, বাস্তব দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো, যেন তোমরা তাদেরকে অনুসরণ করে আমার অনুগ্রহপ্রাপ্তদের দলে শামিল হতে পারো। অনুগ্রহপ্রাপ্তদের দলের মিছিল যে দিকে এবং যেভাবে চলেছে, তোমরাও যেন সেদিকে এবং সেভাবে চলতে পারো।'

আল্লাহর বান্দাগণ তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালো, কোন পথে জীবন পরিচালিত করে কারা তোমার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছে, তাদের পরিচয় আমাদেরকে জানাও। বান্দার প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ–

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে সেই সব লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা নিয়ামত দান করেছেন। তারা হচ্ছে নবীগণ, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ। (সূরা নেছা-৬৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করলো, নিঃসন্দেহে সে অনুগ্রহপ্রাপ্তদের সঙ্গী হলো। চার শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ এই অনুগ্রহ প্রাপ্তদের দলে শামিল রয়েছেন। প্রথম শ্রেণী হলেন, নবী-রাসূলগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন সিদ্দীকগণ, তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন শহীদগণ এবং সালেহ্ বা সৎলোকগণ। এই চার শ্রেণীর বাইরের শ্রেণীগুলো আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত নয়–তারা অভিশপ্ত। মানুষ যদি এই চার শ্রেণীর লোকদের ত্যাগ করে অন্য কোন শ্রেণীকে শ্রেষ্ঠতর মনে তাদের অনুসরণ করে, তাহলে তারা নিঃসন্দেহে ধ্বংসের মুখোমুখি হবে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অনুগ্রহপ্রাপ্তদের চারটি দলের প্রথম দলে যারা অবস্থান করছেন তাঁরা হলেন আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ। নিখিল মানুষের চিরন্তন শান্তি ও কল্যাণের জন্য

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে যারা সত্যের বিধান লাভ করেছেন, তাঁরাই হচ্ছেন নবী ও রাসূল। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশ্তার মাধ্যমে ওহী লাভ করেছেন। এই নবী ও রাসূলগণ হচ্ছেন বে-গুনাহ্, মা'ছুম। তাঁরা কোন ভুল করেন না এবং কোন গুনাহ্ করেন না। এই পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সুপার কোয়ালিটির (Super quality) তথা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন নবী ও রাসূলগণ। তাঁরা হলেন মানব জাতির আদর্শ, মানুষ তাঁদেরকেই অনুসরণ করবে। নবী ও রাসূলদের তুলনায় এ পৃথিবীতে উন্নত চরিত্রের কোন মানুষ হতে পারে না।

পবিত্র কোরআনে নবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁরা মহাসত্যের ওপরে এবং সবচেয়ে সত্য-সরল ও দৃঢ় পথের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের গোটা জীবন চরিত্রে কালিমার সামান্যতম স্পর্শ ঘটেনা। স্বয়ং আল্লাহ তাঁদেরকে যাবতীয় দুর্বলতা থেকে হেফাজত করেন। মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে একমাত্র তাঁদেরকেই অনুসরণ যোগ্য আদর্শ নেতা হিসাবে পবিত্র কোরআনে উপস্থাপন করে তাদের অনুসরণ ও আনুগত্য করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে, তাঁদেরকে অনুসরণ না করলে পৃথিবী ও আখিরাতে মানুষ চরম পরিণতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হবে।

এই নবী-রাসূলদের প্রতি একশ্রেণীর মানুষের ভুল ধারণা রয়েছে। তারা অতি ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে নবী ও রাসূলদেরকে মানুষ মনে করেন না। তাদের ধারণা হলো, নবীদের সম্মান-মর্যাদা সর্বোচ্চে, সুতরাং তাঁরা মানুষ হতে পারেন না। কেননা, কোন মানুষ এতটা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন না। নবীগণ মানুষ নন–তাহলে তারা কি ?

এ প্রশ্নের জবাব তাদের কাছে নেই। নবীগণ মানুষ নন–তাহলে তাঁরা ফেরেশ্তা অথবা জ্বিন হবেন। তাঁদেরকে যদি ফেরেশ্তা বা জ্বিন বলা যায়, তাহলে কি তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হলো ? জ্বিন ও ফেরেশ্তাদের তুলনায় নবী-রাসূলদের সম্মান মর্যাদা অনেক অনেক উচ্চে। সুতরাং তাঁরা জ্বিন বা ফেরেশ্তা ছিলেন না। আর তাঁরা যে জ্বিন অথবা ফেরেশ্তা ছিলেন না, এ কথা আল্লাহর কোরআনে অনেক স্থানেই উল্লেখ করা হয়েছে। জ্বিন ও ফেরেশ্তাদের তুলনায় মানুষের মর্যাদা অনেক বেশী। তাঁরা মানুষ ছিলেন এবং মানুষের মধ্য থেকেই তাঁদেরকে মহান আল্লাহ নবী-রাসূল হিসাবে মনোনীত করেছিলেন।

একশ্রেণীর মানুষ যারা আলেম হিসাবে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত, জ্ঞানের দৈন্যতার কারণে তারা নবী-রাসূল মানুষ কিনা–এই বিতর্ক সৃষ্টি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট ভাবে নবীদের মানবীয় সত্তা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন–

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ–

বলো, আমিও তোমাদের অনুরূপ মানুষ মাত্র। আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ও একক। (সূরা কাহ্ফ-১১০)

মহান আল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিখিয়ে দিচ্ছেন–আপনি বলুন, আমিও তোমাদের মতোই মানুষ। আমি জ্বিন বা ফেরেশ্তা নই, আমার কাছে ওহী আসে,

এটাই পার্থক্য। আমিও তোমাদের মতোই পানাহার করি, সংসার জীবন-যাপন করি, আমাকে বাজারে যেতে হয়, যেহেতু আমিও তোমাদের অনুরূপই একজন মানুষ মাত্র।

নবী-রাসূলও মানুষ সাধারণ মানুষও–মানুষ। তবে এ দুই মানুষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। নবী-রাসূলগণ হলেন অসাধারণ মানুষ–মহামানব। পবিত্র কোরআনে নবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ওপরে তাঁদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। সাধারণ মানুষ ভুল করে, গোনাহ্ করে, ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর নবী-রাসূলগণ এসব দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁরা কোন ভুল করেন না, গোনাহ্ করেন না, আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত তাঁরা কিছুই করেন না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী-রাসূলদের দিয়ে কোন ধরনের গোনাহের কাজ সংঘটিত হতে দেন না। তিনি তাঁদেরকে নিজের কুদরত দিয়ে অথবা ফেরেশ্তার মাধ্যমে গোনাহ্ থেকে হেফাজত করেন।

সুতরাং এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবী-রাসূলগণ ছিলেন মানুষ। নবীদের আদর্শই হলো একমাত্র অনুসরণ যোগ্য আদর্শ। তাঁদের আদর্শ ব্যতিত অন্য কোন আদর্শ, চিন্তাধারা, কর্মপন্থা, মতবাদ গ্রহণ করা বা অনুসরণ করা যাবে না। এই পৃথিবীতে নবীকেই একমাত্র অনুকরণীয় নেতা হিসাবে মানতে হবে। নবী-রাসূলদেরকে 'নেতা' হিসাবে উল্লেখ করায় কিছু সংখ্যক লোক আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন। তারা নবীকে নেতা হিসাবে উল্লেখ করার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যেহেতু সাধারণ মানুষকে নেতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়, বিভিন্ন দলের লোকজন তাদের ছোট, বড়, মাঝারি নেতার নামে ধ্বনি দিয়ে থাকে। সুতরাং নবীকে নেতা হিসাবে উল্লেখ করা হলে, তাঁকে মানুষ নেতাদের সমপর্যায়ে নিয়ে আসা হয় এবং তাঁদের সম্মান-মর্যাদার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়।

জ্ঞানের দৈন্যতার কারণেই এ ধরনের যুক্তি তারা দিয়ে থাকেন। একটি বিষয় স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, নবী-রাসূলদের আনিত আদর্শ যেমন কোন আইন-বিধানের অধীনস্থ হয়ে থাকতে আসেনি, তেমনি পৃথিবীতে কোন একজন নবী-রাসূলও সাধারণ মানুষের অধীনস্থ হবার জন্য আগমন করেননি।

পৃথিবীতে মানুষ দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর মানুষ যারা বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। আরেক শ্রেণীর মানুষ যারা আদেশ অনুসরণ করে ও আনুগত্য করে থাকে। যেমন ইমামের অনুসরণ করেন মুক্তাদীগণ। সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকগণ তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের কমান্ডিং অফিসারদের কমান্ড অনুসারে চলে। একটি দেশের শাসকের আনুগত্য করে থাকে সাধারণ মানুষ। কিন্তু নবী-রাসূলগণ কাদের আনুগত্য করবেন ? তাঁরা যারই আনুগত্য করবেন, তার গোলাম হয়ে যাবেন তাঁরা। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্ কোন একজন নবী-রাসূলকেও এই পৃথিবীতে এক আল্লাহ ব্যতিত আর কারো গোলামী, আনুগত্য বা অনুসরণ করার জন্য প্রেরণ করেননি। বরং সমস্ত মানুষ তাঁদেরকেই অনুসরণ করবে। তাঁরা নেতা আর সমস্ত মানুষ হলো তাঁদের অনুসারী। তাঁরা আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে আন্দোলনের সূচনা করে গিয়েছেন, সেই আন্দোলনের তাঁরা নেতা। আর এই আন্দোলনে যারা শামিল হয়েছে অর্থাৎ মুসলমান হয়েছে

তাঁরা সবাই অনুসারী। তাঁরা ইমাম হতে এসেছেন-মুক্তাদী হতে নয়, নেতা হয়ে এসেছেন, অনুসারী হয়ে নয়।

নবীকে নেতা বলার ব্যাপারে যারা আপত্তি করে থাকেন, তারা যখন নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করেন, তখন তারা লক্ষ্য করেন না, দরুদের মধ্যে তারা কি বলছেন। দরুদের মধ্যে যে 'সাইয়েদেনা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এই শব্দের অর্থও নেতা। সুতরাং আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবী-রাসূল ছিলেন নেতা। তাঁরা ছিলেন মা'ছুম, বে-গুনাহ্, নিষ্পাপ। কোন পাপ-ই তাঁদেরকে স্পর্শ করেনি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বিশ্বনেতা। অন্যান্য নবী-রাসূলদেরকে পৃথিবীর বিশেষ কোন এলাকার বা জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না, তিনিই শেষনবী। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে-তিনি তাদেরও নবী। এই নবী-রাসূলগণ হলেন মহান আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত। মানুষ অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথ অনুসরণ করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছে, আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে নবী-রাসূলদের দেখিয়ে দিয়েছেন, তোমরা আমার প্রেরিত নবী-রাসূলদের অনুসরণ ও আনুগত্য করো, তাহলে তোমরাও তাদের সঙ্গী হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

অনুগ্রহপ্রাপ্তদের দলে দ্বিতীয় যে দলটি রয়েছেন, তারা হলেন সিদ্দিকীন। সিদ্দীক বলতে সেসব ব্যক্তিকেই বুঝায়, যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্যবাদী। যার মধ্যে সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠা জীবনের প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় থাকে। নিজের কাজ-কর্ম আচরণ এবং নেয়া-দেয়ার ক্ষেত্রে সব সময়ই অত্যন্ত পরিষ্কার ও সহজ-সরল পথ অবলম্বন করে। এরা যখন কোন বিষয়ের প্রতি সমর্থন করে, তখন সত্য ও ন্যায়কেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সমর্থন করে এবং সত্যের বিপরীত কোন জিনিসের মোকাবিলায় দৃঢ়তার সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে সে সামান্যতম দুর্বলতা প্রকাশ করে না। যাদের চরিত্র এতটা পবিত্র, পরিচ্ছন্ন এবং নিষ্কলুষ হবে, তার কাছে পরিচিত ও অপরিচিত সমস্ত মানুষই ঐকান্তিক সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতারই আশা পোষণ করবে, কোন ধরনের অসত্য ও অন্যায়ের আশঙ্কা করবে না। সিদ্দিকীনদের মধ্যে যারা শামিল রয়েছেন, তাঁরা সত্যকে উদার, উন্মুক্ত ও অকুণ্ঠিত চিত্তে দ্বিধাহীনভাবে, কোন ধরনের আপত্তি বা প্রশ্ন ছাড়াই গ্রহণ করে থাকেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সিদ্দিকে আকবর বলা হয়। এই উপাধিতে তাঁকে এ জন্য ভূষিত করা হয়েছে যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজ থেকে রাতের শেষে ফিরে এসে বায়তুল্লাহ শরীফে ফজরের নামাজ আদায় করে অবস্থান করছিলেন। মক্কার ইসলাম বিরোধিদের ঘৃণ্য নীতি ছিল, তারা আল্লাহর রাসূলকে দেখলেই বিদ্রুপ করে নানা ধরনের প্রশ্ন করতো। সেদিন সকালে আল্লাহর রাসূল কা'বা শরীফে বসে আছেন। এমন সময় সেখানে আবু জেহেলের আগমন ঘটলো। আল্লাহর নবীকে দেখেই সে বিদ্রুপ করে প্রশ্ন করলো, 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! প্রতিদিনই তুমি আমাদেরকে নিত্য-নতুন কথা শোনাও, আজকে কি কোন নতুন সংবাদ আছে ?'

আল্লাহর রাসুল জবাবে বললেন, 'অবশ্যই আছে, আর তাহলো, গতরাতে আমার মিরাজ হয়েছে। আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে নামাজ আদায় করে ঊর্ধ্ব আকাশে গিয়েছি, আকাশের সমস্ত স্তর অতিক্রম করে আল্লাহর আরশে গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলেছি। জান্নাত-জাহান্নাম দেখেছি। তারপর সেখান থেকে এই পৃথিবীতে ফিরে এসে এখানে ফজরের নামাজ আদায় করেছি।'

আল্লাহর রাসূলের পবিত্র মুখ থেকে মিরাজের ঘটনা শুনে ইসলামের দুশমন আবু জেহেলের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল। আবু জেহেলের ধারণা হলো, এই লোকটির মাথায় কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। তা না হলে এ ধরনের অসম্ভব কোন ঘটনার কথা বলবে কেন। মিরাজের বিষয়টি আবু জেহেলের কাছে ইসলামের সাথে বিরোধিতা করার আরেকটি অস্ত্র হিসাবে বিবেচিত হলো। তারা নানা অস্ত্র প্রয়োগ করে আল্লাহর রাসূলকে প্রকৃত রাসূল নয় বলে মানব সমাজে প্রমাণ করার চেষ্টা করতো। এবার তার কাছে মনে হলো, সে যেন মোক্ষম অস্ত্র লাভ করলো। এই অসম্ভব ঘটনার কথা মানুষের কাছে প্রকাশ করে সে এবার প্রমাণ করবে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মিথ্যাবাদী। এ জন্য সে আল্লাহর রাসূলকে বললো, 'তুমি যে মিরাজের কথা বললে, আমি কি তা মানুষের কাছে প্রকাশ করতে পারি ?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অবশ্যই তুমি প্রকাশ করতে পারো।'

আবু জেহেল মোক্ষম অস্ত্র হাতে ছুটলো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে। তার উদ্দেশ্য–সে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বিভ্রান্ত করবে। সে বললো, 'আবু বকর, তুমি কি শুনেছো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছে ?' তারপর সে বিদ্রুপের ভঙ্গিতে আল্লাহর রাসূলের মুখ থেকে শোনা মিরাজের ঘটনা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে বর্ণনা করলো।

ধীর স্থিরভাবে তিনি বিস্তারিত শুনলেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন–'আবু জেহেল ! তুমি যা বললে, আমার আল্লাহর রাসূল কি ঠিক এই ঘটনাই বর্ণনা করেছেন ?' আবু জেহেল বললো, 'আমি এ ঘটনা নিজের কানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে শুনেছি এবং তিনি এখনও কা'বা ঘরে বসে আছেন।'

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আবু জেহেলকে নিরাশ করে দৃঢ়কণ্ঠে অটল বিশ্বাসে জানিয়ে দিলেন, 'আবু জেহেল তুমি শুনে রাখো, তুমি যা শোনালে তা যদি আমার আল্লাহর রাসূল অনুরূপ বলে থাকেন, তা অবশ্যই সত্য।' এরপর তিনি কা'বার প্রাঙ্গনে এসে রাসূলের কাছে আবু জেহেলের মুখ থেকে শোনা মিরাজের ঘটনা উল্লেখ করে বিনয়ের সাথে জানতে চাইলেন, এসব ঘটনা সত্য কিনা। ঘটনা সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহর রাসূল মিরাজের সম্পূর্ণ ঘটনা তাঁর কাছে প্রকাশ করলেন।

সমস্ত ঘটনা শোনার পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অবিচল বিশ্বাসে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার বর্ণনায় অতিরঞ্জন কিছুই নেই, নিঃসন্দেহে আপনার মিরাজ হয়েছে, আপনি যা বলেছেন তা অবশ্যই সত্য এবং সঠিক বলেছেন।'

কোন ধরনের আপত্তি, যুক্তি বা প্রশ্ন উত্থাপন না করেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কণ্ঠে অটল বিশ্বাসের ধ্বনি উচ্চারিত হতে দেখে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঘোষণা দিলেন, 'আবু বকর, তুমি শুধু আবু বকরই নও–তুমি সিদ্দীক।'

সুতরাং সিদ্দিকীন হলেন তাঁরাই, যারা মহাসত্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের তর্ক-বিতর্ক, যুক্তি প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করেননি, দ্বিধাহীনভাবে, অকুণ্ঠিত চিত্তে মহাসত্যের সামনে নিজের আনুগত্যের মাথানত করে দিয়েছেন। সত্য গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁরা কোন দ্বিমত পোষণ করেননি, কোন কূটতর্কের অবতারণা করেননি, এসব মানুষই হলেন সিদ্দীক এবং এদের দলকেই বলা হয় সিদ্দিকীন। এই সিদ্দিকীনদের দলই হলো আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত। নবী ও রাসূলগণ যে আদর্শ এই পৃথিবীতে এনেছেন, সে আদর্শের প্রতি সিদ্দীকগণ যেমনভাবে আনুগত্য করেছে, তেমনি ভাবে আনুগত্য করতে হবে। তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের দলে শামিল হওয়া যাবে।

আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের দলে আরেক শ্রেণীর লোক শামিল রয়েছেন–যাদেরকে আল্লাহর কোরআন শুহাদা হিসাবে উল্লেখ করেছে। মহাসত্যের ব্যাপারে যারা সাক্ষ্য দান করেছেন তাঁরাই হলেন কোরআনের ভাষায় শুহাদা। এই শুহাদা শব্দ থেকেই শহীদ শব্দ এসেছে। আল্লাহ, রাসূল, কোরআন ও হাদীস–এসব হলো মহাসত্য। এই মহাসত্যকে যারা স্বীকৃতি দিয়েছে, নিজেরা অকুণ্ঠ চিত্তে মহাসত্যের স্বীকৃতি দিয়েছে, নিজেদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে, এর বাইরে সত্য আর কিছুই নেই। এই সত্য প্রতিষ্ঠাব লক্ষ্যে তারা নিজেদের মূল্যবান সময়, কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করেছে, নিজেদের মেধা, যোগ্যতা, স্বাস্থ্য এবং পরিশেষে নিজের জীবন দান করে এ কথারই প্রমাণ দিয়েছে যে, এসবই হলো একমাত্র সত্য এবং মহাসত্য।

এই সত্য আল্লাহর জমীনে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের যা ছিল, সমস্ত কিছুই তারা আল্লাহর পথে নিঃশেষে দান করে দিয়ে মহাসত্যের সাক্ষী হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন, তাঁরাই হলেন শহীদ। এরা নিজের জীবনের সমগ্র ও সম্পূর্ণ কর্মনীতি এবং কাজের পদ্ধতির মাধ্যমে নিজের ঈমানের সত্যতা ও অকৃত্রিমতার সাক্ষ্য দান করেন। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে ব্যক্তি নিজের জীবন দান করেন তাকে এ জন্য শহীদ বলা হয় যে, সে ব্যক্তি তার প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে এ কথারই প্রমাণ দিয়েছে যে, সে যে আদর্শের প্রতি বিশ্বাস করতো এবং যে আদর্শকে সে অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসতো, সে আদর্শ তার কাছে নিজের স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা, পৃথিবীর যাবতীয় ধন-ঐশ্বর্য এবং নিজের প্রাণের থেকেও অধিক প্রিয় ছিল। এ জন্য সে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হননি। এই শহীদগণ হলেন আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

শহীদগণের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর দরবারে যে কত বেশী, তা কল্পনাও করা যায় না। বিচার দিবসের দিনে যখন প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে হিসাব গ্রহণ করা হবে, পৃথিবীতে সে কি করে এসেছে। হিসাব না দিয়ে কেউ একটি কদমও উঠাতে পারবে না, সেদিন এই শহীদগণের

কোন হিসাব গ্রহণ করা হবে না। তাঁরা কোন ধরনের হিসাব গ্রহণ ব্যতিতই আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করবেন। আল্লাহর রাসূল বলেন-আল্লাহর পথের সৈনিকের রক্তের প্রথম ফোটা মৃত্তিকা স্পর্শ করার পূর্বেই তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং জান্নাতের আবাস স্থল তাকে প্রদর্শন করা হয়। কবরের ভয়াবহ আযাব থেকে তাকে নিরাপত্তা দান করা হয়। কিয়ামতের বিভিষীকা দেখে সবাই যখন ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়বে, তখন শহীদদেরকে কোন ধরনের ভয়-ভীতি স্পর্শ করতে পারবে না। কিয়ামতের ময়দানে তার মাথায় এমন মহামূল্যবান মুকুট পরিধান করানো হবে যে, সে মুকুটের ক্ষুদ্র একটি পাথরও এই পৃথিবী ও তার ভেতরে যা কিছু রয়েছে, তারচেয়েও অধিক মূল্যবান। জান্নাতে তার সাথী হিসেবে অসংখ্য হুর দেয়া হবে। তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের ভেতর থেকে সত্তর জনের ব্যাপারে তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। (তিরমিযী)

তিরমিযী শরীফের হাদীসে এসেছে, হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুটো ফোটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তার একটি ফোটা হলো, আল্লাহর ভয়ে যে চোখ ফোটায় ফোটায় অশ্রু ঝরায়। এই অশ্রু বিন্দু আল্লাহ পাকের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এর কারণ হলো, মানুষ আল্লাহকে দেখেনি, তাঁর জান্নাত-জাহান্নাম দেখেনি। এসব না দেখেও গভীরভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাঁর ভয়ে আরামের শয্যা ত্যাগ করে গভীর রাথে নির্জনে আল্লাহর দরবারে অশ্রু ঝরিয়েছে। আরেকটি ফোটা হলো, আল্লাহর পথের সৈনিকের দেহের তপ্ত রক্তের ফোটা। লড়াইয়ের ময়দানে ইসলামের শত্রুগণ তাকে আঘাত করেছে, এই আঘাতে তাঁর শরীর থেকে যে রক্তের ফোটা গড়িয়ে পড়েছে, এই রক্তের ফোটা আল্লাহ অত্যন্ত পছন্দ করেন। ইসলামের শত্রুরা ঈমানদারের দেহে আঘাত করে যে চিহ্ন সৃষ্টি করেছে, এই চিহ্ন আল্লাহ অত্যন্ত পছন্দ করেন। ঈমানদার বান্দা ফরয ইবাদাত করেছে এ কারণে তাঁর দেহে যেসব চিহ্ন সৃষ্টি হয়েছে, এসব চিহ্ন আল্লাহ পাক অত্যন্ত ভালোবাসেন। (তিরমিযী)

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর রাসূলের চাচা হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে উঠবেন। ওহুদের ময়দানে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী তাঁর বুক চিরে কলিজা চিবিয়েছিল। তাঁর নাক কান কেটে মালা বানিয়ে তা গলায় পরিধান করেছিল হিংস্র হায়েনার দল। তিনি এই অবস্থা নিয়ে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবেন। এভাবে অসংখ্য শহীদগণ কেউ তারবারির আঘাত নিয়ে, কেউ বর্শার আঘাত নিয়ে, কেউ বুলেটের আঘাত নিয়ে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবেন। তাদের সামনে নাদুস-নুদুশ চর্বি থলথলে দেহ নিয়ে ইসলামের সৈনিক দাবীদারগণ কিভাবে দাঁড়াবেন ?

দাবী করা হয় আমরা ইসলামের খাদেম-অথচ জীবনে তাকে কোন দিন কোন অপবাদের মুখোমুখী হতে হলো না, ইসলামের শত্রু পক্ষের মুখপত্র পত্রিকাসমূহে তাঁর বিরুদ্ধে কোন লেখা প্রকাশ হলো না, জেলে যেতে হলো না, ময়দানে বাতিল শক্তি তাকে প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে এলো না, নাগরিকত্ব বাতিল হলো না, তার কুশপুত্তলিকা কেউ দাহ করলো না, আদালতে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা হলো না, ইসলামের পক্ষে জীবনে একটা মিছিল পর্যন্ত

করলো না, অথচ নিজেকে রাসূলের আশেক, আল্লাহর সৈনিক, যুগের মুজাদ্দিদ, ওলীয়ে কামিল ইত্যাদি বলে প্রচার করা হয়। এসব লোককে কিয়ামতের ময়দানে ঐসব লোকদের সামনে লজ্জিত হতে হবে, যারা ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে নির্যাতন সহ্য করেছেন। আল্লাহর পথে যারা নিজের মূল্যবান প্রিয় জীবন বিলিয়ে দেন, জীবন-যৌবন, স্ত্রী-পুত্র সমস্ত কিছুর মমতা পরিত্যাগ করে যারা ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে বিরোধী শক্তির সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে মৃত্যুকে স্বাগত জানায়, তাদের সৌভাগ্য দেখে কিয়ামতের ময়দানে মানুষ ইর্ষাবোধ করবে। কারণ নবী-রাসূলগণের কাতারে তারা স্থান লাভ করবে। স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিজের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন—একবার আমরা আল্লাহর রাসুলের সাথে ভ্রমণে যাচ্ছিলাম। যখন আমরা হাররাতে ওয়াকীম নামক স্থানে উপনীত হলাম সেখানে পাহাড়ের উপত্যকায় বেশ কয়েকটি কবর দেখতে পেলাম। আমরা আল্লাহর রাসুলের কাছে জানতে চাইলাম. হে রাসুল ! এগুলো কি আমাদের ভাইয়ের কবর !

আল্লাহর নবী আমাদেরকে জানালেন, এগুলো আমাদের সাথী বন্ধুদের কবর। এরপর আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে আল্লাহর পথে নিহতদের কবরের কাছে গেলাম, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো আমাদের ভাইদের কবর।

শহীদদের কত বড় মর্যাদা ! আল্লাহর পথে যারা জীবন দান করেছেন, স্বয়ং আল্লাহর হাবিব তাদেরকে নিজের ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত উতবা ইবনে আব্দুস সুলামী বর্ণনা করেন আল্লাহর নবী বলেছেন, আল্লাহর পথে নিহত মানুষ তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণী হলো, ঐসব মুমিন ব্যক্তি, যারা নিজের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে থাকে এবং প্রয়োজনে বিরোধী শক্তির মোকাবেলা করতে করতে অকুতোভয়ে শাহাদাত বরণ করে। এসব লোক হলো পরীক্ষিত শহীদ—এরা মহান আল্লাহ পাকের আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে। তাদের আর নবীগণের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য হলো, শহীদগণকে নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়নি আর নবীদেরকে নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত করে অধিক মর্যাদা দান করা হয়েছে। অর্থাৎ নবীগণকে যে সম্মান ও মর্যাদায় আল্লাহ তা'য়ালা অভিষিক্ত করবেন, শহীদগণকেও প্রায় অনুরূপ মর্যাদা দান করা হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী হলো ঐসব মুমিন ব্যক্তি, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে এবং মানবীয় দুর্বলতার কারণে পাপ তাকে মাঝে মাঝে স্পর্শ করেছে। তবুও এই ধরনের ব্যক্তি জিহাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিরোধী শক্তির সাথে নির্ভীকভাবে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেছে। এভাবে সে নিজের পাপ মুছে ফেলেছে। কারণ জিহাদের অস্ত্রই সমস্ত অপরাধ মোচন করে দেয়। এই ধরনের ব্যক্তি জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে তার ইচ্ছে মতো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে।

আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, ইসলামের প্রতি যাদের অন্তরে রয়েছে সন্দেহ সংশয়। ইসলামকে এরা মোটেও ভালোবাসে না। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক, এ ধরনের তৎপরতা তাদের নেই। কিন্তু এরা তাদের মনের ভাব আল্লাহর পথের সৈনিকদের কাছে প্রকাশ করেও সাহস

পায় না। জাগতিক সুবিধা লাভের আশায় এরা ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে। এরা পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে জিহাদে অসন্তুষ্টির সাথে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। লোকজনকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদও দান করে থাকে। এরা যদি জিহাদের ময়দানে শহীদ হয় তবুও এরা জাহান্নামী। কারণ জিহাদের অস্ত্র মুনাফেকী মুছে দিতে সক্ষম নয়। (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করাবেন। মৃত্যুর সময় ঈমানের শ্রেণী অনুসারে মানুষ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন শহীদগণ। ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যারা ইসলামী আন্দোলন করে এবং জিহাদের ময়দানে বাতিলের আঘাতে শাহাদাত বরণ করে, তাদের কোন মৃত্যু যন্ত্রণা নেই। তাঁরা যন্ত্রণাবিহীন মৃত্যু লাভ করে থাকে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে জীবন দানকারী ব্যক্তি মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করে না, তবে তোমাদের কেউ পিঁপড়ের কামড়ে যেটুকু কষ্ট অনুভব করে কেবল সেটুকুই সে অনুভব করে মাত্র। (তিরমিযী)

জিহাদের ময়দানে আমরা দেখতে পাই, অবর্ণনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে শহীদ করে দেয়া হয়। আসলে তাঁরা কোন কষ্টই অনুভব করে না। ছোট্ট একটি পিঁপড়া দংশন করলে মানুষ যে কষ্ট অনুভব করে থাকে, আল্লাহর পথের সৈনিক শাহাদাত বরণ করার সময় সেই কষ্ট অনুভব করে থাকে। সুতরাং, ইসলাম বিরোধী শক্তি লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করবে, এই আশঙ্কায় জিহাদের ময়দানে কর্মসূচীতে যোগদানের ব্যাপারে যারা শিথিলতা প্রদর্শন করে তাকে, তাদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রয়োজন শুধু ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছা। বাতিল শক্তিকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে অনেক বড়-বিশাল দেখা যায়। তাদের মিছিল-সমাবেশ দেখে মনে কত বিশাল এদের শক্তি। আসলে ঈমানদারদের 'আল্লাহু আকবর' গর্জনে ওদের কলিজায় কম্পন দেখা দেয়। ভয়ে ওরা ময়দান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

কোন বাড়িতে যদি কোন ব্যক্তি চুরি করার মানসিকতা নিয়ে প্রবেশ করে, তাহলে তার মন থাকে দুর্বল। সামান্য শব্দে সে চমকে ওঠে। চোরকে দেখে যদি সে বাড়ির ছোট্ট একটি শিশুও 'কে ?' বলে আওয়াজ দেয় চোরের কলিজায় কম্পন সৃষ্টি হয়। বাড়ির মালিক জেগে উঠে তাকে ধরবে, এই ভয়ে সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক হলেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন আর ঈমানদারদের অভিভাবক তিনিই। আল্লাহ তা'য়ালা এই জমিনের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব ঈমানদারকেই দান করেছেন। সুতরাং এই জমিনে ইসলাম বিরোধী শক্তি হলো চোরের মতই ভীরু, এদের মিছিল-সামবেশ আকারে বড় হলেও গুটি কয়েক ঈমানদার যখন তাদের মোকাবিলায় 'আল্লাহু আকবর' বলে গর্জন করে ওঠে। তখন তারা আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ইতিহাসে যেমন এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে, বর্তমান ময়দানেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে শর্ত হলো একটিই-ঈমানদার হতে হবে, মুমিন হতে হবে। যার অন্তরে জিহাদ করার ইচ্ছা নেই, জিহাদের কামনা যে ব্যক্তি অন্তরে পোষণ

করে না, সে ব্যক্তির মৃত্যু হবে মুনাফিকীর মৃত্যু। আর মুনাফিকের স্থান হবে জাহান্নামে কাফিরের পায়ের নীচে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদ না করে এবং জিহাদের কোন আকাংখাও অন্তরে পোষণ না করে মৃত্যুবরণ করলো, তার মৃত্যু হলো মুনাফিকী স্বভাবের ওপর। (মুসলিম)

শাহাদাতের তামান্না মুমিন হৃদয়ে জাগ্রত থাকে। যে হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না নেই, সেই হৃদয় মুনাফিকদের হৃদয়ের মতো। সুতরাং মনে এই আশা পোষন করতে হবে, আল্লাহ যখন মৃত্যু দান করবেন, তখন যেন শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন। মৃত্যু একটি কঠোর বাস্তবতা। এই মৃত্যু থেকে কোনক্রমেই নিজেকে লুকিয়ে রাখা যাবে না। তাহলে মৃত্যু যখন হবেই তখন শাহাদাতের মৃত্যুই আল্লাহর কাছে কামনা করতে হবে। হযরত সাহ্ল ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন আল্লাহর রাসূল বলেছেন–যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য দোয়া করে তাহলে সে যদি শয্যাশায়ী হয়েও মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ পাক তাকে শহীদদের স্তরে পৌঁছে দিবেন। (মুসলিম)

শহীদী মৃত্যু হলো একটি সেতু বন্ধন, এই সেতু অতিক্রম করার সাথে সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। এই শহীদগণ হলেন নিয়ামতপ্রাপ্ত, এদের পথ অনুসরণ করতে হবে। কোরআনের মর্যাদা, রাসূলের মর্যাদা, হাদীসের সম্মান তথা ইসলামকে সমুন্নত রাখার জন্য প্রয়োজনে জান-মাল কোরবানী করতে হবে।

নিয়াতমপ্রাপ্ত বা মহান আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের আরেকটি দল হলেন সালেহীনদের দল। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা নেছার ৬৯ নম্বর আয়াতে তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের যে চারটি দলের কথা উল্লেখ করেছেন, সালেহীনদের দল হলো সর্বশেষ দল। সালেহ্ শব্দের বহুবচন হলো সালেহীন। এর অর্থহলো সৎলোকগণ। সৎলোক বলতে তাদেরকেই বুঝায়, যারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, আকীদা-বিশ্বাস, ইচ্ছা, কামনা-বাসনা, মননশীলতা এবং নিজেদের কর্মের ক্ষেত্রে পূর্ণ সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সর্বাত্মকভাবে নিজেদের জীবনকে ন্যায়নিষ্ঠা ও সৎ আচরণ সহকারে পরিচালিত করে।

যারা সালেহীন, তাঁরা কখনো ইসলামী আদর্শের সাথে আপোষ করেন না। ইসলামের অবমাননা করা হচ্ছে, আল্লাহর কোরআন, রাসূলের হাদীস, ইসলামী আইন-কানুন, নবী-রাসূলদের সাথে বেয়াদবি করা হচ্ছে, মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন করা হচ্ছে ইত্যাদি দেখে তারা নীরব থাকেন না। সিংহ-গর্জনে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। এসব ব্যাপারে যদি তার অর্থ-সম্পদের ক্ষতি হয়, সম্মান-মর্যাদার হানি হয়, কারো সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, দৈহিকভাবে নির্যাতন সহ্য করতে হয়, জেলে যেতে হয়, ফাঁসির রশি গলায় পরতে হয়, তবুও সে তার আদর্শের প্রতি অটল-অবিচল থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের সাথে কোনক্রমেই তাঁরা বিন্দুমাত্র আপোষ করেন না। হকের ওপরে তাঁরা চলেন এবং হক কথা তাঁরা বলতে থাকেন। এরা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত দল, এই দলে শামিল হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّٰلِحِيْنَ-

আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তাদেরকে আমি অবশ্যই সালেহীনদের মধ্যে শামিল করবো। (সূরা আনকাবুত-৯)

যারা সালেহীনদের দলে শামিল হবে তাদেরকে কি ধরনের পুরস্কার দেয়া হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا-ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, (আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে) আল্লাহ তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন এবং এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে সবের নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে আর এটাই বড় সাফল্য। (সূরা তাগাবুন-৯)

সুতরাং নিয়ামতপ্রাপ্তদের অনুসরণ করা ব্যতিত কোন মানুষ কোনক্রমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে না, মানুষ হিসাবে সাফল্য অর্জন করতে পারবে না, কিয়ামতের ময়দানে তাকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহর অসন্তুষ্টির বোঝা বহন করে জাহান্নামে যেতে হবে।

অভিশপ্তদের পথ নয়

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ

সূরা ফাতিহার শেষের দিকে মানুষ আল্লাহর শিখানো ভাষায় তাঁরই কাছে দাবি পেশ করলো, 'আমরা তোমার কাছে সহজ-সরল পথ কামনা করি। তুমি আমাদেরকে সত্য-সঠিক পথপ্রদর্শন করো। যে পথে চলার কারণে যারা তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে। ঐ পথ আমরা চাই না, যে পথে চললে অভিশপ্ত হতে হয়, সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হতে হয়।

গাইরিল মাগ্দুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লিন-এই আয়াতের মাগ্দুব শব্দের অর্থ হলো অভিশপ্ত এবং দাল্লিন শব্দের অর্থ হলো পথভ্রষ্ট। পৃথিবীর সমস্ত মুফাচ্ছিরীন এবং মুহাদ্দিসীনগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মাগদুব বা অভিশপ্ত হলো ইহুদী জাতি। আর দাল্লিন বা পথভ্রষ্ট হলো খৃষ্টানরা। এই ইহুদীরা কেন অভিশপ্ত হলো ? কি এর কারণ ? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ-ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ

كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ-ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ-

আল্লাহর গযব এদেরকে একেবারে ঘিরে রেখেছে, এদের ওপর অভাব, দারিদ্র ও পরাধীনতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এসব কিছু শুধু এ জন্য হয়েছে যে, এরা আল্লাহর আয়াত অমান্য করছিল এবং তারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে, অকারণে হত্যা করেছে। বস্তুত এসব তাদের নাফরমানী ও বাড়াবাড়ির পরিণতি মাত্র। (সূরা ইমরাণ-১১২)

সূরা বাকারার ৬১ নম্বর আয়াতেও আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন, ইহুদী কর্তৃক নবীদের হত্যা করার কথা। আল্লাহর অভিশাপ এদের ওপরে পতিত হবার পরে তাদের অবস্থা কি দাঁড়ালো, তাদের পরিণতি কি হলো, সে সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করার প্রয়োজন অনুভব করছি। পৃথিবীতে ইহুদী জাতি একসময় সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। পবিত্র কোরআনে ইহুদীদের সম্পর্কে অনেক স্থানেই আলোচনা করা হয়েছে। তাদের প্রতি মহান আল্লাহ অসীম অনুগ্রহ করে অসংখ্য নেয়ামত নাজিল করেছিলেন। কিন্তু তারা সে নেয়ামত ভোগ করেও মহান আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করেছে। আল্লাহর অনুগৃহীত একটি বিশেষ জাতি ছিল ইহুদী জাতি।

তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের মধ্যে অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তারা সে সমস্ত নবীদের সাথে অমানবিক আচরণ করেছে। মহান আল্লাহ তাদেরকে দুটো আসমানী কিতাব যবুর এবং তওরাত দিয়ে ধন্য করেছিলেন। কিন্তু তারা এতই হতভাগা যে, ঐ কিতাবের কোন নির্দেশ অনুসরণ করেনি। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম, হযরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালামের মত বিখ্যাত নবী তাদের মধ্যে মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগা জাতি ইহুদীরা তাদের স্বভাবের কোন পরিবর্তন করেনি।

এই ইহুদী জাতি তাদের প্রত্যেকটি নবীকেই অমানবিক কষ্ট দিয়েছে। কাউকে তারা হত্যা করেছে। কাউকে শুলে চড়িয়েছে। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের ওপর তারা সীমাহীন নির্যাতন করেছে। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে তারা হত্যা করার চেষ্টা করে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে ব্যর্থ হয়েছে। পরিশেষে অন্য একলোককে ঈসা মনে করে ক্রুশে বিদ্ধ করে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। এই ইহুদীরা তাদের সমসাময়িক নবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকেও তারা বারবার হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ হলো ইহুদী জাতির ইতিহাস। তদানীন্তন যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত গোটা বিশ্বে যেখানেই বড় ধরণের কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে, সে ঘটনার পেছনে ইহুদীদের কালো হাত সক্রিয় ছিল। এই ইহুদীদের ঘৃণ্য কর্মকান্ড আলোচনা করতে গেলে ভিন্ন একটা গ্রন্থ রচনা করা প্রয়োজন। আমরা এখানে সংক্ষেপে ইহুদী জাতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করবো।

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পৌত্র হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের আরেকটি নাম ছিল ইসরাঈল। এ কারণেই তাঁর বংশধরদের বনী ইসরাঈল বলা হয়। ইসরাঈল শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহর বান্দাহ। ব্যাবিলন সম্রাট নমরুদের দরবারের রাজ পুরোহিত ছিল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পিতা। এমন এক লোকের সন্তান হয়েও ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম শিরকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এ কারণে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় এবং মহান আল্লাহর অসীম রহমতে তিনি রক্ষা পান । তারপর তিনি পিতৃভূমি ইরাক ত্যাগ করে আরবের ভিন্ন এলাকায় গিয়ে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর এক সন্তানের নাম হযরত ইসহাক আলাইহিস্ সালাম।

হযরত ইসহাক আলাইহিস্ সালামের সন্তান হলেন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম। তাঁরই আরেক নাম ইসরাঈল। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের বংশধর এই বনী ইসরাঈলগণ মহান আল্লাহর অনুগ্রহভাজন হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। বনী ইসরাঈলদের একটি শাখা পরবর্তীকালে নিজেদেরকে ইহুদী হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করে। হযরত ইয়াকুবের এক সন্তানের নামও ছিল ইয়াহুদা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর সন্তান হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম মিশরে চলে যান। তাঁর সন্তান হযরত ইউছুফ আলাইহিস্ সালামকে মহান আল্লাহ মিশরে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেন। এভাবে বনী ইসরাঈলগণ মিশরে বসবাস করা কালিন ক্রমশঃ তারা গোটা মিশরে প্রসার লাভ করে।

প্রায় চারশত বছর ধরে তারা দোর্দন্ড প্রতাপের সাথে গোটা মিশর শাসন করে। কিন্তু নিজেদের সীমাহীন জুলুমের কারণে শাসনযন্ত্র তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ফেরাউন নামক উপাধিধারী এক জালিম শাসক গোষ্ঠির হাতে এই বনী ইসরাঈলগণ বা ইহুদীরা পরাজিত হয়ে তাদের গোলামে পরিণত হয়। শাসক গোষ্ঠী তাদের ওপরে লোমহর্ষক নির্যাতন চালাতে থাকে। অদূর ভবিষ্যতে ইহুদী জাতির মধ্যে যেন শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার মত কোন শক্তি দানা বাঁধতে না পারে, এ কারণে ফেরাউন শাসকবৃন্দ বনী ইসরাঈলীদের বা ইহুদী জাতির সমস্ত পুত্র সন্তানকে নির্বিচারে হত্যা করে।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর অসীম রহমতে হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম রক্ষা পান এবং ফেরাউনের বাড়িতেই প্রতিপালিত হন। আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম নবুওয়াত লাভ করার পরে তিনি বনী ইসরাঈলীদেরকে সুসংগঠিত করতে থাকেন ফেরাউনকে উৎখাত করার লক্ষ্যে। আন্দোলনের ধারা পরিক্রমায় তিনি তাঁর অনুসারী বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে একদিন রাতে মিশর থেকে বের হয়ে পড়েন। তাঁরা সাগর পাড়ে জমায়েত হলে ফেরাউনও সৈন্য বাহিনীসহ তাদেরকে ধাওয়া করে।

মহান আল্লাহর নির্দেশে সাগরের পানি দু'ভাগ হয়ে বনী ইসরাঈলদের আত্মরক্ষার পথ করে দেয়। ঐ একই পথে ফেরাউন তার বাহিনীসহ এগিয়ে গেলে আল্লাহর আদেশে সাগরের বিভক্ত

পানি পুনরায় এক হয়ে যায় এবং ফেরাউনের সদল বলে সলিল সমাধি ঘটে। সাগর পাড়ি দিয়ে তারা সিনাই এলাকায় তীহ্ মরুভূমি অতিক্রম করে। সূর্যের প্রচন্ড তাপে পানির তৃষ্ণায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাঁরা অস্থির হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ তাদের মাথার ওপরে মেঘমালা সৃষ্টি করে ছায়ার ব্যবস্থা করে দেন। শিলাখন্ড বিদীর্ণ করে তাদের জন্য পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করেন। সরাসরি আকাশ থেকে মান্না ও সালওয়া নামক বিশেষ খাদ্য প্রেরণ করেন। তাদের কোন পরিশ্রম করতে হয়নি কোন কিছুর জন্য। সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা আল্লাহ্ সরাসরি করে দেন। এরপরেও তারা আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম ওহী লাভের জন্য মহান আল্লাহর আদেশে তুর পাহাড়ে গমন করেন। এই সুযোগে বনী ইসরাঈলগণ গরুর বাছুরের মূর্তি বানিয়ে তার পূজা শুরু করে। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম ফিরে আসার পরে তারা আবার তওবা করে, আল্লাহ্ তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দিলে মুসা আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। সেই হতভাগারা জবাব দেয়, 'হে মুসা ! তুমি আর তোমার আল্লাহই গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা বসে বিশ্রাম গ্রহণ করবো।'

এই অবাধ্যতার কারণে মহান আল্লাহ্ তাদের ওপরে গযব নাজিল করেন। তারা যাযাবরের মত দীর্ঘ চল্লিশ বছর পথে-প্রান্তরে ঘুরতে থাকে। নিজের দেশ নেই, অপরের আশ্রয়ে থাকতে হয়–এভাবে অপমানজনক জীবন-যাপন করতে তারা বাধ্য হয়। এর মধ্যে তাদের সমস্ত বয়স্ক লোকগুলো ইন্তেকাল করে। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামও ইতিমধ্যে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন। এর দীর্ঘদিন পরে তারা পুনরায় ফিলিস্তিনে বনী ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে। রাষ্ট্রশক্তি হাতে পেয়ে এই অবাধ্য জাতি পুনরায় আল্লাহর দেয়া বিধানের সাথে বিদ্রোহ করে। এর শাস্তি হিসাবে আল্লাহ জালুত নামক এক জালিম শাসককে তাদের ওপরে চাপিয়ে দেন।

জালুতের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তারা তালুত নামক এক মহান নেতার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তালুতের নেতৃত্বে তারা যুদ্ধ করে জালুত নামক জালিমের অত্যাচার থেকে নিজেদের মুক্ত করে। তালুতের পরে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম ও হযরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালামের নেতৃত্ব তারা লাভ করে। সে সময়ে তারা উন্নতির স্বর্ণ শিখরে গিয়ে পৌছে। কারণ, এ সময়ে আল্লাহর আইনের কঠোর প্রয়োগের কারণে তারা সৎভাবে জীবন পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছিল।

হযরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালামের অবর্তমানে অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে তারা পুনরায় অহংকারে ফেটে পড়ে। জুলুম অত্যাচারের সয়লাব বইয়ে দেয় তারা। চারিত্রিক অধঃপতনের শেষস্তর অতিক্রম করে এই জাতি। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ প্রকাশ্যে আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করতে থাকে। আলেম সমাজ ধনীক ও শাসক শ্রেণীর হাতের পুতুল বনে যায়। আল্লাহর বিধান শাসক ও সমাজের ধনীক শ্রেণীর স্বার্থে তারা পরিবর্তন করে দেয়। ক্ষমতাসীনদের মর্জি মাফিক আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যা করে শাসকদের সমস্ত কুকর্মের সমর্থন যোগাতে থাকে ইহুদী আলেম সমাজ।

বাইরে ইসলামের খোলসটা শুধু বজায় রেখে ভেতরে তার পরিপন্থী কার্যকলাপে তারা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যায়। জ্বিনা ব্যভিচার মদ পানসহ যাবতীয় অশ্লীল কার্যকলাপ প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সূদ ব্যবস্থা চালু করে নির্মম শোষন আরম্ভ হয়। মহান আল্লাহ তাদেরকে সংশোধন করার লক্ষ্যে একের পর এক নবী তাদের ভেতর প্রেরণ করতে থাকেন। ধ্বংসের অতল তলে নিমজ্জিত ইহুদী জাতিকে তারা উদ্ধারের যাবতীয় প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী। ইহুদী জাতি নবীদের ওপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে বহু নবীকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

এই ইহুদীরা কেবল নিজেরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত হয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সেই সাথে তারা এতদূর দুঃসাহসী অপরাধপ্রবণ হয়ে গিয়েছে যে, পৃথিবীর মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য যত আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে, এসব আন্দোলনের পেছনেই ইহুদীদের মগজ ও চিন্তা শক্তি এবং অর্থও কাজ করেছে–বর্তমানেও করছে।

পক্ষান্তরে সত্যের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য যত আন্দোলন এ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে এবং আন্দোলন চলছে, এ ধরণের প্রতিটি আন্দোলনের সামনে যেসব শক্তি বাধার বিন্ধাচল সৃষ্টি করেছে এবং বর্তমানেও করছে, এসব শক্তির পেছনেও ইহুদীদের কালোহাত এবং অর্থ সক্রিয় রয়েছে। অথচ এই হতভাগাদের কাছে বর্তমানেও আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ বিকৃত হলেও রয়েছে এবং তাদের ভেতরেই নবী-রাসূল বেশী আগমন করেছে। তাদের অত্যাধুনিক অপরাধ হলো অধুনা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও জাতিয়তাবাদী আন্দোলন। এসব আন্দোলন ও মতবাদ ইহুদী মগজে উৎপন্ন হয়েছে এবং ইহুদী নেতাদের অধীনে উৎকর্ষ লাভ করেছে।

এই তথাকথিত আহলি কিতাবের ললাটে এই অপরাধ-টীকাও লিখিত ছিল যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম আল্লাহর সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি, আল্লাহর সাথে প্রকাশ্য দুশমনি ও আল্লাহভিত্তিক মতাদর্শ নিমূল করার প্রকাশ্য সংকল্পের ভিত্তিতে জীবন বিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও সেভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়েছে তবুও চীনসহ অন্যান্য রাষ্ট্র বর্তমানেও টিকে রয়েছে। এই সমাজতন্ত্রের উদ্ভাবক, আবিষ্কারক ও প্রতিষ্ঠাতাও হচ্ছে হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের উম্মতেরই একজন ব্যক্তি তথা ইহুদী। সমাজতন্ত্রের আধুনিক বিশ্বে পথভ্রষ্টতার সবচেয়ে বড় স্তম্ভ হলো ফ্রয়েডীয় দর্শন। আর মজার ব্যাপার হলো, এই ফ্রয়েড নামক ব্যক্তিও একজন ইহুদী। কার্লমার্ক্স, লেলিন, ষ্ট্যালিন-ব্রেজনেভ ছিল ইহুদী সন্তান।

২০০১ সনের সেপ্টেম্বার মাসের ১১ তারিখে আমেরকিার নিউইয়র্ক শহরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের ওপরে যে হামলা পরিচালিত করে তার দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে মুসলমানদের ওপরে। এ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পৃথিবীর ইসলামী আন্দোলনসমূহকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করে আমেরিকা আফগানিস্থানে হামলা করে একটি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সরকার উৎখাত করলো। সভ্য জগতের সমস্ত নিয়ম-নীতি পদদলিত করে পবিত্র রমজান মাসে এবং ঈদের দিনেও অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করলো। তাদের প্রচার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার চালালো। এই ঘটনার পেছনেও ইহুদীদের চক্রান্ত সক্রিয়

ছিল। কারণ যেদিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা হলো, সেদিন সেখানে একজন ইহুদীও তাদের কর্মস্থলে যোগ দেয়নি। অথচ প্রায় চারহাজার ইহুদী সেখানে চাকরী করতো। ঘটনা যেভাবে সংঘটিত হলো, তা সম্পূর্ণ ভিডিও করে সমস্ত প্রচার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হলো। এ ধরনের একটি মারাত্মক ঘটনার সম্পূর্ণ দৃশ্য যারা ভিডিও করলো, তারা ঘটনার ব্যাপারে পূর্ব থেকেই অবহিত না থাকলে যাবতীয় দৃশ্য ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করলো কিভাবে? অভিশপ্ত ইহুদীদের দ্বারা এ ঘটনা সংঘটিত হবার অসংখ্য প্রমাণ মওজুদ থাকার পরও ইহুদীদের প্রতিপালক ইসলাম বিদ্বেষী আমেরিকা সমস্ত দোষ ইসলামপন্থীদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে রক্তশোষক ভ্যাম্পায়ারের মতই নির্বিচারে গনহত্যা চালালো এবং স্বাধীনতাকামী মুসলিম সংগঠন, সেবামূলক মুসলিম সংগঠনসহ ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী দলগুলোকে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করলো।

অভিশপ্ত ইহুদীদের নৃশংসতা ও আল্লাহর গযব

হযরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালামের পরে বনী ইরাঈলীদের ইহুদী রাষ্ট্র দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়। ইসরাঈল নামে আরেকটি রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে। তখন এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। ইহুদীরা একে অপরের প্রাণের দুশমন হয়ে দাঁড়ায়। একে অপরকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তারা মিত্রশক্তির সাহায্য কামনা করে। এ সময়ে আল্লাহর নবী হযরত ইউহান্না আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর নির্দেশে ইহুদীদেরকে তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকেন। তাদেরকে আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান জানান। এই অপরাধে তাকে ইহুদী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি 'আছা' কারাগারের অন্ধকার কক্ষে বন্দী করে। হযরত ইলিয়াস আলাইহিস্ সালাম ইহুদীদেরকে আল্লাহর আইনের দিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তৎপরতা শুরু করেন। মানুষের বানানো আইন দূরে নিক্ষেপ করে তাদেরকে আল্লাহর আইন গ্রহণ করতে বলেন।

ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি 'আখিয়াব'-এর পত্নী স্বামীর কাছে আবদার জানায় আল্লাহর নবীকে হত্যা করার জন্য। নিজের স্ত্রীর অভিলাষ পূরণ করার জন্য রাষ্ট্রপতি আখিয়াব আল্লাহর নবীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশেষে হযরত ইলিয়াস আলাইহিস্ সালাম আত্মরক্ষার জন্য সিনাই এলাকায় একটা পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে তারা আল্লাহর নবীকে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করে রাখে । কারাগারে তাকে কোন খাদ্য এবং পানীয় দেয়া হতো না। আল্লাহর বান্দাহদেরকে আল্লাহর বিধানের ছায়াতলে নিয়ে আসার লক্ষ্যে হযরত ইরমিয়া আলাইহিস্ সালাম পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতেন। ইহুদী জাতি আল্লাহর নবীর কথায় কর্ণপাত করা তো দূরের কথা, তাকে তারা নানা ধরণের বিদ্রুপ করতো। শারীরীক নির্যাতন করতো।

অবশেষে অভিশপ্ত এই ইহুদী জাতি আল্লাহর নবী হযরত ইরমিয়া আলাইহিস্ সালামকে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার জন্য তাকে কাদা পানি ভর্ত্তি একটা চৌবাচ্চার ভেতরে রশি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় বেঁধে রাখে। ইহুদী শাসক হিরোদিসের রাজসভায় প্রকাশ্যে যৌনাচার, মদপানসহ যাবতীয় অশ্লীল কাজ সংঘটিত হতে থাকে। আল্লাহর নবী হযরত ইয়াহিয়া

আলাইহিস্ সালাম এসব জঘন্য কার্যকলাপের বিরোধিতা করতে থাকেন। তাদের এই সমস্ত নোংরা কাজের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। ইহুদী রাষ্ট্রপতি হিরোদিস আল্লাহর নবী হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস্ সালামকে হত্যা করে তাঁর ছিন্ন মাথা এমন এক নারীকে উপহার দেয়, যে নারী ছিল দেহপসারিণী এবং রাষ্ট্রপতি হিরোদিসের রক্ষিতা।

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বনী ইসরাঈলী আলেমদের ও রাষ্ট্র নেতাদের খোদাদ্রোহীতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনা করে তাদের বিরাগ ভাজন হন। আল্লাহর আইনের দিকে আহ্বান জানানোর অপরাধে ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাঁকে কোনভাবেই ইসলামী তৎপরতা থেকে বিরত করতে না পেরে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং বিচারের প্রহসন চালিয়ে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। তারপর ঈদ উপলক্ষ্যে একজন মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীকে মুক্তিদানের ঘোষনা দেয়ার জন্য সম্রাট পিলাতুস সাধারণ জনগণ ও আলেমদের এক সমাবেশ আহ্বান করে। সে সমাবেশে সম্রাট জানতে চায় কাকে মুক্তি দেয়া যায়। সে সময়ে কারাগারে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী ছিল দু'জন। একজন হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম ও অন্যজন বুরাবা নামক কুখ্যাত ডাকাত। সমবেত ইহুদী জনগোষ্ঠী হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের মুক্তির পরিবর্তে ঐ কুখ্যাত ডাকাতের মুক্তি দাবী করে এবং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে ফাঁসিতে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার দাবি জানায়। এ সমস্ত ঘটনা খোদ ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ থেকেই জানা যায়। বাইবেলেও এ ধরণের বহু ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আর পবিত্র কোরআন তো ইহুদী জাতিকে অভিশপ্ত বলে ঘোষনা দিয়ে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে।

ইহুদীদের এই অবাধ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও অপরাধ প্রবণতার কারণে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করেন। পবিত্র কোরআনে সূরায়ে তওবায় মহান আল্লাহ ঘোষনা করেছেন, তাঁর শাস্তি প্রদানের একটা নিয়ম হলো–তিনি কোন অবাধ্য জাতিকে শায়েস্তা করেন আরেকটি পরাক্রমশালী জাতিকে দিয়ে। পাপাচারে লিপ্ত অবাধ্য জাতিকে পরাক্রমশালী জাতির গোলামে পরিণত করে দেন। এই ধরণের শাস্তি অবাধ্য ইহুদী জাতির ওপরে বারবার এসেছে এবং এখন পর্যন্ত তারা শান্তিতে নেই। সময়ের প্রতিটি মূহুর্ত তাদেরকে সজাগ-সতর্ক সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হচ্ছে। তাদের সমর্থক পাপাচারে লিপ্ত খৃষ্টশক্তির সহযোগিতা ব্যতীত তারা এক মূহুর্ত টিকে থাকতে পারবে না। আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে কোথাও তারা নিজেদের শক্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে শান্তির সাথে বসবাস করতে পারবে না। চিরকাল তারা অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। এখানে একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, 'ইহুদীরা তো রীতি মতো মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ওপরে হুমকির ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তীনের মুসলমানদেরকে প্রতিদিন পাখির মতো গুলী করে হত্যা করছে। অথচ আল্লাহ বলেছেন, পৃথিবীর কোথাও এরা স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে পারবে না।'

এই ইহুদীরা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসনমুখী মুসলিম বিদ্বেষী রাষ্ট্রসমূহ ষড়যন্ত্র করে ইহুদীদেরকে ফিলিস্তীনে একত্রিত করে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে

ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে এদেরকে সুসজ্জিত করে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদসহ অন্যান্য সম্পদ কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে এবং মুসলিম দেশসমূহকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে বজায় রাখার লক্ষ্যে আমেরিকা, রাশিয়া ও বৃটেন এবং তাদের সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ এই ঘৃণ্য কাজটি সম্পাদন করে। এসব রাষ্ট্র ইসরাঈলের যে কোন মানবতা বিরোধী কর্মকান্ডের প্রতি বিশ্ব-জনমতের তোয়াক্কা না করে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। ইহুদীরা তাদের নিজস্ব শক্তির ওপর নির্ভর করে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করারও সমর্থ রাখে না। ওদের ওপর থেকে পশ্চিমা বিশ্ব সমর্থন প্রত্যাহার করার সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদীদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। সুতরাং ইসরাঈলী রাষ্ট্র ইহুদীদের কোন জাতীয় স্বাতন্ত্রের অভিব্যক্তি নয়। এটা পশ্চিমা বিশ্বের মুসলিম বিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের অবৈধ ফসল। ইহুদীদের রাষ্ট্র কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। পবিত্র কোরআনে সূরা ইমরাণের ১১২ আয়াতে এ কথাও আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় বা কোন মানুষের সাহায্যে ইহুদীরা কোথাও প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সাময়িক এবং সেখানেও তারা শান্তি ও স্বস্তির সাথে বসবাস করতে পারবে না। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে, অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে ভিক্ষুকের মতো অপমান আর লাঞ্ছনার জীবন-যাপন করবে।

ইতিহাসে দেখা যায় এই ইহুদী জাতির অবাধ্যতার কারণে তাদের ওপরে বিভিন্ন জাতি বারবার আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে ঘর-বাড়ি ছাড়া করেছে, তাদের সহায়-সম্পদ ধ্বংস হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে, তাদের সমস্ত কিছু তছনছ হয়ে গেছে। আশুরীয় বাদশাহ পিয়ার খৃঃ পূঃ ৭২৪ সালে ইসরাঈল রাজ্য আক্রমণ করে হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা করে। কয়েক হাজার ইহুদীকে রশি দিয়ে বেঁধে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে দাসে পরিণত করে। খৃঃ পূঃ ৫৬১ সালে ব্যাবিলনের শাসক বখত নেছার যেরুজালেম আক্রমণ করে গোটা শহর ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে। রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। তারপর ৭০ হাজার ইহুদীকে বন্দী করে নিজের দেশে নিয়ে তাদেরকে দাসে পরিণত করে। রোমান শাসকবৃন্দ ঈসায়ী ৭০ সালে ইহুদী রাষ্ট্র আক্রমণ করে হাজার হাজার ইহুদীকে তীর, তরবারী, বর্শা ইত্যাদী দিয়ে হত্যা করে। সে সময়ে ইহুদী রাজ্যে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়ে যায়। রেমানগণ পুনরায় ১৩২ সালে পুনরায় ফিলিস্তিন আক্রমণ করে হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা করে, তাদের সহায়-সম্পদ ধ্বংস করে এবং তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়।

একাধিক বার ভিন্ন জাতির আক্রমণের ফলে, রোমানদের নির্যাতনে টিকতে না পেরে ইহুদী জাতি পৃথিবীর দেশে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এভাবে তারা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। নিজের দেশ বলে তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পৃথিবীর যেখানেই তারা আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সেখানেই তারা আশ্রয়দাতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয়েছে। ফলে সর্বত্রই তাদের ওপর নেমে এসেছে তাদের কর্মের অশুভ পরিণাম। লোভের যতগুলো মানদন্ড আছে সমস্ত মানদন্ডেই উত্তীর্ণ হবে ইহুদী জাতি। এদের অর্থ লোভ এতই প্রবল যে, ঘৃণ্য সূদ বৈধ করার জন্য তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন করে হারাম সূদকে হালাল বানিয়েছে। এভাবে তারা আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন-বিধান করেছে। সূদী ব্যবসায় তাদের

কলংক গোটা বিশ্ব জোড়া। অপরের অর্থ নিজের পকেটস্থ করার বৈধ-অবৈধ কলা-কৌশল তারা প্রয়োগ করে। এই ইহুদী জাতির রক্তে মিশ্রিত রয়েছে নিষ্ঠুরতা, লোভ, অমানবিকতা, হিংস্রতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। এ সমস্ত কারণে গোটা পৃথিবীতে এরা কোথাও শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারেনি। সর্বত্রই তাদের প্রতি ঘৃণাভরে থু-থু নিক্ষেপ করা হয়েছে। বিতাড়িত হতে হয়েছে অথবা নির্মমভাবে নিহত হতে হয়েছে। বর্তমানের ইহুদী রাষ্ট্রের প্রতি মুসলিম নামধারী শাসকদের মধ্যে যারা আমেরিকার লেজুর বৃত্তি করে, তারা সমর্থন দিতে বাধ্য হলেও গোটা পৃথিবীর সাধারণ মুসলিম জনতা তাদেরকে বিষ্ঠাসম ঘৃণা করে।

ইংল্যান্ড থেকে ১২৯০ সালে ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করা হয়। ফ্রান্স প্রথমে ইহুদীদেরকে ১৩০৬ সালে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। পুনরায় ১৩৯৪ সালে ফ্রান্স থেকে আবার ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করা হয়। বেলজিয়াম ১৩৭০ সালে ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করে। চেকোশ্লোভাকিয়া ১৩৮০ সালে ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হয়। হল্যান্ড ১৪৪৪ সালে ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হয়। ইটালী ১৫৪০ সালে ইহুদীদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে। জার্মানী ১৫৫১ সালে ইহুদীদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। রাশিয়া ১৫১০ সালে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার পাইকারীভাবে ইহুদীদেরকে হত্যা করে। এভাবে হত্যা, লাঞ্ছনা-অপমান, বিতাড়ন ও নির্বাসন ইত্যাদী দুর্ভোগের কাহিনীতে ইহুদী জাতির ইতিহাস কলংকিত। ইহুদী ধর্মীয় পন্ডিতগণ ইহুদী ধর্মের আইন-কানুন প্রণয়ন করার জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আকিবা ইবনে ইউছুফ লিখেছেন 'মিশনাহ' ও 'মাদরাস'। ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'মিশনাহ' ও 'গুমারা' একত্রিত করে লেখা হয়েছে 'তালমুদ'। ১১শ শতাব্দীতে ইসহাক আল ফার্সী লিখেছেন 'হালাখুছ'। ১২শ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসা মায়মুনী লিখেছেন 'মিশনাহ তাওরাত'।

১৪শ শতাব্দীতে ইয়াকুব ইবনে আশহার লিখেছেন 'তুর'। ১৬শ শতাব্দীতে ইউছুফ কারুর লিখেছেন 'শোলখান'। কিন্তু এসব গ্রন্থের প্রতি স্বয়ং ইহুদীদেরই তেমন একটা শ্রদ্ধা নেই। তারা তাওরাত ব্যতীত আর অন্য কিছু মানতে ইচ্ছুক নয়। ১৯০৬ সালে ইন্ডিয়ানা পলস-এ মার্কিন ইহুদী ধর্ম নেতাদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে সাধারণ ছোটখাটো ব্যাপারে ধর্মীয় বিধানের সীমানা সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করা হয়। কেননা, উল্লেখিত গ্রন্থাবলী ধর্মীয় আইনের ছোটখাটো বিধিমালায় পরিপূর্ণ। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের ওপর মহান আল্লাহ যে তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, সে তাওরাতের কোন অস্তিত্ব কোনদিনই ইহুদীদের কাছে ছিল না। তাওরাত কিতাবের বর্তমানে নাম দেয়া হয়েছে 'ওল্ডটেষ্টামেন্ট'। এই কিতাব পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় এ কিতাব কোন ঐশী কিতাবের মর্যাদা রাখে না। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম শেষ জীবনে হযরত ইয়াশু আলাইহিস্ সালামের সহযোগীতায় মূল তাওরাত গ্রন্থ সংকলন করে একটি সিন্দুকে রেখে দেন। এ কথা ইহুদী ধর্ম গ্রন্থই সাক্ষী দেয়।

হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের ইন্তেকালের পরে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট বখতে নাছার বাইতুল মোকাদ্দাসে অগ্নি সংযোগ করলে সেই পবিত্র গ্রন্থ নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই

ঘটনার প্রায় ২৫০ বছর পরে হযরত উযাইর আলাইহিস্ সালাম বনী ইসরাঈলদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় এবং আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে পুনরায় তাওরাত কিতাব সংকলন করেন। কিন্তু এই মূল কপিটিও সংরক্ষণ করা হয়নি। সম্রাট আলেকজান্ডারের বিশ্ব জোড়া বিজয়াভিযান কালে গ্রীক শাসনের পাশাপাশি গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্যসমূহ আরব দেশে বিস্তার লাভ করেছিল। সে সময়ে খৃঃ পূঃ ২৮০ সালে তাওরাতের যাবতীয় গ্রন্থ গ্রীক ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন থেকেই তাওরাতের ইবরানী ভাষার কপিটি পরিত্যক্ত হয় এবং গ্রীক ভাষায় অনূদিত তাওরাত চারদিকে প্রচলিত হয়ে পড়ে। এ কারণে বর্তমানে যে তাওরাত আছে তা যে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের তাওরাত নয়–এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তার মানে এই নয় যে, বর্তমান তাওরাতে আসল তাওরাতের কোন অংশই নেই বা বর্তমান তাওরাত সম্পূর্ণরূপেই জাল। বর্তমান তাওরাতে বাইরের অনেক কথা মিশ্রিত হয়েছে এবং অনেক মূল কথা বাদ পড়েছে।

একটু মনোযোগ দিয়ে তাওরাত পাঠ করলেই স্পষ্ট অনুভব করা যায়, তাওরাতে আল্লাহর বাণীর সাথে ইহুদী আলেমদের তাফসীর, বনী ইসরাঈল ও ইহুদীদের জাতীয় ইতিহাস, ইসরাঈলী ও ইহুদী আইনবিদদের আইনগত পর্যালোচনাসহ আরো এমন অনেক বিষয় মিশ্রিত হয়ে গেছে। বর্তমান তাওরাত থেকে আল্লাহর বাণী খুঁজে বের করা মহাসাগরের অতল তলদেশ থেকে সূঁচ বের করার চেয়েও কঠিন। তবে একথাও অত্যন্ত সত্য যে, আল কোরআনের মতই তাওরাতও ইসলামের শিক্ষাই নিয়ে এসেছিল এবং হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামও ইসলামেরই নবী ছিলেন। বনী ইসরাঈল প্রথমে ইসলামেরই অনুসারী ছিল। কিন্তু পরে তারা মূল আদর্শে নিজেদের ইচ্ছে অনুসারে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে 'ইহুদী' নামে নিজেদের এক ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। বর্তমান তাওরাত হিংসা, বিদ্বেষ, রক্তপাত, দাঙ্গা, মারামারি, ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদী শিক্ষা ও কথাবার্তায় পরিপূর্ণ। বর্তমানে ইহুদীরা যা করছে, তা তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে মোটেও খারাপ কিছু তো নয়ই বরং নির্দেশ। অতএব বর্তমানে ইহুদীরা যা করছে তা তাদের বিকৃত ধর্মের নির্দেশেই করছে। সুতরাং ইহুদীরা হলো অভিশপ্ত, আল্লাহর এদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক রাখবে, এদের সাথে যোগসাজশ করে মুসলমানদের ক্ষতি করবে, ইসলামী আন্দোলনকে বাধাগ্রস্থ করার চেষ্টা করবে, তারাও ইহুদীদের সাথেই জাহান্নামে যাবে।

পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত খৃষ্টান জাতি

খৃষ্টানদের পথভ্রষ্টতার কারণ হলো, তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধানের সাথে অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি করেছে। এরা আল্লাহর নাজিল করা কিতাবের মধ্যে ইহুদীদের মতই বিকৃত সাধন করেছে। এরা হযরত ঈসা আল্লাইহিস্ সালামকে আল্লাহর পুত্রের আসনে আসীন করেছে। কোরআনের সূরা তওবার ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ نِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ–

ইহুদীরা বলে যে, উজাইর আল্লাহর পুত্র। আর ঈসায়ীরা বলে যে, মসীহ্ আল্লাহর পুত্র।

এদের অপরাধ এ পর্যন্ত পৌছেই থেমে থাকেনি, এরা নিজেরাও নিজেদেরকে স্বয়ং আল্লাহর সন্তান বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বানিয়েছে। এরা বিশ্বাস করে যে, আমাদের নবী যেহেতু আল্লাহর সন্তান, আর আমরা হলাম সেই নবীর অনুসারী। সুতরাং, সেই সুবাদে আমরাও আল্লাহর আত্মীয়-পরিজন। এদের ভিত্তিহীন ধারণা সম্পর্কে কোরআন বলছে–

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ-

ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে যে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র। (সূরা মায়িদা-১৮)

এই অপরাধীরা যে নবীকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে তার অনুসরণ করার দাবি করে থাকে, স্বয়ং সেই নবী হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, তিনি ছিলেন আমার বান্দাহ্ এবং আমার বান্দাহ্ হবার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে সামান্যতম দ্বিধা, সংকোচ, লজ্জা বা কোন কুণ্ঠাবোধ ছিল না। তিনি স্বয়ং বলেছেন–

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ-اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا-وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ-وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا-وَّبَرًّا بِوَالِدَتِىْ-وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا-وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا-

আমি আল্লাহর বান্দাহ্, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী নির্বাচিত করেছেন। বরকত সম্পন্ন করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন। আর নামাজ ও যাকাত আদায়ের আদেশ দান করেছেন, যতদিন আমি জীবিত থাকবো। আর নিজের মায়ের হক আদায়কারী করেছেন এবং আমাকে অহঙ্কারী ও হতভাগা করেননি। শান্তি আমার প্রতি যখন আমি জন্ম নিয়েছি ও যখন আমার মৃত্যু হবে এবং যখন আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে। (সূরা মার্য়াম-৩০-৩৩)

এই সূরার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, এ হচ্ছে মার্য়ামের পুত্র ঈসা এবং এ হচ্ছে তার সম্পর্কে প্রকৃত সত্য কথা। একশ্রেণীর মানুষ তার প্রতি যে অমূলক ধারণা পোষণ করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং এটা আল্লাহর কাজ নয় যে, তিনি কাউকে নিজের সন্তান বানিয়ে নিবেন। তিনি এসব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। যারা হযরত ঈসার আদর্শ ত্যাগ করে তাঁর সম্পর্কে মনগড়া ধারণা সৃষ্টি করেছে, তিনি স্বয়ং তাদের প্রতি এভাবে আহ্বান জানিয়েছেন–

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ-هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

আল্লাহ আমারও রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব। সুতরাং তোমরা তাঁরই দাসত্ব করো আর এটাই হলো সিরাতুল মুস্তাকিম। (সূরা মার্য়াম ৩৬)

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে দিলেন, আমি যেমন এক আল্লাহকে রব্ব,

ইলাহ্, মা'বুদ হিসাবে গ্রহণ করেছি এবং একমাত্র তাঁরই দাসত্ব, বন্দেগী, গোলামী, ইবাদাত, পূজা-উপাসনা করছি, তোমরাই তাই করো এবং এটাই সহজ-সরল পথ।

সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছে যে পথ চাইলো আল্লাহ অনুগ্রহ করে সেই পথ দান করলেন। হযরত ঈসা সেই পথই প্রদর্শন করলেন এবং তা অনুসরণ করার জন্য কঠোরভাবে তাগিদ দিলেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে খৃষ্টানরা সেই আদর্শ ত্যাগ করে নিজেরা নিজেদের মনগড়া বিধান অনুসরণ করছে। বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বের অধিকাংশ খৃষ্টানরা পাদ্রীদের মনগড়া বিধান দূরে ছুড়ে ফেলে আদর্শহীন জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। এরা অবাধে-প্রকাশ্যে জ্বিনা ব্যভিচার করে, বিয়ে ব্যতিতই নারী-পুরুষ একত্রে বসবাস করে এবং সন্তান উৎপাদন করে। এসব ঘৃণ্য বিষয় তারা গর্বের সাথে প্রচারও করে থাকে। এরা আল্লাহর বিধান অমান্য করে মদপান করে, শুকুরের গোস্ত আহার করে, মূর্তিপূজক মুশরিকদের থেকেও এরা নিকৃষ্ট কর্মকান্ড করে। সপ্তাহে একদিন গির্জায় যাওয়ার প্রথা এদের মধ্যে ছিল, কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে এখন সপ্তাহের সেই নির্দিষ্ট দিন–রবিবারেও গির্জায় কোন লোক পাওয়া যায় না। সেদিন এরা গির্জায় না গিয়ে সম্মিলিতভাবে ভ্রমণে বের হয়। দর্শনীয় কোন স্থানে বা সী-বিচে গিয়ে পরনের সমস্ত পোষাক দূরে ছুড়ে ফেলে উলঙ্গ হয়ে বিকৃত আনন্দ-ফূর্তিতে মেতে ওঠে।

গির্জায় লোক যায় না, ফলে গির্জাগুলো অচল হয়ে পড়েছে। পশ্চিমা দেশসমূহ ভ্রমণের সময় আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি, অনেক গির্জা বিক্রি করার জন্য গির্জার সামনে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। সেখানের মুসলমানরা একত্রিত হয়ে তহবিল গঠন করে এসব গির্জা কিনে নিয়ে মসজিদ বানিয়েছে। যে গ্রেট বৃটেনে–ইংল্যান্ডে এক শতাব্দী পূর্বে মসজিদের সংখ্যা ছিল মাত্র একটি, সেই গ্রেট বৃটেনে বর্তমানে মসজিদের সংখ্যা সাত হাজারের ওপরে। খৃষ্টীয় ধর্ম বলতে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক আনিত ধর্ম নয়। বর্তমান খৃষ্টবাদের শিক্ষা যে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম দেননি সে সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম মানব জাতির কাছে সেই ইসলামই উপস্থাপন করেছিলেন, যা তাঁর পূর্বে সমস্ত নবী এবং রাসূলগণ করেছিলেন এবং তাঁর পরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উপস্থাপিত করেছেন। বর্তমানে খৃষ্টধর্ম হিসাবে যা উপস্থিত রয়েছে তা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের প্রচারিত খোদায়ী জীবন ব্যবস্থা-নয় বরং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের নামে পাদ্রীদের মনগড়া মতবাদ। ষষ্ঠ শতাব্দীতে খৃষ্টান জাতির অবস্থা মোটেও উন্নত ছিল না। অত্যন্ত শোচনীয় ছিল তাদের অবস্থা। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের শিক্ষা ও আদর্শ পাদ্রিদের হাতে এমনভাবে বিকৃত হয়ে পড়েছিল যে, স্বয়ং ঈসা আলাইহিস্ সালাম ফিরে এলেও তিনি তাঁর প্রচারিত আদর্শকে নিজের বলে চিনতে পারতেন না।

হযরত ঈসার তাওহীদবাদী আদর্শকে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ত্রিতত্ত্ববাদে পরিণত করেছিল। যে ঈসা আলাইহিস্ সালাম পৃথিবীতে এসেছিলেন মূর্তি ধ্বংস করার জন্য, খৃষ্টানরা সেই ঈসার মূর্তিই বানিয়ে তার পূজা করা শুরু করলো। সেই সাথে তাঁর মা মেরীও ঈশ্বরের এক তৃতীয়াংশরূপে সর্বত্র পূজিত হতে লাগলো। শুধু কি তাই? সেন্ট পল ও পিটারের মূর্তি বানিয়েও পূজা শুরু করে দিল। গোটা জীবন ধরে যে যত পাপই করুক না কেন, ত্রাণকর্তা যিশুকে একবার পূজা

করলেই সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যাবে–এই বিশ্বাস সমস্ত খৃষ্টানদের মন-মগজে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হলো। এরপর Holy Roman Empire নামে পৃথক একটা খৃষ্টান জগৎ প্রতিষ্ঠিত করা হলো। রোমের পোপের হাতে খৃষ্টানদের যাবতীয় ধর্ম সংক্রান্ত অপরাধের বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। এরপর ধর্মের দোহাই দিয়ে পোপ-পাদ্রীগণ যে বীভৎস লীলাখেলা শুরু করেছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠা সে সব ঘৃণ্য ঘটনায় আজও কলংকিত হয়ে আছে।

পোপ-পাদ্রীগণ ঘোষনা করেছিল–বেহেশতের চাবী একমাত্র তাদেরই হাতে। যে যত বড় পাপই করুক না কেন, পোপকে উপযুক্ত মূল্যদান করতে পারলে তাঁর আর কোন ভয় থাকবে না। তাকে বেহেশতে যাবার পাসপোর্ট দিয়ে দেয়া হবে। এই ঘোষনার ফলে গোটা খৃষ্টান জগতে পাপ অন্যায় অনাচারের যে প্লাবন বয়ে গিয়েছিল অন্য জাতির ইতিহাসে তার উপমা নেই। ঐ ঘৃণ্য ঘোষনার ফলে আজও গোটা খৃষ্ট পৃথিবী পাপ পংকিলতার অতল তলে নিমজ্জিত হয়ে আছে। প্রকৃত অর্থে তাদের কাছে ধর্ম বলতে যা আছে তা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের শিক্ষা নয়। বর্তমানে ইঞ্জিল বা বাইবেল যেটা, তা প্রধানতঃ চারটা গ্রন্থের সমষ্টি। লুক, মার্ক, মথি, যোহন। কিন্তু এই চারটা কিতাবের কোনটিই ঈসা আলাইহিস্ সালামের নয়। তাঁর ওপরে নাজিলকৃত ওহী একত্রে পাওয়া যায় না। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম ভ্রমণকালে বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন সেগুলো স্বয়ং তাঁর ভাষা নয়। বর্তমানে যা আছে তা যেমন আল্লাহর বাণী নয় তেমনি ঈসা আলাইহিস্ সালামের বাণীও নয়। এগুলো আসলে ঈসা আলাইহিস্ সালামের শিষ্যদের বরং বা তস্য শিষ্যদের লিখিত গ্রন্থ। তারা তাদের জ্ঞানের পরিধি অনুসারে ঈসা আলাইহিস্ সালামের জীবনী, ইতিহাস এবং বাণীসমূহ লিখেছেন।

মথি নামে যে গ্রন্থ রয়েছে তা স্বয়ং মথির লেখা যে নয়, তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। মথির আসল গ্রন্থ লেজিয়া বহু পূর্বেই গায়েব হয়ে গিয়েছে। মথির নামে যে পুস্তক আছে তা যে কার লেখা তা জানার কোন উপায়ই পাদ্রীরা রাখেনি। স্বয়ং মথির নামের জায়গায় একজন অপিরিচিত লোকের নামের মত উল্লেখ করা হয়েছে। মথি নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'ইয়াসু সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে মথি নামক একজন ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন।' মথি গ্রন্থের রচয়িতা যদি স্বয়ং মথি হতেন তাহলে তিনি এমন করে তার নিজের নাম উল্লেখ করতেন না। মথির গ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায়, তা মারকাস গ্রন্থ হতে ধার করা। কারণ মারকাস গ্রন্থের মোট আয়াতের সংখ্যা ১০৬৮ টি। এর মধ্যে ৪৭০টি আয়াতের সাথে মারকাসের বাইবেলের আয়াতের অবিকল মিল রয়েছে। মথির রচয়িতা যদি স্বয়ং মথি হতেন বা তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের সঙ্গী হতেন তাহলে অন্য কারো লেখা বই থেকে তিনি সংকলন করতেন না। খৃষ্টান গবেষকদের ধারণা, এই গ্রন্থটি ঈসার ৪১ বছর পরে ৭০ খৃষ্টাব্দে লেখা। আবার কারো ধারণা, এটা ৯০ খৃষ্টাব্দে লেখা। যোহন নামে যে বাইবেল রয়েছে তা-ও হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের সঙ্গী যে যোহন সে যোহনের লেখা নয় তা বর্তমানে খৃষ্টান গবেষকগণই স্বীকৃতি দিয়েছেন। যোহন নামে অন্য কোন লোক এই যোহন কিতাব বানিয়েছে।

এই কিতাব ৯০ খৃষ্টাব্দে বা তারও অনেক পরে রচনা করা হয়েছে। খৃষ্টান গবেষক হ্যারিং বলেছেন এটা ১১০ সালে রচিত। মার্ক নামে যে বাইবেল রয়েছে তা মারকাসের লিখিত

বাইবেল বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু মারকাস কোনদিন ঈসা আলাইহিস্ সালামের সাথে দেখা করেননি এবং তাঁর সঙ্গীও ছিলেন না। কেউ বলেছেন, এই মারকাস যিশুকে ক্রশে বিদ্ধ করার সময় সেখানে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিল। কিন্তু এ কথার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। মারকাস হলো সেন্ট পিটার নামক শিষ্যের শিষ্য এবং তার কাছে থেকে তিনি যা শুনেছেন তাই তিনি গ্রীক ভাষায় লিখেছিলেন। এ কারণে খৃষ্টান ধর্ম বিশারদগণ তাকে সেন্ট পিটারের বাণীর ব্যাখ্যাতা বলে দাবী করেন। ৬৩ সালে বা ৭০ সালে এই মার্ক গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

লুক যে বাইবেল লিখেছেন তার মধ্যেও মারাত্মক বিভ্রান্তি রয়েছে। এই লুক নামক ধর্ম নেতা যে কোনদিন ঈসা আলাইহিস্ সালামকে দেখেননি এবং তাঁর কথাও শোনেননি তা খৃষ্ট ধর্ম নেতারা একবাক্যে স্বীকার করেন। লুক ছিলেন সেন্ট পলের শিষ্য এবং তার সাথেই তিনি থাকতেন। লুক যা লিখেছেন তা সেন্ট পলের বাণী। স্বয়ং সেন্ট পল বলতেন, লুক যে বাইবেল রচনা করেছে তা আমার। অথচ মজার ব্যাপার হলো, এই সেন্ট পলও হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের সাহচর্য লাভ করেননি। তিনি যিশু খৃষ্টের ক্রশে বিদ্ধ হবার ৬০ বছর পরে খৃষ্ট ধর্মে দিক্ষীত হন। সুতরাং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম ও লুক এবং সেন্ট পলের মধ্যে অনেকগুলো বছরের শুন্যতা রয়ে গিয়েছে। লুক নামক এই লোক হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের বাণী কোত্থেকে জোটালো তা গবেষকদের কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। তারপর লুকের বাইবেল ইতিহাসের কোন সময়ে রচিত হয়েছে তা এখন পর্যন্ত নির্ণয় করা যায়নি। কেউ বলেছেন, লুক রচিত হয়েছে ৫৭ সালে আবার কেউ বলেছেন ৭৪ সালে। খৃষ্টান গবেষক পোমার, ম্যাকগিফটিং ও হ্যারিং-এর মত বিখ্যাত ব্যক্তিগণ বলেছেন ৮০ সালে পূর্ব পর্যন্ত লুক বাইবেল রচিত হয়নি।

অতএব এই চারখানা বাইবেলের একটাও হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত পৌছে না। সুতরাং আজ জানারও কোন উপায় নেই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম কি বলেছিলেন এবং কি বলেননি। এই চারখানা গ্রন্থের বর্ণনার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিরাজমান। ঈসা আলাইহিস্ সালামের নীতি ও আদর্শের যা প্রধান ভিত্তি সেই পর্বতোপরি উপদেশ গুলো মথি, মারকাস ও লুক তিনজনে তিনভাবে পরস্পর বিরোধী পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। প্রতিটি গ্রন্থেই লেখকের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও মনোভাব সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। এসব পাঠ করলে মনে হয় যেন মথির প্রতিপক্ষ একজন ইহুদী এবং সে তার বিতর্কে বিজয় লাভ করতে উদগ্রীব। মারকাসের প্রতিপক্ষ যেন একজন রোমক এবং তাকে তিনি ইসরাঈলী ইতিবৃত্ত শোনাতে চান। আর লুক যেন সেন্ট পলের উকিল এবং অন্যান্য শিষ্যদের বিরুদ্ধে তার দাবী সমর্থন করতে চান। আর যোহন যেন খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষের দিকে খৃষ্টানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া দার্শনিক সুফিবাদী তত্ত্ব কথা দ্বারা প্রভাবিত।

এভাবে বাইবেলগুলোর ভেতর তত্ত্বগত মতভেদ শাব্দিক বিরোধের চেয়েও বেশী হয়ে গেছে। ওদিকে ইঞ্জিলগুলো লিপিবদ্ধ করার কোন চেষ্টাই খৃষ্টীয় দ্বিতীয় দশকের আগে করা হয়নি।

১৫০ সাল পর্যন্ত এই ধরণের ধারণা প্রচলিত ছিল যে, লেখার থেকে মৌখিক বর্ণনা অধিকতর ফলদায়ক। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে যা লিখা শুরু হলো সেগুলোকে নির্ভর যোগ্য বলে মেনে নেয়া হলো। নিউটেষ্টামেন্টের প্রথম প্রামাণ্য পান্ডুলিপিটি ৩৯৭ সালে অনুষ্ঠিত কর্টোজেনা কাউন্সিলে অনুমোদন দেয়া হয়।

চারখানা বাইবেলই প্রথমে গ্রীক ভাষায় লিখিত হয়েছিল। অথচ হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সমস্ত শিষ্যের ভাষা ছিল সুরিয়ানী। এভাবে ভাষার পরিবর্তনের কারণে চিন্তাধারা ও বক্তব্য বিষয়ের পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইঞ্জিলের যে প্রাচীনতম কপিটি বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত তা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের। দ্বিতীয় লিপিটি পঞ্চম শতকের। আর তৃতীয় যে অসম্পূর্ণ লিপিটি রোমের পোপের লাইব্রেরীতে আছে, সেটাও চতুর্থ শতাব্দীর চেয়ে বেশী প্রাচীন নয়। সুতরাং প্রথম তিন শতাব্দীতে যে বাইবেল প্রচলিত ছিল তার সাথে বর্তমান বাইবেল কতখানি সংগতিপূর্ণ তা বলা কতটা কঠিন, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। সে সময়ে বাইবেলকে কোরআনের মত মুখস্থ করার কোন চেষ্টাই করা হয়নি।

প্রথম দিকে এর প্রচার ও প্রসার সম্পূর্ণরূপে মর্মগত বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল ছিল। বাইবেলের শব্দ নয়–এর বিষয় বস্তু প্রচার করা হতো। এতে স্মৃতির ত্রুটি বিচ্যুতি এবং বর্ণনাকারকদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। পরে যখন লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয় তখন তা নির্ভরশীল ছিল লিপিকারকদের কৃপার ওপর। লিপিকরণের সময় যে জিনিষ লিপিকারকের চিন্তা-চেতনা, আদর্শের ও বিশ্বাসের পরিপন্থী তা কাটছাট করে নিজের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ বিশ্বাস অনুপ্রবিষ্ট করাটা অসম্ভবের কিছুই নয়।

সুতরাং খৃষ্টানদের কাছে তাদের ধর্মের অবস্থা তখন যেমন ছিল বর্তমানে তার চেয়ে উন্নত তো নয়ই অবনতিই আশা করা যায়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন সম্পর্কে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর জাতিকে যে সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন এবং বিশ্বনবীর নাম পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা আস্ সফ্-এ মহান আল্লাহ বলেন, আর স্মরণ কর মরিয়াম পুত্র ঈসার সেই কথা, যা সে বলেছিল–

يٰبَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ-فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ-

হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র পাঠানো রাসূল। আমি সত্যতা বিধানকারী সেই তাওরাতের, যা আমার পূর্বে এসেছে আর সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের, যে আমার পরে আসবে, যাঁর নাম হবে আহ্মাদ। কিন্তু কার্যত সে যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন তারা বললো, এটা তো সুস্পষ্ট প্রতারণা মাত্র। (সফ-৬)

প্রয়োজন অভিশপ্তদের প্রভাব মুক্ত জীবন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেয়া হেদায়াত এই ইহুদী আর খৃষ্টানরা গ্রহণ করেনি, তারা আল্লাহর আইন অমান্য করে আল্লাহর প্রতি শির্‌ক করেছে। সত্যের সীমা লংঘন করেছে। এরা নিজেরা মনগড়া বিধান রচনা করেছে। আল্লাহ বলেন-

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ-وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَه نَصِيْرًا-

বস্তুত এসব লোকের ওপরই আল্লাহ তা'য়ালা লা'নত করেছেন। আর আল্লাহ যার ওপর লা'নত করেন, তার কোন সাহায্যকারী তুমি পাবে না। (সূরা নেছা-৫২)

এরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত, এদের ওপরে আল্লাহর লা'নত রয়েছে-এরা অভিশপ্ত। সুতরাং এদের অনুসরণ করা যাবে না। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধপূজারী। এরা নির্লজ্জের মতোই ওদেরকে অনুসরণ করে। বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) মুসলমানদের এই ঘৃণ্য আচরণ দেখে ব্যথিত কণ্ঠে বলেছেন-

ওয়াঁ মে হো তুম নাসারা তো তামাদ্দুন মেঁ হনুদ
ইয়েঁ মুসলমাঁ হ্যায় জিন্‌হে দেখ্‌কে শারমায়ে ইয়াহুদ
চাল-চলনে হিন্দু তুমি বেশ-ভূষাতে খৃষ্টান
মুসলমান এই যারে দেখে ইয়াহুদ করে লজ্জা জ্ঞান

এই মুসলমান ! তোমার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখলে ধারণা হয় তুমি খৃষ্টান। তোমার চলাফেরা, ওঠা-বসা, বিয়ে-শাদী তথা সামাজিক অনুষ্ঠান দেখলে মনে হয় তুমি হিন্দু। আর তোমার লেন-দেন দেখলে ইহুদীরা পর্যন্ত তোমার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে।

নিজেকে মুসলমান বলে দাবিও করা হচ্ছে অপরদিকে অমুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুসরণের প্রতিযোগিতা চলছে। একশ্রেণীর মুসলমান, যারা নামাজ আদায় করে এবং আল্লাহর সামনে বলে, 'আমরা ইহুদী-খৃষ্টানদের তথা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের আদর্শ অনুসরণ করবো না।' এদের মধ্যে অনেকেই অমুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতির দাসত্ব করে যাচ্ছে। বিয়ের অনুষ্ঠানে অমুসলিমদের প্রথা অনুসরণ করছে। পহেলা জানুয়ারী উদযাপন উপলক্ষ্যে ৩১ শে ডিসেম্বর রাত ১২ টা ১ মিনিটে আতশ বাজি করা হয়। মুসলিম নামধারী নারী-পুরুষ রাস্তায় নেমে এসে আতশ বাজি করতে থাকে। মদপান করে, জ্বিনা-ব্যভিচার করে। এদের বিকৃত আনন্দ-ফুর্তির হৈ-হুল্লোড়ে এক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। খৃষ্টানরা এই দিনটি উদযাপনের লক্ষ্যে তাদের আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু কোন মুসলমান এই দিন উপলক্ষ্যে আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে উঠতে পারে না। যারা খৃষ্টানদের এসব অনুষ্ঠান পালন করে, তারা যে নিলর্জভাবে খৃষ্টানদের গোলামী করছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

পহেলা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষ্যে মুসলিম পরিচয় দানকারী নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে রাতে বিশেষ বিশেষ রাস্তায় আলপনা আঁকে। তারপর পূর্ব গগনে সূর্য উদিত হবার পূর্বক্ষণে বাসন্তী রঙের শাড়ী আর ধুতি-পাঞ্জাবী ও গলায় রুদ্রাক্ষার মালা পরিধান করে, বিশেষ স্থানে সমবেত

হয়ে উদয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে প্রণাম জানানোর ভঙ্গিতে বলতে থাকে, 'এসো হে নব বৈশাখ স্বাগতম হে।'

একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একশ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, তথাকথিত শিল্পী-কবি-সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে দিনের সূচনা করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের পশু-প্রাণীর মুখোশ পরিধান করে উদ্ভট সাজে সজ্জিত হয়ে ঢোল-করতাল, ঠুংরি সহযোগে বৈষ্ণবদের অনুকরণে আনন্দ মিছিল বের করা হয়। নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে পশু-প্রাণীর সাজে সজ্জিত হয়ে এরা মানুষকে যেন এ শিক্ষাই দিতে চায়, 'পাশবিক সভ্যতা গ্রহণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে জাতীয় কল্যাণ।'

এসব সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে কোন মুসলমানের সম্পর্ক থাকতে পারে না। পহেলা বৈশাখের এমন কোন গুরুত্ব নেই যে, তা উদযাপন করতেই হবে। তারপরও যদি কেউ উদযাপন করতেই চায়, তাহলে সেদিন ফজরের নামাজ আদায় এবং কোরআন তেলাওয়াত করে সবাই মিলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা যেতে পারে, যেন এই নতুন বছরটি দেশ ও জাতির জন্য আল্লাহ তা'য়ালা কল্যাণ ও বরকতে ভরপুর করে দেন।

ইহুদী-খৃষ্টান তথা অমুসলিমদের অনুকরণে একশ্রেণীর মুসলমানরা মৃতদের উদ্দেশে বা মৃত মানুষের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে। জাতীয় সংসদের একজন সদস্য ইন্তেকাল করার পরে সংসদে প্রস্তাব উঠলো, তার জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করতে হবে। আমি সেদিন সংসদে স্পীকারকে লক্ষ্য করে বললাম, 'মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করলে যদি সওয়াব হয়, তাহলে এক মিনিট কেন, আসুন আমরা সমবেতভাবে পঁচিশ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করি। আর যদি কোন সওয়াবই না হয়, তাহলে কেন এই প্রহসন করছি? আমরা তো আমাদের পিতা-মাতার কবরের কাছে গিয়ে এভাবে নীরবতা পালন করি না? সেখানে আমরা অবশ্যই দোয়া-দরুদ পাঠ করে তাদের মাগ্‌ফেরাত কামনা করি। এটা যদি আমার তাফসীর মাহফিল হতো, তাহলে আমি মানুষকে বলতাম, ফাতিহা এবং অন্যান্য দোয়া-দরুদ পাঠ করে দোয়া করার জন্য। আপনি এই সংসদের অভিভাবক, আপনি উপস্থিত লোকদের বলুন, তারা যেন ফাতিহা ও অন্যান্য দোয়া-দরুদ পাঠ করে দোয়া করে। আল্লাহর প্রশংসা, সেদিন স্পীকার আমার কথা মেনে নিয়ে সবাইকে অনুরূপ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

সংস্কৃতির নামে বেহায়াপনা আর যৌন উচ্ছৃংখলতার গড্ডালিকা প্রবাহে মুসলমানরা ভেসে চলেছে। অমুসলিম দেশ থেকে নটনটী, রূপজীবিনী আর দেহপসারিণীদের আমদানী করে কনসার্টের নামে অপসংস্কৃতির আয়োজন করছে ঐসব ব্যক্তিগণ, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে। যৌন উদ্দীপনামূলক গান-বাজনা আর নোংরা সাহিত্যের মাধ্যমে রুচি বিকৃত করা হচ্ছে। মুসলমানদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে স্বাধীনতা দিবস, বিপ্লব দিবসসহ জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন করা হয় গান-বাজনার মধ্য দিয়ে। অথচ মুসলমানরা এসব গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন করবে আল্লাহর প্রতি শোকর আদায়ের মাধ্যমে। অমুসলিম দেশ থেকে নর্তকী-দেহপসারিণী আমদানী করে তাদের উলঙ্গ নৃত্য আর বাদ্যযন্ত্রের সুরেলা ঝংকার শুনে

স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ অনুসরণ করে ঈমানদার হতে হবে। কেবল ঈমানদারদের হাতেই জাতির স্বাধীনতাসহ অন্যান্য স্বার্থ সুরক্ষা হতে পারে। এভাবে একশ্রেণীর মুসলমানরা প্রগতির নামে অভিশপ্ত আর পথভ্রষ্ট ইহুদী-খৃষ্টানদের অনুসরণ করছে। মনে রাখতে হবে, মুসলমানদের জন্য অমুসলিমদের সংস্কৃতি এইড্‌স রোগের থেকেও মারাত্মক। এসব পথ অনুসরণ করে মুসলমানদের কোন উন্নতি হতে পারে না। কেবলমাত্র আল্লাহর কোরআনের আদর্শই মুসলমানদেরকে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছাতে পারে। বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

আঁ তুঝে বাতাও তাক্‌দিরে উমাম কিয়া হ্যায়
শামসির অ-সীনা আউয়াল তাউস অ রুবাব আখির

এসো, এই জাতির অগ্রগতি আর উন্নতির ইতিহাস তোমাকে শোনাই। যতদিন এই জাতির একহাতে কোরআন ও অন্য হাতে তরবারী ছিল, ততদিন গোটা পৃথিবী এ জাতির পদচুম্বন করেছে। আর যখন এই জাতির হাতে কোরআন ও তরবারীর পরিবর্তে বাদ্যযন্ত্র উঠেছে, তখনই দুর্ভাগ্য এই জাতিকে স্বাগত জানিয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষী, যতদিন মুসলমানরা কোরআনের বিধান অনুসরণ করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আল্লাহর নির্দেশে হাতে অস্ত্র ধারণ করে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, ততদিন এই গোটা পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে তারা আসীন ছিল। আর কোরআনের আদর্শ ত্যাগ করে, সংগ্রাম-মুখর জীবন থেকে দূরে সরে এসে মদ-নর্তকী আর গান-বাজনার প্রতি আসক্ত হয়ে ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত হয়েছে, তখনই এরা গোলামের জাতিতে পরিণত হয়েছে। অপমান আর লাঞ্ছনা হয়েছে নিত্য সাথী। প্রতিদিন এরা বিশ্ব জুড়ে অমুসলিমদের অস্ত্রের খোরাকে পরিণত হচ্ছে। এই মানবেতর ও ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে, মুসলমানদেরকে সূরা ফাতিহার শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে। নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ্–এই চার শ্রেণীর মানুষদেরকে অনুসরণ করতে হবে, তাহলে ইনশাল্লাহ জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হবে এবং আখিরাতের ময়দানে আল্লাহর জান্নাত লাভ করা যাবে।

সংক্ষেপে সূরা ফাতিহার মৌলিক শিক্ষা

পবিত্র কোরআনের প্রথম সূরা ফাতিহার মোট আয়াত সংখ্যা হলো সাত। এই সাতটি আয়াতের শিক্ষাও সাতটি। সূরা ফাতিহার যে তাফসীর করা হলো, তা সম্পূর্ণ মনে রাখা বা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা একটা অসাধারণ ব্যাপার। বিষয়গুলো স্মরণে থাকলে অনুসরণ করা সহজ হয়, আর অনুসরণ করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি স্মরণে না থাকে, তাহলে অনুসরণ করা যায় না। এ জন্য সূরা ফাতিহার সাতটি শিক্ষা অত্যন্ত সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে। সম্পূর্ণ তাফসীর পড়া থাকলে এই সংক্ষেপিত সাতটি বিষয় পড়ার সাথে সাথে বিস্তারিত বিষয় স্মরণ হবে এবং সূরা ফাতিহার শিক্ষা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা সহজ হবে।

১। মনে রাখতে হবে, সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, যখন কোন ফাসিকের প্রশংসা করা হয়–যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে না, রোজা পালন করে না, আল্লাহর বিধানের কোন তোয়াক্কা করে না, এমন ধরনের কোন ব্যক্তির যদি প্রশংসা করা হয়,

তখন আল্লাহ তা'য়ালার আরশ প্রচন্ড ক্রোধে কাঁপতে থাকে। সুতরাং প্রশংসাযোগ্য যে কোন বিষয়ে একমাত্র আল্লাহরই প্রশংসা করতে হবে, অন্য কারো প্রশংসা করা যাবে না। দ্বিতীয় যাঁর প্রশংসা করতে হবে, তিনি হলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। সরবে এবং নীরবে, প্রকাশ্যে ও গোপনে, লোকালয়ে এবং নির্জনে যে কোন অবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রশংসা করতে হবে, এটা মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২। শেষ বিচারের মালিক হলেন মহান আল্লাহ। সেদিনের একচ্ছত্র আধিপত্য হবে একমাত্র তাঁর। বিচার দিবসে তাঁর অনুমতি ব্যতিত কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। তাঁর অনুমতি ব্যতিত কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। তিনিই হবেন একমাত্র বিচারক, তাঁর বিচারে কেউ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কারো মুক্তির মাধ্যম কেউ হতে পারবে না, যারা মুক্তি লাভ করবে, সমস্ত বিচারকের বিচারক-মহান আল্লাহর আদেশেই মুক্তি লাভ করবে।

৩। জীবনের সকল ক্ষেত্রে গোলামী, দাসত্ব, আনুগত্য, পূজা-উপাসনা তথা ইবাদাত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর আইন ব্যতিত অন্য কারো বানানো আইন অনুসরণ করা যাবে না।

৪। সাহায্য কামনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে। যে কোন প্রয়োজনে একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। কোন মাধ্যমে তিনি তার ব্যবস্থা করে দিবেন।

৫। একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসাবে, আইন-কানুন, বিধান ও হেদায়াতের বিধান হিসাবে গ্রহণ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কোরআনকে।

৬। অনুসরণ করতে হবে একমাত্র নবী, সিদ্দিক, শুহাদা বা শহীদ ও সালেহ বা সেই সব লোকদেরকে, যারা ইসলামী আদর্শ অনুকুল অথবা প্রতিকুল পরিবেশে অনুসরণে অটল অবিচল থাকেন। এই চার শ্রেণীর লোক ব্যতিত আর কারো অনুসরণ করা যাবে না।

৭। জীবনের প্রতিটি বিভাগকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রভাব মুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ যারা ইসলাম বিরোধী–মুরতাদ, নাস্তিক, মুশরিক, মুনাফিক, ফাসিক এসব লোকদের অনুসরণ করা যাবে না। যারা ইসলামকে ব্যক্তিগত বিষয় মনে করে এবং ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে আবদ্ধ করতে চায়, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করতে চায় না, এদের অনুসরণ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, ইসলাম কোন আদর্শের অধীনে থাকতে আসেনি, ইসলাম কারো অনুগ্রহ লাভ করতে আসেনি। মসজিদ, মাদ্রাসা আর খানকায় আবদ্ধ থাকতে আসেনি। ইসলাম এসেছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে আসীন হয়ে জাতিকে আল্লাহর দাসে পরিণত করার লক্ষ্যে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুসলমানদেরকে জান-মাল কোরবান করে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে এগিয়ে যেতে হবে।

ওয়া মা আ'লাইনা ইল্লাল বালাগ্

তাফসীরে সাঈদী
সূরা আল-ফাতিহা
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী